বুদ্ধিজীবীর নোটবই

বুদ্ধিজীবীর নোটবই

বুদ্ধিজীবীর নোটবই

সম্পাদক

সুধীর চক্রবর্তী

বুদ্ধিজীবীর নোটবই

বুদ্ধিজীবীর নোটবই

সম্পাদক

সুধীর চক্রবর্তী

আধুনিক মানুষের তৎপর ও সতর্ক জীবনযাপনে নানা ভাব আর ভাবনার স্পর্শ স্বতই ছুঁয়ে যাচ্ছে। জাগ্রত চলমান গ্রহিষ্ণু জীবন সর্বদা সম্মুখীন হচ্ছে সনাতন তত্ত্বগুলির সঙ্গে নতুন তত্ত্বের আবাহনে। একদিকে চলছে বিশেষায়ণের প্রক্রিয়া আর একদিকে সেই বদ্ধতা থেকে মন মুক্তি খুঁজছে বিচিত্রবিদ্যা ও বিশ্বায়নের ঔদার্যে। বিবিধ ও বর্ণিল তত্ত্ববিশ্ব জ্ঞানের সীমান্তকে কেবলই প্রসারিত করে চলেছে। আন্তর্বিদ্যার সমাদর তাই এ-সময়ে অবশ্যম্ভাবী। নানান চিন্তক মানুষের তত্ত্বভাবনা জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন আইডিয়া বা বস্তুবিশ্বের নবব্যাখ্যান, তাই বলে কি প্রচলিত ভাবভাবনাগুলি খারিজ হয়ে যাবে? যাবেনা। কিন্তু পাঠকদের তৈরি হতে হবেই বিদ্যমান সমাজের প্রবহমান টার্ম বা শিরোনামের অন্তর্গত তথ্য তত্ত্বের বয়ান জেনে নিতে। এ-বই তারই সচেষ্ট আর সচেতন এক প্রস্তুতির রূপরেখা।

শ্রমজীবী কৃষিজীবী ব্যবহারজীবী শব্দগুলির অর্থ যত স্পষ্টচিহ্নিত, বুদ্ধিজীবী শব্দটির যথাঅর্থ সে তুলনায় ধূসর ও বিতর্কবহুল। কারণ মানুষের সব রকমের যাপনেই তো লাগে বুদ্ধি ও মেধা। তবু বুদ্ধিজীবী বলতে আমাদের উত্তর আধুনিক সমাজ পরিবেশ বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের দ্যোতনা আনে এবং অবশ্যই তা বিচিত্র ও বহুমাত্রিক। প্রতীচীর কারোর কারোর মতে বুদ্ধিজীবী মানে 'মেধাশ্রমিক', কারোর ভাষ্যে 'মানবীয় ট্রান্সফর্মার', কেউ ভেবেছেন 'মেকি মেধাসম্পন্ন উন্নাসিক',— আন্তোনিও গ্রামসির মতে সমস্ত মানুষই বুদ্ধিজীবী।

'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' তাই বঙ্গভাষী সকল জিজ্ঞাসু আধুনিক মনস্ক ও মেধাসম্পন্ন মানুষের জন্য প্রস্তুত হ্যান্ডবুক। নিশ্চয়ই সর্বস্পর্শী নয় কিন্তু আয়োজনে ও পরিকল্পনায়

হতে চেয়েছে এক নির্ভরযোগ্য জিজ্ঞাসাকোষ। নানা প্রসঙ্গের দ্বিশতাধিক বস্তু, ভাব বা বিষয়ের সংজ্ঞা ও ইতিহাস নিয়ে এ-সংকলনের সম্পুট। অভিবাসী, আদিবাসী, উদ্বাস্তু কিংবা দলিতদের কথা তো এ-বইতে আছেই, অর্থনীতি, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, নৃত্যকলা, নাট্যতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মবিষয়ে বহুতর জিজ্ঞাসার জগৎ। জিন, জিনোম থেকে হকিং-এর তত্ত্ব, এমনকী সুনামি যেমন সংকলনের অন্তর্গত তেমনই রয়েছে ইন্টারনেট, ওয়ান ডে ক্রিকেট, এফ এম চ্যানেল, চ্যাটিং, ব্যাণ্ডের গান কিংবা ক্লোনিং-এর মতো নতুন ধারনার সমাহার। আছে টুরিজম, আখ্যানতত্ত্ব , সাব অলটার্ন, স্ট্রাকচারিলিজম, একাঙ্ক, কার্টুন, কাস্ট, বিজ্ঞাপন, কোলাজ, আদারনেস, নারীবাদ, ডিকনস্ট্রাকশন, পর্নোগ্রাফি, প্রিমিটিভিজম, ম্যাজিক রিয়ালিজম, শৈলী এবং/ অথবা সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের মতো চর্চার সাম্প্রত মনোবীজ। ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরি-টপ্পা-গজল-রবীন্দ্র সংগীত ছুঁয়ে এ-বইয়ের বিষয়সূচি লগ্ন করেছে জীবনমুখী গানকেও। তেমনই ভক্তিমার্গ, বৈষ্ণবতা, সহজিয়া ধর্ম, কবীরপন্থার পথ বেয়ে এ-সংকলনের কুতূহল এগিয়ে চলে শরিয়ত-মারিফত পরম্পরা আর জাতবৈষ্ণব ধারা থেকে গৌণধর্মীদের অন্তর্গুপ্ত প্রতিবাদী সরণি ধরে।

'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' আসলে এক অপরিহার্য সংকলন যাতে আন্তর্জাতিক ভাবনাপ্রকল্পের সঙ্গে মিশেছে প্রার্থিত দেশীয়তার তথা ভারতীয়তার বিচিত্র বিন্যাস।

সম্পাদনা করেছেন সুধীর চক্রবর্তী— লেখক গবেষক হিসাবে যিনি স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত, সম্পাদনার অভিজ্ঞতাও যাঁর বহুদিনের আর বহুধাবিষয়ে।

বুদ্ধিজীবীর
নোটবই

বুদ্ধিজীবীর
নোটবই

বুদ্ধিজীবীর
নোটবই

বুদ্ধিজীবীর নোটবই

সম্পাদক
সুধীর চক্রবর্তী

©
সুধীর চক্রবর্তী

মূল্য : ৭৫০.০০ টাকা

BUDDHIJIBIR NOTEBOI : (a Collection of thoughts of intellectuals for intellectuals). Edited by : Sudhir Chakravarti.

Price : Tk. 750.00

Cover : Sukhen Das.

প্রয়াত প্রকাশক অনুপকুমার মাহিন্দার

নবযুগ প্রকাশনী প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

ব্রাত্য লোকায়ত লালন
যৌনতা ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত)

প্রস্তাবনা

আমাদের দেশে বাঙালি সমাজে নানারকম বৃত্তিধারী আছেন, তাঁদের বিশেষ করে বোঝাতে বা স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার জন্য এক একটা লব্জ আছে। যেমন, কলকারখানার খেটেখাওয়া মানুষদের বলা হয় শ্রমজীবী, চাষবাস করেন যাঁরা তাঁরা কৃষিজীবী, আদালতে ওকালতি করলে তাঁদের ব্যবহারজীবী বলে পরিচিতি ঘটে—কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁদের কেউ বিদ্যাজীবী বলেন এমনটা শুনিনি। উত্তর আধুনিক সমাজকাঠামোয় মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তদের বলিষ্ঠতা এবং সকর্মক ভূমিকা যেমন সর্বত্রস্বীকৃত, প্রায় সেইরকম প্রাধান্য বা মান্যতা দেখা যায় বুদ্ধিজীবীবর্গের। তাঁরা একটা বিশেষ শ্রেণিভুক্তও বটে। কিন্তু কারা এই বুদ্ধিজীবী সংজ্ঞার আওতায় পড়েন ? এর পিঠাপিঠি প্রশ্ন ওঠে নিছক বুদ্ধি খরচ করে কি জীবন চলে ? কায়িক শ্রম কি নিতান্ত অদরকারি ? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল বার্নাড শ'র এক পরিহাসদ্রব মন্তব্য যে, তাকেই বলা চলে 'বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী' (শ'-র ভাষায়) যে কোনো হাতের কাজ জানে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে না এসে পারে না যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার বলেছিলেন আমাদের হস্তশিল্পী বা কারিগরশ্রেণির হাতের সঙ্গে মগজের যোগ নেই, অর্থাৎ তাঁরা প্রথাগত বিদ্যালাভে বঞ্চিত। এর ফলে বংশানুক্রমে তাঁরা একই ধাঁচের বস্তু যান্ত্রিকভাবে উৎপাদন করে চলেন—এমন কী তাঁদের সনাতন যন্ত্রপাতিরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যদি ঘটত এবং তাঁদের হাতের কারুকুশলতার সঙ্গে যদি যুক্ত হত মননের মধু, কল্পনার ঔদার্য আর বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া তবে তাঁদের অভিকরণে একটি নবসৃষ্টির আততি মিশে হস্তশিল্প আরও হয়ে উঠত বর্ণোজ্জ্বল ও বিচিত্রধর্মী। বাস্তবে শত শত বছরে তা হয়নি—গ্রামের পর গ্রামে অশিক্ষিত ও প্রায় নিরক্ষর গ্রামশিল্পীপরম্পরা রচনা করে চলেছেন একই ধাঁচের কাঠের পেঁচা বা গৌরাঙ্গমূর্তি, পটচিত্র, রেলপুতুল বা মাটির ঘোড়া। আমরা যারা শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবী তারাই এই হাতের কাজের গরিব কারিগরদের মধ্যে শিক্ষার বিকিরণ ঘটাইনি। উপরন্তু তাঁদের তৈরি হস্তশিল্প এক লপ্তে সস্তায় কিনে তাতে শহুরে এম্পোরিয়মের ছাপ বা লোগো এঁটে তার বিক্রয়মূল্য বাড়িয়েছি আলোকিত শো-কেসে রেখে কিংবা বিদেশে পাচার করে যশ অর্জন করেছি। এসব হল আমাদের চালিয়াতি বুদ্ধিজীবিতার নগর সংস্করণ। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও কি নেই ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে গুরুসদয় দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, বিনয় ঘোষ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, মানিকলাল সিংহ বা তারাপদ সাঁতরার নাম। এঁদের কোনোভাবেই শুধু সংগ্রাহক বলা যাবে না, এঁরা দরদি ও মরমি। শ্রমজীবীদের জীবনকে

এঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন স্বকীয় বুদ্ধিজীবী জীবনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে। লিখে বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজসংহতিতে কারিগরদের প্রকৃত অবস্থানের কৌলীন্য। রবীন্দ্রনাথকে কি বুদ্ধিজীবী বলব আমরা ? বলি না বলি, তিনিই প্রথম গ্রামিক গান, লোকধর্ম, ছড়া-প্রবাদ-প্রচলন সংগ্রহে মনস্ক হন—নিজের গানের সুরসংগঠনে ভরে দেন লোকায়তের সম্পদ, কলাভবনে শুরু করেন দেশজ শিল্পধারার চর্চা, বাউলফকিরদের গানে ও তাঁদের সান্নিধ্যে স্নাত হন, Religion of Man ভাষণে অনুবাদ করে শোনান লালন ও হাসনের গানের মরমিয়া ভাষ্য। এ জাতীয় কাজ তো প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব বা করা কর্তব্য। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী অনবরত নিজেকে গড়েপিঠে নেন দেশীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার নানা তত্ত্ব-তথ্যের বুননে।

অর্থাৎ, সারকথা হল, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর এক সচেতন প্রস্তুতিপর্ব আছে—বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠতে হয়। তার জন্য চাই সজাগ মনের ক্ষেত্র আর জানার সদাজাগ্রত ইচ্ছা-প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের মনন। প্রয়োজন হয় অনবদমিত নিরন্তর জ্ঞানপিপাসা। কেউ কেউ তাই বলেন, বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ হল অস্বীকার করার সাহস অর্জন এবং তার জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। তাতে সমাজে আসে সবলতা, মানুষ কুসংস্কার আর কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা তা-ই, যা ক্রমে ক্রমে সমাজের বিত্তভোগীদের আওতা ছেড়ে এগোতে থাকে সর্বজনীনতায়, তৈরি করে আদর্শ বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা অগ্রচারী হয়ে আলিঙ্গন করতে পারেন নব নব ভাবাদর্শ, প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করেন না, অজানা তত্ত্বের সঙ্গে শুরু করতে পারেন সংলাপ, দেশীয়তা বজায় রেখেও বিশ্বতোমুখী তত্ত্ববীজগুলিকে বুঝে নিতে চান। কিন্তু তা কি খুব সহজ প্রক্রিয়া? সহজ তো নয়ই, এবং তাছাড়াও বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা নিয়ে কূটকচালও কম নেই। যেমন রোমা রলাঁ তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন *বুদ্ধিজীবীরা আসলে সরকারের চেনবাঁধা কুকুর*। এই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সঙ্গে এখন আবার উঠে পড়ে রাজনীতির প্রতাপ আর মিডিয়ার প্রলোভনের প্রশ্ন। এ সবই হল বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনবুদ্ধি সম্পর্কে সংশয় আর তির্যক অবলোকনের নমুনা। এ সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্যের কথা শোনা যায় ইতিউতি—বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সংকটও বেশ মজার। বিদেশে কেউ বুদ্ধিজীবী বলতে বুঝেছেন 'মেধাশ্রমিক', কেউ বা তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'মানবীয় ট্রান্সফরমার'। কেউ আবার ব্যঙ্গবাচনে বলেছেন বুদ্ধিজীবীরা 'মেকি মেধাসম্পন্ন উন্নাসিকের দল'—কারও মতে 'নির্জীব রক্তঝরা হৃদয়'। হিটলারের সময়ে নাৎসি ভাষ্যকাররা বুদ্ধিজীবীদের মনে করতেন 'মেধাপশু'।

এ সব সংজ্ঞায়ন আমাদের কোথাও পৌঁছে দেয় না। কেননা এ ধরনের বাক্যবন্ধের দ্যোতনার বাইরে বহে যাচ্ছে মানুষের বোধবুদ্ধিবাহিত সংরক্তজীবন। সবাই মানবেন যে, মানববিকাশের প্রতিটি স্তরেই প্রত্যেক সমাজে বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব ছিল—এমনকী সমাজের আদিমতম স্তরেও—তাঁদের বলা যায় 'প্রোটো ইনটেলেকচুয়াল'। আন্তোনিও গ্রামসিও মনে করেন—সমস্ত মানুষই বুদ্ধিজীবী, কারণ এমন কোনো মানবিক কর্ম থাকতে পারে না যা মেধাবর্জিত। তবু তো আমরা শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, ব্যবহারজীবী

শব্দগুলি তৈরি করে সমাজে চালু করেছি এবং সম্ভবত এসবের 'অপর' হিসাবে প্রচ্ছন্ন কৌশলে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষিত করতে চেয়েছি। যেন তাঁরা স্বভাবত স্বতন্ত্র, গূঢ় চৈতন্যের অধিকারী—একটি কুলীন শ্রেণি—রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান যাদের মান্যতা দেয়, সাধারণ জনসমাজ যাদের একটু সভয়ে দেখে।

না, আমরা বুদ্ধিজীবীদের এমনতর বিশেষায়ণে বিশ্বাসী নই। 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' প্রকৃত ইন্টেলেকচুয়ালদের রচনা এবং ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্যই—সদর্থে। অসংকোচে বলতে বাধা নেই যে, ইন্টেলেকচুয়ালিজম্ কোনো অপরাধ নয়, স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠাও নয়। জনসাধারণের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা কোনো বিপ্রতীপ অবস্থানে নেই— তাঁরা নাগরিক সমাজেরই অংশ। তবু কেন এই বইয়ের আয়োজন ? তার সবচেয়ে বড়ো কারণ বুদ্ধিজীবিতার দৈনন্দিন যাপনে প্রতিদিনই শান দিতে হয় মেধা ও মগজে—জানতে হয় দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বকে, বৈদ্যুতিক প্রযুক্তিকে, আন্তর্জালনগ্ন বহির্বিশ্বকেও। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আসলে চিন্তাবিকাশের ইতিবৃত্ত—গ্রহণে বর্জনে—সামগ্রিকতায়।

এতক্ষণকার বিশ্লেষণে যদি আমরা বোঝাতে পেরে থাকি যে বুদ্ধিজীবীরাই সমাজের দিশারী, সমাজবিপ্লবের পটভূমি তাঁরাই বরাবর প্রস্তুত করে থাকেন, তবে এ কথাও কবুল করা উচিত যে বিশেষ করে আজকের বুদ্ধিজীবীদের পারিপার্শ্বিক ও অবস্থান গভীর সংকটাপন্ন। তার একটি কারণ হল নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আদর্শহীন ভোগবাদের অতিকৃতি। নিজের সময়ের কাছে, নবপ্রজন্মের কাছে, রাজনৈতিক দোলাচলের মধ্যেও বুদ্ধিজীবীদের এক আরোপিত দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। সঠিক প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে না পারাও একধরনের কপটতা এবং তা বুদ্ধিজীবীদের অন্তত সাজে না। সংকট এটাও, যেমন বলেছেন ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক একগার মরোঁ, যে 'প্রযুক্তিবিদ্যায় এই সম্পন্ন সমাজ যত বেশি উন্নত হচ্ছে, এর দৃষ্টিমার্গ ও মূল্যবোধ তত বেশি নাবালক হচ্ছে।' এখন তাই সময় এসেছে চিন্তাশীল যুবসমাজকে কাছে ডেকে নেবার, তাদের মধ্যে সঞ্চার করা বৃহতের ভাবনা। 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্যই পরিকল্পিত। এর মূল কাজ তাদের চিন্তার উৎসমুখটি চেনানো—তথ্য ও তত্ত্বের রসদ নিয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন মানবচিন্তার সহযাত্রী করা।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একজন বাঙালি কবির (নৃসিংহমুরারি দে) দেখা কবিতা উদ্ধৃত করছি এটা বোঝাতে যে বুদ্ধিজীবী কবির সমাজভাষ্য কতদূর সঞ্চারী হতে পারে এবং শনাক্ত করতে পারে সাম্প্রতিক সংকটের উৎসকে। কবিতাটি :

আপনার বাড়িতে ফ্রিজ আছে।
বিদেশী রঙিন টিভি আছে
এবং এন্তার ভিডিও ক্যাসেট আছে।
আপনার অনেক লকার আছে
ভল্ট আছে—
আপনার এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ি আছে—

উলেন কার্পেট এবং জাজিম আছে।
আপনার পাঁচটা বিলিতি কুকুর আছে—
বাথরুমে ইলেকট্রিক শাওয়ার আছে।
আচ্ছা বেশ তো!
আপনি কোথায় আছেন আপনার বাড়িতে?

এই ভাষ্য আসলে আমাদের অবস্থানকে, নাকি বিপন্ন বেদিশা অবস্থানকে, একেবারে ঠিক ব্যাধিকেন্দ্রে চিহ্নিত করে ফেলেছে। সমস্যা হল, বুদ্ধিজীবীরাও এই যাপনে গ্রস্ত হয়ে পড়ছেন কি? যুবসমাজের প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন একধরনের new commercial youth culture-এর ধরতাই—'আঁটো-শাঁটো প্যান্ট বা বেলবটম, সাইকেডেলিক শার্ট, ঝাঁকড়া বাবরি চুল, লম্বা জুলপি, জলদস্যুসুলভ গোঁফ-বিন্যাস, বিচিত্রবর্ণের অভূতপূর্ব প্রগলভ পোশাক, মাদক বড়ি ইত্যাদি কি আর কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ? আকাশের মতোই তার বিস্তার বিশ্ব জুড়ে।' আমাদের প্রতিবাদ এই দৃশ্যগত বিন্যাস বা পোষাক বিপ্লবের বিরুদ্ধে নয়—এর অন্তরালে রয়েছে যে মননহীনতা তার বিপক্ষে। কেননা মননহীনতা মানুষকে কেবলই অনুকরণসর্বস্বতার দিকে টেনে নিয়ে যায়—চিন্তায় চেতনায় ও আচরণে মৌলিকতা অদৃশ্য হতে থাকে।

তা তো হতে পারেনা—শেষপর্যন্ত বলতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের সুরে, 'জয় হোক চিরজীবিতের'। আর চিরজীবিত হল মানবসমাজ, যা সর্বদা চলে বুদ্ধি ও বোধের পথে। মনে রাখতেই হয় যে, বেঁচেবর্তে থাকা মানে পরিবর্তিত হওয়া—পরিবর্তন মানেই পূর্ণতা—পূর্ণতা মানে নব নব সৃজনের আত্ম-অঙ্গীকার। মানুষের তৎপর জীবনে নানা বৈশ্বিক ভাব আর ভাবনা নিরন্তর স্পর্শ করছে চেতনালোককে—আমরা সম্মুখীন হচ্ছি প্রবহমান ভাবনার সঙ্গে বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সঙ্গে নবীন ভাবনা ও নবাগত তত্ত্বের অনিবার্য সংঘর্ষের। সাম্প্রতিকতার টানে মন মুক্তি খুঁজছে বিচিত্রবিদ্যার কঠিন কিন্তু সাধ্যদিগন্তের পদাতিক হয়ে। সারা পৃথিবীর মধ্যে বহুতর ও বর্ণিল জিজ্ঞাসা জ্ঞানের সীমান্তকে প্রসারতা দিয়েছে—আন্তর্বিদ্যার অমোঘ অস্তিত্ব সমাগত একবিংশ শতাব্দীকে অনালোড়িত করে তুলেছে। নানা দেশের আর কোনো কোনো একক ব্যক্তির চিন্তা বা দিকনির্দেশী তত্ত্ব-কাঠামো জন্ম দিচ্ছে নব নব ভাবধারার কিংবা বিদ্যমান বস্তু-বিশ্বের নবব্যাখ্যা—গড়ে উঠছে প্রবীণ-নবীনের তাপে পরস্পরিত বয়ান। পাঠকদেরও প্রস্তুতি চাই—তাই এই বিশিষ্ট সংকলন প্রণীত হয়েছে।

'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' পড়বেন যাঁরা, তাঁদের মনে রাখতে হবে, আধুনিকবাদের জন্ম হয়েছে আঠারো শতকে, যাকে বলে 'এনলাইটেনমেণ্ট' (বাংলা তর্জমায় আলোকপর্ব বা দীপায়ন যুগ)। সেই পর্বের যোদ্ধাদের মূল লড়াই ছিল ধর্ম ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ পুরোহিততন্ত্র) বিরুদ্ধে—তাঁরা ছিলেন যুক্তির সাধক। মানুষের মানসবিকাশে দরকার যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একথাই তাঁরা বলেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য শুধু তাত্ত্বিক গুরুত্বেই মূল্যবান নয়, তার মধ্যে নিহিত হয়েছিল আধুনিক যুগের ইতিহাসবোধ,

সমাজবোধ আর বিশ্বরাজনীতির দিকনির্দেশ। একথাও উল্লেখযোগ্য যে এনলাই-টেনমেন্টের ভগীরথ যাঁরা তাঁদেরও সমালোচনা হয়েছে পরবর্তী তাত্ত্বিকদের ক্ষুরধার যুক্তি ও শাণিত লেখনীতে। উনিশ শতক থেকে আধুনিক মানুষের বোধভাষ্য নানা পথ বেয়ে, নানা মনীষীর চিন্তার রেখা ধরে বিশ শতকে এসে একধরনের স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উনিশ শতকের সবচেয়ে বড়ো দুই চিন্তাবিপ্লবী ছিলেন কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডারিশ এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫)। মার্ক্সের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা দেন গিয়র্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১)। তবু মার্ক্সবাদের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ক্রমে গড়ে ওঠে নানা পোস্ট-মডার্ন ধারণা। সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসতত্ত্ব, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান আর লেখকের রচনাপ্রক্রিয়া নিয়ে নানা মুনি আবির্ভূত হন তাঁদের নানা মত নিয়ে। এঁরা সবাই বিশ শতকের মানুষ। কালক্রমের দিক থেকে উল্লেখ করলে এঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ ত্রয়ীর নামগুলি—জাক্ লাঁকা (১৯০১-১৯৮১), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) ও জাঁক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪)—এঁরা তিনজন পোস্ট মর্ডান চিন্তকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু এঁদের অগ্রবর্তী তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর (১৮৫৭-১৯১৩) ও আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) নাম। এঁদের পরিমণ্ডলের মধ্যে না থেকেও খুব মৌলিক ভাবনার সূত্র দিয়ে গেছেন রলাঁ বার্ত (১৯১৫-১৯৮০)। ইউরোপের এই সব নমস্য চিন্তানায়কের পাশে রুশ তাত্ত্বিক মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন-এর (১৮৯৫-১৯৭৫) নামও অবিস্মরণীয়। চিহ্নতত্ত্ব, পাঠনির্ধারণ, রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব তত্ত্ব, দ্বিবাচনিকতা, গঠনবাদ, উত্তর গঠনবাদ, অবিনির্মাণ জাতীয় নানা ঝকঝকে ভাবনা এঁদের রচনা থেকে পেয়ে আমরা ঋণী হয়েছি গত কয়েক দশক।

কিন্তু শুধু তত্ত্বগত মতাদর্শ নয়, প্রয়োগের ও সৃজনের মধ্যেও এসে গেছে উত্তর আধুনিক ভাব ও ভাবনা, এসেছে উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। মানব ভাবনার ক্রমমুক্তির নানা দিশা এসে গেছে নতুন চলচ্চিত্র সৃজনে তথা ফিল্ম স্টাডিজ পাঠক্রমে। মানবীবিদ্যাচর্চা এবং তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের অভিনব আয়োজন আধুনিক পাঠার্থীর পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা। ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে সাবঅলটার্নতত্ত্ব (যাকে বলে 'তল থেকে দেখা ইতিহাস') বেশ বিতর্ক তৈরি করেছে। দলিতদের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিকোণ, অভিবাসীদের নিয়ে ডায়াস্পোরা তত্ত্ব, আদারনেস, নেগ্রিচ্যুড, প্রিমিটিভিজম কিংবা বেতারের নবরূপ এফ. এম. চ্যানেল, কম্পিউটারের ইন্টারনেট আমাদের জ্ঞানের সীমান্ত ধরে টানছে। পপ আর্ট, ব্যাণ্ডের গান কিংবা ওয়ান ডে ক্রিকেট একেবারে টাটকা প্রসঙ্গ। তারপাশে অভিনিবেশ দাবি করতে চায় মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের সমাজস্পর্শী আধুনিক ব্যাখ্যান কিংবা গৌণধর্মের সূত্রে প্রতিবাদের নতুন ভাষ্য। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কারণ ধর্মের আগ্রাসক রূপ দেশে দেশে টেনে আনছে রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ বা অনভিপ্রেত বিচ্ছেদ। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরবিহার ও সুরমিশ্রণের স্বরূপ যেমন আমাদের জানা জরুরি, ঠিক সেই অনুপাতেই জানতে হবে না কি লোকসংগীতের স্বর ও সুর কাঠামোর ধরন? জানতে হবে এটাও যে মাত্র দু'তিন দশকে কেমন করে জেগে উঠল 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে একটি বন্দিশ, বাংলা গানে যা

অপূর্বকল্পিত। জিন-জিনোম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা থাকা চাই আমাদের, তেমনই উপেক্ষা করা যাবে না হকিংয়ের কালদর্শনের সাম্প্রতিক বয়ান। কোলাজ, মন্তাজ, ইমেজারি, ইকোলজি, থার্ড ওয়ার্ল্ড কিংবা ম্যাজিক রিয়ালিজম এখন যেমন খুব আকর্ষণীয় বিষয়, তেমনই আধুনিক মনকে টানে বিজ্ঞাপন, প্রত্নতত্ত্ব, অ্যাবসার্ড এমনকী ন্যারেটোলজি বা আখ্যানতত্ত্ব। অন্দর-বাহিরের অনুসন্ধান যেমন সত্য, ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক অ্যালিয়েলেসন বা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধের বাস্তব। সবকিছুকে ছাপিয়ে অবশ্য রয়েছে সুনামির সাম্প্রতিক আতান্তর।

এই ধরনের বহুতর তত্ত্ব ও ধারণার চলমান বিশ্বকে আমরা ধরতে চেয়েছি 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই'-য়ের দুই মলাটের পরিসীমায়। তবু এর বাইরে রয়ে গেল কত কত তত্ত্ব ও ধারণা। তা নিয়ে আমাদের আক্ষেপ, অসন্তোষ ও অস্থিরতার শেষ নেই। মনে রাখা দরকার যে বুদ্ধিজীবী মানুষ মূলত অতৃপ্ত তবু তার অনন্ত সঙ্গী হল অন্বেষা। সেই অন্বেষার কি শেষ আছে ? মানুষের ভবিতব্য এটাই যে সে জানে না পথের শেষ কোথায় কিন্তু তাই বলে পথ চলার আনন্দ তো মিথ্যা নয়।

প্রয়াত প্রকাশক এবং ধ্রুবপদ-এর একনিষ্ঠ কর্মী অনুপকুমার মাহিন্দারকে বাংলাদেশ-সংস্করণ উৎসর্গ করে তার স্মৃতির প্রতি ভালবাসা অর্পণ করার সুযোগ করে দিল বাংলাদেশের নবযুগ প্রকাশনী।

সুধীর চক্রবর্তী

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন
কৃষ্ণনগর ৭৪১১০১
পশ্চিমবঙ্গ
ভারত

সংকলন প্রসঙ্গে

১৯৯৬ সাল থেকে একটানা প্রকাশিত হচ্ছে *ধ্রুবপদ* বার্ষিক সংকলন, এবার ২০০৫ সালে বেরিয়েছে তার নবম বার্ষিক সংখ্যা। প্রসঙ্গ : নারীবিশ্ব। আসলে এই সংকলনের সম্পাদক, ষাট বছর বয়সে অধ্যাপনার সক্রিয় জীবন থেকে অবসৃত হলেও, তার অনবসর স্বভাব খুঁজছিল নতুন কোনো কাজ—মন ও মননের বিশেষ কোনো চর্যা। *ধ্রুবপদ*-এর ব্যক্তিগত প্রস্তাবনা ছিল তারই ফলিত ফসল। বছরে একবার কোনো একটি পূর্বকল্পিত বিশেষ প্রসঙ্গ সামনে রেখে, তার বিষয়বিচিত্রা-বিন্যাস-নান্দনিক ব্যঞ্জনা সমেত অভিপ্রেত বিস্তারিত অবয়বে, আমন্ত্রিত লেখকদের রচনাসৌকর্যে *ধ্রুবপদ* প্রকাশিত হতে পেরেছে। বিজ্ঞাপনবর্জিত, অবাণিজ্যিক এই সংকলন সারাবছরব্যাপী উদ্যমে ও কয়েকজনের সপ্রেম সহায়তায় এখন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে বাংলার বুদ্ধিজীবী পাঠকবৃত্তে। বছর বছর তার বিষয় যেমন পালটে গেছে, তেমনই মুদ্রণ পারিপাট্য, আঙ্গিক সৌকর্য, প্রচ্ছদকর্ম, চিত্রণ ও বর্ণলিপি বৈচিত্র্যে তার আকারপ্রকার কেবলই নবনিরীক্ষায় নতুন চেহারা পেতে চেয়েছে। এই প্রয়াসে প্রায় এক দশকে কোনো সংঘ বা গোষ্ঠীগত উদ্যম দরকার হয়নি। প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন মিত্রজন, শ্রমদানে ও পরামর্শদানে কোনো পর্যায়েই লোকাভাব হয় নি বা ঘটেনি অর্থঘটিত সংকট। *ধ্রুবপদ*-এর বার্ষিক প্রকাশনা তাই সম্পাদকের পক্ষে বরাবরই এক সানন্দ কৃত্য ও আত্মপ্রসাদের বিষয়। এ দেশে একা এবং কয়েকজনে মিলে দিব্যি ভাল কাজ করা যায় এবং ধারাবাহিকভাবে—তাতে রাজনীতির হাতছানি থাকে না, আগ্রাসী মিডিয়াকে এড়িয়ে চলা যেতেই পারে, সবচেয়ে বড়ো কথা বহু মরমি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ দিনে দিনে এক মানসবৃত্তকে প্রসারিত করে—গড়ে তোলে এক নিরীক্ষাবহুল কাজের প্রযত্ন, ধর্মনির্লিপ্ত পরিবেশ, মুক্তচিন্তা ও নবভাবনার নির্ভীক মননমঞ্চ। লক্ষ করা গেছে, *ধ্রুবপদ*-এর সকল কপিই নিঃশেষে বিক্রিত হয়ে যায় অথচ তার চাহিদা থাকে—অনেকেই খোঁজ করেন, জানতে চান কীভাবে পাওয়া যেতে পারে একসেট *ধ্রুবপদ*। আমরা তার কোনো সদর্থক সহায়তা করতে পারি না কিন্তু পাঠকপ্রতিক্রিয়া টের পেয়ে কোনো কোনো সংকলন বই আকারে বার করি—তবে তাকে নিছক পুনর্মুদ্রণ বলা যায় না। কেননা পরিবর্জন ও পরিবর্ধন চলে, সংকলনের দোষত্রুটি বা মুদ্রণঘটিত বিপর্যয়-গুলিকে সামলানো যায় এবং লক্ষ্য থাকে কীভাবে একটি তৎসাময়িক রচনাবিন্যাসকে নবতর পরিকল্পনায়, এমনকী কোনো কোনো রচনার পুনর্লিখনে বইটি পায় সামগ্রিকতা তথা পূর্ণাবয়ব।

এইভাবে এপর্যন্ত *ধ্রুবপদ*-এর প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম বার্ষিক সংকলন গ্রন্থাকার পেয়েছে এবং সেই তিনটি বই প্রকাশ করেছেন পুস্তক বিপণি এবং এর একটি নবযুগ প্রকাশনী যৌনতা ও সংস্কৃতি। অনেকটা বিস্তারে এবং দীর্ঘসময় নিয়ে, *ধ্রুবপদ*-এর চতুর্থ সংকলন—যার প্রসঙ্গ ছিল : 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই'। এর জন্য সম্পাদকরূপে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বিশেষ করে এই কারণে যে ২০০০ সালে প্রকাশিত *ধ্রুবপদ*-এর 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' সংকলনটির অসম্পূর্ণতা, আয়োজনের শীর্ণতা, বিন্যাসের ত্রুটি, মুদ্রণ বিভ্রাট এবং বহুপ্রসঙ্গের অনুপস্থিতি আমার পক্ষে এতদিন অস্বস্তিকর হয়ে ছিল অথচ যা সম্ভবত অনপনেয় ছিল না। এ সংকলনে ১৪৯ জন লেখকের ২১৪টি রচনা সম্ভারে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা পেয়েছে, তবে আত্মতৃপ্তির কারণ নেই, কারণ এ-সংকলনেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি অনেক প্রসঙ্গ—সম্ভবত যায়ও না। আধুনিক জীবন অনবরত সর্বস্পর্শী হতে চায়—জানবার আর জানাবার বিষয়ের কি শেষ আছে? নেই, কাজেই প্রস্তুত 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' আপাতত হয়ে থাক একটি বৃহত্তর কাজের প্রথম সোপান।

এবারে পাঠকদের জানানো যাক, কীভাবে সূচিত হয়েছিল ২০০০ সালের আট-দশ মাস আগে থেকে 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' সংকলনের প্রস্তাবনা। বস্তুত এই প্রয়াস গত শতাব্দীর অন্ত্যপর্বের সংঘটন। সেই পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে যখন অধ্যাপনার কাজে আমার হাতেখড়ি-পর্ব চলছে, তখন হাতে আসে Ideas নামে একটি মোটা বিদেশী কোষগ্রন্থ। আদ্যন্ত পড়ে মনে হল, ইস্, এমন একখানা বই যদি বাংলা ভাষায় কেউ গড়ে তুলত! পরে, ষাট-সত্তর দশকে আমার সহপাঠী বন্ধু *এক্ষণ* সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য তার ত্রৈমাসিকে 'পরিভাষা পরিচয়' শিরোনামে প্রকাশ করতে থাকে অধিকারী মানুষদের দিয়ে লিখিয়ে কিছু কিছু আধুনিক তত্ত্ব ও ধারণা। কিন্তু সে খুবই অনিয়মিত। (আমাদের বর্তমান সংকলনে পুরনো *এক্ষণ* থেকে সংগৃহীত হয়েছে পরিতোষ সেনের লেখা 'কোলাজ' ও সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইয়েলো জার্নালিজম'।) যাই হোক, আশির দশকে কোনো এক সন্ধ্যায় আলাপচারির ফাঁকে আমার স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র ধীরেন দেবনাথ 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র মনে ধরে যায় এবং দীর্ঘদিন তা লালন করে রাখি মনে মনে। অবশেষে নব্বই দশকের শেষাশেষি, যখন *ধ্রুবপদ*-এর তিনটি বার্ষিক সংকলন বেরিয়ে গেছে, তখন চতুর্থ সংখ্যার প্রসঙ্গ হিসাবে বেছে নিই এই 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' ধারণাটি। ইত্যবসরে অবসর জীবনে হঠাৎ সুযোগ ঘটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বছর দুয়েক অতিথি-অধ্যাপকের কর্ম করার। সেই সুবাদে আলাপ পরিচয়, ভাবনা বিনিময় ঘটে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মননশীল ও জিজ্ঞাসু অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে, তাঁদের কারোর কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতার সম্পর্ক এখনও রয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে একজন, চিন্তাবিদ ও সহৃদয় সজ্জন মানুষ অর্থনীতির অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করি বেশ কিছু প্রসঙ্গের তালিকা প্রস্তুত করে দিতে। তিনি অনায়াসে প্রায় দুশোটি বিষয় ছকে দেন প্রাথমিক ভিত্তিকর্ম হিসাবে। সেই তালিকায় নতুন কটি প্রসঙ্গ

জুড়ে দেন অগ্রজকল্প শঙ্খ ঘোষ এবং স্নেহাস্পদ রুশতী সেন। তালিকাটিকে আর একটু মাজাঘষা এবং নবসংযোজনে সমৃদ্ধ করলেন প্রীতিভাজন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে কাজ শুরু হল। মোট ১২৭টি প্রসঙ্গে লেখবার জন্য অনুরোধ পত্র দেওয়া গেল ৯১ জনকে, প্রয়োজনে ব্যাপারটা বোঝাতে হল মৌখিক ভাবে, শব্দসংখ্যার সীমা বেঁধে দিতে হল। লেখকসূচি প্রণয়নে কোনো প্রান্তবাদী চিন্তা না করে নানাবর্গের ভাবুকদের আহ্বান করা হল। তাঁরা কেউ শিক্ষক, কেউ গবেষক, কেউ এমনকী ছাত্র। ডাকা হল বিজ্ঞান-মনস্ক চিন্তাবিদ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মী, ইতিহাসবিদ, সংগীত সমালোচক, নাট্যকার ও অভিনেতা, চলচ্চিত্রবেত্তা, শিল্পরসিক, সাহিত্যকর্মী, সাংবাদিক, মানবী-বিদ্যার উৎসাহী গবেষককে। সকলেই সোৎসাহে সাড়া দিলেন। বেশ সাড়া জাগিয়ে প্রকাশিত হল *ধ্রুবপদ*-এর চতুর্থবার্ষিকী, যার প্রসঙ্গনাম : বুদ্ধিজীবীর নোটবই এবং অচিরে তার ১৫০০ কপি বিক্রি হয়ে গেল। এইবারে আসতে লাগল পাঠকদের তরফ থেকে ঐ সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের দাবি, কিন্তু আমার তাতে ঘোর অমত, কারণ সংকলনটিতে নানা ত্রুটি ছিল—অবিবেচনা ও তাড়াহুড়োর ছাপ তার সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। কলকাতার এক নামী প্রকাশক এবং ঢাকার প্রকাশক নবযুগ প্রকাশনী চাইলেন বই আকারে বুদ্ধিজীবীর নোটবই বার করতে। কিন্তু পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ভাবে তাকে আবার সাজানো, নতুন লেখা জোগাড় করা, সবই সময় আর পরিশ্রমসাধ্য কাজ—সেই সঙ্গে বহুতর নতুন সিদ্ধান্ত বা পুনর্বিবেচনাও ছিল জরুরি। *ধ্রুবপদ*-এর প্রথমাবধি পরিবেশক এবং স্থায়ী শুভার্থী পুস্তক বিপণির অনুপকুমার মাহিন্দারও দীর্ঘদিন ধরে চাইছিলেন বুদ্ধিজীবীর নোটবইয়ের পুস্তকাকার দিতে। ইত্যবসরে কেটে গেল চারটি বছর, বেরিয়ে গেল *ধ্রুবপদ*-এর আরো পাঁচটি বার্ষিক সংকলন। ততদিনে কাজ শুরু হয়ে গেছে এই গ্রন্থরূপের। তার মানে, অন্তত শতখানেকের বেশি নতুন প্রসঙ্গের সংযোজন এবং তার অনুষঙ্গে নতুন লেখক সন্ধান। কিছু কিছু পুরানো প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া বা অন্যদের দিয়ে পুরানো প্রসঙ্গে নতুন করে লেখানো বেশ জটিল কাজ বলে বোঝা গেল। আর কে না জানেন এদেশে বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে তাঁদের লেখার পুনর্লিখন করানো কতটাই অসম্ভব। তবু নিরস্ত হইনি—তাগাদা, চিঠি, টেলিফোন, দেখা করা সবই চলেছে। অবশেষে এতদিনে বুদ্ধিজীবীর নোটবই বেরোতে পারল। প্রেসকর্মীদের সহায়তা ছিল নিরবচ্ছিন্ন। বইটির প্রসঙ্গগুলি বিন্যাসে নিখুঁত বর্ণানুক্রমিক করা গেছে, অঙ্গসজ্জা, বর্ণলিপি, আকৃতি ও প্রচ্ছদ বদলে গেছে। এরজন্য বেশ কজনকে কৃতিত্ব দিতে হবে।

প্রথম কৃতিত্ব প্রয়াত প্রকাশক অনুপকুমার মাহিন্দারের। লেখক নির্বাচনের কিছু প্রস্তাব ছিল তাঁর, তাঁদের কয়েকজনকে দিয়ে লিখিয়ে নেবার দায়ও নিয়েছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত নবযুগ প্রকাশনীর কর্ণধারেরও প্রস্তাব ছিল সংযোজন বিষয়ে কিন্তু সম্পাদকের শারীরিক অসুস্থতার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া কাজে লেগেছে—সমালোচকদের কিছু কিছু প্রস্তাব শিরোধার্য করেছি। নতুন বিষয়ের ও লেখকের খোঁজে সন্ধানী সতর্কতা ও প্রস্তাব দিয়েছেন শুভেন্দু দাশমুন্সী, কুন্তল মিত্র, সুমন ভট্টাচার্য ও অভ্র ঘোষ—তাঁরা নিজেরাও লিখেছেন। সূচি প্রণয়ন, কম্পিউটারের নানা

কর্মকৃতি আর বিন্যাসের কাজে অকৃপণ সহায়তা করেছে ছাত্রপ্রতিম ছন্দম চক্রবর্তী ও কৌশিক দে। মুদ্রণ সংক্রান্ত সব নির্দেশ, বানানবিধি প্রণয়ন, বারো আনা লেখা সংগ্রহ তথা লেখক নির্বাচনের কাজ অবশ্য সম্পাদকের। সে ব্যাপারে ঝোঁকটা ছিল তারুণ্যের দিকে। লে-আউটের পুস্তক বিপনী সংস্করণের সুপরামর্শ দিয়েছেন শিল্পী সোমনাথ ঘোষ। বাংলাদেশ সংস্করণের লে-আউট প্রকাশক-এর মস্তিক প্রসূত। নানা খুচরো কাজে রমাপ্রসাদ দত্ত আর দেবাশিস মুখোপাধ্যায় সদাব্রতী ছিলেন। ব্যাপক সাহায্য করেছেন প্রীতিভাজন রংগন চক্রবর্তী ও অনুজপ্রতিম অভ্র ঘোষ। বইটির অন্তর্গত 'পারিভাষিক' অংশটি প্রণয়ন করেছেন সুমন ভট্টাচার্য। বানানবিধি বিষয়ে সম্পাদক ঋণী অশোক মুখোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষের কাছে। নানাবিধ ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হাসিমুখে সামলেছেন শিবনাথ ভদ্র।

সম্পাদনা বিষয়ে কয়েকটি কথা শাদামাটা বলা দরকার। প্রথমত, কোনো লেখাতেই আমরা গ্রন্থপঞ্জি বা উল্লেখপঞ্জি দিইনি, যদিও অনেক লেখক তা চেয়েছিলেন। এই অক্ষমতার কারণ বইটির আকারবৃদ্ধির আশংকা, যার অনিবার্য পরিণতি হত মূল্যবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, পাঠকদের জানানো দরকার যে, সব লেখকদের আমরা অনুরোধ করেছিলাম মোটামুটি ৭০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে প্রতিটি লেখার সীমাকে বেঁধে রাখতে। অনেকেই তা মান্য করেছেন, কেউ কেউ তা লঙ্ঘন করেছেন। তাই বলে তাঁদের লেখায় সম্পাদক তাঁর কর্তৃত্ব ফলাননি। প্রয়োজনে পরিমার্জন বা সামান্য কিছু কিছু শব্দ বদল কোনো কোনো লেখায় অবশ্য সম্পাদকীয় অধিকারে নেওয়া হয়েছে। এইসূত্রে ঘোষণা করা উচিত যে, এত সব অনুপুঙ্খ বিষয়ে এবং জ্ঞানচর্চার এত বড় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কারোর লেখায় তথ্যঘটিত প্রমাদ বা ধারণাগত বিভ্রমের স্বরূপ আবিষ্কার করা কোনো একজন একক ব্যক্তির (বা সম্পাদকের) পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ঐ সংক্রান্ত ত্রুটি থাকলে পাঠকরা নিঃসংকোচে পত্রক্ষেপ করবেন, ভবিষ্যৎ সংস্করণের কথা ভেবে। এখানে বলা বাহুল্য যে, সংকলনের সব কটি লেখায় ব্যক্ত লেখকদের মতামত বা মন্তব্য সম্পর্কে সম্পাদকের কোনো দায়ভাগ নেই, তার দায়িত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত। তৃতীয়ত, জানানো প্রয়োজন যে স্বতন্ত্র একটি লেখকসূচি থাকলেও আমরা লেখক-পরিচিতি দিইনি—দিতে চাইনা। কেননা, আমাদের ধারণা, প্রাজ্ঞ-পাঠক তাঁদের রচনা পাবে। তদ্বীয় যোগ্যতা অনুধাবন করবেন। সম্পাদক যাঁকে যে বিষয়ে লেখার অধিকারী বলে মনে করেছেন তাঁকে সেই বিষয়ে লেখার ভারার্পণ করেছেন। *ধ্রুবপদ* চতুর্থ সংখ্যার অন্তর্গত বেশ কটি লেখা প্রস্তুত সংকলনে বর্জিত হয়েছে—তার কারণ বহুক্ষেত্রে সেই রচনার আকৃতিগত দৈর্ঘ্য, যা প্রায় একটি প্রবন্ধের সমতুল।

যাঁরা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকৃতজ্ঞ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সূচিপত্র

অন্দর-বাহির	২৯	একাঙ্ক	১১৩
অভিধান	৩২	এক্সপ্রেশানিজম	১১৬
অভিবাসী	৩৫	এন জি ও	১১৮
আ প্রায়োরি	৩৮	এনলাইটেনমেন্ট	১২২
আইডিওলজি	৪০	এপিস্টেমোলজি	১২৪
আর্কেটাইপ	৪৪	এফ এম চ্যানেল	১২৭
আখ্যান	৪৬	ওয়ান ডে ক্রিকেট	১৩০
আদারনেস	৪৯	ওরিয়েন্টালিজম	১৩২
আধিবাসী	৫১	কপিরাইট	১৩৫
আধুনিকতা আধুনিকতাবাদ	৫৪	কবীর পন্থ্	১৩৮
আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম	৫৭	কমনওয়েলথ অব নেশনস্	১৪১
অ্যাকাডেমিক আর্ট	৬৩	কমপিটেন্স পারফরমেন্স	১৪৪
অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়ালিটি	৬৬	কমিউনিকেশন	১৪৬
অ্যাবসার্ড	৬৯	কমিউনিজম	১৫১
অ্যালিয়েনেশন	৭৩	কমেডি	১৫৪
অ্যালিগরি	৭৬	কম্পোজিশন	১৫৬
ইকো ফেমিনিজম	৭৮	কলোনিয়ালিজম	১৫৯
ইকোলজি	৮১	কল্পবিজ্ঞান	১৬২
ইনস্টলেশন	৮৫	কার্টুন	১৬৫
ইমপ্রেশানিজম	৮৭	কালচার	১৬৮
ই-মেল, ইন্টারনেট, ই-কমার্স	৮৯	কাল দর্শন	১৭১
ইয়েলো জার্নালিজম	৯৩	কান্ট্	১৭৪
ইলাস্ট্রেশন	৯৬	ক্যাপিটালিজম	১৭৬
ইসলাম	১০১	ক্লাসিসিজম	১৮১
উত্তরগঠনবাদ	১০৭	কোরাস	১৮৪
একজিস্টেনসিয়ালিজম	১১০	কোরিওগ্রাফি	১৮৭

কোলাজ ১৯০
কোল্ডওয়ার ১৯৩
ক্লোনিং ১৯৫
খ্রিষ্টধর্ম ১৯৮
গঠনবাদ ২০১
গণনাট্য ২০৪
গীতিকা ২০৭
গৌণধর্ম ও লালনপন্থা ২১০
গ্রুপ থিয়েটার : পশ্চিমবঙ্গ ২১৫
চ্যাটিং ২১৮
চিত্রকল্প ২২১
ছড়া ২২৪
ছোটোগল্প ২২৬
জাত-বৈষ্ণব ২২৯
জাতিসত্তা ২৩১
জিন ২৩৫
জিনোম ২৩৮
জীবনমুখী গান ২৪২
জৈনধর্ম ২৪৫
জোট-নিরপেক্ষতা ২৪৮
টপ্পা-ঠুমরি-গজল ২৫১
ট্র্যাজেডি ২৫৪
টুরিজম ২৫৭
ডাডাইজম ২৫৯
ডিকনস্ট্রাকশন ২৬১
ডিফারেন্স ২৬৩
ডিসকোর্স ২৬৫
ডিস্তালিনাইজেশন ২৬৭
ডেভেলপমেন্ট ২৭০
তথ্যচিত্র ২৭৫
তাল ও লয় ২৭৮
তুলনামূলক সাহিত্য ২৮০
থার্ড ওয়ার্ল্ড ২৮৩
থার্ড থিয়েটার ২৮৫
থার্ড ডিগ্রি ২৮৮
থিসরাস ২৯২
দলিত-আন্দোলন দলিত-সাহিত্য ২৯৪
দ্বিবাচনিকতা ৩০০
ধ্বনিবাদ ৩০৩
ধ্রুপদ ও খেয়াল ৩০৬
ধ্রুপদী নৃত্য ৩০৯
নক্‌শা প্রহসন ৩১১
নক্সা কিস্‌সা বাতেলা ৩১৫
নতুন বিশ্বব্যবস্থা ৩১৯
নভেলাইজেশন ৩২২
নয়া উপনিবেশবাদ ৩২৫
নয়া গণতন্ত্র ৩২৭
নাগরিক সমাজ ৩৩১
নারীবাদ ৩৩৪
ন্যাচারালিজম ৩৩৬
ন্যাটো ৩৩৮
ন্যাশনালিজম ৩৪১
নিউওয়েভ বা ন্যুভেলভাগ ৩৪৪
নিউ লেফট ৩৪৮
নিউ হিস্টরিসিজম ৩৫১
নিও রিয়ালিজম ৩৫৩
নিয়ন্ত্রণরেখা বা লাইন অব্ কন্ট্রোল ৩৫৬
নেগ্রিচ্যুড ৩৫৯
নৈরাজ্যবাদ ৩৬১
পজিটিভিজম ৩৬৬
পট ও পটের গান ৩৬৯
পপ আর্ট ৩৭৪
পপুলার কালচার ৩৭৬
পর্নোগ্রাফি ৩৭৯

পরিবেশ ৩৮২
পাওয়ার ৩৮৬
পার্সিধর্ম ও জরথুষ্ট্রবাদ ৩৯১
পুথি ৩৯৫
পুরালিজম ৪০০
পোস্ট কলোনিয়াল ৪০৩
পোস্ট মডার্নিজম ৪০৬
পোস্ট মার্ক্সিজম ৪০৯
পোস্ট হিউম্যানিজম ৪১২
প্রত্নতত্ত্ব ৪১৫
প্রলেতারিয়েত ৪১৮
প্রসিনিয়ম ৪২০
প্রিমিটিভিজম ৪২৪
ফর্মালিজম ৪৩০
ফলসিফায়াবিলিটি ৪৩৩
ফ্যাসিজম ৪৩৬
ফিউচারিজম ৪৩৮
ফিল্ম স্টাডিজ ৪৪০
বই ৪৪৩
বক্রোক্তি ৪৪৭
বাংলা ব্যান্ড ৪৫১
বাঙালি উদ্বাস্তু ৪৫৪
বিকল্প পরিবার ৪৫৬
বিচ্ছিন্নতাবাদ ৪৫৮
বিজ্ঞাপন ৪৬২
বিশ্বায়ন ৪৬৬
বুর্জোয়া ৪৬৮
বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ৪৭০
বোধ ও বোধিবিজ্ঞান ৪৭৪
বৌদ্ধধর্ম ৪৭৭
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ৪৮০
ব্রতকথা ৪৮৪
ভক্তি ও ভক্তিমার্গ ৪৮৬
ভাষা আন্দোলন ৪৯০
ভাষার মৃত্যু ৪৯৪
মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ ৪৯৮
মঞ্চগীতি ৫০১
মন্তাজ ৫০৪
মাইক্রোবায়োলজি ৫০৬
মার্ক্সবাদ ৫১০
মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব ৫১৩
মানবাধিকার ৫১৬
মারফতি ৫১৯
মাল্টিমিডিয়া ৫২২
ম্যাজিক রিয়ালিজম ৫২৪
মিথ ৫২৭
মিস্টিসিজম ৫২৯
মেটিরিয়ালিজম ৫৩১
মেলোড্রামা ৫৩৪
মৌলবাদ ৫৩৭
রবীন্দ্রসংগীত ৫৪০
রস ৫৪৫
রাগ ও ঠাট ৫৪৮
রিপ্রেজেন্টেশন ৫৫০
রিয়ালিজম ৫৫২
রীতিবাদ ৫৫৫
রূপকথা ৫৫৮
রেনেশাঁস ৫৬২
রোমান্টিসিজম ৫৬৫
রোম্যান্স ৫৬৮
লিটল ম্যাগাজিন ৫৭১
লোকশিল্প ৫৭৪
লোকসংস্কৃতি ৫৭৭
লোকসাহিত্য ৫৮০

শরিয়ত ৫৮৪
শিক্ষাব্যবস্থা : পশ্চিমবঙ্গ ৫৮৬
শিখজাতি ও ধর্ম ৫৯০
শৈলী ৫৯৩
শ্রেণি ৫৯৬
সংগীত—বাংলার লোকসংগীত ৬০০
সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ৬০৪
সংবাদপত্র ৬০৮
সংস্কৃতায়ন ৬১০
সন্ত্রাসবাদ ৬১২
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ৬১৭
সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ৬২২
সাবঅলটার্ন ৬২৪
সাবকালচার ৬২৭
সাময়িকপত্র ৬৩০
সাহিত্যেতিহাস ৬৩৩
সিজোফ্রেনিয়া ৬৩৬
সিনট্যাক্স ৬৩৯
সিনট্যাগমা ও প্যারাডাইম ৬৪৩
সিম্বলিজম ৬৪৫
সুনামি ৬৪৮
সুফি ও সুফিবাদ ৬৫১
সুরবিহার ৬৫৩
সুররিয়ালিজম ৬৫৫
সৃজনশীল নৃত্য ৬৫৮
সেক্স অ্যান্ড জেন্ডার ৬৬১
সেন্সরশিপ ৬৬৪
সেমিওটিক্স সেমিওলজি ৬৬৮
সেমান্টিক্স ৬৭১
সোশ্যালিজম ৬৭৫
স্ফোটবাদ ৬৮০
হকিং-এর কাল-দর্শন ৬৮৩
হিউম্যানিজ৬৮৮ম ৬৮৮
হিন্দুধর্ম ৬৯১

লেখক ও বিষয়সূচি

(বর্ণানুক্রমিক)

অচিন্ত্য বিশ্বাস ➤ দলিত আন্দোলন দলিত-সাহিত্য ২৯৪
অজিতকুমার চক্রবর্তী ➤ হিন্দুধর্ম ৬৯১
অর্জুন সাহা ➤ ক্লোনিং ১৯৫
অর্জুনদেব সেনশর্মা ➤ রোম্যান্স ৫৬৮ শিখজাতি ও ধর্ম ৫৯০
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ➤ নতুন বিশ্বব্যবস্থা ৩১৯
অনির্বাণ রায় ➤ থিসরাস ২৯২
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ তাল ও লয় ২৭৮ রাগ ও ঠাট ৫৪৮
অনিশ্চয় চক্রবর্তী ➤ বিজ্ঞাপন ৪৬২
অনীক চট্টোপাধ্যায় ➤ ডেভেলপমেন্ট ২৭০ ন্যাটো ৩৩৮ শ্রেণি ৫৯৬
অভিজিৎ গুপ্ত ➤ বই ৪৩৩
অভিজিৎ দাশগুপ্ত ➤ বাঙালি উদ্বাস্তু ৪৫৪
অভিজিৎ রায় ➤ কমিউনিকেশান ১৪৬
অভীক মজুমদার ➤ অ্যালিগরি ৭৬ পোস্ট মর্ডানিজম ৪০৬
অভ্র ঘোষ ➤ ক্যাপিটালিজম ১৭৬ পাওয়ার ৩৮৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ৬১৭ সোস্যালিজম ৬৭৫
অমিতা চট্টোপাধ্যায় ➤ বোধ ও বোধিবিজ্ঞান ৪৭৪
অমিতাভ চন্দ্র ➤ নয়া গণতন্ত্র ৩২৭ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ৪৮০
অমিয়কুমার বাগচী ➤ প্রলেতারিয়েত ৪১৮ বুর্জোয়া ৪৬৮
অম্লান দাশগুপ্ত ➤ খ্রিষ্টধর্ম ১৯৮ ধ্রুপদ ও খেয়াল ৩০৬ হিউম্যানিজম ৬৮৮
অয়ন গঙ্গোপাধ্যায় ➤ রিপ্রেজেন্টেশান ৫৫০
অরীন্দ্রজিৎ সাহা ➤ সুরবিহার ৬৫৩
অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ ইকোলজি ৮৭ পরিবেশ ৩৮২
অরূপ রুদ্র ➤ ফিউচারিজম্ ৪৩৮
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ➤ আদারনেস ৪৯
অশোককুমার চক্রবর্তী ➤ ই-মেল, ইন্টারনেট, ই-কমার্স ৮৯
অশোক সেন ➤ আইডিওলজি ৪০
অশ্রুকুমার শিকদার ➤ ডাডাইজম ২৫৯ সুররিয়ালিজম ৬৫৫
আবদুর রশীদ চৌধুরী ➤ শরিয়ত ৫৮৪
আবদুর রাউফ ➤ ইসলাম ১০১
আশিস খাস্তগীর ➤ নক্‌শা-প্রহসন ৩১১ নকসা কিস্‌সা বাতেলা ৩১৫
আশিস্‌কুমার দে ➤ ভাষা আন্দোলন ৪৯০
আশিস লাহিড়ী ➤ এফ এম চ্যানেল ১২৭ জিন ২৩৫ ফলসিফায়াবিলিটি ৪৩৩
ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ➤ প্রত্নতত্ত্ব ৪১৫

ইরাবান বসুরায় ➤ থার্ড থিয়েটার ২৮৫
ঈপ্সিতা চন্দ ➤ সাব কালচার ৬২৮ সেক্স অ্যাণ্ড জেণ্ডার ৬৬১
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ➤ অ্যাবসার্ড ৬৯
উদয় কুমার চক্রবর্তী ➤ সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ৬০৪
উৎসব মুখোপাধ্যায় ➤ চ্যাটাং ২১৮
কাজী কামাল নাসের ➤ বাংলা ব্যাণ্ড ৪৫১
কাঞ্চন সরকার ➤ সংস্কৃতায়ন ৬১০
কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ➤ সিনট্যাগমা ও প্যারাডাইম ৬৪৩
কুনাল চট্টোপাধ্যায় ➤ নৈরাজ্যবাজ ৩৬১
কুন্তল মিত্র ➤ মেলোড্রামা ৫৩৪
কেশব আড়ু ➤ ভাষার মৃত্যু ৪৯৪
কৌশিক ঘোষ ➤ প্রিমিটিভিজম ৪২৪
কৌশিক দে ➤ সিজোফ্রেনিয়া ৬৩৬
গণপতি ভট্টাচার্য ➤ কমনওয়েলথ অব নেশনস্ ১৪১
চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত ➤ লোকসাহিত্য ৫৮০
ছন্দম চক্রবর্তী ➤ চিত্রকল্প ২২১
জয়িতা বাগচী ➤ রোমান্টিসিজম্ ৫৬৫
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ➤ বিচ্ছিন্নতাবাদ ৪৫৮ সন্ত্রাসবাদ ৬১২
তপন রায় ➤ সংগীত-বাংলার লোকসংগীত ৬০০
তপোধীর ভট্টাচার্য ➤ দ্বিবাচনিকতা ৩০০ নভেলাইজেশান ৩২২
পোস্ট মার্ক্সিজম ৪০৯ পোস্ট হিউম্যানিজম ৪১২
তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ কমেডি ১৫৪ ট্র্যাজেডি ২৫৪
তরুণকান্তি সেন ➤ হকিং-এর কালদর্শন ৬৮৩
তানাজী সেনগুপ্ত ➤ ওয়ান ডে ক্রিকেট ১৩০
তিস্তা বাগচী ➤ সিনট্যাক্স ৬৩৯
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ➤ মেটিরিয়ালিজম ৫৩১
তুষার চক্রবর্তী ➤ জিনোম ২৩৮ মাইক্রোবায়োলজি ৫০৬
দিব্যজ্যোতি মজুমদার ➤ মারফতি ৫১৯
দীপক বিশ্বাস ➤ মার্ক্সবাদ ৫১০
দীপঙ্কর ঘোষ ➤ লোকশিল্প ৫৭৪
দীপেন্দু চক্রবর্তী ➤ অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়ালিটি ৬৬
দেবতোষ বসু ➤ ক্লাসিসিজম ১৮১
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ টপ্পা-ঠুমরি-গজল ২৫১ মঞ্চগীতি ৫০১
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ কমপিটেন্স পারফরমেন্স ১৪৪ ডিফারেন্স ২৬৩ ডিসকোর্স ২৬৫
দেবাশিস গুপ্ত ➤ সংবাদপত্র ৬০৮ সাময়িকপত্র ৬৩০
দেবাশিস দেব ➤ ইলাস্ট্রেশান ৯৬
দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ➤ কার্টুন ১৬৫
নিত্যপ্রিয় ঘোষ ➤ থার্ড ওয়ার্ল্ড ২৮৩ ফ্যাসিজম ৪৩৬ বিশ্বায়ন ৪৬৬ মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব ৫১০
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি ➤ ধ্বনিবাদ ৩০৩ রস ৫৪৫ স্ফোটবাদ ৬৮০

নূপুর দাশগুপ্ত ➤ কালদর্শন ১৭১
পবিত্র সরকার ➤ নেমান্টিক্স ৬৭১
পরিতোষ সেন ➤ কোলাজ ১৯০
পল্লব সেনগুপ্ত ➤ ছড়া ২২৪ ব্রতকথা ৪৮৪
পার্থপ্রতিম বসু ➤ এন জি ও ১১৮
পিনাকেশ সরকার ➤ রূপকথা ৫৫৮
পীযূষকান্তি রায় ➤ পার্সিধর্ম বা জরথুস্ট্রবাদ ৩৯১
প্রদীপ বসু ➤ অ্যালিয়েনেশান ৭৩ নাগরিক সমাজ ৩৩১
বরুণকুমার চক্রবর্তী ➤ গীতিকা ২০৭
বাসবী রায় ➤ একাঙ্ক ১১৩ কোরাস ১৮৪
বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ➤ মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ ৪৯৮
বিকাশ চক্রবর্তী ➤ লোকসংস্কৃতি ৫৭৭
বিনয় চৌধুরী ➤ আদিবাসী ৫১
বিপ্লব চক্রবর্তী ➤ শৈলী ৫৯৩
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ➤ বক্রোক্তি ৪৪৭
বিশ্বজিৎ রায় ➤ ইমপ্রেশানিজম ৮৭ এক্সপ্রেশানিজম ১১৬
বিশ্বদীপ দত্ত ➤ টুরিজম ২৫৭
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ নিয়ন্ত্রণরেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল ৩৫৬
বিশ্বনাথ রায় ➤ পুথি ৩৯৫
ভাস্কর সেনগুপ্ত ➤ গ্রুপ থিয়েটার : পশ্চিমবঙ্গ ২১৫
মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য ➤ জাতিসত্তা ২৩১
মল্লিকা সেনগুপ্ত ➤ বিকল্প পরিবার ৪৫৬
মিহির ভট্টাচার্য ➤ সেমিওটিক্স সেমিওলজি ৬৬৮
মৈনাক বিশ্বাস ➤ ফিল্ম স্টাডিজ ৪৪০
যশোধরা বাগচী ➤ নারীবাদ ৩৩৪
রংগন চক্রবর্তী ➤ কলোনিয়ালিজম ১৫৬ জীবনমুখী গান ২৪২
পপুলার কালচার ৩৭৬ পোস্ট কলোনিয়াল ৪০৩
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ কবীর-পন্থ ১৩৮ ভক্তি ও ভক্তিমার্গ ৪৮৬ মিস্টিসিজম ৫২৯
রমাকান্ত চক্রবর্তী ➤ জাত-বৈষ্ণব ২২৯ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ৬২২
রাখী মিত্র ➤ ন্যাচারালিজম ৩৩৬ রিয়ালিজম ৫৫২
রামকুমার মুখোপাধ্যায় ➤ আখ্যান ৪৬ ছোটোগল্প ২২৬
রাহুল দাশগুপ্ত ➤ উত্তরগঠনবাদ ১০৭ গঠনবাদ ২০১
রুশতী সেন ➤ অন্দর-বাহির ২৯
রূপককুমার ভদ্র ➤ ক্লোনিং ১৯৫
শম্পা চৌধুরী ➤ রীতিবাদ ৫৫৫
শান্তি নাথ ➤ পট ও পটের গান ৩৬৯
শুভজ্যোতি ঘোষ ➤ অভিবাসী ৩৫
শুভময় মণ্ডল ➤ কমিউনিজম ১৫১
শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে ➤ কালচার ১৬৮ নিউ লেফট ৩৪৮
শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত ➤ মিথ ৫২৭

শুভেন্দু দাশমুন্সী ➤ কপিরাইট ১৩৫ গণনাট্য ২০৪
শেখর সমাদ্দার ➤ কম্পোজিশন ১৫৬ প্রসিনিয়ম ৪২০
শেফালী মৈত্র ➤ ইকো-ফেমিনিজম ৭৮
শোভন তরফদার ➤ সিম্বলিজম ৬৪৫
শোভনলাল দত্তগুপ্ত ➤ কোল্ড ওয়ার ১৯৩
শোভন সোম ➤ একাডেমিক আর্ট ৬৩ ইনস্টলেশন ৮৫ পপ আর্ট ৩৭৪
শ্যামল রায় ➤ জৈনধর্ম ২৪৫
শ্রাবন্তী ভৌমিক ➤ একজিস্টেনশিয়ালিজম ১১০ এপিস্টেমোলজি ১২৪
সত্যজিৎ চৌধুরী ➤ নিউওয়েভ বা ন্যুভেলভাগ ৩৪৪ নিউ রিয়ালিজম ৩৫৩
সত্যবতী গিরি ➤ বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ৪৭০
সন্দীপ দত্ত ➤ লিটল ম্যাগাজিন ৫৭১
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ অভিধান ৩২
সন্দীপন চক্রবর্তী ➤ আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম ৫৭
সায়ম ঘোষ ➤ সুনামি ৬৪৮
সীমন্তী সেন ➤ ওরিয়েন্টালিজম ১৩২
সুকান্ত চৌধুরী ➤ রেনেশাঁস ৫৬২
সুজাত ভদ্র ➤ থার্ড ডিগ্রি ২৮৮ মানবাধিকার ৫১৬
সুধীর চক্রবর্তী ➤ গৌণধর্ম ও লালনপন্থা ২১০
সুনন্দ সান্যাল ➤ শিক্ষাব্যবস্থা : পশ্চিমবঙ্গ ৫৮৬
সুপর্ণ চৌধুরী ➤ মাল্টিমিডিয়া ৫২২
সুপ্রিয়া চৌধুরী ➤ ডিকনস্ট্রাকশান ২৬১
সুভাষ চৌধুরী ➤ রবীন্দ্রসংগীত
সুমন ঘোষ ➤ পুরালিজম ৪০০ ফর্মালিজম ৪৩০
সুমন ভট্টাচার্য ➤ কান্ট ১৭৪ পর্নোগ্রাফি ৩৭৯ বৌদ্ধধর্ম ৪৭৭
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ ইয়েলো জার্নালিজম ৯৩
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ➤ তথ্যচিত্র ২৭৫
সুরঞ্জন রায় ➤ নেগ্রিচ্যুড ৩৫৯ মস্তাজ ৫০৪
সুশীল সাহা ➤ ধ্রুপদী নৃত্য ৩০৯ সৃজনশীল নৃত্য ৬৫৮
সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ জোট-নিরপেক্ষতা ২৪৮ ডিস্তালিনাইজেশন ২৬৭ নয়া উপনিবেশবাদ ৩২৫
সেবন্তী ভট্টাচার্য ➤ আ প্রায়োরি ৩৮
সেমন্তী ঘোষ ➤ এনলাইটেনমেন্ট ১২২ ন্যাশানালিজম ৩৪১ সাবঅলটার্ন ৬২৪
সোমেশ্বর ভৌমিক ➤ সেন্সরশিপ ৬৬৪
সৌগত চট্টোপাধ্যায় ➤ সুফি ও সুফিবাদ ৬৫১
সৌগত মুখোপাধ্যায় ➤ ম্যাজিক রিয়ালিজম ৫২৪
সৌমিত্র বসু ➤ কোরিওগ্রাফি ১৮৭
সৌরীন ভট্টাচার্য ➤ আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদ ৫৪ মৌলবাদ ৫৩৭
স্বপন চক্রবর্তী ➤ আর্কেটাইপ ৪৪ নিউ হিস্টরিসিজম ৩৫১
স্বপন বসু ➤ পজিটিভিজম ৩৬৬
স্বপন মজুমদার ➤ তুলনামূলক সাহিত্য ২৮০ সাহিত্যেতিহাস ৬৩৩
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ➤ কল্পবিজ্ঞান ১৬২

পারিভাষিক

অতিনাটক—মেলোড্রামা
অন্যতা—আদারনেস
অন্বয়—সিনট্যাক্স
অবিনির্মাণ—ডিকনস্ট্রাকশন
অলটারনেটিভ ফ্যামিলি—বিকল্প পরিবার
অস্তিবাদ—এক্সিস্টেনসিয়ালিজম
আদিমতাবাদ—প্রিমিটিভিজ্ম
আদিকল্প/ আদিরূপ—আর্কেটাইপ
আর্কিওলজি—প্রত্নতত্ত্ব
আলোকপর্ব—এনলাইটেনমেন্ট
অ্যাডভার্টাইজমেন্ট—বিজ্ঞাপন
অ্যানার্কিজম—নৈরাজ্যবাদ
অ্যালিয়েনেশন—বিচ্ছিন্নতাবাদ
ইউনাইটেড নেশনস— সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ
ইন্ডিভিজুয়ালিজম—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
ইমিগ্র্যান্ট/ এন. আর—অভিবাসী
ইমেজারি— চিত্রকল্প
ইম্প্রোভাইজেশন—সুরবিহার
উত্তর আধুনিকতা—পোস্ট মডার্নিজম
উত্তর উপনিবেশবাদ—পোস্ট কলোনিয়ালিজম
উত্তর মানবতন্ত্র—পোস্ট হিউম্যানিজম
উত্তর মার্ক্সবাদ—পোস্ট মার্ক্সিজম
উদ্ভট/ কিমিতি—অ্যাবসার্ড
উন্নয়ন—ডেভেলপমেন্ট
উপনিবেশবাদ—কলোনিয়ালিজম
উপন্যাসিকীকরণ—নভেলাইজেশন
উপস্থাপন—রিপ্রেজেন্টেশন

এনভায়রনমেন্ট—পরিবেশ
ওয়ান অ্যাক্ট প্লে— একাঙ্ক
কমিক স্কেচ—নকশা
কম্প্যারেটিভ লিটারেচার—তুলনামূলক সাহিত্য
ক্লাস—শ্রেণি
কৃষ্ণাঙ্গতন্ত্র/ কৃষ্ণাঙ্গবাদ—নেগ্রিচ্যুড
ক্যাগনিশন—বোধ ও বোধিবিজ্ঞান
ক্রমান্বয় ও পরিকল্প—সিনট্যাগমা ও প্যারাডাইম
ক্ষমতা—পাওয়ার
গৃহবাণী / বাস্তুশাস্ত্র—ইকোলজি
গ্রন্থচিত্রণ—ইলাস্ট্রেশন
গ্রন্থস্বত্ব—কপিরাইট
গ্লোবালাইজেশন—বিশ্বায়ন
জনপ্রিয় শিল্প—পপ আর্ট
জনাদৃত সংস্কৃতি— পপুলার কালচার
জবানি—ডিসকোর্স
জাতিবর্ণ—কাস্ট
জাতীয়তাবাদ—ন্যাশনালিজম
জাদু বাস্তববাদ—ম্যাজিক রিয়ালিজম
জার্নাল/ পিরিয়ডিক্যাল—সাময়িকপত্র
জীবাণুবিদ্যা—মাইক্রোবায়োলজি
জ্ঞানবিদ্যা—এপিস্টেমোলজি
টেররিজম—সন্ত্রাসবাদ
ট্রাইব—আদিবাসী
ট্র্যান্সফরমেশনাল জেনেরেটিভ গ্রামার— সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ
ঠাণ্ডা যুদ্ধ—কোল্ড ওয়ার
ডকুমেন্টারি ফিল্ম—তথ্যচিত্র
ডায়লগ—দ্বিবাচনিকতা
তৃতীয় বিশ্ব—থার্ড ওয়ার্ল্ড
দাদাবাদ—ডাডাইজম
দৃশ্যবিন্যাস / রূপকাঠামো—কোরিওগ্রাফি
ধ্রুপদী—ক্লাসিসিজম
ধ্রুববাদ/ প্রত্যক্ষবাদ—পজিটিভিজম
নন-এলায়েন—জোটনিরপেক্ষতা
নবজাগৃতি—রেনেশাঁস

নবতরঙ্গ—নিউ ওয়েভ বা ন্যুভেলভাগ
নববাস্তববাদ—নিও রিয়ালিজম
নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ—নিউ হিস্টরিসিজম
নয়া বাম—নিউ লেফট
নানাত্ববাদ—পুরালিজম
ন্যারেটিভ—আখ্যান
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার—নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা
নিউ ডেমোক্রেসি— নয়া গণতন্ত্র
নিম্নবর্গ—সাবঅলটার্ন
নিসর্গনীতি ও নারীবাদ—ইকো-ফেমিনিজম
নিস্তালিনীকরণ—ডিস্তালিনাইজেশন
পরাবাস্তববাদ—সুর্‌রিয়ালিজম
প্রাচ্যবাদ—ওরিয়েন্টালিজম
প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প—অ্যাকাডেমিক আর্ট
পিপলস থিয়েটার—গণনাট্য
পীত সাংবাদিকতা—ইয়েলো জার্নালিজম
পুরাণ / লোকপুরাণ—মিথ
পুঁজিবাদ—ক্যাপিটালিজম
পূর্বতঃ সিদ্ধ—আ প্রায়োরি
পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম—উত্তরগঠনবাদ
প্রকরণবাদ—ফর্মালিজম
প্রতীকবাদ—সিম্বলিজম
প্রতীতিবাদ—ইম্প্রেশনিজম
প্রতীয়মান ও প্রকৃত অস্তিত্ব—অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়ালিটি
ফাভামেন্টালিজম—মৌলবাদ
ফ্যাসিবাদ—ফ্যাসিজম
ফেমিনিজম—নারীবাদ
ফেয়ারি টেলস—রূপকথা
ফোক আর্ট—লোকশিল্প
ফোক লিটারেচার—লোকসাহিত্য
ফোকলোর—লোকসংস্কৃতি
বস্তুবাদ— মেটিরিয়ালিজম
বাগর্থতত্ত্ব—সেমান্টিক্স
বাস্তববাদ—রিয়ালিজম
বিচ্ছিন্নতাবাদ—অ্যালিয়েনেশন

ব্যালাড—গীতিকা
বিন্যাস—কম্পোজিশন
বিশেষ বিন্যাস—ইনস্টলেশন
বিষাদান্ত—ট্র্যাজেডি
ব্যঙ্গচিত্র—কার্টুন
ব্যবধান—ডিফারেন্স
ভবিষ্যবাদ—ফিউচারিজম
ভাবতত্ত্ব—আইডিওলজি
ভিন্ন সংস্কৃতি/ অবসংস্কৃতি— সাবকালচার
মডার্নিজম— আধুনিকতা আধুনিকতাবাদ
মরমিয়াবাদ— মিস্টিসিজম
মানবতাবাদ— হিউম্যানিজম
মার্ক্সিজম—মার্ক্সবাদ
মিলনান্ত—কমেডি
যোগাযোগ—কমিউনিকেশন
রাইম—ছড়া
রূপক—অ্যালিগরি
শব্দার্থকোষ—থিস্‌রাস
শর্ট স্টোরি—ছোটোগল্প
শিল্পিত ছবি ও বাণিজ্যিক ছবি—আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম
সংকেততত্ত্ব—সেমিওটিকস সেমিওলজি
সংস্কৃতি—কালচার
সমাজতন্ত্র—সোশ্যালিজম
সম্মেলক—কোরাস
সর্বহারা—প্রলেতারিয়েত
সাইকো অ্যানালাইসিস—মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ
সায়েন্স ফিকশন—কল্পবিজ্ঞান
স্টাইলিস্টিক্স—শৈলী
স্ট্রাকচারালিজম—গঠনবাদ
স্বাভাবিকতাবাদ—ন্যাচারালিজম
স্যাঙ্কক্রিটাইজেশন—সংস্কৃতায়ন
সিভিল সোসাইটি—নাগরিক সমাজ
হিউম্যান রাইটস—মানবাধিকার

অন্দর-বাহির

রুশতী সেন

নারী-পুরুষের ঘরে বাইরের সমস্যাকে বোঝানোর তাগিদেই অন্দর-বাহির কথাটির প্রয়োগ। বাংলা প্রবন্ধের ভাষায় এই প্রয়োগ এখন যথেষ্ট প্রচলিত। তবে সংশ্লিষ্ট সমস্যার স্বরূপ বুঝতে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্ন এবং নারীবাদের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। সুতরাং নারীবাদ যদি স্বতন্ত্র শিরোনাম হিসেবে আলোচিত হয়, তবে অন্দর-বাহির-এর পৃথক বিন্যাস পুনরুক্তির আশঙ্কা এবং অসম্পূর্ণের খামতি থেকে মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের নামকরণেই সম্ভবত বাঙালির বয়ানে অন্দর-বাহির-এর আবাহন সূত্র মেলে। শিক্ষিত বাঙালি যদি অন্দরের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাহিরের ভাগও তার সহধর্মিণীকে দিতে চাইত, তবে সেই চাওয়ার কোনো স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত পূর্তির পথ উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি জীবনের আয়ত্তে আসত না। এই সংকট অথবা স্ববিরোধ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা জুড়ে, বাঙালির আধুনিক থেকে আরো আধুনিক হওয়ার আয়োজন ব্যেপে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তবে যে স্ববিরোধকে বিন্যস্ত করতে অন্দর-বাহির কথাটির প্রয়োগ, তা বাংলা কিংবা ভারত অথবা তৃতীয় বিশ্বের কোনো স্বতন্ত্র সমস্যা নয়।

উনিশ শতক জুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ইংরেজ যখন সভ্যতার শিখরে উঠেছে, তখনকার ইংরেজ সমাজে ঘরের বাইরে একটি মেয়ের কোনো আলাদা ব্যক্তিত্ব প্রায় অকল্পনীয়। স্বামীর ঘর-সংসারের গোছ সে কতখানি বাড়াতে পারে, তারই উপরে নির্ভর করত সহধর্মিণী হিসেবে মেয়েটির উৎকর্ষের মাত্রা। নারীশিক্ষার ব্যাপ্তি তখন ইংল্যান্ডে যথেষ্ট। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রেও মেয়েদের আদানপ্রদানের সঙ্গী একমাত্র মেয়েরাই হতে পারত। তাদের অধিকাংশ সময় কাটত মেয়েমহলে। মহিলাদের আড্ডা-মজলিশে পুরুষের জায়গা না থাকাটাই ছিল মধ্যবিত্ত কেতা। নারীপুরুষের মেলামেশার সুযোগ আনুষ্ঠানিকতার আবরণ পেরিয়ে কোনো আন্তরিকতায়, সুখ-দুঃখের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায় পৌঁছাতে পারত না। অর্থাৎ ঘরের চৌকাঠ পেরলেই যে-বিশ্ব স্বামীর প্রাত্যহিকের অনেকখানি জুড়ে আছে, সেখানে স্ত্রীর অংশগ্রহণ শূন্য অথবা নামমাত্র। আবার ঘর-সংসারের ঘেরে নিজের পৃথিবী শনাক্ত করেছে যে স্ত্রী, তার দিনযাপনের যুক্তি-পদ্ধতিকে, আনুষঙ্গিক কল্পনা-বাস্তবকে, হর্ষ-বিষাদকে অথবা মৌলিক অনুভবকে মর্মস্পর্শে ধারণ করার তুল্য অবকাশ-উদ্যোগ-মানসিকতা থেকে অন্দরবাসিনীর স্বামী

রিক্ত। বাইরের বিস্তার জুড়ে পুরুষের একাকিত্ব আর ঘরের নির্বিকল্প ঘেরে নারীর একাকিত্ব পরস্পর নিকটতমের প্রচ্ছদে মুখ ঢেকে একে অন্যের সুদূর হতে থাকে।

ঘরের বাইরে নারীর যোগদান যত বাড়ে, জ্ঞানের অন্বেষণে অথবা জীবিকার তাগিদে অর্থাৎ মানসিক, সামাজিক কি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অন্বিষ্টে নারীর পরিক্রমা যতই ব্যাপ্ত হয়, ততই সে বোঝে যে, অন্দরের এ যাবৎকালের ভার থেকে তার রেহাই নেই। বরং বাহিরের সঙ্গে তার যা কিছু বিনিময়, সবই বুঝি অন্দরকে সুদৃশ্য থেকে সুদৃশ্যতর করবার আয়োজন! অন্দরের সুশৃঙ্খল রক্ষণে পুরুষ নারীর সহায়ক আবার বাহিরের অভিজ্ঞতায় নারী যদি সহায়ক থেকে মূল অর্জনকারীর ভূমিকায় পৌঁছে যায়, তবে সমাজের শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। বাহির নিয়ে পুরুষের অহং আর অন্দর নিয়ে নারীর সাবেকি সহিষ্ণুতার যুগলবন্দীতে সমাজের এই অভ্যস্ত ছকটা নির্ভর করে। কিন্তু বহির্যাত্রিণী নারীতে সাবেকি সহিষ্ণুতার সঙ্গে নতুন অহং-এর একটা মিশেল একান্ত স্বাভাবিক। অথচ নারী-পুরুষের অহং-এর সাম্য আজও তেমন স্বীকৃত নয়। তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের সামনে সমাজের পুরনো অভ্যাস নতুন দিশা খোঁজে।

বিগত শতকের বেশ কয়েকটি দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরে সিমন দ্য বোভ্যার-এর মনে হয়েছিল, কোনো নারী যদি জগতের মুখ্য সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে চায়, তাকে মূর্ত করতে চায়, তবে সে যে নারী, এই বাস্তবটাই তার চাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ নারী যদি মৌলিক অনুভবের পৃথিবী থেকে জ্ঞান-চৈতন্যের বিশ্বে নিজেকে মেলে দিতে চায়, তবে এক বিশ্বজনীন সমস্যার মোকাবিলা তাকে করতে হবে। আর শিক্ষিত বাঙালির জীবনে অন্দর-বাহির-এর টানাপোড়েন জটিলতর। উনিশ শতকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের যে নতুন বিশ্ব শিক্ষিত বাঙালির সামনে নিরাবরণ হয়েছে, সেখানে প্রবেশাধিকার পেতে উপনিবেশের প্রভুর ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। আলোকপ্রাপ্তির যে অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত বাঙালি মোহিত, তার হদিশ নিজের অন্তঃপুরে সে পৌঁছে দিতে পারে না। অথচ সেই অন্তঃপুরে শুধুমাত্র মাতৃভাষায় স্বাক্ষর করতে না পারা অথবা কোনো মতে স্বাক্ষর করতে পারা নারীরা নেই; বঙ্কিম-দীনবন্ধুর রসগ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন নারীরাও সেখানে আপাদমস্তক অশিক্ষিতের পরিচয় মেখে ইংরেজিশিক্ষিত স্বামীর প্রতীক্ষা করে। পরাধীন উপনিবেশে শাসকের শিক্ষাসংস্কার কি সমাজসংস্কারের রীতিনীতি শিক্ষিত বাঙালির বাহিরকে আবৃত করেছে। স্বাধীনতার অসহায় আকাঙ্ক্ষায় তারা ভিনদেশি প্রভুকে প্রতিরোধ করবার যোগ্যতম স্থান শনাক্ত করতে নিজের অন্দরে—শাসকের সংস্কারনীতির ছায়া যেন সেই ঘরের ঘেরে না পড়ে। অথচ জীবিকা থেকে মননের স্তর থেকে স্তরান্তরে বিদেশের বানানো জগতেই তাদের পরম অবলম্বন।

তাই এমন জীবনের ডাকে গত শতকের বাঙালি বারবার সাড়া দিয়েছে, যেখানে তাদের কর্ম, তাদের মনন, মানুষগুলোকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করেছে নিজেদের সংসার থেকে, সম্পর্ক থেকে। নারীশিক্ষা যে-বাঙালি মনীষীর আজীবনের ব্রত, তার স্ত্রীকে দেখি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিরক্ষর। বিধবাবিবাহ দিতে সর্বস্বপণ করেন যিনি, তিনি

নিজের কন্যাকে হিন্দুবিধবার আচার থেকে মুক্ত রাখতে পারেন না। হরিমোহন ঠাকুর আপ্লুত হয়েছিলেন বিশপ হেবারের বিয়াল্লিশতম জন্মদিনে—এসব মজলিসের মহিমা কত বাড়িয়ে দেয় হেবারের দেশের মেয়েরা উপস্থিত থেকে। একই বিস্ময়ে বিস্মিত রাধাকান্ত দেব—পশ্চিমের নারীদের তুল্য স্বাধীনতা পেতে গেলে, তাঁর দেশের মেয়েদের আরো অনেক বেশি শিক্ষিত হতে হবে। ইউরোপের মতো স্বাধীনতার জন্য চাই ইংরেজের মতো শিক্ষা। নিজের দেশে নিজের মতো করে বাঁচার বাসনা যতই বিলীন হয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতির মৌলিক সংজ্ঞা যতই ব্রাত্য হয়েছে, ততই শিক্ষিত বাঙালি পুরুষের সঙ্গে তার অন্দরের ব্যবধান বেড়েছে।

বিশ শতকের অন্তিমেও স্বাধীন বাঙালির জীবনধারণে উপনিবেশের উচ্ছিষ্ট ভাষা অপরিহার্য। উচ্ছিষ্টের উত্তরাধিকার আজ অনেক বর্ধিত মাত্রায় নারীতে বর্তেছে। আধুনিক বাঙালি নারী নিজের বহিরাগমনকে সার্থক করে তুলবে বলে পরদেশি ভাষায় আর ভিনদেশি সংস্কৃতিতে আজ অন্দর সাজিয়েছে। ওই নতুন সাজের লকানো পরতে সাবেকি অন্দরের পুরোপুরি দেশজ-র জন্য মাপমতো স্মৃতিমেদুরতাও মেশানো আছে। মিশেলের অনুপাত নিয়ে মতানৈক্যই বোধ করি আজ সুশিক্ষিত বাঙালি নারীপুরুষের অন্দর-বাহির-এর নতুন আখ্যান।

অভিধান

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিধান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি শব্দকোষ। কিন্তু সুসংকলিত অভিধান শুধু শব্দ আর তার অর্থের তালিকামাত্র নয়; সেখানে শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদ পরিচয়, সমার্থশব্দ, বিভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট প্রয়োগ, লিঙ্গ নির্ণয়রীতি—সবই থাকে। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সংকলিত আমাদের দেশের প্রাচীনতম অভিধান *অমরকোষ* এর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রাজশেখর বসুর আধুনিক *চলন্তিকা*-ও (১৯৩০) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিচারে, শুধু অভিধান বা শব্দকোষ নয়; তা একটি 'সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ'। এই নিরিখে বিচার করলে 'নিঘন্ট' নামের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থটিকে যথার্থ অভিধান বলা যায় না, তা বৈদিক শব্দের তালিকামাত্র।

'অভিধান' শব্দটিতেই তার আত্মপরিচয় বিধৃত আছে। শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থ নির্দেশই তার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বাচ্যার্থই তো শব্দের একমাত্র অর্থ নয়—লক্ষণা-ব্যঞ্জনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমাদের দেশের প্রাচীন নন্দনশাস্ত্রে। আনন্দবর্ধন বলেছেন, ব্যঞ্জনা কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না; তবে অভিধার ভেতর তার অন্তর্ভাব নিহিত থাকলেও থাকতে পারে। উৎকৃষ্ট অভিধানে শব্দের বহুনার্থের ইঙ্গিতও উদাহরণসহ দেওয়া থাকে; যেমন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলনীয় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দুই খণ্ড (১৯৬৬ খ্রিঃ)। প্রসঙ্গত হরিচরণ ৩৬ বছরের অনলস পরিশ্রমে এই শব্দকোষ সংকলন করে, ১৩৪০-র থেকে প্রায় দশ বছর ধরে তা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন নিজ অর্থে। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত সুবলচন্দ্র মিত্রর *সরল বাঙ্গলা অভিধান* পূর্ণাঙ্গ এবং নানা আনুষঙ্গিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে (১৯৩৭) কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলেও শব্দের উৎপত্তি এবং বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ তিনিও সাধ্যমতো দিয়েছেন। তবে অক্সফোর্ড চেম্বার্সের মতো অভিধান বাংলায় এখনও সংকলিত হয়নি। কালানুক্রমিক পরিবর্ধনের বিচারেও কোনো বাঙলা অভিধান এখনও অক্সফোর্ডের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৮০-র দশকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অভিধান রচনার যে-বিশাল প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, কোনও-রকমে একটি খণ্ড প্রকাশ করেই তা অকাল পরিসমাপ্ত হয়েছে। *সমার্থ শব্দকোষ* এবং পরিবর্ধিত আয়তনের অভিধান প্রকাশ করে এক সাহিত্য সংসদই কিছুটা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রাজ্য বাংলা আকাদেমির অভিধানে বানানরীতি ছাড়া, অন্য ক্ষেত্রে নতুনত্ব বিশেষ নেই।

অভিধানে একই শব্দের প্রতিশব্দ, বিভিন্ন অর্থ, বিবিধ ব্যবহার, বিশিষ্ট গুণ বা 'পর্যায় শব্দ'-সবই থাকে। ইংরেজিতে তাই অভিধানের শব্দকে বলা হয় 'লেক্সিম'—শুধু শব্দার্থ নয়, শব্দ ব্যবহারের প্রকার-প্রকরণও তার সঙ্গে দেওয়া থাকে; যেমন 'গো' শব্দের সঙ্গে গোয়িং, ওয়েন্ট, গন ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিধানে শব্দার্থ প্রায় স্থির নির্দিষ্ট। শব্দ সেখানে কখনোই সুর হয়ে বাজে না। 'শ্রবণ' শব্দটির অর্থ শোনা এবং কান দুই'ই হয়; অভিধানে তা বলাও আছে; কিন্তু 'ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে'—রবীন্দ্রনাথের গানের এই অংশে শ্রবণ শব্দের যে অর্থ-ব্যঞ্জনা, অভিধানে তা পাওয়া যাবে না। শিরীষশাখা অলখজনের চরণশব্দে উৎকর্ণ হয়ে আছে— এতটা কাব্য কল্পনার সামর্থ্য অভিধানের নেই।

বলা হয়, অভিধানের শব্দার্থ স্থিতিশক্তি, তা গতি পায় সাহিত্যের অনুষঙ্গে। সমস্ত ভাষা সম্পর্কেই অবশ্য এ কথা প্রযোজ্য। দার্শনিক লুডভিগ হ্বিটগেনস্টাইন আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভাষার অর্থকে পাওয়া যায় তার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। আমাদের দেশের নন্দনশাস্ত্রীরাও তা জানতেন। ফার্দিনান্দ সোসুরের অনেক আগেই ভর্তৃহরি বলে গিয়েছিলেন, শুধু বর্ণসমষ্টি কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। সারা জীবন শব্দের কারবার করে রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন। শব্দের ক্ষমতা সীমিত; *বাংলা-ভাষা পরিচয়-এ* তা নিয়ে চমৎকার আলোচনাও আছে।

একটি শব্দের অর্থ তার প্রতিবেশী শব্দের দ্বারা অনুভাবিত, নিয়ন্ত্রিত, এমনকী 'স্থগিত'-ও হয়ে থাকে। 'সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো' কিংবা 'পাগলা মন্‌টারে তুই বাঁধ'—এইসব মহৎ উচ্চারণের সঙ্গে আমরা যারা পরিচিত, তারা এটা এক রকম বুঝি। এর জন্য জাক দেরিদার শরণ না নিলেও চলবে। 'প্রেম বিকশিত হল' যখন বলি, 'বিকশিত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ব্যবহার করি না; কিন্তু তা-তে কথাটির অন্তরার্থ বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না।

শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং আভিধানিক অর্থও অমোঘ, অবিসংবাদী নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন 'তেতালা' শব্দের একটি অর্থ দিয়েছিলেন : বাদ্যের চালবিশেষ। যোগেশচন্দ্র রায় তা অনুমোদন করেননি। আবার যোগেশচন্দ্র 'গুলো' শব্দের যে নিরুক্তি-নির্দেশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে হেমন্তকুমার সরকারের বক্তব্য : 'তাহা ঠিক মনে হয় না।' যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, অভিধানে শব্দের অর্থ এবং বানান যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত; কিন্তু তিনি নিজে লিখতেন : 'শব্দকোশ'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহের ব্যবহৃত কিছু কিছু বানানও আমাদের বেশ অদ্ভুত মনে হয়। আবার কালচার অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন যে যোগেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে অত বিবাদ করেছিলেন, তা বুঝে উঠতে পারি না।

ভাষা ব্যাপারটা মনগড়া, বা সোসুর যাকে বলেন 'আরবিট্রারারি'। একই শব্দের এমন সব অর্থ হয় যাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই। বাংলায় 'রতি' বলতে মৈথুন এবং ওজনের একটি একক দুই-ই বোঝায়। ইংরেজী 'পেন' শব্দটির দুটি অর্থ : কলম যন্ত্রণা। আর আঞ্চলিক শব্দ নিয়ে হিসেব করলে যে থই পাওয়া যাবে না তা পূর্ব

পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-এর (১৯৬৪) মতো শব্দ সম্ভারটি হাতে নিলেই বুঝতে পারি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এরকম কোনো সংকলন এখনও রচনা করে উঠতে পারিনি; এক্ষেত্রেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রয়াসের অকালপ্রয়াণ ঘটেছে বলে জানি। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু শব্দকোষ প্রকাশিত হয়েছে। কামিনীকুমার রায়ের *লৌকিক শব্দকোষ* দুই খণ্ড (১৯৬৯-৭০) এক অতি মূল্যবান সংকলন।

অমরকোষ থেকে রাধাকান্ত দেবের *শব্দকল্পদ্রুম* পর্যন্ত ধরে হিসেব করলে এদেশে অভিধান-রচনার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে বলা যায়। বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত *শব্দসংগ্রহ* তাঁর মৃত্যুর পর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, (১৩০৮-র ২য় সংখ্যা); তবে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির *বাঙ্গালা শব্দকোষ*-কেই (১৯১৫ খ্রিঃ) বোধ হয় আমরা বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলতে পারি। ইংরেজি ভাষার অভিধান সংকলিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। তার আগে মূলত গ্রিক এবং হিব্রু ভাষার শব্দ-সংকলনকে বলা হতো 'লেক্সিকন'। 'ডিক্‌শনারি' শব্দটিও খাঁটি ইংরেজী নয়; মধ্যযুগে (১২২৫ খ্রিঃ) লাতিন শব্দকোষ অর্থে Dictionarius থেকে উদ্ভূত। ভিক্টোরীয় যুগে তাই দাবি উঠেছিল, ওটার বদলে 'ওয়র্ড বুক' লেখা হোক।

অভিধান রচনার ইতিহাস পাঠক যে-কোনো বিশ্বকোষে পেয়ে যাবেন। এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিই অভিধান বা ব্যাকরণ কোনো নিরপেক্ষ বস্তু নয়; তা অনেক সময়েই সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা উচ্চবর্গ আধিপত্যের হাতিয়ার হয়ে উঠে। স্পেন শুধু লাতিন আমেরিকা দখলই করে নি, তার নিজের ভাষার ব্যাকরণটাও চাপিয়ে দিয়েছিল সেখানে। ব্রিটেনে ইংরেজি অভিধানেরও আগে প্রকাশিত হয়েছিল টমাস এলিয়টের *ল্যাটিন-ইংলিশ ডিক্‌শনারি* (১৫৩৮ খ্রিঃ)। আমরা বাংলায় পেয়েছিলাম রোমান লিপিতে লিসবন থেকে ছাপা পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ (১৭৪৩ খ্রিঃ)।

অভিধান আমাদের দেশে শাস্ত্রকে শাসন করে। *লোকায়ত দর্শন* লিখতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বার বার 'নিরুক্ত'-কার যাস্কর শরণ নিতে হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অভিধানের অনুশাসন থেকে আমাদের বাংলা ভাষা এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। তবে অভিধান আমাদের অপরিহার্য সঙ্গী হলেও তা থেকে ভাষা শেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই লিখে গেছেন, পাণিনি- অমরকোষের ওপর নির্ভর না করে মানুষ 'নিজের বর্ণনার ভাষা নিজেই' তৈরি করে নিয়েছে।

অভিবাসী

শুভজ্যোতি ঘোষ

অভিবাসী মানে, যে গাছের শিকড় উপড়ে অন্য জায়গায় বসানো হয়েছে। যার জীবনসংগ্রাম আজন্মলালিত, চিরচেনা পরিবেশের বাইরে। কখনও ইচ্ছায়, প্রায়শই অনিচ্ছায়। কখনও টান কুটিরুজির, কখনও নিরাপত্তার। বাঁচাটাও স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে। বস্তারের গ্রাম থেকে যে মজদুর গিয়ে ঠেকেছে মুম্বাইয়ে ধারাভির চাউলে, কিংবা কলকাতার হুকু খানসামা লেন থেকে যার দৌড় গিয়ে থেমেছে ম্যানহাটনের স্কাইস্ক্র্যাপারে—এক অর্থে তারা সবাই বিশ্বজোড়া অভিবাসী সমাজের নাগরিক। যাদের এক পা স্মৃতিতে, এক পা বাস্তবে। সোজা কথায়, না-ঘরকা না-ঘাটকা।

অভিবাসী বলতে সাধারণভাবে এখন বিলেত-আমেরিকা-ইউরোপে গিতু হওয়া একদল সচ্ছল ভারতীয়কেই বোঝায়—যারা শীতের পাখির মতো বড়দিনের ছুটি কাটাতে দেশে আসেন, যাদের ছেলেমেয়ের মুখে বিলিতি অ্যাকসেন্টের বাংলা-বুলি শুনে দাদু-দিদা বিস্ময়ে মূর্চ্ছা যান— এবং যাদের ডাক নাম 'এন আর আই'-তে এখন সবাই চেনে। কিন্তু অভিবাসী কথাটার অর্থ তার চেয়ে অনেক ব্যাপক, এবং অভিবাস আর সাচ্ছল্য সব সময় গা ঘষাঘষি করে চলে তাও নয়। তবে যেমনটা একটু আগেও বলছিলাম, আমাদেবাদের কাপড় কলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে শ্রমিক দুমুঠো অন্নের সংস্থান করছে, সেও শহরের বস্তিতে এসে 'অভিবাসী' হয়েছে গ্রামে কাজ নেই বলেই। কাজেই অস্বীকার করার উপায় নেই—অভিবাসের নেপথ্যে মূল কারণ উন্নততর জীবনের অভিলাষ।

ইতিহাস বলছে—নানা দেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দেওয়া অভিবাসীরা মিলে একটা নতুন দেশই গড়ে তুলেছে, এমন নজিরও আছে প্রচুর। বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই, হাতের কাছেই উদাহরণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের দাপটে এই দুই দেশে ভূমিপুত্র রেড ইন্ডিয়ান বা 'অ্যাবওরিজিন'-দের আজ কী করুণ দশা সেটাও কারও অজানা নেই। আবার এই শ্বেতাঙ্গদের দাসত্ব করতে আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে 'নতুন মহাদেশে' যেতে। যে অভিবাস অনিচ্ছার, করুণ অনাদরের। ফিজি-বোর্নিও-মরিশাস-গায়ানার আখের ক্ষেতে চাষ করতে ভারত থেকে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পাড়ি দিয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও খুব সুখের হয়নি। তবু ইতিহাসের অনেক ঝড়ঝাপটা সামলে এই 'অভিবাসী'রাও এখন অনেক প্রতিষ্ঠিত—আমেরিকার 'ব্ল্যাক'রা তাদের আফ্রিকান সতীর্থদের চেয়ে সব

মানদণ্ডেই ঢের এগিয়ে কিংবা ফিজির ভারতীয়রা অনেক সুখে আছেন তাদের হরিয়ানভি ভাইদের চেয়ে। মার্কিন মুলুক থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে গড়ে তুলেছেন লাইবেরিয়ার মতো সুসভ্য আধুনিক দেশ—অভিবাসের এমন উলটাপুরাণও চোখে পড়েছে বিশ শতকের গোড়ায়।

মুশকিল হল, এই একুশ শতকের সূচনাপর্বে এসে আজকের দুনিয়া আর ততটা অভিবাসী-অনুকূল নেই! পাসপোর্ট ভিসার জটিলতা তো ছেড়েই দিলাম, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই অভিবাসীদের দেখা হচ্ছে সন্দেহের চোখে। প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদিন, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে একটু একটু করে তৈরি হচ্ছে অভিবাসীদের সঙ্গে ভূমিপুত্রদের সংঘাতের জমি। ডেনমার্ক থেকে অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস থেকে ফ্রান্স—সর্বত্রই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো অভিবাসনের বিরুদ্ধে সরব, এবং তাদের পেছনে জনসমর্থনও ঊর্ধ্বমুখী। আর এই লড়াইয়ের জমি প্রস্তুত করে দিচ্ছে সেই চিরকালীন দ্বন্দ্ব—দেশের সম্পদে ভূমিপুত্র ছাড়া আর কারও অধিকার আছে কি নেই! অভিবাসীরাও যে প্রায়শই একটা দেশের অর্থনীতিতে, সম্পদের বিকাশে বড় ভূমিকা রাখেন, সেটা চট করে চোখে পড়তে চায় না—নজরে পড়ে সুবিধাভোগটুকুই। আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে কম্পিউটার-জাদুকরদের বা নাসা-পেন্টাগনের বিজ্ঞানীদের বেশির ভাগই অমার্কিন সেটা ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক—কিন্তু লন্ডনে সরকারি হাসপাতালে আউটডোরের লাইনে অশ্বেতাঙ্গদের পেছনে দাঁড়াতে হচ্ছে, এটা খাঁটি ব্রিটিশ রক্তে হজম হওয়াটা একটু মুশকিল। আবার, ধরা যাক এ তল্লাটের ভালো স্কুলটায় শাদাদের হটিয়ে অ্যাডমিশন টেস্টে জায়গা করে নিচ্ছে 'পড়ুয়া' এশিয়ানরা-হয়তো এর জেরে নয়, তবু এদেরই রাস্তাঘাটে সম্বোধন শুনতে হচ্ছে 'পাকি'। মজা হল—এখানে আবার ভারত-পাকিস্তান ভেদাভেদ নেই, শাড়ি-সালোয়ার কামিজ-কুর্তা পাজামা-বাদামি চামড়া নির্বিশেষে, বর্ণবাদীর দৃষ্টিকোণে সবাই পাকি।

গড়পড়তা অভিবাসীর জীবননাট্য এইসব ওঠাপড়ায় বোধহয় অভ্যস্ত হয়ে যায়—তারা আশাও করেন না প্রেম বিলোতে এসেছি বলে বিলেতে কেউ তাদের বুকে টেনে নেবেন— এবং এর পরও শতকরা কতজন শেষমেশ দেশে ফিরে যান, সেই সামান্য সংখ্যাটাই বলে দেয় সব কিছুর ওপর জীবনযাপন একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসের বসেই অভিবাসী একদিন ভিনদেশের জল-হাওয়া-মাটিতে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে ফেলেন। কিন্তু উল্টোটা হয় কি না, হলেও কতটা মসৃণভাবে হয় সে প্রশ্নটা থেকেই যায়। তামিল পিতার সন্তান নাসের হুসেইন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক হয়েও কখনোই তার ভারতীয় শিকড়টাকে তুলে ধরতে চান না— সেটাও বোধহয় ওই ভয় থেকেই। আবার এই ইংল্যান্ডেরই নতুন তারকা, বিক্রম সোলাঙ্কি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেন বাড়িতে তার পরিবারের সবাই কথা বলেন হিন্দিতেই। তো এই হিন্দিভাষী যুবা যখন মার্কাস ট্রেসকোথিকের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ইনিংস ওপেন করতে নামেন— ব্রিটেনের সব ভারতীয়রই গর্বে নিশ্চয় বুক ফোলে। কিন্তু সেটা ব্রিটিশ হিসেবে নয়, অভিবাসী হিসেবেই! কাজেই বড় বিচিত্র এই মনস্তত্ত্ব।

অভিবাসীরা কততম প্রজন্মে গিয়ে ভূমিপুত্র হতে পারে বা কোনোদিন আদৌ হতে পারে কি না, তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু এখানে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য চিহ্নিত করাটা জরুরি, সেটা অভিবাসীর সঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'শরণার্থীর'। অনেকগুলো মিল থাকলেও আমার মনে হয় অভিবাসীর অভিযান আসলে একান্তই নিজস্ব, ব্যক্তিগত যাত্রা—শররার্থীর তা নয়। দুর্ভিক্ষ বা রাষ্ট্রবিপ্লব জাতীয় সতেরো রকম কারণে ভিটেমাটি ছেড়ে দলে দলে দেশান্তর আশ্রয়ভিক্ষা—শরণার্থীর সংজ্ঞাটা এরই কাছাকাছি। কিন্তু শরণার্থীর দ্যোতনার মধ্যে একটা ফিরে আসার গরজ আছে, টান আছে—অভিবাসীর ক্ষেত্রে যেটা সেভাবে নেই। দেশে অবস্থা ফিরলে শরণার্থীরা আবার ফিরে যাবেন, এই আস্থা থেকেই পৃথিবীতে বহু দেশ, বহু সময় এমন দায়িত্ব কাঁধ পেতে নিয়েছে। কিন্তু চিরকাল সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষিত হয়নি বলেই শরণার্থীরাও আজ প্রায় সারা পৃথিবীতেই অবাঞ্ছিত, সন্দেহভাজন।

প্রবাসীর সঙ্গে অভিবাসীর ফারাকটা আমার মতে, সময়গত। প্রবাস মূলত সাময়িক—যে কারণেই বোধহয় প্রবাসে 'নিয়ম নাস্তি'র সুবিধে দিতে শাস্ত্রকারেরও আপত্তি নেই। তীর্থ থেকে পর্যটন, এমন কী কর্মসূত্রে বদলিও প্রবাসের আওতায় পড়তে পারে, কিন্তু অভিবাসন মানে বিদেশ-বিভুঁয়ে পাকাপাকি থিতু হওয়া। এলাহাবাদে চ্যাটার্জিরা তিন পুরুষের বনেদি পরিবার, তাদের প্রবাসী বাঙালি বলাটা যদিও দিব্বি রেওয়াজ—অভিবাসী কথাটাই বোধহয় সেখানে অনেক সুপ্রযুক্ত হবে। কিন্তু এই শব্দতত্ত্বের উর্ধ্বে প্রবাসী, শরণার্থী ও অভিবাসীরা যে প্রায়শই 'ওভারল্যাপ' করে যাচ্ছেন, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আজকের এই Global Village বা ভুবনগাঁয়ে দূরকে নিকট করা গেছে ঠিকই, কিন্তু আভিবাসন শব্দটা তার ব্যাপ্তি এতটুকু হারিয়েছে বলে তো মনে হয় না। এয়ারপোর্টে অভিবাসন কাউন্টারে বুলডগের মতো মুখ করে থাকা অফিসাররা সেই দর্শন কতটা উপলব্ধি করেন ঈশ্বরই জানেন, তবে এটুকু বুঝি অভিবাসের সংজ্ঞা ব্যাপক, বিশাল। আর বুঝি, অভিবাস শেষ বিচারে অভিলাষে বাস। সেই সঙ্গে অভিযানে বাস, অভিজ্ঞতায় বাস আর বোধহয় কিছুটা অভিনয়েও বাস!

মানে দু'হাজার বছর আগে যা-ছিল, অভিবাস আজও অবিকল তাই।

আ প্রায়োরি

সেবন্তী ভট্টাচার্য

'পূর্বতঃসিদ্ধ' (a priori) এবং 'পরতঃসাধ্য' (a posteriori) পদগুলির ব্যবহার প্রধানত জ্ঞানতত্ত্ব-র (Epistemology) ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, অর্থাৎ এই বিশেষণগুলি জ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ— যেমন : জ্ঞান, বিশ্বাস, সত্যতা—বা বচনের (proposition) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই পদগুলির উদ্ভব মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক্ দর্শনে, যদিও এই ধারণাগুলির বীজ অ্যারিস্টটলের (৩৮৫-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) দর্শনেই নিহিত ছিল। বর্তমানে পদগুলি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা কান্ট প্রদত্ত। কান্টই (১৭২৪-১৮০৪ খ্রিঃ) পূর্বতঃসিদ্ধতার ধারণাটিকে পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করে তার বর্তমান রূপটি দিয়েছেন। ইংরেজিতে 'a priori' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ from what is prior অর্থাৎ যা 'পূর্ব থেকে প্রাপ্ত'। সাধারণভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ বলতে অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং পরতঃসাধ্য বলতে অভিজ্ঞতালব্ধ বোঝানো হয়ে থাকে। কান্টের পূর্বসুরীরা অর্থাৎ লাইবনিট্স (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রি) প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এবং লক, হিউম্ প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মনে করতেন কোনও বচন P-এর জ্ঞানকে পূর্বতঃসিদ্ধ তখনই বলা হবে, যদি সেই জ্ঞানটি আবশ্যিক (necessary) হয়। সে-জ্ঞান যে আবশ্যিক তা হয় প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞার (intution) মাধ্যমে জানা যেতে পারে, নয়তো আর কোনো প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত বচন থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে বলে জানা যেতে পারে।

কান্ট তাঁর critique of Pure Reason গ্রন্থে পূর্বতঃসিদ্ধতা বলতে তিনি কী বোঝেন তা ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে পূর্বতঃসিদ্ধ বলতে কালিক দিক থেকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বুঝেছেন; কিন্তু কান্টের মতে জ্ঞানের শুরুই অভিজ্ঞতা থেকে, অভিজ্ঞতার পূর্বে কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি পূর্বতঃসিদ্ধতার অর্থ করেছেন, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ কোনো বচনকে পূর্বতঃসিদ্ধ বলার অর্থ তার সত্যতা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না।

তিনি পূর্বতঃসিদ্ধতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন; সাপেক্ষ (relative) আর অনপেক্ষ (absolute)। যা সাপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধ, তা, কোনো-না-কোনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পূর্বতঃসিদ্ধ। আর যা অনপেক্ষরূপে পূর্বতঃসিদ্ধ তা কোনোভাবেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয়; যেমন '৭ + ৫ = ১২' এই বচনটি। কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ বলতে এই অনপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধকে বুঝিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল : পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে পরতঃসাধ্য স্থানের থেকে পৃথক করব কীভাবে? কান্ট বলেছেন পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে : ১

আবশ্যিকতা আর ২. যথার্থ সার্বিকতা (Strict Universality)। অভিজ্ঞতা আমাদের বলে কী ঘটছে, কিন্তু কী ঘটবেই সে-কথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি না : একমাত্র পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই আমাদের বলে কী ঘটবেই, অর্থাৎ তা আবশ্যিক এবং যথার্থরূপে সার্বিক। জ্ঞানকে তখনই আবশ্যিক বলা হবে যদি তার বিপরীতটি ঘটা অসম্ভব হয়। এখন কান্টের পূর্বসূরিরা 'বিপরীতটি ঘটা অসম্ভব' বলতে 'বিপরীতটি স্ববিরোধী' এই অর্থ করেছেন। অন্যপক্ষে কান্ট আবশ্যিকতার প্রকারভেদ করে পূর্বোক্ত রূপটিকে আখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষক আবশ্যিকতা; তাঁর মতে, আরেকপ্রকার আবশ্যিকতা হতে পারে; যাকে তিনি সংশ্লেষক আবশ্যিকতা বলছেন; যার বিপরীতটি অসম্ভব হলেও স্ববিরোধী নয়। এর উদাহরণ হিসেবেও তিনি সেই গাণিতিক বচনটিকেই নিয়েছেন— '৭ + ৫ = ১২'।

এমন আবশ্যিকতা যেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য আর আবশ্যিকতা যেহেতু দুই প্রকার, সেহেতু কান্টের মতে পূর্বতঃসিদ্ধতাও দুই প্রকার; বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক।

পূর্বতঃসিদ্ধতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল : তা যথার্থরূপে সার্বিক অর্থাৎ তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও সার্বিক বচনে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু এই বচনগুলির ব্যতিক্রম সর্বদাই সম্ভব; কেবলমাত্র পূর্বতঃসিদ্ধ বচনগুলিরই ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

স্পষ্টতই পূর্বতঃসিদ্ধতার দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যদি 'সকল S [হয়] P' একটি যথার্থরূপে সার্বিক বচন হয় তবে তার ব্যতিক্রম অর্থাৎ 'অন্তত একটি S নয় P' অসম্ভব। এখন যেহেতু 'একটি S নয় P' 'সকল S [হয়] P'-এর বিরুদ্ধ বচন বা বিপরীত বচন এবং সেটি অসম্ভব, যেহেতু 'সকল S [হয়] P' একটি আবশ্যিক বচন। সুতরাং যদি কোনো বচন যথার্থরূপে সার্বিক হয় তবে তা আবশ্যিকও হবে। কান্ট অবশ্য পূর্বতঃসিদ্ধতার এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে পৃথক রূপেই আলোচনা করতে চেয়েছেন।

পরবর্তীকালে সল ক্রিপ্‌কে দেখিয়েছেন যে আবশ্যিকতাকে পূর্বতঃসিদ্ধতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ পরতঃসাধ্য বচনও আবশ্যিক হতে পারে আবার পূর্বতঃসিদ্ধ বচনও আবশ্যিক না হয়ে আপতিক (contingent) হতে পারে (অর্থাৎ যার বিপরীতটি ঘটা সম্ভব)। ক্রিপ্‌কের বক্তব্য হল : তাদাত্ম্যবাচক বাক্যগুলি— যেমন : 'শুকতারাই সন্ধ্যাতারা'—যে পরতঃসাধ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ এগুলির জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে এই বাক্যগুলি যদি সত্য হয় তবে তারা আবশ্যিকরূপেই সত্য হবে কারণ শুকতারাই সন্ধ্যাতারা নয়— এমনটি হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

আবার 'প্যারিসে অবস্থিত মিটার রডটি এক মিটার দীর্ঘ' এই বাক্যটি পূর্বতঃসিদ্ধ কারণ এই বাক্যটির সত্যতা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। অন্যদিকে এটি একটি আপতিক সত্য; কারণ সংকোচন ও সম্প্রসারণের ফলে রডটির দৈর্ঘ্য ঠিক এক মিটার না-ও থাকতে পারে।

ক্রিপ্‌কের এই বক্তব্য পূর্বতঃসিদ্ধতার সম্পর্কে প্রকাশিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে এবং একথাও প্রমাণ করেছে যে 'পূর্বতঃসিদ্ধতা' 'আবশ্যিকতা' প্রভৃতি পদেও নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আইডিওলজি

অশোক সেন

অনেককিছু মিলিয়ে গড়ে ওঠে একটি সমাজের ভাবতত্ত্ব (Ideolgy)। পরিব্যাপ্ত তার বিবিধ আয়তনে জায়গা পায় রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা, আইনের সংস্থান, নৈতিকতার বিচার, শিল্প ও নান্দনিক সংবেদনের আকার প্রকার, দার্শনিক মীমাংসা এবং ধর্মীয় আস্থা-অনাস্থার প্রকৃতি। সেইসঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রচলিত সব ধারণা আর বিশ্বাস, মতামত ও চিন্তাভাবনা। এমন ব্যাপক সংজ্ঞায় ভাবতত্ত্বকে মনে হয় সামাজিক মানুষের চিন্তা এবং চৈতন্যে চিহ্নিত সব বৈশিষ্ট্যের আকরস্বরূপ। বিমূর্ত ভাবের বিশ্লেষণে দার্শনিকদের যে উদ্যোগ, তার বিরুদ্ধে কাজের মানুষের প্রতিক্রিয়া প্রথম নেপোলিয়নের সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছিল। ভাবজগতের ব্যাখ্যায় দার্শনিক আতিশয্য প্রকৃত কাজের তৎপরতা ক্ষুণ্ন করে, এই ছিল নেপোলিয়নের মন্তব্য।

বহুবিধ ভাবানুষঙ্গের ব্যঞ্জনায় ভাবতত্ত্ব যেন এক সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার সমতুল্য হয়ে পড়ে। ছোটোবড়ো নানারকম তার একতিয়ার। একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণি থেকে গোটা সমাজ তো বটেই, এমনকী বিশ্বব্যাপী যোগসূত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কোনো মানবসমষ্টিও উপযুক্ত ভাবতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হতে পারে। ভাবতত্ত্বের ক্ষেত্রে আবেদনের পরিধি এবং বিষয়ের ব্যাপ্তির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। পরিধি বড়ো হলে বিষয় কম হবে এমন বলা যায় না, আবার উল্‌টো সিদ্ধান্তও ঠিক নয়।

সতেরো আঠারো শতক নাগাদ ইউরোপের দেশে দেশে সমাজব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আগের দু-তিনশো বছর ধরে সমাজজীবন ও মননের নানা স্তরে ওই পরিবর্তনের গোড়াপত্তনও ছিল ইতিহাসের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ, ইউরোপের দেশে দেশে তার বিভিন্ন পর্যায় এবং পরিক্রমায় বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তেমন বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির গতিপ্রকৃতিতে এবং সামাজিক প্রাধান্যের ধরনধারণেও প্রকারভেদ দেখা যায়। সেই শ্রেণির উদ্যোগ আর তৎপরতা ছাড়া প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকল্প নির্মাণ সম্ভব নয়। তেমন তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুকূল ভাবনা ও আদর্শের অঙ্গীকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের পক্ষে সেই চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ। তাহল মুক্ত বাজার, অবাধ প্রতিযোগিতা ও চুক্তিমতো কাজের সুযোগে কেবল পুঁজিপতিরা নয়, শ্রমজীবী মানুষসমেত গোটা সমাজ উপকৃত হবে।

তদুপরি ব্যক্তিগত মুনাফার সঙ্গে উৎপাদনশক্তি বিকাশের নিবিড় সম্পর্ক এবং তৎসহ বিজ্ঞানের নিত্যনতুন প্রয়োগে উৎপাদন আর সম্পদবৃদ্ধির অভূতপূর্ব সম্ভাবনা।

এভাবে বললে ধনতন্ত্রকে মনে হয় অর্থনৈতিক উন্নতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সকলের সমান অধিকারে বিশিষ্ট এক আদর্শ ব্যবস্থা। আক্ষরিক অর্থে আইডিওলজিকে বাংলায় 'ভাবতত্ত্ব' বলে শুরু করেছি। সমাজের ভাঙাগড়ায় তার ভূমিকা বিচার করলে 'ভাবাদর্শ' কথাটি আরো জুতসই মনে হয়। পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনে যে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রদর্শন, তার সম্পর্কে মার্ক্স-এর ব্যাজস্তুতি : এ যেন সহজাত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে এক স্বর্গোদ্যান, যেখানে স্বাধীনতা সাম্য, সম্পত্তি এবং বেন্থামের নীতিকথার রাজত্ব চলছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক, শ্রমশক্তির দাম আর উদ্বৃত্ত মূল্য ও শোষণের বাস্তবতাকে আড়াল করেই এই ভাবাদর্শের প্রতিপত্তি। তার সঙ্গে জড়িত উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ নিয়ে সজাগ কোনো অবহিতি তখন ধনতন্ত্রের ভাবাদর্শে জায়গা পায়নি।

ধনতন্ত্রের অনিবার্য অন্তর্বিরোধকে চাপা দিয়ে স্বাধীনতা ও সমান অধিকারে মণ্ডিত এক মায়ার জগৎ গড়ে ওঠে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিন্যাসে। কোথায় যেন বাস্তবতার সঙ্গে চৈতন্যের লেনদেনটাই উলটে যাচ্ছে। তবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তবেই একটা দুমুখো চেহারা আছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভাবাদর্শকে কেবল বিভ্রান্ত চেতনা (false consciousness) বলা ঠিক নয়। তাতে পুরোপুরি স্পষ্ট হয় না পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বকে ঢাকা দিয়ে স্বাধীনতা আর সমান অধিকারের আবেদন টিকে থাকে।

তবে বিভ্রান্ত চৈতন্যের ধারণায় একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা আছে যা উপেক্ষণীয় নয়। পছন্দে অপছন্দে আবিষ্ট মানুষের যুক্তি, ভক্তি, চৈতন্য ইত্যাদি মনের যাবতীয় ক্রিয়াপ্রক্রিয়া অবশ্যই কোনো-না-কোনো মূল্যবোধে সংশ্লিষ্ট। শোষণের বাস্তবতা বিষয়ে অনবহিতিতে বিভ্রান্ত চৈতন্যের নির্দশন। এমন অবস্থা যে শোষিত মানুষও তাদের দাসত্বের স্বরূপ উপলব্ধি না করে এক অলীক চাওয়া-পাওয়ার মরীচিকায় বশীভূত হয়ে পড়ে। যে মূল্যবোধে আচ্ছন্ন এরকম অচেতনা তার সূত্র ধরেই বিভ্রান্ত চৈতন্যের উৎপত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা তেমন মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভাবাদর্শ নিয়ে বর্তমান আলোচনায় ধনতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছি। অন্যান্য সবসমাজেই তার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করবার নয়। এমনকী নানাদেশে ধনতান্ত্রিক ভাবাদর্শের মূল ঝোঁক অভিন্ন হলেও, তত্ত্ববিন্যাসের খুঁটিনাটিতে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিশেষ একটি দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চিন্তাধারার পরম্পরা, ধ্যানধারণার ভাবানুষঙ্গ, বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঞ্চয়, এসব মিলিয়েই গোটা ভাবাদর্শের সংস্থান। প্রতিষ্ঠিত কোনো সমাজব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের অথবা তার পরিবর্তনের প্রেরণা উভয়ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাদর্শের ভূমিকা আছে। শ্রেণি-সমাজ আর সংগ্রামের পরিবেশে শোষক ও শোষিতের, শাসক ও শাসিতের পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক রকম আকার-প্রকারে প্রকাশ পায়। যা কিছু সামাজিক চৈতন্যের অবলম্বন ও অভিব্যক্তি তার সবদিক নিয়েই ভাবাদর্শের নির্মাণ। সেখানে সময় বুঝে

আবার শ্রেণিবিশেষের স্বার্থে জড়ানো রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এক অগ্রগণ্য গুরুত্বে অধিষ্ঠিত হয়।

ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৯৫) গ্রন্থের মুখবন্ধে সমাজ চেতনার নির্ধারণ এবং ভাবাদর্শের এলাকা নিয়ে মার্ক্স-এর আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন সম্পর্ক ও শক্তির সমাহারে গঠিত উৎপাদন ব্যবস্থায় সন্যস্ত থাকে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, মার্ক্স-এর কথায় সমাজের বাস্তব অবকাঠামো (material substructure)। একে মার্ক্স বলেন সমাজের ভিত্তি। তার ওপরে গড়ে ওঠে আইন, রাজনীতি এবং ভাবাদর্শের অন্তর্গত চিন্তা ও সংস্কৃতির পুরো জগৎ—মার্ক্স-এর আখ্যায় উপরিকাঠামো (superstructure)। এসব উপমার অনুষঙ্গে মার্ক্স লেখেন যে সামাজিক আস্তিত্ব তথা মানুষের জীবনযাত্রা তার চৈতন্যের নির্ধারক, চৈতন্য জীবনযাত্রার নির্ধারক নয়। কথাটা যান্ত্রিক কার্যকারণের মতো বুঝলে ভুল হবে। অর্থনীতির প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। তবে চৈতন্যের নিজস্ব নিয়মকেও অবহেলা করা যায় না। ভাবাদর্শের ব্যঞ্জনাও নিছক অর্থনৈতিক সূত্রে খাপ খায় না। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে কে কাকে নির্ধারণ করছে তার কোনো একপেশে মীমাংসা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেই সামাজিক অস্তিত্ব ও চৈতন্যের আদানপ্রদান যথার্থ তাৎপর্য অর্জন করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণির বিশ্লেষণে লেনিন একটি সূত্র নির্দেশ করেন। তাঁর মতে নিজেদের শোষিত অবস্থা সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণি আপনা থেকে সচেতন হতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে রুজিরোজগারের লড়াই পর্যন্ত তার সীমা। বৈপ্লবিক সমাজপরিবর্তনে তাদের অগ্রণী ভূমিকা কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের প্রদত্ত বিশ্লেষণ ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। সে কাজের জন্য পার্টি, তার সংগঠন, তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দেন। অঙ্গাঙ্গি (organic) ভাবাদর্শ ও বুদ্ধিজীবীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় সমূহের চৈতন্যকে মৌল স্বীকৃতি দিলেন আন্তনিও গ্রামসি। চৈতন্যের ভাঙাগড়ায় গ্রামসি কেবল তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেন না। কয়েকটি স্তরে ব্যাপ্ত তাঁর ভাবাদর্শের ধারণা, যেমন দর্শন, ধর্ম, সাধারণ বোধবুদ্ধিতে অর্জিত কাণ্ডজ্ঞান এবং লোককথা। সমাজচেতনার গড়নে অপরিহার্য এসব স্তরের মধ্যে ঠিকমতো আদানপ্রদান।

সমাজচেতনা আর ভাবাদর্শের যোগাযোগ অনেক জটিলতায় জড়িত। *দ্য জার্মান আইডিয়াওলজি* বইটি ১৮৪৫ লেখেন মার্ক্স-এঙ্গেলস। বিংশ শতাব্দীর দুইয়ের দশকের শেষের দিকে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেখানে ভাবাদর্শ বলতে ভাববাদী দর্শনের অবান্তর চিন্তাভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছিল। তার কঠোর সমালোচনাই ছিল ওই বইটির বিষয়। আবার ফয়েরবাখ-এর মতো বস্তুবাদীর সমালোচনাও সে বইয়ে ছিল। তারপরে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা স্তরে ভাবাদর্শের অন্য পরিচয় আমরা মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর রচনায় পাই। তার পরিমাণ অবশ্য খুব বেশি নয়। সে আলোচনার বিস্তার এখানে সম্ভব নয়। সমাজের কোনো বিরোধের সম্পর্কে চৈতন্য থাকলেও তার নিষ্পত্তির সংগ্রাম যথেষ্ট না হতে পারে। এমন সমস্যার মুখোমুখি কোনো বিরোধের পক্ষে বিপক্ষে, বিভিন্ন শ্রেণি

অথবা অন্য কোনো সমূহের মধ্যে পরিবর্তন বা প্রতিরক্ষার প্রেরণা চারিয়ে দেওয়ায় ভাবাদর্শের ভূমিকা আছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, সকলের সমান অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গতিতে বিশিষ্ট ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, এমন ধ্যানধারণাকে মার্ক্স বলেছিলেন বুর্জোয়া ভাবাদর্শ। সেখানে ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শোষণের বাস্তব, আর শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কে অবহিতি নেই। তাই ভাবাদর্শকে বলা হল 'বিভ্রান্ত চেতনা'। সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের প্রেক্ষিতেই তেমন বিভ্রান্তির সত্য আমাদের অবধার্য। পরিবর্তমান জীবন ও সমাজ ইতিহাসে কোনো ব্যবস্থাই ঠিক চূড়ান্ত নয়। সব ভাবাদর্শেই পক্ষবিপক্ষ আছে। সত্যমিথ্যার চেনাজানায়, আস্থা অনাস্থার মতিগতিতে, শেষ মীমাংসার নিবৃত্তিও সম্ভব নয়। আবার কেবল দৃষ্টিগোচর বাস্তবে সীমাবদ্ধ থাকে না ভ্রান্তি অভ্রান্তির বিচার। মনের ভিতরে বাহিরে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের বহু জটিল টানাপোড়েন তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সমাজের গতিস্থিতি বুঝতে নিশ্চয় কাজে লাগে বিজ্ঞানের বোঝাপড়া ও নির্ধারণ। তবে যাবতীয় নির্ণয়ের পরিসর পেরিয়ে বাড়তি আবেগ, ভরসা, প্রেরণায় মথিত হতে পারে ভাবাদর্শের অনেকান্ত তাৎপর্য।

আর্কেটাইপ

স্বপন চক্রবর্তী

প্রাচীন গ্রিকে, 'আর্কেতুপস' মানে আদি ছাঁদ। তার থেকে লাতিন 'আর্কেটিপুস', অর্থাৎ প্রারম্ভিক রূপ। প্রতিরূপের উৎস যেকোনো প্রতিমান বা আদিরূপকে ইংরেজিতে 'আর্কেটাইপ' বলা চলে, যেমন বলা হয় প্রাণিবিদ্যায় অথবা টাঁকশালে। আবার প্লেটো-কথিত 'আইডিয়া' বা বস্তুর ধ্রুব আধিবিদ্যক রূপও আর্কেটাইপ।

মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইউং (১৮৭৫-১৯৬১) বিশ্লেষণধর্মী মনস্তত্ত্ব ও কবিতার সম্পর্ক বিষয়ক এক নিবন্ধে লেখেন যে আর্কেটাইপ হল মানুষের যৌথ নিশ্চেতনে উৎকীর্ণ আদিম রূপকল্পসমূহ। এগুলির প্রতিটি হচ্ছে সমগোত্রের অসংখ্য অভিজ্ঞতার মানসিক অবশেষ, যা মস্তিষ্কে গূঢ়লেখের মত মুদ্রিত হয়ে আছে এবং যা বংশগতিসূত্রে প্রাপ্ত। ১৯৫৭ সালে মির্চা এলিয়াদ লেখেন যে ইয়ুং-এ আর্কেটাইপের দুনিয়া প্লেটোর আইডিয়ার জগতের মতোই নৈর্ব্যক্তিক—উভয়েরই স্থিতিগতি ব্যক্তির অস্তিত্বের ঐতিহাসিক কালসীমা ছাড়িয়ে মনুষ্যজাতির সামূহিক কালে ও জীবনে।

কাব্য ও মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত আরেক প্রবন্ধে ইয়ুং কবিকে বর্ণনা করেন নিশ্চেতন অথচ সক্রিয় সার্বিক মানবাত্মার রূপকার ও সংবাহক হিসেবে। স্বভাবতই কবির রচনায় আমাদের সামূহিক নিশ্চেতনার মিথ ও প্রতীক বারবার ফিরে আসে থিম ও রূপকল্পের আকারে এবং সেগুলি পাঠকের মনে সুপ্ত আর্কেটাইপগুলিকে উদ্রিক্ত করে।

ইউঙের প্রভাবে ইংরেজ লেখিকা মড বডকিন ১৯৩৪ সালে প্রকাশ করেন *আর্কেটাইপাল প্যাটার্নস্ ইন পোয়েট্রি* বইটি। বিভিন্ন ট্র্যাজিক নাটকে পুনরাবৃত্ত ছক, হোমরের কাল থেকে পশ্চিমের কাব্যে দৃষ্ট নারীর নানা আদিরূপ, দান্তে, মিল্টন ও কোলরিজের কবিতায় স্বর্গনরকের আর্কেটাইপ, কোলরিজের *দ্য রাইম অফ দি এনশেন্ট ম্যারিনার* কবিতায় পুনর্জন্মের থিম, ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন বডকিন। ইয়ুং ছাড়াও বডকিন ফ্রয়েডের কিছু ধারণার সাহায্য নিয়েছেন; হ্বোল্‌ফ্‌গ্যাং কোলারের থেকে ধার করেছেন গেশ্‌টল্‌ট্ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা; জেমস ফ্রেজার, আলেকজান্ডার গোল্ডেন হ্বাইসার ও ফ্রান্সিন কর্নফোর্ড প্রমুখের নৃতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন।

আর্কেটাইপ কি বংশসূত্রে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়? জীববিজ্ঞানে এই তত্ত্বের বড়ো একটা সমর্থন মেলে না। প্রত্যেক প্রজন্মে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যের জন্যই আদিরূপগুলি শাশ্বত বলে ভ্রম হয়— এ রকম মতের প্রতিই

বরঞ্চ বিজ্ঞানের সায় মিলবে। এর একটা অর্থ হল এই যে অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বদলালে আর্কেটাইপও বদলাবে। এ-ব্যাপারে বডকিনের চিন্তায় কিছু দ্বিধা আছে।

গোড়ায় অবহেলিত হলেও বডকিনের বই প্রকাশ হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই আর্কেটাইপ-আশ্রয়ী শিল্প সমালোচনার চল বাড়ে। সাম্প্রতিকতর কালে আর্কেটাইপের নতুন ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করেন কানাডার সমালোচক নর্থ্রপ ফ্রাই। আর্কেটাইপের উৎস ও মানসিক গতিপথ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দূরকল্পনা ফ্রাই পরিহার করেন। *অ্যান অ্যানটমি অফ ক্রিটিসিজ্‌ম্‌* (১৯৫৭) বইটিতে তিনি যে কোনো প্রতীক, প্রতিমা বা রীতিকেই আর্কেটাইপ বলেন যদি নিরন্তন পুনরাবৃত্তির ফলে সেটিকে সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। এক রচনাকে অন্য রচনার সঙ্গে যুক্ত করে আর্কেটাইপ আমাদের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাকে সংহত করে। আর্কেটাইপ-নির্ভর সমালোচনা তাই সাহিত্যকে একটি সামাজিক সত্য ও সামাজিক সংলাপ-বিনিময়ের প্রণালী হিসেবে দেখে, যদিও ফ্রাই এটাকেই সাহিত্যের চরম পরিচয় বলে মনে করেন না।

ফ্রাই-বর্ণিত আর্কেটাইপের দুটি মেরু হচ্ছে পুনরাবৃত্তি ও বাসনা। পুনরাবৃত্তির উৎস প্রকৃতির ছন্দে, দিন-রাত্রির আবর্তনে, ঋতুর পরিক্রমায়, জীবন-মৃত্যুর চক্রাকার পালায়। সাহিত্যের আখ্যানের বৃত্তাকার ছন্দের সঙ্গে অতএব যোগ রয়েছে রিচ্যুয়াল বা যৌথ ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের। অন্যদিকে নানা সাহিত্যকর্মের সুর, আঙ্গিক ও মেজাজের যে নিগূঢ় সারূপ্য রয়েছে তার যোগ মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্কের সঙ্গে। আলাদা করে রিচ্যুয়ালের মধ্যে দেখি স্বপ্ন ও শঙ্কার বিবাদ—উর্বরতার কামনার সঙ্গে অজন্মার আশঙ্কার সংঘাত; জিগীষার সঙ্গে শত্রুভয়ের। স্বপ্নের মধ্যেও রয়েছে ইচ্ছাপূরণ আর উৎকণ্ঠার এই দ্বন্দ্ব। ফ্রাই-এর মতে মিথ হচ্ছে আচার-আকাঙ্ক্ষার মিলনের শাব্দিক রূপ। রিচ্যুয়ালকে তার অর্থ দেয় মিথ আর স্বপ্নকে দেয় তার আখ্যান বা ন্যারেটিভ। স্বপ্নের প্রতীকগুলির তাৎপর্য মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিভৃত ও ব্যক্তিগত, কিন্তু আর্কেটাইপাল সমালোচকের কাছে প্রকাশ্য ও সমষ্টিগত। একটি সাহিত্যকর্ম এই বিচারে বৃহত্তর সাহিত্যলোকের শরিক এবং সাহিত্য হল সভ্যতার, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক প্রতিরূপে অংশ।

সাহিত্যের গঠনরীতি ও নীতিনিয়ম ফ্রাই-এর দৃষ্টিতে পুরাকথা এবং ধর্মীয় আচারের ঘনিষ্ঠ এবং এই ঘনিষ্ঠতা আদিম সাহিত্যে ও হালের গণপাঠ্য গল্প-কবিতায় সহজেই ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে ফ্রাই-এর প্রেরণার উৎস কবি উইলিয়াম ব্লেক, যিনি বাইবেলকে তাবৎ শিল্পের মহৎ সংকেতকোষ বলে বর্ণনা করেছিলেন। প্রতিটি আদিরূপকেই অতএব ফ্রাই দেখেন এক সর্বজনীন প্রতীক-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে। এই শৃঙ্খলার দরুণ গঠনবাদ-উত্তর সমালোচনায় ফ্রাই-এর পদ্ধতি ততটা আদৃত হয়নি, যতটা হয়েছে বডকিনের ইয়ুং-পন্থী রীতি। গঠনবাদী নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ত্রাউস ১৯৫৮ সালে ইয়ুং-এ ধারণাকে আক্রমণ করে লেখেন যে, কোনো বিশেষ মিথের তাৎপর্য বিচ্ছিন্ন আর্কেটাইপগুলির মধ্যে নিহিত নেই, আছে সেগুলির সংশ্লেষের বিশিষ্টতার মধ্যে। ফ্রাই-এর সমালোচনায় এই বিচার পদ্ধতির যৎসামান্য পূর্বাভাস বোধহয় পাওয়া সম্ভব।

আখ্যান

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

'আখ্যান' শব্দের অর্থ হল কথন, উক্তি, বচন। 'বিবরণ' অর্থে শব্দটির যে ব্যবহার তাকে সংস্কৃত সমালোচকেরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—একটি হল 'আখ্যায়িকা' এবং অন্যটি 'কথা'। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে বাণভট্টের *হর্ষচরিত* হচ্ছে আখ্যায়িকা এবং একই লেখকের *কাদম্বরী* হল কথা। প্রথমটির ক্ষেত্রে লেখক একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কল্পনার মাধ্যমে একটি কাহিনি সৃষ্টি করছেন। আবার 'কথা'-র পাশাপাশি 'গাথা' শব্দটিও প্রচলিত ছিল পদ্য বিবরণের জন্য। এই 'গাথা' গোত্রে শ্লোক থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য পালাগান ইত্যাদি অনেক কিছুই পড়ে।

আখ্যানের জন্ম-রহস্য বিষয়ে আলোচনায় পণ্ডিতেরা বলেছেন গোষ্ঠীগত, সামাজিক এবং পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর সৃষ্টি। যে কোনো আচার-অনুষ্ঠান মানেই এক-একটি কিংবদন্তি। সে-সব পরে কাহিনির রূপ নেয়। আর তার ভেতর জীবনের ছোটো-বড়ো নানান কথা, দেবদেবী পশুপাখি ইত্যাদি নানা জন এবং নানা কিছুর উপস্থিতি। সময় এবং পরিসরের দিক দিয়ে এক মহাব্যাপ্তি তার ভেতর। অন্যদিকে অতীতের কথা বললেও তা সমসাময়িক, দেবদেবীদের কথা শোনালেও তা মানবিক, কৌমের যৌথ ও সমবেত অনুভূতির কথা বর্ণনা করলেও তা ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিক।

সাহিত্য আখ্যানের যে ইতিহাস তার দুটি ধারা—একটি পাশ্চাত্যের এবং অন্যটি প্রাচ্যের। পাশ্চাত্য ধারার দুটি মূল রীতি হল গ্রিসিয় ও ইহুদীয়। গ্রিসীয় আখ্যানের দুটি স্তম্ভ হচ্ছে ইলিয়াড ও ওডিসি। কাহিনি দুটি বহুকাল ধরে প্রচলিত থাকলেও অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি *ইলিয়াড* এবং একই শতাব্দীর শেষের দিকে *ওডিসি* লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। গ্রিসীয় বিক্রয়, সংহতি, নৈতিকতা এবং দৈনন্দিনের জীবনচর্যার এক ছবি মহাকাব্য দুটিতে। এতো গভীরভাবে আর কোনো কাহিনি গ্রিসিয় জীবনে প্রভাব ফেলেনি। হোমার ছিলেন চারণকবি এবং তাঁরই গাওয়া কথা কেউ লিখে গেছেন বলে অনুমান। কিন্তু অন্য গায়কদের তুলনায় কি অর্থে হোমার ভিন্ন, কোথায় তাঁর নির্মাণের অনন্যতা? এটি হোমারের প্রধান অবদান যে তিনি কাহিনিটির বিস্তার ঘটিয়েছেন, নতুন বিবরণে প্রবেশ করেছেন এবং একই সঙ্গে জীবনের অনেক জটিল স্তর স্পর্শ করেছেন। উপস্থাপনা এতই মিশ্র যে ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়ে কাহিনি দুটিকে বাঁধা যায় না। কিছু বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গির হদিশ মেলে না, জীবনের প্রচলিত হিসেব

মেলে না অথচ সব কিছু মিলে জীবনের এক আশ্চর্য ছবি ফুটে ওঠে। দুটি মহাকাব্যই গঠনের দিক দিয়ে যেন বেশ কিছু ঢিলেঢালা কিন্তু কোথাও এক আশ্চর্য সংহতি আছে। আর পরবর্তী পর্বের কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকরা— শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই বই দুটি থেকে চিন্তা ও সৃষ্টির নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে ইহুদি বাইবেলটি আর এক অর্থে মানুষের জীবন এবং কথন-লেখনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বাইবেলের গ্রন্থগুলি তিন ভাগে ভাগ করা হয়— ক) বিধানশাস্ত্র [বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ যা গ্রন্থপঞ্চক নামে পরিচিত] খ) অবতারদের বাণী [যোশুয়া, বিচারক চরিত, প্রথম ও দ্বিতীয় সামুয়েল, প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলি, ইসাইয়া, জেরেমিয়া, ত্রজেকিয়েল, হোসেয়া, যোয়েল, আমোন, ওবাদিয়া, যোনা, মিথা, নাহুম, হাবাকুক, সেফানিয়া, হগয়, জাখারিয় এবং মালাখি] গ) রচনাবলি যার আর এক নাম 'পুণ্য শাস্ত্রাবলি' [এগুলির মধ্যে রয়েছে সামসঙ্গীত, যোব, প্রবচন, রূপ, পরমগীত, উপদেশক, বিলাপ, এসথার, বৃহত্তর রচনার প্রবক্তাদের অন্যতম দানিয়েল, এজরা, নেহেমিয়া এবং বংশাবলি ১-২।] বাইবেল কে লিখেছেন তা জানা যায় নি। আদি বাইবেলের লেখক হিসেবে মোজেজ-এর কথা বলা হয় কিন্তু তিনি অনেক সময়েই থার্ড পার্সনে উল্লিখিত। ফলে মনে হয় আদি বাইবেল যেন এক সমবেত দৃষ্টি এবং তার বেড়ে ওঠা গাছ কিংবা পাহাড়ের মতো প্রাকৃতিক। মনে হয় এটি ৭০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। বইটিতে মোট চব্বিশটি পর্ব। বাইবেল প্রসঙ্গে দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন সার্বিক আর স্বর্গীয় সত্যের সহাবস্থানে এ এক আশ্চর্য রহস্যগ্রন্থ। মানুষ এবং মানুষের প্রকৃতিকে যেন পৃথিবীর ছাঁচে ফেলে বইটিতে ঢোকানো আছে। দস্তয়েভস্কির মতো পৃথিবীর বহু লেখক এবং সাধারণ মানুষকে আপ্লুত করেছে বন্যা, সুরা তৈরি, আশীর্বাদ, স্বপ্ন, দুর্ভিক্ষ, ভাগ্যমন্ত সংখ্যা ইত্যাদি নানা কিছু বিষয়ের ওপর নানা শৈলীর নানা স্বরবিন্যাসের কাহিনি।

চিনা আখ্যানের ইতিহাসের যে দুজন মানুষ গভীরভাবে ছাপ ফেলে গেছেন তাঁরা হলেন লাও-ৎস (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম) এবং খুং-ফুৎস (জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১)। লাও-ৎসের লেখা *তাও-তে-চিং* এবং খুং-ফুৎসের *লুন-য়ু* শুধু দর্শনচিন্তার দিক থেকে নয়, চিনজাতির মনোজগৎকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে শতকের পর শতক ধরে। লাওৎসের ক্ষেত্রে দর্শনের দিকটি বেশী আর খুং-ফুৎস জোর দিয়েছেন সামাজিক, নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের প্রতি। প্রথমটি শিষ্যদের উদ্দেশে বলা বাণীর সংকলন, দ্বিতীয়টি ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথন। জীবনের দৈনন্দিন, যৌথ জীবনচর্যা, যুদ্ধক্ষেত্রের হিসেবনিকেশ ইত্যাদির সঙ্গে জীবনের বৃহত্তর অর্থ-সন্ধান বই দুটিকে অনন্য করে তুলেছে। চিনা জীবন ও সাহিত্য এই কথ্যশৈলী প্রভাবিতও করে এসেছে বহুকাল। অন্যদিকে জাপানি মহিলা আখ্যানকার মুরাসাকি শিকিবুর (৯৭৮-১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) *গেনজি মোনোগাতারি* পৃথিবীর প্রথম উপন্যাসটি লিখেছেন বলে কিছু সমালোচকের অভিমত। চুয়ান্ন পরিচ্ছেদের এই বইটিতে ব্যক্তি মানুষের এক-দুদিনের ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা। আর সেই মরণশীল জীবনের মধ্যে কেমন করে সে মৃত্যুহীনতার সন্ধান পায়—রয়েছে সে

কথাও। এটি হল হিকারু গেনজি (হিকারু শব্দের অর্থ 'উজ্জ্বল') নামের এক যুবকের কথা যে নানা চরিত্রের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে চলে এবং শেষপর্যন্ত করুণ পরিণতি ভোগ করে। রাজসভার ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র ধরা রয়েছে বইটিতে। ঔপন্যাসিকরা পটচিত্র খোলার ভঙ্গিতে কাহিনিটি উপস্থাপন করেছেন। জীবনের দৈনন্দিনের সঙ্গে সন্ধান করেছেন বুদ্ধের বিশ্বদর্শন। শিকিবুর এই কাহিনিটি বিগত নশো বছর ধরে শুধু জাপানি উপন্যাস নয় জাপানি কবিতা, হস্তশিল্প এমনকি বাগান পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করেছে।

ভারতীয় *মহাভারত ও রামায়ণ* অন্য দুই আশ্চর্য কাহিনি-কাব্য যা ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, সংগীত, ছায়াছবি এবং অন্যান্য শিল্প মাধ্যমকে বহুকাল ধরে প্রভাবিত করে আসছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক ভারতবাসীর জীবনের নানা অনুভূতি যেন ধারণ করে আছে বই দুটি। প্রতিটি খণ্ড এক অর্থে সম্পূর্ণ আবার খণ্ডগুলি জুড়ে অন্য এক অখণ্ডতা তৈরি হয়। এ দুই মহাকাব্য যেন আমাদের ইতিহাস যা পুনর্কথনে আবার বর্তমানও হয়ে ওঠে। কাহিনি-কাব্য দুটি এগোয় সুখ ও দুঃখ, প্রতিহিংসা ও ক্ষমা, যুদ্ধ ও শান্তির মধ্য দিয়ে। প্রতিটি খণ্ড যেমন সত্য তেমনই সমগ্রও সত্য—এমন এক গঠন রহস্য চোখে পড়ে দুটি মহাকাব্যেই।

এই বৃহৎ ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক আখ্যানেরও নানা রূপ চোখে পড়ছে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই। উপন্যাসের পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে ছোটোগল্প। কাহিনি গদ্যের যেমন শিল্পরূপ-নির্দিষ্টতা তৈরি হয়েছে তেমন আবার প্রাচীন ভেঙেও যাচ্ছে নানা ভাষার নানা কলমে। কোথাও মিথ ঢুকে পড়ছে দৈনন্দিনে, কোথাও আবার ভ্রমণসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যের মাঝের বেড়া উঠে যাচ্ছে। নারীর কলমে অন্য এক অনুভূতি আকার পাচ্ছে কথাসাহিত্যের। কালো মানুষের কাহিনি ভিন্ন এক বাচনে কিছু কথা বলে নিতে চাইছে দলিত কথাকারদের মতোই। এই বিশ্বায়নের অন্য কিছু কথাও প্রকাশ পাচ্ছে বিদেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কলমে। এ-ভাবেই ভাঙা-গড়া চলছে আখ্যানের মন ও শরীরে।

আদারনেস

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আড়ভাবুক রুডল্‌ফ বারোর *অন্যতর* (*Die Alternative*/1977) বইটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই 'অন্যতা' (Otherness) শীর্ষক ধ্যানধারণা সামাজিক ব্যবস্থার বিকল্প শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একদা হোনেকারের আমলে পূর্ব জার্মানিতে তাঁর এই অন্যবিবেকী গ্রন্থ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রসংস্থার চিত্তে যেমন ছমছমে অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমন উশ্‌কে দিতে পেরেছিল পশ্চিমে পণ্যবাদী ধনতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃত স্বরূপ। দ্বিতীয়োক্ত প্রবর্তনা থেকেই সবুজ আন্দোলন (Green Movement) সূচিত হয় এবং এই মুহূর্ত পর্যন্ত তার অভিঘাত অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। বস্তুত জার্মানির সাম্প্রতিক সম্মিলিত সরকারের অন্যতম শরিক হওয়ার ফলে তার সদ্য অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিকতা নিয়ে সরব সমালোচনাও বিরল।

ফরাসি বিপ্লবে ভ্রাতৃত্বের প্রণোদনা থেকে শুরু করে শিলারের 'লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমরা এ ওকে জড়িয়ে ধরো' মন্ত্রের উদ্দীপনায় এই ধারার সূত্রপাত যেমন স্পষ্টতই লক্ষণীয়, ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থা বিষয়ে রচিত ডিকেন্সের উপন্যাসেও, আরো বস্তুসহ মাধ্যমে, তেমনিই।

মনে রাখতে হবে, ওই সময়ে প্রথানুগত পৌর জীবনপ্রণালী থেকে সরে গিয়ে বৈকল্পিক জীবনযাপনের তাগিদে বিভিন্ন দেশের ভাবুকেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজস্ব তালুকে এই মর্মে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে পরিশেষে সর্ববিধ পার্থিব নিরাপত্তা থেকে এক ঝটকায় সরে গিয়ে টলস্টয়ের প্রায়-অজ্ঞাতবাস ও মৃত্যুর প্রতীকী তাৎপর্য এখানে স্মরণযোগ্য। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক চর্যায় ডুকহুবারেরা (Doukhoubers) যে রাশিয়া থেকে কানাডা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেই বিশ্ববোধের আড়ালে টলস্টয়ের প্রেরণা অলক্ষ ছিল না। আজও একই গরজে আমেরিকায় তথাকথিত 'অ্যামিশ' (Amish) সম্প্রদায়ের মানুষজন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংস্রব এড়িয়ে সতেরো শতকের ঘরানায় প্রকৃতির পরিচর্যায় দৃপ্তভাবে বেঁচে আছেন।

বিকল্পবাদের দার্শনিক শিকড় খুঁজতে গিয়ে অনেকেই কান্টের প্রেক্ষিতে শোপেনহাওয়ারের 'অন্যদের প্রতি নিঃস্বার্থ করুণা'র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত কিয়ের্কেগার্ডের 'সমাজে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত অতীন্দ্রিয় উৎসের' প্রতি পিছুটানের কথাও এঁরা ভোলেননি।

অন্যতর অভিমুখে তভময় এই সংঘবদ্ধ যাত্রা যে নতুন সময়ের দার্শনিকের কাছ থেকেও সব সময় উষ্ণ উদার সমর্থন পেয়েছে, এরকম নির্ধারণ কিন্তু ভুল হবে। এমনকী সার্ত্রেও অস্তিত্ববাদের সন্ধানে হঠাৎ এক সময় 'নরক সে তো অন্য লোকজন' (L'enfer, c'est les autres) বলেছিলেন। মনে রাখতে হবে, তাঁর একদা-সতীর্থ অথবা অনুব্রতী আলবেয়ার কাম্যু 'প্রতিরোধে'র (Resistance) আয়নায় ওই নঞর্থক প্রাতিস্বিকতা বর্জন করে মহত্তর বিকল্পের সৌজন্যে বিপ্লবের পোষকতা করেছিলেন। জার্মানিতে সত্তরের বোধনবেলায় 'দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবে'র পর্যায়ে সার্ত্রে রাষ্ট্রিক-সামাজিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন অনুভব করে বিপ্লবী ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাম্যুর প্রদর্শিত সেই পথেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ ফ্রান্স ও জার্মানিতে যে তরুণদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী তৃণমূলের আন্দোলন ক্রমবর্ধিষ্ণু, তার আড়ালে কাম্যু-এবং বিস্ময়কর সন্নিবেশে—মহাত্মা গান্ধীর দান অনস্বীকার্য। লক্ষ করতে হবে 'সন্ত্রাসবাদ' (Anarchism) এখানে ছদ্ম-অভিধা, কেননা নিরস্ত্র অসহযোগই বিকল্পমুখী এই বিদ্রোহের চূড়ান্ত আদর্শ।

১৯৬৮-এর ওই ছাত্র জাগৃতির মধ্যেই 'অন্য' অন্বেষার ধারাবাহিকতার ঐতিহাসিক ভিত্তিকে প্রথম ঠিকমতো শনাক্ত করা যায়। শুধু জীর্ণ, আত্মসুখী সমাজটাকে পালটে দেওয়াই নয়, সেদিনকার ছাত্রনেতা ডানিয়েল কোন-বেণ্ডিট, আজকের সবুজ দলের অগ্রগামী, 'ইকলজি'র (<গ্রিক 'ঐকোন' = আবাসন) সপক্ষেও সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতি পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, নিসর্গ ও দুর্গত মানুষকে মিলিয়ে কল্যাণময় একটি অবিভাজ্য বিশ্বভবনেরও দিকে নিরন্তর সেই অভিমুখিতা দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। তারই পৌরোহিত্যে মধ্য-ইউরোপে পর পর নারী আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলন সঞ্চারিত হয়েছে। ঠিক একই প্রৈতির যোগসাজসে প্রথাসিদ্ধ চিকিৎসা বয়কট করে আয়ুর্বেদ এবং চিনের প্রাচীন 'চি-কুং'—শুশ্রূষার প্রয়োগবিধির পুনরাবিষ্কার এবং বিকল্প চিকিৎসায় (Alternative Medicine) তাদের সর্বজনীয়তা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে বিপুল এক কর্মযোগ।

বিকল্প নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর সুন্দরম্ কর্নাটকে যে ANNATTA 'বিবেকানন্দ গিরিজন কল্যাণকেন্দ্র' নির্মাণ করেছেন তার সঙ্কেতও, অনেকেরই মতেই, 'অন্যত্ব' কিংবা 'অন্যতা'। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের পরস্পরস্পর্শী উদ্যোগের এরকম মাঙ্গলিক উদাহরণ থেকে ভরসা জাগে, নতুন শতকে 'এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'।

আদিবাসী

বিনয় চৌধুরী

সমাজবিজ্ঞানীরা 'আদিবাসী' কথাটাকে ব্যবহার করেন এক বিশেষ অর্থে, আক্ষরিক অর্থে নয়। এর প্রয়োগ জনগোষ্ঠী, উপজাতি বা ইংরেজি 'ট্রাইব' অর্থে। ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে আলোচনায় দুটি প্রধান ধারা দেখা যায়। একটাতে নৃতত্ত্ববিদ্যার ব্রিটিশ-ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ ধারার অনুগামী বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, 'আদিবাসী' (ট্রাইব) এক বিশিষ্ট, অনন্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ('স্ট্রাকচারাল টাইপ')। অবশ্য এ অনন্যতার লক্ষণগুলির নির্বাচনে তাঁরা একমত নন। কেউ কেউ তাই বলেন, 'ট্রাইব' শব্দের সংজ্ঞানির্দেশ দুরূহ কাজ; তার বদলে 'ট্রাইব্যাল সমাজ' কথাটা তাঁদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে প্রায় সবাই স্বীকার করেন 'আদিবাসী' সমাজ ও অর্থনীতির কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—এ-অর্থনীতি 'কৃষক' সমাজের অর্থনীতি থেকে ভিন্ন। বহুক্ষেত্রে স্থায়ী কৃষিকাজ তাদের প্রধান জীবিকা নয়। জমির অনুর্বরতা, জলসেচের অপ্রতুলতা এবং অন্যান্য কারণে দক্ষ কৃষি-ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলতে পারেনি। লাঙলের ব্যবহার ছিল সীমিত। 'জুম' প্রথায় চাষ এবং পশুপালন ছিল অরণ্যচারী আদিবাসীদের প্রধান জীবিকা। এ ধরনের অর্থনীতিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল স্বল্প। অর্থনৈতিক অসাম্য তাই এ সমাজে প্রকট হতে পারেনি। উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম ছিল বলে চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই এদের জীবনযাত্রা ছিল সরল, অনাড়ম্বর, বাহুল্য-বর্জিত। আদিবাসীদের সমাজ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমাজ ('লিটল কম্যুনিটি', 'সেগমেন্টারি সোসাইটি'); বৃহত্তর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির সঙ্গে তাদের যোগ প্রায় ছিলই না। থাকলেও তা সরাসরি নয়। এ সমাজে পরিবর্তনের গতি অতি ধীর। এখানে বিশৃঙ্খলা বা ভাঙন অভ্যন্তরীণ কোনও কারণে ঘটেনি; তা ঘটেছে, বাইরের কোনও শক্তিশালী গোষ্ঠীর আবির্ভাবে এবং হস্তক্ষেপে।

দ্বিতীয় ধারায় বিশ্বাসী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের এ বিচ্ছিন্নতার ধারণা মানেন না। কৃষক সমাজের তুলনায় বাইরের রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আদিবাসী সমাজের সীমাবদ্ধ সংযোগের কথা তাঁরা স্বীকার করেন। তাঁরা কিন্তু বলেন, বাইরের জগতের ব্যাপক যোগসূত্র তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। প্রাথমিক সংযোগ অর্থনৈতিক কারণে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগ আসে পরে, এর ফলস্বরূপ। তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন, কী ভাবে 'হিন্দু' সমাজ আস্তে আস্তে আদিবাসীদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে;

এমন কী অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীরা হিন্দু জাতিব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে। (এ ব্যাখ্যার নাম 'হিন্দু মেথড্ অফ্ ট্রাইব্যাল অ্যাবসর্পস্যান')। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে আদিবাসীরা তাদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক ধারণা ইত্যাদি বর্জন করেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে ভারতের বিশেষত পূর্ব ভারতের আদিবাসী জগতের কথা মনে রেখে এ দুটি এবং আরো কয়েকটি ধারণার বিচার প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে এ সমাজে পরিবর্তনের রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ। কয়েকটা মূল প্রশ্নের আলোচনা আমরা এখানে করব।

১। আদিবাসীরা কি সত্যিই আদিবাসী? একটা বদ্ধমূল ধারণা হল— ঔপনিবেশিক যুগের আগে তাদের জগৎ দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থেকেছে; তাদের আদি বাসও তাই অটুট ছিল। এ ধারণা ভ্রান্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে আদিবাসীরা নতুন জমির সন্ধানে প্রায়ই তাদের পুরনো বাস ছেড়ে দলবদ্ধভাবে অন্যত্র চলে যেত। ফলে, বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষ ঘটেছে। জয় হয়েছে তাদের, যাদের কৃষি-উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নততর। (রাজমহল পাহাড়ে, পাহাড়িয়ারা সাঁওতালদের আগ্রাসন রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমেই এভাবে পিছু হটেছে। বিহারে ওঁরাও মুন্ডাদের মধ্যে বিরোধের এটা একটা প্রধান কারণ।)

২। স্থায়ী কৃষি-কাজের কৌশল আদিবাসীদের জানা ছিল না—এ ধারণাও ভুল। পূর্বভারতের প্রধান প্রধান এলাকার অর্থনীতির প্রধান বুনিয়াদ ছিল কৃষিকাজ। কৃত্রিম জলসেচের উপায় তারা জানত। লাঙলের ব্যবহারও ছিল ব্যাপক। যেখানে প্রাকৃতিক কারণে অব্যাহত কৃষি-উৎপাদন সম্ভব ছিল না, শুধু সেখানেই বিকল্প জীবিকা ছিল 'ঝুম' প্রথায় চাষ বা এক ধরনের যাযাবর বৃত্তি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদের বিস্তার অনিবার্য হয়েছে।

৩। আদিবাসী সমাজ বৈষম্যহীন, বিরোধহীন, এক আদর্শ গ্রাম-সংগঠন এককালের এ প্রচলিত ধারণা এখন গ্রহণীয় নয়। জমির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে কৃষকসমাজে যে ধরনের অসাম্য ছিল, আদিবাসী সমাজে তা কদাচিৎ দেখা গেছে। কিন্তু আদিবাসী গ্রামে কোনো বৈষম্য ছিল না, এ ধারণা ঠিক নয়। গ্রামপত্তনকারী (খুৎকাঠিদার, ভুঁইহার ইত্যাদি) পরিবারের সঙ্গে যুক্ত লোকদের অধিকার ছিল অগ্রগণ্য। গ্রামে অন্যান্যরাও থাকত। কিন্তু আদি গ্রামীণ সমাজের অনুমতি ছাড়া এরা গ্রামের জমি চাষ করতে পারত না। তা ছাড়া থাকত বিভিন্ন ধরনের কারিগর—কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি। গ্রাম-সমাজের সংগঠনে এদের কারোর স্থান ছিল না। যেমন, গ্রামের পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি কীভাবে হবে, এ সম্পর্কে তাঁদের মত দেবার কোনো অধিকার ছিল না।

৪। আদিবাসী সমাজ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠী মাত্র ছিল—নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের এ সাবেক ধারণাও এখন সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। বহু জায়গায় এক কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উদ্ভব এবং বিস্তারের ফলে এ বিচ্ছিন্নতা আর থাকল না। (নৃতত্ত্ববিদরা এ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন 'স্টেইট ফরম্যান'। আদিবাসী গ্রামে

এর অন্যান্য তাৎপর্য আমরা পরে আলোচনা করব।) সাম্প্রতিক গবেষণায় বাইরের জগতের সঙ্গে অন্যান্য যোগসূত্রের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যেমন কৃষি-উৎপাদনের নানা কৌশল আদিবাসীরা শিখেছে পাশাপাশি এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে। জ্যোতির্বিদ্যাবিদ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর থেকে তারা জেনেছে চাষের নানা কাজ শুরু করার সঠিক ঋতু সম্পর্কে। আদিবাসী গ্রামের অর্থনীতিতে কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি বাইরের নানা গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়। দীর্ঘদিন এক গ্রামে বাস করার ফলে তাদের সংস্কৃতির নানা দিকও আদিবাসীরা গ্রহণ করেছে।

৫। ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসীজগতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদদের এ সিদ্ধান্ত কি গ্রহণযোগ্য যে এর আগেও আদিবাসী গ্রামসংগঠনে ভাঙনের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল? এটা অনস্বীকার্য যে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আবির্ভাব এবং বিস্তার এ সংগঠনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান আসত অনিবার্যভাবে গ্রামের উদ্বৃত্ত থেকে—খানিকটা ফসলে, বা বিনা মজুরির শ্রমে, খানিকটা জমিতে। কিন্তু এর বাইরে রাজশক্তি গ্রাম-সংগঠনে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। রাজপরিবারে হিন্দু বিশ্বাস গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে, কিন্তু আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য কোনো সরকারি উদ্যম ছিল না। এটা অবশ্য মানতে হবে ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকে রাজপরিবারের এবং তাদের আশ্রিত একদল শ্রেষ্ঠী মহাজন ও ইজারাদারদের সঙ্গে আদিবাসীদের বিরোধ ক্রমেই বাড়ছিল।

আদিবাসী গ্রাম সংগঠনে গুণগত পরিবর্তন আসে ঔপনিবেশিক আমলেই। গ্রাম-পত্তনকারী পরিবার তাদের দীর্ঘদিনের অধিকার হারাল। সব ক্ষেত্রে জমি হারায়নি, কিন্তু হারিয়েছে সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা। অন্যান্য অঞ্চল থেকে চাষিদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামীণ সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত হল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নানাভাবে অরণ্য সম্পদে আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করে; গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব, রকমারি কানুন এবং অনুশাসনের ফলে আদিবাসী অর্থনীতির নানা দিক ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গ্রাম-সংগঠনের উপর চরম আঘাত আসে প্রতিটি প্রতিরোধ আন্দোলনের পর। রাষ্ট্র নির্মমভাবে বিদ্রোহীদের দমন করেছে, এবং প্রত্যক্ষভাবে বহিরাগত গোষ্ঠীদের ('দিখু') প্রশ্রয় দিয়েছে।

৬। বৈষয়িক ক্ষেত্রে এ নিরন্তর বিপর্যয়রোধের প্রয়াসের ফলে আদিবাসী সমাজে এল এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন—পুরনো সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের নতুন মনোভাব। তারা এখন বিশ্বাস করল, নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে না নির্মাণ করলে তারা পরাক্রান্ত শত্রুদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তারা বিশেষ করে নৈতিক ধারণা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে এ পুনর্নির্মাণের কথা ভেবেছে। কোনো কোনো হিন্দু বিশ্বাস এবং রীতিনীতি গ্রহণের এটাই পটভূমিকা। কিন্তু এর ফলে তারা হিন্দু হতে চায়নি বা হিন্দু হয়ে যায়নি; হিন্দু সমাজ-সংগঠনের অঙ্গও হয়ে যায়নি। 'হিন্দু' হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা গেছে, প্রধানত রাজপরিবারের লোকদের এবং গ্রামের উচ্চবিত্ত কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে।

আধুনিকতা আধুনিকতাবাদ

সৌরীন ভট্টাচার্য

অভিধা হিসেবে 'আধুনিকতা'র কোনো একটা অর্থ নেই। এর প্রয়োগক্ষেত্রও হতে পারে নানা রকম। ধর্মীয় আন্দোলন ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য ও সংস্কৃতির আরো নানা ক্ষেত্রে 'আধুনিকতা' শব্দের বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যেতে পারে। তবে এই শব্দ প্রয়োগের এক প্রধান ক্ষেত্র নিশ্চয়ই সমাজ রূপান্তর।

পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাস আলোচনায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মোটামুটি আধুনিকতার সূত্রপাত বলে ধরা হয়। ইউরোপীয় রেনেশাঁসকে অনেকেই এই আধুনিকতার প্রথম দিকচিহ্ন বলে মনে করেন। কিন্তু রেনেশাঁস ঠিক আধুনিকতার অন্তর্গত, না তার সমীপবর্তী, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার কারণ যে সব প্রধান চরিত্রলক্ষণ দিয়ে আধুনিকতাকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তার অনেক কিছুর আভাস হয়ত রেনেশাঁস পর্বে টের পাওয়া যায়, তবে তখনো সেগুলি তেমন পূর্ণ বিকশিত চেহারা অর্জন করেনি।

আধুনিকতার এক প্রধান চরিত্রলক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। সমাজের একক হিসেবে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বদলে ব্যক্তির স্বীকৃতি আধুনিকতায় উত্তরণের পথে একটি বড়ো ধাপ। প্রাগাধুনিক সমাজে ব্যক্তির বিকাশ ছিল স্বভাবত রুদ্ধ। সমাজ সংগঠনে ও সামাজিক স্বীকৃতিতে ব্যক্তির বদলে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য তখনো অবিসংবাদিত। কৌম জীবনের আচার-আচরণ ও বিধিনিষেধের মধ্য দিয়েই তখন সমাজজীবন প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হত। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত প্রয়োগের পরিসর প্রায় ছিল না বললেই চলে। এরকম অবস্থায় ব্যক্তির অধিকারের ধারণাও স্বভাবতই বিস্তার লাভ করতে পারে। মানুষ তখনো তার সমাজসত্তায় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। যুক্তিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সে-রূপান্তরে খুব জরুরি ছিল। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির বিস্তার মানুষের মনে যুক্তিবাদিতাকে আরো গ্রাহ্য করে তোলে। প্রথা প্রচলন ও শাস্ত্রবচনের পরিবর্তে এল যুক্তি তথ্য প্রমাণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আধুনিক মননের এই লক্ষণ থেকে গড়ে উঠল নতুন আদলের জ্ঞানবিজ্ঞান।

ব্যক্তির উত্তরণে আনুষঙ্গিক সহায়ক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ছিল শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শ্রম বিভাজন, সাধারণ আইনি তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রকরণ। কালে কালে এই সব মিলিয়ে নতুন যে জীবনবৃত্ত গড়ে উঠল তাকেই আধুনিক সমাজের চরিত্রলক্ষণ বলে

নির্দেশ করা হয়। এই সমাজে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজজীবনের বদলে শিল্পপ্রযুক্তিভিত্তিক নগরজীবন ক্রমশ প্রধান হয়ে ওঠে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার পর্বে পর্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর আপেক্ষিক অবস্থান ও প্রাধান্যেরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ সমাজে ছিল জমি ও ভূস্বামীর প্রাধান্য, সমাজের অন্যান্য স্তর ছিল অনেকেটাই অধস্তন অবস্থায়। আধুনিকতায় রূপান্তরের পর্বে এই শ্রেণি-অবস্থানে বড় রকমের বদল ঘটে। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব এই বদলে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। রাতারাতি কোনো একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই এত বড়ো একটা রূপান্তর সাধিত হয়নি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভূস্বামী শ্রেণির রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য খর্ব করে তার জায়গায় একদিন এল বণিক শ্রেণির প্রাধান্য এবং তারই সূত্র ধরে একদিন প্রতিষ্ঠিত হল শিল্পপুঁজির অবিসংবাদী প্রভাব। ছকটা অবশ্যই এরকম নির্দ্বন্দ্ব ছিমছাম ছিল না কখনো।

আধুনিকতার বিবর্তন পথ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে নানা বৈচিত্র্যে ভরা। আধুনিকতার সময়কালও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের। কোনও সমাজেই এই রূপান্তর খুব নিরুপদ্রব ও মসৃণ ছিল না। আধুনিকতার যাত্রাপথে দেখা দিয়েছে নানা সংকট ও সংঘর্ষ। দেশে দেশে সেখানেও আছে নানা ভিন্নতা।

আধুনিক শিল্পোন্নত পৃথিবীর ইতিহাসে উপনিবেশের বিস্তার এক প্রধান অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তির প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশসমূহে আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল পশ্চিমি অভিঘাতে। আধুনিক শিল্প, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও রেলপথ, ডাক-তার ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে যে আধুনিকতা দেখা দিচ্ছিল তার ফলে এইসব সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা ও ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি পর্যন্ত নানা টানাপোড়েনের সম্মুখীন হল। প্রথাগত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক রাজনীতির উচ্ছেদ ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে আধুনিকতার রূপান্তর পর্বে দেখা দিয়েছে বিস্তর সংঘাত ও সংঘর্ষ। আমাদের এখানকার সতীদাহ উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই সংকটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

সমাজ রূপান্তরের বিশেষ একটা পর্বকে যদি বলা হয় আধুনিক, আর, সেই পর্বের কিছু সামান্য লক্ষণকে যদি বলা হয় আধুনিকতা, তাহলে সেইসব লক্ষণকে আমরা আমাদের সমাজবয়ানে যেভাবে ব্যবহার করি, তাকে বলা যেতে পারে আধুনিকতাবাদ। আধুনিকতায় উত্তীর্ণ সমাজের লক্ষণগুলিকে যদি আমরা কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করি, তাহলে প্রাগাধুনিক সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এ গেল সময়ান্তরের ভালোমন্দের কথা। একই সময়ে আধুনিক আর অনাধুনিকের মধ্যেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট বিচারের প্রয়োগ সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় আধুনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে অনাধুনিক বা প্রাগাধুনিক প্রগতির পরিপন্থী।

আধুনিকতাবাদের এই প্রয়োগের দিকে একটা দাপটের সম্ভাবনা থেকে যায়। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট মানদণ্ডে একবার পৌঁছতে পারলে সমাজবিন্যাসে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তখন খুব স্বাভাবিক হয়ে দেখা যায়। আধুনিকতার এই প্রতিষ্ঠাপর্বে আধুনিক বা

প্রাগাধুনিকের অনেক কিছু চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। আধুনিকের নজরে আধুনিকতার সিদ্ধির সম্ভাব্য কোনও কিছু মাত্রা তখন আর স্বীকৃতি পায় না। এই জায়গা থেকে গড়ে ওঠে আধুনিকতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ ও নানা সমালোচনা। তাই আধুনিকতার সমালোচনা আধুনিকতারই সমবয়সী। এক কালের রোম্যান্টিকতাবাদ থেকে আরম্ভ করে আজকের উত্তর আধুনিকতাবাদ পর্যন্ত এই সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়ার এক বিস্তৃত ধারা বর্তমান।

আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম

সন্দীপন চক্রবর্তী

বিজ্ঞানের এক মজার আবিষ্কার হিসেবেই চলচ্চিত্রের জন্ম। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে তার ব্যবহার শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তা জনপ্রিয় ও বাজারসফল হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমে তা এক স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং পূর্বোক্ত ধারার ছবিগুলোর থেকে শিল্পিত ছবিগুলোকে আলাদা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। 'আর্ট সিনেমা' কথাটার প্রয়োগ এসেছে আমেরিকান 'আর্ট হাউস'-এর অনুসরণে; এসব আর্ট হাউসগুলোয় বিশেষভাবেই বারংবার ধ্রুপদী চলচ্চিত্রগুলো এবং সিরিয়াস ও সচেতনভাবে বুদ্ধিপ্রধান যেসব চলচ্চিত্র, সেগুলো দেখানো হত। এমনকি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডিয়া স্টাডিজ ধারাটির প্রসারের সঙ্গেও 'আর্ট সিনেমা' পরিভাষাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, আর্ট সিনেমা বলতে সেখানে মূলত বোঝানো হয় 'ফিল্মস'-কে; 'ফিল্মস' ও 'মুভিজ শব্দদুটোর মধ্যে সেখানে একধরনের গুণগত তফাৎ করা হয়— দ্বিতীয়টা এক ব্যাপক আবেদনময় বাজারি ও বাণিজ্যিক পণ্য; আর প্রথমটা স্বল্প খরচে নির্মিত, তার প্রযোজনাব্যয় কম ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে তা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তবে, এই আর্থিক বিভাজন জনপ্রিয়তার কোনো চরম মাপকাঠি নয়। তাই The Fall of the Roman Empire (১৯৬৪) বা Hello Dolly! (১৯৬৯)-র মতো বাণিজ্যিক ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়লেও, অবাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে তৈরি ফেলিনির Eight and Half (১৯৬৩) আবার বাণিজ্যিকভাবে বেশ সফল।

বাণিজ্যিক ও শিল্পিত ছবির মধ্যে পার্থক্যর নানা মাপকাটি আছে। যেমন, ইংলণ্ডে কোনো বাণিজ্যিক ছবির ডিস্ট্রিউশনের জন্য ৫০টা বা তার বেশি সংখ্যক প্রিন্ট তৈরি করা হলেও কোনো শিল্পিত ছবির বিশেষ কিছু থিয়েটারে প্রদর্শনের জন্য তৈরি হয় বড়জোর ২০টা প্রিন্ট। তাছাড়া একটি শিল্পিত প্রযোজনা ব্যয় ক্বচিৎ একটি মূলধারার ছবির মতো এত বেশি; মূলধারার ছবির মতো অত লাভও তা থেকে হয়না, আবার অত ক্ষতিও হয় না। দীর্ঘদিন ধরে কোনো ছোট সিনেমাহলে কোনো আর্ট ফিল্ম চললে তা থেকেও মোটামুটি আর্থিক সাফল্য আসে। তবে এর দর্শক পাওয়াটাই এক সমস্যা। বড় বাণিজ্যিক সিনেমাহলগুলোয় যদি অনাড়ম্বরভাবে কোনো আর্ট ফিল্ম মুক্তি পায়, সেক্ষেত্রে মোটামুটি দর্শক হয়ত পাওয়া যেতে পারে, আবার কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে সেসব সিনেমাহল আধ-ফাঁকাও যেতে পারে। আন্তোনিওনির Zabriskie point

(১৯৬৯) এভাবে MGM সিনেমায় মুক্তি পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একই অবস্থা হয়েছিল সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫)-র প্রথম প্রদর্শনের সময়ে বা ঋত্বিকের 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১)-এর। অথচ ছোটো হলগুলোয় মুক্তি পেলে এই ছবিগুলোর প্রশংসা ও আর্থিক সাফল্য দুটোই লাভ করার সম্ভাবনা থাকে, যেমন হয়েছিল মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' (১৯৬৯)-এর ক্ষেত্রে। আবার যেমন কুরোসাওয়ার Seven Samurai (১৯৫৪) জাপানে প্রভূত সাফল্য পেলেও, তা তখন সাবটাইটেলসহ বিদেশে মুক্তি পায়, তখন খুব একটা চলেনি। অথচ পরে ঐ একই গল্প নিয়ে জন স্টার্জের পরিচালনায় আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবি The Magnificent Seven (১৯৬০) মূলধারার বাণিজ্যিক ছবি হিসেবে প্রভূত সফলতা পায়।

আর্ট ফিল্ম ও মুভির মধ্যে এই পার্থক্যের ইতিহাস সংস্কৃতিগতভাবে নির্ধারিত হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই তফাতের দিকটাকে প্রথম জোরদারভাবে উস্কে দিয়েছিল ১৯১৭-র রাশিয়ান বিপ্লব, তখন র-ফিল্ম স্টকের ঘাটতির ফলেই চলচ্চিত্রবিদ্যার সিরিয়াস চর্চা শুরু হল বলা যেতে পারে। আমেরিকান ফিল্মের প্রিন্ট, যেমন গ্রিফিথের The Birth of a Nation (১৯১৫)-এর দৃশ্যগুলোকে কেটে সেগুলোকে আবার ভিন্ন ক্রমে জুড়ে এবং খাতায় কলমে শুরু হয়ে গেল চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ। এর পরপরই ফ্রান্সে শুরু হয়ে যাবে আর্ট হাউস আন্দোলন। ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে প্যারিসে স্বল্পস্থায়ী কিছু ফিল্ম ক্লাব গড়ে ওঠে— যেমন Friends of the Seventh Art বা ১৯২৪-এ চিত্রপরিচালক লুই দেল্যুকের প্রতিষ্ঠিত Cine Club। ঐ একই বছরে প্রথম নিয়মিত ফিল্ম সোসাইটি The Free Tribune of Cinema এবং ছোট্ট Vieux Colombier থিয়েটার গড়ে ওঠে, যা পরে বিশেষ ধরনের ছবি দেখানোর জন্য বিশ্বখ্যাত এক সিনেমাহল হয়ে উঠবে।

তাছাড়া শুধু বাণিজ্যিক কারণে নয়, বরং 'Art of the Film'-এর সংরক্ষণের জন্যই গড়ে ওঠে কিছু ফিল্ম আর্কাইভ। এর মধ্যে প্রথমটা ছিল ইংলণ্ডের National Film Library (পরবর্তীকালে National Film Archieve)। আর এ ধরনের সংস্থা এখন সারা পৃথিবী জুড়েই, যেমন— আমেরিকার George Eastman Hose, The Library of Congress, Museum of Modern Art, রাশিয়ার Gosfilmofond, মিশরের National Film Archieve প্রভৃতি। ভারতেও এ ধরনের আর্কাইভ গড়ে উঠেছে। এমনকি অনেক সময়ে নিজেদের দেশেও যেসব ফিল্মের প্রিন্ট আর পাওয়া যায় না, সেসব ফিল্মের সন্ধান মেলে অন্য কোনো আর্কাইভে। তাছাড়া এ ধরনের আর্কাইভগুলো টেলিভিশন কোম্পানীগুলোকেও ফিল্মের প্রিন্ট যোগান দিয়ে থাকে। সর্বোপরি, তারা ফিল্মের প্রিন্টগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে এবং বিশেষধরনের সিনেমাহলগুলোয় (যেমন— লণ্ডনের National Film Theatre, প্যারিসের Cinematheque Francaise, বার্লিনের Arsenal Kino প্রভৃতি) সেগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকেই বাংলা ভাষাতেও বিশ্লেষণমূলক চলচ্চিত্র-সমালোচনা ধারাটির শুরু হয়। *প্রবাসী, ভারতী, নাচঘর, বায়োস্কোপ, চিত্রলেখা,*

চিত্রপঞ্জী প্রভৃতি পত্রিকায় এ ধরনের লেখাগুলি প্রকাশিত হত। মূলত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাতেই এর সূত্রপাত। ১৯২৪-এ তিনি *নাচঘর* পত্রিকায় 'ফিলমের আর্ট' প্রবন্ধে লেখেন— 'ফিলমকে আর্টিস্টিক করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই গল্পের সুসমঞ্জস বিকাশ ও তার অভিনয় মনস্তত্ত্বের নিখুঁত লীলা।' এখানে আদর্শ হিসেবে ধরা হচ্ছে গ্রিফিথের চলচ্চিত্রকে, জোর দেওয়া হচ্ছে 'মানবতা' ও 'স্বাভাবিকতা'র উপর, যেখানে গল্প বলার কাজটি 'Natural chain ধরিয়া চলিবে; train of events স্বাভাবিক হইবে।' ১৯৩০-এ *চিত্রলেখা*-য় প্রকাশিত শ্রীচিত্র সেনের 'বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধেও চলচ্চিত্রকে উপন্যাসেরই এক চিত্ররূপ হিসেবে দেখা হয়েছে, তবে সেই উপন্যাসে গতিময়তা ও দৃশ্য-প্রতিমার প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। ১৯৩২-এ *চিত্রপঞ্জীর*-র বিভিন্ন প্রবন্ধেও বলা হচ্ছে এক বাস্তববাদী, ধারাবাহিক, নির্মেদ সম্পদনার কথা। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত হয় নরেন্দ্র দেবের *সিনেমা : ছায়ার মায়ার বিচিত্র রহস্য* গ্রন্থ, যেখানে রাজশেখর বসুর সহযোগিতায় তৈরি হয় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা শব্দের এক পরিভাষার তালিকা। ১৯৩৯-এ ফরিদপুরে হয় প্রথম বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সম্মিলনী। কিন্তু ব্যবসায়িক পত্রপত্রিকাগুলো ক্রমে তাদের চলচ্চিত্র সমালোচনার একটা নির্দিষ্ট চেহারা তৈরি করে নিতে লাগল, যা চলচ্চিত্রকে আলাদা কোনো শিল্পমাধ্যম হিসেবে নয়, বরং সাহিত্যের সেলুলয়েড রূপ হিসেবেই দেখতে দর্শককে অভ্যস্ত করে তোলে। কিন্তু শিল্পিত চলচ্চিত্রে তো অনেক সময়েই ঘটনার থেকে বরং ঘটনার অনুপুঙ্খ কাজ বা ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য এমনকি ঘটনাকে তুচ্ছ করে দিয়ে এক প্রবন্ধের গড়নই বড় হয়ে ওঠে। তাই তাকে বুঝতে হলে চাই—এক অন্য ধরনের চলচ্চিত্র-চর্চার পরিবেশ। ১৯৪৭ থেকে পরপর কিছু ঘটনার সূত্রে বাংলার চলচ্চিত্র-সংস্কৃতিতেও আসে এক নতুন জোয়ার।

১৯৪৭ (৫ই অক্টোবর)— ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি স্থাপন।

১৯৫০— জঁ রেনোয়ার কলকাতায় আগমন। ফিল্ম সোসাইটির সভ্যদের তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নরেশ গুহ ও সুভাষ সেনের সম্পাদনায় *চলচ্চিত্র* (প্রথম পর্যায়) সঙ্কলন প্রকাশ।

১৯৫১— পুদোভকিন ও চেরকাসভের কলকাতায় আগমন। ফিল্ম সোসাইটিতে তাঁর বক্তৃতা প্রদান।

১৯৫২— ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান।

১৯৫৫— সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র মুক্তিলাভ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শিরোপা লাভ।

১৯৫৬— ফিল্ম সোসাইটির দ্বিতীয় পর্যায়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সংস্থার সঙ্গে এই ফিল্ম সোসাইটির যোগাযোগ স্থাপন।

এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়েই বাংলায় আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্মের পার্থক্য একটা নির্দিষ্ট চেহারা তৈরি করে নিতে শুরু করে। চলচ্চিত্র-সংসদের কর্মকর্তারা যখন কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ও অতিরিক্ততা-মুক্ত বাস্তবতার সর্বাঙ্গীণ উপাদানগুলিকে

যথার্থ শিল্পিত চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞান হিসেবে নির্দেশ করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের অ-শিল্পিত চলচ্চিত্রের মানচিত্রও তৈরি করে দিতে হচ্ছিল। মূলত ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলোর মাধ্যমেই নির্দিষ্ট ও গণ্ডীবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল শিল্পিত ছবির ধর্ম। প্রধানত হলিউডের বাস্তববাদী উপস্থাপনভঙ্গি ও ইতালিয় নিও-রিয়ালিজমের বোধ থেকেই বাংলায় জেগে উঠেছিল শিল্পিত চলচ্চিত্র-বিষয়ক সেই ধারণা। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্পিত ছবির শিকড় খুঁজতে গিয়ে, সত্যজিতেরও আগে আমরা চলে যেতে পারি প্রমথেশ বড়ুয়ার চলচ্চিত্রগুলোয়। ঋত্বিক খেয়াল করেছিলেন যে, কিভাবে প্রমথেশের 'গৃহদাহ' (১৯৩৬)-এ অচলার শহর থেকে গ্রামে আসার দৃশ্যে, হাইহিল পরা দু'টো পা থেকে সরাসরি কাট করে দেখানো হয় আলতা—রাঙানো দু'টো পা, অথবা 'মুক্তি' (১৯৩৭)-তে অসাধারণ সাবজেক্টিভ ক্যামেরার ব্যবহার-এসবের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল শিল্পিত ছবির হরেক উপাদান।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, মূলধারার জনপ্রিয় ছবিতে উদ্ভাবনার দিকটি মূলত প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত। সেক্ষেত্রে, শিল্পিত ছবির স্বকীয়তা বরং অনেক বেশি এবং তার কাছে দর্শকের চাহিদাও অনেক বেশি। পশ্চিমী ছবির মধ্যে, মূলধারার জনপ্রিয় ছবি বলতে আমরা মূলত হলিউডের বাণিজ্যিক ছবিগুলোকেই বুঝে থাকি, যার আখ্যান অনেকাংশেই দলগত কাজের ফসল, যেখানে অনেক লেখক মিলে সে-আখ্যানের পরিকল্পনা—তার চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো, উত্থানপতন, নাটকীয় পরিবর্তন ও সমাপ্তি—নিখুঁতভাবে সাজায়। কিন্তু ভারতের মূলধারার জনপ্রিয় ছবিতে আবার তা হয় না, সাধারণত এক বা দু'জন মিলেই রচনা করেন আখ্যান ও সংলাপ। তবে, মোটামুটিভাবে সব জায়গাতেই, এই ধরনের ছবিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালকের থেকে বেশি নির্ভর করে প্রযোজকের উপরে। এই ছবিগুলোয়, সুসামঞ্জস্য বিকাশযুক্ত এক নিটোল ও আপাতসরল রৈখিক আখ্যানের বিন্যাসে, গুপ্ত থাকে শিল্পনির্মাণের আয়াস এবং সেই আখ্যানও হয় নেহাৎ ছকবাঁধা চরিত্রের। তবে কখনো কখনো এসব ছবির কোনো কোনো লেখক বা পরিচালক এর মধ্যেও তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি যোজনা করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও মূলত বাণিজ্যিক দিকটা মাথায় রেখেই তাকেও একভাবে ছকবন্দি করতেই হয় ঐ চলচ্চিত্রকে।

বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতায় সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, কিভাবে এইসব পরিচালক তার মধ্যেও ব্যক্তিগত এক স্বকীয় প্রকাশভঙ্গি গড়ে তোলেন, তার যথাযথ মূল্যায়ন তৎকালীন দর্শকেরা খুব একটা করতে পারেন নি। কিন্তু বর্তমান চলচ্চিত্রবিদ্যার চৌহদ্দিতে মূলধারার এসব জনপ্রিয় ছবিগুলোও শিল্পিত ছবির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন চলচ্চিত্র-গোত্রের পরিচালকদের (যেমন—হাওয়ার্ড হক্স, জোসেফ ভন স্টার্নবার্গ, আর্নস্ট লুবিৎস প্রমুখ) কাজ বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই এখন আলোচিত হচ্ছে।

আর্ট হাউসের দর্শকেরা নিজেদের দেশ ছাড়া অন্য দেশের ছবিও দেখতে ভালোবাসেন। তবে স্থানভেদে এই দর্শকদের রুচি আর চাহিদাও আলাদা আলাদা। এমনকি সেই রুচি যে সবসময় 'filmic' তাও নয়, বরং তাকে এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক

প্রেক্ষাপটে রেখেই বিচার করা উচিত; রুচির এই অনুকূলতা যে সব সময়ে নিজের দেশের ছবির দিকেই ঝুঁকবে, এমনও কোনো কথা নেই, বরং কখনো কখনো তা বিদেশী ছবির বাজার তৈরিতেও সাহায্য করে। যেমন— ইতালিয় নিও-রিয়ালিজমের একটি বিখ্যাত ছবি রোবের্তো রোসেলিনির 'Rome. Open City' (১৯৪৫) ইতালিতে এবং ১৯৪৬-এর কান ফিল্ম ফেস্টিভালেও সমালোচকদের কাছে খুব একটা প্রশংসিত হয়নি, কিন্তু তার পরপরই তা প্যারিসে মুক্তি পায় ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। আর, প্রযুক্তির নিম্নমান বা অপেশাদারদের দিয়ে অভিনয় করানো ইত্যাদি যে কারণগুলো ইতালিতে তার সমালোচনার হেতু ছিল, সেগুলোই প্যারিসে তার প্রশংসার হেতু হয়ে ওঠে। এই ছবির প্লট ক্লিশে হলেও, তার চেয়ে বরং অনেক বড় হয়ে ওঠে—এক ধরনের মেকি আড়ম্বরকে এর পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এর দানাদার ধাঁচের প্রিন্ট থেকে ফুটে ওঠে এক তাৎক্ষণিকতার তাড়না, প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে এর যোগাযোগও একধরনের প্রামাণিকতার বোধ ফুটিয়ে তোলে। আমেরিকাতেও সাফল্য পায় এই ছবি।

ইতালিয় নিও-রিয়ালিজমের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী; তা আমাদের দেশেও বিমল রায়ের মতো বাণিজ্যিক ছবির এবং সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পিত ছবির পরিচালক— উভয়কেই প্রভাবিত করে। বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩)-এ দেখি, জমিদারের অত্যাচার আর অজন্মার মধ্যে দাঁড়িয়েও এক কৃষক আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য কিভাবে মরণপণ লড়াই করে। এ বিষয়বস্তু বিশ্বজনীন, এ নিয়ে জন ফোর্ড 'The Grapes of Wrath' (১৯৪০) বা জঁ রেনোয়া 'The Southerner' (১৯৪৫) এমনকি একটু আলাদাভাবে মিজোগুচি 'Ugetsu Monogatari' (১৯৫৩) করেছেন। আর সত্যজিৎ রায় মূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন জঁ রেনোয়ার 'The River' (১৯৫৮) এবং ভিত্তেরিও দি সিকার 'Bicycle Thieves' (১৯৪৮)-র দ্বারা। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি পশ্চিমি অনুমোদনের মুখাপেক্ষী। সাফাই হিসেবে তিনি বলতেন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য ও পুরাণ—এসবের গহনে ঢুকলে অভারতীয় দর্শকদের কাছে তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। আসলে এই ধরনের শিল্পিত ছবি বিদেশে দর্শক পেলে, তার পরিচালকের বিরুদ্ধে প্রায়ই সাংস্কৃতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশী সংস্কৃতির তোষণের অভিযোগ উঠে আসে; কিন্তু বিদেশি রুচিমান দর্শকের কাছে আবেদনহীন হলেই তা কেন অধিক প্রামাণ্য হবে, সেটা ঠিক বোঝা যায় না। সত্যজিতের পর বাংলার থেকে একে একে উঠে আসেন ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের মতো বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব।

এ ধনের 'শিল্পিত' ছবির গণ্ডীর মধ্যে চলচ্চিত্রের মাস্টারপিসগুলো যেমন পড়ে, তেমনই এমন কিছু ছবিও পড়ে যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস থেকে মুছে গেছে। কিন্তু নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে রয়ে গেছে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো, ক্রমাগতই তার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক ছবিগুলোও কখনো কখনো তার বিষয়বস্তুকে নিজের উপজীব্য করে তুলছে। এরকমই এক ছবি কার্ল থিয়োডোর ড্রেয়ারের 'The Passion of Joan of Arc' (১৯২৮), যা মুক্তি পাওয়ার পর তার

সম্পর্কে লেখা হচ্ছিল 'অসম্ভব ক্লান্তিকর ছবি... এক ডলার দিয়ে দেখা কোনো আমেরিকান বাণিজ্যিক ছবিও এর চেয়ে ঢের ভালো', সেটিই পরে হয়ে উঠবে এক আর্কেটাইপাল শিল্পিত ছবি, যা বারবার ছায়া ফেলবে রোবের ব্রেসঁ-র ছবিগুলোয়, যার প্রতি জঁ লুক গোদার নির্দেশ করবেন তাঁর 'A Married Woman' (১৯৬৪)-এ।

যেসব চলচ্চিত্রের নির্মাণ, তার অন্তর্গত বোধ ও জটিলতাসহ দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়, সেসব চলচ্চিত্রকে দর্শকেরাও নতুনভাবে পড়েন এবং তা নিয়ে চর্চা করেন। এই দর্শকেরা চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং সমাজের অন্তর্গত এক বিস্তৃত নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক বিতর্কের অংশ হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। তবে সম্প্রতি ইউরোপীয় শিল্পিত ছবির উৎপাদনে বেশ মন্দা চলায় ১৯৯০-এর দশক থেকে এই দর্শকেরা ঝুঁকে পড়েছেন ভারত, ইরান, এশিয়ার অন্যান্য অংশের ও লাতিন আমেরিকার ছবির দিকে, যেখানে দৃশ্য-উপস্থাপনার আঙ্গিক সৃষ্টি হয় মতাদর্শ থেকে এবং সেই চলচ্চিত্র-আঙ্গিকও কোনো অচল অনড় বস্তু নয়, বরং তা ক্রমাগতই নতুন নতুন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

অ্যাকাডেমিক আর্ট

শোভন সোম

অ্যাকাডেমিক আর্টের অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক বিধানানুসারী এক বিশেষ শৈলীর শিল্পকলা। য়ুনানি বা গ্রিক সংস্কৃতির অন্যতম অভিব্যক্ত ছিল অকাদেমিয়া বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান। এথেন্সের সন্নিকটে গ্রিক দার্শনিক প্লাতোন বা প্লেটোকে কেন্দ্র করে ৩৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রথম তত্ত্বজ্ঞানচর্চার অ্যাকাডেমি বা আবাঁধা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

রেনেশাঁসকালে ইতালিয় ভাষায় ললিতকলা বলতে নকশা বা দিজেইঞো বোঝাত এবং এই নক্শা ধারণায় চিত্রকলা, মূর্তিকলা, কারুকলা এবং কায়িক শ্রমজাত যাবতীয় শিল্পকলা বোঝাত। শিল্পীরাও একাধারে নানাবিদ্যায় পারঙ্গম ও দক্ষ হতেন। রেনেশাঁসের শিল্পীব্যক্তিত্বের ধারণায় শিল্পকলাকে খণ্ডিত করে বা শিল্পীকে একমার্গী বিশেষায়নে সিদ্ধহস্ত মনে করা হত না। শিল্পী অর্থে বিচিত্রবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিত্ব বোঝাত। যেমন, মিকেলাঞ্জেলো ছিলেন একাধারে মূর্তিকলা, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা এবং পেত্রার্ক-উদ্ভাবিত চতুর্দশ পঙ্ক্তির কাব্যরচনায় সমানভাবে সুখ্যাত। যখন চিত্রকর হিসেবে সুবিদিত, তখনও তিনি অজুরায় গয়নার নক্শা, পদক এবং সূচিকর্মের নকশা করতেন। শিল্পকলায় যেমন চারু ও কারুকলার মধ্যে ভেদ ছিল না তেমনি কোনো শিল্পকেই উচ্চ বা নীচ মনে করা হত না। শিল্পীরা ট্রেড লাইসেন্স বা ব্যবসা করার অনুমোদন নিয়েই শিল্পচর্চা করতেন, অজুরায় কাজ করতেন এবং ট্রেড লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিল্পীকে স্থানীয় গিল্ড বা সমবায়ের সদস্য বাধ্যতামূলকভাবে হতে হত।

রেনেশাঁসকালে পুঁজির বিকাশের সঙ্গে রাজতন্ত্র, পাদ্রিতন্ত্র, এই দুই সাবেক পৃষ্ঠপোষকদের সমান্তরালে শ্রীমন্ত পুঁজিপতিরাও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। রেনেশাঁসের শিল্পীদের জীবনীকার জ্যোর্জো হ্বাসারি অকাদেমিয়া দেল দিজেইঞো নামে একটি সরকারি অ্যাকাডেমি ফ্লোরেনসে ধনাঢ্য মেদিচি পরিবারের কোসিমো নামক ডিউকের সহায়তায় ১৫৬৩-তে মিকেলাঞ্জোলো বুয়োনার্‌রোতিকে পরিচালক করে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শিল্পকলা বিষয়ে তত্ত্বচর্চা হত, শিক্ষাদানও হত। এই অ্যাকাডেমিতে রেনেশাঁসকালের প্রবণতার অনুসরণে প্রাচীন গ্রিক ও রোমক দেবপুরুষ বা উচ্চকুলোদ্ভব ধীরোদাত্ত পুরুষদের ও দেবীরূপী নারীদের অলৌকিক সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তিগুলি দেখে মানব অবয়ব অঙ্কনশিক্ষাকেই আদর্শ অঙ্কনশিক্ষা মনে করা

হত। দেবতা ও অভিজাত শ্রেণিই এবং তাঁদেরই অনুষঙ্গে অবনত দাস কখনো শিল্পকলার বিষয়ে স্থান পেত। রেনেশাঁসের শিল্পকলার প্রধান বিষয় ছিল হিস্ট্রি পেইন্টিং বা ধর্মকথা, পুরাণকথা, ইতিহাসের রূপকধর্মী রচনা। এর পরে স্থান ছিল প্রতিকৃতি চিত্রের।

ভের্সাই প্রাসাদ নির্মাণের অন্যতম কারণ ছিল ফরাসিদেশের যাবতীয় সংস্কৃতিচর্চার রাজনীতিকরণ ও কেন্দ্রায়ন। সেই লক্ষ্যে সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা ও মূর্তিকলার যাবতীয় চর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাজকীয় অকাদেমি গড়া হতে থাকে। ফরাসি দেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৪৮-এ পারিতে অকাদেমি রয়েল দ' পেঁত্তুর এৎ দ' স্কুলতুর বা রাজকীয় চিত্রকলা ও মূর্তিকলা অকাদেমি স্থাপিত হয়। ১৬৬০-এ অ্যাকাডেমি অনুমোদিত শিল্পাদর্শে ছাত্রদের তৈরি ও অনুপ্রাণিত করতে একোল্ অকাদেমিক বা এই অ্যাকাডেমির শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয় খোলা হয়। রেনেশাঁসকালীন অ্যাকাডেমির অনুসরণে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান হতে থাকে। ইতালির রোমেও এর একটি শাখা খোলা হয় এবং মেধাবী ছাত্রদের পারি থেকে বৃত্তি দিয়ে রোমে পাঠানো হতে থাকে। এই অ্যাকাডেমির বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মন্ত্রী কোলবের-এর অনুমোদনে তৈরি করেন পরিচালক শার্ল লেব্রুঁ। ইনি ছিলেন চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে সর্বাধিক কীর্তিমান চিত্রকর। তাঁর তৈরি বিধানে অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনী বা সাঁলো ছাড়া ব্যক্তিগত শিল্পকলা প্রদর্শনী নিষিদ্ধ হয়। অ্যাকাডেমির অনুমোদন ভিন্ন শিল্পীদের শিল্পচর্চা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমক বীরত্বব্যঞ্জক পুরুষমূর্তি ও দেবী নারীমূর্তি অবয়ব অঙ্কনশিক্ষার আদর্শ বিবেচিত হয়। এই ধরনের অবয়বসহ হিস্ট্রি পেইন্টিংকে সর্বোত্তম চিত্রকলা হিসেবে জ্ঞান করা হয়। প্রতিকৃতি চিত্রের স্থান ছিল তার পরে। স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ্ ইত্যাদি তথাকথিত বিষয়বর্জিত গল্পহীন চিত্রকলা বা মূর্তিকলাকে নিকৃষ্ট মনে করা হত, যেহেতু এই ধরনের শিল্পসৃষ্টি প্রজার চরিত্রগঠনে ব্যবহারযোগ্য ছিল না। এই ছিল অ্যাকাডেমিক আর্ট।

যেহেতু গ্রিস ও ইতালি থেকে পুরাণমূর্তিগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, এ কারণে বিশেষ করে ধ্রুপদী গ্রিক ও রোমক মূর্তিগুলির ছোটোমাপের প্লাস্টারে তৈরি নকল ক্লাসে ছাত্রদের অঙ্কনশিক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হত। এগুলিকে বলা হত অ্যান্টিক। ভিস্‌কোবোলোস, আফ্রোদিতি, অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার, হ্বিনাস দ' মিলো, কিছু রোমক প্রতিকৃতিকে আদর্শ অ্যান্টিক হিসেবে বিবেচনা করা হত। এইগুলি দেখে ছবি আঁকা ও মূর্তি তৈরি ছিল মানব-অবয়ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের অ্যাকাডেমি-অনুমোদিত বুনিয়াদি পাঠ। অ্যান্টিক দেখে ছাত্ররা যে সকল অনুশীলন করত, সেগুলিকে বলা হত অ্যান্টিক স্টাডি। এ ছাড়া পুরামূর্তিগুলির হাত, পা, দেহকাণ্ড ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড ছাঁচে তোলা প্রতিমূর্তি বা কাস্ট-ও অঙ্কনশিক্ষায় ব্যবহৃত হত। এইগুলি দেখে অনুশীলনকে বলা হত কাস্ট ড্রইং। এছাড়া ছাত্ররা নগ্ন গ্রিক ও রোমক পুরামূর্তি দেখে আধাআধিমাপে যে ছবি আঁকত বা মূর্তি গড়ত, তাকে বলা হত অ্যাকাডেমি ফিগার।

ফরাসি রাজকীয় অ্যাকাডেমির আদলে শাসনব্যবস্থার অনুকূলে শিল্পকলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইউরোপের প্রতিটি রাজতন্ত্রেই রাজকীয় অ্যাকাডেমি আঠারো

শতকের মধ্যেই গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় রাজতন্ত্রগুলি উনিশ শতকে তাদের উপনিবেশগুলিতে স্থাপিত আর্ট স্কুলগুলির মাধ্যমে এই অ্যাকাডেমিক আর্টকেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা ও শিল্পশিক্ষার বিকল্পহীন আদর্শ হিসেবে প্রচার করে। ক্রমে, মেধাহীন অনুকারক শিল্পকলা ও দৃষ্টজগতের স্বভাবনিষ্ঠ সাদৃশ্যকেই অ্যাকাডেমিক আর্ট হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই শিল্পকলায় এই রাজকীয় রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে শিল্পীরা সক্রিয় হতে থাকেন। উনিশ শতকের শেষে অ্যাকাডেমিক আর্ট ইউরোপে ক্ষীণপ্রভ হয়ে ওঠে। শাসনতন্ত্রও শিল্পকলায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হয়।

বিশ শতকে ইউরোপে অ্যাকাডেমির বিদ্যালয়গুলি শিল্পকলা শিক্ষার স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করে। রক্ষণশীল ইংল্যান্ডের অ্যাকাডেমির বিদ্যালয়েও শিল্পশিক্ষায় অ্যাকাডেমিক আর্টের বিধিবিধান বর্জিত হয়। বর্তমানে কয়েকটি প্রাক্তন উপনিবেশের সাবেক রক্ষণশীল শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাডেমিক আর্ট অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। ইউরোপীয় শিল্পকলায় এখন অ্যাকাডেমিক আর্ট বলতে বোঝায় অতীতের একটি বিশেষকালের শিল্পরীতির অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন অনুবর্তন ও মেধাহীন সাদৃশ্যমূলক শিল্পকলা। মৌলিকতাবিরোধী, সৃজনশীলতাবিরোধী শিল্পকলা হিসেবে এখন অ্যাকাডেমিক আর্ট নিন্দিত হলেও দীর্ঘকাল এই আদর্শেই পশ্চিমে শিল্পকলার চর্চা হয়েছে এবং বহু সুবিদিত শিল্পী এরই আদর্শে শিল্পরচনা করে গেছেন।

অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়ালিটি

দীপেন্দু চক্রবর্তী

অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়্যালিটি মূলত দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণা। বস্তুর প্রকৃত ও প্রতীয়মান অস্তিত্ব ও রূপ কীরকম, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে তা কীরকম ইত্যাকার প্রশ্নের আলোচনা ও মীসাংসা করার প্রয়াস দেখা যায় অধিবিদ্যায় (Metaphysics)। আমরা যা দেখি বা শুনি তা সত্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে। দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান পৃথকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সত্যতা যাচাই করে তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যা বাস্তব তা আদৌ রূপ রস গন্ধে প্রতিফলিত হয় কি না, বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই বস্তুর পরম লক্ষণ কি না তা নিয়ে আবার দর্শনের মধ্যেই নানান পরস্পরবিরোধী মত বর্তমান। বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ধারণায় মিশে গেছে এমন ঘটনাও কম নয়। প্লেটো থেকে প্লটিনাস, অ্যারিস্টটল থেকে আইনস্টাইন সবাই কোনো না কোনোভাবে অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়্যালিটির বিষয়টি ছুঁয়ে গেছেন। তবে এফ. এইচ. ব্রাডলি বিষয়টি নিয়ে শুধু একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচনা করেন নি, তিনি একটি বিশেষ তত্ত্বও রচনা করে গেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুপুঞ্জের আন্তঃসম্পর্ক সর্বদা অসঙ্গতিপূর্ণ, তার সঙ্গতি আসতে পারে একটি পরম সত্তা বা absolute-এর ধারণা থেকেই। এক ও বহুর ঐক্যচিন্তা আমাদের ভারতীয় দর্শনেও অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। যাঁরা ভেবে এসেছেন এ জগৎ প্রপঞ্চময় তাঁরা অ্যাপিয়ারেন্সের বাইরে স্থিতিশীল আর এক জগৎকে অনেক সময়ই না মেনে পারেন নি।

সাহিত্যে বিষয়টি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে উপস্থিত হয়েছে। এখানে অতীত বা সমকালীন দার্শনিক ধারণাটির প্রত্যক্ষ অভিঘাত কোথাও কোথাও অনুভব করা গেলেও, সমাজ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর নিজস্ব ধারণার মূল উৎস। দর্শনের বিমূর্ততা ছেড়ে সাহিত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের জগতে বিচরণ করে বলে অ্যাপিয়ারেন্সের পৃথক একটি মূল্য স্বীকৃতি পেয়ে যায়। নদী, গাছপালা, পথ ঘাট, মানুষ আমরা যেমন দেখি তার হুবহু অনুকরণে যে বাস্তববাদী সাহিত্যরীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার আঙ্গিনায় অ্যাপিয়ারেন্সই রিয়্যালিটি। আবার যে-সাহিত্যরীতি মনো-জগতের হুবহু অনুকরণেই সীমাবদ্ধ তা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবতা-বিরোধী হলেও ভিন্ন এক বাস্তবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সুররিয়্যালিজম পরিচিত বাস্তবতার ধারণাকে ত্যাগ করে লেখকের কল্পজগতের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। এ দিক থেকে

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা কখনই নির্ভরযোগ্য নয়। উত্তর-আধুনিকতা আমাদের চেনা বাস্তব জগৎটাকেই অগ্রাহ্য করতে চায়, এবং বর্তমান প্রযুক্তির দৌলতে ইলেকট্রনিক রূপকল্পকেই বাস্তবের জায়গায় বসাতে আগ্রহী। তাই বোধ হয় এ যুগের নাটকে বাস্তবের উদ্ভট ভাঙ্গাগড়ার খেলা দেখা যায়— যেমন অ্যাবসার্ড নাটকে ও ম্যাজিক রিয়্যালিজম উপন্যাসে।

সেদিনও পর্যন্ত মানবচরিত্র বলে নির্দিষ্ট একটি ধারণা যথাস্থানে ছিল। উত্তর-আধুনিকতা তার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। অবশ্য মার্কসবাদ অনেক আগেই দেখিয়েছিল মানুষের কোনো শাশ্বত চরিত্র নেই, যা আছে তা ইতিহাসের সৃষ্টি। সুতরাং দ্বন্দ্বই মানবচরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। হ্যারল্ড পিন্টারের নাটকে চরিত্রেরা নিজেরাই নিজেদের কথা ও আচরণকে উল্টে দেয়। ইবসেন তাঁর *পির গিন্ট* নাটকেও মানুষের চরিত্র বোঝার চেষ্টাকে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অর্থাৎ মানবচরিত্রের কোন পরম সত্তা নেই।

ইতালীয় নাট্যকার পিরান্দেল্লো মুখ ও মুখোশের সম্পর্ক নিয়ে শুধু নাটকই লেখেন নি, একটা তত্ত্ব খাড়া করারও চেষ্টা করেছিলেন। ভিন্ন আদলে শেকস্‌পিয়র তাঁর ভিলেনদের চরিত্র-চিত্রণে অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়্যালিটির প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। তাঁর *কিং লিয়র* নাটকটির অন্যতম বিষয় হল সত্য ও ভ্রান্তির সম্পর্কগত জটিলতা। যেহেতু মানবসমাজে প্রতারণার ঐতিহ্য বহু যুগের, তাই স্যাটায়ার থেকে ট্রাজেডি সব কিছুতেই যা দেখছি তা ভেদ করে অন্য কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার সুযোগ থেকে যায়। নাটকে-উপন্যাসে ছদ্মবেশ শুধু বিনোদনই যোগান দেয় না, দার্শনিক চিন্তাও জাগিয়ে তোলে। প্রশ্ন ওঠে, কোনটা মানুষের আসল রূপ? একটা রূপকে আসল বলে সমাজ ধরে নেয়, তাই এই দার্শনিক প্রশ্নটি আমাদের প্রাত্যহিক চেতনায় আর এগোতে পারে না। কিন্তু যদি সেই সমাজ-স্বীকৃত রূপটি নিয়েও প্রশ্ন জাগে, তবে মানুষের নিয়তি হবে আত্মপরিচয়ের সংকট বা identity crisis।

ছদ্মবেশের বিপরীতে আধুনিক উত্তর-ঔপনিবেশিক ও নারীবাদী তত্ত্বে স্টেরিওটাইপের ধারণাটিও স্মরণ করা যেতে পারে। জাতি ও লিঙ্গ সম্বন্ধে যে-ছকে বাঁধা ছবিটি আমরা অজান্তেই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে এসেছি তা তো আসলে এক ধরনের অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে নারী তার আত্মপরিচয় নির্ণয় করার তাগিদেই এই স্টেরিওটাইপকে চূর্ণ করে দিতে পারে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সাহিত্যে। প্রাচ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য যে-ধারণা চিরস্থায়ী করে রেখেছে তার দাসত্ব করেছি আমরা অজান্তেই, স্বাধীনতা পেয়েও। এই ধারণাটিও অনেকটা অ্যাপিয়ারেন্সের মতো। তবে অ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়ালিটি বললে যেন দুটি নিশ্চল ছবি বোঝায়। এদের বিকাশমান প্রক্রিয়া হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যার ফলে একটি স্টেরিওটাইপ ভেঙে আর একটি গড়া হয়ে থাকে। তখন মনে হতে পারে রিয়ালিটি বা বাস্তবতা আর যাই হোক আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, তবে সেটা আছে। অথবা বলতে হয়, রিয়াল বা বাস্তব বলে কিছু নেই, সবই ইমেজের খেলা। এ রকম অবস্থানের বিপদ হল, ভণ্ডামি ও

শয়তানির ধারণাটিই তবে লুপ্ত হয়ে যাবে। কোথাও বোধহয় একটা কিছুকে বাস্তব বলে ধরে নিতে হয়, তা না হলে মানুষ তার সীমিত বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে নিজেকেই আর খুঁজে পাবে না। কিংবা হয়ত এই খোঁজার মধ্যেই আছে 'মানুষ' নামক জীবের সার্থকতা—যেমন দেখতে পাই অরসন ওয়েলসের বিখ্যাত ছবি 'সিটিজেন কেন'-এ বা কুরোসাওয়ার ছবি 'রশোমন'-এ।

অ্যাবসার্ড

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

এই পরিভাষাটি মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ও পরবর্তীকালের এক শ্রেণির লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আভিধানিক অর্থে 'অ্যাবসার্ড' শব্দটি, আমরা সকলেই জানি, যুক্তিহীন, অসঙ্গত, নিরর্থক, সঙ্গতিহীন ইত্যাদি অর্থই প্রকাশ করে। বোধবুদ্ধিহীন বা হাস্যকর অর্থেও শব্দটি ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'দি অ্যাবসার্ড' শব্দবন্ধটি (বিশেষ্য, একবচন) যুক্তিহীন, অসঙ্গত বা সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় এমন কিছুকেই প্রকাশ করে। যেমন, Her sense of the absurd কিংবা Some of his criticisms verge on the absurd।

দি অ্যাবসার্ড বোঝাতে সেই শ্রেণির লেখক-শিল্পীদেরই বোঝানো হয় যাঁরা বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো সদুদ্দেশ্য ও তাৎপর্য খুঁজে পান নি। এজন্যেই 'অ্যাবসার্ড' ব্যাপারটা বুঝতে গেলে যাঁরা জীবন সম্পর্কে এই ধরনেরই উদ্দেশ্যহীন তাৎপর্যহীন দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্বাস করেন তাঁদের রচনার ভেতর দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু তার আগে এই দৃষ্টিভঙ্গি কেন এল, কীভাবে এল, সেটা জানা দরকার।

জীবন সম্পর্কে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কারণটি সামাজিক এবং আত্মিক নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন। উনিশ শতক থেকেই, মুক্তবুদ্ধির যুগ বা যাকে Age of Enlightenment বলা হয়ে থাকে, সেই সময় থেকেই এই বিশ্বাসহীনতার শুরু। নীট্‌শে উনিশ শতকের আটের দশক থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সময় থেকে যে-সব সামাজিক প্রগতির অনিবার্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মেছিল তা ভাঙতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্ট্যালিন একদলীয় শাসনযন্ত্রে যখন পরিণত করেন তখন থেকেই মার্ক্স-এর সমাজ-বিপ্লব রূপায়ণের স্বপ্নও ভাঙতে শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্বরতা, গণহত্যা, জাতিনাশ করে কিছুদিনের জন্যে ইউরোপের প্রভুত্ব করে হিটলার অমানবিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখলেন। মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাজেই বুদ্ধিমান সংবেদনশীল মানুষ বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে জীবনাদর্শ বলতে যা বোঝায় তাতে আস্থা হারালেন। স্থির নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ বা সমাজ ব্যবস্থার কোনো স্বপ্নই আর ধোপে টিকলো না। সমস্ত আস্থা হারিয়ে

সংবেদনশীল মানুষ ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক বিশ্বের সামনে হাজির হল। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা যদি এমন একটা ভয়ঙ্কর অর্থহীন পরিস্থিতির কল্পনা করতে চেষ্টা করি তাহলে এমন মনে হতেই পারে যে, একটি ঘরে বেশ কিছু মানুষ যে ভাষায় আলাপ করছিল সে ভাষা হঠাৎ আমাদের বোধ-বুদ্ধির বাইরে চলে গেল। যে গল্প-আড্ডায় আমরা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলেছিলাম তা হঠাৎ যেন এক অজানা ভাষার দুর্বোধ্য আলাপচারিতা বলে মনে হতে লাগল।

তাহলে এমন হতেই পারে, যে প্রচলিত ভাষায় আমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করি তা প্রচলিত অর্থই হারিয়ে ফেলল। পারস্পরিক মেলবার একটা জায়গায় এসে আমরা যে ভাষায় আবহাওয়া নিয়ে কথা বলি, প্রকাশিত নতুন কোনো বই নিয়ে বা শারীরিকভাবে ভালো-থাকা মন্দ-থাকা নিয়ে, তা হঠাৎই অর্থহীন অবান্তর হয়ে উঠতে পারে। মনে হতে পারে, আবহাওয়া নিয়ে যে কথা হচ্ছে তা নেহাতই পরস্পরের ভেতরকার শূন্যতার ব্যবধান ঘোচাবার জন্যেই কিছু বলতে হয় বলেই বলা হচ্ছে, কিংবা তেমন কিছু বলার নেই এটা গোপন করার জন্যেই বলা হচ্ছে।

শূন্যতা ভরানোর জন্যেই কিছু শব্দ উচ্চারণই যদি ভাষা হয়ে ওঠে, তাহলে অর্থহীন এই বিশ্বে প্রচুর পরিশ্রম ও আড়ম্বর করে 'দর্শন' বা 'রাজনীতি'র নামে যে-সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে তা নিছকই অর্থহীন 'বকুনি' হয় ওঠে। স্যামুয়েল বেকেট তাঁর Waiting for Godot (১৯৫২) নাটকে একটি চরিত্রের মুখে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাষাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। হ্যারল্ড পিন্টার প্রতিদিনের চলতি মুখের ভাষা হুবহু তুলে নিয়ে দেখিয়েছেন, সে ভাষায় যুক্তি ও অর্থ বলে কিছু নেই। এবং যাঁরা জীবনের উদ্দেশ্যহীনতাকে নাটকে রূপ দিয়েছেন (Theatre of the Absurd) তাঁদের বাস্তববোধ চরম বাস্তববাদের সঙ্গে মিলে যায়। যদি মানুষের বাস্তব সংলাপ তাৎপর্যহীন ও অর্থহীনই হয়ে পড়ে তাহলে যে-সব নাটকে মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ আছে সেও তো তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। আর, যে-সব নাটকে জীবনের নিরর্থকতার কথা বলা হয়েছে, সে-সব নাটকও বাস্তবেরই হুবহু প্রতিলিপি। অতএব সে-সবই তাৎপর্যহীন—অ্যাবসার্ড। আর যে জগৎ অর্থহীন তাৎপর্যহীন, সেই জগতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে অ্যাবসার্ড-সাহিত্যও বোধহয় বাস্তবের ঘনিষ্ঠতম ব্যাখ্যা।

আর যে সাম্প্রতিক দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা স্বভাবতই ভাষায় প্রকাশিত বলে ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অ্যাবসার্ড সাহিত্য-বিশেষ করে অ্যাবসার্ড নাটক—এতকাল সেই ব্যাকরণের যুক্তি-শৃঙ্খলা মেনে-চলা ভাষাকে মুক্ত করে দিতে চায়। অর্থাৎ মুক্ত ভাষাই বাস্তবতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলে মনে হতে থাকে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে অ্যাবসার্ড নাটক ও সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হাইডেগার, সার্ত্র এবং কাম্যু-র অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাদৃশ্য আছে। মূলত আলবেয়র কাম্যু-র বিখ্যাত আলোচনার বই *The Myth of Sisyphus* (১৯৪২)-এর মধ্যেই মানুষের মৌলিক অবস্থানটিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে 'অ্যাবসার্ড' শব্দটিকে প্রথম বিশেষ পারিভাষিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যে জীবনকে মানুষ তাৎপর্যময় হিসেবে দেখতে চায়, খুঁজতে চায়, সে জীবন যে কখন

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে তা সে কখনোই জানে না। তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কাম্যু এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য অনেক লেখকই জীবনকে একেবারেই নিরর্থক বা যুক্তিহীন বলেই মনে করতে লাগলেন। *দি স্ট্রেন্জার* নামে একটি উপন্যাসে কাম্যু দেখালেন একটি মানুষ তার মায়ের মৃত্যুতে কান্নাকাটি না করার জন্যেই শাস্তি পেতে পারেন। আসলে সেই মানুষটি একজন আরবদেশীয় মানুষকে গুলি করে মারবার জন্যেই দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু জুরিরা তাকে গিলোটিনে পাঠাচ্ছে এই দোষের জন্যে ততোটা নয়, যতটা তার মা-র মৃত্যুতে নির্বিকার থাকার জন্যে। এই উপন্যাসটির আগেকার অন্তত দুটি রচনায় কাম্যু তাঁর উত্তর আফ্রিকার (আলজিয়ার্সের) জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। উত্তর আফ্রিকাতেই তাঁর জন্ম, ওখানেই তিনি বড় হয়েছেন। ফ্রান্সে নাৎসিরা যখন আধিপত্য বিস্তার করে তখন সেখানকার নাৎসি সৈন্যদের খেয়ালখুশির ওপরেই ফরাসিদের বীভৎস ও অনিশ্চিত জীবন কেটেছে। স্বভাবতই এই অত্যাচার কাম্যুকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে জীবনকে নিছক অস্তিত্বসর্বস্ব বলে মনে না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে জীবন যে একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়বে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। জীবনের ওপর এইরকম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কারণ নিশ্চয় আছে। তাই বলে এমন নৈরাশ্যময় জীবনবাদ কখনোই স্বাভাবিক নয়। কাম্যুর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে, কিন্তু কাম্যুর তীক্ষ্ণ সংযত নাটকীয় রচনাভঙ্গির মধ্যে মানবিক সমস্যা-বিশ্লেষণের যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। পরিতৃপ্ত বা নিশ্চিন্ত জীবনদৃষ্টির বিরুদ্ধে কাম্যুর রচনা যেন চ্যালেঞ্জের মতোই মানবিক বিপর্যয়ের দিকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়।

অ্যাবসার্ড শব্দটির নানা অর্থ ব্যঞ্জনার মধ্যে একটা অর্থ হল বোধবুদ্ধিহীন বা হাস্যকর কোনো কিছু, একথা তো আগেই বলেছি। অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট জগৎকে বোঝাতে গিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের ঠাট্টা-রসিকতা-মজারও আশ্রয় নিয়েছেন। স্যামুয়েল বেকেট-এর Waiting for Godot-তে এই ধরনের উদ্ভট প্রথাযুক্ত ভাষা ও মঞ্চ (মঞ্চও নিশ্চয় প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পড়ে। থিয়েটারে মঞ্চও থিয়েটারের ভাষারই অঙ্গ) ব্যবহার করেছেন। দ্বৈত ভূমিকাও আছে। যেমন, বিদূষক ও ভবঘুরে, প্রভু ও ভৃত্য, দণ্ডদাতা ও আসামী। মঞ্চ একেবারে নির্মম শূন্য, স্থান-কালের কোনো চিহ্নই নেই। নাটকীয় কোনো উত্তেজক ঘটনাও নেই। সংলাপে প্রায় একই কথা পুনরাবৃত্ত হয়। কখনো তা অসংলগ্ন ও বৈপরীত্যময়। এই উদ্ভট অর্থহীন বিশ্বকে কোনো তাৎপর্যে ধরা যায় না বলেই এমন প্রথাগত বিন্যাসের বাইরে ভাষাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। নাটকটির মূল বিষয় হল শুধুই 'অপেক্ষা'— Waiting। কিন্তু নাটকের দুটি ভবঘুরে যে কেন অপেক্ষা করছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। যদিও নাটকে এই 'অপেক্ষা'-র যথেষ্ট বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার প্ররোচনা থেকেই গেছে। বেকেট নিজে যদিও তাঁর রচনায় এই নিরর্থকতার ব্যাখ্যা দিতে স্পষ্টতই অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন তবু তাঁর একটা কথা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : 'Godot is life—aimless, but always with

an element of hope'। এই মন্তব্য থেকে এই কথাটি স্পষ্ট যে, অ্যাবসার্ডবাদীদের অন্তত কেউ কেউ উদ্দেশ্যহীন জীবনে মানুষের দুর্মর আশা-ই যে জীবনরসের রহস্য তা অস্বীকার করতে পারেন না।

দি অ্যাবসার্ড সঠিক অর্থে কোনো সাহিত্যিক 'আন্দোলন' নয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বিপর্যস্ত পৃথিবীতে জীবনের প্রতি অনীহা ও বিতৃষ্ণার এক অবধারিত শিল্প-পরিণতি। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বহু নাট্যকার, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক জীবন সম্পর্কে এই রকম একটা নিরর্থকতার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষ করে গ্রিস ও রোমের সাহিত্যে, মূকাভিনয়ে অঙ্গ-ভঙ্গির প্রকাশে, বিদূষকের ঠাট্টাতামাসার মাধ্যমে (miming and clowning) সামাজিক মানুষের ছদ্মবেশ খসিয়ে নিরর্থকতার একটা তাৎপর্য আনার চেষ্টা ছিল। ইতালির নবজাগরণের যুগের পেশাদারি কৌতুকনাট্যের মধ্যে কিংবা ইংল্যাণ্ডের প্যান্টোমাইম বা মিউজিক হল-জাতীয় থিয়েটারের মধ্যেও কখনো কখনো এমন নিরর্থকতার অনুভব ঠাট্টা-তামাসার মধ্য দিয়েও এসেছে। প্রায় সমকালীন নন্‌সেন্স বা উদ্ভটরসের কাব্য, গ্রিস ও রোমের স্বপ্ন ও আতঙ্কময় সাহিত্য, মধ্যযুগের নীতিকথামূলক নাটকের মতো রূপক কিংবা প্রতীকী তাৎপর্যের রচনা, ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক স্প্যানিশ নাটক। প্রচলিত নাট্যধারায় ভাঁড় কিংবা উন্মাদের সংলাপ (শেক্‌সপিয়রের নাটকে যার প্রতিফলন দেখি) ইত্যাদি অ্যাবসার্ডবাদীদের রচনার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। জাঁ জেনে-র অ্যাবসার্ড নাটকে তো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আদিরূপটিই ফুটে উঠেছে কাব্যময় প্রতীকী তাৎপর্যে। চলচ্চিত্রের জগতে চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টন কিটন, ম্যাক্‌স্ ভাইয়েরা এমনকি লরেল ও হার্ডির কৌতুক অবশ্যই অ্যাবসার্ড-সাহিত্যে, বিশেষ করে নাটকে প্রভাব ফেলেছে।

মোটকথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল থেকেই চরম মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও নানা দেশের লেখকেরা নির্মম কঠোর বিভ্রান্তিকর এক জগৎকে তাঁদের রচনায় এঁকেছেন। এঁদের অনেকের রচনাতেই ফ্যানট্যাসি বা স্বপ্ন কল্পনার বাহুল্য আছে, তবু সে-সবই ভীষণ রকমের বাস্তব। কারণ সে-সব রচনা ভয়, হতাশা, একাকিত্বের মতো মানসিক অবস্থাকেই ফুটিয়ে তোলে। বাইরের জগতের বাস্তবতার হুবহু প্রতিলিপির যে চেষ্টা আমরা রিয়্যালিজ্‌ম্-এ দেখেছি তার চেয়ে আইওনেস্কোর 'আমেদি' (Amédée)-র বীভৎস উদ্ভট ইমেজারি বা প্রতিমাগুলো অনেক বেশি বাস্তব। কেননা সে ছবিগুলো অনেক বেশি অবচেতনের মনস্তত্ত্বসম্মত বাস্তব, অন্তর্লীন বাস্তব। কিন্তু তাই বলে চরম হতাশার রচনা হিসেবে এই সব সৃষ্টিকে ছোটো করা যাবে না। কারণ, অ্যাবসার্ডবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে দেয়, অস্তিত্বের এই রহস্যময় জগতে 'সহজ সমাধান' বলে কিছু নেই। জীবনের এই রহস্যময় হেঁয়ালিকে হতাশার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে দায়িত্ব বোধ ও মর্যাদার সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে। জীবনে সান্ত্বনা পাবার মতো কোনো সূত্র নেই, সহজ সমাধান বলেও কিছু নেই,— এই ভাবনা থেকে শেষপর্যন্ত অ্যাবসার্ডবাদ এক ধরনের মুক্তি ও স্বস্তিই নিয়ে আসে।

অ্যালিয়েনেশন

প্রদীপ বসু

দর্শনের ঐতিহাসিকদের মতে পশ্চিমে বিচ্ছিন্নতা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বেশ প্রাচীনকাল থেকেই। প্লোটিনাস, অগাস্টিন ও লুথারীয় ধর্মতত্ত্বে বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গটি এসেছে ঈশ্বর ও জাগতিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে। এখানে বিচ্ছিন্নতাকে বিচার করা হয়েছে এক ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে। অষ্টাদশ শতকে, বিশেষত হেগেল ও ফয়েরবাখের আলোচনায়, বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত তত্ত্ব এক সেকুলার চেহারা পায়। বিচ্ছিন্নতা হেগেলের কাছে বিভক্তির একটি পর্যায়, যা পরবর্তী পর্যায় সমন্বয়ের মাধ্যমে এক অন্য একক প্রস্তুত করে। হেগেলের এই আলোচনা যদিও অনেকাংশেই মৌলিক তবুও তিনি তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য ঋণী ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের কাছে, যেমন রুশো, ফিখ্‌তে বা শিলার। রুশো লিখেছিলেন সামাজিক চুক্তি ব্যক্তিকে সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে, ফলে এই বিচ্ছিন্নতা। রুশো প্রাকৃতিক মানুষ ও সামাজিক মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য টেনেছেন তার সঙ্গে হেগেলের অ-বিচ্ছিন্ন (non-alienated) মানুষ ও আত্ম-বিচ্ছিন্ন (self-alienated) মানুষ তুলনীয়। ফিখ্‌তে তাঁর দর্শনে দেখাতে চেষ্টা করেন যে মানুষ অবভাসিক জগৎকে নির্মাণ করে এক ধরনের বহিঃকরণ (externalization) বা আত্ম-বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে। অন্যদিকে শিলার বিচ্ছিন্নতাকে দেখেছিলেন সাংস্কৃতিক অগ্রগতির এক অন্তর্ভ ফল হিসেবে, যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজাত ঐক্যকে খণ্ডিত করে দিয়েছে এবং তাঁর মতে (হেগেলের মতে নয়) শিল্পই এই সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু আসল কথা হল বিচ্ছিন্নতাবিষয়ক দর্শনের প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রপাত কিন্তু হেগেল থেকেই। হেগেল তাঁর প্রথম দিকের লেখা থেকেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন তাঁর *ফেনোমেনোলজি অফ মাইন্ড* (১৮০৭) গ্রন্থে। পরে অবশ্য হেগেল এই প্রসঙ্গে আর সেরকম ভাবে ফিরে আসেননি, কিন্তু তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের মাধ্যমেই। এক মৌলিক অর্থে হেগেলের দর্শনে আত্ম-বিচ্ছিন্নতার ধারণা প্রয়োগ করা হয়েছে পরম (absolute), পরম মনের (absolute mind) উপর, হেগেলীয় দর্শনে যা হল একমাত্র বাস্তব। এই গতিশীল পরম মন সব সময়ই এক বিচ্ছিন্নতামুখী ও বিচ্ছিন্নতাবিরোধী প্রক্রিয়ায় আবর্তিত। পরম নিজেই নিজের থেকে

প্রাকৃতিক জগতে বিচ্ছিন্ন। পরম ধারণার (absolute idea) এই হল আত্ম-বিচ্ছিন্ন রূপ এবং এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতার পর্যায় থেকে সে প্রত্যাবর্তন করে সসীম মনে (finite mind) বা মানুষে (যে মানুষ ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরম হয়ে উঠবে)। আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ও তাকে অতিক্রম করা তাই পরমের সত্তাস্বরূপ। অন্য এক অর্থে এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতা সসীম মন বা মানুষের উপরও প্রযোজ্য। কারণ যতক্ষণ অবধি মানুষ এক প্রাকৃতিক সত্তা, সে আত্ম-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যখন সে ঐতিহাসিক সত্তা, পরম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম (যার অন্য মানে হল নিজের ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানও), সে নিজের আত্ম-বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতেও সক্ষম। এইভাবে সসীম মন পরমের দিকে তার নির্দেশিত যাত্রা সম্পূর্ণ করে। সুতরাং মানুষের মূল গঠনেও সেই আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ও তার সমন্বয়ের প্রক্রিয়া দেখতে পাই। তৃতীয় এক অর্থেও হেগেলীয় দর্শনে মানুষের বিচ্ছিন্নতা আলোচিত হয়েছে। মানুষ বা সসীম মনের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল বস্তু উৎপাদন করা, নিজেকে বস্তুর মাধ্যমে অভিব্যক্ত করা। এই সব বস্তুর মাধ্যমে মানুষ নিজেই বস্তু হয়ে উঠে এবং এই প্রক্রিয়ায় নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

হেগেলের সমালোচনা করে পয়েরবাখ বলেছিলেন মানুষ আত্ম-বিচ্ছিন্ন পরমাত্মা নয় বরং পরমাত্মা হল আত্ম-বিচ্ছিন্ন মানুষ। এই পরমাত্মা মানুষের সত্তাসারের এক বিমূর্ত এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এক চরম রূপ। মানুষ নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে, তাকে নিজের মাথার উপর বসিয়ে, তার মহত্তর গুণ আরোপ করে নিজেই তার দাস হয়ে পড়ে। ফয়েরবাখের মত ছিল, মানুষের এই বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরকে বিলোপ করেই মানুষ এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে পারবে। মার্ক্স নিজে ফয়েরবাখের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন পয়েরবাখ বর্ণিত ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা মানুষের নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতার একটি বিশেষ রূপ। কারণ বৌদ্ধিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সব স্তরেই মানুষ নিজের সৃষ্ট শিল্প, দর্শন, রাষ্ট্র, আইন, পণ্য পুঁজি থেকে বিচ্ছিন্ন। মার্ক্সের মতে বিভিন্ন উপায়ে মানুষ তার নিজের কাজকর্মের মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং বস্তুসমূহকে নিয়ে এমন এক স্বাধীন, পৃথক, শক্তিশালী জগৎ সৃষ্টি করে যেখানে সে নিজে এক শক্তিহীন, পরাধীন দাস। বস্তুত মানুষ শুধু নিজের উৎপাদিত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যে কাজকর্মের মাধ্যমে সে এগুলি উৎপাদন করে, বিচ্ছিন্ন সেই কাজকর্ম থেকেও, যে প্রকৃতি ও জগতে সে বাস করে সেখান থেকে যেমন সে বিচ্ছিন্ন, সেইরকম সে বিচ্ছিন্ন অন্য মানুষ থেকেও। এই সব রকম বিচ্ছিন্নতাই মানুষের আত্ম-বিচ্ছিন্নতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, মানুষের মানবিক সত্তাসার বা 'প্রকৃতি' থেকে এই বিচ্ছিন্নতা তার মানবিকতা থেকেও।

তিরিশের দশকে মার্ক্সের *ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিকাল ম্যানস্ক্রিপ্ট্স্ অফ ১৮৪৪* যখন প্রকাশিত হয় তখনই আবার বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি আসে, মার্ক্সের এই রচনা নিয়ে বাদানুবাদও কম হয়নি। মার্ক্স তাঁর বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বে জোর দিয়েছিলেন মানুষের বিচ্ছিন্ন শ্রমের উপর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে শ্রমের উপর তার কোনো অধিকার নেই। এই বিচ্ছিন্ন শ্রম এমন জগৎ সৃষ্টি করে যেখানে প্রকৃত উৎপাদক নিজেকে আর চিনতে পারে

না। মার্ক্সীয় তত্ত্বে ততই বিচ্ছিন্নতার মূল সূত্রগুলি লুকিয়ে আছে আধুনিক সমাজে শ্রমের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ম্যানস্‌ক্রিপ্ট্‌স্‌ প্রকাশিত হবার পর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের হার্বার্ট মারকিউজ, এরিক ফ্রম প্রভৃতি মার্ক্সের দর্শনে বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যুদ্ধের পর এ সম্পর্কে আরো ব্যাপক ও তীব্র আলোচনা আরম্ভ হয়, শুধুমাত্র মার্ক্সবাদীদের মধ্যে নয়, অন্য দার্শনিকদের মধ্যেও। হাইডেগার তার *বিইঙ্গ অ্যান্ড টাইম* (১৯২৭) গ্রন্থে মানবিক সত্তার বিচ্ছিন্নতার যে আলোচনা করেছিলেন, ১৯৪৭-এ পুনরায় সেই বিচ্ছিন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সার্ত্র প্রমুখ অস্তিত্ববাদীদের রচনায় বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। সাম্প্রতিককালে ল্যুই অ্যালথ্যুসার তাঁর *ফর মার্ক্স* (১৯৬৫) গ্রন্থে মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের এক শক্তিশালী সমালোচনা করেছেন। আলথ্যুসার দাবি করেছেন যে যুবক মার্ক্সের রচনায় বিচ্ছিন্নতা ছিল এক আধিবিদ্যক (Metephysical) ধারণা, যা মার্ক্স পরবর্তী সময়ে বাতিল করেছিলেন।

বিচ্ছিন্নতা বিষয়টি জাক লাঁকা আবার ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর মনোবিশ্লেষণিক রচনায়, বিশেষত *এক্রিট্‌স* (১৯৬৬) গ্রন্থে তাঁর শিশুদের বিকাশে প্রতিবিম্ব (mirror stage) আলোচনায়। এই স্তরে শিশুর সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিকের একটি প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিন্তু তার শরীরকে খণ্ডিত করে। লাঁকার এই তত্ত্বের সঙ্গে হেগেল বর্ণিত খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মিল আছে, লাঁকা নিজেও হেগেল দ্বারা প্রভাবিত। লাঁকা মনে করেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে গভীর কারণগুলি লুকিয়ে আছে।

ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরায় বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব হিসাবে বিশেষ আলোচিত হয়নি, তবে এর জন্য এই পরম্পরাকে নিকৃষ্ট ভাববার কোনো কারণ নেই। কেন আলোচিত হয়নি তার জন্য বিচার্য ভারতীয় দর্শনের ডিসকোর্স। তবে একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে পশ্চিমে উত্তর-দেকার্তীয় চিন্তায় ও দর্শনে সেলফ্‌ (self) ও সাবজেক্ট-এর যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে ঐ সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণার কোনও মিল নেই।

অ্যালিগরি

অভীক মজুমদার

জীবনের শেষ প্রান্তে *লা দিভিনা কোম্‌মেদিআ* প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে দান্তে জানান—'একথা বোঝা উচিত যে এই রচনার অর্থ কেবল এরকম নয় : বরং এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে, প্রথম অর্থ সঞ্চারিত হয় অক্ষর-শব্দ ভিত্তি করে, তার পরের অর্থ নির্ধারিত হয় অক্ষর-শব্দের তাৎপর্য অনুযায়ী; প্রথমটিকে যদি বলি অভিধাত্মক তাহলে দ্বিতীয়টিকে বলে রূপকাশ্রিত.... সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অবস্থা।... যদি রূপকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ রচনায় ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে এর বিষয়—মানুষ, যে তার স্বাধীন চেতনার অনুশীলনের ত্রুটি-নির্ভুলতা অনুযায়ী বিচারের নিক্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার পায়।'

এ চিঠি সত্যিই দান্তের লেখা কিনা সে বিষয়ে অবশ্য পণ্ডিত মহলে তর্ক আছে, কিন্তু দুই আলাদা মাত্রার অর্থ কীভাবে অভিধাকে ছাড়িয়ে রূপককে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে সেই প্রেক্ষিতে চিঠিটি বেশ প্রাঞ্জল বক্তব্য তুলে ধরে। বাংলা অলঙ্কারে 'রূপক' বেশ পরিচিত নাম। এর মূল অবশ্য রয়েছে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে। অলঙ্কার হিসেবে রূপকের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [*নাট্যশাস্ত্র* ১৬/৪১] আলঙ্কারিকদের মতে রূপকে ঘটে রূপের আরোপ। মূলগতভাবে ধারণাটি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যে অভিন্ন। পরিভাষা অনুযায়ী বলা চলে দুই বস্তুর অভেদ কল্পনা, যেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন প্রথম বস্তু বা তার অর্থ বা তাৎপর্য বেশ গৌণ হয়ে যায়।

রূপকের উৎস অবশ্য সাহিত্য নয়, এর প্রাথমিক ক্ষেত্র দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদ। ধর্মীয় ক্ষেত্র জুড়ে রূপকের ব্যবহার আদিকাল থেকে চোখে পড়ে। সূত্রপাত যুগ থেকেই রূপক খুব ওতপ্রোত যুক্ত ছিল আখ্যানের সঙ্গে। পুরাণ কাহিনি সর্বদাই রূপকের আকর হিসেবে চিহ্নিত। আখ্যানরূপকের দুই উপশাখা, উপরূপক (Parable) এবং কথারূপক (Fable)। *রামকৃষ্ণ কথামৃত*-এ আমরা বেশ কিছু উপরূপকের সন্ধান পাই। নিউ টেস্টামেন্টে নবঘটিত এবং পরিস্থিতিগত উপরূপকের বহু নিদর্শন রয়েছে। কথারূপকের উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে আমাদের *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ*, এবং গ্রিক সাহিত্যে ইশপের কাহিনিগুলিতে। আখ্যানরূপক হিসেবে সংস্কৃতে *বিচার চন্দ্রোদয়* নাটক এবং ইংরেজিতে *ফেয়ারী কুইন* কিংবা *পিলগ্রিমস প্রগ্রেস* প্রসিদ্ধ। বাংলা আখ্যান রূপক হিসেবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আশাকানন* উল্লেখযোগ্য। পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় আখ্যান রূপকে আখ্যান বস্তুটি উপমান আর উহ্য গূঢ়ার্থ বা উপমেয় (যা প্রকৃত)

থাকে পাঠকের উপলব্ধির প্রত্যাশা নিয়ে। অর্থাৎ আখ্যান রূপকে কাহিনি নিজস্ব অর্থ নিয়ে উপস্থিত, যদিও তার আসল মাত্রা রূপকের অভ্যন্তরীণ-ব্যবহার উন্মোচনে।

আধুনিককালে বহু ক্ষেত্রেই রূপক-আখ্যান আর ব্যঙ্গাত্মক কাহিনির (Satire) নিবিড় সম্পর্ক। যেমন ধরা যাক সুইফটের *গালিভার্স ট্রাভেলস*। পিগমিদের দ্বীপ, দৈত্যদের আস্তানা, উড়ন্ত দ্বীপ বা যুক্তিবাদী ঘোড়াদের দ্বীপ আসলে এই 'রণ-রক্ত-সফলতা' নিয়ে ব্যতিব্যস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের অবস্থা এবং পরিস্থিতির রূপক হয়ে উঠে। ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসেও রূপকের অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট।

নিউ টেস্টামেন্টে ভাবা হয়েছিল ঈশ্বর, যিনি এই জগৎ পারাবারের স্রষ্টা তিনি সর্জনেও রূপকমাত্রা বিষয়ে সচেতন। অর্থাৎ, এই সম্পূর্ণ বিশ্বসংসার সর্বদাই দুই ভিন্ন কোটির অর্থ বহন এবং প্রকাশ করে চলেছে। চতুর্দিকের সমস্ত বস্তু, প্রকৃতি, নদ-নদী, মানুষ, সংখ্যা, ঘটমানতা, নক্ষত্র-চাঁদ-সূর্য,—কালপুরুষের তরবারির মতো সদাসর্বদা রূপকার্থ নিয়ে দণ্ডায়মান। ফলে, সেসব রূপকের গূঢ়ার্থকে মন দিয়ে অন্বেষণ আর উপলব্ধি করে চলতে হবে। এর ফলে ইতিহাস, ঋতুচক্র, পাখিদের আচরণ, বজ্রপাত, আত্মীয়বিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই রূপক হিসেবে প্রতীয়মান হত। এই রূপক-কল্পের অতিব্যাপ্তি হয়তো খুব অভিপ্রেত নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে সদাসর্বদা রূপক অন্বেষণের ঝোঁক বর্জন করাই বোধহয় ভালো। রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে সদাসর্বদা 'রূপক' অন্বেষণ যেমন তার বাস্তবলগ্ন স্পষ্টতাকে আচ্ছন্ন করে এক জীবননিচ্ছিন্ন পাঠে পর্যবসিত করে।

ইকো ফেমিনিজম

শেফালী মৈত্র

এটি একটি বিশেষ নারীবাদী মতবাদ। এই মতাদর্শ দেখায় নিসর্গনীতি ও নারীবাদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ, যেহেতু মানুষ ও নিসর্গের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্কের মূলে রয়েছে স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য ও অবদমনের রচয়িতা পুরুষতন্ত্র। এই তন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়াটির প্রথমে একটি আদর্শ পুরুষ যে গুণে-সমন্বিত, নারী প্রতিরূপে ঠিক তার বিপরীত গুণাবলি সন্নিবিষ্ট। এই নির্মিত প্রতিরূপগুলি হল নারী ও পুরুষের লিঙ্গ ধর্ম। যেমন, মনে করা হয় পুরুষ হবে নির্ভীক, যুক্তিপ্রবণ আর নারী হবে প্রেম, মমতা ও সংবেগের প্রতিমূর্তি। তথাকথিত পুরুষোচিত গুণগুলিকে পুরুষতন্ত্রে প্রাধান্য দেওয়া হল বলে যে গুণ পুরুষোচিত নয় তাকে হেয় জ্ঞান করা হয়। পুরুষ ও নারীর পরিচয় লিঙ্গ-সাপেক্ষে দেওয়া হলেও মানুষ বা হিউম্যানের কল্পনা কিন্তু নির্মাণ-নিরপেক্ষ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হয়। নারী নিসর্গনীতিবাদীরা অর্থাৎ ইকোফেমিনিস্টরা মনে করেন এমন কোনো লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হিউম্যানের ধারণা ছলনা মাত্র। কারণ কোনো অস্তিত্বই ইতিহাস-অনপেক্ষ নয়। পিতৃতন্ত্রে পুরুষের জানাটাই হয়ে যায় মানুষের জানা। মানুষের নির্মিত ধর্ম ও পুরুষের নির্মিত ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় আদর্শ মানুষ হতে গেলে পুরুষের তুলনায় নারীকে ঢের বেশি উদ্যোগ নিতে হয়। নারী অবদমনের এটাই সূত্রপাত। পুরুষতন্ত্রের বিচার 'প্রভেদ' আর 'বিভেদ' সমার্থক হয়ে যায়—বৈষম্যবিহীন প্রভেদ করতে এই তন্ত্র জানে না। নারী পুরুষে প্রভেদ তো আছেই, যেমন আছে, শাদা-কালোয় বা মানুষ-প্রকৃতিতে। তার মানে এই নয় যে এই জোটগুলি বি-সম। এমন নয় যে নারী, কালো ও প্রকৃতি যথাক্রমে পুরুষ শাদা ও মানুষ অপেক্ষা হীন। পুরুষতন্ত্র কিন্তু এমন বিচারই আমাদের শেখায়। পাশাপাশি এই তন্ত্র দাবি করে যে প্রতিটি বিচারে একটি উচ্চার বা অনুচ্চার ইতিহাস-অনপেক্ষ স্বীকার্য থাকে। এই ক্ষেত্রে যেমন দাবি করা হয় যে 'মানুষ'-এর ধারণাটি একটি অনপেক্ষ ধারণা। নারীবাদীরা মনে করেন কোনো জুটির একটি পক্ষ দুর্বল হলেও অপরপক্ষের তাকে পরিচালনা করার বা শাসন করার অধিকার জন্মায় না। ক্ষমতার বলে এমন কৃত্রিম বৈষম্য আরোপিত হয়। প্রভেদ-জ্ঞাপন জুটির প্রতি বি-সম আচরণ একজাতীয় রাজনীতির ফসল যা পুরুষতন্ত্রের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-রাজনীতির রূপ নেয়।

অনুষঙ্গ-সাপেক্ষতা সর্বদাই আবশ্যিকভাবে অনেকান্ত আর অনুষঙ্গ-অনপেক্ষতা অ্যাবসোলিউট বা আত্যন্তিকতার সমতুল্য। নারীনিসর্গনীতিবাদীরা অনুষঙ্গ-অনপেক্ষতার দাবিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করেন, এটি নিছক একটি কৌশল যার জোরে শেষ উত্তর দেওয়ার তাত্ত্বিক অনুমোদন পাওয়া যায়। আসলে সব জ্ঞানই প্রেক্ষাপট-নির্ভর। কোনো জ্ঞানকে আত্যন্তিক বলার অর্থই হল জ্ঞানসঞ্জাত আধিপত্যকে প্রশস্ত করা—জ্ঞানকেই তখন ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়।

পিতৃতন্ত্রে নীতি ও রাজনীতি উভয় কোটিকে বেষ্টন করে একটা অবদমনের প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। ফলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ হয়ে দাঁড়ায় নৈতিক এবং রাজনৈতিক দুই-ই। নারী নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন মানুষ ও নিসর্গের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যা যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'নিসর্গ-রাজনীতি জিজ্ঞাসা' বা 'ইকোপলিটিক্স'— নারী, পুরুষ ও নিসর্গের মধ্যে চলেছে একটা ক্ষমতার লড়াই।

নারী, পুরুষ ও নিসর্গের প্রভেদ সুস্পষ্ট নয়, তবুও যে এদের একটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায় তার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব যা কিনা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সমর্থন-পুষ্ট। এই ধারণা অনুযায়ী সম্পূর্ণ মানসিক স্বনির্ভরতা অর্জন না-করা অবধি মানুষ সাবালক হয় না—সাবালক হওয়ার অর্থ স্বকীয়তা ও পরকীয়তার ভেদ স্পষ্ট করে বোঝা। প্রতিটি মানুষের একটি মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আছে যেখান থেকে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব—প্রতিবেশী ও প্রতিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাহ্যিক। নারীনিসর্গনীতিবাদীরা আপত্তি করেন যে প্রতিটি ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তি ও নিসর্গের সঙ্গে নানা আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সাবালক হয়। এই সম্পর্কগুলি ব্যক্তিসত্তা নির্মাণের অন্যতম উপাদান। এমন বলা যাবে না যে 'স্ব' এবং 'অপর' বা 'সেলফ' এবং 'আদার' পরস্পর বিযুক্ত; বলতে হবে এই দুই সত্তা যুক্ত যদিচ প্রভেদ বিদ্যমান। যার ফলে একটা সম্পর্কের ভেতরে থেকেও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, এর জন্য সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। পুরুষতান্ত্রিক নিসর্গবাদীরা মনে করেন যে মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক এমন যে ব্যক্তি নিজের কথা ভাবলে অপরের কথা ভাবতে পারে না। তাই দুই ভাবনার মধ্যে দোলাচল সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ কখনো স্বার্থের কথা ভাবে আবার কখন দরদ দেখায়, অথবা স্বার্থের প্রেক্ষিতে দরদ দেখায়। প্রথম বুঝে নিতে হবে দরদ, ভালবাসা, সহনশীলতা, আস্থা ও দেওয়া-নেওয়ার চর্যাকে যখন নারীনিসর্গনীতিবাদীরা বিশেষ নৈতিক গুরুত্ব দেন তখন পুরুষতন্ত্র থেকে তাঁদের পার্থক্য কোথায়। পুরুষতন্ত্রের প্রেম, ভালোবাসা হল সাম্য-ভাবনার দ্যোতক আর নারীনিসর্গনীতিবাদীদের কাছে তা সংযুক্তি বা কনেক্টেডনেস-এর দ্যোতক—এ এক বিশেষ ধরনের সংযুক্তি যার মাধ্যমে সত্তা তার স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

সব রকম অন্যায় অবদমনের বিরুদ্ধে শান্তির রাজনীতি বরণ করে নারীনিসর্গনীতিবাদীরা পিতৃতন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন অবদমনের চেহারাটা পিছিয়ে দিয়ে বলতে চান কী করে সমাজে বদল আনা যাবে। নতুন সমাজে তাঁরা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতার লড়াইকেও নিরন্তর ঠেকানোর প্রকল্প নিতে চান। জ্ঞানকেন্দ্রিক আধিপত্যকে

নিষ্ক্রিয় করার জন্য তাঁরা বহুলপদ্ধতিবাদ বা মেথোডলজিকাল প্লুরালিজম গ্রহণ করেন— বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাই একমাত্র বৈধ ব্যাখ্যা নয়, বিবিধ সূত্র থেকে রসদ নিয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। নারীনিসর্গনীতিবাদীরা তাঁদের বক্তব্য বোঝানোর জন্য তালি-দেওয়া কাঁথার রূপক ব্যবহার করেন। কাঁথার প্রতিটি তালির নিজস্ব জীবনেতিহাস আছে— এখানে তারা স্বতন্ত্র। তালিগুলি একই কাঁথায় গাঁথা থাকে বলে কাঁথাটির সমগ্র রূপ তৈরি হয়, এখানে তালিগুলি সমন্বিত। এই রূপকের সাহায্যে আমাদের নিসর্গনীতির সমস্যা বুঝতে হবে।

ইকোলজি

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইকোলজি শব্দটি আজ বহুল ব্যবহারে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার নিকটপথে এসে মিলছে। এখানে ওখানে, শ্রবণে দর্শনে ইকোলজি আলোচনা, পরিবেশ চর্চায় ক্রমশই অপরিহার্য হয়ে চলেছে। হবারই কথা। কারণ এই শব্দটিই তো আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবেশমুখী জীবন গঠনে অপরিহার্য আশার ধ্রুবতারা। শব্দব্রহ্মটির শক্তি অনেকখানি, তার থেকেও বেশি তার আশা আকাঙ্ক্ষার আকাশটি। আকাশই বটে, কারণ এই বসুন্ধরার যত অবয়বী জীবন্ত প্রাণ রয়েছে, তাদের স্বাভাবিক আবাস কথা-ই 'ইকোলজি'র মূলকথা। কত বিস্তৃত এবং প্রত্যক্ষ পরিসর, কী তার ব্যাপ্তি—শব্দটির মধ্যেই জড়িয়ে আছে যেন আমাদের সব হতে আপন জীবনবাণী। শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দমালা থেকে। 'ঐকোস' অর্থাৎ গৃহ বা বাসা; আর 'লোগাস্' অর্থাৎ বাণী-অন্বয়ে ইকোলজি। গৃহবাণী আমাদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন কথা, নতুন শব্দ নয়। 'বনবাণী'তে বেড়ে উঠেছি আমরা—শুনি 'না বলা বাণীর' সত্য সংগীতমালাকেও। এই বাণীকে জীবনচর্চায় যুক্ত করাই আজ জীবব্যবস্থা সংরক্ষণ কর্মের বড় কাজ। পৃথিবীর সম্পদ এই বিস্তীর্ণ প্রকৃতি, প্রাণ প্রাণী সমগ্র জীবমণ্ডল, মানুষ—বাসা লাভ করেছে একই ছন্দে বসানো এমনই প্রকৃতি পরিবেশে। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক নির্ভরতায় স্বাভাবিক বাস্তু শৃঙ্খলাকে ভিত্তি করেই বেঁচে থাকে। এমন অভিপ্রেত সমষ্টি জীবনকেই বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম। জীবসমাজ এবং তার পরিবেশ—এই নিত্যসম্বন্ধতা থেকে গড়ে ওঠে একেকটি স্থানের কত না বৈচিত্র্যের বাস্তুতন্ত্র। প্রাণ, প্রাণী, সজীব উদ্ভিদ, গুল্ম, গাছ লতা আর মানুষে মিলেমিশে গড়ে তোলে সুন্দর বাস্তুব্যবস্থা।

যেমন ধরা যাক, কাছের এক অরণ্যভূমি। বিস্তীর্ণ সেই সবুজ প্রান্তে সূক্ষ্মতম কীটপতঙ্গ থেকে বৃহৎ পশু, পাখি, প্রাণিকুল; আবার ঘাসফুল থেকে মহীরুহ প্রঙ্গাবান বৃক্ষসারি—তারই মাঝে স্থান পেয়েছে স্থানীয় আদিবাসী মানুষ। সকলেই অরণ্য ভূমিশ্রীর পুত্র-পুত্রী। সমান অধিকারে জীবপ্রাণ বৃহত্তর জীবসমাজ একে অপরের প্রতি ভারসাম্য বজায় রেখে, জীবননির্বাহ করে চলেছে। খাদ্য ব্যবস্থার নির্মাণও সৃষ্টি ছন্দে, নিত্য জীবনমালা যেন সংস্থাপিতও হয়ে চলেছে। জীবন ও জীবিকার ছন্দ অরণ্য পরিবেশকে সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্যবানও করে চলে। এমনই প্রকৃতিনিহিত ধর্মকে মানিয়ে নিয়ে যে জীবন আচরণ গড়ে ওঠে, সেই বৃহত্তর সপ্রাণ জগৎকথায়—বাস্তুব্যবস্থা,

বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বের ডাক আছে। এই দায়িত্ব পালনে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ মানুষের ভূমিকা তো অনেকখানি। এই গৃহবাণী বিদ্যাচর্চা ও অধ্যায়নকেই বলা হয়ে থাকে ইকোলজি, অনেকক্ষেত্রে বাস্তুবিদ্যা।

১৮৬৬ সাল নাগাদ ইকোলজি বিদ্যাচর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলেন জার্মান দেশের বিশিষ্ট প্রাণীবিদ্যাবিদ আর্নস্ট হেইকেল। তিনি পশুপ্রাণীদের সঙ্গে জৈব-অজৈব পরিবেশ সম্পর্ক নিয়ে বিশিষ্ট কাজ করে, আধুনিক বিজ্ঞানে সাড়া ফেলেন। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘর্ষের নানান রূপরেখা তাঁর গবেষণায় বিশিষ্ট স্থান পায়। বলা যেতেই পারে এর পর থেকেই ইকোলজি আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় বিস্তৃত হতে থাকে। এই শতকের ষাটের দশকের পর থেকে প্রথমে আমেরিকায় পরে পরেই পৃথিবীর দিকে দিকে পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত বৃহত্তর সমাজ ক্রমশই ইকোলজি বিদ্যা ও প্রয়োগচর্চায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পরিবেশ দূষণছায়ায় আক্রান্ত আজ এই পৃথিবীর জীবমণ্ডল সমগ্রতার ছন্দে আর সুরে সুর মেলাচ্ছে না। ছন্দোময় প্রকৃতি-ত্রাণ অভিমুখী মনুষ্যত্বের আদর্শ জীবনে আজ নানা বিঘ্নের মেলা। জীবনযাত্রার ভারসাম্যহীন আচরণ ও অসামঞ্জস্য অবস্থা থেকে দূষণে বিপর্যস্ত আজ বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা, জলপ্রাণ—জীবমণ্ডল। এমন ঐতিহাসিক বেসামাল অবস্থার মুখোমুখি আমরা নিত্যজীবনযাত্রায়। জঞ্জালে, আবর্জনায়, ধুলো বালিতে, কি শহর, নগর কিংবা গ্রাম নদী, জলাশয়, বনভূমি, পাহাড়, উপত্যকা, মরুভূমি কেউই বাদ যাচ্ছে না।

একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ পরিবেশ দূষণ ছায়ায় জীবন অতিষ্ট, আর একদিকে পরোক্ষ প্রভাবে রোগ মহামারী, দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষের জীবন ক্রমশই বিপর্যস্ত হয়ে চলেছে। আবাসস্থলে এমন ছন্দ বিপর্যয়ে, জীবপ্রাণ শৃঙ্খলা যতই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সামগ্রিক স্বাভাবিক বাস্তুব্যবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্র ততই দিশাহারা হয়ে চলেছে। যারা মানুষের মতো কথা কইতে পারে না, অন্যান্য প্রাণ-প্রাণীজগৎ তাদের নীরব ভাষায় ও আচরণে বারে বারে জানিয়ে চলেছে ছায়াঘন অন্ধকারময় জীবসংকোচন-ভবিষ্যত।

এমন ভয়ানক অবস্থায় গৃহবাণী-চর্চা, ইকোলজি সংক্রান্ত নিবিড় তথ্যভিত্তিক কিন্তু প্রাণময়তায় ভরা আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিদ্যা ও প্রয়োগ চর্চার কথাই উঠেছে বারে বারে, সংগত কারণেই দেশে দেশে এবং আমাদের দেশেও এই চর্চায় বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, মানবিক-ভূগোলবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এমন প্রায় সকলে মিলে জীবন ও জীবন-অভিমুখী চর্চা গড়ে তুলছেন। কাজগুলি নির্মিত হচ্ছে অনেকটাই জরুরি অবস্থা সামলাতে। আবাসভূমির প্রকৃত অবস্থা জানতে এবং একই সঙ্গে বিশ্বপ্রাণময় চেতনার উদ্বোধনে সকলকে মেলাতে।

এই বিদ্যাচর্চায়, মজার কথা হল, যদিও বিষয়টি প্রধানত জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত ধারায় পড়ে, কিন্তু কখনোই তা কোনো নির্দিষ্ট খোপবদ্ধতায় আটকা পড়ে না। আটকে রাখা যায়ও না। কারণ ইকোলজি তো শুধু প্রাণ প্রাণীর জৈবিক আবাসস্থলের কথাই বলে না; বিস্তৃত বহুমাত্রিক সাধনায় বায়ুমণ্ডল, জলধারা, আবহাওয়া, মৃত্তিকা, পাথুরে দেহ এমন নানান বাস্তু ব্যবস্থার নানা কথার মাঝে জীবপ্রাণের সামাজিক মানসিক আচরণ ও

বিবর্তন সংবাদও জানতে হয়। প্রয়োগ করতে হয় অভিজ্ঞতার মালাগুলিকে; বিশ্লেষণে বোঝা যায় তখন কার্যকারণ রহস্যকে। আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এই বিষয়টিকে জীবনে অঙ্গীভূত করতে গড়ে তুলতে হয়, খোলা চোখ ও মনের মুক্ত চিন্তাধারা। আবাসভূমি, বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে সনাতন জীবনপ্রণালী—তার বাস্তবিক সামাজিক এমনকী মানবিক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের দরকার হয়। জীবনবাণী দিয়ে এককালে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা গৃহবাণীকে বুঝতে হলে, এমন এক বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের দরকার হয়— যা থেকে নিত্যসত্যসম্বন্ধতাগুলিকে অন্তরতম সত্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। মানুষের বেহিসেবি আচরণে অতি যান্ত্রিকতার ঔদ্ধত্যে প্রাণী আর প্রাণের পরে প্রাণ লাভ করছে না। জীবজগতের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে যে ছন্দ ছিল, সেই ছন্দকে বুঝতে হলে শুধু বিজ্ঞানের অঙ্ক নিয়মে হবে না। দরকার হবে এমন এক দৃষ্টিদীক্ষা যা বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে পল্লীনিকটবর্তী করে তুলতে পারে মানবিকতার মূল্যবোধে। আরো দুটি যে প্রাণ-প্রাণিজগৎ রয়েছে তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব মানুষের। সংরক্ষিত বাস্তুতন্ত্রের মহা আমন্ত্রণে মানুষী আচরণের ডাক আসে সব থেকে আগে। বিংশ শতাব্দীর বিলাস বৈভব, মানুষের তৈরি পরিশ্রমবিমুখ প্রযুক্তি, শেষমেশ মানুষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছে। জীবপরিমণ্ডল এমন আচরণে শঙ্কিত হয়ে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে— এই শতাব্দীতেই সব থেকে বেশি। হাজার হাজার জীবপ্রজাতি, জীববৈচিত্র্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে, হারিয়ে গেছে ধরণীর লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল সবুজ আচ্ছাদন। বিরল সবুজপ্রাণ, সামুদ্রিক প্রাণবৈচিত্র্য।

অসামঞ্জস্য ব্যাধি, চরম দারিদ্র্যও এনেছে মানুষেরই ওপিঠের জীবন স্তরে। বৈষম্য ও বাস্তুপরিকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তনে সামগ্রিকতার ছন্দ গিয়েছে ভেঙে। কিন্তু যে বাস্তুব্যবস্থা নিয়ে ইকোলজি চর্চা, তার আদিকথায় সামগ্রিকতা ও সামঞ্জস্য ভাবনা রয়েছে একেবারে কেন্দ্রে। সেই কারণেই গৃহবাণীর ঐকতানকে ভাষায় ভাষায় মেলাতে, ছন্দে পুনঃর্নির্মাণে আজ সমন্বয়ী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে সব থেকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। সহযোগিতাময় আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ইকোলজিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে দিকে দিকে প্রচেষ্টাও চলেছে। পরিবেশ দূষণ সত্ত্বেও সব থেকে নির্মল সম্ভাবনাময় দিক কিন্তু এই সর্বতোমুখী সংস্কৃতি।

এমন সমন্বয়ী বাণী আমাদের দেশে কিছু নতুন কথা নয়। আমাদের নিজস্ব জ্ঞানবিজ্ঞানে যুগ যুগ ধরে তা প্রবাহিত। ঋগ্বেদে পৃথিবী, ঋতু, মেঘ, প্রাণী, উদ্ভিদ— অগ্নি সৌরশক্তির বিস্তৃত বিশিষ্ট জ্ঞান অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত। স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ছন্দে মালায় মিলিয়ে হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, সরস, শরদ্—ঋতু বৈচিত্র্য মাঝেই যে প্রাণীজগৎ সৃজিত হয়ে ওঠে; গড়ে ওঠে তাদের বিচিত্র বহুমাত্রিক পারস্পরিক সামঞ্জস্য— এমন নীতিজ্ঞানভিত্তিক বিজ্ঞান চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক প্রয়োগযোগ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞান কথায়—অগ্নি, বায়ু, মেঘ যে প্রাণভূমির সৃষ্টিকে এগিয়ে দেয়, জীবও জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে গড়ে মহাচক্র এবং ধরিত্রী তার বৃহৎ আধার এমন মহা ছন্দজ্ঞান, ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিতে জড়িয়ে আছে।

চোখের দেখা, মনের দেখার প্রয়োগ শিল্পদৃষ্টি দিয়ে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ঐতিহ্যকে জীবনযুক্ত করাই আধুনিক বাঙালিয় ইকোলজি চর্চার বিশিষ্ট সম্ভাবনাময় দিক।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বৃহত্তম সমন্বয়ী গৃহবাণী—বিশ্বপ্রাণময়তার, যে অভিজ্ঞতা শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ এনে দিয়েছিলেন, শতাব্দী উত্তীর্ণ সেই আলোকরেখায় মিলতে হবে;—

... প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, যে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরল তৃণলতা-তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত-আকাশ পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে— সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো....

আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি— নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না— আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকেই এইটে অনুভব করি... — *ছিন্নপত্রাবলী*

ইকোলজি চর্চায় এমন বিশ্বপ্রাণ ভাবনা ও অনুভূতি চিন্তাই নিবিড় জীবন-সাধন সংগীত। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সাহিত্য একাকার হয়ে উঠে অনন্ত প্রাণময়তার কথকতা শোনায়। আমাদের নিজেদের ভিতরকার সহজ আনন্দকে সামনে এনে আত্মীয়তা অনুভবের শিক্ষাই তখন ভবিষ্যতের 'ইকোলজি'।

ইনস্টলেশন

শোভন সোম

ইনস্টলেশন এমনই এক শিল্পমাধ্যম যার ঐতিহাসিকতা ও সংজ্ঞার্থ এখনো নির্ণীত না হলেও যাকে ইউরোপীয় শিল্পকলায় শতাব্দী শেষের অভিব্যক্তি বা আভিধানিক ভাষায় ফ্যাঁ দ' স্বিয়েক্ল' সিনড্রোম বলা হয়। বিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ অবধি যে-সকল বাদ বা ইজম্, শৈলী বা স্টাইল এবং মাধ্যম বা মিডিয়াম শিল্পকলার জগতে অনবরত দেখা গেছে, তার মধ্যে শেষতম এবং অতিব্যাপক শিল্পরূপ হল ইনস্টলেশন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব থেকে ইউরোপে এক সর্বব্যাপী নাস্তির মনোভাব দেখা যেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ব্যাপকভাবে বিমান ব্যবহৃত হয়, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং আগ্রাসী জঙ্গী রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা বিবিধ মূল্যবোধ, মানবিকতার নিরিখ ও সমাজজীবনের আদর্শগুলিকে ধ্বংস করে এবং মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডে ইউরোপের নানা দেশ থেকে সমাগত সংস্কৃতি কর্মী ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে লেনিনও ছিলেন। রাজধানী জুরিখ শহরে লেনিনের পাশের বাড়িটা ছিল ক্যাবারে। সেই ক্যাবারেতেই প্রথম নাস্তিবাদী শিল্প-আন্দোলন দাদাইজ্‌ম্ আত্মপ্রকাশ করে। দাদাবাদীরা যেমন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আবেগপ্রবণ ছিলেন, তেমনি লেনিনও প্রচলবিরোধী শিল্প-আন্দোলনগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দাদাবাদের পরবর্তী পর্ব সুররিয়ালিজ্‌ম্ সম্পর্কে তাঁরই নির্দেশে লুনাচারস্কি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। যা কিছু প্রতিষ্ঠিত, ধ্রুপদী আদর্শ হিসেবে গণ্য, তার সবকিছুকে নস্যাৎ করার কাজ, নন্দনতত্ত্বে সুন্দরের বিরোধিতা ইত্যাদি শুরু করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে শরণার্থী শিল্পীরা। এই দাদাবাদীদেরই একজন ছিলেন কুর্ট শ্বিটার্স। তিনি জার্মানির হ্যানোভার শহরে একটি আস্ত বাড়ি কুড়িয়ে-পাওয়া কাগজ ও আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করে সেটিকে শিল্পসৃষ্টি বলেছিলেন ও অর্থহীন একটি নাম 'মার্জবাউ' দিয়েছিলেন। কুর্ট শ্বিটার্স দেখালেন যে যা কিছু, এমনকী আবর্জনাও শিল্পকলার উপকরণ হতে পারে। হ্যাপেনিংস, এন্‌ভিরন্‌মেন্টাল আর্ট, পারফর্ম্যান্স ইত্যাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্পকলার অভিব্যক্তিগুলির সূত্রপাত হয়েছিল দাদাবাদী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ থেকেই। কুর্ট শ্বিটার্সের মার্জবাউকে অন্যতম প্রথম ইনস্টলেশন বলা যেতে পারে।

ইনস্টলেশন অর্থ বিন্যাস। এই মাধ্যমে নানা ধরনের জিনিস, কখনো আপাত-সম্পর্কহীন বস্তু একসঙ্গে সাজানো হয় একটি নির্দিষ্টকালের জন্য। নির্দিষ্টকাল পার হলে সেটি গুটিয়ে ফেলা হয়। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশের দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া, পূজার মণ্ডপসজ্জা, গ্রামগঞ্জে আড়াআড়ি লাকড়ি সাজানো, বাজারে সারিসারি উপুড় করা কলসি সাজানো ইত্যাদিও বৃহদর্থে অস্থায়ী বিন্যাস এবং 'শিল্প' প্রয়াস। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত স্থায়িত্বের প্রতি, গ্যালারি-আর্টের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই ইনস্টলেশনের উদ্ভব। '৬৮-তে জার্মান শিল্পী জোসেফ বিউইস্ একটি ঘরের মধ্যে মেঝেতে ও টেবিলে বোতল, রোলার ইত্যাদি সাজিয়ে রেখে নাম দেন রুম ইনস্টলেশন। আমেরিকার রবার্ট স্মিথসন সত্তরে উটা হ্রদে কালো ব্যাসাল্ট, চুনাপাথর, মাটি ও লাল শ্যাওলা ফেলে দেড় হাজার ফিট দীর্ঘ, একলক্ষ কিউবিক ফিট ঘনত্বের একটি কুণ্ডলাকার রূপ তৈরি করেন। বলা বাহুল্য, এই কুণ্ডলীটি আপনা থেকেই ক্রমে হ্রদে মিলিয়ে যায়। ইউরোপ থেকে শরণার্থী হিসেবে আমেরিকায় আগত য়াহ্বাশেফ্ ক্রিস্তো '৭৬-এ আমেরিকার নর্থ ক্যারোলাইনায় আঠারো ফিট প্রস্থের নাইলন্ শিট দিয়ে চব্বিশ মাইল/চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ, চিনের প্রাচীরের মতো আঁকাবাঁকা দেয়াল দু'সপ্তাহের জন্য তৈরি করেন। জার্মানি থেকে আমেরিকায় আগত হান্স হাকে '৭২-এ একটি চৌকো কাঁচের পাত্রে রাইন নদীর জল, মাছ, শ্যাওলা ইত্যাদি ভর্তি করে নাম দেন রাইন ওয়াটর ইনস্টলেশন। এই রচনাটিও স্থায়ী ছিল না। এই অস্থায়িত্ব এবং উপকরণের চমক ইনস্টলেশনে লক্ষণীয়।

আপাতদৃষ্টিতে খামখেয়ালি নিরর্থক মনে হলেও ইনস্টলেশনে শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীলতার কেল্লাকে আঘাত করা হয়েছে, সভ্যতার দুই অভিব্যক্তি—একদিকে সৃষ্টি এবং অপরদিকে বিনাশ— এই দর্শনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ইনস্টলেশন শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আমাদের এ-ও জানিয়েছে যে, যেকোনো বিন্যাস ও যেকোনো বস্তু 'শিল্প' রচনার উপকরণ হতে পারে এবং শিল্পকলার সাবেক মাধ্যমগুলি শিল্পরচনায় অপরিহার্য নয়। 'শিল্প' কী, এই প্রশ্নও শতাব্দী-শেষে ইনস্টলেশন তুলেছে।

ইমপ্রেশানিজম

বিশ্বজিৎ রায়

এই শিল্প আন্দোলনটি মুখ্যত ফরাসি দেশের চিত্রকলা ও সংগীত জগৎকে আলোড়িত করেছিল। ১৮৬৭-১৮৮৬ এই কালপর্বে ফরাসি দেশের চিত্রকলায় ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চোখে পড়ে। Edouart Manet, Clande Monet, Pirre Auguste Renoir, Camile Pissarro, Alfred Sisley প্রমুখ শিল্পী এই তালিকাভুক্ত। এঁরা প্রচলিত অঙ্কন পদ্ধতির বিরোধিতা করেন। আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু পৃথিবীর বর্ণও বদলে যায়। ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীরা এই পরিবর্তিত মুহূর্তে বস্তুটি যেমন বর্ণিমায় ধরা দিচ্ছে ঠিক সেই বর্ণিমাকে ধারণ করতে চান ক্যানভাসে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিকে আলো-ছায়া সমন্বিত দৈর্ঘ্যে এঁরা নতুনভাবে আঁকতে চান। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি অকাদেমি এঁদের চিত্রের প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীতে ক্লদ মনের আঁকা সূর্যোদয়ের ছবি (Impression : Sunrise) দেখে *Le Charivari* পত্রিকার সাংবাদিক Louis Leroy ঠাট্টা করে এঁদের 'ইম্‌প্রেশানিস্টস্' আখ্যা দেন—সেই আখ্যাই এঁরা গ্রহণ করেন। এরপর আরও সাতবার এঁদের প্রদর্শনী হয়—শেষটি হয়েছিল ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে।

ইমপ্রেশানিজম ফরাসি চিত্রকলায় বিশেষ এক পর্বের সূত্রপাত ঘটায়। Paul Cezanne, Paul Gauguin এঁরা অবশ্য ইমপ্রেশানিস্টদের ভুবনকে অতিক্রম করতে চান। এজন্য এঁরা পোস্ট-ইম্‌প্রেশানিস্ট শিল্পী হিসেবে খ্যাত।

সংগীতের জগতে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। Claude Debussy-র অর্কেস্ট্রা Nuages (১৮৯৯), অপেরা Pelleas et Mélisande (১৯০২) সংগীত জগতে ইম্‌প্রেশানিজম-এর প্রবেশ ঘটায়। ইম্‌প্রেশানিস্ট সংগীত শিল্পী শুদ্ধ ধ্বনির পক্ষপাতী—বাণীবিহীন আবেগ প্রকাশক সুর (mood music) নির্মাণেই তাঁর আনন্দ।

ইম্‌প্রেশানিজমের সাংগীতিক দিকটি বাংলা ভাষার নান্দনিক জগতে ততটা ঠাঁই না পেলেও চিত্রভাবনার দিকটি বাংলা কবিতা শিল্পকে প্রভাবিত করেছে।

জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের 'অবসরের গান' কবিতায় ধরা পড়েছে আলোর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত মাঠের চিত্ররূপ।

ক. চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
খ. মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।
গ. তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেত্রে— রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে;

মাঠের এই পরিবর্তিত আলো ছায়াময় নিসর্গ চিত্র যেন ইমপ্রেসানিস্ট শিল্পীর আঁকা। ব্যক্তি জীবনানন্দ অবশ্য কবি হিসেবে কোনো বর্গে অন্তর্ভুক্ত হতে চান না। তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকায় এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট আপত্তি চোখে পড়ে।

কৃত্তিবাস ও কৃত্তিবাস সংলগ্ন কবিরা ইমপ্রেশানিজম নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। অন্তত সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক রচনায় ফরাসি দেশেই এই শিল্প আন্দোলনের সবিস্তার উল্লেখ আছে। *(দ্র. ছবির দেশে কবিতার দেশে)* পূর্ণেন্দু পত্রীও কবি ও চিত্রকর হিসেবে এ আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

ই-মেল, ইন্টারনেট, ই-কমার্স

অশোককুমার চক্রবর্তী

ইন্টারনেট, সংক্ষেপে যেটা জনপ্রিয় ছোটো হাতের ইংরেজী e-অক্ষরে, আজ একটি সুপরিচিত মাধ্যম—মূলত তথ্য আদান প্রদানের, অন্তত প্রাথমিক স্তরে। আধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়া জোড়া এই উদ্‌ভাবনের বয়স পঞ্চাশেরও বেশি। কিন্তু সমস্যাটি হল একবিংশ শতাব্দীর একটি উন্নতিশীল দেশ ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহানগরীকে হিসাবের বাইরে রাখলে প্রয়োগের ব্যাপকতা এখনও সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়াতে পারেনি। উপযোগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (বিভিন্ন বিদ্যায়তন, পরিষেবা, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থায় কর্মরত মানুষ বাধ্যবাধকতার কারণে যাদের সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান) মানুষজন, প্রযুক্তিবিদদের বাদ দিলে, আগ্রহী ভোক্তাদের গড়পড়তা বয়স তিরিশ-অনূর্ধ্ব, ইস্কুলের গণ্ডি না পেরুনো কচি কাঁচারা পটাপট বৈদ্যুতিক দুনিয়ায় হুটোপুটিতে রত (পরিভাষায় e-mail browsing) এরকম খবর মিললেও, পঞ্চাশোর্ধ্ব শিক্ষিতের দল এখনও এটিকে জড়তা নিয়ে, তাদের বেশির ভাগই ভিতু ভিতু চোখে এর কার্যকলাপ লক্ষ করে যাচ্ছেন।

প্রযুক্তির এই নবদিগন্ত নিয়ে ভাবনা চিন্তার শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনর্গল বোমাবর্ষণ, পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ—শিক্ষা, সরকারি কার্যকলাপ, এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা—তিনটিরই ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পার্থিব পরিকাঠামোর সবটাকেই তখন বিপন্ন ও ক্ষণভঙ্গুর বলে মনে হয়েছিল। প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা তখন থেকেই ভাবনা শুরু করেছিলেন কেমন করে, অন্তত তিনটি ক্ষেত্র শিক্ষা, বাণিজ্য ও সরকারি পরিষেবা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় না রেখে শূন্য মার্গে ঈষৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষিত রাখা যায়। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংরক্ষণ নিয়েই এই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল পরে তা অন্য দুটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। আজকের প্রযুক্তির ক্রমোন্নত বিস্তার ও উদ্‌ভাস, সেদিনের বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে এগিয়ে চলার কাহিনি। সচেতন মানুষ একে দেখেন সার্থক বিনিয়োগকারীর চোখ দিয়ে, অর্ধ-চেতনের নিরিখে এটি একটি বাড়তি খরচ—তরুণ প্রজন্মের চাহিদা মেটাতে তারা বিব্রত ও বিরক্ত।

দ্বিতীয় দলে যারা তাদের জন্য এর উপযোগিতার দিক নির্ধারণের চেষ্টায় বলা যায় এই মাধ্যমটির ফলদায়ী দিকগুলোর কথা। যেমন :

• এটি স্বল্পব্যয়ী এবং দ্রুত এক যোগাযোগ ব্যবস্থা সারা পৃথিবীর সঙ্গে।

• এটি অবিনশ্বর। যদি সংরক্ষণের উপায় জেনে সচেষ্ট থাকা যায়।

• পার্থিব, এমনকি অপার্থিব খবরাখবর, আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করে।

• ঘরে বসেই আর্থিক ও অনার্থিক সব পরিষেবা নিশ্চিত হয়।

• একইভাবে ঘরে বসেই উচ্চতর বিদ্যার্জন ও ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যকলাপ চালানো সম্ভবপর হয়।

• সময়-পরিচালনের (Time-Management) সুষ্ঠু ব্যবস্থা আশ্বাসিত হয়।

• পরনির্ভরতামুক্ত সক্রিয়তা নিশ্চিত করা যায়।

• তথ্য-নির্ভরতা, অনুমিতি ও আশঙ্কাকে নিষ্ক্রিয় করে।

• পরিকাঠামোর অন্যান্য অনুষঙ্গ যেমন লোকলস্কর, ছোটাছুটি, জায়গা বাবদ (Space), সবই অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর হয়ে পড়ে।

• তথ্যের দ্রুত ও সহজ সংকলন ও সংরক্ষণ একটি বিশাল তথ্য-ভাণ্ডার (Data warehouse) নির্মাণের নিশ্চিন্ততা দেয়।

এবারে আলোচনা করা যাক এর কারিগরী দিকটা নিয়ে। যা দরকার সেটি হল একটি Computer, একটি Printer, এবং যেখানে Voltage অস্থিতিস্থাপক এবং লোডশেডিং-এর প্রাবল্য বেশি সেখানে একটি U.P.S (Uninterrupted Power Supply— যেন ছোট্ট একটা Generator) যন্ত্র। Computer চালাতে গেলে এর সবটাই লাগে। অতিরিক্ত হিসাবে দরকার একটি নির্দিষ্ট (Exclusive) টেলিফোন লাইন যা Modem নামের ছোট্ট একটি বাক্সবন্দী হয়ে থাকে। আর দরকার যে কোনো Service Prouder-এর কাছ থেকে নেওয়া Lease line, চার বছর আগেও যার ন্যূনতম মূল্যমান ছিল দশ হাজার টাকা, কমতে কমতে নির্দিষ্ট সময় ও মাত্রার জন্য যা এখন পাঁচশোয় দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি Computer এরই দু'টি বিভাগ। একটি, যা দেখা যায়, যা ছোঁওয়া যায়, সেগুলোর উপরে লেখা যন্ত্রাংশগুলো, যাকে বলে hardware। যা দেখা যায় না অথচ সমস্ত পরিচালিকা শক্তির যে প্রাণবিন্দু, তাকে বলে Software। এগুলো কিনতে পাওয়া যায়। Microsoft Company (U.S.A) Office নাম দিয়ে (M. S. Office) যে Sofwareটি বিপণন করে সেটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত সরলীকৃত মাধ্যম। এটির বিশেষত্ব হল Menu-driver বলে একজন অনভিজ্ঞ ব্যবহারক একে স্বচ্ছন্দে চালাতে পারেন।

Computer-এর পর্দায় WINDOWS (Operating System—MS) চালু করলে কতগুলো ICKON দেখা যায়। এগুলো যেন terminals কতগুলো— যেখানে বাস দাঁড়িয়ে থাকে। কোন্ বাস কোন্ terminus থেকে ছাড়বে আপনি অভিজ্ঞতা থেকে জেনে থাকেন। কোন্ ICKON আপনাকে কী কাজে সাহায্য করবে সেটাও অভিজ্ঞতা আর চর্চা সাপেক্ষে অচিরেই ভোক্তার অধিগত হয়। E-net চালানোর জন্য

নির্দিষ্ট ICKONগুলোর নাম যথাক্রমে 'Outlook Express' 'Internet Explorer' 'MS-Outlook' ইত্যাদি। 'Internet Neighbourhood' অন্য Service Provider-দের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

Service Provieder ভোক্তার কাছে e-net Service পৌঁছে দেয়। পার্থিব পৃথিবীতে যেমন দেয় জোগানদার, Agent এবং অপরাপর Media। সরকারি Service Provider হল V.S.N.L তেমনি বেসরকারি ক্ষেত্রে Yahoo. Com এবং আরও কিছু উদ্যোগ। এদের কারও কাছ থেকেই Service Registration করতে হয়।

Modem-শব্দটির সঙ্গে পরিচিতি দরকার। এটা একটা ছোট্ট বাক্স, T.V. বা Freeze-এ যেমন Stabilizer থাকে তেমনি দেখতে। একে বলে frequency 'Modulator-Demodulator'। শুনতে খটোমটো, কিন্তু ব্যাপারটা ভোক্তার জন্য জটিল নয়। টেলিফোন (Exclusive) লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছোট্ট বৈদ্যুতিক মাধ্যম যার কাজ রূপান্তর ঘটানো। কথা ও ভাষাকে, সংখ্যায় 0 এবং ১ এই দুটি সংখ্যাই Computer পড়তে পারে। অন্য সংখ্যাকে এই দুটি digit-পুন-রূপান্তরিত করা হয়— একে বলে Binary Method। রূপান্তরিত করা এবং সংখ্যাকে ভাষায় পুনঃরূপান্তর এই হল Modem-এর কাজ। এটি একটি সংকেত (signal) প্রথা (Device) যার রূপান্তরণ (Conversion), Computer-এর ভাষায় Analogue (শব্দ, অক্ষর, বাক্য) থেকে digital (০ এবং ১) এবং digital থেকে analogue-এ।

বৃহদাকার সব সংস্থাই Service Provider-এর মাধ্যমে একটি Website (w.w.w.— World Wide Web) কিনে নেয় Satelite ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে। এটি হল মহাশূন্যে তার নিজস্ব জমিজিরেত—তার অভিজ্ঞান। সেই জমিতে কোথায় কী রাখা থাকবে তার জন্য তার ছোটো ছোটো কিছু অভিজ্ঞান (Identity—ID থাকে। Dot (Deptt. Of Telecommunication) এর সাহায্যে Telephone ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সে কিছু এলাকাভিত্তিক নেটওয়ার্ক (LAN—Local Area Network, MAN— Metro Area Network, WAN— Wide Area Network)-এর ব্যবস্থা রাখে। Service Provider-এর কাছ থেকে registration নেবার পর ভোক্তার একটি নিজস্ব ID এবং Password মেলে। সেই ID এবং Password-এর সাহায্যে সে এই সব সংস্থার, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক (LAN/ MAN / WAN) Network-এর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। তথ্য সংগ্রহ, তথ্য আদান প্রদান, আর্থিক বিনিময়, শিক্ষণীয় উপাদন সংগ্রহ সবই সে করে Outbox (প্রেরন-মাধ্যম) এবং Inbox (সংকলন-মাধ্যম) পরিচালনের (Operation) মধ্যে দিয়ে।

সংক্ষেপে এই হল কারিগরি দিক। এই ব্যবস্থাবলির মধ্যে দিয়ে আজ পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য, বিপণন, শিক্ষা ও পরিষেবার উপাদান। স্পষ্ট হচ্ছে ভোক্তার চোখে সব তথ্য। স্বচ্ছতা বা Transperency সুনিশ্চিত হচ্ছে।

E-বাণিজ্য (E-Commerce) এই উদ্‌ভাবনের এক সফল প্রয়োগের দিক। e.c.s (Electronic Clearing System)-এর মাধ্যমে আপনার Banker (R.B.I-এর

অনুমতি ক্রমে) ভোক্তার সব প্রতিশ্রুতি (Commitment) মিটিয়ে দিচ্ছে, ভোক্তার নির্দেশে। ভোক্তাকে আর টাকা তুলতে Bank-এ যেতে হচ্ছে না, লাইনেও দাঁড়াতে হচ্ছে না। বাইরের (Outstation Cheque) চেক ভাঙানোর সময় আর খরচ দুটিরই সাশ্রয় হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াতেই চলছে বাণিজ্য-ব্যবস্থা। যার নাম E-Commerce. এই প্রত্যক্ষ ব্যবস্থারই পোষাকি নাম On Line Trading বা E-Trading.

একইভাবে শিক্ষা জগতে প্রসার লাভ করছে e-learning. বই কেনার খরচা নেই, ডাক মাশুল, অপেক্ষা, সুলভ্যতা কোনোটারই চিন্তা নেই। শুধু খোঁজ রেখে নির্দিষ্ট Website-এ ঢুকে (তালিকাও পাওয়া যায় Provider কর্তৃক প্রদত্ত e-mail ID list থেকে) সংগ্রহ করা। ভাল লাগলে বা প্রয়োজনীয় মনে হলে floppy-তে তুলে নিয়ে নিজের কাছে রাখা বা মুদ্রিত অনুলিপি (hard Copy) Printer চালিয়ে ছাপিয়ে নেওয়া। চাই কি রঙিন Ribbon-এর অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল সঙ্গতির মধ্যে থাকলে, মুদ্রণকে বর্ণময় করা যায়।

নমোঃ যন্ত্র বলার দরকার নেই। যন্ত্র কখনোই বিকল্প নয়, উদ্‌ভাবন বিকাশের পরিপূরক। কালহরণ রোধ, সময় সংক্ষেপ, ব্যয় সংকোচন এবং বিপন্ন নশ্বরতার বিকল্প হিসাবে e-প্রযুক্তি নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতেই পারে। তাকে উপেক্ষা করাটা সমসাময়িকতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেওয়া। কালবিমুখ কখনোই কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। পরিচিত, অনুশীলন আর অন্তরঙ্গতাই জন্ম দেয় গঠনমূলক সামলোচনা অথবা উন্নততর উদ্‌ভাবনের। দুটিরই সামাজিক গুরুত্ব আর আবশ্যিকতা সংশয়াতীত।

ইয়োলো জার্নালিজম

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেপরোয়া কায়দায় চমকপ্রদ খবর ছাপিয়ে পাঠকদের মনে সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রবণতা, বা তাদের কোনো কুসংস্কারে ক্রমাগত ইন্ধন যুগিয়ে উত্তেজিত করার প্রবৃত্তিকে 'পীত সাংবাদিকতা' আখ্যাদানের পিছনে একটা ইতিহাস রয়েছে।

গত শতাব্দীর নবম দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দু'টি জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা থেকে যে বিশেষ কায়দার সাংবাদিকতার উদ্ভব হয়েছিল তা শৈশবের বাচালতা কাটিয়ে আজ পুরোদস্তর 'মাস্তানে' পরিণত হয়ে বিশ্বের হালফ্যাশনের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'জোসেফ পুলিৎজর' (Joseph Pulitzer)—যাঁর নামে পরবর্তী যুগে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক ও লেখকের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে— নিউইয়র্কে *ওয়ার্লড (World)* খবরের কাগজটি এক সময় কিনে নেন এবং ১৮৮৯ সাল থেকে এই কাগজটি ধারাবাহিক কৌতুকচিত্র ছাপাতে শুরু করে—ইদানীং কালের 'কমিক্ স্ট্রিপ' ('ম্যাজিশিয়ান ম্যানড্রেক', 'সুপারম্যান' এই জাতীয় চরিত্র নিয়ে টুকরো টুকরো চিত্র রচনা করে পর্যায়ক্রমে সাজানোর রীতি)-এর পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। *ওয়ার্লড*-এ নিয়মিত প্রকাশিত Hogan's Alley বা 'হোগানের গলি' নামে এই ব্যঙ্গচিত্রাবলির রচয়িতা ছিলেন Richard. F. Outcault। এই ছবিগুলোর বিষয় ছিল শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলের বসতবাড়িগুলির জীবনযাত্রা, আর এর মূল চরিত্র—আলখাল্লা পরিহিত একটি ফোক্‌লা শিশু। ১৮৯৩ সালে যখন সংবাদপত্র মুদ্রণে রঙের ব্যবহার শুরু হয়, তখন রঙ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রে *ওয়ার্লড*-এর মুদ্রণ বিভাগের কেউ একজন এই ফোক্‌লা শিশুটির আলখাল্লায় একটু হলুদ রঙের ছোপ লাগিয়ে দেয়। পরের দিন পীতাম্বরধারী জনপ্রিয় শিশুটির চিত্র নিয়ে যখন *ওয়ার্লড* পাঠকদের সামনে হাজির হল তখন তুমুল সাড়া পড়ে গেল। সেই থেকে শিশুটি Yellow Kid of Hogan's Alley বা 'হোগানের গলির হলুদ বাচ্চা' নামে পরিচিত হয়ে গেল, এবং *ওয়ার্লড*-এর বিক্রি বেড়ে গেল হু হু করে।

কিন্তু *ওয়ার্লড*-এর একচেটিয়া আধিপত্য কিছুকাল পরেই এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হল। ১৮৯৫ সালে মার্কিন সংবাদপত্র জগতের প্রবল পরাক্রমশালী প্রকাশক William Randolph Hearst (যাঁর বহুবিতর্কিত বিবেকবর্জিত জীবনধারার ছায়া অবলম্বনে Orson Welles পরবর্তী জীবনে তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'Citizen Kane' নির্মাণ করেছিলেন) নিউইয়র্কের আর একটি সংবাদপত্র—*জর্নাল* (JOURNAL)— কিনে নেন

এবং *ওয়ার্লড*-এর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। প্রথমেই, *ওয়ার্লড*-এর সম্পাদকগোষ্ঠীর অনেকেই, বিশেষ করে Yellow Kid-এর নির্মাতা Outcault-কে অধিক বেতনে নিজের কাগজে বহাল করলেন। ফলে, *ওয়ার্লড* Yellow Kid-এর ধারাবাহিকতা ও পাঠকদের চাহিদা মেটানোর তাগিদে আর একজন চিত্রকরকে নিযুক্ত করল। এর পর থেকে *ওয়ার্লড* ও *জর্নাল*— উভয় খবরের কাগজেই দুই ভিন্ন চিত্রশিল্পীর Yellow Kid-এর ব্যঙ্গচিত্র বার হতে লাগল।

কিন্তু যে প্রতিযোগিতা এক অলীক ফোক্‌লা নিয়ে শুরু হল, তা ক্রমেই উভয় সংবাদপত্রের অন্যান্য পৃষ্ঠাতেও ছড়িয়ে পড়ল। কে কত বেশি রোমহর্ষক খবর ছাপাতে পারে, কত বেশি পাঠককে উত্তেজিত করতে পারে, তার দৈনন্দিন লড়াই শুরু হয়ে গেল। যেহেতু খুন-খারাপি, যৌনতা ও হিংসাত্মক ব্যাপারে সাধারণ পাঠকের একটা কৌতূহল আছে, এই সব ঘটনাই বেছে নেওয়া হল। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও কাগজ কেনার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আসল ঘটনা ক্ষীণ সূত্র ধরে বিরাট অতিরঞ্জিত সংবাদ ফেনানো হত। প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকের উপর জুড়ে বিরাট শিরোনাম, বীভৎস ছবি সংবাদের পরিবেশনায় কোনো হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা কোনো বিখ্যাত রাজনীতিবিদ বা চিত্রতারকার ব্যক্তিগত জীবনের যৌনাত্মক বিবরণী ছাপা হতে লাগল। অনেক সময় দেশপ্রেমের নামে মার্কিন পাঠকদের মনে যুদ্ধোন্মত্ততার বীজও বপন করা হত, এবং আজকে অনেকেই মনে করেন যে ১৮৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধের সমর্থনে মার্কিন জনমত তৈরির পিছনে *ওয়ার্লড* ও *জর্নাল*-এর অবদান কম নয়। (ঠিক যেমন ১৯৫০-এর দশকের 'ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন' আবহাওয়ায় মার্কিন সংবাদপত্রের অবিচ্ছিন্ন কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের ফলে পরবর্তী যুগে ভিয়েতনামে মার্কিন সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত তৈরি হয়েছিল)

Yellow Kid-কে কেন্দ্র করে যে আপাতদৃষ্ট নিরীহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে *ওয়ার্লড* ও *জর্নাল*-কে পারস্পরিক গলাকাটাকাটির স্তরে নিয়ে গেল এবং বাস্তব ঘটনার সত্যানুগ বিবরণ খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে প্রায় উঠে গেল। গুজব, কষ্টকল্পনা, অতিরঞ্জন, উত্তেজনাপূর্ণ প্রচার—এই সবই সংবাদপত্রের মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সমসাময়িক একজন সম্পাদক— প্রেস (Press) কাগজের Ervin Wardman—বিরক্ত হয়ে *ওয়ার্লড* ও *জর্নাল* দুই সংবাদপত্রকেই, Yellow Press' এই নামে নিন্দিত করলেন। 'হোগানের গলির হলুদ বাচ্চা'-কে নিয়েই সবকিছু শুরু হয়েছিল বলে Yellow কথাটির ব্যবহার। সেই থেকে Yellow Journalism দায়িত্বজ্ঞানহীন সস্তা চটুল উত্তেজক খবর প্রচারের সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

'পীত সাংবাদিকতা'-র ঐতিহ্য আজ তার জন্মস্থান থেকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে বিশ্বব্যাপী বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য সম্প্রতি কালে এ ঐতিহ্যের চূড়ান্ত হাস্যকর এক পরিণাম ঘটে গেছে। ১৮৯১ সালে *Washington Post*-এর এক মহিলা সাংবাদিক Janet cokke-কে পুলিৎজর পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়, উক্ত সংবাদপত্রে মাদক-দ্রব্য-আসক্ত একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকের

বেদনাদায়ক জীবন বিষয়ে তাঁর এক তথ্যবহুল বিবরণীর জন্য। কিছুদিন পরেই অবশ্য ধরা পড়ে যায় যে বিবরণীটি নিছকই কল্পনাপ্রসূত—অন্যান্য সাংবাদিকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য মহিলা সাংবাদিক একটি রোমহর্ষক গল্প ফেঁদেছিলেন, যাতে পুলিৎজর পুরস্কার সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বলা বাহুল্য, এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবার পর, পুরস্কার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিৎজরের খবরের কাগজ *ওয়ার্লড* যে সাংবাদিকতার জন্মদাতা, ইতিহাসের এক নিদারুণ তামাশায়, পুলিৎজরের পুরস্কারের তত্ত্বাবধায়কেরা সেই সাংবাদিকতারই শিকার হয়ে গেলেন।

আমাদের দেশেও এই জাতীয় অতিরঞ্জিত উত্তেজক সংবাদ পরিবেশনার নজির ভূরি ভূরি মিলবে। ১৯৬৪ সালে একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকপত্রে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অতিরঞ্জিত ও বিকৃত সংবাদ এবং প্ররোচনাত্মক শিরোনাম ('হাজার হাজার হিন্দু নিধন'—এই ধরনের হেডলাইন) ছাপিয়ে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধন যুগিয়েছিল। ওই সংবাদপত্র গোষ্ঠীরই ইংরেজি দৈনিকপত্রে অনুরূপ প্ররোচনামূলক সংবাদ ছাপানোর প্রতিবাদে উক্ত সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক পদত্যাগ করেন। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এ পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ দিতে গিয়ে অপর একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন সব উত্তেজক খবর পরিবেশন করে, যার আদৌ কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। আর বটতলা সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে 'বড় ঘরের কেচ্ছা'র সরস বর্ণনা দ্বারা কৌতূহলী পাঠকসমাজের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আর এক বাংলা দৈনিক কলকাতার কোনো প্রখ্যাত পরিবারের এক বধূর বিষপানে মৃত্যুর সংবাদ ও আদালতে সেই বিষয়ে দীর্ঘ মোকদ্দমার দৈনন্দিন বিবরণী ছাপিয়ে এক বিরক্তিকর প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করে।

আজ থেকে বেশ ক'বছর আগে ভারতবর্ষের প্রথম 'প্রেস কমিশন' (তদানীন্তন সংবাদপত্র জগতের অবস্থার বিশ্লেষণ ও তার উন্নতিবিধানের প্রয়োজনে প্রস্তাব প্রদানের জন্য গঠিত) মন্তব্য করেছিলেন 'পীত সাংবাদিকতা কোনো না কোনো প্রকারে, ক্রমশই এ দেশে বিস্তার লাভ করছে।' এই বিশেষ ধাঁচের সংবাদ রচনার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে কমিশনের সভ্যরা—'অসত্য জেনেও বিদ্বেষপরায়ণ সংবাদের ইচ্ছাকৃত মুদ্রণ ; কোনও ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট মিথ্যার জাল বোনা; ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ঠ ঘটনার—যার সঙ্গে পাঠকসাধারণের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই-বীভৎস অনাবৃতকরণ কিংবা ব্যক্তির জীবনে অনধিকার প্রবেশ ; জনসাধারণের রুচিকে সুচিন্তিতভাবে অধঃপতিত করার উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষা ও অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার ব্যবহার'—সংবাদ-রচনার এইসব কৌশলগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন।

আজকের অনেক সংবাদপত্রই এই তালিকার এক বা একাধিক নিন্দিত রচনাশৈলী অনুসরণের অপরাধে দোষী। আইন পাশ করে এই বিপজ্জনক প্রবণতার অবসান সম্ভব নয়। এই পাণ্ডুরোগ থেকে সংবাদপত্র জগতের আরোগ্যের একমাত্র উপায় সাংবাদিকদের মধ্যে অধিক পরিমাণে দায়িত্ববোধ ও সমাজসচেতনতার প্রসার।

ইলাস্ট্রেশন

দেবাশিস দেব

ইলাস্ট্রেশন বলতে বোঝায় লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত যে কোনো ধরনের ছবি বা কারুকার্য যা সেই লেখার বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে আঁকা হয় এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। তবে অনুসরণ মানে এই নয় যে ইলাস্ট্রেশনকে লেখার অধীনস্থ হয়েই থাকতে হবে—শিল্পী অবশ্যই ছবির ভাব এবং কাঠামোটা গড়ে তুলবেন লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই, তবে সেই সঙ্গে তাঁর একটা দায়বদ্ধতাও থাকবে সমান্তরালভাবে একটা শিল্পরস সৃষ্টি করার— যাতে লেখাটির একটা নান্দনিক দৃশ্যকল্প বা ভিস্যুয়াল তৈরী করে পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ ছবি যেন একেবারে হাতে ধরে লেখাকে নিয়ে গিয়ে পাঠকের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে।

শিল্পকলার এই যে অগ্রজসুলভ আচরণ, এর পেছনে রয়েছে ইতিহাসের এক প্রত্যক্ষ সমর্থন। মানুষ সর্বপ্রথম তার মনের কথা প্রকাশ করতে শিখেছিল ছবি এঁকে— লেখালিখির চর্চা শুরু তার অনেক পরে। সূর্য, চাঁদ. পাখি, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি চারপাশে দেখা এই সব বিষয়ই গুহার দেওয়ালে, পাথরের গায়ে পাথর ঘষে এঁকে আদিম মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করেছিল। কিছুটা প্রতীকী চিহ্নের মতো এই ছবিগুলি থেকেই পরবর্তীকালে তৈরী হয় প্রথম বর্ণমালা, যার সার্থক ব্যবহার শুরু চিনদেশে। পরে প্রাচীন মিশরের Hieroglyph বা চিত্রলিপিতেও পাওয়া যায় এর বিস্তার। এর পর ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নিজস্ব বর্ণমালা সৃষ্টি করে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটায়।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চিনদেশে কাগজ আবিষ্কার হয় এবং হাতে লেখা পুঁথির মাধ্যমে গল্প বা তথ্য প্রচার শুরু হয়। তবে এই পদ্ধতি ছিল অসম্ভব সময় ও শ্রম সাপেক্ষ এবং পড়তে জানা মানুষের সংখ্যাও ছিল খুবই নগণ্য, তাই ছবি এঁকে বোঝানোই ছিল একমাত্র বিকল্প। মধ্যযুগেও বইপত্র ছিল অতি দুর্লভ, তাই গির্জা বা উপাসনা মন্দিরের দেওয়ালে বা কাঁচের গায় এঁকে বা খোদাই করে সাধারণ মানুষকে শেখানো হত বাইবেলের গল্প। সেই সময়কার হাতে লেখা বইতেও থাকত নানারকম সুন্দর কারুকাজ এবং অনেকক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো ছবি।

ইউরোপে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপা শুরু হয় পনেরোশো শতাব্দীর গোড়ার দিকে—যার নিদর্শন রয়েছে গুটেনবার্গের বাইবেলে—বলা হয় পৃথিবীতে এটাই প্রথম

পুরোদস্তুর বই। এর সামান্য যে কয়েকটি কপি আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে, তাতে দেখা যায় প্রতিটি পাতায় লেখার পাশে কী অপূর্ব সব নক্‌শা এবং কিছু কিছু সাধু সন্তের পোর্ট্রেট। নামের উল্লেখ নেই এই সব শিল্পীদের কিন্তু এঁরাই হলেন একেবারে আদিযুগের ইলাস্ট্রেটর।

পরবর্তীকালে সারা ইউরোপ জুড়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটে, ফলে বই ছাপার হিড়িক পড়ে যায়। সেই সঙ্গে ইলাস্ট্রেশনের চাহিদাও বাড়তে থাকে। অনেকেই এসে এই কাজে যোগ দেন যার মধ্যে প্রথম দিকে ছিলেন ড্যুরার ও হলবাইনের মতো যশস্বী শিল্পীরা।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংল্যাণ্ডে আত্মপ্রকাশ ঘটে এমন একজন শিল্পীর যিনি সম্ভবত প্রথম তাঁর ছবিতে নানা ধরনের মজার উপাদান এনে একটা ব্যঙ্গাত্মক মেজাজ তৈরি করেন। এঁর নাম উইলিয়াম হোগার্থ। বিভিন্ন সামাজিক দুর্নীতি ও বৈষম্যকে তিনি তাঁর ইলাস্ট্রেশনধর্মী ছবির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

সেই সময় শিল্পীদের ইলাস্ট্রেশন করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপার প্রক্রিয়াটাও ভাল করে জেনে নিয়ে তাতে অংশ নিতে হত। অনেকেই নিজে এঁকে নিজের হাতেই তার ছাপ তুলেছেন যাতে ছবির reproduction ছাপার পরে সঠিক হয়। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন উইলিয়াম ব্লেক, যিনি অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডে উন্নত ধরনের এক ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করে দেখিয়ে গিয়েছেন বইয়ের পাতায় পাতায় নিজের লেখার সঙ্গে নিজের আঁকা ছবিকে আরও সুন্দরভাবে মিশিয়ে কীভাবে একটা আলাদা বিস্তার দেওয়া যায়। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে আজও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকেই পৃথিবীর বহু দেশে সচিত্র সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে শুরু করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে—সেই সঙ্গে প্রচার মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপনের গুরুত্বও বাড়তে থাকে সমান তালে। স্বভাবতই ইলাস্ট্রেশন শিল্পেও এসে ধাক্কা দিল এক নতুন জোয়ার। লেখার মধ্যেও যেমন আরও বেশি করে চিন্তা-ভাবনা আর বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগল, শিল্পীরাও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইলাস্ট্রেশনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এর শিল্প সম্ভাবনাকে ক্রমশ উজ্জ্বল করে তুললেন। ধীরে ধীরে বইপত্র বিক্রির ব্যবসা এমন ব্যাপক আকারে হতে লাগল যে কিছুটা প্রত্যাশিতভাবেই এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রভাব পড়তে শুরু করল। গড়ে উঠল ছোটো-বড়ো নানা মাপের প্রকাশনা সংস্থা। সব কিছুর মধ্যেই এল একটা পুরোপুরি পেশাদারিত্বের আবহাওয়া। এর ফলে ইলাস্ট্রেটরদেরও একটা স্থায়ী রোজগারের রাস্তা তৈরি হল। বহু প্রকাশনা সংস্থায় শিল্পীরা মাস মাইনের চাকরি পেলেন।

এবার এসে গেল বিংশ শতাব্দী—আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার পদ্ধতি—এর সাহায্যে ছাপাখানায় এল এক বিরাট পরিবর্তন—যে কোনো ছবিকে আরও উন্নত মানের করে ছাপা আগের থেকে অনেক বেশি সহজ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, প্রকাশনা জগতের লোকেরা অবিলম্বে এই সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু

করলেন। পত্র-পত্রিকায় ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার বাড়তে লাগল জোর কদমে। শিল্পীরা নতুন নতুন ধরায় ছবি আঁকতে লাগলেন। কার্টুন, কমিক্স স্ট্রিপ, লেখার সঙ্গে ছবি, বইপত্রের প্রচ্ছদ সব মিলিয়ে স্বতন্ত্র শিল্প-মাধ্যম হিসেবে নিজের একটা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিল। লেখকদের পাশাপাশি ইলাস্ট্রেটররাও পেতে লাগলেন সমান মর্যাদা। এমনকি, বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শিল্পীদের আঁকা এতটাই আকর্ষণীয় হয়েছে যে ব্রেক সেই টানেই পাঠকরা বইপত্র বাছাই করেছেন। এই ভাবে ইলাস্ট্রেটরদের একটা স্টার ভ্যালু তৈরি হয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছে। গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধে মার্কিন ইলাস্ট্রেটর নরমান রক্‌ওয়েল এতটাই জনসমাদর পেয়েছিলেন যে তাঁকে সরকারিভাবে মহান মার্কিন নাগরিক হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছিল।

যে কাগজে তিনি কাজ করতেন সেই *The Saturday Evening Post* ব্রেক তাঁর ইলাস্ট্রেশনের জোরেই বছরের পর বছর ধরে তার বিক্রি বাড়িয়েছে।

তবে ইলাস্ট্রেশনে অভিনবত্ব সৃষ্টির সব থেকে বেশি সুযোগ শিল্পীরা পেয়েছে শিশু সাহিত্যের জগতে। ছোটোরা চিরকালই পাঠকসমাজের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে। একাধারে জ্ঞান বিস্তার এবং বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাল ভাল বইয়ের অভাব তাদের কোনোদিনও হয়নি। আর ভাল বই মানেই তো তাকে হতে হবে ইলাস্ট্রেশনে ভরপুর। কেননা ছোটোদের কাছে ছবির ভাষা বেশি সহজবোধ্য। লিখতে পড়তে শেখেনি এমন ফুদে বাচ্চাকেও স্রেফ ছবির পর ছবি দেখিয়ে একটা গোটা গল্প বুঝিয়ে দেওয়া যায়—এইখানেই ইলাস্ট্রেটরা বাজিমাৎ করে দিয়েছেন। তাঁদের হাতে পড়ে এক-একখানি বই এতই আকর্ষণীয় চেহারা নিয়েছে যে পড়া হয়ে গেলেও স্রেফ ছবিগুলোর টানেই বারবার পাতা ওল্টাতে হয়। কুইন্‌টিন ব্লেক, কেট গ্রিনঅ্যাওয়ে, রিচার্ড স্ক্যারি বা ভিক্টর অ্যামব্রোসের ইলাস্ট্রেট করা বইগুলো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন।

বাংলায় বই ছাপা হয় ইংরেজদের হাতেই, তবে প্রথম থেকেই ইলাস্ট্রেশন করার ব্যাপারে বাঙালি শিল্পীদের উৎসাহ ছিল প্রচুর। বিংশ শতকের গোড়ায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছোটদের জন্য গল্প লিখে নিজেই তার ইলাস্ট্রেশন করেছেন। সেই সঙ্গে মুদ্রণবিশারদ হিসেবেও তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ছেলে সুকুমার রায়ও ছিলেন ইলাস্ট্রেটর হিসেবে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নিজের লেখা অসাধারণ মজার সব কবিতা আর গল্পের সঙ্গে তিনি 'হাঁসজারু', 'কুমড়োপটাশ' বা 'রামগরুড়ের ছানা'র মতো অসংখ্য যে সব প্রাণীদের এঁকেছেন, বাঙালি পাঠকের কাছে আজও তারা অমর হয়ে আছে।

তবে সব থেকে মূল্যবান কাজ করে গিয়েছেন নন্দলাল বসু। তাঁর কাজের মধ্যেই প্রথম একটা খাঁটি দেশীয় মেজাজ পাওয়া যায়। তিনিই হলেন বাংলা ভাষায় আধুনিক ইলাস্ট্রেশনের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের লেখা *সহজপাঠ* বইটির তিনটে পর্বে কখনও তুলি দিয়ে, কখনও নিব ব্যবহার করে আলাদা তিনটে স্টাইলে করা ইলাস্ট্রেশনে তিনি এঁকেছেন তালগাছ, কুঁড়ে ঘর, কৃষক কিংবা গরুরগাড়ি। গ্রাম বাংলার যে সহজ সুন্দর ছবি এতে ফুটে উঠেছে প্রতিটি শিল্পীর কাছেই তা দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি চিরকালই একটু বেশি, ফলে ছোটো বড়ো সবার জন্যে পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর। বাঙালি ইলাস্ট্রেটররাও তাই ছবি নিয়ে অনেক বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালি ইলাস্ট্রেটরদের আধিক্য এবং চাহিদাও চিরকাল চোখে পড়ার মতন।

তবে বাংলা বইপত্রের বাজার সীমিত বলে ছাপার ক্ষেত্রে প্রকাশকদের কিছুটা কার্পণ্য করতেই হয়, ফলে দামি কাগজে পাতায় পাতায় রঙিন ইলাস্ট্রেশন সহকারে বাঙলা বই ছাপা হতে সেভাবে দেখা যায়নি কোনোদিন। বহু ক্ষমতাবান শিল্পীকেই শাদাকালোতে ছোটো ছোটো ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

বেশ কিছুদিন থেকেই টিভি আর কেবল চ্যানেলের কল্যাণে লোকজন বইপড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সকালবেলা খবরের কাগজটা একটু উল্টে পাল্টে দেখা ছাড়া বহু শিক্ষিত বাড়িতেই ছাপার অক্ষরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। এই সমস্যা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে। এই কারণে বিদেশে *PUNCH*-এর মতো কার্টুন পত্রিকা উঠে গেল—এমন তুলকালাম মজার কাগজ যে *MAD* তারও কী করুণ চেহারা হয়েছে—বহু নামী পত্রিকা রয়েছে, যা চালাতে গিয়ে প্রকাশকদের রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে। জ্যাক ডেভিস, ডন মার্টিনের মতো দিকপাল ইলাস্ট্রেটররা কবেই বিদায় নিয়েছে। টিনটিন স্রষ্টা হার্জ বা হিথ রবিনসনের মতো যুগান্তকারী শিল্পীদের জায়গাগুলোও খালি থেকে গিয়েছে। ইলাস্ট্রেশন নিয়ে যে উন্মাদনা কুড়ি বছর আগেও ছিল আজ তা কোথায়।

একসময় এক-একজন ইলাস্ট্রেটর এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে শুধু ছবি দেখেই শিল্পীর নাম বলে দিতে পারার মতন অসংখ্য রসিক পাঠক খুঁজে পাওয়া যেত। আজও এরকম অনেকেই আছেন যাঁরা ইলাস্ট্রেশনের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কোনো কলা সমালোচক, মিডিয়া বা মেগা সেলিব্রিটি নয়—এই সব পাঠকদের খুশি করেই একজন ইলাস্ট্রেটরকে টিকে থাকতে হয়।

বইপত্রের এই ভাঁটার যুগে ইলাস্ট্রেটরদের বাজার অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে—প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে বহু শিল্পী আসছেন কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যত খুবই অনিশ্চিত—কিছুটা ভরসা অবশ্য অ্যানিমেশন ফিল্ম-এর কাজ, তবে সেখানে একজন কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য কোনোটাই থাকে না। একজন ইলাস্ট্রেটর লেখার বিষয়বস্তুকে তাঁর ছবির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—যতটা খুশি বিচিত্র আকারে পরিবেশন করতে পারেন—লেখার মধ্যে যা আছে তার সঙ্গে নিজের কল্পনাশক্তি ও শৈলীকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে যোগ করে দিতে পারেন বাড়তি বহু উপাদান, স্রেফ ভিস্যুয়ালকে আরও বর্ণনাত্মক করার জন্যেই। প্রতিটি ইলাস্ট্রেশনই হয়ে দাঁড়াতে পারে আলাদাভাবে এক-একটা ছবি। এক-একটা চ্যালেঞ্জ। বহু অসুবিধের মধ্য দিয়ে একজন ইলাস্ট্রেটরকে কাজ করে যেতে হয় একটা বাঁধা সময়সীমার মধ্যে লেখাটাকে বুঝে নিয়ে চটজলদি আইডিয়া তৈরি করে, তারপর যেটুকু জায়গা ছবির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে যতটা সম্ভব নিখুঁত ডিটেল্‌স রেখে একটা ইলাস্ট্রেশন করে ফেলতে হয়। বইয়ের জন্য প্রকাশকরা

অন্তত তাড়া না দিলেও খবরের কাগজে বা সাময়িক পত্রিকাতে ইলাস্ট্রেটরদের খুবই দ্রুত কাজ করতে হয়—অনেক সময় তিন-চারটি আলাদা বিষয় নিয়ে পর পর এঁকে যেতে হয় বিভিন্ন মেজাজের ছবি—অনেক ক্ষেত্রে সঠিক reference খুঁজতে গিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় বিস্তর বইপত্র। সব কিছুর জন্যেই একজন ইলাস্ট্রেটর নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন এবং এইখানেই তাঁর পেশাদারিত্ব।

ইলাস্ট্রেশন করাটা কখনো কাউকে হাতে ধরে শেখানো যায় না। যদিও বহু জায়গায় এর পাঠক্রম আছে তবু এটা হল ভেতরকার জিনিস যাকে বলে Conception। নিজের মতো করে এই Conception-কে পরিচর্যা করতে হয়, চিন্তার একটা ব্যাপ্তি তৈরি করতে হয়— নানা বিষয় নিয়ে উৎসাহ থাকা চাই, পড়াশুনো করা চাই এবং সে ছাড়াও আছে নিজের পারিপার্শ্বিক আর মানুষজনকে ভালভাবে জানার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ড্রয়িং-এ দখল থাকাটাও খুব জরুরি। নিয়মিত ভাল ভাল কাজও মন দিয়ে দেখতে হবে—এছাড়া রয়েছে অনুশীলন। কোন্ গল্পের কোন্ সিচুয়েশনকে কীভাবে আঁকতে পারলে গল্পের সঠিক মেজাজটা বোঝা যাবে, এই শিক্ষাটা নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে মনে আসে, *সন্দেশ* পত্রিকার জন্য সত্যজিৎ রায়ের করা আন্তন চেকভের 'ভাংকা' গল্পটির সঙ্গে ইলাস্ট্রেশনটির কথা। একটি ছোটো ছেলে প্রচণ্ড শীতের রাত্রে মোটা গরম জামা গায়ে ঝুঁকে পড়ে কলম দিয়ে একটা কাগজে কিছু লিখছে। ছবিতে ছেলেটি ছাড়া শুধু রয়েছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি, আর ছেলেটির ঠিক পিছনে তার একটা প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে। গল্পটি যাঁরা পড়বেন তাঁরা এই ছবিটি দেখে বুঝতে পারবেন 'ভাংকা' নামে এই হতভাগ্য ছেলেটির এ এক করুণ কাহিনি গোটা ছবিটিতে যা নিখুঁতভাবে বলা রয়েছে। ইলাস্ট্রেশন এ-ভাবেই একটা মহান শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

ইসলাম

আবদুর রাউফ

ইহুদিধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্মের বিকাশ। ইসলামের অনুসারীরা অবশ্য বিশ্বাস করেন, ধরাধামে মনুষ্যপ্রজাতির আবির্ভাব পর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল ইসলাম ধর্ম। বাইবেলে যে আদিমানব আদমের কাহিনি আছে, তাঁর আচরিত ধর্মকেই ইসলাম বলে তাঁরা দাবি করেন। তাঁদের মতে ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম এবং এধরনের আরো অন্যান্য ধর্মও আদিতে ছিল ইসলাম। এসব ধর্মের প্রবর্তকেরাও ছিলেন আল্লার দূত বা পয়গম্বর। কিন্তু কালক্রমে অনুরাগীদের দ্বারা ধর্মগুলি বিকৃতি লাভ করায় আল্লা তাঁর শেষতম পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ রূপ প্রচার করেন বলে এই ধর্মের অনুসারীরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। সেই অর্থে মহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, প্রচারক মাত্র।

'ইসলাম' আরবি শব্দ। এর অর্থ শান্তি এবং আত্মসমর্পণ। এক এবং অদ্বিতীয় আল্লার অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা এবং তাঁর প্রচারিত নির্দেশাবলির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যই প্রকৃত অর্থে আত্মসমর্পণ। যথার্থ মুসলমানেরা মনে করেন এ ধরনের আত্মসমর্পণ থেকে পাওয়া যে শান্তি তারই নাম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় 'মুসলমান'। এটিও আরবি শব্দ, যার অর্থ আত্মসমর্পণকারী। যাঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লা এক এবং নিরাকার, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য প্রভু নেই এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ পয়গম্বর তাঁরাই মুসলমান।

মুসলমান হওয়ার জন্য যে বাক্যগুলি মুখে উচ্চারণ করতে হয়, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হয় এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করতে হয় সেইগুলিই 'কলেমা'। কলেমা নামে পরিচিত বাক্যগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম ভাগটির নাম 'কলেমা তৈয়ব', আরবিতে একটি মাত্র বাক্য : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল। 'রসুল' শব্দের অর্থ দূত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, 'পয়গম্বর' শব্দটি পারসি, যার অর্থ সংবাদদাতা। মহম্মদের উদ্দেশে আরবিতে 'রসুল' এবং 'নবি দুটি কথাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নবির কাছে কোনো ঐশ্বরিক গ্রন্থ নাও আসতে পারে। রসুল তিনিই যিনি এই ধরনের গ্রন্থ প্রচারের অধিকার পেয়ে থাকেন। মহম্মদ তাই একই সঙ্গে নবি এবং রসুল। আল্লা এবং তাঁর শেষ রসুল মহম্মদকে উদ্দেশ করে কলেমা তৈয়বের মত আরো চারটি কলেমা বা বাক্যবিন্যাস

আছে। যে বাক্য বিন্যাসগুলির উপর গভীর আস্থা স্থাপনের নামই 'ইমান'। ইমান কথার অর্থ বিশ্বাস।

যাঁরা ইসলাম ধর্মে ইমান এনেছেন তাঁদের জন্য কয়েকটি অবশ্যপালনীয় ('ফরজ') কৃত্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কৃত্যটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'কলেমা' অর্থাৎ আল্লা এবং মহম্মদের উদ্দেশে নিবেদিত নির্দিষ্ট কতকগুলি বাক্যবিন্যাসে সংশয়াতীত আস্থা স্থাপন করে নিজের ইমান ঠিক করে নেওয়া। দ্বিতীয় কৃত্য 'নামাজ'। ভোরে, দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রির প্রথম ভাগে আজান অর্থাৎ আহ্বান ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গিয়ে কিংবা যে যার গৃহে, অথবা যে যেখানে আছে সেখানেই ওজু শেষে অর্থাৎ মুখমণ্ডল, হাত পা ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে নির্দিষ্ট বিধি মেনে পাঁচবার নামাজে অংশগ্রহণ করাও অবশ্য করণীয়ের মধ্যে পড়ে। তৃতীয় কৃত্য, চান্দ্রমাসের গণনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বছরে একমাস 'রোজা' পালন। সূর্যোদয়ের অনেকখানি আগে উষাকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন নিরম্বু উপবাস পালনের নামই রোজা। এভাবে এক মাস রোজা পালন সম্পূর্ণ হওয়ার পর আসে খুশির উৎসব 'ইদ-উল-ফিতর'। চতুর্থ কৃত্য, 'জাকাত'। কোনও মুসলমান যদি তার নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মালিকানা কমপক্ষে এক বৎসর (৩৫৪ দিন) ভোগ করে তাহলেই সেই সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করাটা তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। পঞ্চম কৃত্য, 'হজ'। যাঁদের সামর্থ্য আছে, (এক্ষেত্রে সামর্থ্য বলতে বোঝায় যিনি যাতায়াতের খরচ বহন করতে পারেন, যাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিবারের আর্থিক সংকটে পড়ার আশঙ্কা থাকে না) এমন ব্যক্তির পক্ষে জীবনে অন্তত একবার হজ করা অর্থাৎ বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে মক্কায় গিয়ে কতকগুলি আচরণবিধি পালন করা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ইসলাম ধর্মের সমগ্র ব্যবহারিক দিকটি যেহেতু দাঁড়িয়ে আছে উল্লিখিত কৃত্যগুলির উপর তাই এগুলি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ নামে অভিহিত হয়।

ইসলামে পঞ্চস্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত কৃত্যগুলির ধারণা পাওয়া গেছে কোরআন এবং হাদিস থেকে। কোরআনকে বলা হয় আল্লার বাণী। ইমানদার মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লা তাঁর ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে মহম্মদের কাছে যেসব 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলেন সেগুলিই সংকলিত আকারে কোরআন নামক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রত্যাদেশ মহম্মদ পেতেন অনেকখানি, আবিষ্ট অবস্থায়, যে অবস্থায় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তিনি সম্পর্করহিত হয়ে পড়তেন। পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো পুরো প্রত্যাদেশটি তাঁর স্মরণে থাকত। সেটি তিনি পুনরাবৃত্তি করলে তাঁর অনুগামীরা সেটি সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলতেন এবং লিখে নিতেন। কোরআন সংকলিত হয়েছিল এইভাবেই। হাদিস কিন্তু এইভাবে সংকলিত হয়নি। মহম্মদের মৃত্যুর পরেও বহুকাল হাদিস প্রচলিত ছিল অনেকখানি ট্রাডিশন বা ইসলামি ঐতিহ্যের আকারে। ট্রাডিশনটি মহম্মদের নিজস্ব সৃষ্টি। যে-ওহি বা প্রত্যাদেশ তিনি পেতেন সেগুলির যথার্থ তাৎপর্য কিছু কিছু জটিল পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হত। তাছাড়া অনুগামীদের ব্যবহারিক জীবনে শৃঙ্খলা এবং সংহতি আনার জন্য বিভিন্ন

ধরনের বিধি নিষেধ, রীতি-নীতি ইত্যাদি তাঁকে প্রবর্তন করতে হয়েছিল। এসব করতে গিয়ে মহম্মদ যা যা বলতেন, অনুগামীদের যেসব আচরণ অনুমোদন করতেন, যেগুলি বাতিল করতেন, সেসবের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল একটি সুনির্দিষ্ট ট্রাডিশন। মহম্মদসৃষ্ট ট্রাডিশনকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইমাম সংকলিত করে লিখিত হাদিস প্রচার করেন। ইমানদার মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে যেসব বিধান মেনে চলার প্রয়াস লক্ষ করা যায় সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই কোরআন এবং হাদিস-নির্দেশিত। এ ধরনের বিধানগুলিকেই একত্রে বলা হয় 'শরিয়ত'। শরিয়তের এমন বহু বিধানই আছে যা কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষার ব্যাখ্যা নির্ভর। ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। মতভেদ নিরসনের বিশেষ পদ্ধতিও আছে। পদ্ধতি থাকলেও মতভেদ যে সব সময় নিরসিত হয় এমন নয়।

কেবলমাত্র শরিয়তের বিধান নিয়েই নয়, কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়েও মতভেদ কিছু কম নেই। এইসব ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে ইসলামের অনুগামীদের মধ্যে নানাধরনের 'মজহাব' বা গোষ্ঠী আছে। তবে গোষ্ঠী যতই থাক আল্লা ছাড়া কোনও উপাস্য প্রভু নেই এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত 'রসুল' এ নিয়ে কোনও মতভেদ নেই। মুসলমানরা যেহেতু মহম্মদের মাধ্যমে কোরআন পেয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্ট ট্রাডিশনই তাঁদের কাছে হাদিস, তাই এই মহাপুরুষ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসী হৃদয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁর বিন্দুমাত্র সমালোচনাও তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। যাঁদের বিশ্বাস গভীর তাঁরা জানেন মহম্মদ সম্পর্কে তিলমাত্র আস্থার অভাব ঘটলেই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে। সেই কারণে মুসলমানরা বরং স্রষ্টা আল্লা সম্পর্কে মান-অভিমান, সমালোচনা, রঙ্গ-সরিকতা ইত্যাদিকে প্রশয় দিলেও তাঁর প্রেরিত রসুল মহম্মদ সম্পর্কে তিলমাত্র চটুলভারও পছন্দ করেন না। যেসব অমুসলমান মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখেই তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মহাপুরুষের তুলনা করে ফেলেন তাঁরাও ইমানদার মুসলমানদের ভাবাবেগে অজান্তেই আঘাত করে বসেন। তবে মুসলমানরা কেবলমাত্র মহম্মদ সম্পর্কেই স্পর্শকাতর, তাছাড়া ইসলাম ধর্মের বাকি প্রসঙ্গ নিয়ে যতই মতভেদ প্রকাশ করা হোক, এমনকী কোরআনেরও যতই ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করা হোক তাতে অন্তত সাধারণ মুসলমান যাঁদের কোনও আর্থ-রাজনৈতিক মতলব নেই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার কোনো কারণ খুঁজে পান না। মহম্মদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিক স্বসম্প্রদায়ের সাধারণ বিশ্বাসী মানুষের এই সেন্টিমেন্টটা বোঝেন না বলেই মাঝে মাঝে বিপত্তি বাধিয়ে বসেন। সম্পূর্ণ পয়গম্বর-নির্ভর এরকম একটি ধর্ম, কেবলমাত্র ঐশীগ্রন্থ তাঁর মাধ্যমে পাওয়া গেছে বলেই নয়, পয়গম্বরের নিজস্ব সৃষ্ট ট্রাডিশন বা হাদিসও যে ধর্মের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এমনটি আর দ্বিতীয় কোনো ধর্মে নেই। এই ধর্মে পয়গম্বর মহম্মদকে ছাড়া বিশ্বাসের জমিটা একেবারে বরবাদ হয়ে যায় বলেই তাঁকে কেন্দ্র করে ভাবাবেগ এত গভীর। ব্যাপারটা অমুসলমানদের পক্ষে এবং সংশয়বাদীদের পক্ষে অনুধাবন করা বেশি কঠিন।

মহম্মদ যে আল্লার প্রেরিত রসুল— এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদের কোনও

অবকাশ না থাকলেও তাঁর উত্তরাধিকার নির্বাচন নিয়ে যে মতান্তর রয়েছে তা নিরসনের কোনো সম্ভাবনাই আর আছে বলে কেউ স্বীকার করেন না। মুসলমানদের মধ্যে 'শিয়া' 'সুন্নি' ভেদাভেদের উদ্ভব এই অনপনেয় মতান্তরকে কেন্দ্র করেই। ইসলামের ইতিহাসে যেমনটি ঘটেছে, অর্থাৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের অনুগামীদের নেতৃত্ব বর্তেছিল প্রথম খলিফা (খলিফা একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ প্রতিনিধি, কোরআন মতে মানুষের জগতে আল্লাহ প্রতিনিধি) আবু বকরের উপর, তিনি মহম্মদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইভাবেই পর পর চারজন খলিফা নির্বাচিত হয়ে তৎকালীন মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন— সুন্নিরা এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো ভুল আছে বলে মনে করেন না। 'সুন্নি' শব্দের অর্থ সুন্নতের অনুসারী। 'সুন্নত' বলতে মহম্মদের নীতি ও আদর্শ কিংবা তাঁর সৃষ্ট ট্রাডিশনকে বুঝিয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিদের সংখ্যাই বেশি। শিয়ারা তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। শিয়ারা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্ণয়ের উল্লিখিত পদ্ধতি অনুমোদন করেন না। তাঁরা মনে করেন মহম্মদের পরেই নেতৃত্বের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ছিল হজরত আলির। কারণ তিনি মহম্মদের পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং নেতৃত্বের ঐশ্বরিক মহিমার উত্তরাধিকার তাঁর উপরেই বর্তেছিল। শিয়াদের মতে পরবর্তী পর্যায়েও মহম্মদের কন্যা ফতিমা এবং তাঁর স্বামী আলির বংশোদ্ভূতরাই কেবলমাত্র নেতৃত্বের ঐশ্বরিক মহিমার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন। সেই কারণে শিয়ারা মহম্মদ-পরবর্তী পর্যায়ে কেবলমাত্র আলি এবং তাঁর বংশধরদের ইমাম বা নেতা হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। শিয়া শব্দের অর্থ দল, এটি উৎপন্ন হয়েছে 'শিয়া-ইত-ই আলি' বয়ান থেকে, অর্থাৎ আলির দল। সারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইরানেই শিয়ারা সুন্নিদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য আনুষঙ্গিক আরো কতকগুলি বিষয়ে ধারণা না থাকলেই নয়। যেমন, জানা দরকার ইসলামে পয়গম্বর, পির এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় নাম লিখলেই তাঁদের নামের পাশে বন্ধনীর ভিতরে (দ), (স), (আ), (রা), এইসব লেখা হয় কেন? এসব কিছু 'দরুদ' পাঠের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন হজরত মহম্মদের নাম উচ্চারিত হলে বা শুনলে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা সঙ্গে সঙ্গে সরবে কিংবা নীরবে দরুদ পাঠ করেন, সাল্লাহ আল্লায় হে অ সাল্লাম। যার অর্থ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এটাই সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয় (দ) বা (স)। হজরত মহম্মদ ছাড়া অন্য কোনো নবি বা রসুলের নাম, উচ্চারণ করা, লেখা বা শোনার সঙ্গে তারা পাঠ করেন, 'আল্লায়হে সাল্লাম', এরও অর্থ, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এটারই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (আ)। অনুরূপভাবে আল্লার অলি কিংবা পিরদের নামের পাশে থাকে (র) যার অর্থ, নামটি শোনা, বলা বা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা পাঠ করেন, 'রহমতুল্লাহ আলায় হে' অর্থাৎ আল্লা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। এ ধরনের আরো কিছু কিছু চিহ্ন আছে যা ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্ট মানুষের নামের পাশে দরুদ পাঠের চিহ্ন হিসাবে উল্লিখিত হয়। এ ধরনের যেসব অগ্রগণ্য মানুষের সাধনার দ্বারা ইসলামের ইতিহাস মহিমান্বিত হয়েছে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা এভাবেই গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার

সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করে থাকেন। তবে যাঁরা বলেন ব্যাপারটা ইদানীং নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, এভাবে কথায় কথায় দরুদ পাঠ না করেও হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায়, তাঁদের সমালোচনা উপেক্ষণীয় নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য বিশিষ্ট ফেরেশতাদের নামের সঙ্গেও দরুদ পাঠের রেওয়াজ আছে।

ইসলাম ধর্মের আর একটি আনুষঙ্গিক বিষয় হল, 'ফেরেশতা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আকাশে বাতাসে অসংখ্য ফেরেশতার অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁরা আল্লার 'নুর' বা জ্যোতি থেকে তৈরি। এঁরা আল্লার নির্দেশে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন জিবরাইল যে কোরআনের বাণী মহম্মদের কাছে বহন করে এনেছিলেন একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহম্মদের আগে অন্যান্য নবিদের কাছেও ঐশ্বরিক বাণীবাহক ছিলেন জিবরাইল। বাইবেলে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে গ্যাব্রিয়েল নামে। ফেরেশতা ইস্রাফিলের কাজ শিঙা বাজিয়ে প্রলয় ঘোষণা করা। বাইবেলে এই ফেরেশতা হিব্রুভাষায় সেরাফিম নামে উল্লেখিত হয়েছেন। আযরাইলকে বলা হয় মৃত্যুর ফেরেশতা। সমস্ত মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রাণহরণ করার দায়িত্ব রয়েছে এঁর উপর। খাদ্য, পানীয় এবং বৃষ্টিপাতের ফেরেশতার নাম মিকাইল। এ ধরনের আরো বহু কাজের দায়িত্বে রয়েছেন বিভিন্ন নামের ফেরেশতারা। অশরীরী এবং জ্যোতির্ময় জীব ফেরেশতাদের দুটি কিংবা আরও অধিক ডানা আছে যাতে তাঁরা ক্ষিপ্র গতিতে পৃথিবী ও আকাশের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে যাঁরা গল্পকথা ভাবেন তাঁরা ইমানদার মুসলমান বলে গণ্য হতে পারেন না।

ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা ফেরেশতাদের মতই 'জিন'দের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। এরা বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং ইচ্ছেমতো বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। কোরআনের বয়ান থেকে জানা যায় মানুষকে যেমন বানানো হয়েছে মাটি থেকে, জিন সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে। পৃথিবীতে জিনদের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও ইসলামের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন তারা আছে এবং ভালো মন্দ কাজের জন্য মানুষের মতো তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে। যে কারণে ভালো এবং মন্দ দু'ধরনের জিনের অস্তিত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। ইসলামে যে শয়তানের বর্ণনা রয়েছে তাঁর নাম 'ইবলিশ'। তিনি জাতিতে একজন জিন। আপন এবাদত বা উপাসনায় গভীর নিষ্ঠার গুণে তিনি এক সময় জিন এবং ফেরেশতা উভয়েরই সরদারি বা নেতৃত্বের পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লার নির্দেশে মাটি থেকে সৃষ্ট আদিমানব মানুষকে সিজদা বা প্রণাম করতে অসম্মত হওয়ায় তিনি অভিশপ্ত ইবলিশ বা শয়তানে রূপান্তরিত হন। তখন থেকেই তিনি মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়া এবং কুপথে পরিচালনা করার নিরন্তর প্রয়াসে লিপ্ত। অভিশপ্ত হলেও ইবলিশ এমন সব ক্ষমতার অধিকারী যা আল্লা ছাড়াও কারো নেই। এহেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইবলিশের বিরুদ্ধে মূলত মানসিক লড়াই চালিয়ে মানুষকে আল্লার পথে অবিচল থাকতে হয়। মানুষের যা কিছু মন্দগুণ, কুপ্রবৃত্তি এবং কুকর্মের প্রতি আগ্রহ—সবই শয়তান বা ইবলিশের কারসাজি হিসাবে বিবেচিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, আল্লা ইবলিশকে অসামান্য ক্ষমতা দিয়ে

স্বাধীনভাবে তাঁর শয়তানি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়েই মানুষের ইমান যাচাই হয়। তাকে খাঁটি মানুষে রূপান্তরিত করার এবং যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় উন্নীত করার এটাই সর্বোত্তম প্রক্রিয়া বলে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন। ইসলাম ধর্মে ইবলিশের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মুহূর্তে ইবলিশের হামলার আশঙ্কা আছে বলেই খাঁটি মুসলমানকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ ইবলিশের নিরন্তর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারা।

উত্তরগঠনবাদ

রাহুল দাশগুপ্ত

গঠনবাদের সমালোচনা হিসাবে, আবার কারও মতে গঠনবাদের পরবর্তী ধাপ হিসাবে উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষদিকে উত্তরগঠনবাদের উদ্ভব। দেরিদার 'অবিনির্মাণতত্ত্ব', বার্তের শেষের দিকের রচনা, লাকাঁ এবং জুলিয়া ক্রিসতেভার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণতত্ত্ব, লুই আলথুজেরের রাষ্ট্রীয় পীড়নের ভাষ্য এবং মিশেল ফুকোর ঐতিহাসিক সমালোচনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উত্তরগঠনবাদের জয়যাত্রা।

অবশ্য বহু আগেই মিখাইল বাখতিনের শিষ্য ভ্যালেন্তিন নিকোলায়েভিচ ভলোশিনভ (১৮৮৪-১৯৩৬) তাঁর প্রতিগঠনবাদী গ্রন্থ *মার্ক্সিজম অ্যাণ্ড দি ফিলজফি অব ল্যাঙ্গোয়েজ* (১৯২৯)-এ সোস্যুরের স্থান ও কালের মধ্যে দেওয়াল রচনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভাষার স্থানিক মাত্রাই প্রধান হয়ে উঠলে, সময়ের ভূমিকা অর্থাৎ ভাষাগত আকরণে বিপুল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বোঝা যায় না। আবার 'পারোল' বা 'ব্যক্তি-উচ্চারণ'কে বাদ দিলে ভাষা সামাজিক প্রেক্ষিতের চলিষ্ণুতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক নিরেট বস্তু হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

অতএব ভোলোসিনভের (কারও কারও মতে, যা স্বয়ং বাখতিনেরই ছদ্মনাম) মতে, ভাষা বিনিময়ধর্মী, এক ধনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা, খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিচৈতন্যের উচ্চারণের যোগফল হিসাবে দেখলে তাকে চলবে না। বিচ্ছিন্ন 'বাক্য' নয়, একমাত্র 'উক্তি' হতে পারে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঠিক একক। 'উক্তি' সর্বদাই দ্বিবাচনিক। তাই এটি একটি সামাজিক ঘটনা, যেখানে রয়েছে শ্রেণিসংঘাতের বিভিন্ন বিসংবাদী স্বরের ছাপ। অর্থাৎ ভাষা একটি প্রবহমান, পরিবর্তনশীল, সংলাপমুখর বিষয়। তা একই সঙ্গে স্থানানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক। বাচন ও ভাষাতন্ত্র—ভাষার ক্ষেত্রে দুই-ই সমান জরুরি। তাই ভাষার তত্ত্বে স্থান-কাল-অনন্তরতা অনিবার্য।

সোস্যুরের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি চিহ্নক সীমিত ছিল একটি নির্দিষ্ট চিহ্নের গণ্ডিতে। সোস্যুরের মতে, চিহ্নক ও চিহ্ননের মধ্যে সম্পর্ক নেহাৎ কাকতালীয়, আপতিক। কিন্তু সামাজিক ব্যবহারের ফলে একবার এই সম্পর্ক স্থাপিত হলে, চিহ্নক ও চিহ্ননকে তখন পরস্পরের থেকে পৃথক করা যায় না। তাদের সম্পর্কের একটি স্থায়ী অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

চিহ্নক-চিহ্ননের সম্পর্কের এই স্থায়িত্বকেই প্রশ্ন করলেন উত্তরগঠনবাদীরা। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁরা দেখলেন অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার প্রকাশ। জাক দেরিদা দেখালেন,

চিহ্নক ও চিহ্নের সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট অর্থের সন্ধান স্রেফ পণ্ডশ্রম। চিহ্নের অনন্ত সম্ভাব্যতার মধ্যেই বাঁচে চিহ্নক। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া নিরন্তর প্রবহমান। চিহ্নক ও চিহ্নের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য সম্পর্ক তৈরি হয় যদিও, পরমুহূর্তে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের তাগিদে এই সেতু ভেঙে যায়। জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যত নতুন প্রেক্ষিত তৈরি হচ্ছে, সেই অনুযায়ী চিহ্নকদের মধ্যেও গড়ে ওঠে নতুন সম্বন্ধ ও পরম্পরা, প্রত্যাখ্যাত হয় স্থিতিশীল চিহ্নের প্রতি বিশ্বাস।

ফলে ভাষার মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে বিপুলায়তন শূন্য পরিসর, শব্দার্থবর্তী এক অফুরন্ত নৈঃশব্দ। এই পরিসর বা ব্যবধান যেহেতু অনতিক্রম্য, চূড়ান্ত কোনো অর্থে কেউ কখনো পৌঁছয় না। এই অফুরন্ত সম্ভাবনার মধ্যে সবসময়ই রয়ে যায় পরবর্তী কিছুর পূর্ব-আভাস, অনুপস্থিতের ছায়া-সম্পাত। চিহ্নক ও চিহ্নের টানাপোড়েনে অর্থের এই অন্তহীন পরম্পরা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলে 'ডিসসেমিনেশনস' বা 'বিস্তার প্রক্রিয়া'।

এ প্রসঙ্গেই আসে দেরিদার ডিফেরান্স (differance) তত্ত্ব। লেখন ও ভাষাকে তিনি চিহ্নিত করেন সোস্যুর কথিত ভেদ বা ব্যবধান (differance)-এর জালবিস্তার হিসাবে ও একই সঙ্গে অর্থ বা উপস্থিতি (presence)-কে স্থগিত বা মূলতুবি রাখা (deferral)-এর অশেষ প্রক্রিয়া বলে। (প্রসঙ্গত, সোস্যুর বলেছিলেন, ভাষায় আছে শুধু ভেদ বা ব্যবধান। ইতিবাচক কোনও চিহ্নই নেই সেখানে।) এর পরিণাম অর্থের মুক্ত বিচরণ (wandering), অথবা সরে বা পিছলে যাওয়া (slippage)। এটিই হল অর্থসৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত। এই প্রক্রিয়াকে তিনি নাম দেন স্বরচিত শব্দ differance (difference এবং deferral)। অর্থাৎ, যেকোনো লিখিত 'বয়ান'ই আসলে শূন্যগর্ভ, শব্দের নিজস্ব বা প্রকৃত 'অর্থ' বলে কিছু নেই, কোনো এক শব্দের 'অর্থ' অন্যান্য শব্দের কোনো এক 'অর্থ'-এর পারস্পরিক সমবায়ে গড়ে ওঠে, (যে অর্থ আবার ঢের কিছুর নেতিফল), ভেঙে যায়, পরিবর্তিত হয়ে চলে, আবার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতটি পরিবর্তিত হওয়া মাত্র হয়ে পড়ে শূন্যগর্ভ।

গঠনবাদের সীমারেখা পেরিয়ে বিপুল সম্ভাবনা ও চলিষ্ণুতার এই ইশারাই দেখা যায় রোলাঁ বার্তের 'দি ডেথ অব দি অথর' প্রবন্ধে। অথর বা পাঠকর্তার সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচকদের ব্যাখ্যার ফলে কোনও 'পাঠ'-এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ স্থির হয়ে যায়। এই রাজনীতি আসলে পাঠকসমাজকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যই করা হয়। তখন পঠন হয়ে যায় একটি নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া এবং পাঠক হয়ে ওঠেন একজন নিষ্ক্রিয় প্রাপক। এইভাবে পাঠকর্তা, প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচক ও নিষ্ক্রিয় পাঠককে নিয়ে একটি বদ্ধ ও সংলাপহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পাঠকর্তার বিগ্রহের অপসারণ হলেই শুধুমাত্র সেই সংলাপ শুরু হতে পারে।

তাছাড়া পাঠকর্তার সর্বময় আধিপত্যের ফলে, সব পাঠই যে একটি অন্তর্পাঠী (intertexual chain) শৃঙ্খলের অঙ্গ, তাও বিস্মৃত হতে হয়। পাঠের কোনো চূড়ান্ত অর্থ হয় না, বরং লেখক-পাঠক আলাপ সমবায়েই উৎপন্ন হয় অর্থ। এভাবে চিহ্নকে

বেশি মান্যতা না দিয়ে পাঠকৃতির চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে পাঠকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো মুক্ত বা রুদ্ধ করে দিতে পারেন। লেখক স্রেফ একটি সম্ভাবনাগর্ভ বয়ান বা ডিসকোর্সের আদি-প্রস্তাবক মাত্র।

গঠনবাদ থেকে উত্তরগঠনবাদ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে এক যাত্রা। দেরিদার মতে, গঠনবাদ যে সমগ্রের কথা বলে, তার সর্বদাই একটি কেন্দ্র থাকে। ওই সমগ্রের অন্তর্গত চিহ্নগুলি একে অপরের সাপেক্ষে অর্থবহ হওয়ার সময়ও প্রকৃতপক্ষে ওই কেন্দ্রের ভাবনাকে মেনেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন করে। যদিও এই কেন্দ্রকে কখনো শনাক্ত করা যায় না। দেরিদা তাই এক কেন্দ্রবিহীন গঠনে পৌছতে চান। বার্তের মতেও, একটি আদর্শ পাঠকৃতি অজস্র চিহ্নকের সমষ্টি। চিহ্নের গঠন দিয়ে একে বোঝা যাবে না। তাই একটি পাঠপক্রিয়ায় ঢোকার অজস্র প্রবেশদ্বার থাকতে পারে।

কেন্দ্র ও প্রান্তের এই সংঘাতই উঠে আসে মিশেল ফুকো বা লুই আলথুজারের তত্ত্বে। ফুকোর মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের প্রতাপ ও আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্য ক্ষমতার বয়ান বা 'সত্য'কে নির্মাণ করে। তাই কেউ বিকল্প বয়ান হয়ে উঠতে চাইলেই, তাকে উন্মাদ, রুগ্ন, অপরাধী, দরিদ্র, গণিকা বা প্রথাবিচ্যুত অর্থাৎ অপর হিসাবে চিহ্নিত করে ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তিক অবস্থানে বা বদ্ধ করে রাখা হয় প্রাতিষ্ঠানিক খাঁচায়। আলথুজার দেখিয়েছেন, ভাবাদর্শও গড়ে ওঠে শাসকের চাতুর্যে। ক্ষমতাশালীদের প্রতাপকে নিরঙ্কুশ রাখার জন্যই তা নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একজিস্টেনসিয়ালিজম

শ্রাবন্তী ভৌমিক

যে-জীবন উপলব্ধি করা দার্শনিকের কাজ হওয়া উচিত, তা কোনো ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামগ্রিক সত্তা নয়। কোনো তত্ত্ব-অনুসন্ধান জীবনের মূল কাজ হতে পারে না, অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের বড়ো সত্য। বিংশ শতাব্দীর দর্শন 'অস্তিবাদ' (এক্‌জিস্টেনশিয়ালিজ্‌ম্‌) এই বক্তব্য প্রচার করে যে, দর্শন হল ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি, এবং যে সমস্যা আর সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তিকে জীবনযাপন করতে হয়, দর্শন হল তার প্রকাশ।

'অস্তিবাদ' মূলত বিংশ শতাব্দির দর্শন, যদিও এ-দর্শনের প্রবক্তা বলে যাঁর নাম আমরা স্মরণ করি, সেই সোরেন কিয়ের্কেগার্দ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই তাঁর কাজ শেষ করেছেন, তাঁর মত্যু হয়েছে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে (১৮১৩-১৮৫৫)। আসলে, বিংশ শতকে যখন মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানুষ তার অস্তিত্ব বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তখন সেই মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই ভাষার প্রয়োজন হল, এবং কিয়ের্কেগার্দের রচনায় এই আধুনিক ভাষার সন্ধান পেলেন দার্শনিকরা। আমাদের কাছে পরিচিত হল 'অস্তিবাদ' নামে এক আলোড়ন জাগানো দর্শন।

এই দর্শন প্রচার করেছেন কার্ল ইয়াসপার্স (১৮৮৩-১৯৭১) এবং গ্যাব্রিয়েল মারসেল (১৮৮৯-১৯৭৫)-এর মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী দার্শনিক, অন্যদিকে ফ্রিডরিশ নিটশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) আর জাঁ পল সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) মতো নাস্তিক চিন্তাবিদ।

সাধারণভাবে দার্শনিকরা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আগ্রহ বোধ করেন। তাঁরা মনে করেন, সারা জগতের একটি মূল তত্ত্ব আছে, যা উদঘাটন করা আর বিশ্লেষণ করা দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। আরো মনে করেন যে, মানুষের আছে একটি আত্ম-স্বরূপ, যার সন্ধান পেলে জাগতিক দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। এইরকম কোনো পরমতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না কোনও অস্তিবাদী। মানুষের কোনো সারধর্ম পূর্ব থেকে প্রদত্ত নয়। নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেই তার সারধর্ম গড়ে তুলতে পারে। মানুষ স্বাধীন—কোনও অচেতন বস্তুর মতো নিয়মের নিগড়ে সে আবদ্ধ নয়। যুক্তিবাদী দর্শনের ঠিক বিপরীত ক্রমের এই তত্ত্ব-অস্তিত্ব আগে, সারধর্ম পরে। ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ধারণ করে ব্যক্তির সারধর্ম।

যুক্তির জাল বিস্তার করা আর মানুষের জীবনকে সেই জালের অন্তরাল থেকে পরীক্ষা করে দেখা আমাদের কাজ নয়। যুক্তির গতি আর জীবনের গতি এক নয়। তাই হেগেল যে যুক্তি দিয়ে গতিকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, সে-তত্ত্বও মানেননি কিয়ের্কেগার্দ। জীবন হল একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া, আর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রচেষ্টায় অনবরত কাজ করে যাওয়া। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে, অনুভব করে তার ব্যক্তিসত্তার। একজন মানুষ যখন কোনো সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ায়, কোনো-না-কোনো সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হয়, কিন্তু সে এ-ও বোঝে যে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কাজ সে করবে, তা ভুল হতে পারে, সফল না হতে পারে সে জীবনে। প্রবল আবেগে, অন্তর-আন্দোলনে মথিত হয় তার জীবন এবং এই অনিশ্চয়তা, সফল না হতে পারার উদ্বেগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ঝুঁকি—এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তির আসল অস্তিত্ব।

অস্তিবাদ যেহেতু দর্শনকে ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি বলে মনে করে, সেহেতু এই দর্শন অনুযায়ী, যে-কোনো অনুভূতির নিরিখ একজন ব্যক্তি। তাই, কিয়ের্কেগার্দ, যাঁর প্রচণ্ড আবেগময়তা ছিল খ্রিষ্টীয় ধর্মকে কেন্দ্র করে, তিনি এই ধর্মের উপলব্ধি বলতে বুঝেছিলেন ব্যক্তিগত উপলব্ধি। ব্যক্তির জীবনে ধর্মবোধের অর্থ কী, এই নিয়ে তিনি ভেবেছেন। কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বা ধর্মগুরুর মাধ্যমে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হবে সরাসরি।

জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে ব্যক্তিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন হাইডেগার। কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন, মানুষ তার যথার্থ অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তখনই, যখন নিজের চরম সম্ভাবনাকে সফল করার দিকে সে এগোয়। তাঁর মতে, জীবনের পূর্ণতা বা পূর্ণরূপ হল মৃত্যু। এই সমাপ্তি নিশ্চিত আসে প্রতি মানুষের জীবনে, কিন্তু কখন? সেখানে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চিত নিশ্চয়তা মানুষের মনে জন্ম দেয় এক উদ্বেগের। সার্ত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই উদ্বেগ কখনো 'ভয়'-এর সমার্থক নয়, কোনো পার্থিব বস্তুর সাহায্যে আমাদের ক্ষতির আশঙ্কা নয়—এ হল অনিশ্চয়তার উদ্বেগ, নিজের এবং প্রত্যেকের। এই উদ্বেগ জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করেই ব্যক্তি তার জীবনে চলার পথ তৈরি করে নেয়।

সার্ত্র জানিয়েছেন, মানুষ হল চেতনা-সমন্বিত জগৎ-মধ্যস্থ এক সত্তা। এই সত্তা নিজের জন্যই নিজের সত্তা, 'স্ব-হেতু-সত্তা'। একে বোঝার জন্য চাই একটি নঞর্থক ধারণার বিশ্লেষণ। চেতনা সব সময়ে নিজেকে অতীত সত্তার 'নাশ' হিসেবে উপলব্ধি করে। নিজেকে অনবরত ভেঙে ভেঙে গড়ে তোলার চেষ্টা করে মানুষ। তাই মানুষ হল এমন একটি সত্তা যার মধ্য দিয়ে জগতে 'না'-এর আবির্ভাব হয়। আর এর 'নাশ' করার ক্ষমতা আছে বলেই চেতনা স্বাধীন। একটি সুরক্ষিত বেষ্টনীর মধ্যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি, যে-কোনো সময়ে পড়ে যেতে পারি। কেননা, সব সুরক্ষিত ব্যবস্থাকে পালটে দেওয়ার, অস্বীকার করার স্বাধীনতা আছে আমার। এইখানেই মানুষের উদ্বেগ-নিশ্চিতির অভাববোধ। এই উদ্বেগ অর্থহীন হতে পারে, কিন্তু এই হল মানুষের জীবনের মৌল উপাদান।

অন্তরের মধ্যে আমরা লালন করি এক শূন্যতার বোধ। যা আমার সম্ভাবনা আর যা আমার বাস্তব—দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান অনুভব করি আমি, উদ্বেগ ভর করে মনের মধ্যে, আর এইখানেই অনুভব করি শূন্যতার।

সত্য কি? মূল্য কী জীবনের? যা দার্শনিক অনুসন্ধানের এক গুরুতর বিষয়। অনিশ্চয়তাকে আত্মস্থ করার যে আবেগময় অন্তর্মুখী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষের নিত্য চলাচল, সেইখানে তার সত্যের উপলব্ধি। ব্যক্তির পক্ষে এই হল সর্বোচ্চ সত্য। যে-সত্যের সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজনের বা ব্যক্তির সমস্যার কোনো যোগ নেই, সেই সত্যের কোনো মূল্য নেই অস্তিবাদে। অস্তিবাদীর প্রেরণার উৎস হল ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা-সাধন, সমাজের মঙ্গলবিধান নয়। অস্তিবাদী দর্শনের সত্য হল—ব্যক্তির নিজ অভিজ্ঞতার আলোয় নেওয়া নতুন সিদ্ধান্ত।

এভাবে কি অস্তিবাদ এক বিষাদময়, কর্মবিমুখ, অনিশ্চিত জীবনের দিকে নিয়ে যায় মানুষকে? মৃত্যু যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যদি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক হয়, তবে কি মঙ্গল হতে পারে? সার্ত্র মানবতাবাদ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। বলেছিলেন, মানুষের জীবন সে গড়ে তোলে নিজেই, কিন্তু তার অস্তিত্ব সমাজের পটভূমিকায়। একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত। যা সে নিজের জীবনে ঘটায়, তা স্পর্শ করে অন্যের জীবনকেও। অন্য একজন যে-কাজ করে, সে দায়িত্বও বর্তায় তার ওপর। এইভাবে নৈরাশ্যময়তা কাটিয়ে ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সমাজের ঐক্যের কথা বললেন সার্ত্র। আর তার ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে অস্তিবাদের একটা সামঞ্জস্যও তিনি তৈরি করে তুলতে পারলেন।

একাঙ্ক

বাসবী রায়

একাঙ্ক নাটকের নামেই তার অবয়বের পরিচয়। কিন্তু নিছক বহিরঙ্গের বিচারে নয়, যথার্থ একাঙ্ক তার বিষয়গুণেও এক স্বতন্ত্র সংরূপ। অর্থাৎ এটি শুধু এক অঙ্কে বড় নাটকের সংক্ষিপ্ততম রূপান্তর নয় বরং এই নাটক তার স্বল্প কালসীমায় এমন এক নাট্যপুট উপস্থাপিত করে যা তার কেন্দ্রাভিমুখী নাট্যগতিতে দর্শক বা পাঠককে অখণ্ডতার স্বাদ দেয়। সেজন্য বহুমুখী ঘটনা সম্পন্ন কোনো কাহিনীর পরতে পরতে গড়ে তোলা গূঢ় গভীর বিস্তার তার কাম্য নয়, তুলনায় সে চায় কোনো বিশেষ ঘটনার চরম পরিস্থিতির আবহে দ্রুতই নাট্যকাহিনীকে যোগ্য উদঘাটনের মধ্যে দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছে দিতে; আর তারই মধ্যে বুনে দিতে ঘাতপ্রতিঘাতের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নাট্যোৎকণ্ঠার আততি, একান্ত নাটকীয় তাৎপর্যময় সংলাপের সূত্রে।

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ নাটকের বাইরে অনেক ছোটো নাট্যরচনারই সন্ধান পাওয়া যায়। সহজেই ভাবা যায় গ্রীক 'সাতুর' নাটক বা অনেক পরের 'কমেদিয়া দেল আর্তের' নাটক অথবা পরবর্তীকালে 'ইন্টারল্যুড' জাতীয় নাটকের কথা। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের 'ভাণ', 'প্রহসন', 'বীথি' বা জাপানের হাস্যরসাত্মক 'কিয়োগেন' তো ছোটো নাটকই। মধ্যযুগের ফ্রান্সে এবং ব্রিটেনেও তো প্রচলিত ছিল ধর্মীয় তথা নীতিমূলক ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি। এমনকী আরো পরের নানা স্যাটায়ার বা ফার্স যা 'curtain raiser' বা 'afterpiece' হিসেবে বিভিন্ন রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয়েছে অথবা জনপ্রিয় 'ভোদ্‌বিল' বিচিত্রানুষ্ঠানের অন্তর্গত প্রহসনগুলি কোনোটাই বড় নাটক নয়। ঠিক তেমনি উনিশ শতক থেকেই রঙ্গালয়ের তাগিদে বাংলাতেও লেখা হয়েছিল নানা প্রহসন পঞ্চরং বা সামাজিক নক্‌শা যার অনেকগুলি একটি দৃশ্যে পরিকল্পিত। তবু বর্তমানের সর্বজনগ্রাহ্য একাঙ্ক নাট্যধরনটি গড়ে ওঠার পেছনে এদের প্রভাব প্রধান নয়। এর প্রকৃত উদ্ভব উনিশ বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যখন সাহিত্যে তথা নাটকে আধুনিকতার প্রকাশে স্বতন্ত্র সংরূপ নির্মাণের তাগিদ অনুভূত হচ্ছিল। কারণ এই সময়েই দেখা গেল মানুষের পুরনো জীবনবোধ তথা বাস্তবদর্শনের ধারণাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে নানা নতুন চিন্তা তথা নতুন তত্ত্বের অভিঘাতে, আবার তারই সঙ্গে ঘনীভূত হচ্ছে সভ্যতার সঙ্কটের আততি। সে সময়ে জীবন চেতনার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ নয়, জীবনের খণ্ডিত রূপ তুলে ধরতে চাইছেন কেউ কেউ টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার সূত্রে। যেখানে বিশেষ

কোনো মুহূর্তের, বিশেষ কোনো অনুভবের, বিশেষ কোনো চেতনার বা বিশেষ কোনো স্বপ্নের প্রতিরূপ দেখাতে পারবেন নাট্যরচয়িতারা। এ যেন অল্প সময়ে বিরাট প্রবহমান জীবনেরই এক ক্ষণিক চিত্রের মধ্য দিয়ে জীবনের জটিলতাকে মূর্ত করে তোলা—বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ এনে দেওয়া। আর এভাবেই মিত পরিসরে একাঙ্ক খুঁজে পেতে চাইল নিজের যোগ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে তার যথার্থ দোসর বলে হয়ত ভাবা যায় ছোটোগল্পকে এবং তারই সূত্রে মনে আসে আমাদের চেকভের কথা যিনি প্রায় একই সময়ে লিখছেন ছোটো গল্প এবং একাঙ্ক। তবে এ পর্বে শুধু চেকভ্ নন, একাঙ্কের উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হিসেবে আমরা মেটারলিঙ্ক বা স্ট্রিণ্ডবার্গকেও মনে রাখব যেমন তেমনই আমাদের মনে পড়বে ও'নীল বা লাগেরকেভিস্ট-এর কথা।

অবশ্য বিশ শতকে একাঙ্কের প্রকৃত বিস্তারে লিটল থিয়েটারের উদ্ভব তথা প্রসার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চেকভ্ যখন তাঁর একাঙ্কগুলি লিখছেন তখনই ফ্রান্সে 'তেয়াত্র লাইব্র্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আঁদ্রে আঁতোয়ানের সক্রিয়তায়। আর এর পর থেকেই ১৯১১ সালের মধ্যে অসংখ্য লিটল থিয়েটার গড়ে ওঠে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, সুইডেন, জার্মানি, বেলজিয়াম, রাশিয়ার প্রায় সর্বত্র। ১৯১১-তেই সূত্রপাত হয়েছিল আমেরিকার লিটল থিয়েটার আন্দোলনের। পেশাদারী মঞ্চের জনমনোরঞ্জনকারী ব্যবসায়িক নাট্যপ্রযোজনার বাইরে ভিন্ন আদর্শে রচিত নাটক ও তার পরিবেশনার যোগ্য রঙ্গালয় গড়ে তোলাই ছিল ঐসব নাট্যপ্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য। তারা মনে করেছিল শুধুমাত্র প্রমোদের আয়োজনে নয় বরং দর্শকদেরই প্রয়োজনে যে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিত তাদের দৈনন্দিন বাস্তবকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারই বিশ্বস্ত রূপায়ণ থাকবে নাটকে। আর সেইসঙ্গে তাদের মঞ্চ পরিবেশনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে নানা স্বাধীন পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই একই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত আয়ারল্যাণ্ডের 'অ্যাবি থিয়েটারে সূত্রে লেখা হল অসাধারণ কয়েকটি একাঙ্ক। যেমন নোভি গ্রেগরির *স্প্রেডিং দ্য নিউজ*, বা *রাইজিং অফ দ্য মুন* অথবা সিঙ-এর *রাইডারস্ টু দ্য সী* বা *দ্য শ্যাডো অফ গ্লেন*। এ সময়েই লেখা ইয়েটস-এর কাব্যময় একাঙ্কগুলিও (বিশেষত *দ্য কিংস থ্রেশোল্ড, দি ইউনিকর্ণ ফ্রম দ্য স্টার, অন বেলস্ ষ্ট্রাণ্ড, ডইয়েরর্ড অফ দ্য সরোস*) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি বার্নার্ডশ-এর মত নাট্যকারও একাঙ্ক নাটক লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমেই একাঙ্ক নাটক জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের, তাদের নানা সমস্যার উপস্থাপনার এবং সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলের বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম প্রধান তূণ হিসেবে বিবেচিত হল। অভিজাত, ব্যয়বহুল, বুর্জোয়া থিয়েটারের পাশাপাশি একেবারেই সাধারণ প্রায় বিত্তহীন মানুষের কথায় ভরপুর অজস্র একাঙ্ক লেখা হল বিশ শতকের তিরিশের দশকের মধ্যে। এই একাঙ্কগুলি এমন এক নাট্যধরন যার অভিনয় কেবল রঙ্গালয়ে নয়, পথে ঘাটে পার্কে পানশালায় যে কোনো ছোটো জায়গাতেই অল্প সময়ে অনুষ্ঠিত হত। আর বোধহয় সে কারণেই নাট্য প্রযোজনায় থিয়েটারের অন্যান্য উপকরণের চাইতে জোর পড়ত নাট্যবিষয়ের ওপর। এ প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে যায় ক্লিফোর্ড ওডেটস্-এর *ওয়েটিং ফর লেফটির* কথা। অথবা একইভাবে মনে চলে আসে ব্রেখ্টের বিভিন্ন পর্যায়ে

লেখা একাঙ্কগুলি, যেখানে চিত্রিত হয়েছে ফ্যাসিস্ট শাসনে রুদ্ধ জার্মান জীবনের আতঙ্ক তথা দুর্গতি আবার কোথাও বা শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম রূপায়নের সম্ভাবনা।

তবে শুধু রাজনীতি বা সমাজনীতির অরাজকতা নয়, জীবনের অর্থহীনতা বা অনিশ্চয়তার প্রকাশেও একাঙ্ক বিবেচিত হল যোগ্য মাধ্যম হিসেবে পঞ্চাশের দশকে। ভয়ংকর শূন্যতায় নিমজ্জিত মানুষের অস্তিত্বের যে বিমূঢ় নিশ্চল রূপ—সেই হতাশার অমোঘ অভিঘাত নিয়ে লেখা হল অনেক একাঙ্ক। আমাদের খুব সহজেই মনে আসবে বেকেট. ইয়োনেস্কো, অলবি, পিন্টার বা ব্রেন্ডান বেহান-এর মত নাট্যকারদের নাম। সংকট বা অনির্দেশ্য বন্ধ্যাত্বের বোধের সঙ্গে সঙ্গেই একাঙ্ক এই পর্বে নাট্যভাষা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাতেও লেখা হয়েছে বহু একাঙ্ক। এর বিশেষ গঠনের প্রতি মমতায় সচেতনভাবে একাঙ্ক লিখেছেন মন্মথ রায় বা আরো পরে বনফুল। এই সূত্রেই আমরা মনে করতে পারি বুদ্ধদেব বসু বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অথবা প্রমথনাথ বিশীর নাম। তাছাড়া সাম্যবাদী রাজনৈতিক ভাবনায় পুষ্ট একাঙ্কের বহুল বিস্তার যে গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অভিনীত সেই বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* থেকেই তাও আমরা জানি। যেমন জানি এ ধরনের একাঙ্ক রচনায় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক-এর জনপ্রিয়তার কথা। এর পরবর্তী স্তরে কিরণ মৈত্র, গিরিশঙ্কর প্রমুখ অনেকেই একাঙ্ক লিখেছেন। আবার ষাটের দশক থেকে বাংলায় নাটকের যে বিচিত্র ধারা বহমান সেখানেও দেখা গেল একাঙ্ক নাট্যরচনার জোয়ার। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়বে হয়তো উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় বা বাদল সরকারের নাম।

একাঙ্ক আজ যথার্থই একটি বলিষ্ঠ সংরূপ। পৃথিবীব্যাপী তার বিস্তারে ধরা পড়ছে জীবনের নানা ভাবনা। সেখানে হাসি, আশা আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি রূপায়িত হচ্ছে অশ্রু, নিরাশা আতঙ্কের নিবিড় চিত্ররূপ।

এক্সপ্রেশানিজম

বিশ্বজিৎ রায়

নান্দীকারের 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' আর্থার মিলারের *DEATH OF A SALESMAN* নাটকের বঙ্গীকৃত রূপ। স্বভাবতই মূলের সঙ্গে বঙ্গ রূপান্তরের পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল নাটকটি না জেনেও রূপান্তরিত বাংলা নাটকটি দেখতে দেখতে দর্শকরা বিশেষ এক চাপ অনুভব করেন। এই চাপ বাস্তব বিপর্যয়ের চাপ নয়, একজন ফেরিওয়ালার চিত্তে পর্যবসিত বস্তু পৃথিবী কেমন করে নানা খণ্ডে ভেঙে যাচ্ছে এবং প্রতীয়মান বাস্তবের থেকেও চিত্তে পর্যবসিত পৃথিবীর এই জটিল বিন্যাস কীভাবে ফেরিওয়ালার নিরুপায় সত্তানুসন্ধানের অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে তার বহুমাত্রিক প্রকাশই দর্শককে বিচলিত করে। আপাত প্রতীয়মান বিশ্ব চিত্তে পর্যবসিত হয়ে যে স্ববিরোধী জটিলতা সৃষ্টি করে তার ইঙ্গিত মিলারের নাটকের গোড়াতেই মঞ্চ বর্ণনার মধ্যে নিহিত ছিল :

Before us is the Saleman's house. We are aware of towering, angular shapes behind it. surrounding it on all sides. Only the *blue light of sky* falls upon the house and fore stage, the surrounding area shows an *angry glow of orange*. ...An air of the *dream* clings to the place, a *dream* rising out of reality. (নজরটান সংযোজিত)

আকাশের উন্মুক্ত নীল রং আর ক্রুদ্ধ কমলারঙের সহাবস্থান স্বপ্ন-বাস্তবের বর্ণ প্রতীক হয়ে উঠছে যেন। আসলে Expressionism এর তত্ত্ব ভাবনা, যার শিল্পিত প্রকাশ ছবি, নাটক ইত্যাদি, বাস্তবের ধারণাকেই সমস্যায়িত করে। বস্তু পৃথিবীর মূর্তায়ন নয়, বস্তু পৃথিবী দ্রষ্টার চিত্তে যে আবেগ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা ক্রুদ্ধ অতিরঞ্জনে, অত্যুক্তিময় কাল্পনিকতায় শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করাই এক্সপ্রেসানিস্টদের উদ্দেশ্য। এই শিল্প আন্দোলনটি জার্মানিতে ১৮৮৫-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। Vincent Van Gogh, Edward Munch, James Ensor এঁদের ছবিতে বর্ণ প্রতীকে প্রকাশিত হচ্ছে ভীতি, বীভৎসতা। ১৯০৫-এ এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। Ernst Luding Kirchner-এর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে Die Brücke গোষ্ঠী।

সাহিত্যে Expressionism-র মুখ্য উদ্দেশ্য হল ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরোধিতা করা। August Strindberg, Frank Wedekind নাটকে এই তত্ত্বের

মুখ্য প্রবক্তা। কবিতায় Georg Heym, Ernst Stadler, August Stramm এই তাত্ত্বিকতা থেকে নানা নিরীক্ষা করছেন। নাগরিক কদর্যতা, সভ্যতার ধ্বংসকারী রূপ এঁদের কবিতায় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। Robert Wiene-এর চলচ্চিত্র The Cabinet of Dr Caligari (১৯১৯) এক্সপ্রেসনিজম্-এর ভাবনা প্রসূত।

প্রশ্ন হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সমকালে ও পরে পাশ্চাত্যে যান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যে শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভারতে বা বঙ্গভূমে তার কোনো প্রভাব পড়েছিল কি? নান্দীকার যখন মিলারের নাটকের বঙ্গীকরণ করছেন তখন এদেশেও ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিকতার যন্ত্রণা প্রকাশিত। আর এ জন্যই হয়ত আর্থার মিলারকে নির্বাচন করেছেন তাঁরা। তবে আরো অনেক আগেই তো লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী*। না, কোনো কোনো দর্পিত সমালোচকের মতো একথা বলার মানে হয় না যে স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক চুরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু এটুকুই বলার যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য দর্শনে প্রতীয়মান তথ্যের বাইরে চিত্তে পর্যবসিত সত্যের সন্ধ্যানে ব্রতী। আর তাই হয়ত উপনিবেশের ভারতীয় বাস্তবকে, কৃষি ধ্বংসকারী যান্ত্রিকতার দুর্ভার আবহকে তুলে ধরেছেন *রক্তকরবী*-তে যান্ত্রিকতা বিরোধী এই প্রতীকী সত্য এতটাই শিল্পসুভগ হয়ে উঠছে যে শম্ভুত মিত্রের 'বহুরূপী' স্বাধীনতার বেশ কিছুদিন পরে এই নাটক মঞ্চায়িত করছেন জটিলতর তাৎপর্যে।

এন জি ও

পার্থপ্রতিম বসু

সাধারণভাবে নন-গভর্নমেন্টাল অর্গ্যানাইজেশন (এন জি ও) বলতে সরাসরি সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে অঙ্গীভূত নয় এমন যে কোনো সংস্থাকেই বোঝানো যেতে পারে। তবে এর সঙ্গে তাদের আরো দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন : এক, সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমদানের মানসিকতা ; দুই, আ-লাভজনক ভিত্তিতে প্রধানত সদস্যবৃন্দ, জনসাধারণ অথবা বিভিন্ন বে-সারকারি (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি) সংস্থার আর্থিক সহায়তার ভিত্তিতে কাজকর্ম পরিচালনার সংকল্প। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে এই গোষ্ঠীগুলি সচেতনভাবে দূরত্ব বজায় রাখে। শ্রমিক সংঘ কিংবা ব্যবসায়ী সংগঠনের মতো নিজস্ব কোনো স্বার্থপূরণেও এরা আগ্রহী নয়, বিদ্যমান ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের কোনও কর্মসূচিও নেই। পরিবর্তে তারা সমাজের দুর্বল, অনগ্রসর ও অসহায় মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাদের পক্ষ নিয়ে সরকারি নীতি ও আইনের কাঠামোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। বলা যায়, এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়ের লক্ষ্যের প্রতি সংবেদনশীল ও দায়িত্ববদ্ধ করে তোলাই তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।

এন জি ও অভিধার আড়ালে বহু বিচিত্র চরিত্রের সংগঠনের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। একদিকে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র তৃণমূলস্তরের সংগঠন যাদের আনুষ্ঠানিক চেহারাটা তেমন স্পষ্ট নয়, যারা শিশুশ্রম, সাক্ষরতা প্রসার অথবা মাদকাসক্তির মতো বিশেষ একটিমাত্র এলাকার সঙ্গে যুক্ত এবং কয়েকটি গ্রাম বা কোনো শহরের কয়েকটি মহল্লায় কর্মরত। আবার বিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহু বিভিন্ন সমস্যা-এলাকায় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অল্প নয়।

কিছুটা সরল করে বলা যায় যে, ষাটের দশকের আগে এন জি ও গোষ্ঠীগুলির কর্ম প্রচেষ্টা ছিল মূলত আর্ত ও দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ ও আপৎকালীন সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ—সঙ্গে ছিল শিক্ষাবিস্তার ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। কিন্তু ষাটের দশকে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে—উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে এন জি ও-দের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সূচনা হয়। উন্নয়নের সুফলকে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ছিল এই পর্যায়ন্তরের তাৎক্ষণিক প্রেরণা—সেই সঙ্গে বৈষম্যদীর্ণ সমাজব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের

কল্পনাও যুক্ত হয়েছিল। দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রঋণ, বিকল্প প্রযুক্তি ও নানাধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এন জি ও-গুলি দরিদ্র জনগণের স্বনিযুক্তি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যপূরণে উদ্যোগী হয়। আবাসন, পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের মতো সন্নিহিত বিষয়গুলিও তাদের কর্মসূচিতে স্থান পেতে থাকে। এরপর সত্তরে দশকে কেবলমাত্র আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নেই নয়, আর্থিক প্রসার অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এন জি ও-র নিহিত সম্ভাবনা আরো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থাগুলি এন জি ও পরিচালিত প্রকল্পকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিমের বহু শিল্পোন্নত দেশ আর্থিক সাহায্যখাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রদেয় অর্থের সিংহভাগ ওই দেশের সরকারের পরিবর্তে এন জি ও-দের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। উন্নয়নে এন জি ও-দের ভূমিকাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলির অবদানও কম নয়, যার পরিণামে সাধারণের মধ্যেও এই সংগঠনগুলির বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে দানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বোপরি, ভারতের মতো বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশে সরকারও এন জি ও-দের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শরিক হওয়ার জন্য স্বাগত জানায়।

কর্মরীতির পার্থক্যের ভিত্তিতে এন জি ও-গুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

(ক) অধিকাংশ সংগঠনই দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকুশলতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই উদ্দেশ্যে অনেক সময়েই স্থানীয় মানুষকে নিয়ে কর্মিগোষ্ঠী গঠন করা হয় যার মাধ্যমে লক্ষ্যিত গোষ্ঠীর কাছে কোনো বিশেষ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অথবা তাদের স্বনির্ভর উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে উৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের প্রকল্পের দৃষ্টান্তস্বরূপ বয়স্ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা, কৃষিজীবী কারুশিল্পী অথবা মৎস্যজীবীদের সমবায় গঠন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণদান ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে এন জি ও-গুলি অনেক সময়েই সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে—অতিরিক্ত সম্পদ যোজন অথবা উন্নত পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচির কার্যকরতা বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়।

(খ) প্রধানত শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলিতে নিবদ্ধ কিছু সংগঠন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে অংশ না নিয়ে 'ফান্ডিং এজেন্সি' হিসাবে কাজ করে : উন্নয়নশীল বিশ্বে কোনো সহায়ক এন জি ও-র মধ্যস্থতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং একই সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রসৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে।

(গ) তৃতীয় এক ধরনের গোষ্ঠী : যারা 'অ্যাকশন গ্রুপ' নামে পরিচিত নিম্নস্তর জনগণের বস্তুজীবনের উন্নতি সাধনের তুলনায় তাদের এমপাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ সক্ষমতা ও স্বাধিকার চেতনা বিস্তারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়; নিষ্ক্রিয় উপকারভোগীর ভূমিকা

পালন না করে উন্নত পরিষেবা দাবি করার শিক্ষা দেয়, এবং ভূমি সংস্কার, ন্যূনতম মজুরি, বেগার প্রথা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তাদের উৎসাহিত করে।

(ঘ) এছাড়া সামগ্রিকভাবে এন জি ও কার্যকলাপের পেশাদারি দক্ষতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কিছু কিছু সংগঠন 'রিসোর্স এজেন্সি' হিসাবে গড়ে উঠছে—এদের কার্যতালিকায় রয়েছে এন জি ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ, এন জি ও পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ ইত্যাদি।

উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণে সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি পূরণে এন জি ও কার্যকলাপ এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে এই দাবি—যা কোনো কোনো মহলে বিশ্বাসের চেহারা নিয়েছে—কতকগুলি অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এক, গোষ্ঠীগুলি আয়তনে নাতিবৃহৎ, আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ এবং দীর্ঘসূত্রিতা থেকে বহুলাংশে মুক্ত। তাছাড়া তারা তৃণমূলস্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। দুই, এন জি ও পরিচালিত প্রকল্পগুলি আকারে ক্ষুদ্র ও স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠিত—ফলে একদিকে যেমন ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করার সুযোগ থাকে, অন্যদিকে লক্ষিত গোষ্ঠীর নিবিড় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তিন, এই সংগঠনগুলির সৃজনশীলতার দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : স্থানীয় মানুষের সম্পদ, দক্ষতা, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে কীভাবে উন্নয়ন প্রয়াসে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে সেই বিষয়ে এরা নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই এন জি ও-র কার্যকরতার সূত্র বলে মনে করা হয়, তবে দাবিগুলি তর্কসাপেক্ষ—এখনো পর্যন্ত এন জি ও পরিচালিত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর তাদের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

সরকারের সঙ্গে এন জি ও-দের সম্পর্কের মধ্যেও একটা টানাপোড়েন রয়ে গিয়েছে। ইদানীং বহু উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়ন প্রয়াসে এন জি ও-দের ভূমিকা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, মিলেছে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সেই সঙ্গে, বিশেষত এন জি ও-র বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারের তরফে তাদের কার্যকলাপের সমন্বয়সাধনের সূত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টাও লক্ষ কার যাচ্ছে। এই প্রশ্নে এন জি ও-দের প্রতিক্রিয়া বলা বাহুল্য, ইতিবাচক নয়। একাংশের মতে সরকারি সহায়তার মূল্যস্বরূপ তাদের সরকারি নীতি ও অগ্রাধিকারের অনুগামী হয়ে পড়তে হবে, এর ফলে তাদের কর্মধারায় অভিনবত্ব / পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য ও মূল্যবোধ থেকেও বিচ্যুতি ঘটবে। তাছাড়া কিছু এন জি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আড়ালে সমাজের সার্বিক স্বার্থের পক্ষে হানিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছে এবং সেই কারণেই সরকারি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে—সরকারপক্ষের এই 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারের'—বিরুদ্ধেও এন জি ও গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক কারণেই সরব।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও এই গোষ্ঠীগুলির সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই স্তরে যে আমলারা উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন তাঁদের দৃষ্টিতে এন জি ও-তৎপরতা অনেক সময়েই অনধিকার চর্চা বলে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রাজনৈতিক স্তরবিন্যাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ক্ষমতা বণ্টনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয় থাকে, ফলে এন জি ও-দের তরফে সমাজের প্রত্যন্তবাসী মানুষকে সংগঠিত ও অধিকার সচেতন করে তোলার উদ্যোগ এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের কাছে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবেই উপস্থিত হয় এবং গড়ে ওঠে প্রতিরোধ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার' মাধ্যমে এন জি ও গোষ্ঠীগুলি তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে কিনা সেই প্রশ্নটাকে ঘিরে সংশয় দেখা দিয়েছে, তবে সরকারের সংস্রব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কেবলমাত্র 'এন জি ও আন্দোলনের' মধ্য দিয়েই উন্নয়নের পালে গতি সঞ্চার করা সম্ভব কিনা সেটাও বিবেচনার দাবি রাখে। এন জি ও কার্যকলাপ জারি রাখার জন্য যে ন্যূনতম প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সহায়তা প্রয়োজন, কেবলমাত্র সরকারের পক্ষেই তা সরবরাহ করা সম্ভব। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও কাঠামোগত সংস্কার নীতির প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব থেকে সরকারের পিছিয়ে আসার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তার ফলে উন্নয়নশীল দেশের দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির কোটি কোটি মানুষের জীবনে নতুন করে উপেক্ষার ছায়া নেমে আসার সম্ভাবনা—তাকে প্রতিহত করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এন জি ও গোষ্ঠীগুলির এক বিশেষ দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে সমস্যাকণ্টকিত সম্পর্কের বিষয়টাকে এড়িয়ে না গিয়ে কীভাবে একটা গ্রহণযোগ্য মীমাংসা পৌছনো সম্ভব সেটাই সম্ভবত এন জিও-দের সামনে আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এনলাইটেনমেন্ট

সেমন্তী ঘোষ

ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের আরম্ভ বলে সাধারণ চিহ্নিত করা হয় অষ্টাদশ শতককে। কীসের জন্য সম্ভব হল এই যুগ বিভাগ? নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিপ্লব, নাকি অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তন এর কারণ? খুব স্পষ্ট নয় এই বিভাগের ভিত্তি। অনেক ঐতিহাসিক তর্ক করবেন—অষ্টাদশ শতকের মূল নিজস্বতা আসলে তৈরি করে তুলেছিল 'এনলাইটেনমেন্ট' (কিংবা, Aufklärung) দর্শন। খ্রিষ্টীয় ধর্মদর্শনের মূলে প্রবল আঘাত দিয়ে এই এনলাইটেনমেন্ট বা আলোক-পর্বই নীরবে ঘোষণা করে মধ্যযুগের সমাপ্তি।

মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের সময় বা কারণ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য থাকলেও এনলাইটেনমেন্টের এই মৌলিক অবদান বিষয়ে কারোরই খুব দ্বিধা দেখা যায় না। সম্পূর্ণ নতুন এক প্রবণতা দেখা গিয়েছিল দর্শন-চিন্তায়-ইতিহাসে, রাষ্ট্রচিন্তায়, এমনকী সাহিত্যেও। খ্রিষ্টীয় ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে দার্শনিক সমালোচনা প্রবল হয়ে ওঠে হিউম বা ভলতেয়ারের মত মনীষীর লেখায়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ঐতিহাসিক কলিংউড এই যুদ্ধকে বলেছেন আধুনিক যুগের 'ক্রুসেড'। দর্শনতত্ত্বের এই যুদ্ধের মূল কথা হল— মনুষ্য সমাজের বাহ্যিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক বিকাশের ধরনও পাল্টায়। পুরনো ধ্যানধারণা, বিধি-ব্যবস্থা সরিয়ে দিয়ে আসে নতুন ভাবনা-চিন্তা। আলোক-পর্বের চিন্তাবিদ্‌রা মনে করতেন, অষ্টাদশ শতকের বিশেষত্ব হল—এখন থেকে 'বর্বর মধ্যযুগীয়' মূল্যবোধ ও সমাজকে সমূলে নষ্ট করে প্রোথিত হবে নতুন এক সমাজদর্শন—মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন। আলোক-পর্বের যোদ্ধাদের মূল শত্রু ছিল ধর্ম ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, সেজন্য ভলতেয়ারের রচনায় বর্বরতা (barbarism) এবং ধর্ম (religion) বা পুরোহিতের (priest) মতো শব্দ প্রায় সমার্থকভাবে ব্যবহার হয়েছে। ক্রমশ অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে। ভিকো এক জোরালো যুক্তির অবতারণা করেন কাব্যরচনার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, এই নতুন দর্শনের আলোয়, কবিতা হল নেহাতই মানবমনের অ-সংস্কৃত শিশুসুলভ প্রবৃত্তিগুলির সৃষ্টি। আলোক-পর্বের সাহিত্য বরং হোমার বা দান্তের কাব্য থেকে সরে আসবে অনেক দূর। কল্পনা আর আবেগকে বাদ দিয়ে যুক্তির আরাধনা হবে সেখানে। গদ্য যদি হয় এই যুক্তিবোধের মূল বাহক— 'Purely rational'—

তাহলে ভিকো মনে করেন, সাহিত্যের আর এক স্তর হতে পারে—অর্ধ-কাল্পনিক, অর্ধ-যৌক্তিক—'mythical' বা 'semi-imaginative'।

প্রাথমিক পর্যায়ে আলোক-পর্বের দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল কেবলই ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি সংগ্রহ। এই অর্থে তখন এই আন্দোলন ছিল খানিক তাত্ত্বিক (Polemical) আর খানিক নেতিবাচক (Negative) এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উনবিংশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার মধ্য দিয়ে এই মূল ধারাটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেত্রে। সমাজের প্রগতির সঙ্গে মানবিক বিকাশের যোগ যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে তার আরো বহুরকম অর্থ হতে পারে। মনোবিকাশের উচ্চস্তরে যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে— এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে ওঠে আরো অনেক প্রতিপাদ্য। যেমন, যেসব সমাজে 'যুক্তি' বা 'বিজ্ঞানের' এই উচ্চস্তর লক্ষিত হয় না, মনে করা হয় যে সেগুলি এখনো আবদ্ধ রয়েছে সভ্যতার আরো প্রাথমিক স্তরেই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এইসব পিছনে-পড়ে-থাকা সভ্যতাগুলির উত্তরণ ঘটবে একদিন আরো উচ্চতর স্তরে এবং এই উত্তরণ ঘটাবে মানুষই—সেইসব মানুষ যারা মানবিক বিকাশের মাপকাঠিতে এগিয়ে আছে অন্যদের তুলনায়।

প্রায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পদ্ধতিতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে একধরনের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে যায় আলোক-পর্বের নতুন দর্শনে। বিভিন্ন সভ্যতার বা বিভিন্ন মানব-জাতির উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষ লক্ষ করা হয় এক 'সর্বগ্রাহ্য' (Universal) মাপকাঠিতে। এই মাপকাঠি তৈরি হয়ে উঠেছে 'যুক্তি' (Reason) আর 'প্রগতি' (Progress)—এই দুটি ধারণার সাহায্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোক-পর্বের দর্শনে সভ্যতার গুণগত বিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে আর একটি বোধ—'অতীত' (Past) সময়ের বোধ। ইউরোপের যে 'অতীত'কে সমূলে সরিয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে আলোক-পর্বের সূচনা হয়েছিল একদিন, সে অতীত ছিল 'অন্ধকার' 'বর্বর' 'মধ্যযুগীয়' 'ধর্মান্ধ'। সময়ের অমোঘ হাত ইউরোপে এই অতীতের অবসান ঘটিয়েছে, কিন্তু অন্য নানান ভুবনে সে দুঃসহ অতীত এখনো বর্তমান। তাই যখন আলোক-পর্বের রক্ষণশীল ধারাটি কেবল এইসব পশ্চাৎপর, অতীতমুখী সভ্যতাগুলিকে নির্বিচারে নিষ্করুণ সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকে, উদারপন্থী চিন্তাবিদ্‌রা মনে করতে শুরু করেন—এইসব দেশে অতীতের দুঃস্বপ্ন দূর করার ভার ন্যস্ত রয়েছে আলোক-প্রাপ্ত সভ্যতাগুলিরই উপর। এই অর্থে, আলোক-পর্বের মূল যুক্তবিন্যাস কেবল তাত্ত্বিক গুরুত্বেই সমৃদ্ধ নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক যুগের ইতিহাস-বোধ, সমাজবোধ আর বিশ্বরাজনীতির অভিমুখ।

আলোক-পর্বের এই সমাজ-দর্শন যে ইদানীংকালে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে—তা মোটেই আশ্চর্যের নয়। সভ্যতার এই স্তর-বিভাগ একধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হতে পারে নেহাত স্বাভাবিক। কিন্তু এর ভিত্তি যে আছে এক ধরনের উন্নাসিক পাশ্চাত্যমুখিতার মধ্যে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা মুশকিল। আধুনিকোত্তর যুগের নতুন দর্শন আর গভীরতর ইতিহাস-বোধ সমানেই এই ইউরোপ-বা পশ্চিমকেন্দ্রিক 'যুক্তি', 'প্রগতি', 'সভ্যতার' ধারণাগুলিকে প্রশ্ন করে চলবে।

এপিস্টেমোলজি

শ্রাবন্তী ভৌমিক

সম্ভবত ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত জে. এফ. ফরিয়ারের *ইনস্টিটিউট অব মেটাফিজিক্স* গ্রন্থে 'এপিস্টেমোলজি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রথমবার। দর্শনের দুটি ভাগ ইনি স্বীকার করেন—'এপিস্টেমোলজি' এবং 'অন্টোলজি' : 'জ্ঞানবিদ্যা' এবং 'অধিবিদ্যা'। দর্শনের যে অংশে জ্ঞানের উৎস, ভিত্তি, জ্ঞানের গঠনাকৃতি, জ্ঞানলাভের পদ্ধতি, জ্ঞানের বৈধতার নিরিখ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তার নাম দেওয়া হল 'জ্ঞানবিদ্যা' বা 'এপিস্টেমোলজি'। এই ইংরেজি শব্দটির জার্মান প্রতিশব্দ 'Erkenutnistheorie' অবশ্য অনেকে আগেই ব্যবহার করেছিলেন কান্টের অনুগামী দার্শনিক কে. এল. রাইনহোল্ড, তাঁর ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত *Versuch einer Neuen Theorie des Menschlichen Vorstellungsvermögens* (মানুষের কল্পনাশক্তি বিষয়ে একটি নতুন তত্ত্বের সন্ধানে) এবং ১৭৯২-তে প্রকাশিত, *Das Fundament des Philosophischen Wissens* (দার্শনিক জ্ঞানের মৌলিক উপাদান) বই দুটিতে। আর আধুনিক দর্শনের সঙ্গে শব্দটি যথাযোগ্য মর্যাদায় যুক্ত হয় ১৮৬২-তে প্রকাশিত ই. জেলার-এর *Ueber Aufgabe und Bedeutung der Erkenntnistheorie* (জ্ঞানবিদ্যার সমস্যা ও অর্থ সম্পর্কে) গ্রন্থে।

পাশ্চাত্য দর্শনের আদি চিন্তাবিদরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেননি কখনো, কেননা তাঁদের দর্শনচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবর্তনের প্রকৃতি ও সম্ভাবনার অনুসন্ধান করা। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জানার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁরা সংশয় দেখাননি কখনো। কেবল কোন্ মাধ্যমে প্রকৃতি সম্বন্ধে জানব, সে-বিষয়ে কিছু মতভেদ লক্ষ করা গেছে তখন। যেমন— ইন্দ্রিয় মাধ্যমে প্রকৃতির জ্ঞান সংগ্রহের কথা বলেছেন হেরাক্লিটাস, অন্যদিকে পারমেনাইদিস গুরুত্ব দিয়েছেন যুক্তিবুদ্ধির ওপর। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের আগে পর্যন্ত প্রকৃতি জ্ঞান মানুষের পক্ষে ঠিকমতোই আয়ত্ত করা সম্ভব কিনা— এ বিষয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি দার্শনিকরা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে, যখন প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বীকৃত ও জ্ঞাত তথ্যাবলির অনেকগুলিই ভুল প্রমাণিত হল, তখন স্টোয়িক দার্শনিকরা প্রচার করলেন সাধারণ একটি সংশয়বাদ। বস্তুপুঞ্জ সম্বন্ধে সত্যি আমাদের কিছু জানা হয়, নাকি এগুলি অবভাসমাত্র, এই তর্ক তখন থেকেই শুরু হল। তারপর প্লেটো (৪২৮-৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) যখন প্রশ্ন করলেন : 'জ্ঞান' অর্থ কী, সাধারণভাবে

জ্ঞানের ভিত্তি কী, সাধারণত আমরা যাকে জেনেছি বলে মনে করি তার কতটুকু 'জ্ঞান' পদবাচ্য, তখন শুরু হল দর্শনের এই বিশেষ শাখাটির বিস্তার।

দার্শনিক দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), লক (১৬৩২-১৭১৪), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) মনে করতেন যে জ্ঞানের সম্ভাবনা এবং সীমানা নির্দেশ করা সমস্ত দর্শন চর্চার প্রারম্ভিক অনিবার্যতা। আর স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), হেগেল (১৭৭০-১৮৩২), স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (১৮৫৯-১৯৩৮) প্রমুখ চিন্তাবিদ বলেছেন, দর্শনচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য হল জাগতিক বিষয়ের স্বরূপ-সন্ধান এবং সেইজন্য জ্ঞানবিদ্যার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল অধিবিদ্যার চর্চা। মধ্যপন্থা নিয়েও কথা বলেছেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে, বিষয় দুটি পরস্পরের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল যে, এই গৌণ-মুখ্য বিচারের কোনো গুরুত্ব নেই। জ্ঞানবিদ্যাগত একটি পূর্ব ধারণার সাহায্য ছাড়া অধিবিদ্যার চর্চা করতে পারে না কেউ, আর অধিবিদ্যাগত কিছু ধারণা না নিয়ে জ্ঞানবিদ্যার জগতে প্রবেশ করাও অর্থহীন।

জ্ঞানের প্রকৃতি, সীমা, বৈধতার বিচার করে জ্ঞানবিদ্যা। এই বিদ্যা কি যুক্তিবিদ্যার সমান? তাও নয়। আধুনিককালে যুক্তিবিদ্যা সম্পূর্ণ আকারগত একটি বিজ্ঞান। একটি বিশেষ বিচারপদ্ধতি যথার্থ, না অযথার্থ—এটি যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য। আর, এই 'যথার্থতা' শব্দের অর্থ কী, এর প্রকৃতি কী— এই আলোচনার জন্য জ্ঞানবিদ্যা।

মনে রাখতে হবে, মানুষের মনে জ্ঞানের যতগুলি স্তর থাকে— যেমন প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, যুক্তিগঠন— এই সবগুলির চরিত্র যে-শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তার নাম কিন্তু 'জ্ঞানবিদ্যা' নয়। এ হল 'মনোবিদ্যার' আলোচ্য বিষয়বস্তু। কেবলমাত্র জ্ঞানের অবস্থা এবং বহির্জাগতিক বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এই হল জ্ঞানবিদ্যার গবেষণা। জ্ঞানের আধার যে মন, সেই মনোজগতের প্রতিটি স্তরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করা তার কাজ নয়।

জ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি তবে কী কী! সত্যকার জ্ঞান কি বস্তুতই আয়ত্ত করা যায়? আছে প্রত্যক্ষজনিত সংশয়, আছে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান-সংক্রান্ত সংশয়, আছে 'ইগো-সেন্ট্রিক প্রেডিকামেন্ট' বা 'অলিপসিজ্‌ম'। দার্শনিক জিজ্ঞাসার শুরুতে প্রায় সকলেই কোনো-না কোনোভাবে সংশয়ে উপনীত। সে সংশয়ের অবসান ঘটছে কখনো, কোনো দার্শনিক হয়ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই নিজেকে সংশয়বাদী প্রমাণ করতে চান।

সংশয়ের অবসানে প্রশ্ন উঠে জানের পরিধি বিষয়ে। মানুষের জ্ঞানের সীমা কি নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন? নাকি সীমাহীন এর বিস্তার?

বিতর্ক ওঠে জ্ঞানের উৎসমুখ নিয়ে—অভিজ্ঞতা কি জ্ঞানলাভের পথ হতে পারে? সব সময়ে অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সরবরাহ করে না, বুদ্ধির সাহায্যে সংশোধন করে নিতে হয় আমাদের। তবে কি বুদ্ধিই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সংগ্রহের পথ এবং একমাত্র পথ?

এর সঙ্গে ওঠে একটি পদ্ধতিগত প্রশ্ন। যাঁরা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ জ্ঞানের কথা বলেন, তাঁরা আরোহমূলক সামান্যকিরণের পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক সূত্রনির্দেশ করবেন। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক জ্ঞানজগৎ তৈরি করার জন্য অবরোহমূলক ঔপপত্তিক প্রমাণে আস্থা রাখবেন। এই পদ্ধতিগত সমস্যা জ্ঞানবিদ্যাগত সমস্যা।

আছে স্বতঃসত্য, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সূত্রের প্রসঙ্গ। মনে করা হয়, সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনের প্রারম্ভিক সমস্ত মূল সূত্রগুলি স্বতঃসত্য। কীভাবে পরিবেশিত হবে আয়ত্ত করা জ্ঞানের সূত্রগুলি, কোন গঠনভঙ্গিমায়—জ্ঞানবিদ্যায় এই আলোচনাও করা হয়।

সত্যতা-নির্ধারণের সমস্যাটিও জ্ঞানতাত্ত্বিকের সমস্যা। সত্য বাক্য কাকে বলে? কীভাবে নির্ধারণ করব বাক্যসমূহের সত্যতা? বস্তুর সঙ্গে তার মিল খুঁজব কি? একগুচ্ছ বাক্যের একটির সঙ্গে অন্যটি যদি খাপ খেয়ে যায়, তবে কি বুঝব—সত্যতা নির্ধারিত হল? সত্যতা কি বাক্যের একটি অন্তর্নিহিত গুণ? আর, এই সত্যতা-নির্ধারণের প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানবিদ্যা অধিবিদ্যার সঙ্গে একত্র চলা শুরু করে। শুরু হয়—একদিকে বস্তুর প্রকৃতি অনুসন্ধান, অন্যদিকে ওই বস্তুর জ্ঞানের প্রকৃতি নির্দেশ।

এফ এম চ্যানেল

আশিস লাহিড়ী

'Frequency Modulation'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এফ এম। রেডিও সম্প্রচারের দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হল (Amplitude Modulation) (AM), অন্যটি Frequency Modulation (FM)। আমাদের দেশে এতদিন শুধু প্রথমটিই চালু ছিল, ইদানীং FM চালু হয়েছে এবং খুব জনপ্রিয় হয়েছে। কারণ এফ এম পদ্ধতিতে অবাঞ্ছিত ধ্বনিকে দূর করা যায়, ফলে রেডিও-গ্রাহক-যন্ত্রে খুব পরিষ্কার ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ আওয়াজ পাওয়া যায়। কী করে এটা সম্ভব হয় তা বুঝতে গেলে রেডিও সম্প্রচার ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার। রেডিও স্টেশন থেকে সংগীত বা ধ্বনির একটা অবিচ্ছিন্ন বাহক তরঙ্গপ্রবাহ আকাশে ছেড়ে দেওয়া হল। এই বাহক তরঙ্গ গিয়ে এরিয়ালে ধাক্কা খাওয়া মাত্রই তার মধ্যে যে এনার্জি ছিল তা বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপ নিল। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ এবার রেডিও গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে বসানো বিশেষ কৌশলে ধ্বনিতরঙ্গে রূপ নিল। তখনই আমরা গান বা কথা শুনতে পেলাম।

কিন্তু ঐ অবিচ্ছিন্ন বাহক তরঙ্গপ্রবাহের (amplitude) যদি অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাহলে আমরা কিছুই শুনতে পাব না। কারণ বাহক তরঙ্গের কাজ শুধু বহন করা, প্রেরকযন্ত্র আর গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করা। কী বার্তা সে বহন করে এনেছে তা শুনতে গেলে তার অবিচ্ছিন্নতা ভেঙে দিতে হবে। এর ফলে প্রেরিত সংগীত বা অন্যকোনো ধ্বনিতরঙ্গের কম্পাঙ্কের (frequency) সঙ্গে তাল রেখে ঐ বাহকতরঙ্গের amplitude বদলে বদলে যাবে। এইভাবে বদলে যাওয়া বাহক তরঙ্গকে বলা হয় modulated carrier, আর যে-স্বর বা ধ্বনিটিকে তা বহন করে আনে তাকে বলা হয় modulation। যে-কৌশলে রেডিও গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গকে ধ্বনিতরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়, তার নাম হল detector—জগদীশচন্দ্র বসুদের আমলে একটি ক্রিস্ট্যালের সাহায্যে এই কাজ করা হত। পরে আসে ভাল্‌ভের যুগ। এখন এ কাজ করে ট্র্যানজিস্টর। এই গোটা ব্যাপারটাকে বলা হয়—amplitude modulation বা AM। এককথায় বলা যায় AM পদ্ধতিতে বাহক তরঙ্গের frequency-তে, কোনো পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় তার শক্তিতে, অর্থাৎ amplitude-এ এবং সে-পরিবর্তন ঘটে মাইক্রোফোনের ধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে।

এতে করে সমস্যা হচ্ছে, এমন অনেক অবাঞ্ছিত স্বর বা ধ্বনি চলে আসে যাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা গ্রাহক যন্ত্রের থাকে না। সাধারণ রেডিওতে বিচিত্র সব শব্দের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই সমস্যা দূর করার জন্যই frequency modulation বা FM-এর প্রবর্তন। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা ঠিক উল্টো : বাহক-তরঙ্গের amplitude অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু frequency-টা বদলে যায়। এরই ফলে এফ এম সম্প্রচারে অবাঞ্ছিত আওয়াজ দূর করা সম্ভব হয়। কারণ amplitude-এর ওঠানামার দরুনই ঐসব অবাঞ্ছিত ঘড়ঘড়ানির সৃষ্টি হয়। এফ এম রেডিও গ্রাহক যন্ত্রে discriminator নামক একটা কৌশল ব্যবহার করা হয়। এর কাজ হল frequency-র ছোটোখাটো পরিবর্তনকে শুধরে নেওয়া। এ ছাড়া থাকে একটি Limiter, যার সাহায্যে গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে ভোল্টেজের ওঠাপড়ার প্রভাবকে অনেক পরিমাণে দূর করা যায়। Discriminator আর Limiter—এই দুটো জিনিসই কেবলমাত্র frequency-র পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, amplitude-এর প্রতি নয়। এইসব কারণে এফ এম অনুষ্ঠান এত শ্রবণসুভগ হয়।

ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন-এর পুরোধা পুরুষ হলেন এড্‌উইন আর্মস্ট্রং (১৯৫৪)। ১৯৮৩ সালে তাঁর কীর্তির স্মরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

এফ এম নিয়ে গবেষণা ও তা চালু হওয়ার কালক্রম মোটামুটি এইরকম :

ফেব্রুয়ারি ১৯২২

Frequency Modulation শব্দবন্ধটির প্রথম প্রয়োগ করেন জে. আর. কার্সন *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*-এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে।

১৯৩৩-৩৪ শীতকাল

আর সি এ কোম্পানির এনজিনিয়ার ও কর্তাদের সমক্ষে এড্‌উইন আর্মস্ট্রং ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন প্রকৌশল প্রদর্শন করেন।

মে ১৯৩৪

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ এই প্রকৌশল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ করেন আর্মস্ট্রং।

১৬ই জুন, ১৯৩৪

আর সি কোম্পানি ও আর্মস্ট্রং এ এম এবং এফ এম উভয় পদ্ধতিতে সম্প্রচার করেন।

এপ্রিল ১৯৩৫

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে বিদায় হতে হুকুম দেওয়া হয় আর্মস্ট্রংকে।

মে ১৯৩৬

Proceedings of the Institute of Radio Engineers-এ প্রকাশিত হয় আর্মস্ট্রঙের প্রবন্ধ : A Method of Reducing Disturbances in Radio Signalling by a System of Frequency Modulation.

জুলাই ১৯৩৬

এফ এম সম্প্রচার নিয়ে কাজ করার জন্য আর্মস্ট্রংকে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

অগাস্ট ১৯৩৭

প্রথম এফ এম সম্প্রচার কেন্দ্র নির্মাণের পারমিট পায় Yankee Network, Inc. Paxton, Massachussetts. কেন্দ্রটর নাম দেওয়া হয় WIXOG।

১০ই এপ্রিল ১৯৩৮

চালু হল আর্মস্ট্রঙের প্রেরক (W2XMN, 43.7 MHz, 600 WATTS)

১৮ই জুলাই, ১৯৩৯

আর্মস্ট্রঙের সম্প্রেরক থেকে পৃথিবীর প্রথম এফ এম অনুষ্ঠান বাজিয়ে শোনানো হল শ্রোতাদের। বাজানো হয়েছিল চাইকভ্স্কির দুটি সংগীতরচনা। তবে সারা পৃথিবীতে তখন এফ এম গ্রাহকযন্ত্রের সংখ্যা মাত্র ২৫, তাই খুব কম লোকই এ অনুষ্ঠান শোনেন।

জানুয়ারি, ১৯৪০

আমেরিকান ন্যাশনাল ব্রড্কাস্টিং কর্পোরেশন নিয়মিত এফ এম অনুষ্ঠান চালু করেন।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

এড্উইন আর্মস্ট্রঙের মৃত্যু।

ওয়ান ডে ক্রিকেট

তানাজী সেনগুপ্ত

ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট বা এক দিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শুরু অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎই, ১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারি। এম. সি. সি বা ইংল্যান্ড এসেছিল অস্ট্রেলিয়া সফরে, তৃতীয় টেস্টের প্রথম কয়েকটা দিন বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। দর্শকদের চাহিদা ও অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের আর্থিক ঘাটতি পূরণ করার জন্য ম্যাচের শেষ দিনে এম. সি. সি বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪০ ওভারের (৮ বলের ওভার) 'ওয়ান ডে' ম্যাচ হয়। সরকারিভাবে এটাই বিশ্বের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ। ম্যাচটি জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সরকারিভাবে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হলেও এক দিনের ক্রিকেটের শুরু কিন্তু তারও আগে। টেস্ট ক্রিকেটের ক্রমহ্রাসমান দর্শক দেখে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করার কথা বহু দিন ধরেই ভাবছিলেন সারা বিশ্বের ক্রিকেট সংগঠকরা। টেস্টের একঘেয়েমি, গতি-মন্থরতা, ক্রমাগত ম্যাচ ড্র, ক্রিকেটারদের কোনোরকমে উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা আর দর্শকদের মন জয় করতে পারছিল না। তাই এই ভাবনাচিন্তা। ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডে চালু হয় এক দিনের ক্রিকেটের প্রথম টুর্নামেন্ট—জিলেট কাপ। উৎসুক দর্শকরা আস্তে আস্তে আবার ফিরতে শুরু করেন মাঠে। জিলেট কাপ একসময় বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। সরকারিভাবে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু ১৮৭৭-এ, ৯৪ বছর বাদে ১৯৭১-এ সরকারিভাবে ক্রিকেটের নবতম সংস্করণ 'ওয়ান ডে'র যাত্রা শুরু হল। 'ওয়ান ডে'র অনিশ্চয়তা নিয়ে এল উত্তেজনা, ক্রিকেটের নয়া কলাকৌশল, বিনোদনের এক নব্য ধারা।

এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচটি সফল হওয়ার পরই 'ওয়ান ডে ম্যাচ'-এর জোয়ার আসে। ১৯৭৩-এ ইল্যান্ড সফরের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে লর্ডসে। ক্রিকেটের রাজপুত্র অলরাউন্ডার স্যার গারফিল্ড সোবার্স এই ম্যাচটিতে শূন্য রানে আউট হন। ভারত ১৯৭৪-এ প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নেয়, ইংল্যান্ডেই এবং প্রথম দু'টিতেই হারে। একদিনের ক্রিকেটের অভাবনীয় সাফল্য দেখে ইংল্যান্ডের টেস্ট অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড (টি. সি. সি. বি) ক্রিকেটের বিশ্বকাপ শুরু করার পরিকল্পনা করে। ঠিক হয় চার বছর অন্তর এটি হবে। তখন এটিও ঠিক হয়, ছ'টি সদস্য দেশ—ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড এতে অংশ নেবে। আই. সি. সি-র দু'টি সদস্য দেশ শ্রীলঙ্কা ও পূর্ব আফ্রিকাকেও অংশ নিতে বলা হয়। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন শুরু হল প্রথম বিশ্বকাপ, 'ওয়ান-ডে ওয়ার্ল্ড কাপ'। কে বিশ্বসেরা—এই রুদ্ধশ্বাস প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী

লর্ডসের মাঠে। যে-সব ক্রিকেটার ধ্রুপদী ক্রিকেটে অভ্যস্ত ছিলেন এতদিন, তাঁরাই এবার নামেন ক্রিকেটের নব পরীক্ষায়।

প্রুডেনশিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানির স্পনসরশিপে প্রথম বিশ্বকাপেই এল অপ্রত্যাশিত সাফল্য—১, ১৭,৮০৯ জন দর্শক উপভোগ করলেন বিশ্বকাপের উত্তেজনা, সংগৃহীত হয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৯৮ পাউন্ড। ৭ থেকে ২১ জুন—দু'সপ্তাহ ধরে চলে ১৫টি ম্যাচ। প্রথম চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৭৯-তেও জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৮৩-তে বাজিমাত করল কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত, ফাইনালে হারিয়ে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এখন পর্যন্ত আটটি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, তিনবার। এই উপমহাদেশের তিনটি বড় দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা একবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে একবারো জিততে পারেনি ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য অনেক পরে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে। বিশ্বকাপে প্রতিবারেই অংশ নেওয়া দেশের সংখ্যা বেড়েছে, জনপ্রিয়তা বেড়েছে, দর্শক বেড়েছে, অর্থ ও আয় হয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

এক সময় ভাবা হয়েছিল, টেস্টের আভিজাত্য, মর্যাদা ওয়ান ডে ক্ষুণ্ন করে দেবে। ফলে ক্রিকেটের যথার্থ সমঝদার এই খেলাকে গুরুত্ব দেবেন না। বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। ওয়ান ডে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছে। বিশ্বের সেরা ক্রিকেটাররা দু'ধরনের ক্রিকেটেই সাফল্য পেয়েছেন, পাচ্ছেন। আধুনিক ক্রিকেটের 'ডন' সচিন টেন্ডুলকার টেস্টে এবং ওয়ান ডে-ব্যাটিংয়ে সমান স্বচ্ছন্দ। সদ্য অবসর নেওয়া ওয়াসিম আক্রম টেস্টে পেয়েছেন ৪১৪টি উইকেট, ওয়ান ডে-তে ৫০২টি, সৌরভ গাঙ্গুলি, গ্লেন ম্যাকগ্রাথরাও সমান সফল।

সত্তর দশকের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের ক্যারি প্যাকার নিয়ে এলেন ওয়ান ডে-এর আর এক নতুন রূপ। দিন রাতের খেলা শুরু হল, খেলোয়াড়রা পরলেন ঝলমলে রঙিন পোশাক, ক্রিকেটারদের অর্থের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেকখানি। স্লোগান চালু হল— 'বিগ বয়েজ প্লে অ্যাট নাইট'। আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিলেন শেখ আবদুল রহমান বুখাতির। ১৯৮৪ সালে শারজায় চালু হল ওয়ান ডে-র নানা আকর্ষক টুর্নামেন্ট। ওয়ান ডে হয়ে উঠল আরো রঙিন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এখন ওয়ান ডে ম্যাচের রমরমা। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো দেশে ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। প্রতি সফরে টেস্টের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে থাকছে ওয়ান ডে সিরিজ। তৃতীয় একটি দেশকে নিয়ে হচ্ছে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা।

প্রতিদিন ওয়ান ডে-র আকর্ষণ বাড়বার চেষ্টা চলছে। আনা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছে স্ট্যাম্প-ভিশন ক্যামেরা। ওয়ান ডে এখন ৫০ ওভারের, প্রথম ১৫ ওভার ফিল্ড সাজানোয় কিছু বাধা-নিষেধ থাকে, একজন বোলার কিছুতেই ১০ ওভারের বেশি বল করতে পারেন না। তবে ওভার সংখ্যা কমিয়ে, আরো নানাভাবে ওয়ান ডে-কে অত্যাধুনিক করা হচ্ছে। পাজামা ক্রিকেটের ব্যঙ্গ এখন অনেক পিছনে। ভবিষ্যতে ওয়ান ডে-র জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে, খেলোয়াড়দের দক্ষতা, রেকর্ডও সমানভাবে দেখা যাবে।

ওরিয়েন্টালিজম

সীমন্তী সেন

আভিধানিক অর্থে প্রাচ্য বা 'ওরিয়েন্ট' নিয়ে যাকিছু গবেষণা—নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক কিম্বা ভাষাতাত্ত্বিক—তাই হল 'ওরিয়েন্টালিজম্' অথবা 'প্রাচ্যবাদ' এবং এরকম যে কোন ধারার পণ্ডিতই হলেন 'ওরিয়েন্টালিস্ট' অথবা 'প্রাচ্যবাদী'। ঐতিহাসিকভাবে শব্দটির অর্থ আরেকটু নির্দিষ্ট। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত উইলিয়ম জোনসের ব্যক্তিত্ব এবং এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৪) কর্মকাণ্ডকে ঘিরে যে জ্ঞানচর্চার পত্তন হয় তার সূত্রেই পণ্ডিতমহলে 'ওরিয়েন্টালিজম্' শব্দটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী শতকে তা বিস্তৃতিলাভ করে ফরাসি শিল্প আন্দোলন এবং ব্রিটিশ ও জার্মান রোম্যান্টিক জাগরণের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষের আইনকানুন অনুযায়ী ভারতবর্ষকে শাসন করা উচিত এবং সেজন্য তার কর্মাধ্যক্ষদের প্রয়োজন ভারতবর্ষীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিতে অবগাহন করা—এমন এক ধারণা থেকেই ব্রিটিশ 'ওরিয়েন্টালিজম্'-এর জন্ম। এই ধারণার অন্যতম প্রবক্তা, প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই এর যাথার্থ্য নিরূপণ করেন। তাঁর মতে যে কোনো জ্ঞানের সঞ্চয়ে বিশেষত শাসিতের সঙ্গে সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে যে জ্ঞান সঞ্চয় তা সবসময়ই রাষ্ট্রের পক্ষে উপকারী। সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার ফলে উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে যে সহমর্মিতার সৃষ্টি হয় তা শাসকের (এক্ষেত্রে ব্রিটিশ) মানবতাকেই কেবল সমৃদ্ধ করে না, তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায় হয়। এই নীতি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বহাল থাকে যতদিন না ইভাঞ্জেলিকাল ধারা এবং উপযোগিতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর থেকে ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ নীতি দুটি দিশায় বিভক্ত হয় ইঙ্গবাদী এবং প্রাচ্যবাদী। সিপাহিবিদ্রোহ-পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে রোখার জন্য মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক 'ওরিয়েন্টালিস্ট চর্চা' নতুন করে সক্রিয় হলেও স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের নীতি নির্ধারণ করে মূলত ইঙ্গবাদীরাই। এসব সত্ত্বেও বহুকাল পর্যন্ত 'ওরিয়েন্টালিজম্' শব্দটি ব্যবহৃত হত একটি মূল্য নিরপেক্ষ বর্ণনামূলক শব্দহিসেবে, প্রাচ্য বিষয় গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা বোঝানোর জন্য। এর সঙ্গে কোনো মতাদর্শের প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল না।

বিগত দুই শতকের পণ্ডিতিচর্চায় 'ওরিয়েন্টালিজম্' শব্দটির ব্যঞ্জনা প্রায় আমূল পাল্টে গেছে। যে অর্থে আজকের গবেষক মহলে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা প্রচলন লাভ

করে মূলত আনোয়ার আব্দেল মালেক (*সিভিলাইজেসন অ্যান্ড সোশাল থিয়োরি*, ১৯৬৩) এবং পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাইদের (*ওরিয়েন্টালিজম*, ১৯৭৮) গবেষণার মধ্যে দিয়ে। প্রাচ্যবাদ, সাইদের মতে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং সত্তাতাত্ত্বিক বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক বিশেষ চিন্তাশৈলী। এই মূলগত বিভাজনকে স্বতঃসিদ্ধ মেনেই পশ্চিমের কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদরা নিজেদের সাহিত্যে, কাব্যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবৃতিতে প্রাচ্যের মানুষ, তাদের রীতিনীতি, মনন, ভবিতব্য সব কিছুরই আলোচনা করেছেন। এই প্রাচ্যবাদের চত্বরে ইসকাইলাস থেকে হুগো, দান্তে, কার্ল মার্ক্স সকলেরই আনাগোনা। তবে আঠারো শতকে প্রাচ্যবাদ ইতিহাসগত এবং বস্তুগতভাবে এক ভিন্ন তাৎপর্যলাভ করে। এই সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রাচ্যবাদ দেখা দেয় প্রাচ্য নিয়ে কারবার করার এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে। প্রাচ্যকে শাসন করার মধ্যে দিয়ে তাকে শিক্ষিত, সভ্য করে তোলার মধ্যে দিয়ে, তার রীতিনীতি নির্ধারণ করার মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যবাদ প্রাচ্যকে পুনর্গঠন করার, প্রাচ্যের উপর পশ্চিমি আধিপত্যকে নিশ্চিত করার এক বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে তৈরি হয়। সাইদের এই তত্ত্বায়নের পেছনে বিশ শতকের দুটি তাত্ত্বিক ধারা মূলত কার্যকর হয়েছে। প্রথম, মিশেল ফুকোর ডিসকোর্সের ধারণা—অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক আধার, যার মধ্যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় ক্ষমতার রূপ হিসেবে। দ্বিতীয়, এর সঙ্গে সাইদ যুক্ত করেন আন্তোনিও গ্রামসির সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের তত্ত্ব, যে সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের মাধ্যমে উচ্চকোটির মানুষের নিম্নকোটির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয় এবং বহাল থাকে। সাইদের এই তত্ত্বায়নের ফলে প্রাচ্যবাদ আর নিছক প্রাচ্যবিষয়ক জ্ঞানচর্চার সংজ্ঞায় আটকে থাকে না, তা পরিবর্তিত হয় একটি বিশেষ মতবাদে যার দ্বারা পশ্চিম নিজেকে সংধারিত করার জন্য প্রাচ্যকে রূপান্তরিত করে প্রাকল্পিত এক মিথধর্মী কাঠামোয়। অন্যভাবে বলা চলে প্রাচ্যবাদের মূল কারবার সে অর্থে 'প্রত্যক্ষ' 'বাস্তব' প্রাচ্যকে নিয়ে নয়, তার আসল লক্ষ্য পশ্চিমের বিপরীতে এক 'অন্য'-এর রূপকল্প সৃজন যার অস্তিত্বে নিহিত থাকবে পাশ্চাত্যের প্রভুত্বের, কর্তৃত্বের যাথার্থ্য। অতএব ঐতিহাসিকভাবে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা হল ক্ষমতার, আধিপত্যের এবং প্রভুত্বের জটিলতার। সাইদ আরো বলেন যে, প্রাচ্যের যে 'প্রাচ্যকরণ' হয় তা কেবল উনিশ শতকীয় প্রতীচ্যের সাধারণ কল্পনায় প্রাচ্য এভাবে ধরা পড়েছিল বলে নয়, এটা সম্ভব হয়েছিল প্রাচ্য তার এই রূপকল্পকে মেনে নিয়েছিল বলেই।

প্রাচ্যবাদকে মূলত একটি ইঙ্গ-ফরাসি প্রকল্প হিসেবে দেখা উচিত। অর্থাৎ আঠারো শতকে ইংরেজ এবং ফরাসি জাতির সঙ্গে প্রাচ্যের (এ সময়ে মূলত ভারত এবং বাইবেল ভূমি) যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় তারই প্রকাশ ঘটে প্রাচ্যবাদে। উনিশ শতক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচ্যের বর্ধিত ভৌগোলিক পরিধিতে ইঙ্গ-ফরাসি আধিপত্যই বজায় থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এদের জায়গা নিয়ে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বলা বাহুল্য যে কোনো নতুন তত্ত্বায়নের মতো প্রাচ্যবাদের এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনাও তুমুল বিতর্কের শিকার হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে পাঠ্যবস্তু নির্বাচনের

প্রথাহীনতা নিয়ে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্পর্কের উচ্চাবচ রকমফের অগ্রাহ্য করা নিয়ে, নিম্নকোটি এবং উচ্চকোটি সংস্কৃতির ভেদাভেদকে নিশ্চিহ্ন করা নিয়ে, সংস্কৃতির অস্থায়িত্ব, বহুত্ব, মিশ্রতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধকে উপেক্ষা করা নিয়ে এবং সর্বোপরি প্রাচ্যবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে এক চিরন্তন প্রতীচ্যকে নির্মাণ করা নিয়ে। এ সমস্ত অভিযোগ অনেকাংশে যুক্তিগ্রাহ্য আবার অনেকাংশে সাইদের গ্রন্থের বিভ্রান্তিমূলক পাঠজনিত। সাইদের মূল উদ্দেশ্য প্রাচ্যবাদ সংক্রান্ত যে বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিংবা প্রাচ্যের 'প্রাচ্যকরণ'কে মেনে নেওয়ার প্রক্রিয়ার দোলাচল কিম্বা জটিলতা উদঘাটন করা নয়। সাইদ দেখতে চেয়েছেন পশ্চিমি 'মন' কীভাবে নিজেকে চিহ্নিত এবং সঞ্চারিত করবার জন্য এক অধস্তন প্রতিপক্ষ নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছে যা কোনো ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিশ্লেষিত নয়, যা আবহমান কালের, যা চিরন্তন। এর ফলে জ্ঞাতে কিম্বা অজ্ঞাতে পশ্চিম নিজেরও এক চিরন্তন ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছে। কিছুকাল আগে মার্টিন বার্নাল (*ব্ল্যাক এথেনা*, ১৯৮৭) ধ্রুপদী সভ্যতার আদিসূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। গ্রিক সভ্যতাকে পশ্চিমি সভ্যতার অঙ্গীভূত করার চেষ্টা, তাঁর মতে, এই আদিকল্প নির্মাণের হিসেবেই দেখা উচিত।

বহুস্তরের বিতর্কের ফলে সাইদ প্রণীত প্রাচ্যবাদের তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হচ্ছে। তবে প্রাচ্যবাদের পুরোন সংজ্ঞা থেকে এই নতুন তাত্ত্বিক অভিক্ষেপ কেবল আঠারো-উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী মনকেই নতুন আলোকে উপস্থাপিত করেনি, ঔপনিবেশিত এবং উত্তর ঔপনিবেশিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার আরো এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দিশা দিয়েছে।

কপিরাইট

শুভেন্দু দাশমুন্সী

কপিরাইট কথাটা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে চালু হয়েছে হালে। কিন্তু, শিল্প সংস্কৃতির বিপণন করেন যাঁরা, তাঁদের কাছে এ শুধু একটা শব্দ নয়, রীতিমত ভয়জাগানিয়া একটা শব্দ। একটু পিছনদিকে থেকে, চালু একটা ব্যাপার দিয়ে বিষয়টা বোঝা যাক। কয়েকদিন আগেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলি কিনতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হত বিশ্বভারতীয় জন্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগই একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বাংলা ইংরাজি রচনাগুলি প্রকাশ করতে পারত। (এর মধ্যে শুধু কবির ইংরাজি রচনাগুলি প্রকাশের অধিকার ছিল ম্যাকমিলান কোম্পানির।) অন্য কোনো প্রকাশক সেইসব রচনা প্রকাশ করার অধিকারী ছিল না। প্রকাশ করার অধিকার ছিল না কথাটা ভুল, বলা উচিত অন্য কোনো প্রকাশক যদি তা প্রকাশ করতে চাইত তবে তাকে বিশ্বভারতীয় কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হত। কেউ কখনো সেই অনুমতি চেয়েছে কি না জানিনা, তবে সাহিত্য অকাদেমি যখন তিন খণ্ডে *ইংলিশ রাইটিংস অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* বের করে, সেইসময় তারা কিন্তু বিশ্বভারতীর অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের পর, ২০০১-এর জানুয়ারি মাস থেকে সমস্ত প্রকাশকই রবীন্দ্রনাথের যেকোনো বই প্রকাশ করতে পারে। কারণ হিসেবে শোনা গিয়েছিল ওটি ছিল রবীন্দ্র-গ্রন্থস্বত্ব মুক্তির বছর। রবীন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৪১ সালে, সেই হিসেবেই ২০০১-এ তাঁর মৃত্যুর পর ৬০ বছর অতিক্রান্ত হল আর সেই কারণেই ওটি তাঁর গ্রন্থস্বত্বমুক্তির বছর। শোনা গিয়েছিল, এর বছর দশেক আগেও একবার গ্রন্থস্বত্ব মুক্তির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা খুবই সোজা। আসলে আমাদের দেশে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিয়ম ছিল কোনো সৃষ্টির স্বত্ব, স্রষ্টার মৃত্যুর ৫০ বছর পর পর্যন্ত রক্ষিত থাকে। রবীন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব বিতর্কের ফলেই গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ, স্রষ্টার মৃত্যুর পরে, ৬০ বছর পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর হাতে থাকবে বলে স্থির হয়। বাজারে সেইজন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৩) গ্রন্থস্বত্ব শেষ হয়েছে ১৯৪৩ সালে আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৭) গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৮৭ সালে, কিন্তু ১৯৪১-এর পরে যেসব কবি সাহিত্যিক মারা গিয়েছেন তাঁদের গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ আরো দশ বছর বেড়েছে।

সোজাসাপটা কথাটা বলে এবার একটু ভিতরে ঢোকা যাক। প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে সেটা হল কপিরাইট কি শুধু গ্রন্থস্বত্ব, না কি রচনাস্বত্বও বটে! তারপরেই যে প্রশ্নটা আসে, তা হল কবি সাহিত্যিক ছাড়া অন্যান্য স্রষ্টাদের ক্ষেত্রে কি কপিরাইট বলে কিছু নেই? দুটি প্রশ্নেরই উত্তর অস্ত্যর্থক। অর্থাৎ হ্যাঁ। প্রথমত, কপিরাইটের বাংলা আমরা যতই গ্রন্থস্বত্ব করি না কেন, এটি আসলে রচনাস্বত্ব—পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ-যেকোনো অগ্রন্থিত রচনাও কপিরাইটের আয়ত্তাধীন আর দ্বিতীয়ত, লেখক ছাড়াও চিত্রশিল্পী-সংগীত শিল্পীদের ক্ষেত্রেও কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। যদিও আমাদের দেশে এই আইন লঙ্ঘনকে কেউ বিশেষ নজর পর্যন্ত করে না। সাম্প্রতিক ইন্ডিপপ গানে রিমিক্স গানের রমরমা বা সাম্প্রতিক বাংলা গানে রিমেকের রবরবা দেখে বোঝা যায়, সংগীতের ক্ষেত্রে এই আইনি জটিলতার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পায় না। এর আগেও রবীন্দ্রসংগীতের পরিচিত সুর হিন্দি ছবির গানে ব্যবহৃত হওয়ায় বৌদ্ধিক আপত্তি উঠেছিল কিন্তু আইনি কপিরাইট লঙ্ঘন করার অভিযোগ তো ওঠেনি। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা তাই, না হলে হাটে মাঠে যামিনী রায় বা রামকিঙ্কর বেজের ছবি ও ভাস্কর্যের প্রিন্ট ঢেলে বিক্রি হয়!

আসলে কপিরাইট কী তাহলে? এক কথায় কপিরাইট হল, লেখক, শিল্পী ও সংগীতস্রষ্টাদের হাতে নিজেদের সৃষ্টির পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে অধিকার বজায় রাখা। স্রষ্টা স্বেচ্ছায় যদি নিজের জীবদ্দশায় অন্য কারোকে তাঁর কোনো রচনার স্বত্ব দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে স্রষ্টার ওই বিশেষ সৃষ্টি পুনঃপ্রকাশের অধিকার সেই ব্যক্তির হবে। কিন্তু স্রষ্টার অবর্তমানে রচনাস্বত্ব, স্রষ্টা-নির্দিষ্ট অন্য স্বত্বাধিকারী না থাকলে, স্রষ্টার নিকটাত্মীয়ের হয়; সেক্ষেত্রে রচনার পুনঃপ্রকাশে তাঁর সম্মতি অত্যাবশ্যক। এখানেই আসে সময়সীমার প্রশ্ন। দেখা যাচ্ছে, স্রষ্টার মৃত্যুর পরে ৬০ বছর পর্যন্ত কোনও রচনার স্বত্ব উত্তরাধিকারের হাতে সংরক্ষিত থাকে, তারপর তা জনসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত হয় এবং তখন তার পুনঃপ্রকাশে কারো অনুমতি গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। কপিরাইট আইন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কুইন অ্যানের সময়কালে ইংল্যান্ডে কপিরাইট আইন পাশ হয়। এর আগে যেকোনো লেখা লেখকের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশকরা প্রকাশ করতে পারতেন এবং সেই প্রকাশিত বই থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশভাগ লেখককে দেওয়ারও কোনো প্রশ্নই উঠত না। আমেরিকায় বিশ শতকের প্রথমদিকেও কপিরাইট নিয়ে খুব নির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব ছিল না। বার্ন কনভেনশন অনুযায়ী সারা পৃথিবীর গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট রক্ষিত হয়। বার্ন কনভেনশন অনুযায়ী বর্তমানে রচয়িতার মৃত্যুর পর ৭০ বছর পর্যন্ত সৃষ্টি-স্বত্ব সংরক্ষিত থাকার কথা। তাছাড়া, কোনো সৃষ্টির ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি হলে তার স্বত্ব সংরক্ষিত হয় ভিন্ন নিয়মে। সেক্ষেত্রে রচনাপ্রকাশের পর সর্বাধিক ৯৫ বছর কিংবা রচনাসৃষ্টির পর সর্বাধিক ১২০ বছর পর্যন্ত এর স্বত্ব সংরক্ষিত থাকে। ভারতে অবশ্য এই নতুন নিয়ম এখনও চালু হয়নি।

কপিরাইটের ক্ষেত্রে প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অপ্রকাশিত ভাবনা বা চিন্তাসূত্র সম্পর্কে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য নয়। তবে প্রকাশ শব্দের অর্থ সবসময় মুদ্রণযন্ত্রের

দাক্ষিণ্য পাওয়াকেই বোঝায় না, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিও কপিরাইট আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই সূত্রে আধুনিক কপিরাইট আইনে উল্লিখিত হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কথাটি। *ব্রিটানিকা*-র রেডি রেফারেন্স এনসাইক্লোপেডিয়ায় বলা হয়েছে; Intellectual property হল 'Property that derives from the work of an individual's mind or intellect. Early copyright law aimed to protect the economic interests of book publishers rather than the intellectual rights of authors. Modern copyright law protects the labour of elaborating an idea, but not the idea itself. The concept of discovery also plays a role in intellectual property rights.' আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিষয়টি দেখে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গ্যানাইজেশন। এটি ১৯৭০ সালে কাজ শুরু করে দ্বিবিধ শিল্পবস্তুর—অর্থাৎ industry অর্থে ও art অর্থে—অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে।

কবীর প্রন্থ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ত কবীর তাঁর ব্যক্তিগত নির্জন একক মার্গের পথিক ছিলেন। ধর্মবিশেষের প্রতি কোনো পক্ষপাত তাঁর ছিল না। জীবনাচরণে 'সৎ' থাকতে চেয়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় অনুশাসন, সাম্প্রদায়িক বাহ্যাচারের বিরোধী হলেও তাঁর ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রযোজ্য হবার কোনো অবকাশ নেই। সম্প্রদায়-সৃষ্টির কথা তিনি না ভাবলেও তার নাম নিয়ে যা গড়ে উঠেছে—'কবীব পন্থ' নামে তা পরিচিত। কবীরের প্রতি আকর্ষণে অনেকে তার অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁদের ভেতর পদ্মনাভ, শ্রুতিগোপালদাস, ভগবান গোস্বামী, জগদাস প্রমুখ ছিলেন। এদের পরম্পরায় কবীর পন্থে বিভিন্ন শাখায় উদ্ভব হয়েছে। কবীর এবং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কিংবদন্তীর অভাব নেই। কবীর পন্থের ইতিহাস তার ভেতরও খুঁজে দেখার অবকাশ রয়ে গেছে। এই সম্প্রদায়ের সূচনা কবে থেকে হয়েছিল নিদিষ্টভাবে তা বলা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যায়, কবীর-বাণীর সংকলন কবীর পন্থীদের পন্থ-পুঁথি 'বীজক'-এর রূপায়ণের সূত্রে তা সম্ভব হয়ে থাকবে। ভারতীয় মধ্যযুগে কবীর এবং নানকের সূত্রে বিকশিত পরবর্তী সমস্ত সন্ত-পরম্পরায় গ্রন্থকে গুরুপদের মর্যাদায় অভ্যর্থনা করতে দেখা যায়। আর এক্ষেত্রে 'বীজক' হল সর্বপ্রথম 'পন্থ-পুঁথি', অন্যান্য পন্থ-পুঁথির কথা বিবেচনা করলে।

পন্থ এবং ধর্ম এক জিনিস নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বহু ধরনের গ্রন্থ, শাস্ত্র, দেবদেবী, কীর্তন-পূজন, আচার বিচার প্রভৃতির বিধান থাকে। যাকে বাহ্যাচার বলা হয়। বাহ্যাচার ছাড়া কোনো ধর্ম টিকে থাকে না। কিন্তু পন্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। একজন গুরু বা পয়গম্বর, একখানি গ্রন্থ, এক মন্ত্র এবং প্রায় সৈনিকদের মতো অনুশাসন তথা বেশবাস ধারণ পন্থের ক্ষেত্রে আবশ্যক। পন্থ ধর্ম নয়, বরং তার বিকল্প। আরেকটি কথা এইসূত্রে মনে রাখা ভালো। পন্থ এবং মঠ প্রকৃতপক্ষে একটি আরেকটির সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংবদ্ধ বিষয় নয়। মঠ ছাড়াও পন্থ হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনো পন্থের জন্য মঠের আধার প্রয়োজন হয় নিজস্ব ধর্মক্ষেত্র গড়ে তোলার তাগিদে। পন্থ এবং মঠ তখনই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত বিষয় হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু জুটতে থাকে।

মৌখিক পরম্পরার মানুষ সন্ত কবীরের সঙ্গে তামিলদেশ থেকে আগত বিদ্বান শ্রুতিগোপালদাসের সাক্ষাতের পর তিনি অক্ষরী বিদ্যার চর্চা থেকে সরে আসেন। কবীরের মৃত্যুর পর সন্তমণ্ডলীর এক বৈঠকে তাঁকে আচার্য মহন্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হলেও প্রথমে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলা হয়। পরে অনুরোধের চাপে পড়ে

ওই পদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তিনি পন্থবাদী ছিলেন না। যেমন কবীরের সন্তান / শিষ্য সাধক কমালও তা ছিলেন না। কিন্তু বৈষ্ণবদের চারটি প্রধান সম্প্রদায়ের (রামানুজ, নির্ধারক, মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্য) অন্যতম নিম্বার্কাচার্যদের পরম্পরায় বিকশিত হরিব্যাসী সম্প্রদায় থেকে আগত ভগবান গোস্বামী এঁদের বিপরীত ছিলেন। বলা হয় আজমিরের নিকটবর্তী সুলেমাবাদে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ধর্মাজিজ্ঞাসু নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। কালিঞ্জরের কাছে পিথৌরাবাদ (বুন্দেলখণ্ড) অঞ্চলে কবীরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে তিনি নিজের ভজন-পূজন নিয়ে এক মন্দিরে থাকতেন। আসল তত্ত্ববস্তুর সন্ধানী ছিলেন—তাঁর অভাবমোচন হয় নিরক্ষর অথচ প্রজ্ঞাবান সন্ত কবীরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর। কবীরের বাণীকে তিনি লিপিরূপ দেন। বীজ-বাণী বা মন্ত্র-বাণী হিসেবে গুরুবচনের সংকলনের নামকরণ করেন 'বীজক'। পিথৌরাবাদ থেকে নারায়ণী নদীর তীরে চটিয়ায় (চম্পারন, বিহার) এসে 'বীজন'-এর অন্তিম রূপ দেবার প্রয়াস করেন। তাঁর সৎসঙ্গী গুরুভাইদের তুলনায় বেশি সনাতনী হিন্দু, গ্রন্থবাদী ও পন্থবাদী হওয়ার দরুন কবীর পন্থের ভিত্তি তাঁর প্রযত্নে গড়ে-ওঠার অবকাশ পেয়েছিল। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বেশ কিছু জিনিস তাঁর সূত্রে কবীরের মার্গে যুক্ত হয়েছে। কণ্ঠী, মালা, তিলক যেমন তাঁর দান, 'সন্ত'-র জায়গায় 'ভগৎ ভাব'-এর বিকাশও এবং 'রামনাম'-কে স্মরণ-জপের ক্রিয়ায় সংবদ্ধ করা—'অজপা জপ' মূলরূপে না থাকলেও পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভগতাহী পন্থ'-এ তার প্রচলন এই সূত্রে ঘটে। ভগতাহী পন্থ আজ কবীর পন্থের একটি শাখা হিসেবে গণ্য হলেও 'পন্থ'-র সূচনা এর সূত্রে হয়েছিল।

জাতিভেদে আকীর্ণ হিন্দুসমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষজনের ভেতর এঁদের সংগঠন গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছে। উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অধুনা ছত্তিশগড়, গুজরাট রাজ্যে এঁদের সংগঠন কালক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। সীমিতভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গেও এঁরা রয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের পাশে গৌণ ধর্মীয় সমাজের স্বাতন্ত্র্য তাঁদের আত্মপরিচয় স্থাপনের প্রয়াসের নিরিখে বিচার্য। এদিক থেকে কবীর-পন্থকেও বিবেচনা করতে হয়।

কবীর পন্থীদের বিভিন্ন শাখা উপশাখার ভেতর শ্রুতিগোপালদাসের পরম্পরায় কাশীর কবীর চৌরা, ভগবান গোঁসাইয়ের সূত্রে ভগতাহী পন্থ, জগুদাসের সূত্রে বিদুপর (বৈশালী), ধর্মদাসের সূত্রে ধরমদাসী (ছত্তিশগড়), পদ্মনাভর শিষ্য নীলকান্তর সূত্রে গুজরাটের রাম কবীর পন্থ, জীবার সূত্রে ফতুহা (বিহার) এবং আরো অনেক অঞ্চলে এঁদের মঠ-মন্দির, আশ্রম, খামারবাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এঁদের অভ্যন্তরীণ বিবাদও অপ্রকট থাকেনি। এঁদের বিভিন্ন শাখার পক্ষে প্রচুর সাহিত্যকর্মও আছে। সেগুলি হস্তলেখ বা পুঁথি ছাড়াও মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সন্ত কবীর এঁদের কাছে লোকোত্তর পুরুষ। কবীরের বিশ্বাসের পরিপন্থী বিষয়ও অনেকক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। সাধু এবং গৃহস্থের স্বাতন্ত্র্যে বেশবাস, আচারবিচার, বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই নিরামিষ ভোজন এবং মদ্যপানে নিষেধ প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে এঁরা হিন্দুসমাজের বাইরের কেউ নন। নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজনের ভেতর পারস্পরিক সম্ভাষণে, গুরু প্রণামের সময় বা তাঁদের শ্রদ্ধেয়

আচার্য মহন্ত, কী কোনো মহন্তকে প্রণামের ক্ষেত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁদের 'বন্দেগি' তিন রকমের—কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। সাধু, কী গৃহস্থ বা 'ভগৎ' যে-ই হোন, গুরুপ্রণাম বা মহন্তকে প্রণামের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাক্যালাপ সূচনার আগে তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে দু-হাত সামনে প্রসারিত করে দুই করতল যুক্ত অঞ্জলিমুদ্রায় 'সাহেব' বলেন। এরপর মাথাটি ঝুঁকিয়েই প্রণম্য ব্যক্তির সঙ্গে 'দৃষ্টি বিনিময়' করেন। অপরপক্ষ প্রত্যভিবাদনে বন্দেগি' উচ্চারণ করেন মাথাটি সামান্য ঝুঁকিয়ে। সুব্যবস্থিত জায়গায় এটি হল 'কায়িক বন্দেগি'। কবীরের ছবিব সামনে, কিংবা তাঁর সমাধিপীঠে এবং কবীরের বাবা-মা নিরু-নিমার সমাধি, কিংবা বিগত কোনো মহন্তর সমাধির সামনেও 'কায়িক বন্দেগি' করেন। এসব ক্ষেত্রে যেহেতু অপরপক্ষের প্রত্যভিবাদন জানানোর অবকাশ নেই, ওঁরা তাই নিজের প্রণামটুকু জানিয়ে মৃদুস্বরে 'সাহেব' বলে উঠে পড়েন। আবার পথচলতি ক্ষেত্রে কোনো মহন্ত বা কোনো সাধুর সঙ্গে বা সাধারণ ভগতের যদি দেখা হয়, সেক্ষেত্রে 'সাহেব' বলে মাথা ঝোঁকান। অপরপক্ষ তখন 'বন্দেগি' বলেন। এটি হল 'বাচিক বন্দেগি'। কিন্তু গুরু যদি দূরে থাকেন, তখন 'মানসিক বন্দেগি' হয়। ওঁদের 'কায়িক বন্দেগি'-র উৎসে যে মুসলমানি প্রভাব আছে তা একটু নজর করলে বুঝতে পারা যায়। কিংবা 'বাচিক বন্দেগি'-র উৎসেও সালাম আলেকুম আর আলেকুম সালাম। ওঁদের বন্দেগির বিভিন্ন সময়, মুদ্রা এবং দৃষ্টি বিনিময় এসব নিয়ে নিজেদের পক্ষে ব্যাখ্যাও আছে। সেসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। ওঁদের দীক্ষানুষ্ঠান, 'চৌতা' সম্পর্কেও। বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে ওঁদের কাছে নারকেল এবং পান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওঁদের শাখাভেদে নিয়মকানুনে পার্থক্যও আছে। ধরমদাসী শাখার নানা ক্রিয়াকর্ম কবীর পন্থের ভেতর যুক্ত হলেও শ্রুতিগোপালদাসের পরম্পরা বা কাশীর কবীর চৌরা—কবীরের জন্মকর্মের সঙ্গে যুক্ত মূলস্থানের অধিকারী বা 'মূলগদি'-র দাবিদার যাঁরা, বেশকিছু বিষয় মান্য করেন না। কবীর চৌরা এবং আরো কিছু শাখার মহন্তপদ বংশানুক্রমিক নয়। এই কারণে ওঁরা নিজেদের ভেতর ধরমদাসী শাখাকে 'বৃহশগদি' বা 'বংশঘর'ও বলে থাকেন। সাংগঠনিক প্রচারের দিক থেকে ধরমদাসী শাখা সুদীর্ঘকাল যাবৎ অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি তৎপর। তবে কবীর চৌরা ও অন্যগুলি কালক্রমে নিজেদের সংগঠনকে আরো মজবুত করেছে।

কবীরপন্থীদের মতে ১৪৫৬ সংবতে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার রাতে, সোমবারে কাশীতে সন্ত কবীরের আবির্ভাব এং ১৫৭৫ সংবতে মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে মগহরে তাঁর প্রয়াণ হয়। একশো বিশ বছরের সুদীর্ঘ আয়ু তাঁদের কবীর সাহের'-এর জন্য নিজস্ব উদ্ভাবন এবং সেইমতো তাঁরা ব্যাপক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। সাধু ও ভগৎরা সমবেত হন। প্রবচন, ভজন, ভাণ্ডারা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদানপ্রদানে ওই দুটি দিন মহোৎসবের রূপ নেয়। এছাড়া অন্য সময়েও বিশেষ তিথি উপলক্ষ করে দূরদূরান্ত থেকে তাঁরা আসেন। কবীরপন্থীদের ভেতর সম্পন্ন এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, খুবই দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিরক্ষর সবরকম মানুষই আছেন। কবীর পন্থের না হলেও বহু ভিক্ষাজীবী, বেগানা মানুষেরও অন্নসংস্থান হয় এইরকম উৎসবে যেমন, তেমনি প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলের মঠ বা আশ্রমেও।

কমনওয়েলথ অব নেশনস্

গণপতি ভট্টাচার্য

কমনওয়েলথ অব নেশনস্ হল ব্রিটেন এবং পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশের (বর্তমান ব্রিটিশ শাসনমুক্ত) বা স্বাধীন রাষ্ট্রের মৈত্রী সংগঠন। এক মাত্র ব্যতিক্রম হল মোব্যম্বিক যার ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো অতীত সম্পর্ক ছিল না। ১৯৩১ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের কমনওয়েলথ ভুক্তি এই সংস্থাকে তার আধুনিক রূপ দিয়েছে। অতীতে এটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্ নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে এখনও অনেকে—সে ঐতিহাসিক কারণেই হোক বা অন্যান্য কমনওয়েলথ থেকে এর পার্থক্য নির্দেশের জন্যই হোক—পুরানো নামটি ব্যবহার করে থাকেন। ব্রিটিশ রাব্যাকে কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলি তাঁকে 'symbol of their free association' রূপে বরণ করেছে। সেই কারণে বর্তমানে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ হলেন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের মতো কমনওয়েলথের প্রধান।

বর্তমানে কমনওয়েলথ ৫৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তিরিশ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সম্মিলিত ভূ-খণ্ডের পরিমাণ প্রায় পৃথিবীর মোট ভূ-খণ্ডের এক-চতুর্থাংশ। এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন।

এই সংগঠনের সদস্যপদ পেতে গেলে সেই দেশকে অবশ্যই এই সংস্থার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে হবে—এবং সদস্যপদ লাভে আগ্রহী রাষ্ট্রকে অতীতে বা বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন বা অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংবিধানিক সম্পর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল মোব্যাম্বিক, যে ১৯৯৫ সালে সদস্যপদ লাভ করে উল্লিখিত শর্ত ছাড়াই। মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও ১৯৯৭ সালে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানরা ঠিক করেন যে এটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং কখনই উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হবে না। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজিপ্ট, ইজরায়েল এবং ইরাক কখনই কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার আগ্রহ দেখায় নি, যদিও তাদের ব্রিটিশ উপনিবেশ বা ব্রিটিশ দ্বারা শাসিত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার টিকিয়ে রাখতে না পারার জন্য 'কমনওয়েলথ পরিষদ' থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা

হয়েছিল। বরখাস্ত হওয়া সদস্যরা কমনওয়েলথের সদস্য থাকলে ও কোন সভা বা মিটিং-এ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। ফিজিকে ১৯৮৭-১৯৯৬ এবং ২০০০-২০০১ এই দুই বার সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য বরখাস্ত করা হয় সাময়িকভাবে; যেমনটি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত প্রযুক্ত হয়েছে। একইভাবে রবার্ট মুগাবের নির্বাচনী এবং ভূমি-সংস্কার নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ২০০২ সালে জিম্বাবোয়েকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ২০০৩ সালে এই দেশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করে।

এই সংগঠনের সদস্যপদ ঐচ্ছিক হওয়ার ফলে সদস্য দেশগুলি যখন খুশি কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। বাংলাদেশকে কমনওয়েলথ স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে পাকিস্তান এই সংগঠনের সঙ্গে ১৯৭২ সালে সংযোগ ছিন্ন করে, কিন্তু ১৯৮৯ সালে পুনরায় যোগদান করে।

কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে কমনওয়েলথের সদস্য পদ থেকে সাময়িক বরখাস্তের ক্ষমতা কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের থাকলেও বহিষ্কার করার ক্ষমতা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯৪ সালে 'বর্ণবৈষম্য নীতি'র (Apartheid) অবসান ঘটানোর পর ১৯৯৫ সালে পুনরায় কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে অর্থ্যাৎ 'সাসপেনসন' তুলে নেওয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ হলেন। কমনওয়েলথের নামমাত্র প্রধান। ১৯৬৫ সাল থেকে এই সংগঠনের লণ্ডনে একটি সচিবালয় আছে। কমনওয়েলথের বর্তমান (২০০৫) মহাসচিব হলেন নিউজিল্যাণ্ডের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ডন ম্যাককিনন (Das Makinnon) প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার দিনটি 'কমনওয়েলথ দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়।

দীর্ঘদিন ধরে কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি উন্নত রাষ্ট্রের (যেমন ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড) সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য গরিব দেশগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতৈক্য স্থাপনের একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে কখনো কখনো সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ১৯৫৩-এ রোডেশিয়া নিয়ে মতানৈক্য এবং বিগত শতাব্দীর আশির দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি ব্রিটেনের সঙ্গে আফ্রিকার সদস্য রাষ্ট্রগুলির দূরত্ব সৃষ্টি করে।

এই সংগঠনের মুখ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দুই বছর অন্তত অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের (Commonwealth Heads of Government—CHOGM) মিটিং বা সভায়, যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রতি বা প্রধানমন্ত্রীগণ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে টানা কয়েকদিন ধরে বৈঠক করেন। এছাড়া সদস্য দেশগুলির অর্থমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্টিত হয়। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সভা প্রতি দু'বছর অন্তর পর্যায়ক্রমে পৃথক পৃথক সদস্য দেশগুলিতে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নেতৃবর্গ আন্তর্জাতিক বিয়ষগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সহমতে পৌছাতে সচেষ্ট হন। সদস্য রাষ্ট্র কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সহযোগি এই সভা অনুষ্ঠিত করে। বিগত শেষ সভা নাইজেরিয়ার আবুজাত ২০০৩ সালের ৫-৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামি বৈঠক মল্টা-র ভেলেটা (Valetta) নামক স্থানে ২০০৫ সালের ২৫-২৮শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে।

কমনওয়েলথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৯১ সালের হারারে ঘোষণায় (Harare Declaration-১৯৯১) যার মুখ্য বক্তব্য হল গণতন্ত্রের বিস্তার এবং সু-শাসন বা সু-সরকার প্রতিষ্ঠা এবং যে দেশ তা লঙ্ঘন করবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এর আগে সাধারণভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অ-হস্তক্ষেপের নীতি প্রচলিত ছিল।

এই সংগঠন বাস্তবে কী কাজ করতে পারছে তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এর সদস্যপদ প্রাপ্তি—অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র এর সদস্য আর কোন দেশ নয়—সেই প্রশ্ন, তার কারণ, কমনওয়েলথে-এর সদস্য হওয়ার লাভ হল ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন ইতিহাস সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ঘন ঘন মত বিনিময়ের সুযোগ লাভ যা ক্রমশ অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের রূপ নেয়।

প্রারম্ভিক পর্বে কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জোট হিসাবে কাজ করেছে। যেখানে রাষ্ট্রগুলির উৎপাদিত সামগ্রী সহজেই অন্য সদস্য রাষ্ট্রের বাজারে বিপণনের জন্য প্রেরিত হত (যাকে 'Commonwealth Preference' বলা হত) এবং এক দেশ থেকে সহজেই অন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশে যাতায়াত বা বসবাস করতে পারত। বর্তমানে এই নীতি পরিত্যক্ত হলেও এর প্রভাব সম্পূর্ণ বিলীন হয় নি।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে কমনওয়েলথের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাধ্যমে ব্রিটেনের অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির কমনওয়েলথের সদস্য নয় এমন দেশের সঙ্গে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে নিকটতর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি। এই সংগঠন বর্তমানে মুখ্যত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন, মানবাধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে এটি সম্পদসমৃদ্ধ প্রথম বিশ্বের সাথে ধর্মীয় একটি সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির এক সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

কমনওয়েলথভুক্ত সদস্য দেশগুলির মধ্যে প্রতি চার বছর অন্তর এবং প্রতি অলিম্পিকের দু বছর পর 'কমনওয়েলথ গেমস' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া The Association of Commonwealth Universities বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সদস্য-দেশগুলির মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট। কমনওয়েলথ এই মডেল ফ্রান্স এবং পর্তুগালকে তাদের উপনিবেশগুলি নিয়ে মৈত্রী জোট গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পরিশেষে কমনওয়েলথ যে যে ক্ষেত্রে সক্রিয় সেগুলি হল: উন্নয়ন, গণতন্ত্র, ঋণ ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন, নতুন সহস্রাব্দের লক্ষ্যপূরণ যা এর বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই মৈত্রী জোটের ব্রত (mission) হল : 'We work as a trusted partner for all Commonwealth people as a force for peace, democracy, equality : and good governance; a catalyst for global consensus building ; and a source of assistance for sustainable development and poverty eradication.'

কমপিটেন্স পারফরমেন্স

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের দৌলতে আগে ভাবা হত মানুষ ভাষা 'শেখে' বাইরে থেকে—এ সব উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়োপাত্ত হিসেবে মানুষের কাছে আসে, তারই অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া হল ভাষা।

এমন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ায় বাঁধা আচরণবাদী তথা অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যয়কে আক্রমণ করলেন নোয়ম, চমস্কি। একটি শিশুর দিকে তাকালে দেখা যাবে, সে এমন বাক্য 'বানাতে' পারে এবং 'বুঝতে' পারে, যা আগে সে কখনও শেখেনি বা মুখস্থ করেনি। সে এই বাক্যসৃষ্টি করে কী করে?

মানবভাষায় অবাধ ও যা-ইচ্ছে-তাই (arbitrary) ধ্বনি ও শব্দসংখ্যা সীমায়িত। এই সীমায়িত শব্দ দিয়ে যে কোনো মানুষ *অসীম সংখ্যক* বাক্য বানাতে পারে। কিসের জোরে এই ঘটনা সম্ভব হচ্ছে? চমস্কি বলেণ, মানবমনের দৌলতে। মানবমনের মধ্যে আছে নির্বিশেষ ব্যাকরণের ছাঁদ (যা কিনা অসীম বাক্য সৃজনের জন্য দায়ী), সেই ছাঁদে গিয়ে জড়ো হচ্ছে বাইরের সসীম ও অবাধ ধ্বনি ও শব্দ। এই সসীম *উপাদান* গিয়ে পড়ে ভেতরের *আকারে* বা ছাঁদে। সৃষ্টি হয়, অল্প কয়েকটা নিয়ম মেনে অসীম বাক্য। এই অসীম বাক্য বানানোর মানসিক ও মানবজাতিগত সামর্থ্যকে ১৯৬৫ সালে চমস্কি বলেছিলেন কম্পিটেন্স, ১৯৮৬-তে বললেন অভ্যন্তরীণ ভাষা (Internalized Language)।

আচরণবাদের বিপরীতে চমস্কির এই ভাষা-সৃজন সামর্থ্যের উপকল্প অবশ্যই বুদ্ধিবাদী দেকার্তের উত্তরাধিকার এখানে স্পষ্ট। চমস্কি আজকের ভাষায় এই সামর্থ্যকে বলেছেন 'জেনেটিক এনডাওমেন্ট'—নেটিব স্পিকারের ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এই জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের ফসল। এরজন্যই "আদর্শ বক্তা-শ্রোতা" অসীম বাক্যের আদানপ্রদানে যে বোঝা ও বলা চালিয়ে যান, তাতে এই ভাষিক সামর্থ্যের প্রতিপাদন ঘটে। এই বোঝা ও বলার থাকে তিনটি বিশেষ উপসামর্থ্য : বাক্যিক, শব্দার্থগত ও ধ্বনিতাত্ত্বিক সামর্থ্য।

এই অভ্যন্তরীণ ব্যাকরণগত সামর্থ্য ছাড়াও ১৯৭৭-এ চমস্কি আর একধরনের সামর্থ্যের কথা বলেছেন, বিবক্ষা সামর্থ্য। বিরিঞ্চিবাবার গপ্পো শেষে যখন জানতে পারি মেয়েদের 'য্যাঃ' মানেই 'হ্যাঁ', তখন বিবক্ষিত মানের এই প্রত্যয়কে বলতে পারি বিবক্ষা সামর্থ্য (Pragmatic Competence)।

কম্পিটেন্সের পাশাপাশি চমস্কি (১৯৬৫) এনেছেন পারফরম্যান্সের ধারণা। চমস্কির কথায় পারফরম্যান্স হল 'actual use of language in concrete stituations.' । ভাষা প্রয়োগের সময়, 'আদর্শ' সংগঠন বিচ্যুত বা অ-বিচ্যুত নানান খেলা চলে। জিভ পিছলে যায়, দেখা দেয় মুদ্রাদোষ, থাকে অসম্পূর্ণতা—এগুলোর নাম চমস্কি দিয়েছেন 'perfomance error'—ক্লান্তি, বিরক্তি বা মহানন্দে কথার এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। যাই হোক ১৯৬৮-তে চমস্কি এই Performance-কে নতুন নাম দিলেন—Externalized Language। ভাষার অন্দর ও সদরে ভাগাভাগি হয়ে গেল—অন্দরের জেনেটিক আকৃত ভাষা-সামর্থ্য আর সদরের সামাজিক যা-ইচ্ছে-তাই ধ্বনি-শব্দের উপাদান—এই দুই নিয়েই ভাষা।

ডেল্ হাইম্সের মতো সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য চাইলেন, এই কম্পিটেন্সকে নেহাত বায়োলোজিক্যাল এলাকায় না ফেলে রেখে, সামাজিকতার নিগড়ে বুঝে নিতে। কোনও ভাষার বক্তাকে তো সামাজিক রীতিনীতি শিখে নিয়ে সংলাপ চালাতে হয় (যেন, 'কেমন আছেন' 'ভালো আছেন তো?' 'ধন্যবাদ', 'নমস্কার', 'শুভবিজয়া"...), এতএব 'Communicative Competence'-ও রপ্ত করে নিতে হবে বক্তা ও শ্রোতাকে।

এই Communicative Competence-এর কথাটা অন্যভাবে পাড়লেন হাবেরমাস। প্রাতিষ্ঠানিকতায়, পুঁজিবাজী বৃত্তে, ভাষা-সৃজন সক্ষমতা তথা সামর্থ্য যায় হারিয়ে। এই হারিয়ে যাওয়া সংলাপ-সক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনতে উন্মুখ হাবেরমাস প্রস্তাব রাখলেন এমন এক উত্তরিত এলাকার—যেখানে সক্ষম সামর্থ্যে চালানো যাবে সংলাপ। আসলে চমস্কির উপকল্পে 'আদর্শ বক্তা-শ্রোতা'-র কথা বলে। কিন্তু নিবেদন বা পারফরম্যান্সে যে জবানি তৈরি হয়, তাতে প্রাতিষ্ঠানিকতা ও ভাবনীতির চূড়ান্ত দাপট থেকে যায় (মিশেল ফুকো)। নেই দাপট কি সেঁধোয় না বায়োলজির ভেতরে ('নিৎসের কথায় 'internalization')? সেঁধোয় বলেই বার্ত ও ক্রিস্তেভা, চমস্কির উপকল্পের এই আদর্শ 'উত্তরিত অহং'-কে ছেড়ে কথা কন নি। এইসব প্রসঙ্গ ধরেই কেউ কেউ চমস্কির 'উত্তরিত অহং'-উপকল্পে আনতে চাইছেন মহাপ্রবলবলী সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক দাপটের পদচিহ্ন। তাঁদের প্রস্তাব এইসব প্রতাপে ভাষা-সৃজনে পঙ্গুতা আসে, অতএব প্রস্তাবিত হল Psyche-র সঙ্গে Social মিলেয়ে Psycho-Social properties বা সাই Properties।

স্যোসুরের Langue-parole-র ধারণার সঙ্গে অনেকেই চমস্কি-কথিত এই দ্বৈততাকে মেলাতে চাইবেন। খেয়াল রাখতে হবে 'স্যোসুরের বিরোধাভাস' হল Langue-এর মতো জৈবিক ধারণাকে দুর্খেইম অনুসরণে 'social fact' বলা। তাছাড়া চমস্কির মতো ভাষার নিয়ম-নির্ভরতার কথা স্যোসুর যে সময়ে ভাবতে পারেন নি। তবে উপাদানের দৌলতে স্যোসুরের বিরোধাভাস কাটলেও কাটতে পারে।

কমিউনিকেশন

অভিজিৎ রায়

আমেরিকার সংযোগতাত্ত্বিক জন ডিউই (John Dewey) তাঁর ১৯৩৯ সালে লিখিত *এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড নেচার* বইতে মন্তব্য করেছিলেন '...of all things, Communication is the most wonderful'। কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত চমকপ্রদ বলাটা বাড়াবাড়ি ঠেকতে পারে ; কিন্তু ঘটনা হল, রোজকার কথাবার্তা ইন্টারনেট বা টেলিভিশনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, এমনকী নীরবে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা—সবকিছুই যে আসলে কোনো না কোনো ভাবে একটা যোগাযোগ-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, তা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। এর কারণ, অভিজ্ঞতার একদম প্রাথমিকমাত্রায় এমনভাবে কাজ করে এই প্রক্রিয়া (মতের আদান-প্রদান বা গ্রহণ-বর্জন) যে আমরা তার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করি না। বস্তুত 'অভিজ্ঞতা'র অর্থের মধ্যেই যোগাযোগের একটি পূর্বশর্ত নিহিত রয়েছে।

রেমন্ড উইলিয়াম্‌স জানাচ্ছেন যে 'Communication' কথাটির উৎপত্তি লাতিন 'Communis' থেকে যার ইংরেজিতে অর্থ হচ্ছে Common। 'Communicate' এর আদি অর্থ 'make common to many, impart' অর্থাৎ অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। আর এই ভাগ করে নেওয়াটাকে যা সম্ভব করে তোলে তাই কমিউনিকেশন। সাধাণভাবে 'কমিউনিকেশন' বলতে অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ ও পণ্যের ভৌগোলিক সরণের প্রতি নির্দেশ করা হত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পর থেকে এই অর্থের পরিবর্তন হতে থাকে। কমিউনিকেশনের বর্তমান অর্থ মোটামুটি বিশ শতকের মধ্যভাগে স্থিরীকৃত হয়। এখন যোগাযোগ (Communication) ও পরিবহণ (transport) দুটিকে আলাদা প্রক্রিয়া ও দুটি ভিন্ন শিল্প (industry) -এর অংশ হিসেবে দেখা হয়। প্রথমটি বলতে তথ্য ও ধারণার চলাচল বা তার মাধ্যম (রেডিও, ডাক-ব্যবস্থা টেলিফোন ইত্যাদি) বুঝি আর দ্বিতীয়টি বলতে সাধারণভাবে বুঝি মানুষ ও বস্তুর চলাচল বা তার মাধ্যম।

'সংযোগ' বা 'যোগাযোগ' যাই বলি না কেন—এ বিষয়ে আলাদা করে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা বা অন্যধরনের চর্চা, বাংলাভাষায় তো বটেই, আমাদের দেশেই কখনো সেভাবে হয়নি। সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্রবিদ্যা ও মাধ্যমচর্চার (Media Studies) ক্ষেত্রে যেটুকু কাজ হচ্ছে তা স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়ে পাশ্চাত্যচিন্তার অনুগামী।

যোগাযোগ বিষয়ে পাশ্চাত্যচিন্তা দুটি বিপরীতমুখী ধারণার দোলাচলে সর্বদা স্ববিরোধী থেকেছে। একটাকে যদি বলি প্রেরণ ধারণা (Transmission View) অন্যটাকে বলতে হয় অংশগ্রহণ ধারণা (Ritual View)। সবচেয়ে প্রচলিত প্রেরণ-ধারণা অনুযায়ী 'কমিউনিকেশন' হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মানুষ ও দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণের তাগিদে বার্তা এক জায়গা থেকে আর একজায়গায় 'পাঠানো' হয়। এই ধারণায় 'প্রেরণ', 'সম্প্রচার', 'তথ্য-বিতরণ', 'বণ্টন' ইত্যাদি শব্দ যোগাযোগকে সংজ্ঞায়িত করে। গোটা যোগাযোগ-প্রক্রিয়ায় যে পাঁচটি উপাদান ক্রিয়াশীল—প্রেরক, প্রাপক, বার্তা, মাধ্যম ও প্রাপকের প্রতিক্রিয়া—তাদের মধ্যে প্রেরকের (অর্থাৎ বার্তারও) মতাদর্শগত প্রেক্ষিত এখানে গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয়। ট্রান্সমিশন-ধারণা বিশেষত প্রাক-টেলিগ্রাফ যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার রাজনৈতিকতা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। অনেক গবেষক ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে ধর্মপ্রচারের সম্পর্ককে বোঝার জন্য যোগাযোগের এই ধারণার প্রয়োগ করেছেন। সারা বিশ্বজুড়ে ইউরোপীয় শ্বেতকায়দের উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য যেমন ছিল বাণিজ্য, তেমনি অনেকাংশেই ছিল ধর্মপ্রচার। পৃথিবীতে যখন 'কমিউনিকেশন' বলতে 'ট্রান্সপোর্টেশন' বোঝাত, তখনই সারা বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ তথ্য, বার্তা, পণ্যসামগ্রী ও মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবহণ ঘটেছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। বস্তুত ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার তাড়নায় ভৌগোলিক সরণ শ্বেতকায়দের মধ্যে এমন প্রবল ছিল যে, চেমস্ ক্যারের মতে 'movement in space'-ই একটা 'redemtrive act' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (*Communication as Culture. Essays on Media and Society*, Unwin Hyman, ১৯৮৯) চলনের সঙ্গে মুক্তির যে খ্রিষ্টীয় অনুষঙ্গ তা হয়ত পরবর্তীকালে সংযোগপ্রযুক্তির বিকাশে সেভাবে কাজ করেনি, তবে সম্প্রচারের (broadcasting) মতো প্রযুক্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে রয়ে গিয়েছে নব্য-ঔপনিবেশিকতার বিপদ। পুঁজি-চলাচলের নয়া ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এই ঔপনিবেশিকতা মানুষের ভৌগোলিক সরণের মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত বার্তার একমুখী চলনের মতাদর্শকে বুঝতে সাহায্য করে বলেই প্রেরণ ধারণা আজও যোগাযোগবিদ্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারার নির্দেশক।

যোগাযোগের অন্য যে ধারণাটি (Ritual view) পশ্চিমি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কাজ করেছে তা অনেকটা ধর্মীয় প্রথার মতো করে সংযোগ-ব্যবস্থাকে দেখে। কোনো ধর্মীয় উপলক্ষে যেমন সকলে একসঙ্গে কোনো প্রথা পালন করে এবং একটা সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মত বিনিময় করে, তেমনি, এই ধারণা অনুযায়ী, যোগাযোগকে সংজ্ঞায়িত করে এমন কিছু শব্দ : 'অংশগ্রহণ,' 'বিনিময়', 'সৌহার্দ্য', 'সামাজিকতা', ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ যোগাযোগ এখানে কোনো কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে বার্তার প্রেরণা বিতরণ নয়, সকলে মিলে কোনো সাধারণ বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়া। সমকালীন সংযোগতত্ত্বে রিচুয়াল ধারণা যেভাবে প্রয়োগ হয়, তার বীজ অনেকে এমিল ডার্কহাইমের মধ্যে দেখতে পান। ডার্কহাইমের মতে 'society substitutes for the world

revealed to our senses a different world that is a projection of the ideals created by the community'. (*Sociology and Philsophy* ১৯৫৩)। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত আদর্শগুলির প্রক্ষেপ ঘটে এমন কৃত্রিম প্রতীকী ব্যবস্থা দ্বারা, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে শুধু তথ্যপ্রাপ্তি নয়, তথ্যের প্রতি একধরনের পূর্ণবিশ্বাসের ধারণা যোগাযোগ-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার প্রাথমিক শর্ত। এই ধারণা অনুযায়ী যোগাযোগ-ব্যবস্থা কোনো বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে না, বরং চলতি ধ্যানধারণার প্রতি অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণ আস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত নয় দশকের শুরু থেকে আমাদের দেশে আর্থিক সংস্কারের পটভূমিকায় যে 'যোগাযোগ বিপ্লব' শুরু হয়েছে, তা নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদির দূত হিসেবে। বিপণনবাদের যে রাজনীতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার বিশ্লেষণে রিচুয়াল ধারণা বেশ কার্যকর হতে পারে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে যোগাযোগ বিষয়ে এই দুই ধারণার কোনোটিই কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নয়, 'নিয়ন্ত্রণ'কে যেমন বলা যায় প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতিপালনের উপায়, তেমনি রিচুয়াল ধারণার একটা বড় অংশ জুড়ে মতাদর্শের একমুখী প্রবাহকে স্বীকার করা হয়। এছাড়া এটাও মনে রাখা উচিত যে সাত দশক থেকে 'কমিউনিকেশন স্টাডিজ' বলে যে ক্ষেত্রটির প্রথাগত শিক্ষা ইউরোপ-আমেরিকায় উদ্ভব হয়েছে, তা কিন্তু কেবল মতাদর্শগত সমালোচনায় আবদ্ধ থাকেনি, সেখানে কোথাও ধরে নেওয়া হয়নি যে একটি বিশেষ মতাদর্শের আধার বিপরীতধর্মী মতাদর্শের কাছে সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য। আমরা জানি যে, কোনো সামাজিক ব্যবস্থা—তা সে যতই স্থিতিশীল থাকার চেষ্টা করুক না কেন—তার মতাদর্শের প্রচারে পুরোপুরি সফল হতে পারে না। তার নানান ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে চোরাগোপ্তা প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধের তত্ত্বায়ন আধুনিক সংযোগবিদ্যার একটি বিশেষ চরিত্র বলেই, 'রিচুয়াল' আর 'ট্রান্সমিশন'-এর দ্বান্দ্বিকতায় তাকে পুরোপুরি ধরা যাবে না।

জন ডিউই, জর্জ হার্বার্ট মীড়, রবার্ট এজরা পার্ক—এঁদেরকে যোগাযোগ-চর্চায় আমেরিকান প্র্যাগম্যাটিস্ট স্কুলের প্রতিনিধি ধরা হয়। এঁদের অনেকের কাছে যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যা 'আত্মাকে ক্রমাগত নির্মিত / পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় 'অপর'-এর নিরিখে। সংযোগচর্চার 'Interactionist' ধারার গবেষকেরা (যেমন হাওয়ার্ড বেকার) জোর দেন মানুষের অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তির উপর যা কেবল 'ভাষা'র উপর নির্ভরশীল নয়, ভাষার চেয়েও বৃহত্তর একটি সিম্বলিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। আধুনিক সংযোগবিদ্যায় যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হয় তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মার্শাল ম্যাকলুহান, হ্যারল্ড ইনিস্, জ্যাক গুডি প্রমুখ। সংযোগ-প্রযুক্তির ইতিহাস এঁদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল। ম্যাকলুহান কম্পিউটারকে এক দেবশক্তির আধার হিসেবে দেখেছিলেন এবং সার্বিকভাবে সংযোগ-প্রযুক্তি তাঁর কাছে ছিল প্রগতির সূচকবিশেষ। ম্যাকলুহানের পথে পৃথিবীর অনেক সংযোগতাত্ত্বিক এক সময়ে হেঁটেছিলেন। সংযোগ-প্রযুক্তিকে আলাদা করে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে

দেখার প্রথম যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনা করেন টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাকলুহানের সহকর্মী হ্যারল্ড ইনিস্। যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের মধ্যে ইনিস্ দেখিয়েছেন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিষ। টেলিগ্রাফিক ও ইলেকট্রনিক সংযোগব্যবস্থায় সময় ও স্থানের পরিবর্তনশীল সম্পর্ককে (যেমন বার্তার প্রেরণ ও প্রাপ্তির মধ্যে ক্রমহ্রাসমান সময়) ইনিস্ দেখেছিলেন নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবে, *Changing Concepts of Time* (১৯৫২) বইয়ে ইনিস্ মন্তব্য করেছেন : '... Vast monopolies of Communication occupying entrenched position involved a continuous, systematic ruthless destruction of elements of permanance essential for cultural activity. যোগাযোগ ব্যবস্থার (ও সেই অর্থে যে কোনো প্রযুক্তির) পক্ষপাত সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন তিনি এবং একইসঙ্গে স্বীকার করতেন এর বিকেন্দ্রীকরণের অব্যবহৃত সম্ভাবনার কথাও।

বর্তমানে সংযোগকে এমন কোনো সরল প্রক্রিয়া মনে করা হয় না যেখানে প্রেরক বার্তা encode করে এবং গ্রাপক তা decode করে মাত্র। বরং সমকালীন সংযোগবিদ্যা অনেক বেশি জোর দেয় প্রেরণ ও পাপ্তির মধ্যবর্তী স্তরগুলির উপর। যেমন বার্তার চলাচলে 'noise'-এর ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এ হচ্ছে এমন কোনো উপাদান যা উৎসমুখে নির্মিত মতাদর্শকে লঘু করার চেষ্টা করে। যিনি ক্লাসঘরে পড়াচ্ছেন, তাঁর মুখভঙ্গি অথবা লেবুরঙা শার্ট কিংবা ক্লাসের বাইরে ছায়াচক্র মেলে থাকা ঝাউগাছ সবই 'noise' সৃষ্টি করতে পারে 'কমিমে'র মধ্যে। ১৯৪৮-এ ল্যাসওয়েল তাঁর মডেল কমিউনিকেশনের গবেষণাক্ষেত্রকে যেভাবে চিহ্নিত করেছিলেন ('who says what by what means to whom and with what effect'), তা অনেকদিনই পেরিয়ে এসেছে সমকালীন সংযোগচর্চা। কমিউনিকেশন সম্ভব হওয়ার নানান শর্ত তৈরি হয়েছে, যেমন তৈরি হয়েছে এই প্রক্রিয়ায় নানান শ্রেণিবিভাগ। ম্যাকে ১৯৭২ যেমন বলেন : 'প্রেরকের ইচ্ছে না থাকলে তাকে কমিউনিকেশন বলা যাবে না' (একটা পাথর Communicate করতে পারে না, তার কোনো 'intetion' নেই বলে), তেমনি নিলসন্ (১৯৫৭) আবার Situational communication-এর কথা বলেন যা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।

ডান্স ও লারসন *The Functions of Human Communication : A Theoretical Approach* (US : Holt Reinhart & Winston ১৯৭৬)' বইতে কমিউনিকেশনের ১২৬টি সংজ্ঞাকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে প্রতিটি সংজ্ঞাই আলাদা হলেও, একটি বিষয়ে সেগুলি একমত যে কমিউনিকেশন একটি 'প্রক্রিয়া'। আর এই প্রক্রিয়ার একটি সংজ্ঞাও গবেষকদ্বয় শেষকালে দিয়েছেন : 'কোনো ব্যক্তি দ্বারা একটি বিশেষ কোডের সাহায্যে একটি সিম্বলিক কনটেন্টের উৎপাদন এই প্রত্যাশায় একই কোড ব্যবহার করে অন্য কেউ সেটাকে বিশেষভাবে বোঝার চেষ্টা করবে।' এখানে দেখা যাচ্ছে যে যোগাযোগ-প্রক্রিয়ার বার্তার প্রাপকের সেই অর্থে কোনো ভূমিকা নেই, বার্তার উৎপাদনকেই এখানে কমিউনিকেশন বলা হচ্ছে। এরকম হাজার সংজ্ঞা দিয়েও

আসলে কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে যে নির্দিষ্ট করা যায়নি, তার কারণ এটি একটি সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়া। জেমস ওয়াটসন ও অ্যানে হিল যেমন তাঁদের *Dictionary of Communication and Media studies* [England, Edward Arnold, ১৯৮৯]-এ বলেছেন যে '... it is impossible not to Communicate'। Jurgen Ruesch-এর সংজ্ঞাটি (প্রবন্ধ : Values, Communication and Culture বই : *The Social Matrix of Psychiatry*, W. W Norton, ১৯৫১) বোধ হয় অনেকটা এই প্রক্রিয়াটাকে বোঝাতে পারে। ওর মতে কমিউনিকেশন হচ্ছে '... all those processess by which peopole influence one another'—তবে এই peopole কথাটাই বোধহয় আবার গলদ ডেকে আনল। শুধু তো মানুষ নয়, না-মানুষেরাও একে অপরের সঙ্গে ভাববিনিময় করে। বর্তমানে যোগাযোগবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য ধারা পশুপাখিদের ভাষা নিয়ে গবেষণা, যাকে অনেকেই Zoosemiotics বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য মৌমাছি, ডলফিন ও শিম্পানজির ভাষা বোঝার চেষ্টা অনেকাংশই মনুষ্য ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জানার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন অস্ট্রিয়ার কার্ল্ ভন ফ্রিশ (*The Dancing Bees* ১৯৬৫)।

সত্যি কথা বলতে কী 'কমিউনিকেশন স্টাডিজ'-এর নিজস্ব ক্ষেত্রটা যে কী, তা খুব পরিষ্কার নয়। জন কর্নার ও জেরেসি হর্থন সম্পাদিত *Communication Studies : An Introductory Reader* বইটিতে (Edward Arnold, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৩) যেমন বিল নিকলসের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের উপর প্রবন্ধ রয়েছে, রয়েছে ইয়ান আং-এর আমেরিকার জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিক 'ডালাস'-এর বাস্তববাদিতার আলোচনা, তেমনি স্থান পেয়েছে ফ্রয়েডের *Interpretation of Dreams*-এর একাংশ। এই ব্যাপকতার মাঝে সংযোগবিদ্যা যে কয়েকটি বিষয়ের সামাজিক বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এসেছে সেগুলির উল্লেখ করা জরুরি। একটি অবশ্যই 'ভাষা'র এক অর্থে পুনর্সংজ্ঞায়ন। 'ভাষা' বলতে কমিউনিকেশন স্টাডিজের ক্ষেত্রে শুধু লিখিত ভাষা বোঝায় না, বোঝায় মূলত কথ্য ভাষা এবং অবশ্যই শরীরের ভাষা (gestural language)। বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে এই দুই ভাষার প্রয়োগ ও প্রকরণের বিভিন্নতার অনুসন্ধান বর্তমানে নিঃসন্দেহে যোগাযোগবিদ্যার অন্যতম প্রধান ধারা। আর এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য স্বরক্ষেপ, বাচনভঙ্গি, টান ইত্যাদির ভূমিকা নির্ধারণের চেষ্টা, এই প্রসঙ্গে মিখাইল আর্গাইলের *The Psychology and Interpersonal Behaviour* (Hamondsworth Penguin Books, ১৯৭২) এবং গুন্থার ক্রেশ-এর *Learning to write* (Routledge, London, ১৯৮২) উল্লেখযোগ্য। কথ্য ও 'non-verbal'('অকথ্য বললে অবিশ্যি অন্য মানে হয়)—এই দুই ভাষার চিহ্ন ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণ এখানে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ততখানিই বা তারচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে এদের 'Performance'-এর দিকটি, ভাষার প্রয়োগ ক্ষমতাকে এখান দেখা হয় সামাজিক মানচিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থানাঙ্কের একটি সূচক হিসেবে অর্থাৎ শ্রেণী-লিঙ্গ-জাতি-ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নানান প্রশ্নকে জড়িয়ে ফেলতেই হয় এহেন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে।

কমিউনিজম

শুভময় মণ্ডল

কমিউনিজম্—এই শব্দটার উচ্চারণ, হয় উদ্দীপ্ত আবেগ অথবা প্রখর বিরুদ্ধতার জন্ম দেবে। কোনো ঔদাসীন্যের অবকাশ জন্মায় না এতটুকু।

কমিউনিজম্ বলতে নিশ্চয়ই বোঝায় একটি বিশেষ ধরণের সমাজব্যবস্থা অথবা সেই সমাজব্যবস্থা অর্জনের জন্য একটি মতাদর্শ। যে-মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হবে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ওই ধারাবাহিক ও বিরাম ও বিচ্যুতিহীন আন্দোলনই একটি ভূখণ্ডে এবং পরবর্তীতে সমগ্রবিশ্বে কাম্য পরিবর্তন বা বদল এনে দেবে। সমাজবদলের এই প্রক্রিয়ার ফলেই কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা অর্জিত হবে। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার স্তর যেমন দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনবাদী সমাজব্যবস্থা—এগুলির পর সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

কমিউনিজম্ প্রসঙ্গে যে কোনো আলোচনাতেই কিছু শব্দ ও শব্দবন্ধ—যথা শ্রেণী, আন্তর্জাতিক, উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্ক, শ্রম, শ্রমিকশ্রেণি, দ্বন্দ্ব, বস্তুবাদ, প্রগতি, বামপন্থা—এদের একটি বলয় গড়ে উঠবেই। আবার বিপরীত মেরুর শব্দ—যেমন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ, প্রতিক্রিয়া—এসব শব্দগুলিও কমিউনিজম্ প্রসঙ্গের আলোচনায় অনিবার্যভাবে প্রবেশ করবে।

উনিশ শতক-উত্তরকাল থেকে কমিউনিজম্ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা উঠলে এই শব্দটি মার্ক্সবাদ-এর সমার্থক হিসাবেই হাজির হবে। বস্তুত মার্ক্সবাদ ব্যতিরেকে কমিউনিজম্-এর কোনো ধরনের কথা বর্তমান বিশ্বে ভাবাই যায় না।

স্বয়ং কার্ল মার্ক্স তো বটেই, মার্ক্সবাদী ভাবুকেরা মনে করেন সভ্যতার ইতিহাসে সাম্যবাদী ভাবনার দীর্ঘ ঐতিহ্য ও পরম্পরা রয়েছে।

পুরাকালে প্রখ্যাত চিন্তকদের মধ্যে সোক্রাতেস ও তার শিষ্য প্লেতোর ভাবনারাজ্যে কমিউনিজমের আভাস মিলে যায়। সুশাসন ও সুসমাজ-বিষয়ক ভাবনায় প্লেতো এমন কথা তুলেছেন—সমাজের পক্ষে সব থেকে ক্ষতিকারক হল যুদ্ধ ও দারিদ্র্য, এবং এই দুইয়ের কারণই হল শাসকশ্রেণীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া। সেইসঙ্গে চতুর্দশ শতকের ব্রিটিশ লেখক টমাস মোর ও তার *ইউটোপিয়া* (১৫১৬) নামক গ্রন্থও সাম্যবাদী ভাবনার ইতিহাসে অবশ্য উল্লেখ্য দিকচিহ্ন। আমরা আগেই বলেছিলাম কমিউনিজম্

যেমন একটি মতাদর্শের নাম তেমনই সেই মতাদর্শের প্রায়োগিক সক্রিয়তা ব্যতীত তার অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সেই কারণে এই আলোচনার প্রতি পরিমিত পরিসরে যেমন কিছু বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ও সন্দর্ভের কথা আসবে তেমনই কয়েকটি প্রবল ঘটনা ও সামাজিক-আলোড়নের কথাও অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হবে। ষোড়শ শতকের এমনই একটি ঘটনা হল ১৯২৪-২৫ সালের জার্মান কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়ক মুয়েন্জার স্বপ্ন দেখেছিলেন দুনিয়ার বুকেই এমন এক স্বর্গরাজ্যের যেখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, রাজ-দৌরাত্ম্য থাকবে না, থাকবে না ধর্মযাজকদের প্রতিপত্তিও। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আলোড়ন হিসাবে কমিউনিজম্-ভাবনার সব থেকে প্রভাব রেখে গেছে, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব এবং বিশ শতকের রুশ বিপ্লব।

ফরাসি বিপ্লবের পর বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদার্শনিক কমিউনিজম্‌কে মতাদর্শ হিসাবে যেমন আরো স্পষ্ট করে তোলেন তেমন তাকে অনেকখানি প্রায়োগিক সক্রিয়তাও দান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেব্যু, সাঁ সিমোঁ, লুই বাঁ, ব্লাঁকুই এবং রবার্ট আওয়েন। এঁদের মধ্যে চার্টিস্ট আন্দোলনের আওয়েন বাদে সকলেই ফরাসি দেশের। তবে কমিউনিজম্ ভাবনারাজ্যে মার্ক্স-পূর্ববর্তী চিন্তকদের মধ্যে সব থেকে বেশি আলোড়ন যিনি তুলেছিলেন তিনি জার্মান দেশের, ফ্রেডরিখ হেগেল, যে যুক্তিবাদ ও দ্বান্দ্বিক মতবাদ পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় তার উৎস হেগেলীয় দর্শন। সমগ্র মানবেতিহাসকে হেগেল দেখেছিলেন এক ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়ার মধ্যে, যা পূর্ণ অসচেতনতার মধ্য থেকে এক চূড়ান্ত সচেতনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনই ভবিষ্যত সমাজ এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক গুণগত পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে, আরো যুক্তিসম্মত সংগঠনের দিকে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কমিউনিজম্ এবং মার্ক্সবাদ সমার্থক শব্দ হয়ে উঠল। এই লিপির পরিমিত মেনে আর কয়েকটি বাক্য মার্ক্স ও মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গে ব্যয় করা যাবে তাতে নিশ্চয়ই মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর ভাবনাদুনিয়া যা সম্মিলিতভাবেই মার্ক্সবাদ নামে অভিহিত, তার প্রতি অবিচার করা হবে। আবার একই সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে না, এই অর্থে যে, কমিউনিজম্ বা মার্ক্সবাদের পূর্বাভাস প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা বলা হল, তার সবটাই মার্ক্স-এঙ্গেলসের বিপুলয়াতন সন্দর্ভের মধ্যে মিলে যাবে। ১৮৩০-এর দশকে মার্ক্স নিজে পরিচিত ছিলেন 'বামপন্থী হেগেলিয়ান' বলে।

সাম্যবাদী ভাবনায় সব থেকে বড় বাঁকটি নিশ্চত হয়ে গেল ১৮৪৮ সালে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের যৌথ রচনা *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* প্রকাশের সঙ্গে, পূর্ববর্তী ভাবুকদের থেকে মার্ক্স-এঙ্গেলস সরে এলেন একটি লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে। সেই লক্ষ্য হল কী করে সাম্যবাদী সমাজ অর্জন করা যাবে। আর সেখানেই মার্ক্স উপস্থাপন করলেন তাঁর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। ইতিহাসের এক একটি বিশেষ পর্যায়ের উৎপাদন ও উৎপাদন-সম্পর্কের উপর শ্রেণি নির্ভরশীল। শ্রেণিসংগ্রাম সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেবে এবং এই একনায়কতন্ত্রই জন্ম দেবে শ্রেণিহীন সমাজের। শ্রেণিসংগ্রামের মূলশক্তি হিসাবে মার্ক্স নির্ভর করেছেন শ্রমিক শ্রেণির উপর।

ফলে মার্ক্সবাদ বা কমিউনিজম্ ধনবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ হিসাবে হাজির হল। শিল্পসাহিত্য, ইতিহাসভাবনা ইত্যাকার বিষয়ে যেমন মার্ক্সবাদী ঘরানা গড়ে উঠেছে তেমনই মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতিরোধে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে কিছু তত্ত্ব চালু হয়েছে বিশ শতক জুড়ে।

একই সঙ্গে মার্ক্সবাদে অসামান্য ব্যাখ্যাতা ও প্রয়োগকর্তা হিসাবে বিশ শতক জুড়ে সব থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে ঘটল রুশ বিপ্লব, ধনবাদীদের মধ্যে সব থেকে অনগ্রসর দেশে। পরবর্তীকালে দেশে দেশে কমিউনিজমের পথে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটতে পারে তার জন্যে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল লেনিনের ভাবনা। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালগুলির কথাও উল্লেখ্য।

কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক সংগঠন হিসাবে ট্রটস্কি, স্তালিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, ডিমিট্রিভ এবং চীনের মাও জে দং-এর নামও অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বিশ শতকের শেষ দশককে কমিউনিজম্-এর দুঃসময় হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা মনে করেন, মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান, সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সাম্যবাদের প্রবর্তন অনিবার্য।

কমেডি

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'কমেডি' জীবনের অপেক্ষাকৃত লঘুতর, স্বল্পভার, হাস্যোদ্দীপক ও আনন্দময় পরিবেশন। যদিও অ্যারিস্টটল তার *দি পোয়েটিকস*-এ কমেডি নিয়ে খুব কম কথাই খরচ করেছেন, তবুও সেখানে তিনি বলেছেন কমেডির মূলে রয়েছে 'some defect or ugliness that is not painful or destructive'। প্লেটো ও হবসের চিন্তায় কমিক নাট্যকার নিজের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থান ও কমিক চরিত্রের হীনতর, সামঞ্জস্যহীন ও সামাজিক আচরণবিধি থেকে স্খলিত অবস্থানের মধ্যে ফারাক বিবেচনা করে, পরেরজনকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করেন। বের্গসঁ বা ফ্রয়েডের মতেও কমেডির উৎপত্তি কোনও অস্বাভাবিকত্ব বা অসংগতি থেকেই। অ্যারিস্টোফেনিসের (৪২৫-৩৮৮ খ্রিঃ পূঃ) হাতে গোনা কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কমেডিকেই এই শিল্পরূপের প্রাচীনতম উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। যদিও এ ধরনের 'ওল্ড কমেডি'-তে ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, তবুও এই কমেডিগুলোতে একটি স্পষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ও উদ্ভট কল্পনার ছাপ প্রচ্ছন্ন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 'নিউ কমেডি' নামক আরো এক ধরনের কমেডি বিকশিত হয় গ্রিক মিনান্দারের (খ্রিঃ পূঃ ৩৪২-২৯১) হাতে। পরে এই ধারার অনুকরণ করেন প্লটাস (২৫৪-১৮৪) ও টেরেন্স (১৯০-১৫৯) নামক দুই রোমান নাট্যকার। প্রাচীন এই নাটকগুলোকে সমাজ বাস্তবতার প্রত্যক্ষতা লক্ষ করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কমেডি ঐতিহাসিকভাবে ট্র্যাজেডির থেকে অনেক বেশি সমাজ সচেতন এবং এতে বিভিন্ন সামাজিক দুর্নীতি, অধঃপতন, অবক্ষয়কে আক্রমণ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে কমেডির চরিত্ররা মূলত একমাত্রিক বা স্টক্ ক্যারেক্টারস, যাদের সমগ্র নাটকের গতিপথে কোন পরিবর্তন হয় না। কমেডির জন্ম ফার্সের গর্ভে একথা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। কিন্তু ফার্সের মূল লক্ষ্য যেখানে ভাঁড়ামি (buffonery) পেটে খিল ধরানো চটুল মোটাদাগের হাসি (belly-laughs), সেখানে প্রকৃত কমেডির উদ্দেশ্য বুদ্ধিদীপ্ত ও চিন্তা উদ্রেককারী হাস্যরস ('intellectual laughter'... মেরেডিথ)

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের (১৬২২-৭৩) কমেডির অন্যতম সুদক্ষ স্রষ্টা। মলিয়েরের কমেডি (উদাহরণ-*দি মিসানথ্রপ*) উৎকর্ষের যে মানদণ্ড তৈরি করে, তা ছুঁতে না পারলেও একদল ইংরেজ নাট্যকার-কংগ্রেভ, উইচার্লি, ইথারেজ, ভ্যানব্র

'কমেডি অব্ ম্যানারস' নামক এক জাতীয় সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক কমেডি লেখা শুরু করেন। এদের যোগ্য উত্তরাধিকারী গোল্ডস্মিথ, শেরিডান, অস্কার ওয়াইল্ড কমেডিকে পৌঁছে দেন এক নতুন উচ্চতায়। কমেডি হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম, ঝকমকে, চূড়ান্ত বুদ্ধিদীপ্ত. চটজলদি উপস্থিত বুদ্ধিনিষ্ঠ বাদানুবাদ (verbal repatee) সমৃদ্ধ। এ ধরনের কমেডি মূলত উচ্চবিত্ত জীবনের বৈভব, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, যৌনবিকৃতি, অন্তঃসারশূন্যতা, ষড়যন্ত্রকেই আক্রমণের লক্ষ করে। শেক্সপিয়রের সমসাময়িক বেন জনসনের *কমেডি অব্ হিউমারস* প্রাচীন গ্রিক কমেডির আঙ্গিকের সঙ্গে, মধ্যযুগীয় ধারণা 'humours' এর মিশেল ঘটিয়ে আক্রমণ করে মানুষের প্রবৃত্তিগত ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে। জনসনের 'হিউমারস' কমেডিতে ব্লাড, কোলের. ফ্লেম, বাইল প্রভৃতির অসঙ্গতিজনিত কারণে মানুষকে বিভিন্ন চারিত্রিক ত্রুটির শিকার হতে দেখা যায়। এই 'হিউমারস'কে 'হিউমার' বা নির্মল হাস্যরস হিসেবে দেখলে ভুল হবে। পক্ষান্তরে শেক্সপিয়রের কমেডি বা রোমান্টিক কমেডির জগত সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রিত, স্বপ্নালু, কাব্যিক, অপেক্ষাকৃত নির্বিষ, কমিক ও ট্র্যাজিক উপাদানের নিয়ন্ত্রিত মিশ্রণে আবেগপ্রধান। প্রাচীন 'নিউ কমেডি' ধারার আভাসযুক্ত এই কমেডির অন্যান্য অনুশীলনকারীরা হলেন বোমাঁ, ফ্লেচার, মিডলটন, মার্সটিন প্রভৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেডি রিচার্ড স্টিল, হিউ কেলিদের হাতে যথেষ্ট *সেন্টিমেন্টাল* হয়ে উঠতে থাকায়, এর বিরুদ্ধে যে অ্যান্টি-সেন্টিমেন্টাল ধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে তা শীর্ষবিন্দু ছোঁয় বার্নার্ড শ'-এর শেভিয়ান কমেডিতে। শ' তার *plays pleasant* ও *plays unpleasant*-এর মাধ্যমে মেরামত করতে চান প্রথাসিদ্ধ ও ভ্রান্তি-জর্জরিত ধারণাগুলো। সে জন্যই তাঁর কমেডিকে বলা হয় 'কমেডি অব আইডিয়াজ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কমেডিকারেরা নির্ভর করেন 'ডার্ক কমেডি'র ওপরে। এখানে কমেডি ও ট্র্যাজেডির বিভাজন রেখা ক্রমশ অস্পষ্ট। স্যামুয়েল বেকেট, হারল্ড পিনটার, এডওয়ার্ড অ্যালবিদের কমেডি জীবনের অদ্ভুতত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে আশ্রয় নেয় উদ্ভট এক হাস্যরসের। আধুনিক মানুষের লক্ষ্যহীন, নিরালম্ব, বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন তাদের পরিবেশনে কমিক, কিন্তু সেই খোসার নিচে জমে উঠতে থাকে এক অন্তঃহীন বিষাদ, এক অব্যর্থ করুণরস। বেকেট-এর *ওয়েটিং ফর গোডো* এমন এক কিছুর জন্য অপেক্ষাকে দেখায়, যা-এ পৃথিবীতে কখনোই ছিল না। এখানে অপেক্ষা এক উদ্দেশ্যহীন অভ্যাস, সময়কে খুন করে সময় তৈরি করার ছল। অত্যন্ত সচেতনভাবে বেকেট এখানে কমেডিকে ব্যবহার করেন, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এক নির্মম ট্র্যাজেডিকে নির্দেশ করতেই।

কম্পোজিশন

শেখর সমাদ্দার

মঞ্চ যদি হয় একটি ছবির মতো ফ্রেমে বাঁধানো চতুষ্কোণিক ক্ষেত্র, তাহলে নাট্যপরিচালকের কাজ হল সেই মঞ্চছবি (Stage Picture)-টিকে সাজানো। বস্তুতপক্ষে চিত্রকলার ক্ষেত্রে ঠিক কোনসময়ে ফ্রেম এসেছিল তা বলা মুশকিল হলেও নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে ফ্রেম কীভাবে তৈরি হয়ে উঠল, তা জানা কষ্টকর নয় (দ্র. 'প্রসিনিয়ম')। চিত্রকলাতে অনেক আগেই অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়ার জন্য ফ্রেম এসে গিয়েছিল, মঞ্চেও ক্রমশ তা চলে এল। এই ফ্রেম, চিত্রকলা বা মঞ্চনাট্যকলা—উভয়ক্ষেত্রেই সীমাহীন, অপরিমিত ক্ষেত্র-কে যখন নির্দিষ্ট করে দিল, তখন, সেই বাঁধাক্ষেত্রের প্রতিটি অংশ হয়ে উঠল মূল্যবান, তাৎপর্যবাহী। চিত্রকলাতে যেমন দর্শকের গতিশীল দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য রেখা ও রং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলে, তেমনি মঞ্চে দৃশ্যপট, মঞ্চোপকরণ, অভিনেতার শারীরিক অবস্থান, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আলো—সব মিলিয়ে তৈরি হয় মঞ্চছবি। চিত্রকর যেমন-তেমন করে রেখা ও রঙের ব্যবহার করেন না, তার মধ্যে কাজ করে চলে এক সুষম বিন্যাস। মঞ্চচিত্রী, আলোকশিল্পী ও অভিনেতাদের যোগফলে যে মঞ্চছবি তৈরি হয় তাদের মধ্যেও এক সুষম বিন্যাসরচনা করতে হয় পরিচালককে। এই সূত্রেই 'কম্পোজিশন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'বিন্যাস' বা কাঠামো এবং নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে এটিই হল প্রথম কর্তব্যকর্ম।

প্রাথমিক এই ধারণার পর, নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে 'কম্পোজিশন'-এর বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, মঞ্চের এই ছবি নাট্যঘটনার সূত্র ধরে প্রতি মুহূর্তে বদলায়। এমতাবস্থায় অভিনীত চরিত্রগুলিকে একক বা সমবেতভাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করার জন্য নির্দেশককে প্রথমেই এই বিন্যাসের কথা ভাবতে হয়।

নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের মূলভাব অনুযায়ী সেই ভাবকে শিল্পসম্মত করে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করাই হল বিন্যাস (Composition)। অবশ্য শুধু অভিনেতা নয়, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ দৃশ্যপট এবং আলোর প্রক্ষেপণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বিন্যাস সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এইসব মিলেই বিন্যাস। পরিচালক যদিও প্রাথমিকভাবে অভিনেতাদের কথাই ভাববেন তবু তাঁকে এই

বিভাগগুলি সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। মঞ্চের কোনো নির্দিষ্ট অংশে এক বা দুজন অভিনেতা যখন অভিনয় করেন, তখন তার বিন্যাস রচনার সময় পরিচালককে সমগ্র মঞ্চচিত্রটি মাথায় না রাখলেও চলে, কেননা ওই সময়ে দর্শকরা তাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রভূত করেছেন অভিনেতাদের ওপর। কিন্তু যখন সমগ্র মঞ্চ কিংবা মঞ্চের বেশিরভাগ এলাকা ব্যবহার করতে হয়, তখন নির্দেশককে মেনে চলতে হয় গ্রাফিক শিল্পীর নান্দনিত সূত্রগুলি। অর্থাৎ তাঁর সৃজিত মঞ্চছবির মধ্যে এক বা একাধিক স্থানে রচনা করতে হয় ঝোঁক বা বৈশিষ্ট্য (Emphasis)—যার দ্বারা বিন্যাসটি একটি সুচারু চেহারা পায়। আবার একে তার নির্দিষ্ট জায়গায় সুস্থিত রাখতে হয়। এই সুস্থিতি (Stability) হল বিন্যাসের দ্বিতীয় গুণ। দর্শকের মনে অসচেতনভাবে যে শৈল্পিক চাহিদা কাজ করে চলে, তাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য এই বিন্যাসের তৃতীয় আবশ্যিক গুণ হল 'সমতা' (Balance). আবার এই বিন্যস্ত দৃশ্য বা মুহূর্তগুলিকে নাট্যক্রিয়ায় যেমন পরস্পর অন্বয় (Harmony) সূত্রে গ্রথিত হতে পারে, আবার এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে যেতে যেতে সমগ্র নাট্যক্রিয়াটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকা চাই। এই দৃশ্যানুক্রমিক অন্বয় বা ঐক্য এবং বৈচিত্র্য (Variety) হল বিন্যাসের অন্যান্য দিক।

ঝোঁক বা গুরুত্ব আরোপের অনেকরকম প্রকারভেদ আছে। অভিনেতার শারীরিক অবস্থান (Body Position) এবং মঞ্চক্ষেত্র (Space) ব্যবহার করে এই গুরুত্ব আরোপ সম্ভব হয়। শারীরিক অবস্থান চার রকম হতে পারে—পূর্ণ সম্মুখ অবস্থা (Full front view position) অর্থাৎ দর্শকদের দিকে পুরোপুরি মুখ করে যে অবস্থান। সাধারণত এই অবস্থাতেই চরিত্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। অবশ্য এটা নির্ভর করে নাট্যপ্রয়োজনের ওপর। যেমন অনেক চরিত্রকে মঞ্চের সামনে সার বেঁধে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড় করালে প্রমাণ হয় নির্দেশক কাউকে আলাদা গুরুত্ব দিতে চান না। দ্বিতীয় রকম হল তিন-চতুর্থাংশ সম্মুখ অবস্থা (Three quarter view position) মঞ্চে উপস্থিত তৃতীয় কোনো চরিত্রকে গুরুত্ব দেবার জন্য সাধারণত এই রীতি ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় হল পার্শ্ব-ফেরা অবস্থা (Profile)। মঞ্চে চরিত্রের মনোভাব বোঝাবার জন্য এই ভঙ্গি ও অবস্থান কাজে লাগে। চতুর্থ হল সম্পূর্ণ পেছন-ফেরা অবস্থা (Back position)। সচরাচর এই ভঙ্গি রীতিবিরুদ্ধ। আধুনিক মঞ্চে এই কৌশল বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়। মঞ্চে যখন বিভিন্ন উচ্চতা (Height) অথবা 'তল' (Level) ব্যবহার করা হয়, তখন এই অবস্থায় বসে বা দাঁড়িয়েও কোনো অভিনেতা উপরে থাকার দরুণ এই দুর্বল অবস্থান (Weak position) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারেন।

শারীরিক অবস্থানগত এই বিন্যাস মঞ্চক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক বিভাজন ছাড়া সৃষ্টি করা অসম্ভব। মঞ্চক্ষেত্রকে যথাক্রমে উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন তিনঅংশে এবং প্রতি অংশে দক্ষিণ, মধ্য ও বামক্ষেত্র ধরে মোট ন'টি বিভাগে ভাগ করা হয়। মঞ্চের এই সব বিভাগই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ কথা মনে রেখেই নির্দেশক এদের ব্যবহার করেন।

ছবির মতো মঞ্চেও রেখার গুরুত্ব অপরিসীম। কখনো একসঙ্গে একই রেখায় কখনো চতুষ্কৌণিক রেখা কল্পনা করে প্রত্যেক বিন্দুতে চরিত্র সংস্থাপন করে এই রেখার

ছকটি সাজানো হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিগ্রাহ্য রেখার বিন্যাসে দর্শকের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয়। অবশ্য সবকিছুর সময়েই নির্দেশক চরিত্র ও মঞ্চোপকরণ সহযোগে মঞ্চে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলেন। চরিত্র ও সংলাপের অন্তর্গত ভাবগত তাৎপর্য ও সংগতি অনুসারে এই সমতাবিধান করতে হয়। সাধারণত মঞ্চমধ্যরেখা (Stage centre line) থেকে নানাদিকে সমাঞ্জস্য রেখে সমতা তৈরি করা হলে তা দর্শকের দৃষ্টিকে ক্লান্ত করে তোলে। একই তলে সমান সংখ্যাক চরিত্র, তাদের দূরত্ব ও উচ্চতার সমতা অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শকদের আগ্রহ নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে নাট্যগতি শ্লথ হতে বাধ্য। যেহেতু নাট্যোৎকণ্ঠা অনুযায়ী চরিত্রদের মঞ্চ অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়, তাই বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসম সাম্য (Contrast balance) অনেক বেশি কার্যকর। নির্দেশকের কৌশল হল এই অসাম্যের মধ্যে ভারসাম্য রচনা করা। যদি তাকে কখনো যথাযথ রেখা (Actual line) মেনেও দৃষ্টিক্ষেপণের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে তারই মধ্যে রেখাকে বক্রতা দিতে হয় চরিত্রের উপর থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে সরিয়ে। মঞ্চতলের তারতম্যও এই অসমসাম্য রচনায় সহায়ক হতে পারে।

বিন্যাস বা Composition-এর জন্য নির্দেশক মঞ্চচিত্রণের ক্ষেত্রে রেখা (Line), রূপ বা গঠন (Form), ভর (Mass), আয়তন (Value) এবং রং (Colour)-এর ব্যবহারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন—যেন তা চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আসবাবপত্র সাজাতে হয় অসম বা সমসাম্যে। এছাড়া আলো-বিন্যাসের গুরুত্ব অনুযায়ী দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য তরে, দৃশ্যমান মঞ্চগতির মধ্যে আনে ছন্দ—রং ছায়া এবং তীব্রতার সহায়তায় মঞ্চবিন্যাসের সবিশেষ মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলে।

বিন্যাস Composition বা যখন এইভাবে মঞ্চদৃশ্যের ভাবটিকে পরিস্ফুট করে, তখন আসে দৃশ্যায়ন (Picturisation)—যা চরিত্রের চিন্তা ও আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

সংগীতজ্ঞ পর্দার সঙ্গে পর্দা (note) মিলিয়ে রচনা করেন সুর। সেই সুর একটা বিশেষ ধরন (Pattern) রচনা করে চলে। কবিতায় ছন্দ ও চিত্ররূপময় ভাষার বিন্যাসে ভাবপ্রকাশ পায়। ওষুধ প্রস্তুতকারক এক-একটি ওষধির সঙ্গে অন্যটি মিশিয়ে তৈরি করেন ওষুধ। সর্বত্রই বিন্যাস (Composition) আছে। কিন্তু নাট্যের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এর সঙ্গে পূর্বসূরিতাসূত্রে একমাত্র চিত্রকলার বিন্যাসের মিল আছে, যেহেতু দুইক্ষেত্রেই 'ফ্রেম' বা 'প্রসিনিয়ম"—যাই বলি না কেন, একটি নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়।

কলোনিয়ালিজম

রংগন চক্রবর্তী

কোনো একটি রাষ্ট্র যখন নিজের স্বার্থে অন্য কোনো একটি ভূখণ্ডকে দখল করে নেয়, এবং সেই দখল করা ভূখণ্ডের মানুষদের ওপর নিজের শাসন চাপিয়ে দিয়ে তাদের শোষণ করে নিজের লাভ বাড়ায়, তখন এই শাসন ব্যবস্থাটাকেই সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ইতিহাসে এক খুবই পুরোনো অভিজ্ঞতা, নতুন কিছু আদৌ নয়। কলোনিয়ালিজম এই সাম্রাজ্যবাদেরই একটা বিশেষ রূপ। সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই অধিকৃত অঞ্চলে এসে বসবাস করে সেখানকার মানুষজন, সংস্কৃতি, জীবনধারার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং উপনিবেশগুলোর মধ্যে ফারাককে যত্ন করে টিকিয়ে রাখা হয়। আইনের চোখেই হোক বা শাসনের প্রাত্যহিক নিয়মের মধ্যে দিয়েই হোক, উপনিবেশবাদের মূল কথাই হল এই অসাম্য : কেন্দ্রের অধিবাসী, ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের জন্য এক আইন আর উপনিবেশের মানুষদের জন্য অন্য আইন। কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধের পাল্লা উপনিবেশের তুলনায় সব সময়ই ভারি।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল উপনিবেশবাদের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে ইউরোপের কিছু দেশ পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে সেখানকার মানুষদের ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে আনে। বলা যায় গোটা দুনিয়াটা ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি কয়েকটি দেশের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলো যখন এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে তখন তারা সেখানকার মানুষ ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই সমাজগুলো, তাদের সংস্কৃতি, মানুষদের চেহারা, পোষাক, আচার ব্যবহার ছিল পুরোপুরি আলাদা। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা নিজেদের শাসনকে একটা নৈতিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই পার্থক্যগুলোকে ব্যবহার করে। ঔপনিবেশিকদের লেখা বইয়ের পর বই, নৃতত্ত্ববিদ্যা জাতীয় তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চর্চায়, ইতিহাসে, ধর্মযাজকদের বক্তৃতায় বারবার 'প্রমাণ' করা হতে থাকে ইউরোপের সভ্য সমাজগুলোর তুলনায় এই সমাজগুলো কত পিছিয়ে পড়া, কত বর্বর। কেন ইউরোপের দ্বারা শাসিত হওয়াটাই এদের সুসভ্য হওয়ার এক মাত্র পথ। আর এই ভাবে সভ্যতার নামে পৃথিবীর এই বিশাল ভূখণ্ড থেকে লুঠ করে নেওয়া হল সব রকমের সম্পদ।

উপনিবেশবাদ শুরু হওয়ার আগে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশের সম্পদ ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদী লুণ্ঠনের ফলে এই ৫০০ বছরে পৃথিবীর ভারসাম্য অনেকটাই পশ্চিমের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে। ইংল্যান্ডের মতো একটা ছোট দেশ ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে দিয়ে প্রায় রাতারাতি পৃথিবীর ধনীতম দেশগুলোর মধ্যে একটা হয়ে উঠেছিল।

আজকের দিনে বসে দুনিয়াকে বুঝতে হলে উপনিবেশবাদের এই ইতিহাসকে খুব ভালো করে বোঝা দরকার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে অধিকাংশ উপনিবেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলোরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সব বিভিন্ন কারণে ১৯৬০-এর দশকে পৌঁছে আমরা দেখি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো হার মানছে। পৃথিবীর অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে এবং পূর্ণ মর্যাদায় জগতসভায় আসন নিতে সচেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অনেক সমাজতত্ত্ববিদেরাই মনে করেন যে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়ে যাওয়া মানেই এই ঔপনিবেশিক ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং ঠিক উল্টোটাই। উপনিবেশবাদ পৃথিবীর ওপর গভীর ছাপ ফেলেছেন। বিভিন্ন অর্থে, নানা অপরিবর্তিত বা পরিবর্তিত রূপে সে ইতিহাস এখনও এক চলমান শক্তি হিসেবে বর্তমানের গতি প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে চলেছে। তাই তাকে আমাদের বোঝা এবং চেনা দরকার। উপনিবেশবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও বহু বিতর্ক রয়েছে। আমাদের ইতিহাসে উপনিবেশবাদকে আমরা কতদূর নির্ধারক হিসেবে দেখব তাই নিয়ে তর্ক রয়েছে। স্বপ্ন পরিসরে হলেও আমরা সেই বিষয় ও বিতর্কগুলোকে ছুঁয়ে যাব।

আজকে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেটা বিশ্ব স্তরে ক্ষমতার সম্পর্কে সংগঠিত। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যা এই ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে নেই। এই যে গোটা পৃথিবীকে একটা ক্ষমতার সম্পর্কে নিয়ে আসা এটা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত উপনিবেশবাদের জন্যই ঘটেছে। উপনিবেশবাদের সময়ই পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ড ইউরোপের কোনো না কোনো দেশের অধীন হয়ে পড়ার ফলে একটা আন্তর্জাতিক ক্ষমতার কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে, আজকের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামো তারই কিছুটা পরিবর্তিত উত্তরসূরী। অনেকের মতে এই বর্তমান কাঠামোতেও প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রাধান্য খুব ক্ষুণ্ন হয় নি। আজ আমরা যে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা এবং নির্বাচনভিত্তিক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা দেখি তাও প্রথম দেখা দিয়েছিল ইউরোপেই। সেখান থেকেই উপনিবেশবাদের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা উপনিবেশগুলোতে ছড়ায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে এই ধারণাগুলোর পেছনে কাজ করেছিল এক ধরনের মানবতাবাদ, যে মত শাসকদের দৈব ক্ষমতার ওপর মানুষের বোধকে, অধিকারকে স্থান দেওয়ার কথা ভেবেছিল। এই বোধ থেকেই সমস্ত মানুষের জন্য সমান ন্যায়, নাগরিকত্ব ইত্যাদি বোধের জন্ম হয়। ইতিহাসের পরিহাস এটাই যে এই মানবতা আর সাম্য কিন্তু উপনিবেশের মানুষদের তার হিসেবের মধ্যে ধরে নি, তারা মনুষ্যেতর হিসেবেই গণ্য হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও উপনিবেশবাদ আমাদের ইতিহাসকে নতুন ভাবে সংগঠিত করেছে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে এসেছে, কিন্তু উপনিবেশবাদ বিশ্ব-বাণিজ্যকে ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রাধান্যের স্বার্থে নতুন করে সংগঠিত করে। উপনিবেশগুলোর কাঁচামাল ইউরোপের দেশগুলোতে গিয়ে সেখানকার কল কারখানায় বিভিন্ন পণ্যে পরিণত হয় এবং তারপর বিশ্ববাজারে বিক্রি হতে আসে। এই বন্দোবস্ত ছিল অসম। উপনিবেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নিয়ে, সেখানকার শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে, কোটিরও বেশি দাস শ্রমিককে নিয়ে এসে ইউরোপ ও আমেরিকা ফুলে ফেঁপে ওঠে। ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব সফল হয় এই মুনাফায়। বলা বাহুল্য এই ঋণ শোধ করার কোনো প্রয়োজন ইউরোপ বা আমেরিকা কখনোই বোধ করে নি অথচ আজ আবার এই বিশ্বায়নের বাজারে এই ধনী দেশগুলোই ইচ্ছেমত শর্ত অনুযায়ী এই প্রাক্তন উপনিবেশ দেশগুলোকে চড়া সুদে ঋণ দিয়ে নতুন করে টাকা লুটছে।

উপনিবেশবাদ সাংস্কৃতিক দিক থেকেও খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেই বলেছি যে উপনিবেশগুলোতে অন্য ধরনের সমাজ-সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়ে ঔপনিবেশিকরা তাদের অসভ্য, অনাধুনিক বলে চিহ্নিত করল এবং সভ্যতার নামে এই মানুষদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে, দেশ দখল করে, সম্পদ লুটে নিয়ে রাজত্ব করল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর সাফল্য এই যে তারা শুধু গায়ের জোরে এই কাজ করে নি। আন্তোনিও গ্রামসি যাকে 'হেজিমনি' বলে অভিহিত করেন, সেই সম্মতি নির্মাণও করতে পেরেছিল। উপনিবেশেরও বহু মানুষ বলে করেছিল যে এই শাসন তাদের পক্ষে ভালো, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পায়ন, বাজারের বিকাশই সমৃদ্ধির পথ, আধুনিতকার পথ। আজকে যখন এই শিল্পায়নে বিপদগুলো বুঝতে পারছি, যখন মুনাফার লোভে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার, কিছু মানুষের স্বার্থে বহু মানুষকে একেবারে নিংড়ে নেওয়ার ফলগুলো টের পাচ্ছি , তখনও কিন্তু এই শিল্পায়ন, পণ্যের ভোগের মধ্যে দিয়ে জীবনের মান উন্নয়নের হাতছানি আধুনিকতার নামে আমাদের আকর্ষণ করে চলেছে। এই আধুনিকতার ধারণা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াও কিন্তু উপনিবেশবাদেরই কৃতিত্ব।

মার্ক্সবাদ আমাদের শিখিয়েছে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসকে ধনতন্ত্রের উত্থানের ইতিহাস হিসেবে দেখতে। এই দর্শনের গুরুত্ব স্বীকার করেও সমালোচকরা আজকে বলছেন যে কেন্দ্র ও উপনিবেশগুলোর বিকাশের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে দুনিয়ায়-জোড়া ধনতন্ত্রের সর্বজনীন ইতিহাস হিসেবে বোঝা যায় না। উপনিবেশবাদের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বা দেশগুলোর মধ্যেও যে সামাজিক বদলগুলো ঘটেছে, ঘটছে এবং ইতিহাসকে প্রভাবিত করে চলেছে, তার ওপর আরো জোর দিতে হবে, তা না হলে সত্যিকার বোধ তৈরি হবে না।

কল্পবিজ্ঞান

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

ইংরাজি 'সায়েন্স ফিকশনের' বাংলা প্রতিশব্দ সিহেবে 'কল্পবিজ্ঞান' কথাটা এখন চালু হয়ে গেছে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে অদ্রীশ বর্ধনের সম্পাদনায় *আশ্চর্য* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকাতে নিয়মিত ভাবে বিস্ময়মণ্ডিত বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ গল্পগুলির নাম দেয়া হয়েছিল কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এখন সংক্ষিপ্ততর হয়ে কল্পবিজ্ঞান' নামেই পরিচিত হয়েছে। কল্পবিজ্ঞান এখন সাহিত্যেরই একটি ধারা।

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে মেরি শেলির *ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, অর দি মর্ডান প্রমেথিউস* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। যা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' নামেই খ্যাত। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন। এই উপন্যাসটিকেই প্রথম স্যায়েন্স ফিকশনের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। যদিও তখনো 'সায়েন্স ফিকশন' কথাটার জন্ম হয়নি। এই কথাটির প্রথম ব্যবহার করেন সমালোচক ইউলিয়াম উইলসন, ১৮৫১ সালে।

মেরি শেলির পর এলেন জুলভের্ন। ১৮৯৫ সালে এলেন এইচ. জি. ওয়েল্‌স্। কল্পবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হতে থাকল।

১৮৮৬ সালে সুইডেন থেকে প্রকাশিত হল বিশ্বের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা *স্টেলা*। আর ১৯২৬ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত হল প্রথম ইংরাজি কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা *অ্যামেজিং স্টোরিজ*। সম্পাদক ছিলেন হুগো গার্নস্‌ব্যাক। হুগো একটি সংজ্ঞাও দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন সায়েন্স ফিকশন মানে এমন এক বিস্ময়মণ্ডিত কাহিনি যার সঙ্গে মিশ্রিত থাকবে বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব এবং ঐ সব তত্ত্বের প্রয়োগ ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার কাল্পনিক চিত্র, যা শুধু পড়তেই ভাল লাগবে তা নয়, শিক্ষামূলকও হবে।

গার্নস্‌ব্যাকের সংজ্ঞাটি কল্পবিজ্ঞানের উপর একটা গুরুভার চাপিয়ে দেয়। কারণ তার মতানুসারে এই কাহিনিকারকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। কল্পবিজ্ঞানের প্রথম দিকের মহান স্রষ্টা জুলভের্ন এবং এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনাবলির আগাম চিত্র এঁকেছিলেন যা এখন আমরা বুঝতে পারছি।

পরবর্তী যুগের কল্পবিজ্ঞান রচয়িতারা, যথা জন ক্যাম্পবেল, আইজ্যাক অ্যাসিমভ প্রমুখ লেখকরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকাটাকে ঘাড়ে চাপানো জোয়াল মনে করলেন।

ক্যাম্পবেল বললেন—খোদ বিজ্ঞানের সগোত্র এক সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে কল্পবিজ্ঞানকে অভিহিত করা উচিত।

তিনি আরও বলেন—কল্পবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের তত্ত্ব শুধু কাহিনিকেই নিয়ন্ত্রিত করবে না, নতুন, এবং এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ঘটনারও পূর্বাভাস দেবে। আবার অ্যাসিমভ্ বললেন—ভবিষ্যতের ফলাফল শুধুমাত্র যন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, মানবসমাজের নতুন কি চেহারা আনতে পারে, সেটাও কল্পবিজ্ঞানে আসা উচিত। থিওডর স্টার্জিয়ন এই ধারণাটিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে বললেন—কল্পবিজ্ঞান হল সেই কাহিনি, যার মধ্যে থাকে মানুষ, মানবিক সমস্যা ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান।

এসব হল তত্ত্বে কথা। তত্ত্ব মেনে তো সৃষ্টি হয় না। নানা ধরনের কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি লেখা হতে লাগল বিশ্বজুড়ে। আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 'কুন্তলীন কেশ তৈল' আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' গল্পটির জন্য, পরে *অব্যক্ত* গ্রন্থে পরিমার্জিত ঐ গল্পটির নাম হয় 'পলাতক তুফান'। গল্পটিতে আছে কীভাবে এক শিশি কুন্তলীন তেল উত্তাল সমুদ্রগর্ভে ঢেলে দিয়ে সমুদ্রকে শান্ত করা হয়েছিল। তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান বা সারফেসটেনশন তত্ত্বটির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল গল্পটিতে। তবে ঐ গল্পে মাত্র এক শিশি তেলেই সমুদ্র শাসন করিয়ে দিলেন তেলের আশ্চর্য শক্তি বোঝাতে। যে শক্তিশালী তেল সমুদ্রকে শান্ত করে দিতে পারে, টাকে চুল গজানো তো সামান্য কথা। গল্পটির মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে আশ্চর্য ও হাস্যরসও মিশে আছে। তখনো কল্পবিজ্ঞান কথাটির উদ্ভব না হলেও এই গল্পটিকেই প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলে স্বীকার করা হয়। যদিও সিদ্ধার্থ ঘোষ বলেছিলেন ১৮৮২-তে প্রকাশিত *বিজ্ঞান দর্পণ* পত্রিকায় হেমলাল দত্তের 'রহস্য'ই প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প। তবে ঐ গল্পে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেই। তবে আজকাল বাংলার অনেক নামজাদা সাহিত্যিকের লেখা 'কল্পবিজ্ঞানে' বিজ্ঞান থাকে না, কল্পনাই থাকে। কল্পবিজ্ঞান শুধু ফ্যান্টাসিই নয়, আরো কিছু। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে গ্রহান্তর যাত্রার বর্ণনা আছে। আমাদের পুরাণে শূন্যমার্গে ভ্রমণ, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, শব্দভেদী বাণ ইত্যাদির কথা আছে। কিন্তু ঐসব কাহিনি তত্ত্বনির্ভর নয়। গত শতকে গ্রহান্তর সহ পৃথিবীর বহু অজানা প্রান্তে অভিযান নিয়ে কাহিনি লেখা হয়েছে। যা আজও সমাদৃত। যেমন *গ্যালিভার্স ট্রাভেল্স*। কিন্তু গ্যালিভার্স ট্রাভেল কল্পবিজ্ঞান নয়।

ওয়েল্স এবং জুলভের্ন-এর পর পাশ্চাত্যে নানা ধরনের কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি রচিত হয়েছে। জন ক্যাম্পবেলের পর অ্যাসিমভ, ফিলিপ ডিক, থিওডর স্টার্জিয়ান, রে ব্রাডবেরি, আর্থার সি ক্লার্ক, ভিল ব্রাউন, উইলিয়াম সি প্রমুখ লেখকরা এই ধারাটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন।

ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মারঠি ভাষার অল্পবিজ্ঞানের গল্পই সম্ভবত সবচেয়ে সমৃদ্ধ। জগদীশচন্দ্র বসুর সমসাময়িক লেখক এস. বি. রানাডে, নাথ মাধব থেকে আজ অবধি এই শাখা সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। কল্পবিজ্ঞান লিখেছেন জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের

মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের পরে কোনও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী কল্পবিজ্ঞান লিখতে তেমনভাবে এগিয়ে আসেননি।

বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্পগুলির কথা মনে পড়ে। সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলির কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। শঙ্কু সিরিজের প্রথম গল্পটির নাম 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। ১৯৬১ সালে লেখা।। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বর্ধন, অনীশ দেব, সিদ্ধার্থ ঘোষ, সমরজিৎ কর, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের অবদান অনস্বীকার্য।

কার্টুন

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কার্টুন বলতে আমরা বুঝি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র। লণ্ডনের *পাঞ্চ* পত্রিকার ১৮৪৩ সালের ১০৫ নম্বর সংখ্যায় জন রিচ-এর আঁকা একটি হাস্যরসাত্মক ছবিকে সর্বপ্রথম 'কার্টুন' আখ্যা দেওয়া হয়। স্কেচটি ছিল তখনকার বিখ্যাত একটি প্রদর্শনীকে ব্যঙ্গ করে আঁকা। কিন্তু 'কার্টুন' শব্দটি এর আগেও ছিল। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে দেওয়ালের গায়ে ফ্রেস্কো বা ছবি আঁকার আগে শিল্পী কাঠকয়লা, পেনসিল, সাদা বা লাল চকখড়ি দিয়ে ছবিটির একটি প্রাথমিক খসড়া করে নিতেন। কখনও বা কাগজেও এঁকে নিতেন। ওই প্রাথমিক খসড়াটিকে ইতালিয় ভাষায় বলা হত 'কারটোন' (Cartone)। এই 'কারটোন' শব্দটি থেকে উৎপত্তি 'কার্টুন' শব্দের।

তবে আমরা যাকে কার্টুন বলি, বিশ্বের অন্য বেশ কয়েকটি দেশে তাকে বলা হয় 'ক্যারিকেচার'। কেবল ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার কয়েকটি দেশে ব্যঙ্গচিত্রার্থে 'কার্টুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজি শব্দ 'ক্যারিকেচার' বলতে অঙ্গের, বিশেষ করে মুখের বিকৃত হাস্যরসাত্মক ছবি বোঝায়। এই ধরনের ছবিতে কোনো বক্তব্য প্রকাশ করে না। তুলনায় কার্টুনে থাকে গভীর এক ব্যঞ্জনা। পরিস্থিতি, ঘটনা বা সরকারি কোনো বক্তব্যের বিশ্লেষণ যা পাঠককে অবশ্যই ভাবাবে।

ষোড়শ শতকের শেষদিকে কার্টুন শব্দের সংজ্ঞা একটু বদলে যায়। ফ্রেস্কো আঁকার খসড়াকে নয়, যে কোনো খসড়া ড্রইংকেই কার্টুন আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। সে যুগে ইউরোপের কয়েকটি দেশে, বিশেষ করে ইতালির সমাজবহির্ভূত মাতাল, পতিতা বা জুয়াড়িদের ব্যঙ্গ করে কিছু ছবি আঁকা হত। 'ক্যারিকেচার' নামের ওই সব ছবিগুলোতে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের উঁচু মহলের মানুষজনদের কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র আঁকার চল হয়নি। ওই ধরনের ছবি একে বক্তব্য প্রকাশের শিল্পমাধ্যমটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের রসিক মহলেও বেশ জনপ্রিয় হয়। ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হোগার্থ অভিজাত সমাজের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতিকে বিষয় করে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে প্রভূত খ্যাতি পেয়েছিলেন। ক্রমে তিনি রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। জনগণের ভোটাধিকার বা কুচক্রী রাজনীতিবিদদের কুকীর্তি ফাঁস করে ব্যঙ্গচিত্র বা ক্যারিকেচার আঁকা শুরু করেন। চিত্রগুলি আঁকা হত বড় মাপের কাগজে বা বোর্ডে অনেকটা

পোস্টারের মতো করে। কাঠ খোদাই বা তামার পাতে খোদাই অর্থাৎ এচিং পদ্ধতিতে ছবি এঁকে একাধিক প্রিন্ট করেও সেগুলি বিক্রী করা হত। কোন বড় নাচ গানের আসরে প্রিন্টগুলি সাজিয়ে রাখলে দর্শকেরা ছবিগুলি দেখে আনন্দ পেতেন। প্রচারমূলক ব্যঙ্গচিত্রগুলি বাজারের মধ্যে টাঙিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করা হত। ইংল্যাণ্ডের মহিলাদের ভোটাধিকারের উদ্দেশ্যে আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলি বাজারের মধ্যে প্রদর্শনের উল্লেখ সাধারণ ইতিহাস বইতেই পাওয়া গেছে। উইলিয়াম হোগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪), জেমস গিলবে (১৭৫৭-১৮১৮) ওই সময়ের খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্রকর। হোগার্থ বড় কাগজে ছবি আঁকতেন, গিলবে ব্যঙ্গচিত্রের প্রচার বাড়াবার জন্যে নিজেই খোদাই করে ছেপে এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রিন্ট করে বিক্রির ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছিলেন। ইউরোপের রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা তাঁর চিত্রগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পৃথক দেশগুলিকে বোঝাতে তিনিই প্রথম প্রতীকের ব্যবহার শুরু করেন।

মুদ্রণ ব্যবস্থা এবং পরে ছবি ছাপার কৌশল আবিষ্কারের পর এই ধরনের ছবির চল বাড়ে। প্রথমে কাঠখোদাই ব্লকে, পরে হাফটোন পদ্ধতি আবিষ্কারের পরেই পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রের কদর বাড়ে। ইংল্যাণ্ডের *পাঞ্চ* পত্রিকা বিখ্যাত হয়ে ওঠে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে। ১৮৪৩-এ লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে খসড়া চিত্রের, অর্থাৎ আগে যে ধরনের চিত্রকে কার্টুন আখ্যা দেওয়া হত, এক বড় মাপের প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর সংগৃহীত র‍্যাফেলের আঁকা কয়েকটি কার্টুন রাখা ছিল। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ফ্রেস্কোর জন্যে উপযুক্ত কার্টুন বাছাই করা। সেই সময়ের ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পীরা ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই প্রথম চার্লসের সংগৃহীত কার্টুনের অনুকরণ করে ছবি এঁকে জমা দেন। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রানি ছিলেন ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়ার সময়ে প্রথম চার্লসের সমসাময়িক চিত্রের বড় বেশিরকম প্রভাব দেখে *পাঞ্চ* পত্রিকায় বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রকর জন লিচ একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে দেখান রানি ভিক্টোরিয়া যেন প্রথম চার্লসের ছাঁচে ঢালা প্রতিরূপ। চিত্রটির নাম দেওয়া হয় 'কার্টুন', সেই থেকেই হাস্যরসাত্মক যাবতীয় ব্যঙ্গচিত্রের নাম হয়ে যায় কার্টুন। এর আগে *পাঞ্চ* পত্রিকাতেই ওই ধরনের ছবিকে বলা হত 'পেনসিলিং'। তবে *পাঞ্চ* পত্রিকাকে পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয় করার মূলে ছিলেন জন টেনিয়েল। যিনি *অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড*-র অলঙ্করণের জন্যে বিশ্বখ্যাত। ১৮৫০-এ তিনি *পাঞ্চ* পত্রিকায় যোগ দেন এবং কার্টুন এঁকেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হন। তবে তাঁর কার্টুনের বিশেষত্ব ছিল, কার্টুন এঁকে তিনি কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না। জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্মল হাস্যরস জোগানই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। দেশের গৌরব তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবে দেশের রাজনীতি নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন ডেভিড লো এবং ভিকি-র মত কার্টুনিস্টরা।

ভারতে কার্টুন আসে ইংরেজদের হাত ধরে। ১৮৫০-এ 'দিল্লি গেজেট' প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *দিল্লি স্কেচ বুক* নামে একটি মাসিক পত্রিকা। শিল্প-সমালোচক ও গবেষক

কমল সরকারের মতে এটিই ভারতের সর্বপ্রথম কার্টুন পত্রিকা। জন ও'ব্রায়েন সন্ডার্স নামে এক নীলকরের উদ্যোগে পত্রিকাটির প্রকাশ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিবিদদের ব্যঙ্গ করাই ছিল পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। প্রায় বছর সাতেক প্রকাশের পর সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'দিল্লি গেজেট'-এর অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিদ্রোহীরা। *দিল্লি স্কেচ বুক*-এর তখনই সমাপ্তি। ১৮৫৯-তে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয় আর একটি কার্টুন-পত্রিকা, *ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ*। এই সময়ের পরই পত্রিকার পাতা থেকে কার্টুন উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়। আধুনিক ব্যঙ্গচিত্র বিশেষ করে ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাসে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরাই প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রে কার্টুন প্রকাশ করে। আঠারো শতকের শেষদিকে কালীঘাটের পটুয়ারা ঠাকুর-দেবতা আঁকার পাশাপাশি সমসাময়িক ঘটনা, বাংলা প্রবাদ প্রভৃতিকে বিষয় করে নানা ধরনের ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুনধর্মী ছবি এঁকেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্যঙ্গচিত্রকর হিসেবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ। এক বা একাধিক রঙে আঁকা তাঁর কার্টুনগুলি সমসময়ের বঙ্গসমাজের দর্পণ বিশেষ। শুধু বাংলার নয়, ভারতের কার্টুন চিত্রের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ। ১৮৭৩-এ মুম্বাই থেকে প্রকাশিত গুজরাটি ভাষায় *পার্শি পাঞ্চ*, ১৮৭৪-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বসন্তক*, ১৮৭৭-এ উর্দু ভাষায় *অওধ পাঞ্চ* ভারতে আদি যুগের কার্টুন পত্রিকা। বাংলায় পরবর্তীকালে *পঞ্চানন্দ, বিভার, বঙ্গবাসী, সচিত্র ভারত* প্রভৃতি পত্রিকা কার্টুন প্রকাশ করে বাংলায় কার্টুনের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলে। যতীন্দ্রনাথ সেন, রেবতীভূষণ, কুট্টি, চণ্ডী লাহিড়ী, দেবাশিস দেব, অমল চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কার্টুন এঁকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সর্বভারতীয় পত্রিকার ক্ষেত্রে কার্টুন এঁকে খ্যাতি পেয়েছেন শঙ্কর, আবু আব্রাহাম, আর কে লক্ষ্মণ প্রমুখ শিল্পীরা।

কালচার

শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে

কালচার (Culture) শব্দের মূলে আছে লাতিন Cultura ('কুলতুরা') শব্দ যা লাতিনের 'col'—কোল্ ধাতু থেকে হয়েছে, যার অর্থ 'কৃষ্', চাষ করা; আবার 'পূজা করা' বা 'যত্ন করাও' হয়। ইংরাজি Chambers অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে 'cultivation', অথবা 'the state of being cultivated'। এরই সঙ্গে আরো স্পষ্ট ইঙ্গিতে 'refinement' কথাটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'cultivate' ইংরাজি শব্দটির অভিধানিক অর্থেও 'to civilise or refine' বোঝানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ সখেদে বলেছিলেন ইংরাজি ভাষায় চাষ এবং সভ্যতা একই শব্দে চলে গেছে। সেদেশে সুশিক্ষিত ও সুশীল মানুষ বোঝাতে 'কাল্চারড্' বা 'কাল্টিভেটেড' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বহু লেখালেখি করেছিলেন বিভিন্ন নিবন্ধে, অথবা ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠিতে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর লেখালেখিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি 'culture'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'কৃষ্টি' কথাটির ব্যবহার নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর কাছে এর সঠিক প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' ছিল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তার আগে ১৯২০-এর শুরুর দিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'কৃষ্টি' শব্দটিকে বাংলা ভাষায় প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁর মত ছিল শুধু ভূমির কর্ষণ নয়, চিত্তভূমিরও কর্ষণ হতে পারে। রামপ্রসাদ তার সাক্ষী। একমাত্র 'কৃষ্টি' শব্দটিই অর্থে অবিকল 'culture'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'কৃষ্টি' শব্দটি ইংরাজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। বিকল্প হিসাবে, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় উৎকর্ষ, প্রকর্ষ প্রভৃতি শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাবটি ব্যবহারে কেটে গেছে, সেইজন্যে চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটিকে 'কালচার' অর্থে ব্যবহারের দোষ কি? ভাদ্র, ১৩৪২-এর *প্রবাসী*-তে 'কালচার' নিবন্ধে তিনি লিখলেন—'মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্চার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। ...সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি, cultured mind, cultured intelligence-অর্থে কৃষ্ট-চিত্ত, কৃষ্ট-বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ cultured তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান বললে তার প্রতি সম্মান করা হবে।'

'কালচার' কথাটিকে বিশ শতকে চিত্ত-উৎকর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মনোভাবটি কীভাবে এল, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রিসে আর ভারতে একই ধরনের মনোভাব ছিল—নাগরিকই সভ্য, আর গ্রাম্যই অসভ্য, সংস্কৃতে 'সভ্য' শব্দের মূল অর্থ যা পাঁচজন ভদ্রজনের সম্মিলিত স্থানে উপবেশনের উপযুক্ত। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষাতেও সভ্য শব্দ কোনো গোষ্ঠীর বা দলের মানুষ বোঝাতে ব্যবহৃত হত—ইংরাজিতে যেমন sibling (অর্থাৎ আত্মীয়), কিংবা জর্মানে sippe (অর্থাৎ জ্ঞাতিগোষ্ঠী)। প্রথমে 'গোষ্ঠী', তারপর 'জনসমাগম' সম্পর্কিত, তারও পরে ভদ্রতা, ভব্যতা, যা—'refinement'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। ইউরোপীয় শ্বেতকায়ের শ্রেষ্ঠত্ববোধের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে ক্রমে 'civilized' ও 'uncivilized' অর্থে সভ্য ও অসভ্য শব্দগুলি প্রযোজ্য হতে শুরু করল। 'সভ্যতা'কে সূক্ষ্মতরভাবে দেখার আবশ্যকতা থেকেই জন্ম নিল আরো আরো নতুন শব্দ—যেমন কালচার। পার্থিব বা materialistic civilization-এর সঙ্গে জাতির জীবনে আরো জড়িয়ে থাকে অতিরিক্ত কিছু, যা তার ভিতরের ব্যাপার, তার মানসিক প্রবৃত্তি, তার নৈতিক আদর্শ, তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি। সুনীতিকুমারের লেখায়—একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তা-ই হচ্ছে culture।

সাধারণ বা সামান্যার্থ ছেড়ে নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের পরিভাষাতেও কালচার শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়—যেমন Primitive Culture, Tribal culture, Urban culture প্রভৃতি। প্রাগ্ ইতিহাস যুগের মানবেতিহাসের এক একটা পর্বকে চিহ্নিত করা হয় সে যুগের নিজস্ব সংস্কৃতি দিয়ে। আলোচ্য গোষ্ঠীর বা সমাজের বাস্তব উপাদান উপকরণ, জীবনযাপনের কৃৎকৌশল সেই সেই যুগের সংস্কৃতি-নির্দেশক। কালচার শব্দটির প্রায়োগিক বিভিন্নতা (যেমন এগ্রিকালচার, সেরিকালচার, পিসিকালচার, এমনকি ব্লাড-কালচার) বস্তুতপক্ষে ধারণাটিকে খানিকটা ঢিলেঢালা ইমেজ দান করেছে। সংজ্ঞাটিকে খানিকটা টানটান করার জন্যে টি. এস. এলিয়ট ১৯৪৮ সালে একটা বই-ই লিখে ফেলেন *Notes Towards the Definition of Culture*।

শেষে মার্ক্সীয় দর্শনে কালচারের স্থান কোথায় দেখা যাক। সেখানে সামাজিক বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে ধরা হয় উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও উপকরণকেন্দ্রিক সম্পর্কই দুনিয়ায় অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ককে (রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিক ইত্যাদি) নির্ধারণ করে। সোজা কথায় সমাজের দুটি মূল অংশ—ভিত ও উপরিকাঠামো। ভিত বলতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, যেমন কৃষিব্যবস্থা, জমি ও শিল্পের মালিকানা ও তার চরিত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের উপরিকাঠামো। উপরিকাঠামো অর্থাৎ রাজনীতি, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জীবন, মানুষের চিন্তাভাবনা এবং সব মিলিয়ে সংস্কৃতিবোধ। এই দুটি অংশের মধ্যে সাধারণভাবে ভিতই উপরিকাঠামোর সংস্কৃতিকে

নির্ধারণ করে দেয়। ভিত বুর্জোয়া চরিত্রের তো সংস্কৃতি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের কবলে; পুঁজিবাদী সমাজের ভিত ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব উপরিকাঠামো ভোগসর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিতর যেহেতু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অতএব উপরিকাঠামোতে জনসাধারণের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজের সংস্কৃতি বা কালচার হওয়া চাই। এই 'উচিত' কাজটিকে সফল করার তাগিদে ১৯৬৫-র নভেম্বর চিনে শুরু হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার বর্শামুখ তাক করা ছিল পুরানো 'মৃত' সমাজের চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে আর অন্যতম শ্লোগান ছিল 'আমরা শুধু প্রাচীনকে ধ্বংস করি না, নতুনকে সৃষ্টিও করি।'

অতএব কালচার বলতে শেষমেষ যা বলা যায়, তা হল কোনো একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী বা সমাজের সমস্তরকম আচরণ ও তৎসঞ্জাত ক্রিয়াগুলি, যা তারা বিবিধ ইঙ্গিতবাহী উদ্ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে—যেমন সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, বিশ্বায়ন, প্রতিষ্ঠান, সংরক্ষিত শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি; যা কেবল সেই গোষ্ঠীটিরই নিজস্ব নির্মাণ, প্রতীকী চিহ্ন; আর যা প্রজন্ম পরম্পরায় মননচর্চার মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

কাল দর্শন

নূপুর দাশগুপ্ত

সময় বা কালের ধারণা আদি যুগ থেকেই দুটি সাধারণ অর্থে উপলব্ধ : এক, পৃথিবীর আবর্তনে দিবা ও রাত্রির বিভেদ আলো ও আঁধারে সময়ের বিভাজনকে প্রাঞ্জল করে। তারই সঙ্গে ধীরে ধীরে চন্দ্রের আবর্তনে মাস ও ক্রমে ঋতুর পরিবর্তনগুলি অনুভূত হয়। দুই, সময় বা কালের দার্শনিক সন্দর্শন। মানবজীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও আদিসৃষ্টির ধারণার সঙ্গে এই দর্শন জড়িত। প্রথম ধারাটি প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ এবং নিত্য কৃষিকর্ম ও জীবনের বৃত্তে দিবারাত্রি ও ঋতুর বিভিন্নতার জ্ঞান ও উপযোগিতার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। তাই, কালের নিত্যনৈমিত্তিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি জীবনে নিয়ম ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি করে। প্রাচীন ভারতের রচনায় কালের নিয়ামক রূপটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার আভাস গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। এই রচনাতে ঋতুর আবর্তন, দিবা ও রাত্রির ক্রমাবর্তন, চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থান সম্পর্কে কৌতূহল দার্শনিক স্তরে উপনীত।

অঘমর্ষণ রচিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৯০তম সূত্রটিতে সময়ের সংজ্ঞা পরিণত হয়েছে 'সম্বৎসরে'র ধারণায়। 'সম্বৎসর'কে সৃষ্টির মূল উৎসরূপে দেখা হয়েছে। পরবর্তীকালে পরিণত 'কালবাদ' তত্ত্বের সূচনার রূপ এটি। ঋগ্বেদে ঋতুগুলিরও ব্যক্তিকরণ হয়েছে। জীবনের ধারা ও সময়ের ধারার অভিন্নতা ব্যক্ত করা হয়েছে বহু সূত্রে। দিবা ও রাত্রির নব নব উন্মেষ, জীবনের পুনরাবৃত্তি ও সময়ের আবর্তনে তত্ত্বটির সূত্রপাত হয়।

এর পরে এই চিন্তা আরো সূক্ষ্মরূপ ধারণ করেছে। সময় ও সূর্যকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে অথর্ব বেদে। কালের সপ্তচক্রের ধারণা জন্মগ্রহণ করেছে এবং বৎসর, সংক্রান্তি, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা / যামিনী ও প্রহরে কালের সাধারণ বিভাজন ঘটেছে। নিয়ামক রূপে কালের আত্মপ্রকাশের ফলে কালের রূপ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলেও ব্যক্ত। 'কাল'-ই প্রাণী জগতের সৃষ্টিকর্তা ও সংহারক। কাল আদি পিতা, আদিত্যের জনক ও ব্রহ্ম। কাল অনন্ত ও সমস্ত বস্তুর উৎসস্থল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কালের নিরন্তর উপলব্ধি এক দার্শনিক, এমনকী আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত। ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদের দার্শনিক ভাবধারার পরবর্তী সূত্র ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে প্রাপ্ত। এই সময় থেকে 'কাল' সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। সময়ের এই সংজ্ঞা একইভাবে জন্মবৃত্তান্তের 'রহস্যের' সঙ্গেও জড়িত ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বাস্তব জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক সময়-

কাল বিভাজনের ধারাটি সুচারুরূপে লক্ষিত হয়। বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ ও কৃষকগণ বৎসরে তিন বার কর্মে নিযুক্ত হন, যথা—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে। শতপথ ব্রাহ্মণে সময় ও জীবনের ধারার অভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট। জীবজগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কল্পিত প্রজাপতি ও সম্বৎসর এই দুই স্বরূপ এক এবং অভিন্নভাবে দেখা হয়েছে। গর্ভস্থ মনুষ্য-সন্তান ও গবাদি বৎস প্রভৃতি এক বৎসর কালে জন্ম নেয়; শিশুর মুখে এক বৎসর কালের মধ্যে ভাষা ফোটে। মনে করা হয়েছে 'হিরণ্যগর্ভ' এক বৎসর কাল ধরে মহাশূন্যে বিচ্ছুরিত করেন তাঁর প্রভা। এই 'হিরণ্যগর্ভ' যা অপরদিকে আদিত্যের রূপকল্প, সমস্ত সৃষ্টির উৎস। সুতরাং এই সম্বৎসর কাল ও হিরণ্যগর্ভ দুই-ই সৃষ্টির জনকরূপে কল্পিত।

এই ধারণাগুলি সূর্য, পৃথিবী ও সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অক্ষয়, অব্যর্থ, নিয়ামক রূপে দৃষ্ট হল যাকে বৈদিক সাহিত্যে 'ঋত' বলে কল্পনা করা হয়েছে। 'কালবাদে' তত্ত্বের সূচনায় এই বৈজ্ঞানিক দিকটিও উপস্থিত ছিল যা প্রাকৃতিক নিয়মরূপে ব্যক্ত হয়েছে। বেদের ধারা ধরে এই তত্ত্বের বিবর্তন ঘটে। বৈদিক পরবর্তী যুগে কোনো কোনো দার্শনিকের চিন্তায় কাল দর্শনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে নব নব তত্ত্ব। যথা, বাধ্ব ও যাজ্ঞবল্ক্য, দুজনই বৎসর ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। মহীদাস আরণ্যকের ভাবনায় মনুষ্য জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা রয়েছে—যা কালের ধাবমান গতির অগ্রসরের ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। ব্রহ্মণস্পতি ও প্রজাপতি পরমেষ্ঠিনের আলোচনায় কালচক্রের পুনরাবৃত্তির কথা—সৃষ্টি প্রলয় এবং দৃশ্যমান অনন্তের ধারণা উপস্থাপিত।

পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই সাধারণভাবে কালের তত্ত্বটি একটি বিজ্ঞান-বিষয়ে পরিণত, যাকে 'নিধি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কৌটিল্যীয় *অর্থশাস্ত্র* ও *মনুস্মৃতি*, *মহাভারত*, *বৃহৎ সংহিতা*, *কামসূত্র* ইত্যাদি নানা রচনায় নিধি এক বিশেষ রূপে আলোচিত। স্বাভাবিক সময়কে বৎসর, অর্ধবৎসর, সংক্রান্তি, মাস, পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। সময়ের প্রকৃত ব্যবহার ও তার উপযোগিতা সম্বন্ধেও কিছু ধারণা রয়েছে। জীব-বিজ্ঞানের সাথে কালের নিয়ামক ধারার নিবিড় সম্পর্কটিও পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই পরিলক্ষিত। কিছু পরবর্তীকালের রচনা *চরক-সংহিতায়* এই আলোচনা বর্তমান। বলা হয়েছে, কাল মনুষ্য-জগতের উৎপত্তিস্থল এবং ব্যাধিরও উৎপত্তিস্থল। কাল সমস্ত বস্তুর কারক ও সংহারক, চিকিৎসা বিদ্যার মূল সূত্রে কালের আবর্তন ও গতি চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে যে নিবিড়ভাবে যুক্ত, একথাও ভাবা হয়েছে। ঠিক খাদ্য, ঠিক পথ্য ও ঠিক সময় এই তিনের গুরুত্বও আলোচিত। আবার দিন ও রাত্রির ব্যবধান, ঋতু উপযোগী খাদ্য ও অন্যান্য অভ্যাসের কথাও বলা হয়েছে। এমনকী বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে আবির্ভূত বিভিন্ন ব্যাধির কথাও বলা হয়েছে।

'কালবাদ'-এর তাত্ত্বিক বিবর্তনে মহাকাব্য রচয়িতাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মহাভারতে 'কালবাদ'-এর এক বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই রচনার উপস্থাপিত কালের বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন বিভাজন, যথা—'দিষ্ট', 'দৈব', 'হঠ', 'ভব্য-

ভবিতব্য', 'বিহিত' ও 'ভাগধেয়' এই ছয় ধরনের সময় মনুষ্যজীবনের নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুক্ত। 'দিষ্ট' সেই সময় বা সময়ের ব্যবহার যা মানুষের বা ব্যক্তির 'ইচ্ছাপ্রণোদিত' স্বাভাবিক সময় এটি। মহাভারতে বলা হয়েছে 'যদ অন্যদ দিষ্ট ভবস্য পুরুষস্য স্বয়ম্ কৃতম্।' 'দৈব' ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত বা প্রাকৃতিক সময়, যা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, খরা, জরা ইত্যাদি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে। 'হঠ'—হঠাৎ, চকিতে উৎপাদিত ঘটনা বা সময়ের সেই ধারা যা পূর্ব পরিকল্পিত ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন। 'ভব্য-ভবিতব্য' অর্থাৎ যা নিয়তি বা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত। 'বিহিত' অর্থাৎ যা নিয়মিত, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে সময়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার; যথা—নিদ্রা বা জাগরণ, কর্ম বা বিশ্রামের সময়। 'ভাগধেয়' অর্থাৎ ভাগ্য পরিচালিত সুখ বা দুঃখের সময়। সময়ের অবস্থাজনিত এই বিভাজন যেমন একদিকে সৃষ্টি হল, তেমনই কালের বৃহত্তর বিভাজনও ঘটে চতুর্যুগ—যথা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপে। এরও পরে মন্বন্তর, কল্প ও মহাকল্পের ধারণাও জন্ম নেয়।

কালের তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে। বুদ্ধের 'কর্মবাদে' কালের বৃত্তাকার চক্র ও পুনঃ পুনঃ জীবনধারণের তত্ত্বটি বার বার আলোচিত। ক্রমে এই তত্ত্বে অবতারের কল্পনা এসেছে। তবে কালের সর্বব্যাপ্ত রূপটির বিরুদ্ধে বুদ্ধের নির্বাণ-তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। বৈদিক পরবর্তী যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য রচনায় কালের সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপ্ত রূপ কল্পিত। বলা হয়েছে কাল সর্ববস্তু এমনকী স্বয়ং কালকেও গ্রাস করে। অর্থাৎ তার সংহারক রূপটি এভাবে দেখানো হয়েছে। নির্বাণ তত্ত্বে বুদ্ধ কালের এই নিরন্তর জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত চক্রের আবর্তন থেকে মুক্ত হওয়ার সূত্র দিয়েছেন। জৈনধর্মেও অন্যরূপ মোক্ষ লাভের কথা বলা হয়েছে। এই নির্বাণ বা মোক্ষলাভ কালের বৃত্তাকার গতির যে বর্ণনা আমরা পূর্বের সমস্ত রচনায় পেয়েছি তা থেকে ভিন্ন একদিকে গেছে। নির্বাণের তত্ত্ব কালের একমুখে ধাবমান রূপটির দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং বৌদ্ধ কর্মবাদে যেমন বৃত্তাকার কালের গতির কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত তেমনই সময়ের একমুখী রেখায় অগ্রসরের ধারণাও বর্তমান। হয়তো চার্বাক দর্শনের মরণেষু আত্মার ধারণা এবং মৃত্যুপরবর্তী অস্তিত্ব সম্বন্ধে নেতিবাচক ভাবনা বৌদ্ধ দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। যদিও বৌদ্ধ ধর্মে আত্মার অমরত্বের কথাই বলা হয়েছে।

তবুও প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তনের পুনঃ পুনঃ বাস্তব উদাহরণ ও ঋতুচক্রের চক্রাকার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে উপলব্ধ সময়ের ধারণার ফলে সাধারণভাবে কাল সম্বন্ধে এক আবর্তন চক্রের দর্শন-ই বেশি গৃহীত ও সহজবোধ্য। পরবর্তী রচনাগুলি, যথা *যোগবাশিষ্ট রামায়ণ*, শুক্রনীতি, অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ কাব্য*, *মৈত্রী উপনিষদ*, *জৈন দ্রব্য সংগ্রহ* ইত্যাদিতে কালের রূপটিরই আলোচনা রয়েছে।

কাস্ট্

সুমন ভট্টাচার্য

কাস্ট্ (Caste) শব্দটি জাতি এবং বর্ণ, এই দুটি সামাজিক পরিচয়েরই সূচক। আর এই দুটি পরিচয়ই পরস্পর সংবদ্ধ হওয়ায় কাস্ট্-এর সমাজবিজ্ঞান-সম্মত পরিভাষা জাতি-বর্ণ।

যে কোনো রাষ্ট্রের, যে কোনো সমাজেই কর্তৃত্ব-দক্ষতা-আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ও অক্ষমতার সাপেক্ষে সামাজিক স্তর-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, তার সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বা গঠনবৃত্তটিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টিই প্রাথমিক শর্ত—ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যে-ভাবে 'বর্ণ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। এক বিশেষ দেহবর্ণের মানবগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার্থেই যে সামাজিক বিধি তথা নিষেধমূল সামাজিক মেলামেশার একটি বলয় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তারই ফল—বর্ণাশ্রম। মেধামান ও আর্থিক-সামর্থ্যের তুল্যমূল্য সম্পর্ক ও সমীকরণ বা আপাত-অসমীকরণ এই স্তরবিন্যাসের অন্যতম নির্ভরতা হয়ে উঠেছে সভ্যতার ক্রম-অগ্রগতিতে। কিন্তু ভারতবর্ষের পটভূমিতে জাতিবর্ণ পরিচয় সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতার অন্যতম খুঁটি হয়ে আছে জন্মলব্ধ পরিচয়ের জমিতে।

জন্মসূত্র থেকেই জাত বা জাতি শব্দটির প্রতিষ্ঠা। বৈদিক সাহিত্যে সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচয়ে আর্যজাতি ও দাসজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্য অর্থাৎ নিত্যগমনশীল একটি যাযাবর গোষ্ঠী, যখন অপর কোনো গোষ্ঠীকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় স্বপ্রতিষ্ঠ, তখনই বিজিত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের প্রভেদ চেনাতে প্রযুক্ত হল জাতি শব্দ, যা পশ্চিমি প্রেক্ষিতে race-শব্দার্থবহ। আর এই পর্যায়েই Ethnic identity-র বাহকতার সূত্রে গুরুত্ব পেল 'বর্ণ'-পরিচয়।

ভারতবর্ষে আগত পোর্তুগিজ গোষ্ঠীই প্রথম এই সমাজরূপকে Caste নামে চিহ্নিত করে। লাতিন Castus শব্দের অর্থ pure বা শুদ্ধ। কাস্ট-এর সংজ্ঞার সন্ধানেও এই শুদ্ধির প্রবণতাকে বোঝা যায়। কারণ কাস্ট্ শব্দে নির্দেশিত হয় একটি বংশানুক্রমিক ক্রিয়া বা জীবিকায় সংযুক্ত গোষ্ঠী যাঁরা বৈবাহিক সূত্রে অন্তর্বদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রথা ও আচারকে বিনা-প্রশ্নে অনুসরণে অভ্যস্ত।

সামাজিক কর্তৃত্ব-ক্ষমতা-বংশগরিমা-ক্রিয়াবিভাজনের একটি গঠনগম্যতার আকার বিন্যাসিত হলেও, কাস্ট্ বা জাতিবর্ণের অনুশাসন ভারতবর্ষের সমাজেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র : এই চারটি শ্রেণির চিহ্নিতকরণ, একই সঙ্গে মানবের

চারিত্রিক প্রবণতার একটি বর্গীকরণ। বলা যায়, সমগ্র 'বিশ্বমানব' বা মানব-বিশ্ব-ই এই চারটি পরিচয়ে চিহ্নিত। সুতরাং এই বিভাজন পদ্ধতিসম্মত। কিন্তু এই জাতিবর্ণ-বন্দোবস্ত যে কারণে ভারতবর্ষের সমাজকে সেই 'আদিযুগ সনাতন' থেকে বিকৃত ও বিঘ্নিত করে চলেছে, তা হল এই পরিচয়ের বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠার ধারণা। যে কারণে বর্তমান সমাজে 'বর্ণ' তার 'মৌলবাদী' অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে পারিবারিক পরিচয়ের পরিশিষ্ট হয়ে টিকে আছে। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই বর্ণক্রমই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে বাহিত হয়েছে আচরণ ও Consumerism-এর অনুপুঙ্খে, ব্যক্তিগত যাপনের বৃত্তান্ত। ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, ক্ষত্রিয় লোহিত, শূদ্র কৃষ্ণ। মধ্যবর্তী বৈশ্য শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পীত বা পিঙ্গলবর্ণ। দেহবর্ণের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য-অনুষঙ্গে ব্রাহ্মণের বস্ত্র শ্বেত, আহার্য-ও শ্বেতবর্ণ প্রধান যে কারণে এখনও শ্বেতবর্ণকে পবিত্রতার অনুষঙ্গে গণ্য করা হয়।

একইভাবে ক্ষত্রিয়—যুদ্ধজীবী হওয়ায় রজঃ বা রক্তবর্ণ তার প্রতীক। আর ভারতবর্ষের যথার্থ অধিবাসী সেই তাম্রবর্ণ ক্ষীতনাস মানবগোষ্ঠী বিজিত জাতি গোষ্ঠীরূপে ঘৃণিত হলেন তমঃ বা কৃষ্ণবর্ণের দেহচিহ্ন থেকে যাপনবৃত্তে। আর এই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণকে রক্ষা করতেই দৃঢ় নিষেধাজ্ঞায় স্থাপিত হল আন্তঃবিবাহ সম্পর্ক তথা মিশ্রণ। যদিও তা শেষত রক্ষিত হয়নি। আর এই বর্ণসংকর-এর নিষেধাজ্ঞারই প্রতিবাদ *মহাভারত* নামক মহাকাব্য।

ভারতবর্ষের যাবতীয় সাহিত্যকর্মে সামাজিক যাপনবৃত্তে এই বর্ণপ্রথা তথা জাতিপ্রথা তথা জাতিবর্ণ-সংস্কার অথবা জাতিবর্ণ-পরিচয়ের বংশানুক্রমিকতার সংস্কার প্রায় স্থায়ী এক সামাজিক সমস্যার আকর হয়ে উঠেছে। বলা যায় আদিম শাস্ত্রকার বর্গ gene-এর ধারণাকে মেনেছিলেন, কিন্তু variation-কে স্বীকার করেননি। করতে চাননি। কিন্তু সমাজ নিজের নিয়মে আত্মঘোষণা করেছে এই বংশানুক্রমিক অনড়তার বিরুদ্ধে। যার থেকে এসেছে স্তরান্তরণ বা Stratification-এর ধারণা। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। মহাভারতকার ব্যাসদেব স্বয়ং বর্ণসংকর। ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত লোককথা-রূপকথার অলি-গলিতে ব্রাহ্মণের মূর্খতার বা মূর্খ ব্রাহ্মণের অজস্র গল্প নিত্য যাতায়াত করে চলে। আর বিজিত ভারতবর্ষের পটভূমিতেই স্মার্ত রঘুনন্দন ক্ষত্রিয় নামক বর্ণকেই অস্বীকার করেন, এ-সবই জাতপাতের পাথরচাপা বরাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই জাতিবর্ণ-প্রথা একান্তভাবেই হিন্দুধর্ম-সম্পর্কিত। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে তার বৈচিত্র্যও অনন্ত। প্রতিটি শ্রেণির অন্তর্বর্তী শ্রেণিবিন্যাস ও ক্রমোচ্চবিন্যাসের অভিমান সঞ্চারিত তথা প্রভাবিত করেছে উপজাতীয় সমাজকেও। এই জাতিপ্রথার সঞ্চার বিস্তৃত হয়েছে বালি-জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সমাজেও।

কিন্তু নানান 'আবর্তন-বিবর্তন-সম্বর্তন আদি'-র অন্ত ঘোষিত হয় সেই সংস্কারেরই দাস্যরেখায়—যখন অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর তফশিল বা তালিকার মানুষ সরকারি সহযোগিতা পেলে—তাঁদের মেধামূল্য এখনও গণ্য করা হয় না। অথবা ২০০২-এ সুপ্রিম কোর্টের বৈপ্লবিক রায়ের পরেও শাস্ত্রজ্ঞ অব্রাহ্মণের বদলে আকাট মুখ্যু বামুন ঠাকুরকেই ধরে এনে পুজোয় বসানো হয়।

ক্যাপিটালিজম

অভ্র ঘোষ

ক্যাপিটালিজম (Capitalism) বা পুঁজিবাদ এক বিশেষ অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার নাম। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী টনি (Tawney) ও মরিস ডব (Dobb) বলেছেন যে 'ক্যাপিটালিজম' শব্দটি অমার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদরা কখনো ব্যবহার করেননি। এমনকী মার্ক্সীয় সাহিত্যেও এই শব্দটির ব্যবহার চালু হয়েছে একটু দেরিতেই। *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* বা *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডে 'ক্যাপিটালিস্টিক্' শব্দের ব্যবহার থাকলেও (অবশ্যই ইংরেজি তর্জমায়), বিশেষ্যপদ হিসেবে 'ক্যাপিটালিজম্' শব্দের ব্যবহার নেই। ১৮৭৭ সালে রুশ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের সময়ে, বিশেষ করে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের সঞ্চরণ প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে, 'ক্যাপিটালিজম্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কার্ল মার্ক্স। *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশেনারি*-তে অবশ্য বলা হয়েছে যে ১৮৫৪ সালে থ্যাকারে (Thackeray) প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ইংরেজি 'ইজম্' বা বাংলায় 'বাদ' শব্দাংশটি সাধারণভাবে দুটি জিনিস বোঝায়। এক, বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা। দুই, কোনো বিশেষ চিন্তা, মতাদর্শ বা ভাবধারার শৃঙ্খলাপূর্ণ বিন্যাস। ক্যাপিটালিজম্ বা পুঁজিবাদ প্রথমোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ পুঁজিবাদী এক বিশেষ অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার নাম, মতাদর্শগত ব্যবস্থা নয়। সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ বরং দুই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি বিশেষ উৎপাদনব্যবস্থাও বটে আবার এক বিশেষ মতাদর্শও বটে।

বাংলায় পুঁজিবাদের অন্য এক পরিভাষা হল ধনতন্ত্র। ধন বলতে সম্পদ বোঝায়। মানুষ যে কোনো সমাজব্যবস্থাতে সম্পদ সৃষ্টি করে ও তার পরিমাণ বাড়াতে চায়। আর সমাজে মুষ্টিমেয় একশ্রেণির মানুষ যখন সম্পদসৃষ্টির উপকরণগুলি নিজের হাতে কুক্ষিগত করে স্বীয় লাভের অঙ্ক স্ফীত করে এবং অপর মানুষজনের শ্রমশোষণ করে, তখন সম্পদসৃষ্টির ওই উপকরণগুলিকে পুঁজি বলা হয়। মনে রাখতে হবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে মনুষ্যসমাজ যুগ যুগ ধরেই শ্রেণিবিভক্ত ও শোষণক্লিষ্ট। সম্পদ সবসময়েই কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত, উৎপাদনের হাতিয়ার সমূহের মালিকানা মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত। দাসমালিকদের সমাজব্যবস্থায় এবং পরবর্তীযুগে সামন্ততন্ত্রেও এই একই শোষণক্লিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থার চরিত্রগত ভেদ রয়েছে দাসসমাজ বা সামন্ততন্ত্রের মধ্যে, সামন্ততন্ত্রের থেকে ধনতন্ত্রও

ভিন্নতর। শোষণ সর্বত্রই, কিন্তু শ্রেণিশোষণের প্রক্রিয়া ও প্রকৃতিও এক নয়। অন্য সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিগত ভিন্নতা বুঝতে হলে প্রয়োজন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম। এক, প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন পরিবার সম্পদ উৎপাদন করত নিজেদের ভোগের স্বার্থে। যেমন, একটি কৃষক পরিবার যে ধান উৎপাদন করে সেটা সেই পরিবার নিজের ঘরেই ভাঙিয়ে চালু তৈরি করে নিজের খাদ্যসংস্থান করত। ওই চালের বিনিময়ে কৃষক তার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রও যোগাড় করত। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ হল বাজার তৈরি করা। বাজারে উৎপাদিত বস্তু বিক্রি করে টাকা রোজগার করাটাই প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদক জানে না যে তার উৎপাদিত দ্রব্য কার ভোগে ব্যয়িত হচ্ছে। সে সম্পদ সৃষ্টি করে বাজারের জন্য। এই বাজারমুখিনতা পুঁজিবাদের প্রথম ও প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন করে। লাভের পরিমাণ বাড়াবার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল বা পাটের পরিবর্তে সৌখিন কোনো বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের দিকেই তার নজর থাকবে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা এই কারণেই ধান-পাটের জমিতে নীলচাষের পরিমাণ বাড়াবার জন্য চাষিদের ওপর অত্যাচার করত।

দুই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্য বা বস্তুসমূহ পণ্যে (commodity) রূপান্তরিত হয়। বাজারে বিক্রয়যোগ্য বস্তুকে পণ্য বলে। পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য হল কেবলই লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া এবং তা টাকার হিসেবে। বাজার অর্থনীতিতে টাকা অনন্য সাধারণ মাধ্যম। চাষি চাল বিক্রি করে টাকা রোজগার করে, তাঁতি কাপড় আর শিক্ষক তাঁর বিদ্যা বেচেন, ডাক্তার তাঁর ডাক্তারি। টাকার বিনিময়ে যাবতীয় পণ্যের কেনাবেচা চলে।

তিন, পুঁজিতন্ত্রে উৎপন্ন বস্তুই শুধু পণ্য নয়, মানুষের শ্রমক্ষমতাও পণ্য। মানসিক, বৌদ্ধিক, শারীরিক সমস্ত শ্রমক্ষমতাই পণ্য। কেননা তা বাজারে বিক্রিত হয়। চাষির জানা আছে কীরকম লাঙল চালাতে হয়, কীভাবে ধান রুইতে হয় ইত্যাদি, কিন্তু তার যদি জমি লাঙল বলদ বীজ চারা সার অর্থাৎ উৎপাদনের শক্তিসমূহ বা পুঁজি বলে পরিচিত বস্তুটি না থাকে, তাহলে তার শ্রমক্ষমতার মূল্য কোথায়? উৎপাদনের উপায়সমূহে অর্থাৎ পুঁজির যে মালিক সে হল পুঁজিপতি। এই পুঁজিপতি তার পুঁজির জোরে চাষি-শ্রমিক-মজুরের শ্রমক্ষমতা ও শ্রমসময় কিনে নেয় আর ওই শ্রমক্ষমতা ও শ্রমসময় দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে সে তার মুনাফার পাহাড় তৈরি করে। চাষি-মজুর-শ্রমিকের শারীরিক শ্রমক্ষমতা যেমন সে কেনাবেচা করে শ্রমবাজারে তেমনই পণ্য হিসেবে ক্রীত হয় বুদ্ধিজীবীর বৌদ্ধিক শ্রম বা মানসিক শ্রমক্ষমতা। তবে অবশ্যই পুঁজিবাদী বাজারে কায়িক শ্রমক্ষমতা ও সময়ের চাইতে মানসিক শ্রম ও সময়ের দাম অনেক বেশি।

চার, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও তার ম্যানেজারেরা বা শিল্প-পরিচালকমণ্ডলী গোটা উৎপাদনব্যবস্থাটিকে আপাদমস্তক নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ শুধু এই নয়

যে শ্রমিকদের কত মজুরি দেওয়া হবে বা তাদের কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি কী হবে, তা নির্ধারণ করা। নিয়ন্ত্রণের অর্থ এও যে কী পদ্ধতিতে উৎপাদন হবে বা কোন লাভজনক পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং তার বিপণন সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়া দখলে রাখা। এক কথায়, পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, শ্রমিক নিয়োগ-ছাঁটাই থেকে শুরু করে কত লাভজনক উপায়ে পণ্যবিক্রি করা যায় এবং বাজার তেজি রাখা যায়—সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিপতি তার পুঁজির জোরে।

পাঁচ, পুঁজি কিংবা অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনার মালিকও পুঁজিপতি। পুঁজি সঞ্চয়নে (Capital accumulation) অন্যের কাছ থেকে পুঁজি ধার করা (Loan Capital) ইত্যাদি হরেকরকম প্রক্রিয়ায় পুঁজি সংগ্রহ ও তার লাভজনক বিনিয়োগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা হল পুঁজিপতি। শ্রমদানকারী উৎপাদকদের এসব ব্যাপারে কোনও ভূমিকা থাকে না। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, বিশেষ করে উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে, গণতন্ত্রীকরণের উদারনৈতিক হাওয়া জোরদার হওয়ায় বড়ো বড়ো কলকারখানাগুলিতে শিল্প পরিচালনসংক্রান্ত বিষয়সমূহে শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আংশিক ও সীমিত অংশগ্রহণের রীতিনীতি কোথাও কোথাও সাব্যস্ত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শিল্পের আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। পুঁজিবাদী শিল্প-মালিকের ভুল পরিকল্পনার জন্য অবশ্য শেষে এই শ্রমজীবীদের কপালে জোটে অশেষ দুঃখ-কষ্ট।

ছয়, আধুনিকযুগে শিল্প-মালিকানার ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিরাট শেয়ার বাজার। শিল্প সংস্থার সীমিত শেয়ার কিনে ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ ভোগ করা পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির আরেক রীতি। এরই সূত্রে তৈরি হয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ইত্যাদি। শেয়ার হোল্ডার মালিকেরা অনেকেই শিল্পের মালিকানা ভোগ করে, বৎসরান্তে লভ্যাংশ পায়, কিন্তু শিল্প ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠতে পারে না। নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা হতে গেলে সেই শিল্পের সঙ্গে যে ওতপ্রোত বন্ধন গড়ে তুলতে হয় বাজার থেকে শেয়ার কিনে সে-সম্পর্ক তৈরি হয় না। এইভাবে আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পের মালিকানা ও শিল্প নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার মধ্যে ফারাক তৈরি হয়ে যায়।

সাত, পুঁজির গতিশীলতাও পুঁজিবাজের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিপতির মুনাফা ক্রমবর্ধমান। মুনাফার সবটুকু অংশ পুঁজিপতি খেয়ে ফেলে না, বরং ভবিষ্যৎ অতিরিক্ত মুনাফার আশায় সে পুঁজি সঞ্চয় করে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলে মুনাফা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ও বর্ধিত পুঁজির আকার নেয়, পুঁজির পাহাড় তৈরি হয়। একেই বলে পুঁজির গতিশীলতা, স্থিতিশীল থাকতে পারে না পুঁজি।

আট, পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে, কোনো পরিবার নিজের প্রয়োজনের সবটাই নিজের শ্রমে উৎপাদন করতে পারত না। কিন্তু পরিচিত লোকজনের সঙ্গে বিনিময় করে সে তার নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের প্রয়োজন মেটাত। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সরাসরি এই বিনিময়-প্রথা অচল। নিজের প্রয়োজন মেটাতে হলে পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং তা বেচতে হবে বাজারে। বাজার মারফত

সেসব পণ্য চলে যায় অদৃশ্য ক্রেতাদের হাতে। বাজারের চাহিদা আন্দাজ করে উৎপাদকদের উৎপাদন করতে হয়। কে কত উৎপাদন করল তার ওপর সবসময়ে উৎপাদকের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে না, কে কত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারল তার ওপর নির্ভর করে উৎপাদন-মালিকের লাভ-ক্ষতি। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তাই উৎপাদন করতে হয়। পুঁজিবাদী অবস্থায় এই অর্থে উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক। অথচ এই ব্যবস্থায় উৎপাদন-মালিকেরা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নিজের লাভ-ক্ষতির হিসেব করে উৎপাদনের কাজে ব্যাপৃত থাকে। বাজার না বুঝে উৎপাদন বেশি করে ফেললে ক্ষতি অনিবার্য, এবং সেদিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যাপারটি একটা ফাটকা—কখনো লাভ, কখনো ক্ষতি। এই বিশৃঙ্খলা পুঁজিতন্ত্রে অনিবার্য।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মাথায় রেখে একথা বলা যায় যে প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা অনেক উন্নত, বিপ্লবাত্মক। এই ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিপতিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কারণে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ও পণ্যের গুণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে বৈপ্লবিক গতিতে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের নবতম কৃৎকৌশল ব্যবহার করে উৎপাদিকা শক্তিকে যেমন বাড়িয়ে তোলা হয়, অন্যদিকে উৎপাদনের খরচ কমিয়ে লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা হয় ব্যাপকহারে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সৃষ্টিমুখর উল্লাসে পুঁজিবাদের ধারাবাহিক প্রগতি ঘটে।

কিন্তু ধারাবাহিক বিস্তারেরও সীমা আছে। মার্ক্সবাদী সাহিত্যে বলা হয়েছে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃতিগত নিয়মেই তৈরি হয় ক্রমে তার সংকটের নানা কারণ। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানায় শ্রমজীবীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিপতিদের তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ মুখোমুখি শোষণের কারণে শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা ও সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠতে থাকে স্বাভাবিক নিয়মে। মার্ক্সবাদীদের ভাষায় একেই বলা হয় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সমাজচেতনা যা এই পুঁজিতন্ত্রকে নিধন করতে চায়। দ্বিতীয়ত, লেনিন বুঝিয়েছেন যে পুঁজিবাদ নিজের কবর নিজেই খোঁড়ে। পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে বাজার দখলের অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বিশ্বব্যাপী পুঁজির বাজারের ওই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে ছোটোখাটো যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তৈরি হয়ে যায়। মার্ক্সবাদীদের মতে বিশ শতকের দুই মহাযুদ্ধ পুঁজিপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষময় ফল। এরকম আরো বহুকারণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিয়মে একদিন পুঁজিতন্ত্রের পতন ঘটবে। গড়ে উঠবে নতুন উৎপাদনব্যবস্থার সমাজ।

পুঁজিতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় নানা বাঁক বা স্তর ইতিহাসে পরিদৃশ্যমান। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে সর্বপ্রথম যে পুঁজিবাদের সঞ্চার ঘটেছিল তা ছিল বাণিজ্যিক পুঁজিকে কেন্দ্র করে। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বণিকেরা এক বৃহৎ পুঁজির দ্বারা আঘাত হেনেছিল সাবেকি কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার শরীরে। ক্রমে এরা ক্ষমতা দখল করে গড়ে তোলে বাণিজ্যিক পুঁজিতন্ত্র। কিন্তু এরপরেই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বৃহৎ

কলকারখানা, বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ও অন্যবিধ প্রযুক্তির আশ্রয়ে তৈরি হল শিল্প-পুঁজি, ইউরোপে ঘটে গেল শিল্প-বিপ্লব। পুঁজিবাদের আধুনিক রূপ এই শিল্প-পুঁজির কৌলতে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। শিল্প পুঁজিবাদকেও আবার নানাস্তর অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল শিল্পপতিদের অবাধ প্রতিযোগিতার বাজার, ইতিহাসে যার নাম Laissez Faire-এর পুঁজিবাদী যুগ। ক্রমে প্রতিযোগিতা তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে তৈরি হল একচেটিয়া পুঁজিবাদী বাজার (Monopoly Capital) লগ্নি পুঁজি বা ফিন্যান্স ক্যাপিটালের যুগও বলা যেতে পারে একে। রাঘব পুঁজিপতিদের দাপটে এই একচেটিয়া পুঁজির যুগেই বাজারের বিশ্বায়ন ঘটতে শুরু করে, আর বিশ্ববাজার দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মনোভাব প্রকট হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার দিকে নজর রেখেই লেনিন অমোঘ উক্তি করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

অবাধ পুঁজি-প্রতিযোগিতার যুগে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ। উৎপাদনব্যবস্থার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তেমন গ্রাহ্য হত না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই কারণেই রাজনীতি-দর্শনের জগতে সীমিত ক্ষমতার রাষ্ট্রকর্তৃত্বের তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবিকে সামনে রেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তত্ত্ব বুর্জোয়া যুগের প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমে একচেটিয়া পুঁজির সদম্ভ বিকাশের স্তরে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তার ভূমিকা প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর হয়ে উঠল, তৈরি হল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি (State monopoly capital)। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিয়ে বিদেশের বাজারে পুঁজির লগ্নিকরণ ও বৈদেশিক বাজার দখলের প্রতিযোগিতা তৈরি হল।

উনিশ শতকের অবাধ বাণিজ্যের যুগ থেকে সরে এসে একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নি পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের স্তরের বিকাশ ঘটেছে বিশ শতকের প্রারম্ভে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদের আরো পরিপক্ব রূপ প্রকাশ পেল বহুজাতিক কর্পোরেশনের (Multinational Corporation) উদ্যোগে গঠিত আধুনিক পুঁজিবাদে। আধুনিক পুঁজিবাদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লগ্নির যে বিপুল প্রসার ঘটেছে তার মূলে আছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি, সুনির্দিষ্ট কৌশল, দক্ষ পরিচালনব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পদ, তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন অধ্যায়ে প্রাধান্যকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিপর্যস্ত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সংকট, অনুন্নত ও সদ্যস্বাধীন দেশের শিল্পায়ন, প্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত বিকাশের প্রয়োজন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ, জাতীয় পুঁজির স্বল্পতা, এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব বহুজাতিক সংস্থাগুলির সামনে বিশ্বব্যাপী বাজারের দরজা মুক্ত করে দিয়েছে। এই বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমেই একদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের বাজার দখল করেছিল, এখন তা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, জার্মানি ও জাপানও এখন বিশ্ববাজারে প্রভুত্বকারী শক্তি। এসবের ফলেই তৈরি হয়েছে বর্তমানের সাবেকি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বদলে আধুনিক অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাসে এই অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা সাধারণ মানবসমাজের ওপর শেষতম শরাঘাত।

ক্লাসিসিজম

দেবতোষ বসু

শিল্প-সাহিত্যে ক্লাসিকরীতি বা শৈলীর প্রতি আস্থা বা আনুগত্যকেই ক্লাসিসিজম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্লাসিক রীতি বা শৈলীর স্বরূপ কী তা জানা না থাকলে এই অভিধা অস্বচ্ছ ও অসম্পূর্ণ। 'ক্লাসিক' এই বিশেষণটি নানার্থক—কখনো ন্যূনতম অর্থে ক্লাসে বা শ্রেণিকক্ষে পঠিতব্য গ্রন্থকে বোঝায়, কখনো বোঝায় প্রথম সারির আদর্শ এবং সর্বমান্য কোনো রচনাকে এবং কখনো সঙ্কুচিত অর্থে প্রাচীনযুগের গ্রিক ও রোমান সাহিত্য বা শিল্পকে। এই তৃতীয় অর্থটি সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ক্লাসিক বলতে বোঝায় এমন শিল্প-সাহিত্যকে যা সনাতন গ্রিক-রোমান শিল্পরীতির প্রভাবে রচিত হয়ে অসামান্য সৃষ্টির আদর্শ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সনাতন গ্রিক রোমান শিল্পরীতির স্বরূপ কী? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের পেগানবিশ্বকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসতে হবে রেনেশাঁসের সময়ে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন ইউরোপে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্য পুনরাবিষ্কৃত হল। আরিস্টটলের *পোয়েটিকস্* শুধু নয়, রোমান কবি হোরেসের *আর্স পোয়েটিকা*-র প্রভাবে তৎকালীন বিদেশী সাহিত্যে নতুন একটি মতবাদের জন্ম হল যার নাম 'নিও ক্লাসিসিজম্'। এই মতবাদ অনুসারে সাহিত্যিক রচনায় থাকা দরকার যুক্তিনিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, সংযম, আবেগের শৃঙ্খলা, আত্মবিলোপ এবং সামান্য সত্যের প্রকাশ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি সাহিত্যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব পর্যন্ত জার্মান সাহিত্যে সাধারণভাবে ক্লাসিকাল আদর্শের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 'অগস্টান এজ' নামে সুপরিচিত ইংরেজি সাহিত্যের এই পর্বে রচিত হয়েছে আলেকজান্ডার পোপের পদাবলি যার অন্যতম চরিত্রলক্ষণ পঙ্‌ক্তিশেষে ভাবগত ও ছন্দগত যতির মিলন এবং চরণান্তিক অনুপ্রাস।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত সময়ে জীবিত কবিরা তাঁদের রচনায় যুক্তির বদলে আবেগ এবং সংযম অপেক্ষা আত্মপ্রকাশকেই মূল্য দিয়েছেন বেশি। উদাহরণ, বৈষ্ণব পদাবলি। অবশ্য, ক্লাসিকাল-রীতি-শোভন আত্মবিলোপের কিছু দৃষ্টান্ত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী কাব্যে দুর্লভ নয়। মঙ্গল-কাব্যের বিভিন্ন কাহিনিতে এই আত্মবিলুপ্তি সাধিত হয়েছে বর্ণনা ও বস্তুনিষ্ঠার মাধ্যমে। 'যতিপ্রান্তিক ছন্দে'র (শব্দবন্ধটি জীবনানন্দের) কথা বাদ দিলে, মধ্যযুগের এই মানবতাবাদী সাহিত্যকর্মকে ক্লাসিকাল

রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ এখানে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, যা ক্লাসিসিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তকে লঙ্ঘন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে ভাষার প্রসাদগুণের যে পরিচয় আমরা পাই, তা পূর্ববর্তী কবিদের কবিতায় দুর্লভ। তাঁর অল্প বলার ক্ষমতা, ক্ষুদ্র শ্লেষাত্মক কবিতা বা Epigram রচনার দক্ষতা, মাত্রানিষ্ঠা, ক্লাসিকাল রীতিরই পরিচয় বহন করে। তাঁর দুঃখময় জীবনের ছায়া ভারতচন্দ্রের কাব্যে পড়েনি—যথার্থই লক্ষ করেছেন প্রমথ চৌধুরী এবং এই অহং বিসর্জনের মধ্য দিয়েই তাঁর আত্মবিলোপের সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ একই যুগের প্রতিভূ হয়েও একে অপরের থেকে একেবারে আলাদা। রামপ্রসাদের কবিতা ও গানে আমরা ক্লাসিকাল রীতির অনড়তা থেকে সুখকর প্রস্থান লক্ষ করি। ভারতচন্দ্রীয় অন্ত্যমিলনসম্পন্ন চরণপরম্পরা থেকে কাব্যপঙ্‌ক্তিকে মুক্ত করে রামপ্রসাদ তাকে প্রবহমাণতা দিলেন এবং বাংলা কবিতায় রোমান্টিক ভাবনাসম্মত আঙ্গিককে অভ্যর্থনা জানালেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতকারণেই এই ভাবিকথন করেছিলেন যে ভবিষ্যতের বাংলা ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুগামী হবে। রামপ্রসাদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মাঝখানে আবির্ভাব হল বাংলা গদ্যের জনক রামমোহন রায়ের। আধুনিক পাঠকের কাছে সেই ভাষার অন্বয় জটিল ও সেকেলে মনে হলেও, একথা মানতেই হবে, তর্কের যদি আলাদা কোনো ভাষা থাকে, তবে সেই ভাষা রামমোহনের, সংহত স্বচ্ছ ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি শিষ্ট—হোরেসের decorum-এর তত্ত্বকে যা সমর্থন করে। অনুজ হলেও, সেইসময় ঈশ্বরগুপ্তও তাঁর কবিতা লিখে চলেছেন। রামপ্রসাদ নয়, তিনি যেন ভারতচন্দ্রেরই উত্তরসূরি। বাংলা কবিতায় ফিরে এল যতিপ্রান্তিক ছন্দ—সেই পরিমিতি ও বস্তুনিষ্ঠা, কবিতার পঙ্‌ক্তিকে অল্পকথার বন্ধনে নিয়ে আসার প্রয়াস, আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনাগ্রহ এবং ব্যক্তি-সমাজ-সংস্কারের প্রতি ব্যঙ্গের শরসন্ধান।

গুপ্তকবির অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এই শতাব্দীর অন্তর্গত হয়েও, গুপ্তকবির দ্বারা প্রভাবিত হননি। *মেঘনাদবধ কাব্য*-এ ভার্জিল-হোরেসের পরোক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও *চতুর্দশপদী* ও বীরাঙ্গনা কাব্যগ্রন্থের কথা স্মরণীয় যেখানে মাইকেলের সুস্থির রোমান্টিক মানসিকতা সুস্পষ্ট। সর্বোপরি তাঁর হাতে অমিত্রাক্ষর নামক পঙ্‌ক্তি লঙ্ঘন ছন্দের প্রবর্তনাও প্রমাণ করে গুপ্তকবির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কতখানি। গদ্য ক্লাসিকাল রীতির পরিচয়বাহী নয়। আর, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাসবদ্ধ, সংহত, সান্দ্র গদ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে 'এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য'-এর স্ফূর্তি দেখেছিলেন, তা তো রোমান্টিকতারই লক্ষণ।

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রপূর্ব অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ অর্থে ক্লাসিকাল রীতির প্রতি আগ্রহ যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের নাম স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের পর, 'জন্ম-রোমান্টিক' ওই মহাকবির স্পর্শ বাঁচিয়ে যাঁরা কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন, তিরিশের দশকে সেইসব কবিও মূলস্রোত থেকে নিজেদের নিঃসম্পর্ক করতে পারেননি। তবু, কোনো কোনো কবি, যেমন বিষ্ণু দে-র ব্যঙ্গমিশ্রিত

কবিতায় এবং প্রধানত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে ক্লাসিসিজমের প্রতি পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। ক্লাসিকাল রীতির বিপরীত মেরুতে অধিষ্ঠান করেও জীবনানন্দ দাশ এঁদের কাব্যাদর্শকে চিনতে ভুল করেননি—'কোনো-কোনো কবির হাতে ক্লাসিক বা মাত্রানিষ্ঠ রীতির এমন একটা প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যা রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমসাময়িকদের ভিতর প্রায়ই ছিল না।' শুধু কবিতা নয়। এখানে অবশ্যই মননশীল উপন্যাসের কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক, বিশেষভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা। এইসময় থেকে আর দু'দশক এগিয়ে কমলকুমার মজুমদারের গদ্যশৈলীর ধ্রুপদী ভঙ্গিও আমাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে আসল দ্বন্দ্বের কথাটি। সত্যই কি রোমান্টিক ও ক্লাসিক শিল্পচেতনা বিভিন্ন? ক্লাসিসিজ্‌ম স্বাস্থ্য এবং রোমান্টিসিজ্‌ম রুগ্‌ণতা যে কবি বলেছিলেন, সেই গ্যেটেও দুই মানসিকতার মধ্যে সারাজীবন স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। সুতরাং প্রশ্নটি থেকেই যায়। বিশ্বসাহিত্যের দীর্ঘস্রোত পার হয়ে এসে আর কি দেখতে পাওয়া সম্ভব পোপ বা ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচনা? ব্যঙ্গশাণিত হাল্কা পদ্য নয়, মহৎ কবিতা কি রচনা সম্ভব ওই ভঙ্গিতে? অন্যদিকে, স্বতোৎসাহিত উচ্ছ্বসিত আবেগের দিনও শেষ। মনে হয়, আধুনিক কবি মেনে নিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি : 'উচ্ছ্বাস সংবরণ কবির আদ্যকৃত্য'। এই সংবরণের শিক্ষাই আধুনিক কবির শিক্ষা, যে শিক্ষার সুফল আমরা পাই এ কালের বেশ কয়েকজন কবির মধ্যে যাঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যিনি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে একদা যশঃপ্রার্থী তরুণ কবিকে একশোটা সনেট রচনার সাদর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কোরাস

বাসবী রায়

প্রাচীন গ্রিসে কোরাস ছিল দেবতার উৎসবে মুখোস পরিহিত গাইয়ে ও নাচিয়েদের দল। আরিস্টটল মনে করতেন ডিথুরাম্ব কোরাস গানের (দিওনুসুসের উৎসবে গীত) মধ্যে থেকেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি। আর্কিলোখাস, যাঁকে মনে করা হয় ডিথুরাম্ব সংগীতের আদি রচয়িতা, তিনি, পঞ্চাশজনের (আনুমানিক) একটি দলের নেতা হিসেবে বৃত্তাকার ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে এই গান উদ্দাম নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করতেন। এরপর আরিয়ন-এর (৬২৫-৫৮৫ খ্রিঃ পূঃ) রচনাতেই নির্দিষ্ট কাহিনী নির্ভর ডিথুরাম্ব সংগীত পাওয়া গেল; তার আঙ্গিকেরও ঘটল পরিবর্তন। এবার বিশিষ্ট সীমানায় কোরাসের পদচারণা নির্দিষ্ট হল, যার সূত্রে কোরাস গানে এল স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি বা ইপোডের সমাহার—গানের দীর্ঘ বহতায় সুর, তাল, গতিতে, মেজাজে বৈচিত্র্যের তাগিদে। সে সময় প্রেক্ষাঙ্গনের মধ্যবর্তী অংশে থাকত দিওনুসুসের বেদী, তাকে ঘিরে বৃত্তাকার জায়গা থাকত অর্কেস্ট্রার জন্য আর সেখানেই ছিল কোরাসের অবস্থান। ক্রমশ ডিথুরাম্ব সংগীতের আরো রূপভেদ ঘটল। কোরাসের দলনেতা কোরাসের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্যদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কাহিনির পর্ব বিশেষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা বা কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। যা ছিল ধারাবাহিক গীতিপালা এবার তা হল উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গীতিখণ্ড। কোরাসের গানকে এভাবে নাট্যগীতিতে গ্রন্থিত করার সর্বাধিক কৃতিত্ব থেস্‌পিস-এর। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম কোরাসের দলের বাইরে একজন অভিনেতাকে আনলেন—যার প্রয়োজন নিছক গ্রন্থনার কারণে নয়, অতিরিক্ত কোনো আবেদন সৃষ্টিতে। কোরাস থেকে আলাদা এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধিতেই ট্র্যাজেডির উন্মেষ এবং ইস্কাইলাসের হাতে অভিনেতার সংখ্যা বেড়ে হল দুই আর সোফোক্লিসের নাটকে তা হল তিন। অর্থাৎ গ্রিক ট্রাজেডির বিকাশের পরম্পরায় 'রিচ্যুয়াল'-এর পরিধি ছেড়ে কোরাস চলে এল নাটকের আঙিনায়। তখনকার নাট্যাঙ্গনের স্থাপত্যে অর্কেস্ট্রার তথা কোরাসের স্থান হল মূল অভিনয় ক্ষেত্র (Proskenion) এবং দর্শক সমাবেশের মধ্যিখানে।

আসলে গ্রিক ট্রাজেডির জন্মসূত্রেই কোরাস তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে সব নাটকে প্রায় শুরু থেকে শেষ অবধি কোরাসের উপস্থিতি। এমন কি গ্রিক ট্রাজেডির গঠন চিহ্নিত করা হয় কোরাসের উচ্চারণের নানা পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন

কোরাসের মঞ্চে প্রবেশ করার আগের অংশ হল নাটকের 'প্রোলোগ', কোরাসের শেষ উপস্থাপনার পরবর্তী পর্ব হল 'এপিলোগ', তেমন ট্রাজেডির মূল অবয়ব তৈরি হল কোরাসের বিভিন্ন আবৃত্তি তথা গীত অংশের ফাঁকে ফাঁকে অভিনেতাদের সংলাপে নির্মিত নানা এপিসোডের বুননে। শুধু তাই নয় 'কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে গণ্য করতে হবে' আরিস্টটলের এই মন্তব্য ভাবাই যেতে পারে সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতার সূত্রে যে পারম্পর্যময় কাহিনি গড়ে উঠত, কোরাসের তাতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনেক নাটকের নামকরণই তো কোরাসের উল্লেখে—'দ্য সাপ্লায়েন্টস', 'দ্য পারসিয়ানস', 'দি ইউমেনিডিস্' অথবা 'বাক্কাই'। সেখানে নাট্যগতি নির্মাণে সক্রিয় অংশ নিত কোরাস আর তার নৈতিক অবস্থান নির্ধারণই প্রায়ই হয়ে উঠত নাটকের পথনির্দেশ। তবে গ্রিক ট্রাজেডিতে কোরাসের অনিবার্য উপস্থিতির আরো গভীর দ্যোতনা ছিল। কোরাস যেন প্রেক্ষাঙ্গনে তার বিশেষ অবস্থানের তাৎপর্যে অভিনেতা এবং দর্শকদের মধ্যে যোগাযোগের সেতুস্বরূপ। তারই মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে পারে উভয়ের ভাবের আদানপ্রদান। তাই কোরাস নাট্যক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অংশীদার না হয়েও ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ প্রদানে তথা তার বিশ্লেষণে নাটকের মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করত। কোরাসের উচ্চারণেই জানা যেত চরিত্রদের গভীর পরিচয়, তাদের আলোড়িত মুহূর্তের অন্তর্গূঢ় কারণ, এমন কি তাদের বিপর্যস্ত পরিণতির জন্য সমবেদনা আবার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে নাট্যকারের অভিপ্রায়। আসলে পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম, বিশেষত পেরিক্লিসের এথেন্স, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চাহিদায় চেয়েছিল যে নাট্যপ্রযোজনার সুবাদে তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে এবং সেসব সংকটের সমাধানের সূত্রে সাধারণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে। আর একাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল 'কোরাস'—যা একই সঙ্গে রাষ্ট্র তথা সমাজের বিবেকী অস্তিত্ব এবং দর্শকদেরও আবেগ তথা অনুভবের কণ্ঠস্বর। কোরাসের তাই পরিচয় হল মানুষের যৌথ নির্জ্ঞানের রূপকার হিসেবে। আমাদের মনে পড়ে যাবে *প্রমিথিউস বাউণ্ড, অ্যাগামেম্‌নন, ওয়াদিপাউস, আন্তিগোনে* বা *মেদেয়া*-র মতো নাটকের কথা। আবার এসব নাটকের গীতিময়তা সৃজনে বা বলা যায় ভয়ের ঘটনা বা শোকের আবহকে সংগীতের মূর্ছনায় সহনীয় এবং সৌন্দর্যময় করে তুলতেও কোরাসের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। অবশ্য ইউরিপিডিস-পরবর্তী ট্রাজেডি রচয়িতার নাটকে কোরাস নিছকই এক অলংকরণ এবং গ্রিক থিয়েটারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটকে কোরাসের অস্তিত্ব অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে গেল।

তবে নাট্য সাহিত্যের নানা পর্বে গ্রিক ট্রাজেডির মডেলে লেখা বিভিন্ন নাটকে কোরাসের ব্যবহার ছিল, যেমন সেনেকার নাটকে এবং অন্যান্য রোমান নাটক বা আরো পরবর্তী কালে *গর্বোডাক* (স্যাকভিল ও নর্টন), *স্যামসন অ্যাগোনিস্টেস্* (মিলটন) অথবা *প্রমিথিউস আনবাউণ্ড* (শেলী) বা *আটলান্টা ইন ক্যালিডন*-এর (সুইনবার্ন) মতো নাটকে। এরই সূত্রে আমরা মনে রাখতে পারি যে বিশ শতকে কাব্যনাট্যের প্রসারে কোরাস আবার উপস্থাপিত হল তার পুরনো গরিমায় যেমন *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল*

(এলিয়ন) নাটকে। এছাড়া কখনো কখনো নাটকে কোরাসের সমবেত উচ্চারণ শোনা না গেলেও তার অস্তিত্ব রয়ে গেল কোরাস নামধারী একক চরিত্রে—এ প্রসঙ্গে শেক্সপিয়রের *হেনরী দ্য ফিফথ্* বা আনুই-এর *আন্তিগোনে*-র নাম সহজেই মনে আসে। আবার সেই শেক্সপিয়রের নাটকেই 'কোরাস' নামে নয়, তবে এমন একক চরিত্র পাওয়া গেল যারা বৈশিষ্ট্যে কোরাসপ্রতিম এবং এরাই অভিহিত হল 'কোরাল ক্যারাক্টার' রূপে, যেমন 'এনোবারবাস' (*এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা*) বা 'ফুল' (কিং লীয়র) জাতীয় চরিত্র। আর এদেরই অনুসরণে বাংলা নাটকে এল 'করিমচাচা' (গিরিশচন্দ্রের *সিরাজদ্দৌলা*) বা 'দিলদার'-এর (দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান) মতো চরিত্ররা। তবে আধুনিক বাংলা নাটকে নাট্য অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলার আয়োজনে হয়তো সর্বাগ্রে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাটকের ঠাকুর্দা ধরনের চরিত্রদের কথা, যারা কোরাসের আদর্শে নির্মিত না হয়েও তাৎপর্যে কিছুটা তারই সমগোত্রীয়। পাশাপাশি আরো পরের অনেক কাব্যনাট্যে ব্যক্তি চরিত্রগুলির মানসলোক বা স্বপ্নকল্পের দ্যোতনায় থেকেই যায় কোরাসের ভূমিকা।

কোরিওগ্রাফি

সৌমিত্র বসু

কোরিওগ্রাফি হল সেই পদ্ধতি বা বিদ্যা, যার প্রয়োগে শরীরের নানা ভঙ্গি, অভিব্যক্তি বা সঞ্চালন একটা শিল্পরূপ পেতে পারে। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Lefenittet ১৬৯৯ সালে। কোরিওগ্রাফিতে দুটি বিষয়ের বোধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম হল ছবি, যা তৈরি হয়ে ওঠে রং, রেখা, বিভিন্ন আকার এবং তাদের যোগ্য সংস্থাপনার মধ্যে দিয়ে; যে কোনো শরীরের মধ্যে এদের সবকটি উপাদান আছে, রূপসজ্জা পোশাক আলো প্রভৃতির সাহায্যে তাদের অভিপ্রায়মত বিন্যস্ত করাই শিল্পীর কাজ। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল ছন্দের বোধ। কোরিওগ্রাফির মারফতে তৈরি হওয়া ছবি যেহেতু স্থির নয়, অবিরত পরিবর্তনশীল, তাই সে পরিবর্তনকে কীভাবে সামঞ্জস্যময় ছন্দ দেওয়া যায় তাও দেখতে হয় শিল্পী বা স্রষ্টাকে।

কোরিওগ্রাফির প্রেরণা পাওয়া যাবে প্রকৃতির মধ্যেই। হাওয়া লেগে দুলে ওঠে গাছের সারি, একটি নির্দিষ্ট ছন্দে নদীর জল পাড়ে এসে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে। এই দৃশ্যমান জগতের সর্বত্র নানা রং রেখা আকারের সমাহার, আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত পর্যন্ত ছন্দের শাসনে নিয়ন্ত্রিত। ময়ূরের পেখম মেলা বা বাঘের ছুটে যাওয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কোরিওগ্রাফি। আদিম মানুষ দেবতাদের খুশি করবার জন্য সবাই মিলে নাচত, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শিকার বা যুদ্ধের আবেগ প্রকাশ করা হত একক বা সমবেত দেহভঙ্গি দিয়ে। মানুষের তৈরি কোরিওগ্রাফির সেই হল শুরু।

সভ্যতার আদি যুগেও নাচ ছিল বিবিধ কৃত্যের (ritual) অঙ্গ। প্রাচীন আঁকা বা খোদাইকরা ছবি থেকে দেখা যায় ইজিপ্টে কেমন নাচের প্রচলন ছিল। শস্যের দেবতা ওসিরিসকে বন্দনা করে যেমন সমবেত নৃত্য হত, তেমনি নাচত প্রাচীন ওঝারা, নাচতেন ফারাও স্বয়ং। গ্রিসে ছোটোবেলা থেকে দেখানো হত নাচ, স্পার্টায় পাঁচ বছর বয়স থেকে নাচের অনুশীলন শুরু হত। এর ফলে শরীরের ব্যায়াম হয়, সুগঠিত দেহে মানুষ ভাল যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে। হোমারের লেখায় নাচের বেশ কিছু চমৎকার বর্ণনা আছে। রোমানরাও নাচকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। হিব্রু ধর্মে ছবি আঁকা বারণ বলে কোন দৃশ্যায়িত নিদর্শন পাওয়া যায় নি, কিন্তু বাইবেলে একাধিকবার নাচের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রাচীন খ্রিষ্টান চার্চেও নাচের চল ছিল। ৭৪৪ সালে পোপ জাকারিয়াস এই নাচ

নিষিদ্ধ করেন। সে নিষেধ অবশ্য বজায় থাকেনি। পারির নোতারদাম গির্জায় ধর্মপ্রচারকেরা মুখে রং মেখে বা মুখোশ পরে নাচতেন।

রেনেশাঁস পর্বে কবিতা, গান, আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ইত্যাদির সহায়তায় কোরিওগ্রাফি আরো মনোরম হয়ে উঠতে চাইল। এ বিষয়ে ফ্লোরেন্সের লোরেঞ্জো দ্য মেদিচি (১৪৪৯-৯২), লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) প্রমুখের অবদান স্মরণীয়। ১৫১২ সালে অষ্টম হেনরির রাজসভায় মুখোশ নৃত্যের প্রচলন হয়। ফ্রান্সের রানি ক্যাথরিনা দ্য মেদিচিসের (১৫১৯-৮৯) আমলে তাঁর আদেশে নির্মিত হল 'Le Ballet Comique de la Rievne' (১৫৮১)—'রানির কৌতুক ব্যালে', এর থেকে ব্যালে নামক শিল্পমাধ্যমটির উদ্ভব। জাঁ জর্জেস নোভের (১৭২৭-১৮৯০), যাঁকে নৃত্যের শেক্সপিয়র বলা হত, তিনি কাহিনিমুখ্য ব্যালের প্রবর্তন করলেন। কার্লো ব্লামিসের (১৭৯৭-১৮৭৮) বই *Code of Terpsichore* প্রকাশিত হল ১৮২৫ সালে, যাতে ধ্রুপদী ব্যালের নিয়মকানুন লেখা আছে, বিভিন্ন শিল্পীর সহায়তায় কোরিওগ্রাফি আরো বেশি সম্পূর্ণতা, আরো বেশি পরিণতির দিকে বিবর্তিত হতে হতে চলেছে।

এইসব নাগরিক নৃত্যশৈলীর পাশাপাশি অবশ্যই লোকায়ত নৃত্যভঙ্গিমার কথাও বলতে হবে। এদের কোরিওগ্রাফিতে উদ্ভাবনের চেষ্টা তুলনামূলকভাবে কম, খুব সংগত কারণেই প্রথা মেনে চলার প্রবণতা বেশি। এরা অনেক সময় কৃত্যনির্ভর, অনেক সময় খেলা হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে একটি লোকনৃত্যানুষ্ঠানের নাম ছিল Play Party Game. গ্রিক নৃত্য কালামাশিয়ানোসে প্রধান নাচিয়ের হাতে থাকে রুমাল, ইতালির মেয়েরা তাম্বুরিন নিয়ে নাচে। আরো অসংখ্য লোকনৃত্যের কথা বলা যেতে পারে।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের, তথা কোরিওগ্রাফির ইতিহাস অতি প্রাচীন। পিতামহ ব্রহ্মা নৃত্য ও অভিনয়ের শাস্ত্র ভরতমুনিকে দিয়েছিলেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অজস্র দেহভঙ্গি, মুদ্রার কথা বলা আছে। 'অভিনয় দর্পণে' নৃত্যশিল্পীর দশটি গুণের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তার মধ্যে তৎপরতা, ঋজুতা, বুদ্ধি এবং নিজের কলাবিদ্যার প্রতি গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকা চাই সুসমঞ্জস দেহ, তা দ্রুত সঞ্চালনের ক্ষমতা, চোখের নানা ভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোলার অভ্যাস।

প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও কোরিওগ্রাফির উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তৈরি করেছে। জাভা, বালি, সুমাত্রার নৃত্যশৈলী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। সিংহলেও বৌদ্ধ উৎসবে বিখ্যাত ক্যান্ডি নাচ দেখানো হয়। বর্মা বা মায়নামারে আছে Zat Pwe এবং Nat Pwe নৃত্য, থাইল্যাণ্ডে Khon এবং Lakon খুব বিখ্যাত। আধুনিক কালে বাংলায় নৃত্যশৈলী নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এ ব্যাপারে খুব উল্লেখযোগ্য নাম রবীন্দ্রনাথ বা উদয়শংকরের। বর্তমানকালে যাঁরা এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের নাম বিশেষভাবে মনে আসে।

কোরিওগ্রাফির সঙ্গে নাচের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বটে, কিন্তু যেকোনো অভিকরণ শিল্পই (Performing Art) এর সাহায্য নিয়ে থাকে। বাংলা নাট্য এবং চলচ্চিত্র

দীর্ঘকাল ধরে নাচকে ব্যবহার করেছে, এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে সংস্থাপনের জন্যে তাকে এই বিদ্যার সাহায্য নিতে হয়েছে এবং হয়। এখন দৃশ্যপ্রধান প্রচার মাধ্যমগুলোর দাপটে, এবং নানা কারণে বিক্ষিপ্তমনা উপভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে সংগীত বা আবৃত্তির মতো শ্রুতিনির্ভর শিল্পগুলিও দৃশ্যমানতাকে আশ্রয় করতে চায়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে, সঙ্গে পোশাক আলো প্রভৃতির সাহায্যও নেওয়া হয়। পুজোর গানগুলির দৃশ্যময় বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে টেলিভিশনে, সেখানেও পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন কোরিওগ্রাফার। তাই আপাতত এই শিল্প বৃদ্ধির পথে, কমবার কোনো লক্ষণ নেই।

কোলাজ

পরিতোষ সেন

ফরাসি ভাষায় Coller (ক্রিয়াপদ) শব্দের অর্থ আঠা দিয়ে কিছু লাগানো, কিংবা জোড়া। তার থেকেই বিশেষ্য Collage।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের জনক সেজানের (Cazanne) মৃত্যু সাল ১৯০৬। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত এ যুগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন 'কিউবিজ্‌ম্'-এর অত্যাশ্চর্য বিকাশ প্রথমে পিকাসো (Picasso), ব্রাক (Braque) এবং স্বল্পকাল পরে প্যারিসবাসী আরেক প্রখ্যাত স্পেনীয় চিত্রকর জুঁয়া গ্রি-র (Juan Gris) তুলিতে। কিউবিজ্‌মের প্রভাবে চিত্রে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে এমনকি, সাহিত্যে যে নতুন নান্দনিক আবিষ্কার এবং মূল্যবোধ সমূহ শিল্পজগতে এক বিরাট আলোড়ন তুলেছিল এবং যার ফলে দৃশ্যমান জগৎকে এ যুগের মানুষ সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে শিখল, তার রেশ প্রকাশ্য এবং পরোক্ষভাবে এখনো আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে চলেছে।

১৯১২ সালের প্রথমার্ধে পিকাসো একটি ছোটো ছবি আঁকেন। ছবিটির নাম হল 'Still life with chair-caning'। ছবিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বেতের তৈরি চেয়ারের সিট্‌টি (seat) রঙ-তুলিতে আঁকার পরিবর্তে সেখানে বাস্তবকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে, হুবহু বেতের নক্‌সা ছাপা একটুকরো অয়েল-ক্লথ কেটে ক্যানভাসের ওপর পিকাসো আঠা দিয়ে সেঁটে দেন। কিউবিজ্‌মের ঐতিহাসিকদের মতে এটিই নাকি প্রথম কোলাজ (Collage) চিত্র। অর্থাৎ এটিই প্রথম এমন একটি ছবি যার সমতলপটে রঙ ছাড়াও অন্য বহিরাগত (extraneous) পদার্থ কিংবা উপকরণ (materials) ব্যবহৃত হল। রঙ ও চিত্রপট-সংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যানধারণায় ঘটল এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন।

একই বছরের (১৯১২) সেপ্টেম্বর মাসে পিকাসোর সহকর্মী ব্রাক্ একটি ড্রইং আঁকলেন, যার নাম হল Compotier et verre অর্থাৎ ফল রাখবার পাত্র (fruit dish) এবং একটি গ্লাস। এই ছবিটির পশ্চাৎপটে, রঙ-তুলির ব্যবহারে কাঠের প্যানেল (wooden panelling) আঁকার পরিবর্তে, হুবহু কাঠের প্যানেলের মতো ছাপ মারা তিন টুকরো ওয়াল পেপার (wall paper) সরাসরি ক্যানভাসের ওপর সেঁটে দিলেন। এটি হয়ে রইল সর্বপ্রথম papier (কাগজ) colle (সেঁটে দেওয়া, coller-এর ক্রিয়া-বিশেষণ) চিত্র। পিকাসো এবং ব্রাক-কৃত ছবি দু'টির মধ্যে লক্ষণীয় তফাত এই যে,

একটিতে ব্যবহার হল ছাপা অয়েল ক্লথ, আরেকটি ছাপা ওয়াল পেপার—কিন্তু উদ্দেশ্য দুইয়ের ছিল এক। এখন দেখা যাক উদ্দেশ্যটি কী।

পিকাসো এবং ব্রাকের মধ্যে নানা ধরনের কথাবার্তার এখানে-ওখানে উল্লেখ আছে। এক জায়গায় ব্রাক্ বলছেন যে, ধরা যাক খবরের কাগজ পাঠরত একটি লোকের ছবি আঁকা হচ্ছে। শিল্পী কি সংবাদপত্রটি রঙ-তুলির মাধ্যমে হুবহু নকল করবেন (Simulation of Reality), না সরাসরি এক টুকরো সংবাদপত্র কেটে, সেটিকে ক্যানভাসে সেঁটে দিয়ে কাজটিকে আরো সহজ এবং সংক্ষেপ করে তুলবেন? এই আলোচনায় ব্রাক্ হাউস্ পেন্টারদের (house painter) দ্বারা ব্যবহৃত মার্বেল পাথরের কিংবা কাঠের টেক্সচার কিংবা গ্রেন-সম্বলিত ওয়াল পেপারের কথা তোলেন, কারণ, তাঁর পেশাদারি হাউস পেন্টার পিতার অধীনে বাস্তবের অনুকরণে মুদ্রিত এইসব কাগজ বাড়ির দেয়ালে সেঁটে দেওয়ার কাজ কিছুদিন ধরে তিনি শিখছিলেন। এছাড়াও যে আরেকটি ভাবনা এই দুই শিল্পীর মনে ঘোরাফেরা করছিল, সেটি হল এই যে, আরেকটি নিতান্ত বুদ্ধিভিত্তিক কিউবিস্ট ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বাহ্যিক বাস্তবের (External Reality) সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন না করা। এই মনে করে পিকাসো একটি কাল্পনিক অবয়ব (portrait)-চিত্রে সত্যিকারের কোটের বোতাম লাগিয়ে দিলেন। কিংবা তাঁর অঙ্কিত আরেকটি এ ধরনের ছবিতে গোঁফ সেঁটে দিলেন। একদিকে তৈরি হল তাঁর অঙ্কিত সমতল চিত্রপটের সঙ্গে ত্রৈমাত্রিক বাস্তব পদার্থের এক নতুন সম্পর্ক, অন্যদিকে তৈরি হল কিউবিস্ট ভাবনায় নির্মিত স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-contained), গঠনমূলক বস্তুসমূহ (cotstructed objects)। বলা বাহুল্য, এই গঠন পদ্ধতি কিউবিজ্মের একটি বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাছাড়া ছবিতে এই প্রথম এল নানারকম টেক্সচারের ভূমিকা। নানা প্রকার কাগজের টেক্সচার ছাড়াও শিল্পীরা রঙের সঙ্গে বালি মিশিয়ে চিত্রপটে সমতল জমির পাশে তৈরি করলেন খড়খড়ে (rough) জমির বিরোধিতা (contrast)। সঙ্গে সঙ্গে অচেতনভাবে ঘোষিত হল রীতিগত তৈল-চিত্রের (conventional oil painting) বিরুদ্ধে এক আপসহীন জেহাদ, যার ফলে চিত্রকলায় এল এক আমূল পরিবর্তন। অর্থাৎ ছবি এতদিন শুধু যে রঙ এবং ক্যানভাস-এর মিলনক্ষেত্র বলে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে এল কাগজ ছাড়াও নানা বহিরাগত বস্তুর ব্যবহার এবং যে কারণে পরবর্তীকালে কোলাজের বিকল্প নামকরণ হল 'art of assemblage'। অর্থাৎ চিত্রপটে দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার উপযুক্ত জিনিসকে একত্র করা। কোলাজ, পাপিয়ে কোলে কিংবা দেকুপাজ—এ তিনটি প্রথার মধ্যে কোনো মৌলিক তফাত নেই, অর্থাৎ এ তিন প্রথাতেই আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়ার ক্রিয়াটি সাধারণ, যদিও উদ্দেশ্য এক নয়।

কোলাজের নান্দনিক তাৎপর্য যে খুবই ব্যাপক ছিল এবং এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর শিল্পের বহুমুখী বিকাশকে যে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কোলাজের যৌক্তিক উপসংহার (logical conclusion) হল কিউবিজ্মের পরবর্তী আন্দোলন দাদাইজম্ (Dadaism)। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন

এই আন্দোলন ছিল সুচিন্তিতভাবে পুরোপুরি শিল্পবিরোধী (Anti Art)। অর্থাৎ তাবৎ শিল্পের মূল্যবোধের এক তীব্র ওলটপালট।

কোলাজের কথা বলতে গিয়ে পিকাসো এবং ব্রাকের সমসাময়িক আরেক শিল্পী অঁরি মাতিস (Henry Matiss) এবং তাঁর কৃত decoupage, অর্থাৎ কাঁচি কাটা রঙিন কাগজ ক্যানভাসে সেঁটে মস্ত বড়ো রচনাসমূহের কথা বলা নি প্রয়োজন মনে করি, যদিও পিকাসো, ব্রাক এবং জুয়াঁ গ্রি-কৃত কিউবিস্ট কোলাজ-স থেকে মাতিসের কাগজ কেটে লাগাবার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাতিস ছিলেন দ্বি চিত্রপটে রঙিন কাগজের নানা মূর্ত ও বিমূর্ত আকার (shape) এবং রঙের পার এবং সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় আগ্রহী। তাঁর এই রচনাসমূহ মৌলিকত্বে পি এবং ব্রাক-কৃত 'কোলাজ' এবং 'পাপিয়ে কোলে' রচনাসমূহের চাইতে কোনো কম নয় এবং তার প্রভাব এতই ব্যাপক ছিল ও আছে যে নানা দেশে আজও ব্যবহার পরিলক্ষিত।

ষাট-সত্তর বছরে কোলাজের সম্ভাবনাসূচক শক্তি যে এখনো নিঃশেষিত হয়ে তার প্রমাণ নিউইয়র্কবাসী কৃষ্ণকায় শিল্পী Romare Bearden-এর কোলাজ অসাধারণ এবং অভিনব কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁরা কোলাজ রচনা করেছেন, ত মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর রচিত, আ ছোটো হলেও, বেশকিছু খাসা কোলাজ-চিত্র শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে। অ অনুজ যে শিল্পীরা এই কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বর্তমান লেখক, গুজরাল, বিকাশ ভট্টাচার্য, রবীন মণ্ডল প্রমুখ।

কোল্ডওয়ার

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক অঘোষিত যুদ্ধ চলেছিল। এরই নাম ঠাণ্ডা যুদ্ধ, কারণ এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে সরাসরি কোনও সামরিক সংঘাত ঘটেনি। গোড়ার দিকে এই লড়াই মূলত দু'টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কালক্রমে এটি পর্যবসিত হয় ধনতান্ত্রিক বনাম সমাজতান্ত্রিক শক্তিজোটের এক দীর্ঘ, অঘোষিত যুদ্ধে। গোড়া থেকেই এই ধারণাটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজম অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এই 'লাল আতঙ্ক' বা 'লাল জুজু'কে রুখে দেওয়ার জন্য তৎপর ও উদ্যোগী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের নির্দেশ কমিউনিজমের গতি রোধ করার এই নীতি ইতিহাসে 'ট্রুম্যান নীতি' নামে পরিচিত এবং এভাবেই সূত্রপাত হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধের। ১৯৪৭ সালে মার্কিন কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে মার্কিন ধনকুবের ও রাষ্ট্রপতির এক পরামর্শদাতা, বারনার্ড বারুচ্ প্রথম 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করেন।

১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে একদিকে যেমন দুই বৃহৎ শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সামরিক ভারসাম্য, অপরদিকে শুরু হয় কমিউনিজমের প্রসার ও কমিউনিজমকে রোখার এক দীর্ঘস্থায়ী অঘোষিত যুদ্ধ, যা ১৯৪৯ সালে চিন বিপ্লবের পর আরো এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। এই যুদ্ধ তীব্রতম আকার ধারণ করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এবং নব্বই দশকের প্রারম্ভে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়।

কার্যকরভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, যখন পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজমকে রোখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্ল্যান-এর মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমি দেশগুলিকে মার্কিন অর্থ সাহায্য প্রদান করে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় অর্থনীতিতে তার নিয়ন্ত্রণকে কায়েম করে। এই বিপুল আর্থিক সাহায্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম ইউরোপের ভেঙে যাওয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠন, যাতে বিধ্বস্ত আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই সব দেশে কমিউনিজম মাথা চাড়া না দিতে পারে। এক বছর পরে ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের প্রধান কয়েকটি দেশকে নিয়ে 'ন্যাটো' (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা) সামরিক জোট। শুধুমাত্র ইউরোপে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে সচেষ্ট হয় লাতিন আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতেও কমিউনিজমের অগ্রগতিকে রোখার জন্য যে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী সরকারকে উচ্ছেদ করতে। এইভাবে ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায়, ১৯৬৫ সালে কিউবার বিপ্লবের পরে ডমিনিকান রিপাবলিকে ও ১৯৭৩ সালে চিলিতে প্রগতিশীল সরকারকে কখনো সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে কিংবা পরোক্ষভাবে সামরিকবাহিনী ও প্রশাসনকে মদত যুগিয়ে উচ্ছেদ করা হয়।

১৯৫৫ সালে 'ন্যাটো'র জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় ওয়ারশ চুক্তির নামে পালটা সামরিক জোট। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে এবং ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপে নতুন শক্তিজোটকে ভেঙে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে সমাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণের নামে নতুন যে কোনো শক্তির উত্থান আসলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিন মদতপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যুক্তিকে সামনে রেখেই ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ জোটের সাময়িক হস্তক্ষেপের পরে ঘোষিত হয় ব্রেজনেভ নীতি, যার মর্মার্থ হল যে পূর্ব ইউরোপের যে কোনো দেশে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র বিপন্ন হলে সেই দেশকে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করার অধিকার ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলির থাকবে। এইভাবে ইউরোপের দেশগুলিকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তীব্র হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয় সংস্কৃতি ও মতাদর্শগত স্তরে দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক আক্রমণ ও বিদ্বেষ। ঠাণ্ডা যুদ্ধ কোনো সময়েই প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষের রূপ নেয়নি, তবে ১৯৬২ সালে কিউবাতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় সরাসরি সংঘাতের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মিখাইল গর্বাচভের নেতৃত্বে যে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তার পরিণতিতেই শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৮৯ সালে ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের এক সম্মেলন থেকে প্রথম ঘোষণা করা হয় যে এই দেশগুলি তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করে নেওয়ার পক্ষে কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না। ১৯৯০ সালে ঘটে দুই জার্মানির পুনর্মিলন। ২১শে নভেম্বর ১৯৯০ সালে এর পরেই ইউরোপের ৩৪টি দেশ প্যারিস সম্মেলনে ঘোষণা করে যে ইউরোপের দীর্ঘদিনের সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটল। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে ওয়ারশ জোটের ও ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়।

ক্লোনিং

রূপককুমার ভদ্র। অর্জুন সাহা

ক্লোনিং শব্দটা আজকাল সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা নয়। অত্যন্ত সহজভাবে বলতে গেলে কোনও কিছুর অনন্য বা অভেদ অনুলিপি নির্মাণ করাকে ক্লোনিং বলে।

অণুজীববিজ্ঞানে ক্লোনিং-এর আবির্ভাব সত্তরের দশকে। কোষ জীববিদ্যার সংজ্ঞানুযায়ী ক্লোনিং বলতে এক সময় অসংখ্য কোষ সমষ্টি থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট কোষকে পৃথক করে, তার থেকে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অসংখ্য সদৃশকোষ সৃষ্টি করাকে বোঝাত। অনুরূপে কোষের ভেতরকার ক্রোমোজোম থেকে একটি নির্দিষ্ট ডি. এন. খণ্ডকে (জিন) পৃথক করে কোনো সজীবকোষের মধ্যে (সাধারণত ই কোলাই ব্যাকটেরিয়া) তার অসংখ্য অনুলিপি নির্মাণ করাকে ডি এন এ ক্লোনিং বলা হয়। এখানে বলে রাখা ভালো ক্রোমোজোম হল বংশগতির ধারক ও বাহক যা ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিইক অ্যাসিড (ডি এন এ) দিয়ে গঠিত। ডি এন এ-তে আবার চার রকমের বেস থাকে; অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন্, ও সাইটোসিন্। ওই চার রকমের বেস বিভিন্ন সজ্জাক্রমে সজ্জিত থাকে ডি এন এ সূত্রে। কোষের বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত কিছুর তথ্য ভাণ্ডার হল এই ডি এন। ফলে জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জৈবিককার্যের কারণ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে জিন স্তর অবধি বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ল। বাধা হয়ে দাঁড়াল ক্রোমোজোমের বিশাল দৈর্ঘ্য। কোষস্থ ক্রোমোজোমে অবস্থিত লক্ষাধিক জিনের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট জিন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে শুরু হল বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা। ফলস্বরূপ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে একের পর এক কৌশলের উদ্ভাবন হয়, যার মধ্যে ডি এন এ ক্লোনিং অন্যতম এবং একত্রে সবগুলোকে রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ টেক্‌নোলজি বলে। নিম্নলিখিত সাধারণ পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে ডি এন এ ক্লোনিং করা হয়।

১. ডি এন এ সূত্রকে নির্দিষ্টস্থানে খণ্ডিত করা। এই কাজটি করা হয় রেস্ট্রিক্‌শন এন্ডোনিউক্লিয়েজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে। বিজ্ঞানীরা আদর করে যার নাম দিয়েছেন 'আণবিক কাঁচি' বা মলিকুইলার সিজার।

২. যে ডি এন এ খণ্ডটিকে ক্লোন করতে হবে সেটিকে একটি সেল্‌ফ রেপ্‌লিকেটিং ডি এন এ খণ্ডের সঙ্গে 'ডিএনএলাইগেজ' নামক উৎসেচকের

সাহায্যে সংযুক্ত করা। এই 'সেল্‌ফ রেপ্‌লিকেটিং' ডিএনএ হিসাবে সাধারণত 'প্লাস্‌মিড', 'ভাইরাল ডিএনএ' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এক কথায় যাদের 'ভেক্টর' বলা হয়। ভেক্টর এবং এর সঙ্গে যুক্ত ডিএনএ খণ্ডকে একত্রে 'রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ' বলা হয়।

৩. তারপর ঐ রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ-কে টেস্টটিউব থেকে কোনো একটি ধারক কোষে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে তার রেপ্লিকেশনের উপযোগী সমস্ত 'এনজাইমেটিক মেশিনারি' বর্তমান।

৪. রিকমিম্বন্যান্ট ডি এন এ সম্বলিত ধারক কোষগুলিকে পৃথকীকরণ এবং সনাক্তকরণ।

একটা উদাহরণের সাহায্যে উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি খুব সহজে বোঝানো যায়। মনে করা যাক আমরা মানুষের সমগ্র ক্রোমোজোম থেকে একটা নির্দিষ্ট জিনকে, যার কিনা শুধুমাত্র একটি কপিই আছে, ক্লোন করতে চাই। তাহলে প্রথমেই 'রেস্ট্রিক্‌সন্ এন্ডোনিউক্লিয়েজের' সাহায্যে ঐ ডি এন এ-কে ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করতে হবে। এরপরে ঐ প্রত্যেকটি খণ্ডকে একটি ভেক্টরের সঙ্গে যুক্ত করে ধারককোষের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। এখন প্রশ্ন হল কত ব্যাকটেরিয়াল কলোনি প্রয়োজন যার প্রত্যেকটির মধ্যে অন্তত একটি রিকমিন্যান্ট ডি এন এ থাকবে। মনে করা যাক কোন একটি নির্দিষ্ট রেস্ট্রিক্‌শন এনজাইম ৪০০০ বেস পেয়ার অন্তর অন্তর ডিএনএকে খণ্ডিত করতে পারে এবং এটা জানা আছে যে মানুষের হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজামের সাইজ ২.৮×১০^{৬} কিলো বেস পেয়ার। সুতরাং অন্তত ২.৮×১০^{৯} + ৪০০০ = ৭×১০^{৫} ব্যাক্‌টেরিয়াল কলোনি দরকার যাতে আমরা অভীষ্ট জিনের ক্লোন পেতে পারি। ঐ সমগ্র ব্যাকটেরিয়াল কলোনির মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ মানবক্রোমোজোমের বিভিন্ন খণ্ড থাকছে। সেই জন্যেই অণুজীববিজ্ঞানের ভাষায় ঐ সমগ্র ব্যাক্‌টেরিয়াল কলোনি, যার মধ্যে রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ রয়েছে তাকে বলা হয় জিন লাইব্রেরি বা জিনব্যাঙ্ক।

আগামী দিনে ডি এন এ টেক্‌নোলজির সম্ভাবনা এতটাই যে বিজ্ঞানীরা একবিংশ শতাব্দীকে ডি এন এ-র শতাব্দী বলছেন। বেশ কিছু অণুজীবের সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সজ্জাক্রম নির্ণয় করা হয়েছে। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে মানবকোষের সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সজ্জাক্রম নির্ণয়। ডি এন এ ক্লোনিং টেক্‌নোলজি শুধুমাত্র টেস্টটিউব বা ল্যাবরেটরিতেই সীমাবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শিল্প তথা মানুষের ঘরে ঘরে। সর্বাপেক্ষা প্রভাব পড়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। বিভিন্ন দুরারোগ্য সব রোগ নিরাময় সম্ভব হবে 'জিন থেরাপি' কাজে লাগিয়ে। উদ্ভাবন হয়েছে নতুন নতুন রোগনির্ণয় পদ্ধতি। জীবনদায়ী বিভিন্ন ওষুধ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে জীব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। বিপুল পরিবর্তন এসেছে কৃষিক্ষেত্রে। উচ্চফলনশীল তথা উন্নত খাদ্যগুণসম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগিয়ে। বিভিন্ন ফরেনসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও আজকাল রিকম্বিন্যান্ট ডি এন এ টেকনোলজির প্রভূত সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে রেজিলিন ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানী উইলমট ও

তাঁর সহকর্মীদের সৃষ্টি 'ডলি' নামক মেষ। জননকোষের ডি এন এ ব্যতীত দেহকোষের ডি এন এ টেকনোলজি এগোচ্ছে—আগামীদিনে সম্পূর্ণ মানুষ ক্লোন করাও হয়ত সম্ভব হবে। জানা নেই আবির্ভাব হবে কিনা কোনও ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের; তবে এইসব সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছে। তবে আমরা আশা করব ভবিষ্যতে যা হবে তা যেন মানুষের কল্যাণের জন্যেই হয়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে দেশ নেতাদের দায়িত্বও অনেকখানি।

খ্রিষ্টধর্ম

অম্লান দাশগুপ্ত

এক অর্থে খ্রিষ্টধর্মের উত্থান যিশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর পর থেকে। যদিও এই ধর্মের প্রধান আকর যিশুর জীবন এবং কর্ম, এর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বজনীনরূপে বিকাশ তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টার ফলেই হয়। প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশে যিশুর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। খ্রিষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' অংশে তাঁর জীবনের যে আখ্যানগুলি রয়েছে, তার থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রিষ্টের জন্ম বেথেলহেম শহরে হয়েছিল এবং তারই নিকটবর্তী জনপদগুলি ঘিরেই তাঁর কর্মজীবন। জন্মসূত্রে যিশু ইহুদি ছিলেন এবং পেশায় ছুতোর হওয়া সত্ত্বেও ইহুদি ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অধিকার অন্যদের মনে বিস্ময় জাগায়। কোনোদিনই তিনি এই ধর্ম স্পষ্টভাবে ত্যাগ করেননি। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁর অনুগামীদের অধিকাংশ নিজেদের ইহুদি ব্যতীত কিছু ভাবতে পারতেন না। আবার ইহুদি ধর্মনেতা ও সমাজপ্রধানদের বৈরিতার ফলে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

খ্রিষ্টধর্মের স্বতন্ত্র ও সাংগঠনিক রূপ যিশুর মৃত্যুর পর থেকে। জীবদ্দশায় তিনি কোনো সংগঠন সৃষ্টি করেছিলেন বলে জানা যায় না। এমনকী তাঁর বহু ভক্ত এবং কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটি ধর্মগোষ্ঠীর প্রণেতা হিসেবে মনে করা যায় না। 'নতুন নিয়মে'র চারটি সুসমাচার-এর যিশুর দীক্ষাস্নান, তাঁর অলৌকিক কর্মাবলি, তাঁর শিক্ষা, প্রথাগত ইহুদি ধর্মমতের সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং তাঁর ক্রুশে আত্মবলিদান সম্বন্ধে জানা যায়; যদিও চারটি আখ্যানের বিবরণের মধ্যে নানান প্রভেদ আছে। এছাড়া দেবদূতের মুখে যিশুর আগমনের প্রাক্-সংবাদ এবং মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের কথা পাওয়া যায়, যদিও সব কটিতে নয়। মনে রাখা ভালো যে সুসমাচারের উপাখ্যানগুলি বর্তমান রূপ পায় যিশুর মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে।

সাধু পৌলের পত্রাবলিতে খ্রিষ্টধর্মের স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই। এই অর্থে তিনি 'খ্রিষ্টধর্মের' প্রণেতা। কেননা তিনি যিশুর জীবন এবং কর্ম থেকে একটি সুসংবদ্ধ ধর্মীয় দর্শন সৃষ্টি করেন। প্রথমেই বলতে হয় যে তাঁর লেখায় যিশুর জীবন দিয়ে বিশেষ তত্ত্ব বা আগ্রহ নেই। তাঁর কাছে যিশু ঈশ্বরপুত্র, মানুষের ত্রাণকর্তা। পরিত্রাতা-কেন্দ্রিক একেশ্বরবাদরূপে খ্রিষ্টধর্মের প্রকাশ পৌলের পত্রে। তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল খ্রিষ্টের মানুষের জন্য আত্মবলিদান। এর মাধ্যমে মানুষের

নতুন জীবনের সম্ভাবনা এবং অধিকার জন্মায়। খ্রিষ্টের বাণী শুধুমাত্র ইহুদি সমাজের জন্যে নয় : এই সত্য, পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনে সমানভাবে প্রযোজ্য। পৌল সূচনা করেন একটি 'বিশ্ব-ধর্মের' যা গোষ্ঠী, জাতি, দেশ, কালের বন্ধন অতিক্রম করে এক সর্বজনীন জীবনদর্শন তুলে ধরে। পাপ এবং মৃত্যুর থেকে পুনর্জন্ম, মানুষের অন্তঃস্থিত সত্তার পুনর্গঠনের ও নবীকরণের কথা পৌলের লেখায় বার বার ফিরে আসে।

মানবজাতির কল্যাণের জন্য ঈশ্বরপুত্র যিশুর মৃত্যুবরণ এবং এই মধ্যস্থতার ফলে মানুষের পাপ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা পৌলের কাছে এক অনন্য স্বাধীনতার সংজ্ঞা। ইহুদি ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর তার আইনব্যবস্থা। মানুষের জীবন নানারকম বিধিনিষেধ দ্বারা সঞ্চালিত : এর মূলে আছে প্রাচীন ইহুদি ঋষিদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাপত্র। পৌলের চোখে আইনের বিধিনিষেধ এক ধরনের বন্ধতা, যার থেকে মুক্তির উপায় খ্রিষ্টের শরণ। 'প্রাচীন নিয়মের' জীবন কারাবাসের অনুরূপ, 'নতুন নিয়মে'র বার্তা স্বাধীনতার। বাহ্যিক নিয়মপালনের পরিবর্তে অন্তরে শুদ্ধতার কথা পৌল বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হয় খ্রিষ্টের 'পর্বতে উপদেশ' অধ্যায়ে (মাথ্‌থাই, ৫-৭) নীতিশিক্ষা এবং তাঁর 'প্রধান নির্দেশ'। মানুষের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে, এবং অপরকে ভালবাসতে হবে নিজের মতো করে। (লুক ১০ : ২৭)। ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেম—এর যৌথ দায়িত্ব মানবজীবনের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত হয়।

পৌলের লেখার মূল কয়েকটি ঝোঁক সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা গেলেও, তাঁর চিন্তার অনুপুঙ্খ বিচার করা অতি দুরূহ কাজ। খ্রিষ্টধর্মের দু-হাজার বছরের ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে বাইবেলের উপর। আমরা দেখেছি যে 'নতুন নিয়মে'র মধ্যেই অনেক বৈচিত্র্য, নানাসূত্রের সমাবেশ। অথচ খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারার অশেষ বিবিধতা—যা কখনো আলোচনা, কখনো বিতর্ক, কখনো বা দ্বন্দ্ব-কলহ-বিচ্ছেদ-অবদমনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়—স্বপ্রমাণ খোঁজে এক-ই পাঠে। তাই খ্রিষ্টধর্মের বিকাশ ভিন্ন থেকে ভিন্নতর ব্যাখ্যার উপর ভর করে। কখনো একেবারে নতুন মত খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারায় প্রবেশ করে, কখনো বা পুরোনো চিন্তাধারা নতুনের রূপ ধরে আসে। তাই খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারার মূলসূত্রগুলি আমাদের মনে করতে হয় প্রশ্নের মতো করে। দুঃখ-দুর্দশার প্রতিনিয়ততার থেকে মানুষের পরিত্রাণ কীভাবে হয়? ঈশ্বর কাদের পরিত্রাণ করবেন? ঈশ্বরলাভের সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক কী? পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির মতো খ্রিষ্টধর্ম মানুষের জীবনকে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য দিতে চেয়েছে, যদিও এই লক্ষ্য কী তাই নিয়ে বিবাদ এবং মতনৈক্যের শেষ নেই। একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, একজন ত্রাণকর্তা এবং একগুচ্ছ পাঠ—খ্রিষ্টধর্মের এইগুলি মূলগত বিষয় হলেও আমরা জানি যে খ্রিষ্টধর্মের গোড়া থেকেই তার মতাদর্শের বিকাশ হয়েছে নানারকমের বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। এরই জেরে কখনো খ্রিষ্টীয় সমাজ মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়েছে, কখনও বা তার প্রত্যন্তস্থিত গোষ্ঠী মূলধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খ্রিষ্টধর্মের সামাজিক ইতিহাস

দেখতে গেলে নানা সমস্যার কথা ওঠে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় সমাজের রূপাদর্শগুলি বা তার আচরণপ্রথার সাফল্য বা সীমাবদ্ধতার আলোচনা এখানে অবান্তর।

খ্রিষ্টধর্মের ভেতরে যেমন মানুষের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের করুণার প্রসঙ্গগুলি নাটকীয় এবং তাৎক্ষণিক আকার নেয়, বাইরে থেকে দেখলে এগুলিকে দার্শনিক তত্ত্ব বলে মনে করা যায়। তবে যে কোনো নিরিখেই মনে হয় যে খ্রিষ্টধর্মে মানবজীবনের অপূর্ণতা এবং দুর্বলতার একটি বিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে পাওয়া যায় এই নশ্বর জীবের অমরত্বের স্পৃহার কথা। তাই পরিবর্তন—তা আকাঙ্ক্ষায় সীমিত থাক, বা অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হোক—খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ আমাদের চিনতে সাহায্য করে।

গঠনবাদ

রাহুল দাশগুপ্ত

গঠনবাদী চিন্তার বীজকে প্রথম বপন করেন সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩)। ১৯০৬-১১, তিন দফায় জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোস্যুর ভাষাতত্ত্বের যে পাঠ দেন, সেইসব বক্তৃতার নোটপত্র সংকলিত করেই সোস্যুরের মৃত্যুর তিন বছরেরও কিছু সময় পরে ১৯১৬-য় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিকস* প্রকাশিত হয়। সোস্যুরের দুটি মূল প্রশ্ন ছিল, 'ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কী' এবং 'শব্দ ও বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক কী!'

সোস্যুরের মতে, শব্দ হল মূলত চিহ্ন। ভাষাতত্ত্বই মূল চিহ্নবিজ্ঞান, যা দিয়ে অন্যসব চিহ্নকে পড়া সম্ভব। লেখ্য বা কথ্যভাষা নির্বিশেষে এই ভাষা-চিহ্নের একটি অংশ হল চিহ্নক (সিগনিফায়ার) এবং অপরটি চিহ্নন (সিগনিফায়েড)। চিহ্নক-চিহ্ননের মেল নেহাত কাকতালীয়, আপতিক, সাময়িক কোনও চুক্তির ফল। বস্তুজগতের সঙ্গে ভাষারাজ্যের কোনো প্রাঙ-নিষ্পন্ন মৌল সম্বন্ধ নেই। তাই হুবহু এক বস্তুকে নির্দেশ করতে 'কুকুর', 'কানিস', 'শ্বন', 'হনড', 'ডগ', 'শিয়'র মতো আলাদা অসংখ্য চিহ্নকের শরণ নিতে হয়। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে বস্তুজগতের অবিকল পঠন-পাঠন অসাধ্য, যা রয়েছে তা শুধু চিহ্নক-চিহ্নন, ভাষাচিহ্ন ও বস্তুর মধ্যে ভঙ্গুর আন্তসম্পর্ক।

সোস্যুর আরও বলেন, ভাষায় আছে শুধু ভেদ বা ব্যবধান, ইতিবাচক কোনও চিহ্নই নেই সেখানে। 'কুকুর' চিহ্নকে 'কুকুর' নেই, 'কুকুর' বলতে আমরা বুঝি, সেটা উট, ঘোড়া, টেবিল নয়, বরং ইত্যাদি আরও ঢের কিছুর নেতিফল। এইভাবে এক বস্তুর সঙ্গে অন্যবস্তুর পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমেই লক্ষ্যবস্তুর অর্থ প্রতীয়মান হয়।

সোস্যুরের মতে, যে-কোনো জীবন্ত ভাষাই যুগপৎ দুটি মাত্রায় বর্তমান। স্থানানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক। স্থানানুক্রমিক বিস্তারে স্থান পরিবর্তনশীল, সময় স্থির বা নির্দিষ্ট। কালানুক্রমিক বিস্তারে সময় পরিবর্তনশীল, স্থান নির্দিষ্ট। সোস্যুরের দুটি যুগান্তকারী পারিভাষিক প্রয়োগ হল 'লাং' এবং 'পারোল'-এর ধারণা। বাচন বা পারোল বলতে ভাষার ব্যক্তিক প্রয়োগ-বিনিয়োগকে বোঝায়, যা বহু, পরিবর্তনশীল, বিষয়ীনিষ্ঠ ও অসমসত্ত্ব। অন্যদিকে লাং বা ভাষাতন্ত্র হল একধরনের ব্যবস্থা, যা সেইসব নিয়মের সমষ্টি যাদের সাপেক্ষেই কেবল অর্থবহ হয় ব্যক্তি-উচ্চারণ ও পারস্পরিক বিনিময়। ভাষাতন্ত্র একক, ধ্রুবক, বিষয়নিষ্ঠ ও সমসত্ত্ব। এই বদ্ধ ও চিরস্থায়ী ভাষা-ব্যবস্থার

এলাকাভুক্ত বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মই ভাষার একমাত্র নিয়ম। মানুষ কথা বলে ঠিকই।

কিন্তু বলে, কোনো স্বসম্পূর্ণ ভাষাব্যবস্থার নিঃশব্দ নির্দেশ মেনে। 'কালানুক্রমিক', 'স্থানানুক্রমিক', 'বাচন', 'ভাষাতন্ত্র'—এই চার তত্ত্বমূলের দুটিকে বেছে এবং দুটিকে বর্জন করলেন সোস্যুর। 'ভাষাতন্ত্রের স্থানানুক্রমিক বিশ্লেষণ'—এই বীজমন্ত্রে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন 'গঠনবাদী' ভাষাতত্ত্বের। রেনেশাঁস, এনলাইটেনমেন্ট, রোমান্টিসিজম হয়ে ইউরোপে যে স্বনির্ভর, স্বশাসিত, দম্ভময় ব্যক্তিমূর্তিটি গড়ে উঠেছিল, উদ্ভব হয়েছিল ব্যক্তিবাদী মনস্তত্ত্বের, তাকে সামলাতে 'বাচন' বা 'বিষয়ীসত্তা'র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন সোস্যুর। আবার চিহ্নক ও চিহ্ননের মধ্যে আপতিক ও ভঙ্গুর সম্পর্কের ফলে লোপ পেল 'বিষয়'। এইভাবে 'বস্তুবিষয়' এবং 'ব্যক্তিবিষয়ী'কে বর্জন করার কৌশলের পারিভাষিক আখ্যাই 'গঠনবাদ'।

বিশ শতকের ছয়ের দশকে পাঁচজন দিকপাল ফরাসি চিন্তাবিদ গঠনবাদী চিন্তাকে জনমানসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেন। এরা হলেন, নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভিস্ত্রাউস, ভাবনার ইতিহাসের প্রণেতা মিশেল ফুকো, সাহিত্যতাত্ত্বিক রোলাঁ বার্ত, ফ্রয়েডিয় মনোবিশ্লেষণবিদ জাক লাকাঁ এবং মার্ক্সিয় তাত্ত্বিক লুই আলথুজের। কোনও কিছুর সংগঠক উপাদানগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা নয়, সমগ্রের ওপর ঝোঁক দিয়ে বিভিন্ন অংশের সম্পর্কসূত্রের পর্যালোচনাই হয়ে দাঁড়ায় গঠনবাদীদের মূল কথা।

১৯৫৮ সালে ক্লদ লেভিস্ত্রাউস তাঁর *অ্যানথ্রোপলজি স্ট্রাকচারাল* গ্রন্থে মিথতত্ত্ব বিশ্লেষণের পর থেকেই এই তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। লেভিস্ত্রাউস তাঁর আলোচনায় মানবিক চিন্তার সার্বভৌম স্বভাবের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বার্ত তাঁর *মিথোলজিস, এলিমেন্টস অব সেমিওলজি, রাইটিং ডিগ্রি জিরো* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিভিন্ন বস্তু-সন্নিবেশের মধ্যে পার্থক্যমূলক সম্পর্কই সাধারণভাবে সমস্ত মানবিক প্রক্রিয়ার প্রাকশর্ত। এই মুখ্য সূত্রকে তিনি কার্যত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়ায় প্রয়োগ করে চিহ্নায়নের এক নতুন তাৎপর্য উদঘাটন করতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পোশাক ও খাদ্যের মতো সামাজিক অনুশীলন ভাষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে।

গঠনবাদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন ভ্লাদিমির প্রোপ, এ জে গ্রাইমাস, তোদোরভ, জেরার্দ জেনেট, রোমান জ্যাকোবসন, জোনাথন কুলের, ডেভিড লজ ও নোয়ম চমস্কি। ভ্লাদিমির প্রোপ তাঁর *মরফলজি অব ফোক টেইল* গ্রন্থে (১৯২৮) লোককথার বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে কাঠামোগত বিশ্লেষণের কথা বলেছেন।

অর্থাৎ গঠনবাদী তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ফসল। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরই এই তত্ত্বের তাৎপর্য নিহিত। ভাষা দিয়ে শুরু হলেও যোগাযোগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে তথ্য ও ভাবের আদানপ্রদান ঘটায়, সেই যাবতীয় চিহ্নই এই তত্ত্বের আওতায় পড়ে। উদাহরণ হিসাবে, বিভিন্ন সিগনাল, যেমন, ধোঁয়া, আগুন, ট্রাফিক লাইটস, পতাকা,

অঙ্গভঙ্গি—এছাড়া পোশাক, শিল্পদ্রব্য, রেলওয়ে টাইমটেবিল বা থাম্বস আপ চিহ্ন—এসবই বলা যেতে পারে। সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতার প্রতিফলন—সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘলালিত ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ জানায় গঠনবাদ। বরং এই তত্ত্ব অনুযায়ী, অপরাপর বিভিন্ন পাঠ ও রীতির সংস্থানের ফলেই সাহিত্য পাঠবস্তু গঠিত হয়।

গণনাট্য

শুভেন্দু দাশমুন্সী

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা নাটকে এ নবযুগের সূচনা হল। পূর্ববর্তী পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য থেকে সরে এসে তৈরি হল গণনাট্য সংঘ। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার দায়িত্ব ছিল এই গণনাট্য সংঘের ওপর। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর চলছে তখন। প্রথমে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের শাখা হিসেবে বাংলায় গণনাট্য সংঘ কাজ শুরু করে ১৯৪২ সালে। মুম্বাইতে তার দু বছর আগেই শুরু হয়েছে জননাট্য। ভারতের বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে বিশ্বাসী সংগঠনগুলি ১৯৪৩-এর ২৫ মে তারিখে সংঘবদ্ধ হল একক সর্বভারতীয় সংগঠনের ছত্রছায়ায়। তৈরি হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে আই পি টি এ।

গণনাট্য-র ভাবনাসূত্র নিহিত ছিল ঐতিহাসিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আর বিশ শতকের সূচনায় ফরাসি চিন্তাবিদ রোমা রঁলার বিখ্যাত গ্রন্থ *পিপলস থিয়েটার*-এর মধ্যে। এছাড়া, আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিন থিয়েটার, চিনের রেড থিয়েটার সম্পর্কেও অবগত ছিলেন গণনাট্যের উদ্যোক্তারা। তবে ওইসব নাট্যোদ্যোগেরও প্রস্তাবনা ছিল রোমা রঁলার বিখ্যাত ওই গ্রন্থটি। ওই বইটিকেই কার্যত পিপলস থিয়েটার-এর ইশতেহার বলা হয়ে থাকে।

১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে রঁলা বিশিষ্ট ফরাসি নাট্যপত্র *রিভিউ দি আর্ট ড্রামাটিক*-এ থিয়েটার সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯০৩-এই সেই লেখাগুলি একত্র করে প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায় 'তেয়াত্তর দ পুপ্‌ল' নামে। ১৯১৮তে বইটি অনূদিত হয় ইংরাজিতে। তারও বছর কুড়ি পরে গোটা পৃথিবীতেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগে এই বইটি গৃহীত হতে আরম্ভ করে। জনগণের কাছে প্রয়োগশিল্পকে পৌঁছে দেওয়ার কথা প্রথম বলেছিলেন রুশো। রুশোর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রঁলা উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সেই স্থাপন করেন জনগণের নাট্যমঞ্চ বা মোরিসিয়েল পত্তিশের। জার্মানির ফোক থিয়েটার বা সুইজারল্যান্ডের সেমি দ কর্তেও এক একভাবে পিপলস থিয়েটারের পূর্বসূরি।

রঁলা তাঁর বইয়ের মধ্যে একদিকে বলেছেন পিপলস থিয়েটার কেমন হবে আর তার চরিত্রই বা কী হবে; আর তারই সঙ্গে বলেছেন কীভাবে গড়ে তুলতে হবে সেই নাট্য আন্দোলন। রঁলার মতে গণনাট্যের মূল তিনটি ভিত্তি হল : ১. থিয়েটারকে অবশ্যই বিনোদন হতে হবে ২. থিয়েটারকে অবশ্যই শক্তির উৎস হতে হবে আর ৩. জনগণকে থিয়েটার শিখিয়ে দেবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন পরিস্থিতি। তবে তিনি সাবধানতার সঙ্গে, সম্ভবত ৩ নং শর্তটি লক্ষ করেই দুটি কঠোর নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছেন। ১. নৈতিক শিক্ষা বাদ দাও আর ২. চারুকলার প্রতি ভাসাভাসা নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ যাতে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। গণনাট্যের অভ্যন্তরীণ নৈতিক শর্তের পাশাপাশি এর সংগঠন সম্পর্কেও নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন রঁলা। সেই মাফিক এর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনই ভেবেছেন স্বতন্ত্র মঞ্চব্যবস্থা নিয়েও। পরিষ্কার জানিয়েছেন, গণনাট্য কীভাবে স্থানে স্থানান্তরে সংগঠিত করবে নিজেকে। শহরাঞ্চল থেকে গ্রামে গিয়ে গণনাট্যের অভিনয় করায় এই আন্দোলন সার্থক নয়, বরং গণনাট্য যদি গ্রামজীবনেও তৈরি হয়ে ওঠে, গ্রামীণ জনসাধারণও যদি যুক্ত হয় এই নাট্য আন্দোলনে, তাহলেই এর সার্থকতা।

এই নাট্যাদর্শকে সামনে রেখে গণনাট্য সংঘের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রমে নাট্যবিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পটভূমির বিশ্লেষণ, তার সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে আসা বিপন্ন মানুষের অবস্থাচিত্রণ। অন্যদিকে, কালোবাজারি, গ্রাম ও শহরের মধ্যস্বত্বভোগীদের অর্থগৃধ্নুতাও তাঁদের নাটকের লক্ষ্যবস্তু হয়। মন্বন্তরের সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাদের নাট্যাভিনয়ের দুটি উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়। প্রথমত, আর্ত ত্রাণ তহবিলের জন্য টাকা তোলা, দ্বিতীয়ত, সারা ভারতকে বাংলার মহামারির সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। আর এর মধ্য থেকেই গণনাট্যের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।

বাংলার গণনাট্য সংঘের নাট্যব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, বিনয় ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, তৃপ্তি ভাদুড়ি প্রমুখ। বিজন ভট্টাচার্যের আগুন, জবানবন্দি, নবান্ন : বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্বকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, এখানকার গণনাট্য সংঘ কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নিজেদের কর্মসূচিকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। আবৃত্তি, নাচ, গান, ছায়ানৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োগশিল্পের মধ্য দিয়েই প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, নানাবিধ কারণে গণনাট্য সংঘের কর্মোদ্যোগ শিথিল হয়ে আসছিল ১৯৪৬ থেকেই। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত মতাদর্শগত বিরোধ গণনাট্য সংঘের ভাঙনকালকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল, সেই মোতাবেক ১৯৪৯ সালে নিয়ন্ত্রণ করা হল গণনাট্য সংঘের কার্যকলাপ। ইতিমধ্যে, গণনাট্যের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা নাট্যাভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এমন অনুযোগ তুলে শম্ভু মিত্র সহ বহু দক্ষ অভিনেতারা আই পি টি এ ছেড়ে পৃথক নাট্যদল তৈরি করলেন 'বহুরূপী'

নামে। বিজন ভট্টাচার্যও ১৯৫০-এ তৈরি করলেন আলাদা নাট্যদল। ফলে একদিকে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ ও অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ভাঙনে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কার্যকলাপ প্রায় স্তিমিত হয়ে আসে। তবে গণনাট্য থেকে বেরিয়ে যাঁরা নবনাট্যের সূচনা করেন, সেইসব বিভিন্ন শিল্পীদল নিজ নিজ নাট্যদলের অভিনয়ে গণনাট্যের আদর্শ বহন করেন। এরই মধ্যে ১৯৬৪ সালে চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *গণনাট্য* পত্রিকা।

সাতের দশকে গণনাট্য সংঘ পুনরপি বিপন্নতার মধ্যেই নিজের কাজ ক্ষীণ ভাবে করে চলে আর ১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর গণনাট্যের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়। খাতায় কলমে, শাখা সংগঠনের সংখ্যার বিচারে গণনাট্য শক্তিশালী হয় বটে, কিন্তু সরকারের হয়ে, তাদের মুখপাত্রে পরিণত হয়ে নাট্যাভিনয় করতে গিয়ে গণনাট্য তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের ওপর গণনাট্য তার সম্ভাব্য সদর্থক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নিজেই নিজের হাতে নষ্ট করেছে।

গীতিকা

বরুণকুমার চক্রবর্তী

ইংরেজীতে Ballad যাকে বলে, আমরা বাংলায় তাকেই বলি গীতিকা। তাই বলে ব্যালাড আর গীতিকা সমার্থক নয় যদিও অনেকগুলি বিষয়েই উভয়ের গভীর সাযুজ্য। কাকে ব্যালাড বলব? নানা মুনির নানা মত। কিন্তু সকলেই যে-বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল এর গল্প রস; তারপরই উল্লেখ করতে হয় এর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের— 'A ballad is a song that tells a story' কিংবা 'the traditional ballad is a song that tells a story' in simple verse and to a simple tune. It is the product of no one time or person. its author. if ever known, has been lost in the obscurity of the past and in the processes of oral tradition.'

গীতিকাতেও একটি কাহিনী পরিবেশিত হয় তবে ঔপন্যাসিকের মত বিস্তারিত করে লোককবি তা প্রকাশ করেন না। সংক্ষিপ্ততা-ধর্ম রক্ষা করে চলেন। ফলে অনাবশ্যক ঘটনায় কালক্ষেপণ করা হয় না। অপ্রাসঙ্গিক তথ্যে গীতিকা-র অবয়বকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হয় না। যে ঘটনাটি লোককবির উপজীব্য, যে চরিত্রটির চিত্রায়ন তাঁর উদ্দেশ্য শুধু সেটিকেই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে উপস্থাপিত করা হয়। গীতিকাকে কেউ কেউ লোককথার পর্যায়ে ফেলতে চান। লোককথার স্রষ্টা যেমন অজানা, গীতিকা-রও তাই। দু'টিই ঐতিহ্যাশ্রিত এবং মৌখিক ভাবে সৃষ্ট। কিন্তু লোককথা গদ্যাত্মক রচনা, গীতিকা সেখানে ছন্দোবদ্ধ রচনা। গীতিকা-র নাটকীয়তা শ্রোতাকে, পাঠককে চমৎকৃত করে। নাট্যকার যেমন অন্তরালে থেকে সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথোপকথন সূত্রে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান, গীতিকা-র রচয়িতাও সরাসরি আখ্যানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন না। সম্ভবমত ব্যবধান রক্ষা করে চলেন। নাটক যেমন গতিময়তার গুণে দর্শককে প্রথমাবধি আকৃষ্ট করে, মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে দেয় না, পরিণতিতে পৌঁছে তবেই তার শান্তি, তবেই তার রেহাই, গীতিকা-র পাঠকের অথবা শ্রোতার ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা।

ব্যালাডে Parallelism বা সহচারবাদের অনুসরণ লক্ষণীয়। সহচারবাদ কি? 'Parallelism in phrase and idea...and the favourite way of developing this parallelism is by incremental repetition. Each stanza

repeats the one before it, but with some additions which leads on to the climax.'

গীতিকাতেও এই সহচারবাদের প্রয়োগ দেখি—

পাখী যদি হই তারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্ পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে॥
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালায় বসি॥ (কমলা)

গীতিকা চরিত্রগুলির কথোপকথনে সমৃদ্ধ। তবে নাটক যেমন অবিমিশ্র চরিত্রগুলির কথোপকথনে সমৃদ্ধ, গীতিকা তা নয়, কথোপকথন ব্যতীত কবির নিজস্ব বর্ণনাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই কথোপকথন গীতিকা-র নাটকীয়তা ধর্মকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—

একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই।
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে॥
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা॥
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা।
কতদিনে পূরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা॥ (দেওয়ান ভাবনা)

আমাদের অনেকগুলি গীতিকা-র সঙ্গে পাশ্চাত্যের বেশ কিছু ব্যালাডের গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমাদের 'মহুয়া' পালার সঙ্গে মিল পাই 'ট্রিস্টান ও ইসল্ট' এর। নদ্যার চাঁদ এবং মহুয়া আরণ্যক জীবন যাপন করছিল, ট্রিস্টান ও ইসল্টও গাছের পাতা সংগ্রহ করে ঘর বেঁধেছিল। অরণ্য অভিসার চিত্রে দুটি আখ্যানের সুগভীর মিল। ট্রিস্টান ও ইসল্টের সন্ধানে কিংমার্ক শিকারী কুকুরের সহায়তা নিয়েছিল হুমরা বেদেও তেমনি কুকুরের সাহায্যে আত্মগোপনকারী মহুয়া ও নদেরচাঁদের সন্ধান পেয়েছে। মহুয়া ও নদেরচাঁদের করুণ মৃত্যুর পর হুমরা বেদে অনুতপ্ত হয়েছে, বেদনাশ্রু নির্গত হয়েছে তার দুচোখে, অনুরূপভাবে কিংমার্কও ট্রিস্টান ও ইসল্টের কবর নির্মাণ করে দিয়েছে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের জল ফেলেছে। 'দেওয়ানা মদিনা' পালার সঙ্গে 'Butcher Boy' গীতিকা-র মিল রয়েছে। মদিনাকে ত্যাগ করে তার স্বামী দুলাল সেকেন্দর দেওয়ানের পাণিগ্রহণ করেছে। পতিশোকে উন্মাদিনী মদিনা অকালে প্রাণত্যাগ করেছে। Butcher Boy-তে দেখি চর্মকার-পুত্র তার প্রেমিকাকে ত্যাগ করে অর্থের লোভে অন্য এক রমণীকে বিবাহ করেছে। শোকে প্রেমিকা প্রাণত্যাগ করেছে। মদিনার দশা হয়েছে তার। ইংরেজি Earl Brand কিংবা The Douglas Tragedy'র সঙ্গে মিল খুঁজে পাই 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবি' পালাটির। উমর খাঁ দেওয়ান জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁর সঙ্গে তার কন্যা সখিনার বিবাহ দিতে চান নি। ফেয়ার

মার্গারেটের বাবাও তাদের পুরুষানুক্রমিক শত্রু আর্ল ব্রাণ্ডের সঙ্গে ফেয়ার মার্গারেটের বিয়ে দিতে গররাজি ছিলেন। সখিনা মৃত্যুর শিকার হয়েছে, মার্গারেটেরও একই পরিণতি ঘটেছে।

আমাদের গীতিকাগুলির সিংহভাগ অধিকার করে আছে প্রেম কাহিনী, যে প্রেম প্রাক বিবাহ পর্বের। লোককবিরা গীতিকাগুলি রচনা করেছেন পয়ার ছন্দে। এছাড়া অন্য কোনো ছন্দনির্মিতি কৌশলকে তাঁরা অবলম্বন করেন নি। গীতিকায় যে সব তুলনা দেওয়া হয় সেগুলির নিজস্বতায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এক্ষেত্রে সংস্কৃত অলঙ্কারের ছায়াও মাড়ান নি তাঁরা; যেমন 'রক্তজল আঁখি কেনা পাগলের প্রায়', 'পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ', 'মানিকের কাছে দেখ ছিবসার মতন', কিংবা 'যৌবন আইল দেহে জোয়ারের পানি'।

গীতিকা সর্বোপরি লোকসংগীত, গীত হবার উদ্দেশ্যেই এগুলি রচিত। পাঁচালীর সুরে এগুলি গীত হয়। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ভাটিয়ালি সুরে গীতিকা পরিবেশিত হয়। করুণরসাত্মক গীতিকা গীত হয় বিচ্ছেদ লহরে, অন্যদিকে পৌরাণিক কাহিনী গীত হয় হাঁহলা সুরে। 'মণির ওঝা মাগুর মাও' পালা রচিত সাগরী ঝাঁপ লহরে। পালাটি গীত হয় মুড়াই সুরে। শীলাদেবীর পালা গীত হয় মুড়াই ও সাইগরীতে।

গীতিকা মানবকেন্দ্রিক, দেবদেবীর প্রাধান্য মুক্ত। মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবিকই প্রশংসাব্যঞ্জক। তাই গীতিকাগুলি অলৌকিকতা মুক্ত।

নাথ ধর্মাশ্রয়ী গীতিকা হল গোপীচন্দ্রের গান, অন্যদিকে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দস্যু কেনারামের পালা, দেওয়ান ভাবনা ইত্যাদি।

গৌণধর্ম ও লালনপন্থা

সুধীর চক্রবর্তী

গৌণধর্ম, যাকে ইংরিজিতে বলা হয় Minor Religious Sect, এখন বেশ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ উনিশ শতকে যখন H. H. Wilson-এর *The Religious Sects of the Hindus*, অক্ষয়কুমার দত্ত-এর *ভারতবর্ষীয় উপাসক* সম্প্রদায় এবং যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এর *Hindu Castes and Sects* বইগুলিতে বঙ্গদেশের নানা গৌণধর্মীদের বৃত্তান্ত ও করণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন তখনও বাঙালি পণ্ডিতদের ঠিক প্রত্যয় হয়নি এ সব বহুসংখ্যক, বিচিত্রধর্মী গৌণবর্গের জীবনাচরণের বিবরণ ভবিষ্যতে খুলে দেবে কতটা নব ইতিহাস পাঠ আর সমাজবিজ্ঞানের দরজা। উইলসন সাহেব কিংবা ব্রাহ্মণসন্তান যোগেন্দ্রনাথ ও কায়স্থ অক্ষয়কুমার যে গৌণধর্মীদের সম্পর্কে খুব অনুকম্পায়ী বা আস্থাশীল ছিলেন তা নয়। গৌণধর্মের অন্যতম শক্তিশালী ও বহুসংখ্যক ভক্তমণ্ডলী সমন্বিত 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের অসহিষ্ণুতা ছিল প্রকট। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দু সাধক দুমুখে নিন্দা করতেন কর্তাভজা আর বাউলদের। দাশরথি রায় কর্তাভজাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে পাঁচালি লিখেছিলেন—জেলেপাড়ার সং বেরিয়েছিল কলকাতায়। তবু রোখা যায়নি গৌণধর্মীদের—তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন গ্রামে গ্রামান্তরে, তাঁদের গোপ্য সাধনকেন্দ্রে, জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে। আসলে বৃহৎ বঙ্গের নিম্নবর্গের নিরক্ষর জনসমাজ বরাবরই উপেক্ষা ও ঘৃণা পেয়েছে ব্রাহ্মণ্য সমাজ এবং মৌলানা মৌলবীদের কাছে। মন্দিরে-মসজিদে তাদের জন্য প্রীতির আসন পাতা হয়নি। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণব সাধনার মূল শক্তিকেন্দ্র রূপে টেনে নিয়েছিলেন আচণ্ডাল, ভক্তিকামী মুমুক্ষু মানুষদের। তাদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে জাগ্রত করেছিলেন আত্মশক্তিতে, মানবমহিমার স্পর্ধায়। চৈতন্যপ্রয়াণের পরে অবশ্য তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবতার আদর্শ বৃন্দাবনকেন্দ্রিক শাস্ত্র শাসনে বেশ গোঁড়া চেহারা নিল। তখন তার থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে নিজের চারিত্র প্রতিষ্ঠা করল জাতিবৈষ্ণব আর সহজিয়া ধর্ম। নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এই দলছুটদের নাম দেন পাষণ্ড ও ভণ্ড। তাদের দলন ও বর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বৈষ্ণবদের মূলধারা থেকে ভ্রষ্ট নানা উপধারাকে তাঁরা চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন করেন। *বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়* বই থেকে সেই তালিকা এখানে উদ্ধার করা হল। তাদের নাম :

বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধিনীপন্থী, সহজিয়া, খুশি বিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রাম সাধনীয়া, জগবন্ধু ভজনীয়া, দাদুপন্থী, রুইদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, মীরাবাই, বিঠ্ঠলভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক বা রূপকবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বড়ী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী, সখিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশচন্দ্রী, সাধনপন্থী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়াদুয়ারা, কামধেন্বী, মটুকধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়, মহাপুরুষীয় ধর্মী সম্প্রদায়ী, জগমোহিনী, হরিবোলা, রাতভিখারী, বিন্দুধারী, অনন্তকুলী, সৎকুলী, যোগী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, ফারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, আহমদপন্থী, বীজমার্গী, অবধূতী, ভিঙ্গল, মানভাবী, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী, শার্ভল্লী, নরেশপন্থী, দশামার্গী, পাঙ্গুল, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী, কুণ্ডপাতিয়া, খোজা, গৌরবাদী, বামে কৌপীনে, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীনছাড়া, চূড়াধারী, কবীরপন্থী, খাকী ও মুলুকদাসী।

তালিকায় চোখ বোলালে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—১. এই পঞ্জিকরণে শতাধিক গৌণ সম্প্রদায় থাকলেও তার মধ্যে বহু সম্প্রদায়ই বৈষ্ণবধারা থেকে আসেনি, ২. এর মধ্যে বেশ কটি গৌণধর্ম সর্বভারতীয় এবং ৩. এর অনেকগুলি হিন্দু-মুসলিম যুক্তসম্প্রদায়ী। লক্ষণীয় আরও যে অপধর্মের তালিকায় দরবেশ আর বাউলদের উল্লেখ থাকলেও মারফতি ফকিরদের প্রসঙ্গ নেই।

উনিশ শতকের 'ভদ্রলোক' শ্রেণিদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যমান উচ্চধর্ম ত্যাগ করে নানা গৌণধর্মে (যেমন কর্তাভজা ও রামবল্লভী) সামিল হয়েছিলেন মানবীয়তার টানে, সত্য আচরণের প্রভাবে এবং কিছুটা বোধহয় যৌন-যৌগিক সাধন রহস্যের গোপন স্রোতে মিশতে। এছাড়া মূর্তিপূজা বিরোধী, শাস্ত্র সম্পর্কে উদাসীন, শ্রেণিবর্ণজাতি সমন্বয়ের আদর্শমুখী প্রবণতা এবং বহু ধরনের দেহতত্ত্বের গানের এক অমোঘ আকর্ষণও ছিল এ সব গৌণধর্মে। বিবাহবর্জিত নারীপুরুষ সম্পর্ক, গুরুভজনের পরম্পরা, সেবাদাসীদের সঙ্গ এবং সহজিয়া সাধনপন্থা বহু মানুষকে গৌণধর্মের দিকে আকর্ষণ করে। চৈতন্যদেবের সমন্বয়ী জীবনাদর্শ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-বিগ্রহের প্রভাব, কীর্তন ভজন আখড়া, শান্ত শুদ্ধ ভক্তিমার্গ এ সবের মোহ কি কিছু কম? তাই উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক গাঙ্গেয় বাংলায় কর্তাভজাধারা, নবদ্বীপ-কাটোয়া-গুপ্তিপাড়া-বাঘনাপাড়া-শালিগ্রাম-খড়দহভিত্তিক সহজিয়া নানা স্রোত এবং মধ্যবঙ্গে সুফিদের প্রচার ও মারফতি ফকিরদের দল গৌণধর্মীদের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। এঁদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে উচ্চবর্গের বৈরিভাব, প্রত্যক্ষ সংঘাত বাড়তেই থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে গৌণধর্ম আশ্রয় নেয় গ্রামের গহনদেশে, গ্রামবিন্যাসের প্রান্তিক অঞ্চলে। তাঁদের সাধনমার্গে ক্রমে এসে যায় তান্ত্রিকধারা ও নাথপন্থের সূত্র-বিকৃতিও আসে। 'গুরুপ্রসাদী'

প্রথা কিংবা বিকৃত কামাচার বহুক্ষেত্রে তাদের গোপন ঘাঁটিতে নির্বাসিত করে। আত্ম সাবধানের খবরদারি দিয়ে তাঁরা ঘোষণা করেন :

আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা
আপনার আপনারে তুমি হইও সাবধান।

এর সঙ্গে তাঁরা যুক্ত করলেন 'ট্যাকশালি' বোল অর্থাৎ শব্দের বিশেষ প্রতীকী অর্থে প্রয়োগ (যার আর একটা নাম 'উল্টোবাঁশি'), তার অনেকটাই পাওয়া যায় দেহতত্ত্বের গানে। আগ্রহী জনমানসকে বিভ্রান্ত করবার জন্য তাঁদের গুরুনির্দেশ ছিল : 'যাইবি দক্ষিণে বলিবি বামে'।

কিন্তু, সমাজে গৌণধর্মের অস্তিত্ব ও অবস্থান নিতান্ত বাস্তব বা চোখেপড়ার মতো হলেও ভদ্রপঞ্চজন তাঁদের উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করতেন। তাঁদের গানের আসরে সেকালে শিক্ষিত সমাজের শ্রোতা থাকত না। অথচ আশ্চর্য যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এ ধরনের গ্রামিক ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে কৌতূহলী হন। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা দেশে থাকিয়াও দেশের বিষয় কিছুই জানি না।...বস্তুত আমাদের এই অজ্ঞতা স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগকে বড়ই সংকীর্ণ করিয়া ফেলে।' 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ভাষণে তাই তিনি বিদ্যার্থীদের নজর দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'দেশের দিকে—চারিদিকে—দেশের মাটির দিকে।' বলেছিলেন, 'পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোনো ব্যক্তি এক নূতন ধর্মসম্প্রদায় গড়ে তুললে' তার থেকে তথ্য বিবরণ সংগ্রহ করে 'সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত, অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি সমাজের মধ্যে' কাজ করছে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। গৌণধর্মের মধ্যে তিনি লক্ষ করেছিলেন, 'সমাজের একান্ত আত্মসংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও...আত্মপ্রসারণের উদ্‌বোধন চেষ্টা।'

গৌণধর্ম সম্পর্কে এতটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি যে রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন তার কারণ তাঁর যথার্থ ইতিহাস বোধের অনন্যতা। ইংরেজের পাঠশালার ঔপনিবেশিক পঠনপাঠনের বাঁকা পথে তাঁর ইতিহাসতত্ত্ব গড়ে ওঠেনি বলে স্বচ্ছ চোখে এবং প্রত্যক্ষ গ্রামীণ সংসর্গ থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন মুক্তদৃষ্টি—তাতে তাই মিশে যায়নি উচ্চবর্ণের কৌলান্যবোধ, ঠাকুরবাড়ির অহংকার বা ব্রাহ্মসুলভ নীতিবাদ। মরমিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মধ্যযুগের সন্তসাধনার সঙ্গে বাংলার লোকধর্মের সহজ সংযোগের সরণি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর উদ্‌যোগ শুধু ছাত্রদের পরামর্শ দানে শেষ হয়নি, তিনি সংগ্রহ করেছিলেন লালনের গান, তা ছেপেছিলেন প্রবাসী পত্রিকায়—লালনগীতির স্বরলিপি করিয়েছিলেন ভাইঝি ইন্দিরাকে দিয়ে এবং তা ছেপেছিলেন কলকাতার *বীণাবাদিনী* পত্রিকায়। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে ইংরাজি ভাষণে ভাবাবেগের সঙ্গে বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন লালনের মরমি রচনার গভীরতার কথা এবং প্রসঙ্গত অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন লালন ও হাসন রাজার গান।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ আর ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা ভাষায় তাঁদের লেখালেখিতে, প্রথম নিম্নবর্গের গানের অন্তঃশীল ভাবুকতা ও মন্ত্রতন্ত্র-আচারমার্গ বিরোধী স্বরকে শনাক্ত

করেন। রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে সচেতনভাবে তাঁর বেশ কিছু গানে (বিশেষত স্বদেশ পর্যায়ের) লৌকিক সুর প্রয়োগ করেন, উপন্যাসে উদ্ধৃত করেন গগন হরকরার গান। তাঁদের উদাহরণে প্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে মতিলাল দাস, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যেরা গৌণধর্মের গান এবং লালনগীতি সংগ্রহ করে গ্রন্থ সংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু সে সব প্রয়াস কিছুটা খণ্ডিত, কারণ তাঁদের বিশেষ ঝোঁক ছিল বাউলদের দিকে। কিন্তু বাংলার গৌণধর্ম মানে তো শুধু বাউল নয়—আরও বহু ছোটোখাটো উপসম্প্রদায়। গৌণধর্মের অন্তর্গত বাউল ও সহজিয়াদের ভাবুকতা ও দর্শনভিত্তি নিয়ে ইংরিজিতে লেখেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলায় লেখেন ক্ষিতিমোহন সেন। অন্যতর নানা গৌণধর্মের মধ্যে কর্তাভজাদের সম্পর্কে বেশ কিছুটা কাজ হয়েছে—সাহেবধনী ও বলাহাড়ি সম্প্রদায় সম্পর্কেও স্বতন্ত্র কাজ হয়েছে—তবে উপেক্ষিত রয়ে গেছে গৌণধর্মের অনেকটাই। তার একটা কারণ যথাযথ ক্ষেত্রানুসন্ধানীর অভাব, আর একটা কারণ গৌণধর্মগুলির ক্রমিক ক্ষয়িষ্ণুতা এবং কোনো কোনোটির এমনকী অবলুপ্তি।

গত এক শতকে কিন্তু লালন ফকির সম্পর্কে চিন্তা-চর্চা-সংকলন-বিশ্লেষণ খুব ব্যাপকভাবে চলছে উভয়বঙ্গে। লালন সম্পর্কে শিক্ষিতদের প্রথম উস্‌কে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্দেহ নেই। পরে যখন ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হল তখন লালনের সমাধিস্থল ছেঁউরিয়া গ্রাম পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে। তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামপ্রেমী কিছু কর্তাব্যক্তি লালনের দীন সাধন কুটির তথা সমাধিস্থলে এক ইসলামি স্থাপত্যের সৌধ (দিল্লির মুসলিম সাধক হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মকবরার আদলে) গড়ে তুলে লালনসাধনাকে একটি ইসলাম-ঐতিহ্য-ভিত্তি দিতে চাইলেন। যেহেতু লালনের জীবনকাহিনী নানা রহস্যে ঢাকা কাজেই উৎসাহী গবেষকরা তাঁকে নিয়ে নানা গালগল্প চালু করে দিলেন—তাঁকে নিয়ে গল্প-নাটক-উপন্যাস-ফিচার ফিল্ম অনেকগুলি প্রকাশ পেল। লালনগীতির আট দশটি সংকলন বেরোল। তাঁর গানে সুর বসিয়ে রেকর্ড বেশ ভালো বিপণন পেল। জাল পুথিও আবিষ্কৃত হল। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চেয়েছিলেন যিনি তাঁর জন্মসূত্র আর জন্মগ্রাম নিয়ে শুরু হয়ে গেল হিন্দু ও মুসলিম গবেষকদের পাল্লাদারি।

সত্যসন্ধ ও নিরপেক্ষ মানুষরা লালনবিতর্কে অংশ নেবেন না, বিশেষত এইজন্য যে তাঁর শেষজীবনে ছেঁউরিয়ায় অবস্থান এবং ১৮৯০ সালে প্রয়াণের বাস্তবটুকুই সত্য। আর কিছুই জানা যায় না তাঁর জীবন সম্পর্কে। তবে এটুকু জানা গেছে, তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন না— তাঁর ইচ্ছানুসারে শিষ্যরা লালনের দেহ হিন্দুমতে অগ্নিসাৎ করেননি বা ইসলামি মতে জানাজা নামাজ পড়ে কবর দেননি। আখড়াতেই ভূমিতলে সমাধিস্থ করেছিলেন।

কিন্তু লালনের প্রয়াণের পরে তাঁর গানের অন্তর্গত ভাবসত্য আর আত্মদর্শন যেন প্রচ্ছন্নভাবে একরকম সাধনপ্রণালী বা পন্থা সৃষ্টি করেছে। হিন্দু-মুসলিমের যুক্তচৈতন্যে তাঁর গানের অন্তঃস্থ তত্ত্বগুলি এক স্থায়ী বিস্তার করেছে। তিনি স্পষ্ট করে নিরর্থক

জাতিদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন—আরও স্পষ্ট করে বলেছেন : 'মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে/ সেকি অন্য তত্ত্ব মানে?' এই মানুষতত্ত্ব অর্জন করতে গেলে মাটির ঢিবি-কাঠের ছবি-কুসংস্কার-কবচ তাবিচ-ওঝা-জলপড়া বর্জন করতে হবে। দৃপ্ত বিশ্বাসে তাঁর বাচন : 'যে হি মুর্শিদ সে হি খোদা'। এই দুনিয়াদারি তাঁর কাছে মনে হয় ঝকমারি। পাঁচরোক্ত নামাজ পড়ে শরিয়ত মতে খোদাকে পাওয়া যায় না। তীর্থ বা বনবাস যে নিষ্ফল তা বোঝাতে লেখেন : 'তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাইরে?' বা 'ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়/স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়?' সবচেয়ে বড়ো কথা হল :

কাশী কিংবা মক্কায় যাওরে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন—
ধ্যানধারণা ভজনপূজন মানুষ সর্ব ঠাঁই।

এমনকি এতদূর তাঁর বিশ্বাস যে, 'দেবদেবতার বাসনা যে মানুষজন্মের লাগিয়ে'।

বাংলার গৌণধর্মীদের মধ্যে লালনপন্থা সাম্প্রতিক লোকায়ত সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। যে কোনো মেলা-মহোৎসবেআখড়ায় বা বাউল ফকিরদের সমাবেশে লালনের গানের তত্ত্বগত অগ্রচারিতা বা মান্যতা দেখবার মতো। গবেষকরা লালনগীতির মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা, নতুন সমাজ ভাষ্য আর ইতিহাস তত্ত্বের ইঙ্গিত পান যা সমন্বয়বাদী এবং মানবস্বপ্নে আস্থাশীল। যুক্তির শস্ত্র এবং বাস্তব দেহচেতনা তাঁর গানের তত্ত্বে অবিরল ভাবে লভ্য। কবীর-বাণীর মতোই লালনের বাচনিক উৎকর্ষ ও অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি আধুনিক সারস্বত কর্মীদেরও চমকে দেয়। যুক্তিসংগত কারণেই লালনকে বাংলার গৌণধর্ম সাধনার পরম্পরায় সবচেয়ে বরিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ বলা হয়। ব্যক্তিগত অনুভব আর আত্মস্থ সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন গভীর বোধে। ভাববাদকে অস্বীকার করে প্রতিবাদী যুক্তির শানে তিনি একদা কয়েক হাজার শিষ্যকে জীবনসত্যে দীক্ষিত করেন।

লালনের জীবনস্বপ্ন ছিল একান্ত তাঁর নির্জন অর্জন। তিনি নিম্নবর্গের কৃষিজীবী মানুষদের যেমন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে জীবনের দেহগত চর্যায় টানতে চেয়েছিলেন তেমনই তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রের আচরণসর্বস্ব অনুসরণ বা অনুমানবহুল ঈশ্বর ধারণা থেকে। তাঁর ব্যক্তিগত সাধুতা, জীবনের যাপনগত বৈশিষ্ট্য, নিজেকে আড়াল রাখার অভিনবত্ব পরিপার্শ্বে তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। সমকালের ধূসর গ্রামীণ সমতল থেকে তিনি ঋজু বৃক্ষের মতো উঠে গিয়েছিলেন উর্ধ্বতর চেতনালোকে। সেকালের গাঙ্গেয় বঙ্গে নাগরিক রেনেশাঁসের বৃত্তের বাইরে লালনপন্থা আরেকরম নবচেতনার ভগীরথ হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতরা ক্রমে তা বুঝছেন, যদিও এখনও লালন উচ্চতর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হননি।

গ্রুপ থিয়েটার : পশ্চিমবঙ্গ

ভাস্কর সেনগুপ্ত

থিয়েটার এক বহমান প্রক্রিয়া। তাই সাম্প্রতিকের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নে প্রয়োজন বিবর্তন ধারার সম্যক উপলব্ধি। প্রয়োজন ইতিহাসবেত্তার নিষ্ঠায় প্রতিটি স্তরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রেক্ষিতবীক্ষণ। প্রয়োজন মেধা, যুক্তিনিষ্ঠা। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ব্যপ্তি মাত্র পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের। তবু এখানে অনেক মানুষ, অনেক দল, অনেক নিষ্ঠা, অনেক বিশ্বাস, অনেক বিতর্ক, অনেক অভিমান। সীমায়িত পরিসরে এর সংকলন অসম্ভব।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে নিউইয়র্ক আর লন্ডন শহরে 'গ্রুপ থিয়েটার' নাম দিয়ে দুটি নাট্যদলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। লন্ডনের নাট্যদলটি তাদের সীমায়িত অস্তিত্বে (১৯৩৩-১৯৫৩) মূলত সমকালীন কবিদের লেখা নাটক মঞ্চায়নে প্রয়াসী ছিল। অন্যদিকে নিউইয়র্ক শহরে ক্লারম্যান, স্ট্রাসবার্গ, ক্রফোর্ড, ক্লিফোর্ড ওডেট্স্ প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বরা কিছু দর্শনগত স্বাতন্ত্র্যে 'থিয়েটার গিল্ড' থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করলেন 'গ্রুপ থিয়েটার' (১৯২৮-২৯)। একের পর এক নাট্য সৃজনের মাধ্যমে তাঁরা গ্রুপ থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক নিশ্চিত বামভাষী নাট্যদল হিসাবে। দলটা নিষিদ্ধ হল (১৯৪০)। তারপর হারিয়ে গেল। থেকে গেল রোমা-রঁলা পিসকাটো-স্তানিস্লাভস্কি (মস্কো আর্ট থিয়েটারের 'dedicated to the principle of group acting' অবশ্যই 'গ্রুপ থিয়েটার'কে প্রাণিত করেছিল) জারিত গ্রুপ থিয়েটার concept। এরই অনাবিল সাযুজ্যে চল্লিশের দশকে বাঙলা তথা ভারতে প্রত্যক্ষ করা গেল এক ব্যতিক্রমী নাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের শরিক মূলত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসা প্রগতিশীল ভাবনার কিছু মানুষ। তাঁদের অনুভবে অস্তিত্বের সংকট। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা সমস্যার মূলে পৌঁছানোয় সচেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই 'গ্রুপ থিয়েটার' অভিধাটি বেছে নেওয়া হল তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় হিসাবে।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের (১৮৭৬) ভ্রূকুটি সত্ত্বেও বাঙলা পেশাদারি মঞ্চে প্রশ্রয় পেয়েছিল স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদ, সমাজ সংস্কার। এমনকী গিরিশের পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্রয়োজনার বিশাল ক্যানভাসে বুর্জোয়া-বাস্তববাদ থেকে উত্তরণের প্রয়াসও অস্পষ্ট থাকেনি। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় গণনাট্য বাংলা মঞ্চে এনেছিল শ্রেণিসংগ্রাম। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪-এ শ্রীরঙ্গমে বিস্ফোরিত হয়েছিল 'নবান্ন'। কারো

কারো মতে গণনাট্যের আবির্ভাবেই বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সূচনা। সময়ের দাবিতেই এসেছিল গণনাট্য। প্রতিভা পুষ্ট হয়ে সে ছিল অমিত তেজস্বী। এরপর স্বাধীনতা এল একরাশ বিতর্ক নিয়ে। ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটের দিকে লাল চোখে তাকাল শাসক শ্রেণি। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল। শক্ত চোয়ালে লড়াই করার সময় এল গণনাট্য কর্মীর। ঠিক তখনই গণনাট্যের এক অংশের 'জাত বদল' ঘটল। বহুরূপী এল সৎ নাট্যের প্রতিশ্রুতিতে (১৯৪৮)। অধিকাংশের বিশ্বাসে এখানেই বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের শুরু।

'ভালো নাটক ভালোভাবে করা'র সংকল্পেই এই নতুন ধারার সূচনা। শুধু শ্রেণি-সংগ্রামে সীমায়িত না থেকে জীবনের সর্বাত্মক রূপ প্রতিবিম্বিত করার ঈপ্সায় শিল্পীর চোখে গণনাট্যের অসম্পূর্ণতা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। গণনাট্যকে আত্মস্থ করে সে চায় পরিধির ব্যাপ্তি। সর্বাত্মকভাবে জীবনকে ছুঁতে যদি কোনো শিল্পী শিল্পের ব্যাপ্তি দাবি করে; সেই দাবি যদি সততাপুষ্ট হয়, তবে তা অবশ্যই প্রশ্রয় যোগ্য। সে প্রশ্রয় গণনাট্য দেয়নি। রাজনৈতিক দলের গ্রন্থিবন্ধনে থেকে তার দাবি শুধুই দলীয় আদর্শের প্রচার। শিল্পের প্রতি সত্যনিষ্ঠায় শিল্পী তাই বেছে নিয়েছিল স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকীকরণের সংকল্পে যদি মঞ্চে আসে 'ব্যাপিকা বিদায়', যদি সেই শিল্প পুষ্ট হয় প্রতিক্রিয়াশীলের আর্থিক অনুদানে, যদি সে শিল্পকে গ্রাস করে দাম্ভিক নগরকেন্দ্রিকতা, তবে মিথ্যা হয় প্লেখনভের উচ্চারণ : 'শিল্প এক সামাজিক ঘটনা'। প্রকট হয়ে ওঠে দর্শনহীনতা। অভিযোগ আসে গণনাট্যের শ্রেণিদর্শন থেকে দূরে থাকা কিছু মানুষের বুর্জোয়া সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ আর জনগণের সংগ্রাম থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করার সংস্কারবাদী মনোভাব থেকেই এই 'ভাবের ঘরে চুরি'। আপোষহীন ঋত্বিক ছিলেন প্রত্যক্ষ—সেই সাহস, মেরুদণ্ড, আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অন্যদের নেই। তাই নিজেকে বিকিয়ে এই নতুন দর্শন, নতুন অজুহাত তৈরির চেষ্টা। এভাবেই বিতর্ক বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকে জন্মলগ্ন থেকেই বিব্রত করেছে। গণনাট্যপন্থী বা সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার অভিযোগ ছাড়াও দলগুলোর নিজেদের মধ্যেই Commitment আর নান্দনিকতার অনুপাত নিয়েছিল নানা বিতর্ক। নানা আনুবীক্ষণিক কারণে, এমনকী নিছক ব্যক্তিত্বের সংঘাতে একের পর এক ভাঙনে ক্লিষ্ট হয়েছে দলগুলো। স্বয়ং শম্ভু মিত্র যতই এই ভাঙনকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বিবেচনা করুন, এইসব ভাঙন আসলে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শনহীনতাকেই প্রকট করেছে। সাহসী মন্তব্যে, বাঙলার গ্রুপ থিয়েটার কখনই আন্দোলনের চেহারা পায়নি, কারণ সামগ্রিকভাবে গ্রুপ থিয়েটারের কোনো স্পষ্ট চরিত্র ধরা পড়েনি।

বল্গাহীন উদ্দেশ্যবিহীনতা নিয়ে চলছে বাংলার সাম্প্রতিকতম গ্রুপ থিয়েটার। পেরিয়ে আসা দিনগুলোতে সার্থকভাবে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন বাংলা মঞ্চে। পিরানদেল্লো, সোফোক্লেস, ইবসেন, চেখ্‌ভ, ব্রেখট, আর্থার মিলার, দারিও ফো বাংলা থিয়েটারকে কিছুটা হলেও আন্তর্জাতিক চরিত্র দিয়েছে। বুক ঠুকে রাজনৈতিক থিয়েটার চালিয়েছেন উৎপল দত্ত। বিষয় আর প্রকরণগত পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে অবিশ্রান্ত। ছিলেন অজিতেশ তবু এখনো বাংলা গ্রুপ থিয়েটার পায়নি কোনও স্বচ্ছ পরিকাঠামো। গণ

আন্দোলন থেকে সরে এসে, Commitment খুইয়ে, ক্রমশই কনজিউমারিজমে আক্রান্ত হয়েছে থিয়েটার। অস্বচ্ছ অর্থনীতির আবর্তে এখন থিয়েটার চত্বরে চড়াই-শালিখের খুঁটে খাওয়া। অনেকেই অনেকের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে। অনির্বচনীয় হুন্ডি কারো কারো হাতে। বাকিরা লীন। শুশ্রূষায় আছে নাট্য একাডেমি ইত্যাদিরা। চৌকাঠে ভিড়। কেউ বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে; কেউবা অনাথ, খঞ্জদের দিয়ে নাটক বেঁধে সমাজ উদ্ধারে নিরলস। কেউবা বেছে নেয় মন্ত্রিমশায়ের বিরচনা। সবার চোখ মফস্বলের দিকে। হল-শোর ঘাটতি মেটাবে কল-শো। অথচ মফস্বলে চলছে অদম্য নাট্যচর্চা। তবু মহানগরে মূলত এই সমীকরণেই চলেছে বাংলার গ্রুপ থিয়েটার। এরই মাঝে এসেছে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'প্রাচ্য', 'হোলি', 'তীর্থযাত্রা', 'দুখীমুখী যোদ্ধা', 'কালান্তক লালফিতা', 'অশ্বচরিত'। স্বাগতম। থিয়েটার অন্তত কথা বলুক থিয়েটারের ভাষায়।

চ্যাটিং

উৎসব মুখোপাধ্যায়

বছর তিনেক আগে ডিসকভারি চ্যানেলে হংকঙের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটা বিজ্ঞাপন দেখানো হত। বিজ্ঞাপনটির মূল উপজীব্য ছিল—একটি রোবট হংকং উৎসবে এসেছে—একটি পাখি তার জন্য ঠোঁটে করে দুটো ফল নিয়ে আসে—একটা প্রজাপতি তার চোখের পাতা দুটো টেনে বন্ধ করে দেয়—একটা হাতি তাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয়—কটা বেড়াল তার মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়ে দেয়—পরিশেষে যখন রোবটটি উৎসব ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে তখন তার চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে—অর্থাৎ হংকঙের আতিথেয়তা যন্ত্রের চোখেও জল এনে দেয়। এই বিজ্ঞাপনটা দেখে মনে হয়েছিল, যেহেতু মানুষ তার আবেগ-অনুভূতির উপলব্ধিগুলো ক্রমশ হারাতে বসেছে তাই একটা যন্ত্রের মধ্যে অনুভূতির প্রকাশের দ্বারা মানুষের কাছে একটা বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

'আগুন থেকে ক্লোনিং'—সভ্যতার এত বছরের ইতিহাসে মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল 'কম্পিউটার'। আর মানবজীবনে এক অভাবনীয় গতির সঞ্চার করাই কম্পিউটারের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও কম্পিউটার শুধু গতির জোরেই মানুষের অন্যতম প্রিয় বন্ধু। বর্তমানে এই বন্ধুত্বের গাঢ়ত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে 'চ্যাটিং' নামে একটি ধারণার গুরুত্ব বোধহয় সর্বাধিক।

অভিধানগত অর্থে চ্যাটিং একধরনের আড্ডা বা খোশগল্প কিন্তু 'সাইবার যুগে' চ্যাটিং শুধু আড্ডার সীমারেখা অতিক্রম করে বিশেষ ধরনের যোগাযোগ, আবেগ আদান প্রদান ও আত্মতৃপ্তির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চ্যাটিং নামক ধারণার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে প্রথম ও প্রধানভাবে যে বিষয়টা কাজ করে তা হল একাকিত্ব। বর্তমান জীবনযাত্রার দ্রুততার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মেশার বা বন্ধুত্ব করার সময় বা সুযোগ দুই-ই খুব কমে গেছে। চ্যাটিং এখানে একটা যোগাযোগ স্থাপন করে—ইন্টারনেটের যোগাযোগ।

পদ্ধতিগত দিক থেকে চ্যাটিং বেশ সহজ। এর পদ্ধতি অনেকটা এইরকম :

১. সাধারণত প্রত্যেক ওয়েবসাইটে চ্যাটিং এর সুবিধা থাকে।

২. মাউস ক্লিক করে চ্যাটিং-এর মহাদেশে ঢুকে পড়লেই বেশ কিছু নাম এসে যাবে যারা সেই মুহূর্তে ঐ নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে চ্যাট করতে উপস্থিত।

৩. একটা পছন্দসই নাম বেছে নিলে একটা নতুন সংকেতের সঙ্গে পরিচয় হবে— 'ASL'-যার অর্থ Age, Sex, Location। পরস্পর পরস্পরের ASL পছন্দ হলে যোগাযোগ শুরু হবে।

৪. এরপর Key-board-এ টাইপ করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরস্পরকে জানার চেষ্টা চলে। এখানেও যদি একে অপরকে পছন্দ করে তাহলে দুজনে একটা নির্দিষ্ট বক্সে চলে আসা যায়। যেখানে শুধু দুজনেই চ্যাট করবে। অন্যথায় কোনো বক্সে না এসে একই সঙ্গে একাধিক মানুষের সঙ্গেও চ্যাট করা যেতে পারে।

৫. চ্যাটিং-এর সঙ্গী যদি পছন্দসই হয় তাহলে দুজন নির্দিষ্ট দিন ও সময় ঠিক করে নিতে পারে, যখন দুজনেই কম্পিউটারের সামনে বসবে।

মূলত দু-ধরনের চ্যাটার পাওয়া যায়। অনিয়মিত ও নিয়মিত চ্যাটারদের চ্যাটিং-এর পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতাগত দিক থেকে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অনিয়মিত চ্যাটারদের ক্ষেত্রে

১. এদের সাধারণত নিজস্ব কম্পিউটার থাকে না। এরা দোকানে পয়সা দিয়ে চ্যাট করে। তাই এদের চ্যাট করার স্থায়িত্ব খুব বেশি হয় না।

২. সাধারণত প্রত্যেকেই নিজের নাম ও ASL গোপন করে অন্য পরিচয়ে চ্যাটিং শুরু করে। মেয়েদের মধ্যে, নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেবার প্রবণতা দেখা যায়।

৩. এরা মূলত প্রয়োজনে চ্যাট করে না। কিছুটা সময় কাটানোই এদের লক্ষ্য।

৪. চ্যাটিং সঙ্গীর আধিক্য মূলত 'টিন এজের' ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তির বোধ জাগায়।

নিয়মিত চ্যাটারদের ক্ষেত্রে।

১. এদের মূলত নিজস্ব কম্পিউটার থাকে। তাই এদের এককালীন চ্যাটিং-এর স্থায়িত্ব পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও হয়।

২. নিজস্ব পরিচয় গোপন রাখা এখানেও প্রচলিত। তবে এখানে যেহেতু গভীর রাতে যোগাযোগের সুযোগ থাকে তাই তখন ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের পরিচয় বহন করে যৌনোত্তেজক কথোপকথনের আনন্দ নিয়ে থাকে।

৩. দূরের আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে এত কাল চিঠি, টেলিফোন বা e-mail-এ যোগাযোগ করতে হত। চ্যাটিং-এ টেলিফোনের থেকে খরচ কম আবার একটা Live যোগাযোগের সুযোগ থাকে যা চিঠি বা e-mail-এ নেই।

৪. গভীর রাতের কামুকতা, যৌনতার আদান প্রদান ও অশ্লীল প্রস্তাব বিনিময়ের সুযোগ নিয়মিত চ্যাটারদের একটা বড় আকর্ষণের কারণ।

৫. অচেনা মানুষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় এক ধরনের দ্বিধা থাকে। চ্যাটিং-এ সেই অসুবিধা নেই আবার পুরো ব্যাপারটাতেই একটা টাটকা, জীবন্ত উপলব্ধি থাকে।

৬. চ্যাটিং-এর মাধ্যমে পরিচয়, বন্ধুত্ব, প্রণয় ও পরিণয়ের সম্পর্ক বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

চ্যাটিং-এর উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে একটা ছবি পরিষ্কার যে চ্যাটিং-এর জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ হল কম্পিউটারের গতিময়তা এবং মানুষের আবেগ-অনুভূতির আদান প্রদানের সুযোগের একটা মেলবন্ধন। যন্ত্রই এখন দুটো মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ও মাপকাঠির মাধ্যম। তাই 'বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ'—এ কথা বোধহয় আর পুরোপুরি সত্যি নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির অন্যতম সূচকের মাধ্যমেই আজ আবেগ প্রতিপালিত। আর তাই বোধহয় আবেগ-অনুভূতির বার্তাবহ বিজ্ঞাপনে রোবট ব্যবহার করা হয়।

চিত্রকল্প

ছন্দম চক্রবর্তী

চিত্রকল্প শব্দটি বিশুদ্ধ বঙ্গজ নয়, শব্দটির শরীরে কিঞ্চিৎ সাহেবি রক্ত রয়েছে। বাংলা চিত্রকল্প আদতে ইংরেজি imagery-র বঙ্গীয় সংস্করণ। চিত্রকল্প-র আক্ষরিক অর্থ চিত্রের ন্যায়; পারিভাষিক অর্থ, অনেকেই করেন, শব্দনির্মিত চিত্র। একথা ঠিক যে চিত্রকল্প শব্দনির্মিত, ভাষানির্ভর; বিশেষত figuarative language যেমন প্রকাশিত উপমা (simile), অন্তর্নিহিত উপমা (metaphor), অন্যাসক্ত (transferred epithet) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিতব্য। একথাও ঠিক যে তা চিত্রের মতো মূর্ত (concrete) ও ইন্দ্রিয়সংবেদ্য। কিন্তু চিত্রের মতো তা শুধু দৃশ্য নয়, যে কোনো ইন্দ্রিয় (sense) এবং জৈবচেতনার (organic sensation), যেমন তাপ, গতি ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে। যেমন ধরা যাক, 'ভ্রূযুগ ধনুকবর নয়ন তাহাতে শর'। মুকুন্দরামের এই পঙ্‌ক্তিটি এক সার্থক অন্তর্নিহিত উপমা। এখানে ধনুক ও শর যথাক্রমে ভ্রূযুগ ও শরের উপমান হলেও তাদের গুণ আরোপিত হয়েছে, আসলে মূর্ত করে তুলেছে তৃতীয় আরেকটি বস্তু, চোখের দৃষ্টি। তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টির খোঁচা সচেতন পাঠকমাত্রেই অনুভব করেন। তীক্ষ্ণতার মতো একটি বিমূর্ত অভিজ্ঞতা এবং এহেন বিমূর্ত স্মৃতি, প্রেষণা (motivation), প্রত্যক্ষণ (perception) ইত্যাদি যখন শব্দের শরীরে ধরা পড়ে, অর্থাৎ মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই গঠিত হয় চিত্রকল্প। সুতরাং তা visual হতেও পারে, নাও পারে। যখন 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন / সন্ধ্যা আসে' তখন বলা বাহুল্য কোনো ছবি নয়, সন্ধ্যার নিঃশব্দ-মন্থর পতনই মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার জীবনানন্দেরই পঙ্‌ক্তি 'পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ'-এ, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'বিবাহ' ঘটে দৃষ্টি ও স্পর্শের। সুতরাং চিত্রকল্প শব্দটি কেবল একশ্রেণির imageকেই দ্যোতিত করে, image শব্দের সমগ্র অর্থটিকে নয়। তাই কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচক শব্দের মূল লাতিন অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে 'সাদৃশ্যবোধের প্রতিরূপায়ণ' অর্থে—তা সে চিত্র, ধ্বনি, স্পর্শ ইত্যাদি যার মাধ্যমেই হোক না কেন—বাক্‌প্রতিমা শব্দটিকে image-এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কেউ বলতে পারেন, শুধু সাহিত্য কেন, রোজকার ব্যবহারিক ভাষাতেও তো আমরা কত চিত্রকল্প ব্যবহার করি। বাস্তবিক করি, এবং করি বলেই অনেকে বলেন যে,

ভাষামাত্রেই 'নিহিত বাক্‌প্রতিমা' (submerged imagery)। যেমন, 'আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল' এবং 'লোকটির কথাগুলো মধুমাখা'। প্রথমটি দৃশ্যগ্রাহ্য (visual), অন্যটি নয়, কিন্তু আকাশ-ভাঙা ও মধুমাখা দুটোই চিত্রকল্প। মুশকিল হল দুটোই বহুব্যবহৃত, ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ, শক্তিহীন; বর্তমানে মামুলি প্রতীকে পরিণত। এরকম আরো কিছু উদাহরণ হল পাগলা হাওয়া, বাসি কথা, কথার ওজন, ঠুনকো মন ইত্যাদি। এরা মৃত চিত্রকল্প (dead imagery)। সাহিত্যের ভাষাতেও এমন কিছু চিত্রকল্প আছে যারা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত, বহুব্যবহৃত, অতএব ক্ষীণশক্তি। যে কোনো রচয়িতার মকসো-পর্বে এহেন চিত্রকল্পের অতিরেক দেখা যায়। যেমন রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথমপর্বে নিশার স্বপ্ন, পাষাণহৃদয়, চরণে কঠিন শিকলের ফাঁসি ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যে চিত্রকল্পের কাজ তো শুধু বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলা নয়, আভিধানিক অর্থকে শুধু বিস্তৃত করাও নয়; প্রকৃতপক্ষে পাঠকের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করা, তার অনুভূতিকে গভীর করে তোলা। তাই চিত্রকল্পের কাছে পাঠকের কাঙ্ক্ষা সার্থক অপ্রত্যাশিতের। সেইজন্য, ছয়ের দশকের কবি যদি একথা লিখেই ক্ষান্ত হতেন, 'আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে / কাঁদে না মোহন বাঁশিতে বটের মূল' তাহলে চিত্রকল্প হয়ত পেতাম, কিন্তু হতাশ হতাম নির্ঘাত। কিন্তু অতঃপর তিনি যখন লেখেন, 'এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে / বিদ্যুৎ রেখা মেলে', তখন শুধু পূর্ববর্তী রাবীন্দ্রিকতাই অতিক্রান্ত হয় না, আমাদের বিদ্যুৎচমকিত বর্ষণের ঐতিহ্য-পরম্পরিত অভিজ্ঞতায় যুক্ত হয় মৌলিক এক মাত্রা। আবার চিত্রকল্পের এই অতি-আবশ্যিক গুণ originality-র অভাবই আমাদের নিরাশ করে যখন অতি-সাম্প্রতিক এক কবি-রচিত চিত্রকল্পে—'পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ত্রাণশিবিরের মতো ছেঁড়া'—আমরা খুঁজে পাই সমর সেনীয় গন্ধ। এই মৌলিকতার উৎস কী। সাধারণভাবে শব্দার্থের আভিধানিকতায় অন্তর্ঘাত, বাক্যে পদক্রমের বিপর্যাস এবং তুলনানির্ভর, বিশেষত অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্যনির্ভর বর্ণনা।

দেখার বিষয় এতক্ষণ, প্রদত্ত সমস্ত চিত্রকল্প ছিল একক, স্বল্পায়তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আসলে প্রকরণের মর্জিমাফিক সাহিত্য তৈরি করে চিত্রকল্পের শরীর, অনেকাংশে। সাধারণভাবে দেখা যায়, একটানে পড়ে ফেলা কবিতায় চিত্রকল্প লহমায় উৎপন্ন, এবং যেন বিদ্যুল্লেখায় নিষ্পন্ন, একটি বা দুটি চরণে। পক্ষান্তরে বড় কবিতা, নাটক বা কথাসাহিত্যের বিস্তৃত অবসরে তা প্রায়শই দীর্ঘ এবং জটিল, বিশেষত মিথোজীবিতায় আগ্রহী। যেমন 'বৈশাখ' কবিতায় বৈশাখের মূর্তিরচনায় উপমান : বিশীর্ণ নদীপ্রান্তিক শ্মশানে মগ্ন তপস্বীর দীপ্ত প্রাখর্য; চিত্রকল্পটি নির্মিত হয়েছে দীর্ঘ দশটি পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু আধুনিক কবিতায় অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বহুসংখ্যক চিত্রকল্পের পারস্পরিক বা অন্যোন্য সম্পর্ক। ধরা যাক জীবনানন্দের 'শব' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি : 'যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শবের ভিতর, / যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর; / যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে খুঁটে খায় / সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায়; / নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হয়ে আছে চুপ / পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ; / ...ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো / এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব /

ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব।' আঠারোটি পঙ্‌ক্তির এই কবিতায় গঠিত হয়েছে, আদতে গ্রথিত হয়েছে একের পর এক চিত্রকল্প এবং দৃশ্য, শব্দ (এখানে নৈঃশব্দ) ও গতি (এখানে নিশ্চলতা)-নির্ভর এক-একটি চিত্রকল্প ক্রমান্বয়ে উপরিপাতিত হয়ে নির্মাণ করেছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, মৃত্যুসুনিবিড় এক জৈব পরিমণ্ডল। এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় বা জৈবচেতনা-নির্ভর চিত্রকল্পের ক্রমিক অবস্থানে রচিত এহেন চিত্রকল্প-সমবায়কে বলা যেতে পারে চিত্রকল্প-শৃঙ্খল (chain of imagery)। বৃহত্তর অর্থে 'সোনার তরী' কবিতাটি এর উদাহরণ। আবার কোনো রচনা নির্দিষ্ট ইঙ্গিত প্রদানকারী বিভিন্ন চিত্রকল্প যখন বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং সম্মিলিতভাবে রচনাটিকে কোনো নির্দিষ্ট তাৎপর্যে উত্তীর্ণ করে তখন সেই সমবায়কে বলা হয় চিত্রকল্পগুচ্ছ (image cluster)। যেমন সমালোচক দেখিয়েছেন, কর্ণকুন্তীসংবাদ-এ কর্ণ চরিত্রের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় অন্ধকারচেতনা। আত্মপরিচয়ের সংকট ও ভবিতব্যরূপী এই অন্ধকার মূর্ত হয়েছে, 'জননীর গর্ভের আঁধার', 'রজনীর তিমির ফলক' ইত্যাদি চিত্রকল্পের মাধ্যমে। যেমন দেখিয়েছেন বিদেশি সমালোচক—জরা, মৃত্যু ও দুর্নীতির image motif-এর পৌনঃপুনিকতা কীভাবে গঠন করেছে হ্যামলেট-এর চিত্রকল্পগুচ্ছ।

যাইহোক, চিত্রকল্প বিষয়টি সাহিত্যে অনাদি; কত যুগ আগে চর্যার কবি জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'ওরে এখন কী শুভ্র কাপাস (ফুল) ফুটেছে' (ষুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা)। অথবা বৈষ্ণব কবি লিখেছেন, 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়'। আসলে যে ব্যাপারটা নবীন তা হল সাহিত্য-সমালোচনার জগতে চিত্রকল্পের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা। একেবারে নবীনই বা বলি কীভাবে; গত শতকের শুরুর দিকে এজরা পাউন্ড বলেছিলেন একগাদা লেখার চেয়ে একখানা image রচনা ঢের ভালো। কবিতাকে কল্পনালতার ভাবালুতা এবং মেরুদণ্ডহীন নমনীয়তা থেকে রক্ষা করতে, বলা চলে সংহত, সুনির্দিষ্ট ও concrete করে তুলতে ইমেজিস্ট বা নিউ ক্রিটিকদের অন্যতম শস্ত্র হিসেবে চিত্রকল্প গত শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে চিত্রকল্পের মৌরসি পাট্টা ছয়ের দশক থেকে। একথা স্পষ্ট যে, ক্রমান্বয়ে দুরূহ ও ব্যক্তিগত হয়ে ওঠা সাহিত্যকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের জন্য সাহিত্যেরই ভিতর থেকে সুনির্দিষ্ট উপাদান খুঁজে নেওয়ার যে প্রয়াস, চিত্রকল্প তারই অন্যতম ফল। কিন্তু অধিকতর সংহত এবং বিজ্ঞানমনস্ক ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্য সমালোচনার যুগে—যখন আরো সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের মাধ্যমে সাহিত্যকে বোঝার প্রয়াস চলেছে—চিত্রকল্পকেও একটু যেন মন্ময় মনে হয়; মনে হয়, অকাট্য যুক্তিতে বাঁধতে না পারা একটু যেন অসংহত ব্যাপার। পি. এন. ফারব্যাঙ্ক সাহেবের ভাষায়, "The trouble with 'imagery' is that it appears to refer to some technical feature in literature-like 'rhythm' or 'stanza' or 'metaphor'—yet it is hard to discover what."

ছড়া

পল্লব সেনগুপ্ত

ছড়াকে মানুষের আদিমতম সাহিত্য-প্রয়াসগুলির অন্যতম বলে মনে করা হয় প্রায়শই। স্মরণাতীত কাল থেকে এ অবধি সুরে-ছন্দে-লয়ে-তালে যখনি মানুষ কিছু ব্যক্ত করতে চেয়েছে, তখনি ছড়া জাতীয় সৃষ্টির একটা মৃদু উদ্‌ভাস ঘটেছে বলতে পারি। দেবতাদের উদ্দেশে স্তব, স্তুতি ইত্যাদি যা হত, ছন্দ-সুরের মাধ্যমে যেসব নিবেদন করতেন প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহরা—তার থেকেই ছড়ারও আদি-উৎসরণের পথ খুলে যায়। কালক্রমে তার অন্তর্গত ধর্ম-দেবতা ইত্যাদির অনুষঙ্গটা মুছে যায়, লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে তার অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে।

সর্বত্রই ছড়ার মূল দুটি বর্গ : ছেলেভুলানো এবং সর্বজনীন। প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধা-ব্রতের 'মন্তর' ইত্যাদির মধ্যেও এই বিশিষ্ট বাক্‌শিল্পটির প্রকাশ হামেশাই দেখা যায়। এমন কি, বিয়ের লোকাচার হিসেবেও ছড়ার প্রয়োগ অপ্রচলিত নয়। ভূত-বাঘ-সাপ ইত্যাদির 'মোকাবিলা' (!) করার জন্য ছড়ার আকারে মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তবে এগুলিকে যথা-অর্থে ছড়া বলে গণ্য না-করাই ভাল। তাহলে 'যথার্থ-ছড়া' কোন্‌গুলিকে বলব? যেখানে ধর্ম-সংস্কার-লোকাচার-অলৌকিকে বিশ্বাস ইত্যাদি থাকে না—সেগুলিই হল 'প্রকৃত' ছড়া। পূর্বোক্ত দুটি বর্গ তাদের মধ্যেই প্রাপ্য।

আপাতভাবে ছড়ার মধ্যে পরিচিত জগতের নানা ধরনের চিত্রকল্প (অর্থাৎ ইমেজারি) টুকরো-টুকরোভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং হর-হামেশাই এক ধরনের অসংলগ্নতাও তাদের মধ্যে আছে বলে মনে হয়। ঐ অসংলগ্নতার 'কোলাজ্‌'-এই গড়ে-ওঠে ছড়ার ভাব ও রূপগত কাঠামো। ছেলেভুলানো ছড়াগুলি এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শিশুর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানারকমের অর্থবিহীন শব্দবিন্যাস হল ছেলেভুলানো ছড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সার্থক এবং অনর্থক বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে যে আপাতভাবে অসংলগ্ন কোলাজের কথা এখনি বলেছি, সেখানে সবটা মিলিয়ে একটা ভাব-অনুভূতিময় রূপের অবিচ্ছিন্ন প্রতিভাস শ্রোতার মনে উপস্থিত হয়।

দু-একটা উদাহরণ এখানে দেওয়াই যায়; যেমন :

ক. 'হাট্টিমা টিম টিম / তারা মাঠে পাড়ে ডিম / তাদের খাড়া দুটো শিং / তারা হাট্টিমা টিম টিম। / তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা / খায়-দায় গান গায় / তাইরে নাইরে না। / চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে / কদমতলায় কে? / হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে / সোনামণির বে'।'

খ. 'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি / যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি / রেল কম ঝমাঝম / পা পিছ্‌লে আলুর দম।'

উদ্ধৃত এই ছড়াদুটিকে অন্বিষ্টভাবে বিচার করলেই ছড়ার প্রকৃত চরিত্র এবং রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারবে। 'ক'-এর মধ্যে কল্পিত-প্রাণী 'হাট্টিমা টিম টিম'-দের সম্পর্কে দু-চার কথা বলেই, তাঁতির বাড়িতে কোলাব্যাঙের ছানারা কী-কী করে, সে সবের খোঁজ দেওয়া হয়েছে। (হাট্টিমাদের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক তা বোঝা না গেলেও, একটা আপাত-অসংলগ্নতার মধ্যেই কিন্তু আবছায়া কোনো কিছু রূপকে যেন উপলব্ধি করা যায়!) পরের দুই গুচ্ছ পংক্তির মধ্যে চাঁদের আলোয়-ভরা ফুল বাগানের সঙ্গে সোনামণির বিবাহের উল্লেখ মানান্‌সই হলেও হতে পারে, হয়ত সেই আনন্দে হাতি-ঘোড়াদের নাচও না-হয় মেনে নেওয়া গেল! কিন্তু হঠাৎ কদমতলার উল্লেখ করে রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্কেতটা যে কেন এল, কে তা বলবে! এই অনিরসিত প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে ছড়ার প্রকৃত সৌন্দর্য।

'খ' উদাহরণে, 'আই কম বাই কম' খুব সম্ভবত 'I come ভাই Come': 'রেল কম' (না-কি Rain come? 'ঝমাঝমের' সূত্রে তো সেটাই মনে হয়!) এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই যদু মাস্টার মশাই (ছাত্রদের রাগ থাকাই স্বাভাবিক তাঁর সম্পর্কে!) পা পিছ্‌লে পড়ে কাদা মাখামাখি অবস্থায় ঝোলমাখা আলুর দমের উপমেয়রূপে প্রতীত হয়েছেন। এখানে চারটে চরণের মধ্যে চিত্রকল্পের সংলগ্নতা থাকলেও, গোটা বর্ণনাটুকুর মধ্যে যে এক ধরনের 'ননসেন্স-ইমেজ' গড়ে উঠেছে, তাতে আর সন্দেহ কী? এটাও ছড়ার পরম বৈশিষ্ট্য।

ঘুমপাড়ানি ছড়া (বা, Iullaby). ছেলে ভুলানো, খেলাধুলোর ছড়া (যেমন 'এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং সই লো'), ঘর-গৃহস্থালির ছড়া, উৎসব-অনুষ্ঠানের ছড়া—এই রকম নানান্ বর্গে 'যথার্থ' ছড়াগুলোকে ভাগ করা যায়। তবে, ছড়া যে-বর্গেরই হোক না-কেন—তার অন্তর্নিহিত আপাত-অসঙ্গতিটা থাকতেই হবে; বস্তুতপক্ষে, সেটাই হল ছড়ার প্রাণসত্তা।

বাংলা ছড়ার একটা নিজস্ব ছন্দও আছে—যা শ্বাসাঘাত প্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দ হিসেবে পরিচিত। চার মাত্রার এক একটি দ্রুতলয় পর্ব সাজিয়ে ঐ ছন্দ গড়ে ওঠে। উচ্চারণের মধ্যে 'হস্' ধ্বনিরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে সেখানে।

ছোটোগল্প

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

বিগত এক-দেড়শ বছরে 'ছোটোগল্প' শিল্পরূপটি এত বিচিত্রভাবে নানা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে যে একটি সর্বজনীন সংজ্ঞায় এটিকে ধরা অসম্ভব। কিন্তু 'ছোটো' এবং 'গল্প' শব্দ-দুটির নির্দিষ্ট অর্থময়তার কারণে ছোটোগল্পের মধ্যে আকারে ছোটো একটি গল্পের দাবী রেখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু 'ছোটো' শব্দটি এত আপেক্ষিক এবং বহু ধ্রুপদী গল্প এতই গল্পহীন যে এই মত সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে কোনো কোনো সমালোচক আকারের চেয়ে প্রকার এবং গল্পের চেয়ে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন বেশী। এর মধ্যে এই শিল্পরূপটিকে বৈচিত্র্যে বোঝার তাগিদ রয়েছে এবং রীতিটিও অবরোহী। ফলে আধুনিক সমালোচনায় এই ভাবনা অনেকখানি মান্যতা পেয়েছে। আর এখন প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যে বৈচিত্র্য ছোটোগল্পের দায় নয়—অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

একটি নির্দিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে ছোটোগল্পের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে। রাশিয়ায় নিকোলাই গোগল এবং আমেরিকায় এডগার অ্যালান পো ও নাথানিয়েল হথর্ন বিশ শতকের তিনের দশকেই শিল্পরূপ হিসেবে ছোটোগল্পকে তৈরী করে ফেলেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম-নবম দশক পর্যন্ত অনেকেই মনে করেছেন ছোটোগল্প হল 'লম্বা-গল্প' বা উপন্যাস লেখার প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। যেমন এমিল জোলা গী—দ্য-মোপাসাঁর প্রথম গল্পসংকলনের প্রশংসা করতে গিয়ে ১৮৮১ সালেও লেখেন যে একটি উপন্যাস লিখে মোপাসাঁকে তাঁর সম্ভাবনার সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। আবার এরকম প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে গল্পের মধ্যে কিছু উপকাহিনি ঢুকিয়ে এবং নতুন চরিত্র যোগ করে উপন্যাসের রূপ দেওয়া যায়। তেমন প্রচেষ্টা বেশ কিছু লেখকের মধ্যে লক্ষও করা গেছে, ফলে ছোটোগল্পকে খণ্ড বা ভগ্ন হিসেবে দেখার একটা রীতি তৈরী হয়। ছোটোগল্পের আলোচনায় 'ব্রিফ' 'লিটল' 'ক্ষুদ্র' 'টুকরো' ইত্যাদি শব্দগুলি ফিরে ফিরে আসে, বোধহয় এক ধরনের অসম্পূর্ণতার বোধ থেকে। এ-সব শুনতে শুনতে, হয়তো কিছুটা হতাশ হয়েই, ১৮৮৯ সালে আন্তন চেকভ অনেকটা ঘোষণার ভঙ্গীতে জানান যে ছোটোগল্পেরও নিজস্ব কিছু রীতিনীতি আছে এবং একটি ছোটোগল্প পাঠককে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণতার বোধে পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ছ-টি গল্প

প্রকাশের পর *হিতবাদী* কর্তৃপক্ষ যে গল্প-প্রকাশ বন্ধ করে দেন তার কারণ কি গল্পকার রবীন্দ্রনাথ নাকি এই শিল্পরীতির বিষয়েই এক ধরনের অনাস্থা?

ছোটোগল্পের জন্ম কেন হল এ নিয়ে একটি অন্যতম মত হল কোনো আকস্মিকতা নেই এর পেছনে। আমাদের ভঙ্গুর এবং দ্রুত অপসৃয়মাণ ঘটনাবলি ও সময়ের নিয়মেই এর জন্ম। উনবিংশ শতাব্দীর 'থ্রী-ডেকার', ত্রয়ী, মহাকাব্যিক ইত্যাদি নানাগোত্রের উপন্যাসে যে বাস্তবতার নির্মাণ তা যেন অনেকটাই স্বপ্নবিলাস। এর বিপরীতে আধুনিক অস্তিত্ব চেস্টারটনের ভাষায়, একটা আভাস মাত্র, হয়ত বা শুধুই মায়া। আমাদের কোনো চূড়ান্ত সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি নেই। অসম্পূর্ণতা আমাদের আসল বাস্তবতা আর সম্পূর্ণতা আমাদের নির্মাণ, উপকথা আমাদের প্রকৃত ভাষ্য, কথা আমাদের সৃষ্টি। উপন্যাস থেকে ছোটোগল্পে আসা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জীবন ও সাম্প্রতিক সময়ের কাছে যাওয়া, জীবন ও শিল্পের অস্তিত্বকে আরো কিছুটা নিবিড় করা। অবশ্য এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। আবার একই লেখক গল্প এবং উপন্যাস একই সঙ্গে লিখছেন, যেন সময়, সমাজ ও জীবনেরই ভিন্ন কোনো দায় থেকে। যেমন রবীন্দ্রনাথ একদিকে তাঁর *গল্পগুচ্ছ*-এ পল্লী-প্রাঙ্গণের 'আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখের' কথা প্রতিবিম্বিত করলেন, অন্যদিকে নাগরিক জীবন, রাষ্ট্রভাবনা, রাজনীতি, স্বদেশ-বিদেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যবহার করলেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তার পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন গল্পকার বিশেষ করে হর্হে লুই বোরহেস এবং ফ্রানৎস কাফকা, অন্য এক আধুনিকতার সন্ধান করলেন ছোটোগল্পে। বোরহেস সচেতন নতুন কিছু সৃষ্টির পরিবর্তে একই কাহিনির মধ্য দিয়ে আধুনিক সময় ও জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার (ডিসকভারি) করতে চাইলেন আর কাফকা ছোটোগল্পে খুঁজে চললেন এমন শব্দমালা যা প্রাচীরের পরিবর্তে সেতু বাঁধতে পারে এবং একই সঙ্গে কেউ গল্পের সন্ধানে মাতলে যা একই সঙ্গে যুদ্ধ ও মুক্ত করতে পারে।

ছোটোগল্প যে উপন্যাস নয় কিংবা উপন্যাসের খণ্ডাংশ—তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ছোটোগল্প শিল্পরূপের ভিন্ন শিল্প-প্রকরণ। এই ভিন্নতাকে মেনে নিতে কিছু কিছু পাঠক-সমালোচকদের প্রাথমিক অসুবিধে হয়েছিল। তার থেকেই কাব্যধর্মী গল্প চিত্রধর্মী কাহিনী ইত্যাদি মতামতের সৃষ্টি। তেমনই সমালোচনার মুখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর কোনো কবি এত লেখেন নি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতিধর্মী। ...ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে আর মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান-জাতীয় পদার্থ বলবে?' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'অবাক লাগে', বোধহয় অসহায়ও বোধ করেছিলেন, কারণ রূপক-প্রতীক-ব্যঞ্জনার্থ ইত্যাদি দিয়ে ছোটোগল্পের যে শৈলী প্রকরণ তিনি গড়ে তুলছিলেন তা ছোটোগল্পের জাত নষ্ট করছে এমন এক ইঙ্গিত ছিল 'কাব্য-কবিতা' ইত্যাদি শব্দে। ছোটোগল্পের ছোটোর নির্মাণ যে শিল্পীর একটি বড় দায় এমন কথা ছোটোগল্পকাররা মাঝেমাঝেই মনে করিয়ে

দিয়েছেন। বলেছেন বেতার-কেন্দ্রের চৌম্বক ফিতে সম্পাদনার সময় শ্বাস, ক্ষণিক স্তব্ধতা এবং নীরবতাকে যত্নে সংরক্ষণ করতে হয়, বাদ দিতে হয় অন্য অংশ (হাইনরিশ ব্যোল-এর *মাকে'স কালেকটেড সাইলেনসেস* ১৯৫৮)। ছোটোগল্পকে হয়ে উঠতে হয় এমন এক নির্মাণ যার প্রতিটি শব্দ অনিবার্য। ক্যাথেরিন ম্যানসফিল্ড-এর ভাষায় একটি শব্দও স্থান বিচ্যুত নয়, একটি শব্দও নয় বাড়তি। গদ্যে লেখা হলেও ছোটোগল্প যে খণ্ড উপন্যাস কিংবা উপন্যাসের নাতিদীর্ঘ সংস্করণ নয় তার নিদর্শন মেলে যে কোনো উল্লেখযোগ্য গল্পের প্রতিটি বাক্যেই।

জাত-বৈষ্ণব

রমাকান্ত চক্রবর্তী

বিভিন্ন জাতির মানুষজন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে 'জাত-বৈষ্ণব' রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের 'সংযোগী' এবং 'বান্তাশী' বৈষ্ণব বলা হত। একটি মত অনুসারে 'আশ্রমান্তর গ্রহণের পর পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে "বান্তাশী" কহে। অর্থাৎ বমন করিয়া যে তাহা পুনরায় ভক্ষণ করে।' তবে 'বান্তাশী' জাত-বৈষ্ণব যে কী ভাবে ও কেন 'বান্তাশী' হয়েছিলেন, তা উদাহরণের অভাবে স্পষ্ট নয়। জাত-বৈষ্ণব সমাজে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত আছে। তাঁদের পনেরটি 'পরিবার' আছে, যথা 'অদ্বৈত পরিবার', 'নিত্যানন্দ-পরিবার', 'গদাধর পণ্ডিত পরিবার' ইত্যাদি। 'পরিবার'-শব্দ 'গোত্র'-শব্দের ব্যঞ্জনা বহন করে। জাত-বৈষ্ণব সমাজে বহিরাগতদের গ্রহণ করা হয়। অনেক ব্রাহ্মণও নানা কারণে জাত-বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তবে কোনো মুসলমান জাত-বৈষ্ণব সমাজে স্থান পান না। জাত-বৈষ্ণব দীক্ষার প্রণালী অত্যন্ত সরল; 'ভেক-গোসাঁই' দীক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রচলিত গুরুদক্ষিণা পাঁচসিকা। এই সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রাক্-বৈবাহিক যৌন-সঙ্গম শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল না; তবে এরূপ ক্ষেত্রে তার পরিণতি ছিল পাত্রপাত্রীর বিবাহ। বিবাহের পদ্ধতি ছিল স্মার্ত-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। কণ্ঠী-বদলের দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হত। বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল চৈতন্য-বিগ্রহের পূজন, 'মহাভোগ' এবং সংকীর্তন। বিধবার পুনর্বিবাহকে মান্যতা দেওয়া হয়। জাত-বৈষ্ণবদের প্রধান এবং একমাত্র দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরা প্রধানত চৈতন্যোপাসক—নিত্যানন্দের এবং অদ্বৈত আচার্যের পূজাও তাঁরা করেন। তাঁদের গুরুপরম্পরায় বৃন্দাবনের ছয় জন গোস্বামীর স্থান অতি বিশিষ্ট। এক কথায় বলা যায় জাত-বৈষ্ণবতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার লোকপ্রিয় অংশ। অনেক ক্ষেত্রে জাত-বৈষ্ণবের গুরু-গোসাঁই ব্রাহ্মণ; কিন্তু এরকম ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-সমাজে মান্যতা নেই। জাত-বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন। দাহ করেন না। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে চৈতন্যের পূজা করা হয়। 'মালসা-ভোগ' দেওয়া হয়। জাত-বৈষ্ণবরা ভিন্ন জাতির ব্যক্তিদের কাছ থেকে রান্না করা খাদ্য গ্রহণের বিরোধী।

মেদিনীপুর জেলায় উনিশ শতকের শেষে লক্ষাধিক জাত-বৈষ্ণব ছিলেন। ১৮৮১-র জনগণনা অনুসারে বঙ্গের সব জেলাতেই জাত-বৈষ্ণবদের সংখ্যা কমে যায়। তাঁদের মধ্যে অধুনা বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন; অনেক জাত-বৈষ্ণব সমৃদ্ধ গৃহস্থ। জাত-বৈষ্ণব সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা

হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলের পরিচালক ছিলেন একজন গোসাঁই। তাঁকে সাহায্য করতেন ক্রমানুসারে অধিকারী, ফৌজদার এবং ছড়িদার। 'ফৌজদার'-কে 'খুড়ো' বলা হত। দীক্ষিত-ব্যক্তি-প্রদত্ত পাঁচসিকা দক্ষিণা এই সব কর্মাধিকারীদের মধ্যে ক্রমানুসারে বণ্টন করা হত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-বর্ণিত পণ্ডিত মশাই ছিলেন জাত-বৈষ্ণব। তাঁর সচ্চরিত্র, উদারবুদ্ধি, জ্ঞানস্পৃহা আমাদের মুগ্ধ করে; তাঁর স্ত্রী প্রকৃত অর্থেই তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। অথচ, গৌড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা জাত-বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব-সমাজে সবার নিচে রেখেছিলেন। এমনও ভাবা হয়েছিল যে, জাতি (বর্ণ)হীন জাত-বৈষ্ণবদের কোনও সামাজিক পরিচিতি নেই। ব্রাহ্মণরা জাত-বৈষ্ণবদের অস্পৃশ্য ভাবতেন। যখন রিজ্‌লে এবং জেমস্ ওয়াইজ (দ্রষ্টব্য, James Wise, *Notes on the Races, Castes, and Traders of Eastern Bengal* (1883) জাত-বৈষ্ণব এবং ভিক্ষোপজীবী বৈরাগী-বোষ্টমদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন বলে সেকালের বৈষ্ণব ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে পরিচিত) জাত-বৈষ্ণবদের ও বৈরাগী-বোষ্টমদের মধ্যে কোনও পার্থক্য না দেখে জাত-বৈষ্ণবদের ব্রাহ্মণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পদতলে রাখার প্রস্তাব করেন। কোনো কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব (অব্রাহ্মণ হলেও) নিজেদের ব্রাহ্মণের সমান ভাবেন। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সমতার তত্ত্বানুসারে জাত-বৈষ্ণবগণ ও বৈরাগী বোষ্টমগণ ছিলেন অস্পৃশ্য, জারজ, এবং বদমাস। চৈতন্য এবং তাঁর সমকালীন অনুগামীগণ ভক্তিতে জাতপাতের বিচার করেননি। পরবর্তী গৌড়ীয় গোসাঁই-গোবিন্দগণ এই পথ থেকে সরে এসে গৌড়ামি অবলম্বন করলেন, এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রচারিত ধর্মের সামাজিক ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেললেন।

জাতিসত্তা

মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য

আধুনিককালের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী আলোড়ন ঘটেছে যে বিষয়গুলি নিয়ে তার মধ্যে জাতিসত্তা একটি। রাষ্ট্রের উদ্ভবে রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিসত্তার ভূমিকা অপরিমেয়। বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূল নিহিত আছে জাতিসত্তায়।

জাতিসত্তার সংজ্ঞা নির্ণয় করাও দুরূহ। কোনো কোনো পণ্ডিত জাতিসত্তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা তৈরি করাই সম্ভব নয় বলে মনে করেন। জাতিসত্তার নির্মাণে কি কি উপাদান প্রয়োজন হয় তা নিয়ে অদ্যাবধি বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ধর্ম, ভাষা, নৃগোষ্ঠী, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এমনকী ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও জাতিসত্তা নির্মিত হতে পারে। ভাষা নিয়ে জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে দ্বিখণ্ডিত করে কীভাবে বাংলাদেশ নির্মিত হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। অথচ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের আধুনিক দৃষ্টান্তও বর্তমান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের রাষ্ট্র ইউগোশ্লাভিয়া ভেঙে বসনিয়া-হারজেগোভিনার সৃষ্টি হয়েছে। নৃগোষ্ঠীভিত্তিক জাতিসত্তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে আছে জার্মানি ও হাঙ্গেরি। জার্মান অধ্যুষিত বহু ছোটোবড়ো রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে উনিশ শতকে জার্মানি গঠিত হয়। পরবর্তী শতকে অস্ট্রোহাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে ম্যাগিয়ার জাতি অধ্যুষিত হাঙ্গেরির সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক কারণে জাতিসত্তা নির্মাণের দৃষ্টান্ত স্পেন। পিরেনিজ পর্বতমালা স্পেনকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু স্পেনীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব সর্ববাদীসম্মত নয়। পশ্চিম স্পেন তথা পশ্চিম পিরেনিজের বেশ কিছু মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা বাস্ক (Basque) অবলম্বন করে এবং পশ্চিম স্পেনের প্রধান শহর বার্সেলোনাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন।

ভারতীয় জাতিসত্তা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রথম উচ্চারণ ঘটে উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনকালে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ কখনো একই জাতি বা ধর্মের মানুষের বাসভূমি ছিল না। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারত বহুভাষী দেশও বটে। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান উপাদান হিসাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অভিন্নতার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হত। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিস্তার বহু ভারতবাসীকে ভৌগোলিক

বিচ্ছিন্নতাসত্ত্বেও পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিল। মধ্যযুগে এক সঙ্গে ইসলামিক সংস্কৃতির সংযোগের ফলে ভারতীয় জাতিসত্তা আরও বিবর্তিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের নিষ্পেষণে তা পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় জাতিসত্তার রূপ পরিগ্রহ করে।

ইউরোপে যে রাষ্ট্রটি জাতিসত্তার আন্দোলন নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিব্রত হয়েছে সেটি হল অস্ট্রোহাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য। জার্মান, সার্বিয়ান, হাঙ্গারিয়ান, বসনিয়ান মুসলিম, রোমানিয়ান, আলবানিয়ান, চেক, বুলগারিয়ান, শ্লোভাকিয়ান, ম্যাসিডনিয়ান, মন্টিনেগ্রিন ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিঅধ্যুষিত এই সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে বহুধাবিভক্ত হয়। বসনিয়ার সারাজেভো শহরে ১৯১৪ সালে একজন সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদী জঙ্গী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির যুবরাজ ফ্রানজ ফার্ডিনান্ডকে হত্যা করে। ফলস্বরূপ অস্ট্রিয়া স্বাধীন সার্বিয়া রাষ্ট্রকে এক চরমপত্র দেয়। এই চরমপত্র সার্বিয়ার সার্বভৌমত্বের পক্ষে অপমানজনক ছিল। এখানেই দেখা গেল জাতিসত্তার কটুর অভিব্যক্তি। সার্বিয়ার সম্মান রক্ষার্থে এগিয়ে এল রাশিয়া। কারণ শ্লাভ জাতিসত্তা সার্বিয়া ও রাশিয়াকে একসূত্রে বেঁধেছে। জার্মানঅধ্যুষিত অস্ট্রিয়ার সমর্থনে এগিয়ে এল জার্মানি। এভাবেই প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি তৈরী হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান জাতিসত্তার ভয়াবহ আগ্রাসী রূপ প্রত্যক্ষ করেছে সারা পৃথিবী। দুটি মহাযুদ্ধে বহু মানুষের প্রাণহানি ও বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও জাতিসত্তার আগ্রাসীরূপ আজও প্রত্যক্ষ করছে পৃথিবীর মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউগোশ্লাভিয়া নামে যে বহুজাতিক রাষ্ট্র দক্ষিণ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে জাতিসত্তার নানান অভিঘাতের পরীক্ষাগার বলা চলে। এই রাষ্ট্রে সার্বিয়া (শ্লাভ অধ্যুষিত) প্রধান প্রদেশ ছিল। শ্লাভদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ক্রোট, বসনিয়ান মুসলিম, স্লোভেনিয়ান, ম্যাসিডনিয়ান প্রভৃতি জাতির মানুষেরা। এঁরা ফেডারেল ইউগোশ্লাভিয়া ভেঙে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিদার হলেন। কোথাও ধর্ম, কোথাও ভাষা, কোথাও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তাঁদের সংহতির অন্তরায়। সার্বিয়ান ও ক্রোশিয়ানদের ভাষা একই। সাউথ শ্লাভ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তাঁরা। কিন্তু সার্বিয়ানরা এ ভাষা লেখেন সিরিলিক (Cyrillic) লিপিতে। ক্রোশিয়ানরা লেখেন রোমান লিপিতে। (প্রসঙ্গত, সার্বিয়ান ও ক্রোশিয়ানদের বিভেদ দেখে *গালিভারস ট্র্যাভেলস*-এর লিলিপুটদের দেশের গৃহযুদ্ধের কথা মনে পড়বে। সেখানে বিবাদের জন্য দায়ী ছিল দুই বিবদমান গোষ্ঠীর ডিমভাঙ্গার পদ্ধতি। একদল ডিমের বড় দিকটি ভাঙত। তারা 'বিগ এন্ডিয়ান' [Big Endian]। আর একদল ছোট দিকটি ভাঙত। তারা 'স্মল এন্ডিয়ান' [Small Endian]। ধর্মও তাঁদের স্বতন্ত্র। সার্বিয়ানরা রাশিয়ানদের মত অর্থোডক্স চার্চের অনুসারী। ক্রোশিয়ানরা রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট। প্রধানত এই দুটি কারণে তাঁরা ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি করেছেন। ইউগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্র চাই। তাঁরাও ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হলেন গত শতকের নব্বই-এর দশকে। নৃগোষ্ঠী হিসাবে তাঁরা যে সার্বিয়ান বা ক্রোশিয়ানদের থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র তা নয়। কিন্তু তাঁদের ধর্ম আলাদা। তাঁরা মুসলিম। ক্রিশ্চান অধ্যুষিত ইউরোপে তাঁরা কীভাবে মুসলিম হলেন? সে কাহিনী

বড় করুণ। তুর্কি সাম্রাজ্যের বাড়বাড়ন্তের সময় তুরস্কের সুলতানের বাহিনী বহু অভিযান চালায় ইউরোপে। এই সময় শ্লাভ জাতীয় বহু অসহায় মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তুর্কি অভিযান শুরু হয় ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। কিছুকাল পরে তুর্কি সুলতান সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট (Suleiman the Magnificent) হাঙ্গেরি ও বলকান উপদ্বীপ দখল করেন। কিন্তু ১৬৯৯ সালে হাঙ্গেরি তাদের অধিকারমুক্ত হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বহুবার রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বলকান উপদ্বীপের আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ হয়।

শ্লাভ জাতীয় মানুষদের রক্ষাকর্তা ছিলেন রাশিয়ার সম্রাট। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বলকান অঞ্চলের ইতিহাস হল জারের কসাক বাহিনী ও তুর্কি সুলতানের জানিসারী বাহিনীর সংঘর্ষের ইতিহাস। বহু লোককাহিনী ও উপকথার উপজীব্য এই জাতিদ্বের। কসাকরাও অত্যাচারে কিছু কম যেতেন না। ধর্মের কারণে বহু মুসলমানঅধ্যুষিত অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হত রাশিয়ান বাহিনীর অত্যাচারে। ততদিনে ধর্মান্তরিত মুসলমানরাই একদা স্বগোষ্ঠীভুক্ত শ্লাভদের শত্রু। আজও তাঁদের অনেকে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন। প্যান ইস্লামিজমের এই কট্টর ভক্তেরা কাশ্মীরে বা অন্যত্র বিধর্মী বিনাশের জন্য জেহাদী সৈনিক পাঠান। আবার স্বদেশে সার্বদের বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করেন। কোনো কোনো পণ্ডিত আগ্রাসী জাতিসত্তার প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য (Hays, *Essays on Nationalism*) এঁদের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব অনেক সময়ই আগ্রাসী ও স্বার্থপর। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদ যা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে। ধর্মীয় কারণে জাতিসত্তা ক্ষুণ্ন হওয়া বা বহুজাতিক রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালয় ও সিঙ্গাপুর একত্রিত হয়ে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠন করেছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরকে মুসলিম অধ্যুষিত মালয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে দ্বীপরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে হয়। এ ঘটনা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের।

আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইহুদি বা ইজরায়েলি জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষের কথা সর্বজনবিদিত। মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ নৃতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে পরস্পরের নিকটাত্মীয়। অবশ্য ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে সমস্ত ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ ইজরায়েলে এসে বসতি করেছেন তাঁরা রক্তের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের থেকে স্বতন্ত্র। নানাদেশী ইহুদিদের একসূত্রে বেঁধেছে ধর্ম। তাঁদের জিওনিজম (Zionism)-এর সঙ্গে আরবদের প্যান ইস্লামিজম (Pan Islamism) এর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির একটি।

জাতিসত্তাকে বা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অতিক্রম করা বা নির্বাসিত করা বড় শক্ত কাজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী আক্রমণে কোণঠাসা সোভিয়েট ইউনিয়ন তা প্রমাণ করেছে। এই সময় স্তালিনশাসিত রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেট, মার্শাল সুভোরভ, মার্শাল কুটুজভ প্রভৃতি জাতীয় বীরদের স্মৃতিকে রুশ জনমানসে জাগরূক করে তোলার চেষ্টা হয়। পিটার দি গ্রেট অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ায়

আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করেন। রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এই স্বৈরাচারী জার। মার্শাল সুভোরভ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বহুযুদ্ধজয়ী সামরিক নেতা। আর মার্শাল কুটুজভ নেপোলিয়ানের বাহিনীকে প্রতিহত করে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রেষ্ঠ রুশ সেনাপতি হিসাবে পরিচিত হন। এঁদের স্মৃতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে রুশ জাতীয়তাবাদকে প্ররোচিত করে নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়াস, স্তালিন বিরোধীরা বিশেষ করে ট্রটস্কীপন্থীরা, তাত্ত্বিকভাবে অনুমোদন করেন নি। কারণ তা বলশেভিক আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরা তো যুদ্ধপূর্ব কালেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন।

জাতিসত্তার চেতনা বা জাতীয়তাবাদ শিল্পসংস্কৃতি ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। লিও টলস্টয়ের *ওয়ার এ্যান্ড পিস* উপন্যাসকে রুশ জাতীয়তাবাদের দলিল হিসাবে অভিহিত করা ঠিক হবে না। কিন্তু টলস্টয় মার্শাল কুটুজভকে তাঁর উপন্যাসে অনন্যসাধারণ এক উচ্চতায় তুলে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের রুশ জাতীয়তাবাদ যে টলস্টয়কে (১৮২৮-১৯১০) প্রভাবিত করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাঙলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী বা আনন্দমঠ তো জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি বটেই। যদিও তা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যথাযথভাবে খাপ খায় না। তবু বাংলা সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

অতীতে জাতিসত্তা নিয়ে যে মহাদেশে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন হয়েছে তা হল ইউরোপ। সেখানকার উন্নত দেশগুরি জাতিসত্তার সমস্যা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও যে জাতিসত্তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাও তারা উপলব্ধি করেছে। সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গঠন তারই প্রত্যক্ষ ফল। সম্ভবত এই পথেই জাতিসত্তা সংক্রান্ত বিবাদের অবসান হবে। যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের ব্যবস্থার উন্নতি পৃথিবীকে ক্রমশ ছোটো করে ফেলছে। দূরকে নিকট করলে, অপরিচয়ের গণ্ডী অপসারিত হলে জাতিসত্তার অভিমান দূর হয়ে কোনো না কোনোদিন বিভিন্ন জাতিসত্তার সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়।

জিন

আশিস লাহিড়ী

Gene শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ডেনিশ জীববিজ্ঞানী ভিল্‌হেল্ম লুডভিগ জোহানসেন (১৮৫৭-১৯২৭), ১৯০৯ সালে। জার্মান শব্দ gennan থেকে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হলেও শব্দটির আদি উৎস হল গ্রীক gignomai যার অর্থ 'জন্ম নেওয়া', 'হয়ে ওঠা'।

জিনের সর্বজনস্বীকৃত কোনও সংজ্ঞা দেওয়া এখানে বেশ কঠিন কাজ। ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকম : প্রতিটি জীবের দেহে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। যেমন মানুষের দেহে থাকে তেইশ জোড়া বা ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম। তার মধ্যে অর্ধেক আসে মায়ের শরীর থেকে, অর্ধেক বাপের শরীর থেকে। প্রতিটি দেহকোষের কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, তারই মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম। একটি ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে একটি জিন। জিন হল বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক ইউনিট। একটু টেকনিক্যাল ভাষায় বলা যায়, জিন হল ডি. এন. এ-র সেই অংশটুকু যা প্রোটিনের পলি-পেপটাইড শৃঙ্খলের সংশ্লেষণ ঘটায়।

জীবদেহকে যদি বাড়ি বলি, তাহলে প্রোটিন হল তার ইট। সেই ইট গেঁথেই বাড়ি তৈরি হয়। আবার এই ইট তৈরি হল কতকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডকে পরপর জুড়ে। পলিপেপটাইড শৃঙ্খল হল অমনই এক অ্যামিনো অ্যাসিডের মালা। মালায় কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের পর কোনটি গাঁথা হবে, তার ফরমুলাটা জানে কেবল জিন। তারই নির্দেশে এতবড়ো কাণ্ডটা ঘটে চলে।

কী করে ঘটে ব্যাপারটা? ডি. এন. এ-র মধ্যে থাকে দুজোড়া 'base'-Adenine [A] আর Thymine [T] দুটি এবং Cytosine [C]. Guanine (G). আর Guanine (G) আর দুটি। এই A.T.C.G. কে চারটে অক্ষর বলে কল্পনা করা যেতে পারে। ঐ চারটে অক্ষরের নানাবিধ সমাহার ও বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে নানান সংকেত গড়ে ওঠে। সেই সংকেত অনুসারে তৈরি হয় বিশেষ প্রোটিন। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের হরেক বৈশিষ্ট্য, তারাই চালায় শরীরের কাজকর্ম।

যৌন মিলনের মধ্যে দিয়ে একপ্রজন্মের জিন পরের প্রজন্মে পৌঁছে যায়। নকলনবিশিতে জিনের পটুত্ব অতুলনীয়। নব্য-ডারউইনবাদী বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তো তাঁর *The sefish Gene* বইতে জীনের সংজ্ঞাই দিয়েছেন এইভাবে : 'A gene is a replicator with high copying fidelity'. তাই একটা কোনো বৈশিষ্ট্যকে সে

একের পর এক প্রজন্ম ধরে কপি করে চলতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে একই প্রজন্মের সহোদর ভাইবোনদের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা দেয় কেন? এর একটা সহজ উত্তর এই যে বাবা এবং মা, এই দুই তরফের জিনই সন্তানদের দেহে থাকে। এতগুলো জিনের মিশ্রণের মধ্যে থেকে কার দেহে কোন কোন জিন বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই অনেকসময় দেখা যায়, চার ভাইবোনের মধ্যে একজনের রঙ ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা, চুল কোঁকড়া। অন্য তিনজনের রঙ কালো, নাক টিকালো, চুল সোজা। এ সবই ঘটে কোনো না কোনো জিনের কল্যাণে। এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, এটা পুরোপুরি আকস্মিক ব্যাপার। আর সেইজন্যেই প্রাণীদের মধ্যে এমন অসীম বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। একজন ব্যক্তির শরীরে লক্ষ লক্ষ জিন থাকে। তার মধ্যে সবগুলোই যে সক্রিয় থাকে, তা নয়। কিছু কিছু জিন আত্মগোপন করে থাকে, তাদের বলা হয় প্রচ্ছন্ন (recessive) জিন। তাদের প্রভাব শরীরে প্রকাশ পায় না। ধরা যাক কোনো পুরুষের শরীরে এমন একটি প্রচ্ছন্ন জিন আছে যার প্রভাবে বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। যেহেতু সেটি প্রচ্ছন্ন, তাই ঐ ব্যক্তির ওপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। এইবার ধরা যাক, ঐ পুরুষটির সঙ্গে এমন এক মহিলার যৌন মিলন হল যাঁর শরীরেও ঐ প্রচ্ছন্ন জিনটি রয়েছে। তখন কিন্তু তাঁদের সন্তানের দেহে ঐ বিশেষ জিনের মোট সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এবং তখন সেই জিনটা আর প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবে না, তা হয়ে উঠবে প্রকট (dominant)। তখন তার প্রভাবে সন্তানটি হয়তো জড়বুদ্ধি হয়ে পড়বে। ঠিক এর উল্টোটাও দেখা যায়। বাবা-মা দুজনেই কালো এবং বেঁটে, কিন্তু সন্তান ফর্সা এবং লম্বা। প্রচ্ছন্ন জিন প্রকট জিনে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অনুচিত।

ইতিহাস থেকে জিনের বিচিত্র কারিকুরির একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। হিমোফিলিয়া রোগ ছেলেদেরই হয়, মেয়েদের হয় না। কিন্তু মেয়েরা তার বাহক হতে পারে। এ রোগে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটা ঠিকমতো কাজ করে না। ফলে কারণে-অকারণে রক্ত পড়ে এবং তা বন্ধ হতে চায় না। মহারানি ভিক্টোরিয়া এই রোগের বাহক ছিলেন। তাঁর ছেলে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এ রোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। ফলে ইংলন্ডের বর্তমান রাজবংশ এই রোগ থেকে মুক্ত। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার দুই মেয়ে মায়ের মতোই হিমোফিলিয়ার বাহক হন। তাঁদের একজনের এক মেয়েও ছিলেন তাই এবং সেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের। এঁদের একমাত্র পুত্র হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই রোগের সুযোগ নিয়েই রাস্পুটিন তাঁর ওপর প্রভাব খাটায়। পরিণাম তো আমরা সবাই জানি। ভিক্টোরিয়ার আর এক মেয়ের মেয়েও ছিলেন হিমোফিলিয়া-বাহক। তাঁর বিয়ে হয় স্পেনের রাজ-পরিবারে এবং তাঁদের পুত্রসন্তানও হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হয়। এমনই অসীম ক্ষমতা জিনের।

জিন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সূত্রপাত করেন গ্রেগর যোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪), উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কড়াইশুঁটির রঙ, খোলসের কুঞ্চন, এইসব বৈশিষ্ট্য

কোন নিয়মে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়, তা নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। তিনি দেখেন যে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই একেকটি নির্দিষ্ট 'ফ্যাক্টর' রয়েছে। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের গুরুত্ব তাঁর সমকালে প্রায় কেউ বুঝতে পারেননি। বছর চল্লিশেক পরে বিংশ শতকের গোড়ায় এ নিয়ে নতুন করে কাজকর্ম শুরু হয়। তখন তাঁর গবেষণার অসীম গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। তার আবিষ্কৃত 'ফ্যাক্টর'-গুলোকেই 'জিন' নামে অভিহিত করেন জোহানসেন।

জিনোম

তুষার চক্রবর্তী

বিজ্ঞানীদের মহলে যদিও 'জিনোম' শব্দটি নতুন নয় বরং এর পিছনের ইতিহাস যথেষ্টই প্রাচীন তবু এটাও মানতে হবে যে অধুনা মানবজিনোম প্রকল্পের সৌজন্যেই পরিভাষাটি বিশেষজ্ঞদের বেড়া টপকে দ্রুত মুখের ভাষায় উঠে এসেছে।

জিনোম বলতে বোঝায় হয় যে কোনো জীবের কোষ-কেন্দ্রকে লুকিয়ে থাকা সামগ্রিক জেনেটিক উপাদানটিকে। কোনো জীবকে নির্দিষ্ট করার এটাই মুখ্য উপাদান। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে জীবজগতে জিনোম-এর আকৃতি এবং প্রকৃতিই হল মুখ্য জৈব-পরিচিতি। আদতে জিনোম বস্তুটি হল কোষ-কেন্দ্রকে নিহিত ক্রোমোজোমের মোড়কে আবৃত মোট (total) DNA-র সম্ভার। ব্যাকটেরিয়ার মত যে সব এককোষী জীব বা জীবাণু কেন্দ্রক-হীন এবং ক্রোমোজোম বর্জিত—তাদের ক্ষেত্রে কোষের সামগ্রিক DNAই হল জিনোম। তেমনি RNA ভাইরাসগুলির ক্ষেত্রে জিনোম বলতে গণ্য করা হবে সেই RNAটুকু যার অবিকল পুনরুৎপাদনের ফলে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

ব্যুৎপত্তিগত বিচারে জিনোম শব্দটি তৈরী হয়েছে জিন আর ক্রোমোজোম শব্দ দুটি জুড়ে। ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যাবে যে গ্রেগর মেন্ডেল তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার 'বংশগতির ধারক ও বাহক' কল্পিত বস্তুটিকে সর্বত্র 'উপাদান' বা Factor বলে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন। তাই কল্পিত বস্তুটির নির্দিষ্ট নামকরণের দায়িত্ব বর্তেছিল পরবর্তী যুগের জীববিজ্ঞানীদের ঘাড়ে। ওলন্দাজ জীববিজ্ঞানী দেভ্রীয়ে এর নাম দিতে চান Pangen। আরেক ওলন্দাজ জীববিজ্ঞানী জোহানসেনের পছন্দ ছিল আরো আকর্ষণীয় এবং তির্যক 'জিন' শব্দটি। গ্রিক জেনেসিস বা উৎস শব্দটি ভেঙ্গেই তিনি পরিভাষাটি গড়ে ছিলেন। কপালগুণে বংশগতির বাহক উপাদানটি বিজ্ঞানী মহলে 'জিন' নামেই টিকে গেল। অন্যদিকে ১৯০২ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নবীন ছাত্র ওয়াল্টার সাটন প্রথম জোর গলায় এই মত জাহির করলেন যে 'জিন'গুলির আস্তানা সম্ভবত ক্রোমোজোমে। এটা ততদিনে জানা গেছে যে ক্রোমোজোম নামের অতি ক্ষুদ্র সুতোর মত বস্তুগুলি কোষবিভাজনের ঠিক আগেই কোষ-কেন্দ্রকে কোনো এক অজানা উপায়ে নিজেদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ফেলে এবং, প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলির সংখ্যা ও আকার-প্রকার থাকে নির্দিষ্ট। সে যুগের বরিষ্ঠ জিনতাত্ত্বিক টমাস হান্ট মর্গান তত্ত্বটিকে

জোরালোভাবে সমর্থন করলেন এবং ফলের মাছি ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই মতটির স্বপক্ষে বহু তথ্য প্রমাণ জড়ো করলেন। অতঃপর হান্স উইলকিন্স্ নামে আরেক বিজ্ঞানী ১৯২০ সালে জিন এবং ক্রোমোজোম এই দুই পরিভাষা ও ধারণার মেলবন্ধন ঘটাতে 'জিনোম' এই পরিভাষাটির জন্ম দিলেন। সে যুগে এই জিনোম শব্দটি দিয়ে বোঝান হত ক্রোমোজোমে লুকিয়ে থাকা 'কাল্পনিক' জিন-সমষ্টিকে যা কিনা প্রাণীর সমস্ত জৈবধর্মের ধারক ও বাহক। সুতরাং হান্স উইলকিন্সকেই জিনোম শব্দটির জনক বলে ধরতে হবে। প্রাণানুবিদ্যার (Molecular Biology) চর্চা থেকে আজ জিন আর কোনো 'কল্পিত' ধারণা নয় বরং এটা প্রমাণিত সত্য যে জীবের জিনোমে অতিবৃহৎ DNA-র ভাষায় লিখিত আছে অধিকাংশ জৈবধর্মের অনুময় সংকেত। তাই প্রায়ই হেঁয়ালি করে বলা হয় যে 'জিনোম' হল জীবনের পুঁথি (Book of life) বা 'ঈশ্বরের থালা' (holi grail)।

জিনোম অবশ্য শুধু যে জিনের সমাহার তাই নয়—প্রকৃতপক্ষে এটি হল একটি পরিপূর্ণ ছক বা কৌশল (Strategy) যাকে কোষ দ্বারা ঠিকমতো চালনা করে প্রতিটি জীব নিজেদের দেহ নিজেরাই তৈরী করে, লালন করে এবং বংশগতির দ্বারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। তাই জিনোমে একদিকে যেমন রয়েছে জিনরূপী সাংগঠনিক সূত্র—যা থেকে নির্দিষ্ট RNA এবং প্রোটিন তৈরী হতে পারে—অন্যদিকে পাশাপাশি লুকিয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ কার্যকর নির্দেশের তালিকা এবং সর্বোপরি অতীব জটিল অথচ নির্ভুল নিয়ন্ত্রণের লাগাম। এর অনেকটাই আজও অজানা বলেই আশা করা হয় যে বিভিন্নভাবে জিনোম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের জীববিদ্যা প্রকৃত সাবালকত্ব অর্জন করবে।

অনেকেই হয়ত জেনে অবাক হবেন যে মানব জিনোমে নির্দিষ্ট RNA বা প্রোটিন তৈরির সংকেতবাহী জিনগুলি জুড়ে আছে মাত্র দুই শতাংশ স্থান। অর্থাৎ, জিনোমের শতকরা ৯৮ শতাংশ (প্রায় পুরোটাই) দখল করে আছে এমনতর DNA-র বিন্যাস যারা কোনো জিনেরই অংশ নয়। জিনগুলো যেন এই সব অজানা DNA-র সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—যাদের দূরবীন লাগিয়ে খুঁজতে হয়। আপনি অবশ্যই জানতে চাইবেন যে এই বিপুল পরিমাণ DNA, যারা কোনো প্রকৃত জিনের অংশ নয়, তাদের নির্দিষ্ট কাজ কী?

দুঃখের বিষয় হল, প্রশ্নটি নিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে মাথা ঘামিয়েও বিজ্ঞানীরা আজও কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি, উপনীত হতে পারেন নি কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে। অবশ্যই জিন নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু সংকেত ছড়িয়ে আছে এদের মধ্যেই। তবে অনেকে এমনও মনে করেন যে জিনোমের অনেকখানিই জুড়ে আছে এমনতর সব বাপছাড়া পৌনঃপুনিক (repetitive) DNA-র বিন্যাস যারা সম্ভবত অকেজো বা আবর্জনা (DNA Junk) মাত্র।

বস্তুত জিনোমের পরিমাণগত রূপের সঙ্গে জীবের চরিত্রের জটিলতা, অভিব্যক্তির সময়সূচি বা প্রজাতিগত স্তরের কোনো সম্পর্ক একান্তই দুর্নিরীক্ষ। এও দেখা গেছে যে তথাকথিত 'উচ্চবর্গীয়' জীব মানুষের তুলনায় অনেক 'নিম্নবর্গীয়' জীব সালামান্ডারের

জিনোমে DNA-র পরিমাণ ২০ গুণেরও বেশি। এমনকি অনেক এককোষী অ্যামিবাও মানুষের তুলনায় দশগুণ বড়ো জিনোমের দখলদার। জিনোমের আকার বা বৈচিত্র্যের সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের এই অসামঞ্জস্য বা বেখাপ্পা আচরণকে বলা হয় C-value paradox—যেখানে 'C' হল Complexity বা বৈচিত্র্যের দ্যোতক।

১৯৯৫ সালে প্রথম জিনোম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রাণীটি ছিল হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নামের ব্যাকটেরিয়া। ক্রেনা ভেন্টর নামে তুখোড় এক বিজ্ঞানীর পরিচালনায় তাঁরই তৈরি 'সেলেরা জেনোমিকস্' নামধারী নবীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কাজটি সম্পাদন করে। জিনোম প্রকল্পের উন্নয়ন, বিকাশ ও দ্রুত রূপায়ণের মূলে এই একরোখা বিজ্ঞানীর অবদান অপরিসীম।

ইতঃপূর্বে জেমস ওয়াটসনের ব্যক্তিগত উৎসাহে ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের আঁতুড়ঘরে মানবজিন প্রকল্পের জন্ম। শুরুতে, প্রকল্পটির সারবত্তা নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে বিজ্ঞানীদের মহলে। যদিও পরিশেষে প্রকল্পটিতে সামিল হয় প্রাণানুবিদ্যায় এগিয়ে থাকা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্র। প্রকল্পটি তার ফলে একটি আন্তর্জাতিক ও গণমুখী চরিত্র অর্জন করে। ধীরে ধীরে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। প্রকল্পটিও শুধু মানব জিনোমে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর জিনোম উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব কাঁধে নিল। কেননা, অভিব্যক্তির সূত্রে যেমন সমস্ত প্রাণী একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত—যার উৎস হল DNA-র ভাষা তেমনি জীববিদ্যার নির্দিষ্ট প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান নির্ভর করে এক নয়, বহু প্রাণীকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করার ওপর।

আজকের জিনোম প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য চতুষ্টয় হল এরকম :

১. জিনোমে জিনগুলির অবস্থান নির্ণয় এবং জিন মানচিত্র রচনা।

২. জিনোমে সমগ্র DNA-র পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস (sequence) নির্ণয় এবং নির্দিষ্ট জিনগুলির সনাক্তকরণ।

৩. জিনোম বিশ্লেষণ এবং উপরিউক্ত তথ্য সমুদয়কে উৎসাহী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলিকে কম্পিউটার এবং আন্তর্জালের মারফৎ বিনামূল্যে এবং বিনা শর্তে উত্তরণের ব্যবস্থাপনা।

৪. এই প্রকল্পগুলিতে আহরিত জ্ঞানসম্ভার ও তথ্য যাতে মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয় তা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ, এই জ্ঞানের অনৈতিক ব্যবহার বা প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ, এবং এর দ্বারা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির সমস্ত রকম সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যে সম্পর্কে জনগণকে আগেভাগে সচেতন ও সতর্ক করে তোলা।

মানব জিনোম প্রকল্পের প্রথম তিনটি দায়িত্ব মোটের ওপর পালিত হয়েছে। ২০০৩ সালটি DNA-র দ্বিতন্ত্রী গঠন প্রতিমা আবিষ্কারের সুবর্ণজয়ন্তী। তেমনই মানব জিনোম প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার সূত্রে বছরটি (১৪ এপ্রিল ২০০৩) বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানব জিনোম বা অন্যান্য জিনোম প্রকল্পগুলির চতুর্থ লক্ষ্য বা নৈতিক দায়িত্ব পালনের সময়সীমা, স্বাভাবিক কারণেই অনির্দিষ্ট। এই অন্যটির সাফল্যের খতিয়ান দেবে আগামী দিন।

অনেকেই মনে করেন যে জিনোম প্রকল্পগুলি নিয়ে বিশ্বজুড়ে মাত্রাতিরিক্ত হৈ চৈ বাধানো হয়েছে। আশা ও সম্ভাবনাগুলি যথেচ্ছ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। এ সবের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ত ছিল জিন প্রযুক্তিতে অতিদ্রুত বাণিজ্যিক পুঁজির অভিনিবেশ ঘটানো। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার যুগে এই নতুন প্রযুক্তিকে খড়কুটোর মতই আঁকড়ে ধরতে চাইছে বৃহৎ পুঁজির কারবার—এই ধারণা নিতান্ত অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া কঠিন। এবং সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ সফল হয়েছে—এটা বলাই বাহুল্য। বাণিজ্যের জগতে জিনপ্রযুক্তি দ্রুত একটি বিশাল জায়গা দখল করেছে। কিন্তু, এই সব সম্ভাবনার কতগুলি আশু ফলপ্রসূ হবে এবং কতগুলি নিতান্তই আকাশ কুসুম তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন।

তবে বাণিজ্যিক লাভ-লোকসানের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও জিনোমচর্চার গুরুত্ব থেকেই যায়।

তুলনামূলক জিনোম বিশ্লেষণ প্রাণী বিবর্তনের আদি ও সনাতন প্রশ্নটিতে নতুন মাত্রা আরোপ করেছে। অভিব্যক্তি ক্রমশ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়ছে এবং এটা আশা করাও বোধ করি অসঙ্গত হবে না যে—জিনোমের কূট-সংকেতের অর্থোদ্ধার করার কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে আজকের কম্পিউটার, গণিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নতুন নতুন শাখা একদিকে যেমন জিনোমকে নিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ করবে—অন্যদিকে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেরাও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

এটাও লক্ষ করবার বিষয় যে জিনোম বিদ্যার (Genomics) অভাবনীয় অগ্রগতি নতুন যুগের জীববিজ্ঞানকে খণ্ডাত্মক প্রাণানুবিদ্যার পথ থেকে ধীরে ধীরে একটি সমগ্রবাদী এবং তুলনামূলক জীববিজ্ঞানের নবদিগন্তে ঠেলে দিচ্ছে।

জীবনমুখী গান

রংগন চক্রবর্তী

১৯৯১-৯২ সালে বাংলা গানে আমরা সুমন চট্টোপাধ্যায় নামে এক গায়কের আবির্ভাব লক্ষ করি। সুমনের প্রথম ক্যাসেট 'তোমাকে চাই' বাংলা গানে এক পরিবর্তন সূচিত করে। সুমনের জন্ম ১৯৫০ সালে। ১৯৬৬ সালেই তিনি আকাশবাণী কলকাতায় গান গেয়েছেন। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তাঁর দুটি রবীন্দ্রসংগীতের ডিস্কও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সুমন কার্যোপলক্ষে আমেরিকা ও জার্মানিতে কাটান। এই সময় তিনি কয়েকবার দেশে আসেন ও পরিচিতদের সঙ্গে নিজেদের মতো করে গান তৈরি ও ক্যাসেট প্রকাশের চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে ছিল : 'অন্য কথা অন্য গান' এবং 'নিকারাগুয়ার জন্য'। এই প্রচেষ্টাগুলো পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বললে ভুল বলা হবে না।

১৯৮৯ সালে সুমন পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে গান করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯২ সালে তাঁর ক্যাসেট 'তোমাকে চাই'-এর বাণিজ্যিক মুক্তির পর থেকে সুমনের গান প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী বেশ কিছু ক্যাসেটের সাফল্য এবং প্রচুর গানের অনুষ্ঠান তাঁর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। এই সাফল্য তাঁর একক সাফল্য নয়। সুমন বাংলা গানে যে নতুন আবহাওয়া তৈরি করেন, সেই পরিসরে আরো এক ঝাঁক নতুন গায়ক গায়িকা উঠে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নচিকেতা, শিলাজিৎ, অঞ্জন, লোপামুদ্রা, মৌসুমী, কাজী কাদম্বরী, তপন সিন্‌হা ইত্যাদি। এই পরিবর্তিত এবং তুলনামূলকভাবে মুক্ত গানের পরিবেশে রামপন্থী ঘরানার গানও নতুন করে সামনে উঠে আসে, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব-অনুশ্রী চক্রবর্তীরা জনপ্রিয় হন।

পত্র-পত্রিকা, শ্রোতা, সমালোচকরা এই নতুন গানকে 'জীবনমুখী' নামেই চিনে নেন। 'জীবনমুখী বাংলা গান' কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল নচিকেতার একটি ক্যাসেটে। এই কথাটি নিয়ে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টিও হয়েছিল। 'এই গান জীবনমুখী হলে পুরনো বাংলা গান কি মরণমুখী?' এই জাতীয় প্রশ্নও উঠেছিল।

এখন বোধ হয় বলা যেতে পারে যে 'জীবনমুখী' বাংলা গান নব্বই-এর দশকের প্রথম ভাগে একটা আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছেছিল, অন্তত কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলোয়। গ্রামাঞ্চলে এই গানের প্রভাব তেমনভাবে পৌঁছয়নি। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সর্বসম্মতভাবে এই গানকে 'জীবনমুখী' নামে অভিহিত করা হলেও এই আন্দোলন গোষ্ঠীভিত্তিক হয়ে ওঠে। এঁদের অনেকেই এবং তাঁদের শ্রোতারা 'জীবনমুখী'

অভিধাটিকে অপছন্দ করেন। গায়কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে—পরবর্তীকালে অবশ্য আবার যৌথ অনুষ্ঠান দেখা যায়, সম্ভবত বাণিজ্যিক অনুশাসনের ফলে।

বাংলা গানের বৃহত্তর ইতিহাসে জীবনমুখী নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সংক্ষেপে তার একটা আলোচনা করা যাক। জীবনমুখী বাংলাগানের গান নির্মাণের পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গ্রামোফোন ও রেডিওকে ঘিরে বাংলা গান বাণিজ্যিক শিল্প সংগঠনের পথ ধরে ছিল। গান রচয়িতা, সুরকার, গায়ক, সঙ্গতকার ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। সুমন কিন্তু নিজেই গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। নচিকেতা, শিলাজিৎ, অঞ্জন, প্রতুল, বিপুল-অনুশ্রীরাও তাই।

অনুষ্ঠানে বাংলা গান গাওয়া ও শোনার ব্যাকরণেও পরিবর্তন ঘটল। এতদিন পর্যন্ত গায়ক গায়িকারা মূলত মঞ্চে বসে গাইতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা হার্মোনিয়াম বাজাতেন, তবলা, গিটার ইত্যাদি সঙ্গত থাকত। সুমন মঞ্চে এলেন একা, গিটার ও সিন্থেসাইজার নিয়ে, অঞ্জন গিটার নিয়ে, নচিকেতা, শিলাজিৎ ইত্যাদিদের সঙ্গে থাকল নতুন ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এঁরা সবাই দাঁড়িয়ে গাইলেন। কেউ কিছুটা নাচলেনও। শ্রোতাদের গান শোনার অভ্যাসেও পরিবর্তন ঘটল। সুমন কিছু কিছু গানে শ্রোতাদের তাঁর সঙ্গে গাইতে আহ্বান জানালেন। নচিকেতা, শিলাজিৎ-এর কিছু অনুষ্ঠানে শ্রোতারা নাচতে শুরু করল। গানের সঙ্গে আলোর ব্যবহার শুরু হল—গান আর শুধু অডিও নয় ভিস্যুয়ালও হয়ে উঠল।

নতুন বাংলা গানের প্রচার ও প্রসার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল অডিও টেকনোলজির বিশ্বায়নের সঙ্গে। আশির দশকেই অডিও বিপ্লবের ঢেউ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। সস্তায় ক্যাসেট প্লেয়ার এবং ক্যাসেট গানের ইন্ডাস্ট্রিকে বিপুল সাফল্য দেয়। এই ক্যাসেটের প্রচার জীবনমুখী গানেরও মূল অবলম্বন ছিল। ক্যাসেটের প্রচারই অনুষ্ঠানের বাজার তৈরি করে। এর কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দিকও ছিল। ফিল্ম ও গ্রামোফোনের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে রেডিও বিংশ শতাব্দীর বিশাল অংশ জুড়ে বাংলা গানের রুচি তৈরি ও নিয়ন্ত্রণে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। অনুরোধের আসর, ছায়াছবির গান, বিবিধ ভারতী ইত্যাদির মধ্য দিয়েই গান ঘরে ঘরে পৌঁছত। নব্বইর দশকের গোড়ার দিকে রেডিও ক্যাসেট বাজাত না। সরকারি রুচিবোধ এবং বিশাল সংখ্যক পরিশীলিত মানুষের কাছে 'জীবনমুখী'র সংস্কৃতি মূল্যবোধ ব্রাত্য ছিল। ক্যাসেট জীবনমুখীর ভক্তদের প্রিয় গান যথেচ্ছভাবে শোনবার স্বাধীনতা দেয়।

'জীবনমুখী' অভিধাটি গ্রহণ বা বর্জনে গায়ক গায়িকারা বিভিন্ন মতাবলম্বী হলেও এই নতুন গানে প্রচলিত বাংলা গানের 'চাঁদ-তারা-ফুল' থেকে বাস্তবের মাটিতে ফেরার একটা চেষ্টা ছিল। এই দাবি তাঁদের সমর্থক ও বিরোধীদের দুটি শিবিরে বিভক্ত করেছিল।

নতুন গান কি পুরোপুরিই নতুন ছিল? কোনো শিল্পই আকাশ থেকে পড়ে না। এই নতুন গানের জন্মও তাই ইতিহাসের মাটিতেই। আধুনিক বাংলা গানে মূলত একটা

রোমান্টিক প্রেমের ধারা থাকলেও সবই এক ধাঁচের ছিল একথা বলা ভুল। বহু গানে নানা চরিত্র, শহরজীবন নানা ভাবে উঠে এসেছিল। সাতের দশকে মহিনের ঘোড়াগুলি, বুদ্ধদেবপ্রসাদের গান, নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা নানা গান, চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলন এবং সলিল চৌধুরির গানের সঙ্গে 'জীবনমুখী'র নানান যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বলে এই গানকে আগের গানের বোধের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি বললে এর নতুনত্ব ও অবদানকে ছোটো করে দেখানো হবে।

জীবনমুখীর বিভিন্ন গায়কের গানের ধরন ছিল একেবারেই আলাদা। সুমনের গানের কথায় শিক্ষিত বাংলা মননের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর গানে সুকুমার রায়-সলিল-ভীমসেন যোশি-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে ঘিরে, বাঙালির ও বাংলার সংস্কৃতির আবাহন চলে। গান সামাজিক প্রতিবাদের ভাষায় মুখর হলেও পরিচিত বামপন্থার অনুসারী নয়। এ গানে মধ্যবিত্তের আপোসের কথা ফিরে ফিরে আসে, তার যন্ত্রণা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা পাশাপাশি স্থান পায়।

নচিকেতার গানের 'আমি' তুলনায় অনেক নিশ্চিত। সাধারণত সে একজন বেকার তরুণ—সবাই তাকে 'বিট্রে' করেছে। প্রেমিকা, সমাজ সবাই। নিজেকে প্রশ্ন না করার তুলনামূলক নিরাপত্তা থেকে সমাজ সমালোচকের ভূমিকা এবং অত্যন্ত শক্তিশালী গায়কী নচিকেতার অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ বলে মনে হয়। কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তাঁর গানের কথার এবং বিশেষত গায়নভঙ্গির শারীরিকতার প্রভাবও খুবই শক্তিশালী।

তুলনায় শিলাজিৎ-এর গানের কথা কিছুটা অপরিণত বোধের পরিচায়ক। যদিও তার মধ্যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় কিছু গভীর অনুভূতি। আমার মতে শিলাজিৎ-এর আসল অবদান শব্দ নিয়ে তাঁর আশ্চর্য পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রথম ক্যাসেট থেকে শুরু করে 'ফিস্‌ফিস্' পর্যন্ত চমকে দেওয়ার মতো কাজ—কিন্তু শব্দের এই পরীক্ষা নিয়ে ভাববার শ্রোতা বোধ হয় যথেষ্ট তৈরি হয়নি।

অঞ্জনের মূল বৈশিষ্ট্য গানে নানান চরিত্র তুলে নিয়ে আসা। এই নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, কিন্তু নির্মাতার গান খুবই দৃশ্যভিত্তিক, আর একটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য দিক হল নানান প্রান্তিক চরিত্রের গল্প। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কালো মেয়ে, মুরগি-কাটা-আসিবারা, স্যামশন, কলকাতায় ছিল, কিন্তু বাংলা গানে ছিল কী?

জীবনমুখী-পূর্ব আধুনিক বাংলা গানের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু প্রতিভাশালী গায়িকার দেখা পেলেও প্রায় কোনো মহিলা গীতিকারের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই নতুন গান বেশ কিছু গায়িকা আমাদের সামনে তুলে আনে, তাঁদের মধ্যে অনুশ্রী চক্রবর্তী ও মৌসুমী ভৌমিক নিজেরা গানও লেখেন। মৌসুমীর গান বিশেষ করে নারীত্ব ও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতগুলোকে তুলে ধরে।

২০০৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই যে জীবনমুখীর স্রোত স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাংলা গানে এখন জনপ্রিয় ট্রেন্ড ব্যান্ডের গান, দুটি ব্যান্ড 'ভূমি' এবং 'চন্দ্রবিন্দু' বিশেষ ভাবে সফল। জীবনমুখী কি তবে শেষ? গানের বোধ হয় শেষ শুরু হয় না। নতুন ভাবে বেশ টিকে থাকে।

জৈনধর্ম

শ্যামল রায়

জিনের অনুগামীদের জৈন নামে অভিহিত করা হয়। 'জিন' শব্দের অর্থ জিতেন্দ্রিয়। জিনের প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈন। জৈনধর্মকে অর্হৎ বা নির্গ্রন্থ ধর্ম নামেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা এই চতুবর্গকে নিয়ে যিনি সংঘ স্থাপন করতে পারেন তাকে তীর্থঙ্কর বলে। ঋষভদের থেকে শুরু করে জৈনধর্মে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ করা হলেও ঐতিহাসিকেরা শুধু পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই দু'জন তীর্থঙ্করকে প্রামাণ্য বলে মনে করে থাকেন।

জৈন ধর্মগ্রন্থের নাম *কল্পসূত্র*। কল্পসূত্র প্রাকৃত ভাষায় লেখা। ভগবান মহাবীর প্রচারিত জৈনধর্মের প্রধান লক্ষ্য হল আত্মাকে বিকশিত করে মুক্ত হওয়া। আত্মা কীভাবে বদ্ধ হয় এবং কীভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত নবতত্ত্বে তার উল্লেখ রয়েছে। জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ এই নয়টি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নবতত্ত্বের অন্তর্গত।

সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চারিত্র ও অহিংসার উপর ভিত্তি করে জৈনধর্ম গড়ে উঠেছে। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রকে পূর্ণরূপে উপাসনা করলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে জৈনরা মনে করে থাকেন। সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ও অহিংসা এই পাঁচটিকে জৈনধর্মে মহাব্রত বলে উল্লেখ করা হয়। জৈন দর্শনে অহিংসার সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। সেখানে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অনেকান্তস্যাদবাদ। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে থাকেন যে, অনেকান্ত দৃষ্টি ছাড়া অহিংসা পালন করা সম্ভব নয়।

মানুষ তার জ্ঞানের অপূর্ণতা ও আংশিকতার জন্য বস্তুর সামগ্রিক গুণকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বস্তুর স্বরূপকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ভাষার অসামর্থ্য ও শব্দার্থের সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ অযথা কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়। অহংবোধ তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। অনেকান্তবোধের সাহায্যে মানুষ সমন্বয়ের পথে বহু বিরোধকে এড়িয়ে যেতে পারে বলে জৈন দর্শনে বলা হয়ে থাকে।

হিংসা-অহিংসা জৈন ধারণা অনুযায়ী ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তা ভাবের উপর নির্ভর করে। হিংসা শুধু দেহের বহিঃপ্রকাশ নয়, মানুষের মনেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। তাই হিংসা যেমন দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত হয় তেমনি বাক্যবাণে

বিদ্ধ করেও মানুষ হিংসাকে প্রশ্রয় দিতে পারে। কায়-মন-বচনকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে অহিংসা পালন করা যায় না। তার জন্য চাই অনেকান্তদৃষ্টি। অনেকান্তদৃষ্টির সাহায্যে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রের অধিকারী হওয়া যায়।

জৈন সাধুরা ক্ষমা, মার্দব (নম্রতা), আর্জব (সরলতা), নির্লোভতা, অকিঞ্চনতা, সত্য, সংযম, তপস্যা, শৌচ ও ব্রহ্মচর্য এই দশটি যতিধর্ম পালন করে থাকেন। শ্রাবক-শ্রাবিকা বা গৃহস্থদের জন্য জৈনধর্মে নিয়ম-কানুন এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যাতে তাঁরা সমাজের মধ্যে সৎপথে থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও তৃষ্ণাকে সংযত করতে পারেন। গম্ভীর, সৌম্য প্রকৃতি, অক্রূর, অশঠ, দয়ালু, মধ্যস্থ, গুণানুরাগী, বিনীত, কৃতজ্ঞ, পরহিতব্রতের জন্য তাঁদের দ্বাদশ ব্রত পালন করতে হয়। এই দ্বাদশ ব্রতের মধ্যে রয়েছে—১. স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণব্রত ২. স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ ব্রত ৩. স্থবল অদত্তদান বিরমণ ব্রত ৪. স্থূল মৈথুন বিরমণ ব্রত ৫. পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত ৬. দিক্ পরিমাণ ব্রত ৭. ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত ৮. অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত ৯. সাময়িক ব্রত ১০. দেশাবকাশিক ব্রত ১১. পৌষধ ব্রত ১২. অতিথি সংবিভাগ ব্রত।

এই দ্বাদশ ব্রতের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে অনুব্রত, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত তিনটিকে গুণব্রত ও নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত চারটি ব্রতকে শিক্ষাব্রত বলা হয়। কৃচ্ছ্রতা জৈনধর্মের সবচেয়ে বড় বিষয়। তাই জৈনধর্মের সঙ্গে উপবাস অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। জৈনেরা প্রধানত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

আধুনিকতার প্রভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতোই জৈনদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন দেখা গেলেও তাঁদের পারিবারিক আচার-সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জৈন রীতি-নীতির সঙ্গে সনাতন ধর্মেরও কিছু কিছু মিল লক্ষ করা যায়। সন্তান জন্মগ্রহণের পর ষষ্ঠদিনে যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ছঠ্টি বা নামকরণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এক থেকে দুই বৎসরের মধ্যে নবজাতকের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। একে মুণ্ডন বলে। আগে চার বছর, চারমাস, চারদিন বয়স পূর্ণ হলে হাতে খড়ি দেওয়া হত। এখন অনেক আগেই শিশুশিক্ষার পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। জৈন বিয়েতে পণের আদান-প্রদান নেই। মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে মামাকে একটা বড় খরচ বহন করতে হয়। বিয়েতে বরের বেশ রাজস্থানি শেরওয়ানি ও মাথায় পাগড়ি থাকে। কনের পরনে থাকে ঘাগরা-উড়নি। মৃত্যুর পর মৃতদেহ বাড়িতে শুদ্ধ করে শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার হাতের কাচের চুড়ি ভেঙে দিয়ে সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়। সধবার চিহ্ন—চুটকি, মল, নাকের ফুল খুলে নেওয়া হয়। মৃত্যুর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে দুপুর একটায় মৃতের গৃহে আত্মীয় সমাবেশ ঘটে। বারো দিনের পর মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়। মৃতের পরিবারবর্গ শোকের চিহ্ন হিসেবে গলায় সাদা উত্তরীয় পারলৌকিক ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করেন। হোলির দিন সমাজের মানুষ এসে আবির রঙ দিয়ে মৃতের পরিবারের শোকভঙ্গ করেন। জৈন সমাজে জাতিভেদ নেই। তাই জৈন সমাজে পুরোহিতের অস্তিত্বও নেই। কিন্তু পূজা পার্বণে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন মেটায় হিন্দু পুরোহিতেরা। জৈন মন্দিরে কাঠ বা মাটির মূর্তি থাকে না। প্রস্তর নির্মিত তীর্থঙ্করদের

মূর্তি জৈন মন্দিরে পূজিত হয়ে থাকে। জৈন পূজা-পদ্ধতিতে কাটা ফলের প্রচলন নেই। পূজায় গোটা ফল ব্যবহার করা হয়।

মহাবীর জয়ন্তী, পর্যুষণা, আখাতিজ (অক্ষয় তৃতীয়া), দেওয়ালির দিন ভগবান মহাবীরের নির্বাণ তিথি, ওলিজি বা নবপদের পূজা, হোলি, বসেরা, জ্ঞানপঞ্চমী, কার্তিকী পূর্ণিমা ইত্যাদি জৈনদের কয়েকটি প্রধান উৎসব। জৈন সাধুসাধ্বীরা আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারমাস ভ্রমণ করেন না। তখন তাঁরা মন্দিরে বসবাস করে গৃহস্থদের প্রবচন দান করেন। চতুর্মাস্যার সময়ে জৈন গৃহস্থদেরও অনেক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। সে সময় গৃহে কোনো শুভ কাজ হয় না। চতুর্মাস্যার শেষে কার্তিকী পূর্ণিমায় কলকাতায় জৈনদের যে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয় তা পরেশ (পার্শ্ব) নাথের মিছিল নামে সুপরিচিত। মিছিলের পুরোভাগে থাকে আভিজাত্যপূর্ণ ধ্বজা। সেই মিছিলে পালকিতে করে তীর্থঙ্করদের মূর্তি বহন করা হয়। দেব-দেবীর পূজা জৈনধর্মে নিষিদ্ধ হলেও সংস্কার অনুযায়ী তাঁরা বসেরা, ভৈরুজী, শাসনদেবী, পদ্মাবতী, ভোমিয়াজী, সরস্বতী, মানভদ্রজী প্রমুখ লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা সহ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন শহর ও শিলিগুড়িতে প্রচুর জৈনধর্মের মানুষ বসবাস করে থাকেন। প্রধানত তাঁরা রাজস্থান থেকে আগত এবং পুরুষানুক্রমে এখানে জমিদারিসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। প্রয়াত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ বিজয় সিং নাহার, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর ইন্দ্র দুগার ছিলেন জৈন পরিবারের সন্তান। কলকাতা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় 'শ্রমণ' ও ইংরেজিতে 'জৈন জার্নাল' নামে জৈনধর্ম সংক্রান্ত দু'টি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

জোট-নিরপেক্ষতা

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্ব-রাজনীতিতে যে রাজনৈতিক সমীকরণের উদ্ভব হয়েছিল তার প্রতিফলন হল দ্বিমেরুকরণে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ রাশিয়ার নেতৃত্বে সমান্তরাল অন্য এক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভরকেন্দ্র গড়ে তুলল। বাণিজ্যিক স্বার্থ, বাজার সম্প্রসারণের প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি পৃথিবীতে দুই যুযুধান শিবিরের জন্ম দিল। বস্তুত ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে রুশ-মার্কিন শিবিরে দ্বন্দ্ব পরীক্ষিত হচ্ছিল বিশ্বের সর্বত্র। আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে এমনকি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডেও এই সংঘাতের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছিল। দ্বিমেরুকরণ ও ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূত্রপাত বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকেই হয়েছিল। কূটনৈতিক স্তরেই এই লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য মূল প্রশ্নটা ছিল আন্তর্জাতিক বাজার দখল নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে উভয় শিবিরের রাষ্ট্রপ্রধানেরা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সমর্থন লাভের আশায় বিভিন্ন জোট বাঁধার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মার্কিন শিবিরের নেতৃত্বে যেমন ন্যাটো (NATO), সিয়াটো (S.E.A.T.O.) প্রভৃতি সামরিক চুক্তিনির্ভর একেকটি রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র গড়ে ওঠে, তদানীন্তন সোভিয়েট শাসকবর্গও পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিয়ে ওয়ারশ (Warsaw) চুক্তির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র গড়ে তুলল। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বাণিজ্যকে করায়ত্ত করে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের এলাকাকে সম্প্রসারিত করা।

উভয় শিবিরের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংঘাতের ফলে তৃতীয় বিশ্বের শাসকবর্গের অনেকেই মনে করতে আরম্ভ করেন যে রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণে দুই বৃহৎ শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয় জোট-নিরপেক্ষ নীতির কর্মসূচি। জোট নিরপেক্ষ নীতির মূল উদ্দেশ্যই হল দুই বৃহৎ শক্তিবর্গের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখা। এই নীতির প্রথম প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যোসেফ্ ব্রন্ টিটো, মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসের এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ১৯৪৭ সালে নয়া দিল্লিতে এশিয়ান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য একটি সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে যে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ইন্দোনেশিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ বা মায়ানামার ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সমস্যাটিকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এই প্রশ্নেই অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। কেননা পাকিস্তান তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনেতারাই তখন প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম বা শ্লোগানের অনুসারী হতে রাজি ছিলেন না।

আসলে জোট-নিরপেক্ষ নীতি মূলত ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold-War-এর প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। তাই ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে যে পঞ্চশীল নীতি ঘোষিত হয়েছিল সেখানে ইন্দোনেশিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ বলেছিলেন যে সোভিয়েট গোষ্ঠী ও পশ্চিমি শক্তিবর্গের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এমনকি তিনি প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। একই কথা পণ্ডিত নেহরু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর The Discovery of India বা *ভারত-আবিষ্কার* গ্রন্থে। তারই ফল হল ব্রিয়নিতে (Brioni) নেহরু, নাসের ও টিটোর সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ ঘোষণায়। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা কোনোভাবেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর শিকার হতে রাজি নন—এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামরিক জোটের কোনোটিতেই তাঁরা যোগদান করবেন না। ফলে ওয়ারশ চুক্তি অথবা ন্যাটো ও সিয়াটো সংগঠনের কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে বস্তুত অস্বীকার করে জোট-নিরেপক্ষতার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এক সমান্তরাল সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলল। এই সমান্তরাল সাংগঠনিক কাঠামো কিন্তু পঞ্চশীল নীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

পঞ্চশীল নীতির মূল ভিত্তি হল জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা অর্থাৎ কোনো দেশই অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শান্তি, উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি ও জাতিগত বা বর্ণভিত্তিক স্বাধীনতা এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের দ্বারা সৃষ্ট সামরিক চুক্তি থেকে দূরে থাকাই হল পঞ্চশীল নীতির মূল ভিত্তি। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জোট-নিরপেক্ষ নীতি গড়ে ওঠার পটভূমি হিসেবে ভারতসহ অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক সমীকরণ কাজ করেছিল। কেননা নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ কখনোই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থায়ী শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে যুদ্ধ ও সংঘাতের পথ এড়িয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাই হল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার লক্ষণ বিশেষ। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ দ্বিমেরুকরণ আর ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল শেষ হয়ে যাবার পরেও ক্রিয়াশীল আছে।

বস্তুত ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা Cold-War-এর পর্যায় শেষ হবার আগেই প্রায় নয়টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দশম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে। হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায়। একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলম্বিয়ার শহর কার্টাজেনায় (Cartagena) ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে। সারা বিশ্বের ১০৯টি দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন না। কেননা ততদিনে অখণ্ড যুগোশ্লাভিয়া ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অর্থে অখণ্ড সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল না। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম বিশ্বের দেশগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ করে মার্কিন দেশের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ করা হয়। লিবিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে জোট-নিরপেক্ষতার সমর্থক দেশগুলি ক্রমশ রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে বিশ্বায়নের যুগের অসম্পূর্ণতাকে প্রকাশ্যে আলোচনা করা ও প্রয়োজনে প্রথম বিশ্বের আগ্রাসী অর্থনীতি ও রাজনীতির বাস্তবায়নকে বাধা দেওয়া। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কানকুনে (Cancun) প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা বিশ্বায়নের নামে অবাধ বাণিজ্যের যে নীতি কার্যকর করতে সোচ্চার হয়েছিলেন তা বস্তুত উন্নতিশীল দেশগুলির মিলিত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় স্তরে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যে নয়া সমীকরণ হচ্ছে তার পেছনে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির (NAM) ইতিবাচক ভূমিকা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

টপ্পা-ঠুমরি-গজল

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়

টপ্পা

টপ্পা রাগসংগীতের ঘেরাটোপে লঘু চালের গান। কখনো গিটকিরি, কখনো দানাদার। কখনো মুড়কি-প্রধান দীর্ঘ বা হ্রস্ব তালে রূপ পায় 'টপ্পা'। আদিতে টপ্পা ছিল পঞ্জাবের উটচালকদের গান। পথের ক্লান্তি ঘোচাতে গলায় তুলে নিত সুরের বেমিশাল ছন্দ। *গীতসূত্রসার* রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (১৮৪৬-১৯০৪) মতে 'টপ্পা হিন্দি শব্দ—আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে রূঢ়ার্থে সংক্ষেপ, এই সংক্ষেপার্থে ইহা গানে ব্যবহার হইতেছে। অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর তাহার নাম 'টপ্পা'।' লক্ষ্ণৌ-এর খেয়ালিয়া গোলাম রসুল-এর (১৭০০-১৭৭০) পুত্র গোলাম নবি (১৭৪২-১৭৯২) এ গানের প্রচার জোরদার করেন সরির মিঞা বা সরি মিঞার আড়াল নামে। প্রাচীন খেয়ালের মতোই স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুই তুকে টপ্পার পদ রচিত হত। তবে গানের বাণীকে ঘিরেই টপ্পার সুরবিস্তার হয়। খেয়ালের মতো আলাদা তান বা আলাপের ব্যবহার নেই এ গানে। গানের ভাষায় প্রেমগীতিরই প্রাধান্য। প্রধানত খাম্বাজ, লুম, কাফি, পিলু, ঝিঁঝিট, ভৈরবী, যোগিয়া, সিন্ধু, কেদারা, বাঁরোয়াঁ, দেশ রাগেই রচিত হয়েছে টপ্পা গান। টপ্পা গানের গতি মূলত মধ্য লয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। যৎ, মধ্যমান, আড়াঠেকা, ত্রিতালেই তার সুরবিস্তার। *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা*-য় (প্রকাশ ১৮৬২) পরিচয় মেলে জিক্কু আর টুনোয়ার টপ্পার। ভিনভাষী সে গান বাংলা কাব্যসংগীতের ধারাতে বিশেষ সমাদর পেল রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর (১৭৪১-১৮৩৯) রচনায়। বলা যেতে পারে একক চেষ্টায় নিধুবাবুই টপ্পা পৌঁছে দেন বাঙালির ঘরে ঘরে মূলত প্রেমবিরহের মর্মগাথায়। পাশাপাশি সে ধারায় রচনা করেছেন ধর্মগাথাও। বাঙালির বাবুমহল থেকে সাধারণের মুখে মুখে ফিরতে থাকে নিধুবাবুর টপ্পা। পরবর্তীকালে বাংলায় টপ্পার সে ধারা সপ্রাণ রইল কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জার (১৭৫০-১৮২০) টপ্পায়। রবীন্দ্রনাথও (১৮৬১-১৯৪১) এ ধারায় রচনা করেছেন বহু প্রেমগীতি।

ঠুমরি

'ঠু' অর্থে ঠুমক্ বা চলন, 'ম' অর্থে মন বা অন্তর এবং 'রি' বা রিঝানা অর্থে আপ্লুত বা আকুল করার ক্ষমতা—এই তিনের সমাহার ঠুমরি—কথ্যে ঠুংরি। ফকিরউল্লাহ্-র

(মৃ. ১৬৮৪) *রাগদর্পণ* গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ মেলে ঠুমরির। সে সময় বারোয়াঁ রাগে গাওয়া হত সে গান। ক্রমে সে ধারায় রঞ্জিত হল বহু রাগসংগীত। ঠুমরি পরিবেশনে প্রথাবদ্ধ রাগরূপ বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাধীনতা থাকে ভিন্ন স্বরমিশ্রণের। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে 'কোন কোন গানে এক রাগিণীতেই কোন নূতন কড়ি কোমল প্রয়োগ করতঃ স্বরজ পরিবর্তন দ্বারা বিচিত্রতা সম্পাদন হয়।' প্রাচীন খেয়ালের মতোই স্থায়ী ও অন্তরা—দুই তুকেই রচিত হয় ঠুমরির পদ। ঠুমরির বাণীর বিষয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম বা বিরহ। বিশিষ্ট সংগীতব্যক্তিত্ব দিলীপকুমার রায়-এর (১৮৯৭-১৯৮০) মতে 'ধ্রুপদের প্রধান বিশেষণ যদি হয় কঠিন (Solid), খেয়ালের যদি হয় তরল (fluid), তবে ঠুংরির চরিত্রলক্ষণ বলা যেতে পারে বায়বীয় (Gaseous); তাই জন্যেই তো ওর এত রূপ, বহুধা গতি।' রসবিচারে এ ধারার গান শৃঙ্গার-প্রধান। কালে কালে তাই দরবার ও বাইজির সমার্থ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে ঠুমরি। বর্তমান-বহতা ঠুমরির ধারাটির সূচনা হয়েছে লখনৌ-এর নবাবি দরবার থেকে উনিশ শতকের গোড়ায়। ঠুমরির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর (১৮২২-১৮৮৭)। নিজে ঠুংরি রচনার পাশাপাশি মদত দিয়েছেন বহু ঠুমরি-গুণীদের। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সাদিক আলি খাঁকেই বর্তমান গীতধারার প্রাণপুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। ঠুমরি ধারার প্রবর্তনায় দু-অঙ্গের সমর্থন মেলে—পূর্বী এবং পঞ্জাবি। লখনৌ এবং বেনারসের গান পূর্বী ধারার আর পঞ্জাবের গান পঞ্জাবি ধারা। দ্বিতীয় ধারায় তাই টপ্পার প্রভাব মেলে কিছুক্ষেত্রে। তিলক কামোদ, পিলু, কাফি, তিলং, খাম্বাজ, ভৈরবী, যোগিয়া, শিবরঞ্জনী রাগবিন্যাসে গড়ে ওঠে ঠুমরি গান। কথার ফাঁকে তান-সরগমের সুরের অলঙ্করণে হয় কাব্যবিস্তার। নিকট অতীতে মৈজুদ্দিন খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, (১৮৭২-১৯৩৭), ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও (১৮৫২-১৯২০) এবং বড়ে গোলাম আলি খাঁ (১৯০৩-১৯৬৮) ঠুমরির প্রধান প্রবক্তা। বাংলায় এধারা প্রসার পায় ওয়াজিদ আলি শাহ্-র মেটিয়াবুরুজে নির্বাসনকালে। বিশ শতকে বাংলায় মৈজুদ্দিন খাঁ এবং পরে জামরুদ্দিন খাঁ-র (মৃ. ১৯৩২) চেষ্টায় যে ধারা প্রাণিত হয় বহু সংগীত গুণীর রচনায় ও গায়নে। বড়ে মতিবাই (১৮৯১-১৯৮৬), মালকাজান, গহরজান (মৃ. ১৯২৯), জড্ডন বাই, সিদ্ধেশ্বরী দেবীর (১৯০৯-১৯৭৭) ঠুমরি গানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাই-সংস্কৃতি।

গজল

আরবিতে রাজার স্তুতি গানের (কাসিদা) প্রস্তাবনাকেই বলা হত 'গজল'। আরবের আব্বাসি দরবারে (৮১৩ খ্রিঃ) কবি আবু নুভাসের কবিতায় শুরু হয় গজল রচনা। তবে রাগসংগীতের ধারায় গজলের প্রতিষ্ঠা পারস্যে। পারসিক শেখ সাদির সময় (১২৯১ খ্রিঃ) থেকে প্রসার পেতে থাকে বর্তমান শৈলীর গজল। আরব থেকে পারস্যে এসে 'বা জনান গুফ্‌তও ক্যারদ্যন' কিংবা প্রিয়ার কানে প্রেমের টুকরো কথা থেকে গজল উত্তীর্ণ হল মহত্তর, বিস্তৃততর ভূমে। নর-নারীর প্রেম ছাড়াও গজলের বিস্তার হল ভিন্ন প্রেমে—কখনও অস্তজ, কখনো দেহজ, কখনও ঐশ্বরিক আবার কখনওবা দেশপ্রেম। ফারসিতে

শুরু হলেও উর্দু হয়ে উঠল পরবর্তীকালের গজলের ভাষা। তেরো শতকে ভারতে গজল এল পারসি ভাষায়—মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে। জালালউদ্দিন খিলজির সভাকবি আমির খুসরুর (১২৫৩-১৩২৫) রচনায় প্রকাশ পেল, প্রসার হল গজলের ধারা। কুলিকুতুব শাহ্ (১৫৮০-১৬১২), সিরাজুদ্দিন অওরঙ্গাবাদি (১৭১৫-১৭৬৩), মিরতকিমির (১৭৭৩-১৮১০), ভারতের শেষ মোগল সম্রাট মহম্মদ বাহাদুর শাহ্ জাফর (১৭৭৫-১৮৬৯), মির্জা অসদুল্লা খাঁ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯), মোমিন খাঁ সোমিন (১৮০০-১৮৫১), মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮), ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৩) প্রমুখের রচনায় ভারতে গজলের বিস্তার। বেগম আখতার (১৯১০-১৯৭৪), মেহেদি হাসান, গোলাম আলি এ গান প্রচারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। বাংলায় জমিরুদ্দিন খাঁর তালিমে গজলের ধারাকে জনপ্রিয় করেন কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বহুক্ষেত্রেই গজলের ভাষা দ্বি-অর্থপূর্ণ—সেখানেই তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। যেমন, মদিরা পান অর্থে আত্মহারা তন্ময়তা, মদিরামত্ততা অর্থে প্রেমোন্মত্ততা বা পরমানন্দ-অনুভূতি। গজলের কতকগুলি পাত্রপাত্রী আছে—যেমন থাকে নাটকে। নায়ক 'আশিক', নায়িকা 'মাশুক', খলনায়ক 'রকিব' সুরা পরিবেশক 'সাকি'। আর আছে পারিপার্শ্বিক স্থান-কাল-পাত্র—যেমন 'আশিয়ানা' (নীড়), 'মহ্ফিল', 'ময়খানা' (মখুশালা) ইত্যাদি। গজল দুই বা চার চরণের কাব্যবিন্যাসে লিখিত হয়। স্থায়ী এবং অন্তরা এই দু-ভাগেই বিভক্ত হয় গজল। স্থায়ী ছাড়া সব অংশই অন্তরা। সাধারণত অন্তরাগুলি একই সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো স্তবকে সুরে ছন্দবিহীন আবৃত্তি করা হয়। সে অংশকে 'শের' বলা হয়ে থাকে। গজলের সুরারোপে কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, ভৈরবী, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগের বেশি ব্যবহার দেখা যায়। টপ্পা-ঠুমরির মতই বাণী বিস্তারে তান-সরগমের অলংকরণও করা হয় ক্ষেত্রবিশেষে।

ট্র্যাজেডি

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্র্যাজেডি' শব্দটির উৎসে রয়েছে ডায়োনিসাসের উৎসব। প্রাচীন গ্রিসের এই উর্বরতার উৎসবে অসংখ্য ছাগল বলি যেত, ছাগলের চামড়া গায়ে চাপিয়ে মদোন্মত্ত জনতা গাইত 'Tragoidia' (ছাগ-সঙ্গীত)। এই শব্দই যে ট্র্যাজেডির বীজ তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, অন্য তথ্য নেই। গ্রিক নাট্যকার থেস্‌পিস (Thespis) প্রথম এই সমবেত-সংগীতের কাঠামোকে ভেঙে কেন্দ্রীয় চরিত্র সমৃদ্ধ একটি নাটকীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ডায়োনেসীয় উৎসব উপলক্ষে যে নাট্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন হত তাতে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এই শিল্পরূপ ইস্কাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপেডিস প্রভৃতির হাতে উর্বর মাটি পেয়ে যায় ও বেড়ে ওঠে তরতরিয়ে। সে সময়ের কয়েকটি ট্র্যাজেডিই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। *প্রমেথিয়ুস বাউন্ড* (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৫), *মিডিয়া* (খ্রিঃ পূঃ ৪১৩), *আন্তিগোনে* (খ্রিঃ পূঃ ৪৪১), *অয়দিপাউস রেক্স* প্রভৃতি। তবুও প্রাচীন এই গ্রিক নাটকগুলোই ট্র্যাজেডির ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী ধারা। এই ট্র্যাজেডিগুলোকে মাথায় রেখেই অ্যারিস্টটল তাঁর *দি পোয়েটিকস্* (খ্রিঃ পূঃ ৩৩০)-এ ট্র্যাজেডির তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণে নামেন ও সমগ্র ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি হল এমন এক ক্রিয়াপ্রবাহের অনুকৃতি যা গভীর, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিমিত; যা যথোপযুক্ত আলঙ্কারিক ও সৌষ্ঠবপূর্ণ ভাষায় নাটকোচিত উপস্থাপনের প্রত্যাশী, যা অবশেষে আমাদের শোচনা ও শংকা নামক দুটি আবেগের উদ্রেক ঘটিয়ে তাদের মোক্ষণ ঘটায় ও এক শুদ্ধতর মন ফিরিয়ে আনে। অ্যারিস্টটল কথিত ক্যাথারসিসের তত্ত্বটি অনেকটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে কোনো রোগকে বাড়িয়ে তুলে তাকে প্রশমিত করার পদ্ধতির সমার্থক। কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবনের বিপর্যয়, যন্ত্রণা ও এক বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু দর্শকের আবেগের জলাধারকে যখন কানায় কানায় পূর্ণ করে ফেলে, তখন শোচনা ও শংকা নামক দুটি নলের মাধ্যমে অতিরিক্ত আবেগের মোক্ষণ ঘটে। অবদমিত আবেগের এই নিষ্কাশন বা বহিষ্করণকে একটি 'aesthetic depersonalisation'ও বলা যায় বা মিলটন থেকে ধার করে বলা যায় 'Calm of mind, all passions spent'.

প্রাচীন, গ্রিক নাটকে ট্র্যাজিক হিরোর পতনের মূলে থাকে 'হিউব্রিস' (Hubris) যা তাকে 'হ্যামারসিয়া'র দিকে নিয়ে যায়। হিউব্রিস হল কেন্দ্রীয় চরিত্রের অত্যধিক ঔদ্ধত্য

বা অহংকার, আর হ্যামারসিয়া হল তার চরিত্রের কোন অভ্যন্তরীণ ত্রুটি বা সিদ্ধান্তগত বিচ্যুতি। রেনেশাঁস ট্র্যাজেডিতে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বা কোনও দৈব অনুশাসনের প্রাধান্য কমে গিয়ে, ব্যক্তিকেই তার পরিণতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখানো হয়। শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পতনের জন্য ব্রাডলে কথিত 'fatal onesidedness'কেই দায়ী করা হয়। অ্যারিস্টটলের কথায় ট্র্যাজিক হিরো একজন 'intermediate kind of personage'. সে যদি হয় একজন 'pre-eminently virtuous or just'. না হয় কোনো 'vicious or wicked' ব্যক্তি হত তাহলে তার জন্য দর্শকের মধ্যে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি নাও হতে পারত। তাই তার মধ্যে মানবিক দোষ-ত্রুটি বা স্খলন না থাকলে সে ট্র্যাজিক হিরো হবার জন্য সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে না। ধ্রুপদী গ্রিক ট্র্যাজেডির ঠাসবুনোট রেনেশাঁস ট্র্যাজেডিতে দেখা যায় না। স্থান, কাল ও ক্রিয়াগত ঐক্য; প্রোলগ, প্যারাডস, এপিসোড, স্টাসিমন, অক্সোডাস-এর গঠনগত পারম্পর্য থেকে সরে এসে রেনেশাঁস ট্র্যাজেডি বহুবিধ স্বাধীনতা ভোগ করে। একঘেয়ে করুণ সুরে বাঁধা না থেকে, মাঝেমাঝেই আত্মীকৃত করতে থাকে লঘু ও চপল হাস্যরস। তাছাড়া ইতালীয় নাট্যকার সেনেকার প্রভাবে এ জাতীয় ট্র্যাজেডিতে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে থাকে উত্তেজক দৃশ্যের আধিক্য, রক্তক্ষয়, প্রতিহিংসা পরায়ণতা।

ইংলণ্ডের এলিজাবেথান নাট্যকারেরা ধ্রুপদী ধারার থেকে সরে এলেও সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি নাট্যকারেরা, যেমন জাঁ রাসিন, পিয়ের করনিল, ট্র্যাজেডির ধ্রুপদী ধারারই অনুসারী ছিলেন। জার্মান ট্র্যাজেডিকার আঁদ্রে গ্রীফিউস অনুসরণ করেন প্রাচীন রোমান মডেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদী ধারার বুর্জোয়া ঝোঁক থেকে ক্রমশ সরে এসে কেন্দ্রীয় চরিত্ররা হয়ে উঠতে থাকে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন ও অগস্ট স্ট্রিন্ডবার্গদের প্রভাবে ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক সমস্যামূলক। ব্যক্তি সেখানে বাহ্যিক, পরিস্থিতিগত ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাপের কাছে পরাজিত হয়ে আমাদের মনে শোচনা ও ভয়ের সঞ্চার করে। আধুনিক ট্র্যাজেডির নায়ক নায়িকারা, যেমন আর্থার মিলারের *ডেথ অফ এ সেলসম্যান*-এর (১৯৪৯) উইলি লোমান বা টেনেসি উইলিয়াম-এর *এ স্ট্রিট-কার নেমড ডিজায়ার* (১৯৪৭) এর ব্ল্যাঙ্ক, গলস্ওয়র্দির *জাস্টিস*-এর ফ্যালডার প্রচলিত অর্থে কোনোভাবেই হিরোইক নয়; এদের পতনের জন্য নিয়তি বা কোনও চারিত্রিক ত্রুটি দায়ী নয়,—সমাজ নামক এক অন্ধ-উদাসীন শক্তির কাছে অসহায় বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমেই এরা ট্র্যাজিক মহিমা অর্জন করে। ফেদেরিকো গ্রাসিয়া লোরকার *ব্লাড ওয়েডিং*, ইউজেন ও'নীলের *মৌরনিং বিকামস ইলেক্ট্রা*, আর্থার মিলারের *এ ভিউ ফ্রম দা ব্রিজ*, ডেভিড হেনরি হোয়াং-এর *এম. বাটারফ্লাই* কিছু আধুনিক ট্র্যাজেডির উদাহরণ।

আসলে ট্র্যাজেডি বা কমেডি সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কলার খোসায় পা দিয়ে ভূপতিত ভদ্রলোক একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ট্র্যাজিক, আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যারপরনাই কমিক। হ্যামলেট, ওথেলো, লিয়ার এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যতই মহিমান্বিত

হন না কেন, অন্যদিক থেকে দেখলে তাঁরা হাস্যকর ধরনের আবেগপ্রবণ ও অস্বাভাবিক। আধুনিক নাটকে আবেগের আধিক্যকে প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য বা জীবনকে একটি গম্ভীর ও গভীর প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে না চাওয়ার জন্য, ট্র্যাজিক রসের জায়গা দখল করে বসেছে এক ধরনের ডার্ক-কমেডি বা ব্ল্যাক-হিউমার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নাটকে জীবন নামক গূঢ় এক প্রক্রিয়াকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে নাট্যকার এক উদ্ভট হাস্যরস তুলে আনলেও, এখানে ট্র্যাজেডি ও কমেডির কোনো প্রভেদ নেই। আসলে জীবনকে কমিক হিসেবে উপলব্ধি করার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এ পৃথিবীতে কখনো ছিল না, আর ভবিষ্যতেও থাকবে না।

টুরিজম

বিশ্বদীপ দত্ত

টুরিজম শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংগঠিত পর্যটন। যার সঙ্গে জড়িত শিল্প সম্ভাবনা। ভ্রমণের ইচ্ছা বা নতুন দেশ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালীন। কিন্তু টুরিজমের ধারণার সৃষ্টি অতি সাম্প্রতিককালের। বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের ফসল। আগেকার ভ্রমণের সঙ্গে আধুনিক পর্যটনবাদের পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় তার গণ চরিত্রে। তীর্থযাত্রা ছাড়া অতীতে ভ্রমণ ছিল অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দুঃসাহসিক অভিযান অথবা বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির বিলাস। বিংশ শতাব্দীতে পর্যটন হয়ে ওঠে সামাজিক মানুষের আধুনিকতার প্রতীক। তুলনায় স্বল্পবিত্ত শ্রেণিকেও দেখা যায় আয়ের সামান্য উদ্বৃত্ত সম্বল করে পর্যটনে সামিল হতে। এই সময়ের কাজের ফাঁকে অবসরের সুযোগ বৃদ্ধি অবশ্যই ব্যাপক পর্যটন প্রসারের অন্যতম কারণ। সপ্তাহান্তিক আর বাৎসরিক সবেতন ছুটির দিনগুলো নিয়মিত হয়ে ওঠে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নতিশীল দেশেও। তার সঙ্গে যোগ হয় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে যানবাহন নির্মাণেও ঘটে দ্রুত অগ্রগতি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেখা দেয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যা ক্রমশ পর্যটনকে সহজ করে তোলে সাধারণ মানুষের জন্য। দিনে দিনে আরও বেশি মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে স্বদেশ তথা বিশ্ব পর্যটনে। পর্যটক সমাগমে স্থানীয় মানুষের অর্থ আয়ের সুযোগ, এমনকী বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনাও বিবেচিত হতে শুরু করে গুরুত্বের সঙ্গে। পরিকল্পিত পর্যটন প্রসারের চেষ্টা শুরু হয় নানা দেশে। পর্যটনকে দেওয়া হয় শিল্পের স্বীকৃতি।

১৯৬৩-তে রোমে ইউনাইটেড নেশনসের 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম কনফারেন্স' আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রসারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সম্মেলনে পর্যটনকে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং কেবল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উৎস বলেই নয়, অন্যান্য সহায়ক শিল্প গড়ে ওঠার জন্য আর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচনা করা উচিত বলে আলোচিত হয়। এরপর ইউ এন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ১৯৬৭ সালকে 'ইন্টারন্যাশনাল টুরিস্ট ইয়ার' বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা পর্যটনকে এক মৌলিক ও মানবিক আচরণ, যা কিনা সমাজের সবস্তরের মানুষের প্রশংসার যোগ্য এবং সরকারি তরফ থেকেও উৎসাহদানের যোগ্য

বলে বর্ণনা করেন। এই ধারণা ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় যে, পর্যটন জাতির জীবনে এমন এক অত্যাবশ্যক ক্রিয়া—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। মনে করা হতে শুরু হয় আন্তর্জাতিক পর্যটনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির, যার সাহায্যে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পার্থক্য হ্রাস পেয়ে সৃষ্টি হতে পারে এক নতুন পৃথিবীর।

শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বদলে যায় আধুনিক পর্যটকের সংজ্ঞাও। যেমন, ব্যবসায়িক কারণে ভ্রমণকারীও পরিগণিত হতে শুরু করেন পর্যটক হিসেবে। এখন আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে কোনো ব্যক্তি যদি তার আবাসভূমির বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে ২৪ ঘণ্টার বেশি অথচ ৬ মাসের কম সময় বাস করেন এবং সেখানে যদি তার কোনো বাড়ি না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে সেখানে পর্যটক বলে গণ্য করা হয়। তবে সমুদ্রপথযাত্রীরা কোথাও ২৪ ঘণ্টার কম সময় থাকলেও ওয়ার্ল্ড টুরিজম অর্গানাইজেশনের সংজ্ঞা অনুসারে তাকে পর্যটক বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ওয়ার্ল্ড টুরিজম অর্গানাইজেশনের হিসেবে ১৯৯৫ সালে বিশ্বে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ জন। যার থেকে ৩৭২০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি পরিমাণ অর্থোৎপাদন সম্ভব হয়েছিল এবং এই সুবাদে সে বছর পর্যটন শিল্পে কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছিল ২১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের। যা নাকি বিশ্বের মোট কর্মজীবী মানুষের ১০.৭ শতাংশ।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক পর্যটন বেড়ে ওঠার দিনেও ভারতে আগত আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এখন বছরে ২৫ লক্ষের মতো। তবু ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যটন বাবদে ভারতের মোট আয় ছিল ৮৬৪০ কোটি টাকা। যার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রা আয়। ১৯৯৮-৯৯-তে পর্যটন খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকায়। আর পর্যটন শিল্পকে নির্ভর করে কর্মসংস্থান হয়েছে দেশের ১ কোটি ৭৪ লক্ষ মানুষের। এই কর্ম সংস্থানের পরিমাণ দেশের মোট কর্ম সংস্থানের ৫.৮ শতাংশ। বিপুল সম্ভাবনাময় এই শিল্প। আশা করা হচ্ছে, ২০১০ সালে ভারতের প্রতি ১৫ জন কর্মীর মধ্যে ১ জন হবেন পর্যটননির্ভর কর্মী। তখন পর্যটন খাতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ আয় দাঁড়াবে ৬.৬ শতাংশে।

অনিয়ন্ত্রিত দ্রুত পর্যটন প্রসারের ফলে কোনো দেশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত উন্নতিশীল কিছু দেশে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন প্রসারের কুফল লক্ষ করা গেছে। বোঝা যাচ্ছে এই শিল্প প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যেহেতু এই শিল্প পরিষেবাভিত্তিক, তাই সমাজের সব স্তরের মানুষের সচেতনতাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ডাডাইজম

অশ্রুকুমার সিকদার

শিল্পের বিরুদ্ধে শিল্পের আক্রমণ ডাডাবাদ। ডাডা এক নেতিবাদী, অবিশ্বাসী, নিহিলিস্টিক শিল্প-আন্দোলন। একে ঠিক একটা সংগঠিত আন্দোলনও বলা যায় না, ডাডা যেন এক বিশিষ্ট মনোভঙ্গি। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন ঐ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই আন্দোলনের, এই শিল্পতত্ত্বের সূত্রপাত। যে যুক্তিলালিত আধুনিক সভ্যতা মহাযুদ্ধের পাশবতা ঘটাতে পারে, তার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ডাডাবাদের জন্ম। এই ঘৃণ্য সভ্যতার মনন, নীতি, তত্ত্বের গায়ে চূড়ান্ত বিনমিমায় এই শিল্পীরা থুতু ছিটিয়েছেন। এই শিল্পতত্ত্ব ভেঙে ফেলতে চেয়েছে এতদিনকার যাবতীয় বিধিবিধান, আদর্শ আর ঐতিহ্য। এই আন্দোলনের ঘৃণার লক্ষ্য—এই জুগুপ্সাময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী বুর্জোয়াদের প্রতি অন্তঃসারশূন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের প্রতি, যে-শিল্প শুধু ভোলাতে চায়, ঘুম পাড়াতে চায়। আসলে তাঁদের রাগ শিল্পের বিরুদ্ধে তত নয়, যত শিল্পের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে।

১৯১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে রুমেনীয় কবি ত্রিস্তান জারা, হ্যনস্ তার্প এবং আর দুজন জার্মান শিল্পী নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার দ্যোতক শব্দের সন্ধানে খুঁজে নেন একেবারে নিরর্থক Dada শব্দটি। ১৯১৯ সালে যখন ডাডাবাদীরা আস্তানা গাড়ে প্যারিসে, তখনই তার আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রকট হতে থাকে। এই সময়ে এই আন্দোলনের জুটে গিয়েছিলেন আন্দ্রে ব্রেতোঁ, আরাগঁ, এলুয়ার ইত্যাদি—এইসব এবং আর অন্য অত্যুৎসাহী তরুণ কবি এবং সমাজদ্রোহী যুবকের দল। সামান্য প্রবীণ এবং তাঁদের মতোই প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধচারী কিউবিস্ট শিল্পীদের অনুমোদনও তাঁরা পেয়েছিলেন। এই নেতিবাদী আন্দোলনের সারকথা 'nothing'। জারা বলেছিলেন, 'যা কিছুই আমরা দেখি, সব মিথ্যা।' যা-কিছু মহাযুদ্ধের নৃশংসেতার জন্য দায়ী সব তাঁরা সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন, ভাঙতে চেয়েছেন কাব্য আর শিল্পের পরম্পরাক্রমে চলে আসা রীতিনীতি। তাঁরা লিখেছেন ইস্তেহার, ধ্বন্যাত্মক কবিতা, রচনা করেছেন কোলাহলের শ্রুতিকটু সংগীত, সাধারণকে রাগিয়ে দেবার জন্য ঘটিয়েছেন উদ্ভট ঘটনার প্রদর্শনী। এইসব প্রদর্শনীর লক্ষ্য ছিল, লোক খেপিয়ে নিজেদের জাহির করা। এইসব উদ্ভট ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁদের তত্ত্বকে প্রয়োগও করতে চান উদ্ভট সংঘটনের উপস্থাপনায়। যা-কিছু ইতিহাসের নিয়মে দেউলে হয়ে গেছে, তাকে উদ্বেগাকুল প্রাণশক্তি দিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব, এমন বিশ্বাসই তাঁদের

প্রণোদিত করেছিল। এই নেতিবাদী আন্দোলনের ধাক্কা শেষ পর্যন্ত তাই ইতিবাচক হয়েছিল। শিল্পে কবিতায় তাঁরা এনেছিলেন কোলাজ-পদ্ধতি, যাতে বিচিত্র নিঃসম্পর্কিত বস্তু ইমেজের সমাবেশ ঘটে ন্যায়পরম্পরার বালাই না রেখে। ডাডাবাদের কোলাজ-পদ্ধতির ছাপ মিলবে এলিয়ট, এজরা পাউন্ডের কবিতায়, ম্যাক্স এরন্‌স্ট, মার্সেল দুশাঁপ, মাগ্রিত, মান রে-র শিল্পে। ডাডাবাদীদের লড়াই ধরতাই বাকপ্রতিমা, প্রচলিত অন্বয় আর বাগধারার বিরুদ্ধে। উপমায় তাঁরা ঘটিয়েছেন উদ্ভটের আর বিদ্রূপাত্মকের সমাবেশ।

ডাডাবাদ শিল্পের প্রথাগত ধারণাকে ধাক্কা দিয়ে মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিল, কিন্তু ১৯২১ সাল নাগাদ মনে হল ডাডাবাদ তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে ফেলেছে। এবার তার উত্তরণ ঘটল সুরারিয়ালিজমের অনেক বেশি প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পতত্ত্বে। কিন্তু ডাডাবাদের স্থায়ী ছাপ থেকে গেল ফরাসি কবিতায়। জার্মানিতে ও মার্কিন দেশে অনেক শিল্পীর সহযোগিতায় ডাডাবাদের ধারা অব্যাহত থাকল। বিশেষত গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ফিউচারিস্ট, ডাডাবাদী আর পরাবাস্তববাদীদের উত্তেজক তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে মার্কিনদেশের শিল্পীলেখকেরা, অভিনেতা, সংগীতকারেরা গড়ে তুললেন পপ্ আর্টের আঙ্গিকগত পরীক্ষা।

ডিকনস্ট্রাকশন

সুপ্রিয়া চৌধুরী

ফরাসি ও ইংরেজি deconstruction-এর তর্জমা ('অবিনির্মাণ') জাক দেরিদার অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অবদান।

অবিনির্মাণ মুখ্যত কোনো দার্শনিক বা নান্দনিক তত্ত্ব নয়। ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদার প্রয়োগ অনুসরণ করে শব্দটির তাৎপর্য দাঁড়িয়েছে দর্শন বা সাহিত্যসমালোচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। এর পিছনে রয়েছে জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের কিছু চিন্তা। তিনি লিখেছিলেন যে দর্শনে construction বা নির্মাণ মূলত deconstruction বা অবিনির্মাণ অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্বের ভাঙন ঘটানো। নিটশে ও হাইডেগার অধিবিদ্যার যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, দেরিদার চিন্তা সেই পথ ধরে এগিয়েছে ও পূর্বসূরিদের অতিক্রান্ত করেছে। তাঁর লেখায় আরো পাওয়া যায় অন্য কিছু তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অবস্থানের জটিল পর্যালোচনা—যেমন হুসের্লের প্রতীতি-বিজ্ঞান (Phenomenology), সোস্যুরের গ্রন্থনবাদী (Structuralist) ভাষাতত্ত্ব, ফ্রয়েড ও লাকাঁর মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis), মার্ক্সের রাজনৈতিক চিন্তা ইত্যাদি।

দেরিদার লক্ষ্য, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের নিরন্তর 'বাককেন্দ্রিকতা' (logocentrism)-কে ধ্বংস করা। গ্রিক logos-এর তাৎপর্য একাধারে 'বাক্, শব্দ' ও 'সত্য, যুক্তি'। বাককেন্দ্রিকতা হল সেই বিশ্বাস যে বাক্যের মধ্যে সত্য অবস্থান করতে পারে। এই বিশ্বাসের ফলে উচ্চারণ (speech) ও লেখন (writing)-এর মধ্যে একটি দ্বন্দ্ববোধের সৃষ্টি হয়, এবং উচ্চারণকে লেখনের উপরে স্থান দেওয়া হয়। যে চেতনা লেখনে বিলুপ্ত বা অতিক্রান্ত হয়েছে, উচ্চারণ যেন তারই আধার। এই ভাবধারা ও তার আরো বিস্তৃত প্রতিফলনকে দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন 'উপস্থিতির অধিবিদ্যা' (Metaphysics of presence)।

এই চিন্তায় যে ফাঁক ও ফাঁদ আছে, দেরিদা তা প্রথম তুলে ধরেন হুসের্লের উপর তাঁর গ্রন্থ *Speech and Phenomena* (*La Voix et le phenomene*, ১৯৬৭)-এ; গ্রন্থনবাদের সমালোচনা *Writing and Difference* (*L'Ecriture et la difference* ১৯৬৭) ও *Of Grammatology* (*De la Grammatologie*, ১৯৬৭)-তে, ও প্লেটোনীয় অধিবিদ্যার পর্যালোচনা *Dissemination* (*La Dissemination* ১৯৭২)-এ। এই বইগুলিতে তিনি লেখন ও ভাষাকে চিহ্নিত করেন পার্থক্য (Difference)-এর

জালবিস্তার হিসাবে ও একই সঙ্গে অর্থ বা উপস্থিতি (presence)-কে স্থগিত বা মুলতুবি রাখা (deferral)-এর অশেষ প্রক্রিয়া বলে। এর পরিণাম অর্থের মুক্ত বিচরণ (wandering) অথবা সরে বা পিছলে যাওয়া (slippage)। এটিই হল অর্থসৃষ্টির আবশ্যিক শর্ত। এই প্রক্রিয়াকে তিনি নাম দেন স্বরচিত শব্দ diffe'rance (difference এবং deferral)। শব্দটি তাঁর কাছে একটি নবলেখন বা neographism, যেহেতু এর দ্বৈতভাব ফরাসি ভাষায় একমাত্র লেখায় ধরা পড়ে, উচ্চারণে নয়। দেরিদার পরবর্তী কাজে অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তার অন্য অনেক দিকের আলোচনা রয়েছে—বিশেষ করে যাকে তিনি বলেছেন বিশিষ্টতা (propre)-র বিধি। (ফরাসি ভাষায় propre-র অর্থ একাধারে 'সভ্য, বিধেয়' এবং 'স্বয়ং, সবিশেষ')। তাছাড়া মৈত্রী ও ন্যায়ের মতো কতগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব তাঁর চিন্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দেরিদার চিন্তা যদিও অবিনির্মাণের মুখ্য দৃষ্টান্ত, deconstruction শব্দটি ক্রমশ আরো ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁর গুণগ্রাহী কিছু মার্কিন সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কাজের সঙ্গে—যেমন পল দ্য মাঁ (Paul de Man) জেফ্রি হার্টম্যান (Geoffrey Hartman)। সাহিত্যতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যায় আজ শব্দটি বহুপ্রচলিত। গতানুগতিক দার্শনিক পদ্ধতিতে বিপরীত প্রত্যয়ের ব্যবহারে দেরিদা দেখেছিলেন, শান্তিপূর্ণ সহবাস নয়, একটি প্রত্যয়ের উপর অপরটির বলপূর্বক আধিপত্য-স্থাপন। অবিনির্মাণের লক্ষ্য হল এই আধিপত্যকে ভেঙে দেওয়া। তার উপায় নতুন একপ্রস্থ প্রত্যয় স্থাপন করা নয়; বরং গৃহীত প্রত্যয়গুলির ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখা, সেই ইতিহাসে কী কী বিলুপ্ত বা উপেক্ষিত হয়েছে। কার্যত এই অবিনির্মাণের কৌশল হল ভাষার আলংকারিক প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করে তার নিহিত ঝোঁকটির পাশাপাশি বিপরীত অর্থ বা ইঙ্গিতকে তুলে ধরা।

শেষ বিচারে ভাষার অর্থবহ চিহ্ন (Signifier) সবসময়েই মুক্তভাবে বিচরণ করে, যদিও আমরা তাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থপুঞ্জে আবদ্ধ রাখতে চাই। ভাষার মধ্যে যে ফাঁক (aporia) বা অনির্দেশনীয় (undecidable) শব্দ আছে, অবিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় সেগুলি ব্যাখ্যানের অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। আমাদের দৃষ্টিতে যা ছিল বদ্ধ, সীমিত, তা হয়ে যায় মুক্ত, বিস্তৃত, (disseminated)। অবিনির্মাণ হচ্ছে সেই পাঠক্রিয়া যা পাঠের প্রচলিত ধারার বিরোধে কাজ করে—ভাষার বিস্তীর্ণতাগুণ ব্যবহার করে অর্থের অশেষ বিচরণের স্বাধীনতা দেয়।

আধুনিক তত্ত্ব ও সমালোচনার জগতে যে সংশয়বাদী, মানবিকীচর্চা ও মৌলবাদ-বিরোধী ধারা দেখা যায়, অবিনির্মাণ তারই অঙ্গ। কিন্তু একে আত্মসর্বস্ব (solipsist), পাঠসর্বস্ব ও সামাজিকভাবে দায়িত্বহীন বলেও আক্রমণ করা হয়েছে।

ডিফারেন্স

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্যাটা মানে নিয়ে—মানে কীভাবে আমরা বুঝি তা দিয়ে—মানে কীভাবে আমরা বার করি তা নিয়ে।

গ্রন্থনবাদী (Structuralist) তাঁর অভিজ্ঞেতিবাদী (Positivist) ঐতিহ্য ও পারম্পর্য বজায় রেখে শব্দ-বাক্য-জবানি ভেঙেচুরে, তাদের মধ্যে থেকে নানান অণু-উপাদান খুঁজে পেতে বার করে আনেন। তাঁর ঘরানা অনুযায়ী বক্তব্য হল, চিহ্নের তো নিজের কোনো মানে নেই, ভাষাতন্ত্রের মধ্যে চিহ্ন ভেদ-অভেদের খেলা খেলে মানে পায়। অতএব গ্রন্থনবাদী বিশ্লেষণাত্মক—তিনি মানে বার করতে (Componential Analysis করেন।

দেরিদা এই বিশ্লেষণাত্মক ভেদাভেদের গণ্ডগোলটা ধরে ফেললেন। অভেদের (identite) বিপরীতে ভাবলেন ভেদের কথা (ইংরেজি differ) এর সঙ্গে মিশে গেল মানে স্থগিত (ইংরেজি defer) রাখার ভাবনা। এই দুটি শব্দের সেতুবন্ধে যে নতুন প্রত্যয় এসে জুটল—ence-এর বদলে ance। অর্থাৎ পুরো শব্দটা দাঁড়াল differance। ফরাসি উচ্চারণে 'আঁস' 'ence' আর 'ance' এর লিপিগত তফাত রাখে না। এখানেই লৈখিক আর মৌখিকের তফাত ঘুচিয়ে খেলা জমে—কেননা এইধরনের ভুল বানানোর মধ্যে মানের অ-স্থিতিকর খেলাটা জমা বাঁধে। দেরিদার তত্ত্বরচনায় লেখা আর মুখের কথার ভেদাভেদ নিয়ে যে খেলা জমে তারই উপস্থাপন ঘটে এমন নতুন বানানে। আর এই নতুন বানানের দরুণ ভাষার মানেবিষয়ক ধ্রুপদী স্থবিরতা, চিহ্নের উপস্থিতি ও উপস্থাপন সবই বিঘ্নিত হয়—আঘাত পায়। এখন এই 'দিফেরাঁস' কথাটির মানে বোঝার মূল অসুবিধে হল যে দেরিদা স্বয়ং এই লৈখিক-মৌখিক শব্দবন্ধকে কোনো 'ধারণা' হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি বা এমন কোনো স্থবির মানেতে বেঁধে ফেলতে চাননি, যার সংজ্ঞার্থ দেওয়া যায় বা মানে ধরে ফেলা যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে মানেতে বেঁধে ফেলার ইস্কুল কলেজি অভ্যাস থেকে ছুটি চাইছেন দেরিদা। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতার প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করার যে বিরোধাভাস, তার থেকে এমন অ-প্রাতিষ্ঠানিক বানান লিখে ছুটি নিলেন বটে দেরিদা, কিন্তু তাঁর বয়ানপাঠ বিশ্রামহীন, ছুটিহীন, শেষহীন। মানে যেহেতু সবসময়েই পিছলে বেরিয়ে যায়, অথবা মানে মুছে যাওয়ার প্রতীক্ষার (under erasure) থাকে, সেহেতু বয়ানে উপস্থাপিত

জবানির বারংবার পাঠ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যাকে ভাবা হচ্ছে, তার মধ্যে খ থাকতে পারে, গ-ও থাকতে পারে, অথবা নিতান্তই যদি মানে 'বোঝা' না যায়, নিতান্তই. আমি স্থগিত রাখতে পারি মানেটাকে। বার্ত অবশ্য বলবেন, এমন স্লো-মোশন রিডিং সম্ভব কেবলমাত্র নন-ডিসপোজেবল্ বয়ানের ক্ষেত্রেই, ডিজপোজেবল্ বয়ান তো একবার পড়েই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। তার মানে, বয়ানের নিজস্ব সামর্থ্য থাকতে হবে এই ধরনের পাঠ্যক্রিয়ার অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য।

এই সামর্থ্যের সূত্রেই দেরিদা দিফেরাঁস শব্দটির কোনো মানে বলে দেন না। দেরিদাপাঠের ক্ষেত্রে ১৯৬৭-র *Speech and Phenoena* থেকেই এই বিশেষ শব্দটিকে নানান প্রসঙ্গে স্থাপন করে নানান পাঠে নানান মানে বের করে নিতে হয়। অতএব, দিফেরাঁস এমন এক শব্দ, যার মানে নেই কোনো—'এইটাই মানে'। এই শব্দ দাবি করে মনোযোগী পড়ুয়ার সতর্ক পাঠপ্রক্রিয়া—ভেদ অভেদের গণ্ডি পেরিয়ে যার স্ফুরণ ঘটে।

ডিসকোর্স

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমে কতকগুলো প্রাক্-ধারণা (অ) কতকগুলো ধ্বনি অথবা বর্ণপুঞ্জের সমাহারে নির্মিত (আ) যাচ্ছেতাই বা অবাধ (arbitrary) সমাজসংস্কারজাত শব্দের কাঁচামাল বা উপাদান substance-কে (ই) বাক্যের আকারে বিন্যস্ত করে। (ঈ) মানে ও (উ) প্রসঙ্গ অনুযায়ী সাজিয়ে যে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, তার নাম জবানি। এই হল জবানির গ্রন্থনবাদী (Structural) পর্যায়ক্রম। এই পর্যায়ক্রমের গ্রন্থনবাদী বিশ্লেষক পদ্ধতিগুলোর নাম জানিয়ে দেওয়া ভালো : ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), শব্দতত্ত্ব (Lexicology), মানে-তত্ত্ব (Semantics) বিবজ্ঞাবিজ্ঞান (Pragmatics) ও জবানি বিশ্লেষণ (Discourse Analysis)।

তার মানে জবানি আমাদের ভাষা-বিষয়ক ব্যাপার—বলা যায়, দুই নীরবতার মধ্যবর্তী অংশ জবানি। এটা ভাষায় নিবেদনের (দ্র. Performance) এলাকায় পড়ে। দুই নীরবতার মধ্যেও এসে যেতে পারে নীরবতা, পুনরাবৃত্তি, মুদ্রাদোষ অথবা জিহ্বার স্খলন পতন। এই সব নিয়েই জবানি তার ছাঁদ তৈরি করে নানান জ্ঞানাণুর (Episteme) সাহচর্যে। একে বলা যায় জবানি-ছাঁদ (Discursive Formation)। জবানি-ছাঁদ নানান দিকে ছড়িয়ে যায় (Dispersion) কখনো বা তার মধ্যে ঢুকে পড়ে বক্তা বা লেখকের রণনীতি বা রণকৌশল (জবানি বা discursive Strategy)। রণ-এর কথা যখন কথায় কথায় এল, তখন জবানির প্রতাপ প্রসঙ্গ খেয়াল রাখতে হয়। জবানিতে কী নিবেদিত (performed) হল এবং তাতে প্রতাপ-প্রসঙ্গের দখলদারি কতটা কীভাবে হল সেটা বুঝে নিতে চাইবেন উত্তর-গ্রন্থনবাদী (post-structurlal-ist)। প্রতিষ্ঠান ও তার ভাবনীতি জবানি-ছাঁদে নিবেদিত জ্ঞানের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতায়, তা নিয়ে পাল্টা-জবানি (Counter-Discourse) তৈরি করেছেন মিশেল ফুকো। ফুকোর শেষ কাজে জবানি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য ফিরে হয়ে গিয়ে জবানি আর প্রতিষ্ঠান মিলেমিশে গিয়েছে। এই যোগসূত্রে এক নতুন ধারণা হাজির করেছে ফুকোর 'শৃঙ্গারের ইতিহাস' (*History of Sexuality*) যার নাম ফুকো দিয়েছেন 'Dispotif'। ক্ষমতার বহুমুখি খেলায় বক্তা/লেখকের জবানি অনবরত নিয়ন্ত্রিত ও ঝাড়াই বাছাই হতে থাকে। ফলে প্রতিটি জবানি বিনোদনেই থাকে প্রতাপান্বিত স্বর। অবশ্য তাতে থেকে যায় নানান পরত বা ভাঁজ। এই ভাঁজ খুলে মেলে ধরার নাম জবানি বিশ্লেষণ (Discourse Analysis)।

জন্মনিয় পরতে বা স্তরে থাকে ক্ষমতা-জ্ঞানের নানান রূপ। এই নানান রূপকে চিনে নিতে বাশেলার ব্যবহার করলেন এইরকম সব ধারণা : জ্ঞানতাত্ত্বিক ফোকাস (দুই বা ততোধিক জ্ঞানাণুর পারস্পরিক সহাবস্থান, অথচ তাদের মধ্যে ফোকাস আছে), জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনরাবির্ভাব (প্রাচীন কোনও জ্ঞানাণু আজকের জ্ঞানাণুর মধ্যে ঢুকে পড়ল) ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বাধা (আজকের জ্ঞাননৃষ্টি কালকের জ্ঞানকে বুঝতে পারছে না); এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় জ্ঞানতাত্ত্বিক মিশ্রণ (Epistemological Amalgamation)—বোধিদ জ্ঞানাণু একত্র হয়ে বিভূতি পাকালো। আমার মনে, জ্ঞানাণুর এইসব নানান সমাহারে যখন জরায়ুতে আবির্ভূত হয়, তখন ভবতা বা প্রজ্ঞান কিন্তু অনুপস্থিত থাকে না।

ডিস্তালিনাইজেশন

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

যোসেফ স্তালিন মারা যান ১৯৫৩ সালে। বেঁচেছিলেন দীর্ঘ তুয়াত্তর বছর। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল টিফলিস শহরে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণি যে আন্দোলনের আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতিপর্ব সেরে নিচ্ছিলেন সেই প্রস্তুতিপর্বের অন্যতম সহায়ক ছিলেন স্তালিন। স্তালিন নিজেই বলেছেন যে বিপ্লবের প্রথম দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন টিফলিস্ শহরের শ্রমিকদের কাছে। দীক্ষান্তের পর স্তালিন—লেনিন, ট্রটস্কি, সুখানভ, কামেনেভ, কোলনতাই-সহ অন্যান্য বলশেভিক নেতৃবৃন্দ ও রুশ শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় এক দুর্ধর্ষ বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে ১৯১৭ সালে যে-বিপ্লব রুশদেশে সংঘটিত হয়েছিল সেই বিপ্লবের নৌল চরিত্র, কাঠামো ও নির্মাণ-প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী অন্যান্য বিপ্লবগুলি থেকে ভিন্ন ছিল। ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর শ্রেণিভিত্তিক গণজাগরণ অন্যত্র বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে দেখা যায়নি। ইতিউতি গণবিদ্রোহ হয়েছে বটে যেমন হয়েছিল জার্মান নেত্রী রোজা লাক্সেমবার্গের নেতৃত্বে জার্মানিতে—কিন্তু শ্রেণিসংগ্রাম প্রায়শ গণযুদ্ধ এবং সার্বিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারেনি। মার্ক্সবাদের সার সংকলন করে একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা বলশেভিক পার্টির অন্যতম লক্ষ্য ছিল এবং সেই লক্ষ্যে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাফল্যের মধ্যেই যেমন ব্যর্থতার বীজ অঙ্কুরিত হয়, ঠিক তেমনই বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালে এই গৃহযুদ্ধ তথাকথিত রুশ দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখন সেই গৃহযুদ্ধের উত্তাপকে প্রশমিত করার জন্য এবং প্রতিবিপ্লবীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্মূল করার জন্য স্তালিনকে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সমর্থকদের প্রস্তুতিত ও সংগঠিত করার জন্য নির্দেশ দেয়। স্তালিন সেই নির্দেশগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধ বস্তুত শ্রেণিযুদ্ধেরই এক পরিবর্ধিত রূপ ছিল। প্রখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোকভ, তুর্গেনিভের *Virgin soil* বা 'উর্বরভূমি'কে স্মরণ করে লিখলেন *Virgin Soil Upturned*। শলোকভ আসলে লিখেছিলেন এক মর্মস্পর্শী গৃহযুদ্ধের ইতিহাস যে-ইতিহাসের বিবরণীকে আনাটোলি কালিনিন (Anatoly Kalinin) বলেছেন রুশ

দেশের গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক মহাজাগরণের উৎসব। অন্তত ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে এই বিশাল গৃহযুদ্ধের পটভূমিতেই স্তালিনের সাংগঠনিক ও গণনেতৃত্বের অভিষেক হয় এবং বস্তুত এক সুস্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করে। লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর এই মতাদর্শগত পার্থক্য এই পর্ব থেকেই স্তালিনের সঙ্গে ট্রটস্কি ও বুখারিনের মতভেদ এক তীব্র সংঘাতে রূপান্তরিত হয় এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ অধিবেশন (১৯২৪) ও পঞ্চদশ অধিবেশনের (১৯২৭) পরবর্তী স্তরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে স্তালিনের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ তিনের দশকে স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং মিত্রশক্তির সাহায্যে হিটলারের নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তিকে পরাভূত করে। কিন্তু যুদ্ধশেষের এগারো বছর পর ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ্ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে স্তালিনপন্থা ও নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। স্তালিনের মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ক্রুশ্চেভ্ স্তালিনের বক্তব্য, নীতি ও সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন যে স্তালিন মূলত এক অহংকারী ও স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন এবং তাঁর সামরিক নেতৃত্বও অনাবশ্যক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। এই অহংকার ও স্বেচ্ছাচার কালক্রমে ব্যক্তিপূজার জন্ম দিয়েছিল, যা কিনা প্রায় বিগ্রহপূজার সমতুল। ক্রুশ্চেভের সমালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল স্তালিনের একনায়কতান্ত্রিক ঝোঁক। তাই কমিউনিস্ট পার্টিতে এক নয়া-শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে স্তালিনবাদকে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ও ইতিহাসপাঠ থেকে নির্বাসিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন। তাঁর সেই প্রস্তাব ও সমালোচনা গৃহীত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল নিস্তালিনিকরণ প্রক্রিয়া। ক্রুশ্চেভের মতে স্তালিন নির্মমভাবে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ (Political Pluralism) ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রখ্যাত বলশেভিক নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, বুখারিন সমেত বহু বলশেভিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্তালিন বলেছিলেন যে দলের মধ্যে ব্যাপক শুদ্ধিকরণ বা Purging না হলে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। নিস্তালিনিকরণ প্রক্রিয়ায় মূলত স্তালিনঘোষিত ও নির্ধারিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তিপূজার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাব ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস করা ও যৌথ খামার প্রবর্তনের পদ্ধতিকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। লেখক ও ইতিহাসবিদ আইজ্যাক ডয়েশ্চার তাঁর স্তালিন নামক গ্রন্থে স্তালিনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। ট্রটস্কি থেকে ডয়েশ্চার, মিলোভান্ জিলাস্ থেকে ক্রুশ্চেভ কিংবা বুখারিন থেকে অর্থনীতিবিদ লিবারম্যান সকলেই মনে করেছেন যে স্তালিনের যৌথ খামার নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কৃষকেরা উদ্যম হারিয়ে ফেলেন এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌথ খামারের

আগে যে সব খামারে বহু উদ্বৃত্ত উৎপাদন হত, সেগুলিতেও উৎপাদন হার জ্যামিতিক হারে কমে যায়। কেননা ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি শ্রেণিসমাজের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা মানুষ সহজে মেনে নেয় না। সুতরাং স্তালিনের যৌথ-খামার নীতি প্রবর্তনের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ক্রুশ্চেভ বললেন যে লেনিন প্রবর্তিত ও পরিচালিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বর্জন করে স্তালিন স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন।

বস্তুত নিস্তালিনিকরণের মূল দর্শনই হল স্তালিন যুগের গোটা ইতিহাস ও বিবর্তন-প্রক্রিয়াটিকে অস্বীকার করা। যৌথ-খামার নীতি, জাতীয়করণ ও সর্বোপরি উপরিসৌধের (superstructure) ওপর আঘাত স্তালিনবাদকে সমাজতন্ত্রের এক বিকৃত সৃষ্টিতে পরিণত করেছিল। অন্তত বিংশতিতম সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে পূর্বোক্ত সমালোচনাগুলিকে শাণিত করা হয়েছে। কবি ইয়েভ্তুশেঙ্কো, বরিস্ পাস্তেরনাক, সমালোচক মেদভেদেভ্রা তথ্যপ্রমাণসহ বলার চেষ্টা করেছিলেন যে স্তালিন আমলে ব্যক্তি ও শিল্পীর স্বাধীনতা ছিল না। ব্যক্তি ও শিল্পীর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ-প্রক্রিয়া ব্যর্থ হতে বাধ্য। অনড়, অচল সমাজ পরিণতিতে ব্যক্তিপূজায় রূপান্তরিত হয়। স্তালিনের যুগেও তাই হয়েছিল। ক্রুশ্চেভের আগে লিয়ঁ ট্রটস্কি, যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তন নেতা ও রাষ্ট্রপতি জোসেফ ব্রজ্ টিটোও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। সরকারিভাবে স্তালিনকে অস্বীকার করে যে নয়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের কথা ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন এবং যে নীতি পরবর্তীকালে ব্রেজনেভ, কোসিগিন্, আন্দ্রোপভ্, গর্বাচভ্রা ব্যাপকভাবে সোভিয়েত দেশে পরীক্ষা করলেন সেই নীতির মূল কথাই হল ভোগবাদ ও ব্যক্তিগত মালিকানার বৈধীকরণ। ইতিমধ্যে অবশ্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটেছে এবং এক সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক বাস্তবতার সমীকরণ ঘটেছে। তার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট অবশ্য ভিন্ন।

ডেভেলপমেন্ট

অনীক চট্টোপাধ্যায়

ব্যুৎপত্তিগতভাবে অর্থনৈতিক হলেও 'উন্নয়ন' এর ছাতার নিচে বর্তমানে আশ্রয় নিয়েছে রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার, এমনকী ব্যক্তিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে 'উন্নয়ন'-এর। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানের নামকরণেও জায়গা করে নিচ্ছে উন্নয়ন কমিটি। এমনকী যদি বলা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনেও ঢুকে পড়েছে 'উন্নয়ন', সম্ভবত তাহলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও তাত্ত্বিক বিচারে, 'উন্নয়ন' ধারণাটি ১৯৯০-এর দশক থেকে বেশ কিছুটা সংঘর্ষের সম্মুখীন, তবুও 'উন্নয়ন' কথাটির জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। প্রথমে বিশ্লেষণ করা যাক 'উন্নয়ন' ধারণাটিকে।

'উন্নয়ন' বলতে বোঝায় ইতিবাচক পরিবর্তন এবং বিকাশ। বিবর্তন, বুদ্ধি, প্রগতি বা বিকাশ এবং পরিবর্তন—সবকিছুই 'উন্নয়ন' সূচিত করে। *The Oxford Dictionary of Current English*, 'Development' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে : 'A stage of growth or advancement' (১৯৮৮ সংস্করণ, পৃঃ ২০০)। অর্থাৎ বৃদ্ধি বা প্রগতির একটি পর্যায় হল উন্নয়ন। ক্রিয়া (verb) হিসাবে 'উন্নয়ন' হল সেইসব কার্যকলাপ যা এই বৃদ্ধি, প্রগতি বা পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। বিশেষণ হিসাবে 'উন্নয়ন' হল একটি বিচারপদ্ধতি—একটি মাপকাঠি, যার ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক বিষয়ের তুলনা করা চলে। 'ক' রাষ্ট্র 'খ'রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নত, কিংবা 'উত্তর গোলার্ধ' 'দক্ষিণ গোলার্ধ'র চেয়ে উন্নত—এই জাতীয় বিচার 'উন্নয়ন' এর মাপকাঠিতে করা যেতে পারে। কিন্তু অভিধানগত ব্যাখ্যা ছাড়াও সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন'-এর ধারণাকে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিছুকাল আগে, ১৯৯৫ সালে, আরতুরো এসকোবার (Arturo Escobar) 'উন্নয়ন'-কে বিশ্লেষণ করেছেন কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে। এসকোবারের মতে, 'উন্নয়ন' হল সেইসব ধারণা ও কার্যকলাপের সমন্বয় যা পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে দক্ষিণের ওপর উত্তরের ঔপনিবেশিক বা নয়া ঔপনিবেশিক প্রাধান্য কায়েম রাখবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ এসকোবারের কাছে 'উন্নয়ন' হল ধনী উত্তর গোলার্ধের দেশগুলির পক্ষে নয়া উপনিবেশ প্রথা কায়েম রাখবার একটি আধুনিক হাতিয়ার। (Arturo Escobar, *Encountering Development the Making and Unmaking of the Third World*, New Jersey.

Princeton University Press. ১৯৯৫). এসকোবারের এই ধারণার মধ্যে মার্ক্সীয় শোষণতত্ত্বের প্রতিধ্বনি শুনেছেন কেউ কেউ। তবে একথা সত্যি যে উন্নয়ন পুঁজিবাদ-প্রসূত একটি তত্ত্ব। সমাজবিজ্ঞানী ল্যারেইন-এর মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ইউরোপে 'উন্নয়ন'-এর ধারণাটি জন্মলাভ করে। প্রায় দুই শতক ধরে, ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারণাটি পুষ্টিলাভ করেছে। ল্যারেইন এই সময়কালকে 'প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের সময়' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন যদিও প্রতিটি যুগেই ঘটেছে, প্রগতি বা বিকাশের ধারণাটি কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসেছে (*Larrain Theories of Development Capitalism. Colonialism and Dependency.* Cambridge. Polity Press. ১৯৮৯) অধ্যাপক অম্লান দত্ত-ও 'উন্নয়ন'-এর জন্মলগ্ন হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত গ্রন্থ *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations* প্রকাশিত হওয়ার পরেই 'উন্নয়ন' সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও স্মিথের আগে 'মার্কেন্ট্যালিস্ট' মতবাদীরা উন্নয়নপ্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা করেছেন, তবুও স্মিথের আবির্ভাবের সঙ্গেই সম্ভবত 'উন্নয়ন'-এর যুক্তিসঙ্গত বাস্তব ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল বলে অধ্যাপক দত্ত মনে করেন (অম্লান দত্ত, *উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭)। সরকারি স্তরে 'Development' বা 'উন্নয়ন' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালে এবং তারপর থেকেই 'উন্নয়ন'-এর মাপকাঠিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে 'উন্নত' 'উন্নয়নশীল' বা 'অনুন্নত' ছাপ দিতে শুরু করেন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা। সুতরাং ধারণা বা তত্ত্ব হিসাবে 'উন্নয়ন' জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে। মুখ্যত পশ্চিমি এই ধারণাটি বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

উন্নয়নের ধ্রুপদী তত্ত্বের রূপকার হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ ও জন স্টুয়ার্ট মিল বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্মিথের উন্নয়নতত্ত্বে সঞ্চয়কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। সঞ্চয় এবং তার বিনিয়োগ—উন্নয়নের জন্য একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। স্মিথের মতে, জমিদার বা অভিজাত শ্রেণি সঞ্চয়ী নয়, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সঞ্চয়ী। তাই দেশের আর্থিক উন্নয়নের কাজে স্মিথ শিল্পপতিকে অগ্রণী ভূমিকায় রেখেছেন। তাঁর মতে, কৃষির উন্নতির জন্যও প্রয়োজন সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগ। উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে স্মিথ কিন্তু রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকার কথাও বলেছেন, যদিও সাধারণত মনে করা হয় যে স্মিথের উন্নয়নতত্ত্বে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকাই নেই। স্মিথ জনসাধারণের জন্য সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন করার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। শিক্ষার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানেই করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

স্মিথের পর ধ্রুপদী উন্নয়নতত্ত্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হলেন ডেভিড রিকার্ডো। স্মিথের মতোই রিকার্ডোর সমর্থন ছিল শিল্পপতির উপর। তিনি মনে করতেন

যে যে আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণি ও শিল্পপতির স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। শিল্পপতি সঞ্চয়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারেন। রিকার্ডো ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক। অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে তিনি যাবতীয় শুল্ক তুলে দেবার পক্ষে ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল, স্মিথ ও রিকার্ডোর আর্থিক উন্নতির তত্ত্বের একজন সমর্থক। তিনিও অবাধ বাণিজ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। পাশাপাশি আবার সমাজতন্ত্র ও সমবায় ব্যবস্থার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের ভিতর সমন্বয়সাধন সম্ভব। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সমাজকে ক্রমে নিয়ে যাবে সমবায়ের পথে—এই আশা জন স্টুয়ার্ট মিল পোষণ করতেন।

স্মিথ-রিকার্ডোর আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হলেও মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র। স্মিথ-রিকার্ডো যেখানে জমিদার ও শিল্পপতির স্বার্থের দ্বন্দ্বের উপর জোর দিয়েছেন, মার্ক্স-এঙ্গেলস্ গুরুত্ব দিয়েছেন, শ্রমিক ও শিল্পপতির স্বার্থের দ্বন্দ্বের উপর। শিল্পোন্নত সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে থাকে, উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় পুঁজিপতির স্বার্থে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তার হাতে থাকে না। শ্রমিক তার শ্রমবিক্রয়ের মাধ্যমে জীবনধারণে সক্ষম হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম একটি পণ্যদ্রব্য, বাজারে যার ক্রয়বিক্রয় চলে। শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে আর শ্রম বিক্রয়ের দ্বারা যে মূল্য লাভ করে, এই দুয়ের ভিতর তারতম্য থাকে ধনতান্ত্রিক সমাজে। শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি বা উৎপাদন করেছে অথচ নিজে তা লাভ করেনি তাকে মার্ক্সীয়তত্ত্বে বলা হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য। যেহেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম ক্রম করে পুঁজিপতি, উদ্বৃত্ত মূল্যের মালিকানাও থাকে তারই দখলে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমেই শোষিত হয় শ্রমিক, কারণ উদ্বৃত্ত মূল্য একচেটিয়াভাবে হস্তগত করে পুঁজিপতি। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এক তীব্র শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা (স্মিথ, রিকার্ডো, মিল) ধনতান্ত্রিক সমাজে যে উন্নয়নের কথা বলেন তা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু শ্রেণির উন্নয়ন, সমগ্র জনগণ তার দ্বারা উপকৃত এবং উন্নত হয় না। মার্ক্স-এঙ্গেলস্ উন্নয়ন বলতে বোঝেন সমগ্র সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, কেবল সংখ্যালঘু পুঁজিপতি শ্রেণির উন্নতি নয়। সমগ্র সমাজের সার্বিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ সমগ্র জনগণের নিয়ন্ত্রণ। এর জন্য প্রয়োজন শ্রেণি বৈষম্যের অবসান, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান। দীর্ঘদিনের শোষণে ক্লিষ্ট এক সচেতন শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে আসবে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন—ধনতন্ত্রের অবসান এবং শ্রেণিহীন বৈষম্যহীন সমাজের পত্তন। অভ্যন্তরীণ সংকটে জীর্ণ ধনতন্ত্রের অবসানের পর সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—মার্ক্সবাদ এই সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। মার্ক্সীয় উন্নয়নতত্ত্বে শোষণহীন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সার্বিক মুক্তি চিত্রিত হয়েছে। উন্নয়নতত্ত্বে মার্ক্সবাদ এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল শোষণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ধ্রুপদী উন্নয়নতত্ত্বের পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৮৫০-১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ) উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নের

ধারণাকে প্রচারের আলোকে রাখতে সাহায্য করেছিল। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকদের হাত ধরে যে উন্নয়ন তত্ত্বের জন্ম, উন্নত পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদে তা আরো পুষ্ট হয়েছে। সাইদ (Said) মেয়ার (Mair) প্রমুখ গবেষকদের মতে, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে প্রগতি, বিকাশ, উন্নতি ইত্যাদি ধারণাগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হতে থাকে। মেয়ার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অভিভাবক ও শিশুর সম্পর্কের মতো ঔপনিবেশিক প্রভুরা স্থানীয় জনগণকে উন্নত করার বাসনায় নিয়োজিত থেকেছেন। বিদেশী শাসক ও শাসন শিক্ষায়, আচার-ব্যবহারে, আইনি দৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে, নেটিভদের তুলনায় যে যথেষ্ট উন্নত, সেটা ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দেওয়াই ছিল ঔপনিবেশিকদের লক্ষ্য। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ 'সমাজ উন্নয়ন'এর কাজও করে গেছেন। নেটিভদের ল (Law), পলিটি (Polity), সোসাইটি (Society), গুড গভর্নমেন্ট (Good Government) প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বিষয় শেখাতে যে বৌদ্ধিক চর্চা এই সময়কালে হয়েছে তা যে যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এর পরবর্তীপর্যায় আধুনিক উন্নয়ন তত্ত্বের (১৯৫০-১৯৮০) এবং উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিক সংকটের (১৯৮০ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত) সময়। উন্নয়নের আধুনিক তত্ত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়, গুরুত্ব দেয় শিল্পায়নকে, নগরায়ণকে, সংযোগ ব্যবস্থাকে। উন্নয়নকে অর্থনৈতিক প্রগতি হিসাবে দেখা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য। আর অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন অভিজাত প্রযুক্তি, উন্নত ক্রেতা, সংযোগ ব্যবস্থার বিস্তার, দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। আধুনিকীকরণ নিয়ে এসেছে উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠি,—মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product), ব্যক্তির মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) ইত্যাদি। আধুনিক তাত্ত্বিকেরা ভেবেছেন যে GNP বাড়লে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ফল দেখা দেবে, যথা অশিক্ষা, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু দূরীভূত হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল চুঁইয়ে পড়বে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে। বর্ধিত জাতীয় উৎপাদন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে, নতুন পরিকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে বিস্তার ঘটবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ পরিষেবার। আধুনিক উন্নয়নতত্ত্ব ১৯৭০-৮০-র সময় থেকেই সমালোচনার সম্মুখীন। বর্ধিত GNP যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বাসস্থানের অভাব দূর করতে পারে না, পৃথিবীর অনেক ধনী দেশেও তা প্রমাণিত। আর অভিজাত প্রযুক্তি, ব্যাপক নগরায়ণ ও শিল্পায়নভিত্তিক যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা আধুনিক তত্ত্বে ঘোষিত, তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র দেশের পার্থক্য বাড়িয়ে তোলে, সৃষ্টি করে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে উন্নয়নতত্ত্ব তার অর্থনৈতিক চরিত্র হারিয়ে রাজনীতি-ভিত্তিক হয়ে পড়ে।

অভিজাত প্রযুক্তি, ব্যাপক নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এবং অত্যাধুনিক সংযোগব্যবস্থা যে কেবল আর আশীর্বাদ নয়, উত্তর-আধুনিকপর্বে এসে আমরা বোধহয় তা বুঝতে শিখেছি। বর্তমানে তাই শিল্প-নির্ভর প্রযুক্তি-নির্ভর একপেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা

পুরানো হতে শুরু করেছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ যদি বিনষ্ট করে পরিবেশ এবং তার ভারসাম্য, তবে সেই 'উন্নয়ন' আর কাঙ্ক্ষিত নয়। অত্যাধুনিক অভিজাত প্রযুক্তি যদি পরিবর্ত হয় সুস্থসংস্কৃতির, তবে সেই 'উন্নয়ন' আর কাম্য নয়। Per Capita Income আর Gross National Product-এর হিসাবে যদি বাড়িয়ে তোলে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, তবে উন্নয়নের মাপকাঠি পরিবর্তনের আগ্রহ হয়ে উঠবে স্বাভাবিক। উত্তর-আধুনিকতা নির্দিষ্টতাকে প্রশ্রয় দেয় না, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার বহমুখিতা উত্তর-আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য। তাই পরিবেশবিদ্ যদি বলেন যে অভিজাত প্রযুক্তির ব্যবহার করে নদীতে বাঁধ দেওয়া 'উন্নয়ন' নয়, তবে তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ বর্তমানে 'উন্নয়ন' কেবল অর্থনৈতিক রাস্তায় সুনির্দিষ্ট প্রগতি নয়, 'উন্নয়ন' হতে পারে কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, হতে পারে পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণকে রুখে দেওয়া, হতে পারে GNP বা GDP ঐজাতীয় কোন বিষয়ের ছকে বাঁধা বিচারদণ্ড ভেঙে দেওয়া, হতে পারে আরো অনেক কিছু—যা নিকট অতীতে ভাবা সম্ভব হত না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রথাগত উন্নয়ন ব্যাহত করেও ঘটতে পারে উন্নয়ন, কারণ এটি আর গণ্ডিবদ্ধ নয়। তাই ১৯৯০ এর দশক থেকে উন্নয়নের ধারণাটি তাত্ত্বিক সংঘর্ষের সম্মুখীন। একথা ঠিক যে, এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিই উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত ও স্বীকৃত, তবুও যদি বলা যায় যে গত শতাব্দীর শেষভাগে উন্নয়ন তত্ত্বের উন্নয়ন বেশ কিছুটা রুদ্ধ ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তবে কি আপত্তি উঠবে?

তথ্যচিত্র

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

১৮৯৩ সালে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরের এক হোটেলের অন্ধকার ঘরে পর্দার সামনে থেকে আলো ফেলে স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে, দিনের শেষে কারখানা থেকে মজুররা বেরিয়ে আসছে, খাবার টেবিলে বাচ্চাদের দুষ্টুমি ইত্যাদির চলন্ত দৃশ্যাবলি দেখান। এক-একটি বিষয় নিয়ে এক-একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি থেকে চলতে শুরু করে চলচ্চিত্রের ইতিহাস যা ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় বিশ্বের বৃহত্তম বিনোদন শিল্পে।

পনেরো বছরের মধ্যে কলকাতাতেও স্বাভাবিক আলোতে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি শুরু করে দেন হীরালাল ও মতিলাল সেন, জে এফ ম্যাডান, অনাদি বসু প্রভৃতি। ইতিমধ্যে ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই দৃশ্যের ছবি তোলেন জ্যোতিষচন্দ্র সরকার। ওদিকে বম্বেতেও হরিশচন্দ্র সখারাম ভাটওয়েদকর, দাদাসাহেব ফালকে প্রমুখও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ শুরু করেন। এঁদের দৌলতে ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের নানা অংশ এবং টিলক, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত নানা স্মরণীয় মুহূর্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে ধরা পড়েছে। অনাদি বসু ক্যালকাটা ফিল্ম গেজেট নামে নিয়ম করে সংবাদচিত্রমালা শুরু করেন অরোরা ফিল্ম কোম্পানির নামে।

১৯২২ সালে রবার্ট ফ্লাহার্টি 'নানুক অব দ্য নর্থ' নামে ঘণ্টা দেড়েকের একটা ছবি করেন। নানুক আলাস্কার একজন এসকিমো। এসকিমোদের জীবন, পরিবার ও পরিবেশ নিয়ে এই অসাধারণ ছবির পরে ফ্লাহার্টি দক্ষিণ সমুদ্রের সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের তাহিতিদের নিয়ে আর-একটা ছবি করেন 'মোয়ানা' নামে। তাহিতি মেয়েরা আগে পরত ঘাসে বোনা ঘাঘরা, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে কাপড়ের ঘাঘরা পরা। তবু ছবি তোলার সময় ফ্লাহার্টি তাদেরকে ছবির জন্য বিশেষভাবে বানানো ঘাসের ঘাঘরা পরিয়েছেন। এই তাৎবাস্তবতা থেকে বিচ্যুতিকে সমর্থন করে, ১৯২৬ সালে জন গ্রিয়ার্সন বললেন যে এ হল বাস্তবতার সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা—'the creative interpretation of reality'। এই তত্ত্বকে গ্রিয়ার্সন হাতে কলমে রূপ দিলেন হেরিং মাছশিকারিদের নিয়ে তোলা 'ড্রিফটার্স'-এ।

এসব ছবি নির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলি তত্ত্ব বিকশিত হয়। সেগুলোকে চিহ্নিত করে গ্রিয়ার্সন অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলোকে গ্রন্থিত করেন

Principles of Documentary নামে। তাঁর কথাতেই অনেক সময় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিকে ডকিউমেন্টারি বা তথ্যচিত্র বলা হয়। ১৯৪৮ সালে গঠিত ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন এই নামকরণকে জনপ্রিয় করেছে। আর সংবাদমূলক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির নাম হয় নিউজ রীল।

পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনি-চিত্রের উদ্দেশ্য আমজনতার মনোরঞ্জন করা। তাতে কারিগরির কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ। জার্মানির ফ্রিৎস লিঙ্গ, উইলিয়ম মুরনাউ প্রমুখের ছবিতে দেখা যায় প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রকাশ। রাশিয়ার আইজেনস্টাইন মেক্সিকোর উপর তাঁর অসমাপ্ত ছবিতেও নিয়ে এলেন নতুন শৈলী। ফ্রান্সের রেনে ক্লেয়ার, লুই বুনুয়েল, জাঁ ককতো প্রভৃতির ছবিতে দেখা গেল বাস্তবতার সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা নয়, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থেকে বাস্তবতার স্বরূপ জিজ্ঞাসা।

তবে এ যুগের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলাণ্ডের ইয়োরিস ইভেনস। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে তোলা 'স্প্যানিস আর্থ'-এর ধারাবিবরণী লেখেন ও বলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। এ ছবির বিরূপ সমালোচনা করেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন, 'তবু এ ছবি সারা বিশ্বের অবশ্যই দেখা উচিত।' ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপানের চিন আক্রমণের উপরে তিনি নির্মাণ করেন 'দ্য ফোর হানড্রেড মিলিয়ন' নামে একটি ছবি। যে-ক্যামেরা দিয়ে তিনি ছবিটা করেছিলেন সেটা বেজিং-এ বিপ্লবের জাদুঘরে রাখা আছে অন্যতম দ্রষ্টব্য রূপে। মানুষের অধিকার ও মর্যাদার জন্য যেখানেই লড়াই সেখানেই তিনি হাজির হয়েছেন। 'ইন্দোনেশিয়া কলিং' ছবিটা করার জন্য ডাচ সরকার তাঁর পাশপোর্ট পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেছিল। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিকে তিনি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৯২ সালে বম্বেতে তাঁর সতেরোটা ছবির এক রেট্রসপেকটিভ দেখানো হয়।

ফিল্মস ডিভিশন বা এফ ডি-র ছবিগুলোর মুখ্য লক্ষ্য হল ভারত সরকারের প্রচার। আইন করা হয় যে সমস্ত সিনেমা হল-এ বাণিজ্যিক পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি শুরু করার আগে অন্তত আধঘণ্টা এফ ডি-র ছবি দেখাতে হবে। সরকারের প্রচারমূলক তথ্যচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে এফ ডি-র বেতনভুকদের ভেতর থেকে এস এন শাস্ত্রী, জাহাঙ্গির ভাবনাগরি, শান্তি বর্মা, প্রেম বৈদ্য, প্রমোদ পতি, এন এস থাপা প্রভৃতি পরিচালকদের পেয়েছি যাঁরা বহু মানবিক আগ্রহের ছবিও করেছেন। এফ ডি-র বাইরেও স্বল্পদৈর্ঘ্যের অনেক গুণী চিত্রনির্মাতার আবির্ভাব হয়েছে, যেমন এস সুখদেব, ক্লেমেন্ট ব্যাপটিস্ট, হরিসাধন দাশগুপ্ত, শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, মণি কাউল প্রমুখ। আবার কবিতার মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে শিল্পীমনকে প্রকাশ করার প্রশ্রয় বা সুযোগ বেশি বলে এম এফ হুসেন, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক তাঁদের আত্মপ্রকাশের আর একটা বাহন বা মাধ্যম হিসেবে একাধিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন।

পরের যুগে শ্যাম বেনেগাল, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাতারূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান তাঁরা প্রথমে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি

করেই ফিল্ম জগতে আসেন। এঁদের সময় থেকে ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি মুখ্যত শিল্পসৃষ্টির অথবা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আবেগ ছাপিয়ে সামাজিক বা রাজনীতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। আনোয়ার জামালের 'ভাগীরথী কি পুকার', বসুধা যোশি ও রঞ্জন পালিতের 'ভয়েসেস অব বালিয়াপাল', তপন বসুর 'ভোপাল : বিয়ন্ড জেনোসাইড', আনন্দ পটবর্ধনের বাবরি মসজিদ নিয়ে 'রামকে নাম', কি গুজরাট দাঙ্গার উপরে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' প্রভৃতি ছবি কায়েমি স্বার্থ ও সরকারি স্বার্থের অবিচার, প্রতারণা ও নির্যাতনের সত্যকে ও স্বরূপকে দর্শককুলের সামনে উন্মোচন করেছে। প্রতিবাদ ও সমালোচনার ধারা থেকেই গুলান কৃপালনি 'বিহাইন্ড দ্য ক্লোজড ডোরস', সেহজো সিং 'দ্য উইমেন বিট্রেড' প্রভৃতি 'নারীবাদী' ছবি করেছেন। আবার 'দ্য ব্লু রোজ'-এ আশা দত্ত দেখিয়েছেন প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনের বাস্তবতা ও সংগ্রাম।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি কখনোই মনোরঞ্জনের শিল্প ছিল না, বরাবরই ছিল চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি, শিল্পশৈলী ও কল্পনাবিস্তারের অবকাশ, ছিল বিচিত্র বিশাল মানবসমাজের পরিচয় অন্বেষণের একটা উপায়, ছিল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা। তার সঙ্গে যুক্ত হল মানুষের কীর্তি ও শিল্প সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করার কাজ। এখন হয়ে উঠেছে মানুষের মস্তিষ্কের বিচারশীলতা ও হৃদয়ের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধকে সচেতন ও সক্রিয় হবার জন্য স্পর্ধিত আহ্বান।

তাল ও লয়

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতের আদ্যোপান্তে কাল পরিমাণের নিয়ম সমান রাখাকে লয় বলে। সেই লয়কে, অর্থাৎ কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গান ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে তাল বলে।

সংগীত রত্নাকর গ্রন্থকার তালের নিম্নলিখিত তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন—১. লঘু, গুরু ও প্লুত মানের সাহায্যে নির্ধারিত ক্রিয়া দ্বারা পরিমিত কাল। ২. এক প্রকার কলা এবং ৩. এক প্রকার প্রবন্ধাঙ্গ। প্রচলিত সংগীতে লয় এবং মাত্রা বিশিষ্ট একটি ছন্দ রচনাকে তাল বলা হয়। এই রচনা বিশেষ বাণী বা বোলের মাধ্যমে রচিত হয়। বিভিন্ন লয় এবং মাত্রা সমষ্টিতে নানারূপ ছন্দোবৈচিত্র্যে প্রস্বনের তারতম্যে অসংখ্য তালের উৎপত্তি হয়েছে। অন্য দিকে প্রস্বনের স্থানগুলিকেই তাল বলা হয়। গীত, বাদ্য বা নৃত্য কোনো না কোনো তালে নিবদ্ধ থাকবেই। তাই সংগীতে তাল একটি অপরিহার্য অঙ্গ, অর্থাৎ এক কথায় তালকে সংগীতের প্রাণ বলা হয়। তালের দশটি প্রাণ আছে। সেগুলি হল :

১. কাল : সংগীতের নির্দিষ্ট সময়সীমাকে বলা হয় কাল। কাল দু' ধরনের—সূক্ষ্ম ও স্থূল।

২. মার্গ : মার্গ দ্বারা তালের মাত্রাসংখ্যা, পদসংখ্যা, গতিভঙ্গি, তালি, খালি এবং সেগুলির অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মার্গ চার ধরনের—ধ্রুব, চিত্র, বাচিক ও দক্ষিণ। এগুলি তালের পদ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. ক্রিয়া : তাল প্রদর্শক কর্মকে ক্রিয়া বলা হয়। ক্রিয়া দু'ধরনের—সশব্দ ও নিঃশব্দ। সশব্দ ক্রিয়া আবার চার রকম—আবাপ, নিঃষ্ক্রম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ।

৪. অঙ্গ : তাল বিভাগকে অঙ্গ বলে। অঙ্গ প্রধানত ছয় ধরনের—অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত এবং কাকপদ। এর অক্ষরকাল হল যথাক্রমে ১, ২, ৪, ৮, ১২ এবং ১৬। এই কালগুলিকে বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে।

৫. গ্রহ : তালের যে বিশেষ মাত্রা থেকে সংগীত আরম্ভ হয় সেই স্থানটিকে গ্রহ বলা হয়। এটি দু'ভাগে বিভক্ত—সম ও বিষম। বিষম গ্রহকে আবার অতীত ও অনাগত এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

৬. জাতি : তালের একাধিক জাতি। *সংগীত রত্নাকর*-গ্রন্থে মোট পাঁচটি জাতির উল্লেখ আছে। যথা—তিস্র, চতুস্র, খণ্ড, সঙ্কীর্ণ ও মিশ্র।

৭. কলা : তালের নিঃশব্দ ক্রিয়াকে কলাপাত বা পাতকলা বলা হয়। অনেকের মতে কলা ও তাল সমার্থক।

৮. যতি : সংগীতে গতি প্রয়োগের নিয়মকে যদি বলা হয়। এটি পাঁচ প্রকার।
সমা—আদি, মধ্য এবং অন্তে এক প্রকার গতি।
সরিৎ—আদিতে বিলম্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুত গতি।
মৃদঙ্গ—আদি অন্তেদ্রু এবং মধ্য ও দ্রুতের মিশ্রণ গতি।
উমরু—আদি ও অন্তে বিলম্বিত এবং মধ্যস্থানে দ্রুত গতি।
গোপুচ্ছ—আদিতে দ্রুত এবং মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত গতির ক্রিয়া।

৯. প্রস্তাব : তালের বিস্তারকে প্রস্তাব বলা হয়।

১০. লয় : তালের গতির নাম লয়। *সংগীত রত্নাকর* গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ক্রিয়ান্তে বিভ্রান্তি লয়ঃ' অর্থাৎ লয় হল ক্রিয়ার অন্তে বিশ্রান্তি। লয় সাধারণত তিন রকম—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। তবে লয়ের এরূপ অবস্থাকে ভেঙ্গে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত, দ্রুত মধ্য, দ্রুত বিলম্বিত ও মধ্য বিলম্বিত এই ছয় ধরনের লয় রচনা সম্ভব বলে উল্লেখ পাওয়া। *সংগীত রত্নাকর*-এও এর উল্লেখ আছে। তালের গতি খুব ঢিমা হলে বিলম্বিত, বিলম্বিত ও দ্রুত গতির মধ্যবর্তী গতিকে মধ্য এবং গতি দ্রুত হলে দ্রুত লয় বলা হয়। সাধারণভাবে বিলম্বিত লয়ের দ্বিগুণকে মধ্য লয় এবং মধ্য লয়ের দ্বিগুণকে দ্রুত লয় বলা হয়।

লয়ের গ্রহ চারটি—সম, অতীত, অনাগত ও বিষম। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে তাল শুরু হলে তাকে সম বলা হয়। গীত-বাদ্য শুরু হওয়ার পর তাল আরম্ভ হলে লয়ের অতীত গ্রহ হয়। তাল শুরু হওয়ার পর সংগীত শুরু হলে লয়ের অনাগত গ্রহ এবং সংগীতের তাল ক্রিয়ার প্রথম অনিয়ম হলে মধ্য ও শেষ ভাগে নিয়মমতো প্রয়োগ হলে লয়ের বিষমগ্রহ হয়। বৈচিত্র্য সহকারে নানা ছন্দে লয় প্রদর্শনকে 'লয়কারি' বলা হয়ে থাকে।

তুলনামূলক সাহিত্য

স্বপন মজুমদার

তুলনামূলক সাহিত্য (লিতারেতুর কঁপারে) শব্দবন্ধ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ফ্রান্সে এক সংকলনগ্রন্থের নামে, ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে। ইংরেজিতে ম্যাথু আর্নল্ড ১৮৪৮ সালে একটি চিঠিতে তুলনামূলক সাহিত্য-র উল্লেখ করেন বহুবচনে। এই নামপদটিরই প্রায় জার্মান ভাষান্তর (হ্বের্গেলেইশেন্ডে লিটারেটুরগেশিস্টে) করেন মরিৎস্ কারিয়ের ১৮৫৪-য়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এক ভাষণে তুলনামূলক সাহিত্য-কে 'বিশ্বসাহিত্য' নামে বাংলায় অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ। (১৯০৭)। ১৯৫৬-য় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্রসম্পূর্ণ বিভাগ সৃষ্টির সময় তার নাম হয় তুলনামূলক সাহিত্য।

তুলনামূলক সাহিত্য যথাসম্ভব নিরাসক্তভাবে সাহিত্যে সৃজন ও প্রতিগ্রহণের সূত্রগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। বিচিত্রবিদ্যার সমাহারে গড়ে উঠেছে তার বিচারপদ্ধতি। আখ্যানমূল (থিম্) ও সাহিত্য প্রজাতির (জঁর) বিবর্তন এবং সাহিত্যের যুগকালগত তনুবর্তন (হিস্টরিওগ্রাফি); প্রধানত এই তিনটি ক্ষেত্রে অভিঘাতসূত্রের বিচারের মধ্য দিয়ে নিষ্পন্ন হত আদিপর্বের তুলনামূলক সাহিত্য-র পাঠ। ধ্রুপদী সাহিত্যের ধারা কত বিচিত্রপথে রেনেশাঁসের মধ্য দিয়ে বহুশাখায়িত ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছে, তার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যানই ছিল সূচনাপর্বে তুলনামূলক সাহিত্য-র প্রধানতম অভিলক্ষ্য। অভিন্ন গ্রেকো-রোমান ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য সত্ত্বেও ইউরোপীয় দেশগুলির স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার তুলনা ছিল এই বিদ্যাচর্চার স্বকীয় ক্ষেত্র। কখনো তার মধ্যে কাজ করেছিল স্বদেশগৌরব প্রচারের (গ্যোয়টে), কখনো বা বিদেশের ছদ্মপ্রশস্তির (ভোলতেয়ার) মনোভাবে। আলোকপ্রাপ্তির যুগেই তুলনামূলক সাহিত্য পেল তার শিকড়ের ডানা।

ইউরোপে উদ্ভূত হলেও তুলনামূলক সাহিত্য বিদ্যায়তনিক পাঠের কৌলীন্য পায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। চার্লস্ শন্‌সি শ্যাকওয়েল ১৮৭১ থেকে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৮৮৭ থেকে চার্লস্ মিলস্ গেইলি মিশিগানে তুলনামূলক সাহিত্য পড়াতে শুরু করেন। প্রথম অধ্যাপকপদ সৃষ্টি হয় হার্ভার্ডে ১৮৯০-তে। ইউরোপে লিয়ঁ-য়, ১৮৯৭ সালে। তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, হ্যাচেসন ম্যাকলি পসনেটের *কম্প্যারেটিভ লিটারেচর* প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই বিষয়ে প্রথম গবেষণাপত্রে *আক্তা কম্পারাশিওনিস্ লিতেরারুম্ ইউনিভার্সারুম্* প্রকাশিত হয় উগো মেন্টৎস্‌ল্ দ্যা

লোমনিৎস্ এর সম্পাদনায় (১৮৭৯)। মাক্স কখের *ৎসাইটশিফ্‌ট্ ফ্যুর-স্ভেৰ্গেলেইশেন্ডে লিটারেট্যুরগেশিস্টে* (১৮৮৭-১৯১০) ও *স্টুডিয়েন ৎসুওর স্ভেৰ্গেলেইশেন্ডে লিটারেট্যুরগেশিস্টে* (১৯০১-০৯) তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার প্রয়োগক্ষেত্র অবারিত করে। ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা দ্য স্টাডি অফ্ কম্পারেটিভ লিটারেচর, লেখক রলফ্ হেঙ্কল্, প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৫২)। এশিয়ায় এই বিষয়ে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৬১), বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়।

প্রথম যুগে তুলনামূলক সাহিত্য-র প্রধান প্রবণতা ছিল প্রভাব আবিষ্কারের। দুই বা তার বেশি দেশের জাতীয় সাহিত্যের তুলনা করে একের মধ্যে অন্যের প্রতিসরণ প্রতিপন্ন করাই ছিল এই পাঠের উদ্দেশ্য। এর জন্য তাঁরা নির্ভর করেছিলেন লেখকের স্বীকারোক্তি বা অনুরূপ কোনও অকাট্য তথ্যাবলির ওপর। প্রভাবের উৎস বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ যত ছিল, প্রভাবিতের গ্রহণবৈশিষ্ট্য বিচারে তাঁদের তত মনোযোগ ছিল না। ফ্রান্সের তাত্ত্বিকেরা এই পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন বলে তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্রে একে বলা হয় ফরাসি মার্গ। এরই পাশাপাশি আমেরিকায় গড়ে উঠেছিল সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তর বা সমাযোজিত যেকোনো সৃজনশীল মানবিক প্রকাশের তুলনাচর্চা। ফরাসি মার্গের ঐতিহাসিকতা আর প্রজাতিনির্ভরতার বিপরীতে আমেরিকান মার্গ অবলম্বন করেছিল বিবরণাত্মক ও সমন্বয়মুখী এক দৃষ্টিভঙ্গি। পল ফ্যানটিমের সূত্র অনুযায়ী প্রথমটি তুলনামূলক সাহিত্য, দ্বিতীয়টি সর্বজনীন / সাধারণ সাহিত্য। রনে স্ভেলেক অবশ্য এই সরল বিভাজনের বিরোধী; তাঁর মতে তুলনামূলক ও সাধারণ সাহিত্য অনিবার্যভাবে মিলনপ্রত্যাশী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক প্রতাপগর্বী ইউরো-আমেরিকান তুলনামূলক সাহিত্য চর্চায় কিন্তু ওই দুই মহাদেশের বাইরের সাহিত্য-অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারমুখী তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্র গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টাই ছিল না। তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যপাঠের সূত্রে মাত্র যে ক্ষীণ দৃষ্টি-উন্মীলন ঘটেছিল নিপ্পন থেকে মিশর পর্যন্ত প্রাচ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাকেই পর্যাপ্ত ভেবে তৃপ্ত ছিলেন তাঁরা। এমনকী মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডেই যে স্লাভ ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে সম্পন্নতর এক তুলনামূলক সাহিত্য প্রস্থান, অথবা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে যে তৌলনিক সম্ভাবনার অমিত প্রাচুর্য থাকা সম্ভব, এমন কল্পনাও বিব্রত করেনি তাঁদের। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে অন্য মহাদেশ-চতুষ্টয়ের বিপুল সাহিত্যকীর্তি ও সমালোচনা পদ্ধতি এতদিনকার রক্ষণশীল তুলনামূলক সাহিত্য তত্ত্বকে শুধু যে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলল তাই নয়, প্রয়োজন দেখা দিল তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্রকে নতুন বর্মে ও বিন্যাসে সজ্জিত করে তোলার। দায়োনিজ দুরিজিনের *লিটেরারি কম্প্যারেটিস্টিক্স* বা ইটামার ইভান-জোহারের বহুতন্ত্রবাদী (*পলিসিস্টেম*) তত্ত্ব ইউরো-আমেরিকান তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্রকেই সংস্কৃত ও সম্প্রসারিত করে নতুন জীবন দিল। ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-সীমিত শীর্ণ ও স্থবির তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্রের আপাত

এই বিলয় থেকে সমুত্থিত তার এক-একটি প্রস্থান হয়ে উঠল স্বরাট্; তুলনামূলক সাহিত্য বিচারপদ্ধতিতে ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ওপর নির্ভরতা আপেক্ষিকভাবে কমে এল, প্রাধান্য পেল সমাজবিদ্যা ও রাজনীতির বহু অনুসিদ্ধান্ত। জন্ম নিল সংস্কৃতিবিদ্যা, অনুবাদশাস্ত্র, মানবীবিদ্যা, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ বা উত্তর-আধুনিকতা প্রভৃতি বিশ্লেষণমার্গ। একক সাহিত্যের অনুশীলন ও পাঠও স্বীকার করে নিল তুলনামূলক সাহিত্য শাস্ত্রের এইসব সুকৃতি। বর্তমান বিশ্বে, বিশেষত ভারতবর্ষের মত বহুভাষিক, বিচিত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশে, যেকোনো সাহিত্য-পাঠপ্রকরণেই তাই আজ তুলনামূলক সাহিত্য-র বীজবান বিস্তার।

থার্ড ওয়ার্ল্ড

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধনতান্ত্রিক দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ, মোটামুটি এইভাবে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না লাগলেও এই দুই শিবিরে যুদ্ধের আয়োজনে বিরাম ছিল না। একটি শিবিরের নেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অপরটির রাশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র। যুদ্ধ না বাধলেও, স্নায়ুযুদ্ধ লেগেই ছিল, যার নাম ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ এশিয়া আর আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলন যোগ দেন। চিন ছাড়া অন্যান্য যেসব দেশ সম্মেলনে আসে তাদের অধিকাংশই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের পুরোনো উপনিবেশ। এরা ঘোষণা করল, ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কোনও শিবিরেই এরা নেই, এরা নিরপেক্ষ, এরা নন অ্যালাইন্ড রাষ্ট্র। পরে ইউরোপ থেকে যুগোস্লাভাকিয়াও এই শিবিরে যোগ দেয়। শিবিরটির নাম হল তৃতীয় বিশ্ব।

'তৃতীয় বিশ্ব' নামটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছিলেন একজন ফরাসি সাংবাদিক বান্দুং সম্মেলনের সময়। পরে মাও জে দঙের রচনায় এর ব্যবহার একে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয় শুধু সাংবাদিকতায় নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও। ফরাসি সাংবাদিক নামটি ব্যবহার করেছিলেন তৃতীয় শিবির হিসেবে নয়, থার্ড এস্টেট-এর অনুকরণে। ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৭৮৯) রাজতন্ত্র ও চার্চ এই দুই এস্টেটের-এর বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেটের অভ্যুদয় হয়েছিল। এই তৃতীয় এস্টেটের মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরা নিজেদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রেরা নিজেদের অবহেলিত এবং উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির সুবিধা থেকে বঞ্চিত মনে করত।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি যদিও নিজেদের নিরপেক্ষ গণ্য করত, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে সব রাষ্ট্রই বৃহৎ শক্তির প্রভাবেই ছিল, যেমন ভারত ছিল রাশিয়ার আর পাকিস্তান ছিল আমেরিকার। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিন্যাসও বিভিন্নরকম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ না হলেও তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ লেগেই ছিল। ফলে এই তৃতীয় বিশ্ব কখনই কোনো সংহতশক্তি হিসেবে দেখা দেয়নি। তবে তৃতীয় বিশ্বের উত্থানের পর উন্নত দেশগুলো তৃতীয় শক্তির জন্ম দেবে এই ভয়ে সমসময়েই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকেই নিজেদের প্রভাবে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল।

তৃতীয় বিশ্ব নামটি অস্বচ্ছ; কোনও সম্মেলনে বিধিবদ্ধভাবে কোনো দেশ তৃতীয় বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তুলনায় 'জোট-নিরপেক্ষ দেশ' বা নন্-অ্যালাইড দেশগুলো নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে ন্যাম্-এর (নন-অ্যালাইড মুভমেন্ট) অন্তর্ভুক্তির ফলে স্পষ্টভাবে বলা যায় কোন্ কোন্ দেশ এই জোটে আছে। ১৯৫৫-এ বান্দুঙের সম্মেলনের পর ১৯৬১-এ বেলগ্রেড-এ এই জোটের প্রথম সম্মেলন হয়। ১৯৬৫ সালে আবার এর গতি প্রসারিত ও নির্দিষ্ট হয়, সে সময় এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতের জওহরলাল নেহরু, যুগোস্লাভাকিয়ার মার্শাল টিটো এবং মিশরের গামাল আবদেল নাসের। বর্তমানে ১১৪টি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ ন্যাম-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইউনাটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম উন্নয়নশীল দেশ বলে নির্দিষ্ট করেছে এই রাষ্ট্রগুলোকে : আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ক্যামেরুন, কলম্বিয়া, কঙ্গো, কিউবা, মিশর, ফিজি, হাইতি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জামাইকা, কেনিয়া, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, লেবানন, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, মরক্কো, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, পানামা, পেরু, ফিলিপিন্স, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, সুদান, থাইল্যান্ড, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, ভিয়েতনাম আর জিম্বাবোয়ে।

অনুন্নত দেশ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে : আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, বাংলাদেশ, বেজিন, ভূটান, বুরকিনা, ফাসো, বুরুন্ডি, কাম্বোডিয়া, কেপ ভার্দে, চাদ, কোমারস, জিবুতি, ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, গিজি, গিজি বিসাউ, হাইতি, কিরিবাটি, লাওস, লোসোথো, লাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার, মালয়ি, মালদ্বীপ, মালি, মরিশাইয়া, মোজাম্বিক, মায়ানমার, নেপাল, নাইজের, রোয়ান্ডা, সামোয়া, সাও টোপ ও প্রিন্সিপে, সিয়েরা লিওন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সোমালিয়া, তানজানিয়া, টোগো, টুভালু, উগান্ডা, ভাজুয়াটু, ইয়েমেন, জাইরে আর জাম্বিয়া।

থার্ড থিয়েটার

ইরাবান বসুরায়

থার্ড থিয়েটার একটি নাট্যপদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রচলিত, দীর্ঘকাল ধরে চর্চিত নাট্যরীতিকে প্রত্যাখ্যান করে একটি স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

থার্ড থিয়েটারের ভাবনা ও নামকরণের দায় ও দায়িত্ব সম্পূর্ণই বাদল সরকারের। দেশজ নাট্যরীতি যাত্রাকে তিনি অভিহিত করেছেন প্রথম বা ফার্স্ট থিয়েটার বলে, পশ্চিম থেকে পাওয়া মঞ্চনির্ভর বা প্রসেনিয়ম থিয়েটার হল দ্বিতীয় বা সেকেন্ড থিয়েটার। আর এই দুয়ের বিরুদ্ধ এবং বিকল্প হল তৃতীয় বা থার্ড থিয়েটার যা মঞ্চকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে চায়। যাত্রা বা ফার্স্ট থিয়েটার গ্রামীণ, এবং তা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। সেকেন্ড থিয়েটার নাগরিক এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি বা উচ্চশ্রেণির সংস্কৃতির অঙ্গ। থার্ড থিয়েটার সেদিক থেকে গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির এক সিন্থেসিস বলে মনে হতে পারে।

দেশজ লোকনাট্য বা যাত্রায় একটি মঞ্চ থাকে, যদিও তার চারদিক খোলা, এবং চারপাশেই দর্শক বসতে পারে। প্রসেনিয়ম থিয়েটারে মঞ্চের শুধু সামনে দর্শকাসন, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মঞ্চ দর্শকদের সমভূমি নয়, একটু উঁচুতে। কিন্তু এই দুই থিয়েটারেই অভিনয়ের সঙ্গে দর্শকের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, অর্থাৎ দর্শক সেখানে থিয়েটারে অংশ নিচ্ছে না। থার্ড থিয়েটার চলে আসে দর্শকদের মাঝখানে, মঞ্চ ও দর্শকের দূরত্বকে মুছে দিয়ে এই থিয়েটার দর্শককে অংশীদার করে তুলতে চায়। এখানে তথাকথিত মঞ্চ নেই, অভিনেতারা দর্শকদের একই ভূমিতে অভিনয় করেন।

যাত্রায় বাচনভঙ্গি, স্বরক্ষেপণ, অঙ্গসঞ্চালন কোনোটাই স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ সেটি যে অভিনয় তা প্রতি মুহূর্তেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় থিয়েটার লোকনাট্য বা যাত্রা থেকে কিছু নিতে চেয়েছে। যেমন এই থিয়েটার বাস্তবের বিভ্রম তৈরি করে না, দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উস্কে দিতে চায়। ফলে এই থিয়েটারের ভাষা প্রসেনিয়ম থিয়েটার থেকে একেবারে আলাদা। এই থিয়েটারের মূল কথা হল, বক্তব্য। কী করে দর্শকের কাছে কোনো বক্তব্য পৌঁছে দিয়ে তার চেতনায় নাড়া দেওয়া যায়, তাকে সক্রিয় করে তোলা যায়, এটাই এর উদ্দেশ্য।

এইজন্যই এই থিয়েটারকে অন্যভাষা খুঁজতে হয়। প্রসেনিয়ম থিয়েটারের অনেক কিছু বর্জন করলেও একটি সত্যকে থার্ড থিয়েটার মেনে নিয়েছে যে 'থিয়েটার' এই শিল্পমাধ্যমটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত। প্রাণবন্ত অভিনেতা ছাড়া থিয়েটার হয় না। তাই থার্ড

থিয়েটার অভিনেতার বুদ্ধি, অনুভূতি ও শরীরের পূর্ণ ব্যবহার করতে চায়। সে-কারণেই প্রাণবন্ত দর্শককে দূরে না রেখে তাকে কাছে আনতে চায়, তার নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি বদলে তাকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তুলতে চায়। তাই এই থিয়েটার মানব শরীরকে থিয়েটারের অপরিহার্য উপকরণ মনে করে। এর ভাষা একইসঙ্গে শরীরী প্রতীকনির্ভর আবার কথাকে অবলম্বন করতে চায়। এই কথাগুলি কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র বা অভিনেতার সংলাপ নয়, ফলে এই অভিনয় পাঁচজনও করতে পারে, পনেরোজনেও করতে পারে। কিন্তু এই থিয়েটারের ভাষা শুধু নির্দেশনির্ভর নয়। এখানে অভিনেতাদেরও সমান তাগিদ অনুভব করতে হয়। এখানে কথা বলা, হাঁটাচলা ইত্যাদির কোনো মডেল নেই—ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, গতিবিধির আছে অবাধ স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অবশ্যই নাটকের কথাকে অর্থবহ ও কার্যকর করে তোলার জন্য, তা নাহলে যে শরীরের ব্যবহার নিষ্প্রাণ অলংকরণ হয়ে পড়বে, সে-বিষয়ে থার্ড থিয়েটার সচেতন।

থার্ড থিয়েটার বাণিজ্যিক পণ্য নয়, আবার 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই ধারণাতে বিশ্বাসী নয়, যদিও থার্ড থিয়েটার নিজেকে শিল্প বলেই মনে করে। থার্ড থিয়েটার 'থিয়েটারের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে' এই মতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ থার্ড থিয়েটার শুধু একটি স্বতন্ত্র নাট্যরীতিই নয়, তা একটা দর্শন, একটা ভাবধারা, তাই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন।

বাদল সরকার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন নাটকের বিষয়ের তাগিদেই এই নাট্যরীতি গড়ে উঠেছে। এ-ব্যাপারে অবশ্য দ্বিমত হওয়া চলে। বাদল সরকার বা অন্যান্য 'থার্ড থিয়েটার' আন্দোলনের দলগুলি এই প্রয়োগরীতির কথা মনে রেখে সেভাবেই নাটক লিখেছেন বা সাজিয়ে নিয়েছেন, এমনকী প্রসেনিয়ম থিয়েটারের অভিনীত নাটককেও কিছুটা অদল বদল করে এই নাট্যরীতি অনুসারে অভিনয় করা হয়েছে। আসলে এই নাট্যরীতির উদ্ভবের তাগিদ হল দর্শকের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা।

থার্ড থিয়েটার প্রাথমিক পর্বে প্রেরণা পেয়েছিল পোল্যান্ডের জর্জি গ্রোতোভ্স্কির 'পুওর থিয়েটার'-এর তত্ত্ব থেকে। গ্রোতোভ্স্কি তার থিয়েটার থেকে নানা আয়োজন বাদ দিয়ে অভিনেতাদের উপরই অবলম্বন করেছিলেন। দর্শক-অভিনেতার মধ্যে দূরত্ব কমাবার চেষ্টা করেছিলেন। আবার ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকা ও কানাডায় গিয়ে বাদল সরকার 'এনভায়োরনমেন্টাল থিয়েটার'-এর উদ্যোক্তা রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, 'লিভিং থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা জুনিয়ান বেক ও জুডিথ বেকের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়। এই 'লিভিং থিয়েটার'-এর শরীরী অভিনয়, তাৎক্ষণিক সংলাপ, ঘটনাসৃজন ও তার সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্যের মিশ্রণও থার্ড থিয়েটারের প্রাথমিক প্রেরণা, যদিও বাদল সরকার পরে 'লিভিং থিয়েটার'-এর 'সেক্সুয়াল রেভল্যুশন' নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। আবার ব্রেখট প্রবর্তিত এপিক থিয়েটার রীতির সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্যও পাওয়া যাবে, ব্রেখটের মতোই দর্শককে মুগ্ধ না করে তাকে সচেতন করে তোলাই থার্ড থিয়েটারের উদ্দেশ্য। এই থিয়েটারে স্থান কাল, এমনকী চরিত্রের সীমারেখাকেও যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাট্যগুলির সঙ্গেও

কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। জার্মানির নাট্যকার পিটার ভাইসের 'সং অব দি লুসিতানিয়ান বগি' বা 'ভিয়েতনাম' নাটকেও দেখা যাবে চরিত্রের নাম নেই, শুধু সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত তারা, মুহুর্মুহু সংলাপ চরিত্র থেকে চরিত্রান্তরে যাচ্ছে, সাজসজ্জা, পোষাক, এমনকী উপকরণের বাহুল্য নেই। বস্তুত এইসব নানা পরীক্ষামূলক নাট্যরীতি যা প্রচলিত প্রসেনিয়ম থিয়েটারের বাইরে এসে বা তার বিরোধিতা করেই তৈরি হয়েছিল, বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটারে'-এর ভাবনাকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু ক্রমশ বাদল সরকার তাকে করে তুলেছেন দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

থার্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য হল, এই থিয়েটার নমনীয়, অর্থাৎ নানা ধরনের পটভূমিতে অর্থাৎ কোনো ছোটোঘরে, অঙ্গনমঞ্চে বা খোলা জায়গায় মুক্তমঞ্চে অভিনয় করা যায়। এই থিয়েটার বহনীয়, অর্থাৎ একে সহজেই সব জায়গায় নিয়ে পাওয়া যায়, শহরের অঙ্গন থেকে প্রত্যন্ত গ্রামেও এর অবাধ বিচরণ। এই থিয়েটার এক অর্থে গরিব থিয়েটার, কেননা এ-থিয়েটার উপকরণের বাহুল্য, যথা, দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা, বেশভূষা, রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দযন্ত্র ইত্যাদিকে বর্জন করে। এই থিয়েটার মানবশরীরকে থিয়েটারের অপরিহার্য উপকরণ মনে করে। এই থিয়েটার প্রসেনিয়ম থিয়েটারকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শগত বলে মনে করে, আবার লোকনাট্য যা যাত্রায় সামন্ততান্ত্রিকভাবে প্রভাব আছে বলে মনে করে, সেজন্য ভাবাদর্শের দিক থেকে এই দুইকে বাতিল করতে চায়। এই থিয়েটার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; দর্শকের কাছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পৌঁছে দিতে চায়, সেক্ষেত্রে অভিনেতা ও দর্শকের যৌথ অংশগ্রহণই এর বিশিষ্টতা। এই থিয়েটার একটি নাট্যরীতি, কিন্তু তা একটি দর্শনও।

থার্ড ডিগ্রি

সুজাত ভদ্র

অত্যাচারের ইতিহাস পুরোনো। এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে সভ্যতা এগিয়েছে যখন অত্যাচারকে অন্যায়, অনৈতিক বা অবৈধ বলা হত না। সমাজের মধ্যে, তার সংস্কৃতির মধ্যেই তা প্রোথিত ছিল, অনুমোদন ছিল। Page dec Bois তাঁর অনুপম গ্রন্থ *Torture and Truth*-এ (লন্ডন, ১৯৯৯) দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাচীন গ্রিসে ক্রীতদাসদের কাছ থেকে সাক্ষ্য আদায়ের জন্য অত্যাচারের নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হত। আবার, মিশেল ফুকো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Discipline and Punish* (পেঙ্গুইন, ১৯৮৫) শুরুই করেছেন অপরাধীকে (Condemend) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে প্রকাশ্যে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে নৃশংস, অমানবিক কায়দায় হত্যার বর্ণনার মাধ্যমে। 'মধ্যযুগের বর্বরতা' নিয়ে তো উল্লেখের বিশেষ দাবি রাখে না; আমাদের উপমায়, রূপকে অভিব্যক্তিতে তার বারংবার ব্যবহার সেই যুগের বর্বরতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

কিন্তু উপর্যুক্ত অত্যাচারসমূহ আধুনিক 'থার্ড ডিগ্রি' নয়। অধুনা অত্যাচার সংগঠিত হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে, ঘাতকের পৈশাচিক উল্লাসের পরিমণ্ডলে। আত্মীয়-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগহীন পরিস্থিতিতে যাকে বলা হয়, detention incommunicado। বন্দীর উপর নানা ধরনের পুলিশের অত্যাচারকে 'থার্ড ডিগ্রি' বলা হয়। প্রকাশ্য থেকে গোপনে, সকলের আড়ালে অত্যাচার পদ্ধতির এহেন রূপান্তরের প্রধান কারণ, অত্যাচার আজ দেশে দেশে অবৈধ, বেআইনি। যেমন, জিজ্ঞাসাবাদের নামে অথবা অন্য কোনো অজুহাতে পুলিশ নিরস্ত্র অসহায় বন্দীকে অত্যাচার করলে ভারতের দণ্ডবিধির ৩৩০, ৩৩১ ধারা অনুসারে, পুলিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়—প্রহার, নির্যাতন, নিগ্রহ তো দূরের কথা, এমনকী হুমকি বা ভয় দেখানো অথবা লোভ বা টোপ দেওয়াও ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৩ ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এও আমাদের মনে রাখতে হবে, পুলিশের কোনো অভিযুক্তকেই কোনো ধরনের শাস্তিদানের ক্ষমতা নেই। ১৮৮২ সালের কার্যবিধিতেই পুলিশের সাজা দেওয়ার ন্যূনতম ক্ষমতাকেও সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং দোষী প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তিদানের বৈধ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার হাতে।

'থার্ড ডিগ্রি'র ব্যুৎপত্তি সম্পৃক্ত হয়ে আছে নাগরিকের অবাধ, মুক্ত চলাফেরার স্বাধীনতার উপর নানা বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে। সম্ভবত ১৯০১ সালে এই শব্দটির প্রচলন হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেনে। ১৯০১ সাল নাগাদ আমেরিকাতে একইভাবে 'থার্ড ডিগ্রি' শব্দটি পরিচিতি লাভ করে। কোনো নাগরিককে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে তা বলা হত 'ফার্স্ট ডিগ্রি'; অর্থাৎ নাগরিকের মুক্ত স্বাধীন চলাফেরার উপর প্রথম হস্তক্ষেপ বা বাধানিষেধের প্রথম ধাপ। 'সেকেন্ড ডিগ্রি' বা দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণের ধাপ হল ধৃত ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসা। 'থার্ড ডিগ্রি' হল উক্ত ধৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'থার্ড ডিগ্রি' ছিল নিরীহ শব্দ। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থে থার্ড ডিগ্রি আজ দেশে দেশে পুলিশ কর্তৃক বন্দীর উপর দৈহিক (এবং মানসিক) নিগ্রহ ও নির্যাতনের নামান্তর, ত্রাস ও আতঙ্কের সমার্থকে পরিণত হয়েছে।

বন্দীকে থানার অভ্যন্তরে অথবা কোনও অন্তরীণ গৃহে (দেশে দেশে যাদের পোশাকি নাম আছে, যেমন গ্রিসে 'অতিথি ভবন', ফিলিপাইনসে 'নিরাপদ গৃহ', পশ্চিমবঙ্গে 'রিট্রিট') নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় বা একাধিক পুলিশকর্মী মিলে নিগ্রহ করে। পরিবেশটাই বন্দীর কাছে সন্ত্রাসের ও আতঙ্কের হয়ে ওঠে। ঘরটাই অত্যাচারের একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়ে যন্ত্রণার বাহক হয়ে ওঠে; দেওয়াল, সিলিং, দরজা, জানলা— কক্ষের কাঠামোটাই অত্যাচারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অনিবার্যভাবে লীন হয়ে যায়।

অত্যাচারিত বা অত্যাচারিতার অভিজ্ঞতা, নানা ধরনের গবেষণা, অত্যাচারের পরিণতির উপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আজ আমরা জানি, সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে পৃথিবীর দেশে দেশে বন্দীদের (রাজনৈতিক বিরোধী অথবা সাধারণ অপরাধে অভিযুক্ত) উপর নানা পদ্ধতিতে 'থার্ড ডিগ্রি' প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে সেই রকম কয়েকটি পদ্ধতি হল নিম্নরূপ—

১. হিংস্র আক্রমণ করা : বিভিন্ন ভারি (কাঠ বা ধাতু) পদার্থ দিয়ে বন্দীর দেহে নানা অংশে তীব্র ভাবে আঘাত করা—বেটন, লোহার রড বা চেন, চাবুক / বেল্ট, রাইফেলের বাঁট দিয়ে অথবা কিল, চড়, ঘুসি, সঙ্গে চলে অশ্রাব্য গালিগালাজ। কুখ্যাত 'falanga' বা 'bastinado' এই পদ্ধতির অন্তর্গত পায়ের তালুতে ক্রমাগত ভারী পদার্থ দিয়ে আঘাত করে যাওয়া।

২. ঝুলিয়ে অত্যাচার করা (Suspension method) : বন্দীকে উপর দিকে দুটি হাত বেঁধে অথবা মাথা নিচুর দিকে করে পা দুটি বেঁধে প্রহার করা; সঙ্গে যুক্ত হয় ইলেকট্রিক শক ইত্যাদি। এই পদ্ধতির বৈচিত্র্য আছে; ঝুঁকে আসা হাঁটুর সঙ্গে কনুইয়ের মাঝখানে রড বা লাঠি দিয়ে শরীরকে ঘোরানোর চেষ্টা (যাকে Wheel of Buddha বলা হয়) অথবা হাত দুটোকে এক সঙ্গে বেঁধে একটা হাতকে জোর করে মাথার দিকে, অন্য হাতকে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়া (যাকে Palestinian Suspension বলা হয়), সঙ্গে চলতে থাকে নিগ্রহ ও গালিগালাজ।

৩. আর একটি সাধারণ অত্যাচার পদ্ধতি হল বন্দীর হাত পা গলায় দড়ি, স্ট্র্যাপ এবং হাতকড়া দিয়ে বেঁধে কিছুটা অংশ ঝুলিয়ে প্রহার করা (যাকে Strapping বলা হয়)।

৪. আরেকটি 'প্রচলিত' পদ্ধতি হল, শরীরের নানা অংশে, বিশেষ করে সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশগুলোতে বিদ্যুৎ ছোঁয়ানো এবং তা শক বেটনের অথবা অন্য বিদ্যুৎবাহী পদার্থের মাধ্যমে প্রয়োগ করা (যাকে বলা হয় electrical torture), লাতিন আমেরিকার এই পদ্ধতি 'picana' নামে প্রচলিত।

৫. আরেক ধরনের পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে বন্দীকে নানাভাবে অবস্থান নিতে বাধ্য করা হয়। একে 'forced position' বলা হয়। দু'টি চেয়ারের হাতলে বন্দীর শরীরের অংশ বেঁধে প্রহার অথবা দু'টি চেয়ারের মাঝখানে কোনো রড বা বেতের লাঠি বন্দীর শরীরকে ঘুরিয়ে দিয়ে নানা অংশে অথবা হাত-পা বেঁধে কম্বল জড়িয়ে নানা জয়েন্টে ক্রমাগত মেরে যাওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারি ওজনের জিনিস দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি।

৬. যৌন অত্যাচার : সত্তর দশকে পশ্চিমবাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা রাজবন্দিনীদের উপর এই পদ্ধতি পুলিশ প্রয়োগ করেছিল। নগ্ন করে দেহের নানা অংশে সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া, যৌনাঙ্গে কোনও পদার্থ প্রবেশ করানো, মলদ্বারকে পাকাপাকি ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া, ধর্ষণ ইত্যাদি।

উক্ত সমস্ত পদ্ধতিই পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্রয়োগ করেছে। পদ্ধতিগুলোর অবশ্য স্বদেশি নামও আছে : যেমন কচুয়া ধোলাই, পাঁউরুটি ধোলাই ইত্যাদি। উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও আরো নানা পদ্ধতি রয়েছে যাকে আমরা 'বিবিধ পদ্ধতি' আখ্যা দিতে পারি; যেমন হাত-পা বেঁধে পাজামার ভেতর আরশোলা বা ইঁদুর ঢুকিয়ে দেওয়া, দাড়ি-চুল ওপড়ানো, বন্দীর পুরুষাঙ্গে পেট্রোল, কেরোসিন বা ডিজেল ও অ্যাসিড সিরিঞ্জ দিয়ে 'পুশ' করা ইত্যাদি।

'থার্ড ডিগ্রি'র প্রয়োগের ফলে বন্দীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার বয়স মাত্র তিন দশক। অত্যাচারের মূল লক্ষ্য অত্যাচারের মুহূর্তে বন্দীকে শুধু যন্ত্রণা দেওয়া নয়, তার ব্যক্তি সত্তাকেই ধ্বংস করে দেওয়ারও প্রয়াস থাকে। অত্যাচারিত ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারের চিহ্ন বা ক্ষত বহন করে— শারীরিক অঙ্গহানি, বিকৃতি, বিকলাঙ্গ, গঠনশৈলীতে ত্রুটি নিয়েই হয়ত তাকে বেঁচে থাকতে হয়। দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে অথবা এককভাবে বন্দী নানা মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। ত্রাস, সন্ত্রাসের পরিবেশ, অত্যাচারের মুহূর্তগুলো বন্দী কখনও স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারে না, ফলে নানা মানসিক জটিলতার লক্ষণ দেখা যায়, যাকে আধুনিকতম চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)। রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.'। ভারত

সরকার ১৯৪৮ সালেই এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল। পরবর্তীকালে ষাটের দশকে রচিত হয়েছে নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ, রচিত হয়েছে আশির দশকে অত্যাচারবিরোধী সনদ। এগুলোতেও ভারত স্বাক্ষর করার মাধ্যমে থার্ড ডিগ্রি তথা যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরোধিতা করার কথা ঘোষণা করেছে। তবু গোপনে, অপ্রকাশ্যে, নিত্যদিন আইনরক্ষক বা 'সংঘবদ্ধ সমাজবিরোধীরা' (বিচারপতি এন. এন. মুল্লার অনুসরণ) রাষ্ট্রের মদতে বন্দী নাগরিকের উপর আসুরিক নির্যাতন চালায়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আশির দশকের অত্যাচার সংক্রান্ত একটি পুস্তিকায় বলেছে যে, অত্যাচারের অর্থ হল ব্যক্তিসত্তার অবমাননা; রিপোর্টের ভাষায় 'Torture means degradation : insults, sexual threat, or assaults,. forcible eating of one's excrement, humiliation of one's family'. দ্বিতীয়ত, অত্যাচারের অর্থ বন্দীর বিচ্ছিন্নতা; অপহরণ; গোপন স্থানে বন্দী করে রাখা, বন্ধু পরিবার, আইনজীবী থেকে দূরে, যোগাযোগবিহীন অবস্থায় আটকে রাখা।

তৃতীয়ত, অত্যাচারের নিজস্ব ভাষা আছে, যাকে বলা হয় 'Sadonic slang'। দেশে দেশে পুলিশবাহিনী অশ্রাব্য গালিগালাজ প্রহারের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব্যবহার করে।

থার্ড ডিগ্রির বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (বিশেষ করে ১৯৭৭ পরবর্তী সময়ে) বহু জনস্বার্থ মামলায় রায় দান কালে বারংবার সোচ্চার হয়েছেন; অত্যাচারিত বা অত্যাচারে নিহত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন; অত্যাচার প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ ও নিয়মাবলি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আইনরক্ষকদের।

বস্তুত বিশ্বজুড়ে থার্ড ডিগ্রি বা যাবতীয় অত্যাচার আজ নিন্দিত ধিক্কৃত ও ঘৃণিত। ঘৃণিত শুধু এই কারণে যে, অত্যাচার বেআইনী। অত্যাচার সভ্যতার ক্ষুদ্রতম আধার—আশ্রয়কে—আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার দুটি প্রধান স্তম্ভ—স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও ন্যায় বিচার এবং আইনের শাসনকে ধ্বংস করে, সমাজকে মূল্যবোধবিবর্জিত, মানবতাবিরোধী চরিত্রে রূপান্তরের চেষ্টা করে।

থিসরাস

অনির্বাণ রায়

থিসরাস (Thesaurus) শব্দের মূলে আছে গ্রীক থিসৌরোস, অর্থ : (গৃহ) ভাণ্ডার, রত্নভাণ্ডার বা রত্নপেটিকা। সাম্প্রতিক অভিধানকারদের মতে এর অর্থ 'ভাবানুক্রমে বিন্যস্ত শব্দাভিধান; কোষগ্রন্থ, জ্ঞানমঞ্জুষা; যথাশব্দ সংগ্রহ'। যদিও শব্দাভিধান এবং কোষগ্রন্থ অর্থের দিক দিয়ে ভিন্ন। 'কোষ শব্দটির অর্থের মধ্যে একটু বাছাইয়ের ভাব আছে, অর্থাৎ কোষ হইল বাছাই করা (এবং মূল্যবান) বিষয়ের (ও বস্তুর) সুদৃঢ় (অর্থাৎ সুরক্ষিত) সংগ্রহ।' অন্যদিকে অভিধান 'শব্দার্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ : শব্দার্থকোষ'। 'অভিধান ও রচনাসংগ্রহ অর্থে কোষ শব্দের ব্যবহার আছে সর্বপ্রথম (?) দণ্ডীর কাব্যাদর্শে'।

আধুনিককালে থিসরাস শব্দটি জনপ্রিয়তা পায় পিটার মার্ক রোজে (Peter Mark Roget ১৭৭৯-১৮৬৯) প্রণীত বা সংকলিত *Thesaurus of English Words and Phrases* [১৮৫২] গ্রন্থসূত্রে। পেশায় চিকিৎসক এবং একদা রয়্যাল সোসাইটির সম্পাদক রোজেকে এই থিসরাস সংকলনে অনুপ্রাণিত করেছিল শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত (১৮০৮) অমরসিংহের সংস্কৃত থিসরাস 'নামলিঙ্গানুশাসন' (অমরকোষ নামে সমধিক পরিচিত)-এর হেনরি টমাস কোলব্রুক (Henry Thomas Colebrooke ১৭৬৫-১৮৩৭)-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। লোকশ্রুতি, অমরসিংহ ছিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম। কারো মতে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ, কারো মতে জৈন।

অমরসিংহের 'নামলিঙ্গানুশাসন' ঠিক অভিধান নয়। প্রতিশব্দকোষ, লিঙ্গানুসারে সাজানো। স্বর্গ, ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন বর্গে এখানে শব্দগুলি সংকলিত। এছাড়াও উল্লেখ্য, 'নামলিঙ্গানুশাসন' বা *অমরকোষ*-এ 'পর্যায়, নানার্থ এবং লিঙ্গ নামে তিনটি কাণ্ড' আছে। তাই এর আরেক নাম ত্রিকাণ্ড। *অমরকোষ* অনুসারে স্বর্গ-বর্গের অন্তর্গত দেবতার প্রতিশব্দ : অমর নির্জর দেব ত্রিদশ বিবুধ সুর সুপর্বা সুমনাঃ ত্রিদিবেশ দিবৌকাঃ আদিত্যেয় দিবিষৎ লেখ অদিতিনন্দন আদিত্য ঋভু অস্বপ্ন অমর্ত্য অমৃতান্ধাঃ বহিমুখ ক্রতুভুক্ গীর্বাণঃ দানবারি বৃন্দারক দৈবত দেবতা।

দেবনাগরাক্ষরে *অমরকোষ* প্রকাশ করেন জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৪৪-১৯১০)। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদটির নাম *অমরার্থচন্দ্রিকা*। এছাড়া *অমরকোষ*-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক, হরগোবিন্দ রক্ষিত।

বাংলায় এ পর্যন্ত পাঁচটি থিসরাস বা 'ভাব-অভিধান' প্রকাশিত।

রত্নমালা [সমর্থাভিধান]। প্রাণতোষ ঘটক। কলিকাতা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। আশ্বিন ১৩৬২

বাংলা *অমরকোষ*। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস ও যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস। কলিকাতা। দে বুক স্টোর। ১৯৮৩

যথাশব্দ। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ঢাকা বাংলা একাডেমী। ১৯৭৪

মণিমঞ্জুষা। জগন্নাথ চক্রবর্তী। কলিকাতা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬

সংসদ সমার্থ শব্দকোষ। অশোক মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৯৮৭

প্রাণতোষ ঘটক *রত্নমালা*-র 'ভূমিকা'য় জানিয়েছেন, 'আমি এই সঙ্কলনে বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ, সমার্থ বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহ সঙ্কলন করতে সচেষ্ট হয়েছি।' *রত্নমালা*-র একটি দৃষ্টান্ত :

জল—সলিল পয়ঃ বারি নীর জীবন অমৃত অম্বু তোয় পানী ক্ষীর উদক অবর্ণ বন মেঘপুষ্প অন্তঃ পানীয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মতে পিটার মার্ক রোজের পথ ধরে বাংলায় প্রথম থিসরাস সংকলক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'য় হাবিবুর রহমানের নিবেদন, 'জানা শব্দ অনেক সময় প্রয়োজনবোধে মনে আসে না। যে শব্দ মনে আছে অথচ মনে আসছে না, সেই বিস্তৃত শব্দের সূত্রসন্ধানে এবং যে শব্দ মনে আসছে অথচ মনে ধরছে না, অতৃপ্ত মনের সেই অভীপ্সিত শব্দের উদ্দেশ্যে এই ভাব-অভিধানের সূত্রপাত।...এই পুস্তক ভাবপ্রকাশে যথার্থ শব্দ নির্বাচনে সহায়তার জন্য ব্যবহারিক সুবিধার্থে ভাবানুক্রমে বিন্যস্ত। বলাবাহুল্য, এই ভাব-অভিধান অভিধানের বিকল্প নয়...।'

অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর *সমার্থশব্দকোষ*-কে বলেছেন 'বাংলা ভাষার থিসরাস'। তিনি মনে করেন 'প্রয়োজনে ঠিক-ঠিক শব্দের হদিশ দেওয়া ও সমার্থক কিংবা আনুষঙ্গিক শব্দ জোগান দেওয়াই থিসরাসের অন্যতম কাজ।'

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন থিসরাসে 'শব্দাবলীর মধ্যে তৈরি হয় এক সংযোগসূত্র'। একদা থিসরাসকে বলা হত 'নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত শব্দভাণ্ডার বা অথরিটি লিস্ট' এখন তার অর্থ প্রসারিত হয়েছে। ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ৫৭২৩ অনুসারে থিসরাস হল 'ইনডেক্স তৈরির উপযোগী নিয়ন্ত্রিত শব্দাবলী নির্দেশের এক উপায়, যার মধ্য দিয়ে শব্দসমূহের আপাত সম্পর্কটিও স্পষ্ট' হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থিসরাস শব্দটিকে নতুন করে তাৎপর্যময় করে তোলেন হেলেন ব্রাউনসন ডর্কিং সম্মেলনে (১৯৫৭)। থিসরাসের সম্প্রসারণকাল ১৯৬০-১৯৮০।

দলিত-আন্দোলন দলিত-সাহিত্য

অচিন্ত্য বিশ্বাস

ভারতীয় সমাজ কাঠামো বর্ণভিত্তিক। চতুর্বর্ণ সমাজে 'রোটি-বেটি-কাম'—অর্থাৎ সমপংক্তিতে ভোজন, অন্তর্বিবাহ ও পেশার পার্থক্য ছিল। ছিল শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস। পাশাপাশি মৌর্যযুগে—নগর রাষ্ট্র, কুলতন্ত্র শাসন (Oligarchy) ও প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতা ভেঙে যায়—লোহার লাঙ্গল দেশের কৃষিক্ষেত্রকে বাড়িয়ে বহুগুণ করে। ফলে নতুন নতুন বহু জনগোষ্ঠী সমাজে অন্তর্ভূত হবার জন্য উন্মুক্ত হয়। এই নতুন শ্রমজীবীরা দাস বা পঞ্চম বর্ণের। কালক্রমে চতুর্বর্ণ সমাজের শুদ্ধতার ধারণা লুপ্ত হয়—অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথার সূত্রে জন্ম নেয় বর্ণসঙ্কর। মুসলমান অধিকার পর্বে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় থাকে। জাতি-বর্ণ প্রথার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ শাসকরা লক্ষ করে দেশব্যাপী বিচিত্র বিচ্ছিন্নতা। বৃটিশ-গ্রন্থাগারে বসে কার্ল মার্ক্স দেখেন ভারতবর্ষের মানুষ শুধু অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণি বিভক্ত নয়, তারা বর্ণ বিচ্ছিন্ন—বৃক্ষের মত নিশ্চল। চিনা দরজির মতো তাপ্পি মারা কোট থেকে আরেকটি নতুন তাপ্পি মারা কোট গড়ল ইংরেজরা। শহর কলকাতায় হল 'জাতি-কাছারি'—পাড়াগুলো হল 'ডোমপাড়া', 'পটুয়াটোলা', 'কুমোরটুলি', 'আহিরীটোলা', 'কলুটোলা' ইত্যাদি। ইংরেজি শিক্ষা পূর্বাবধি চলে আসা শিক্ষার ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল। সারা দেশে নিম্নবর্ণভুক্ত অস্পৃশ্য (যাদের সঙ্গে খাওয়া যায় না, কন্যা দান নিষিদ্ধ, যারা নোংরা কাজ করে) মানুষরা অল্পবিস্তর শিক্ষিত হবার সুযোগ পেল।

ইংরেজ শাসকরা জনগণনার প্রতিবেদন মুদ্রিত করলে সারাদেশে উঠল তরঙ্গ। বিশেষত ১৯১১ সালের জনগণনার প্রাককালে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের জাতি-গত অবস্থান পাল্টাবার চেষ্টা করে। দেশের সর্বত্র জাতিগুলির পরিচিত নাম (যার বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় অবমাননাকর বলে মনে হত) বদলের চেষ্টা হতে থাকল। এই সময় জাতিগুলি আরও সংহত হল। কোনো কোনো অঞ্চলে দেশীয় রাজারা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল—তারা জনগোষ্ঠী গুলির নেতৃত্ব দিল। কোথাও তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করল স্বগোষ্ঠী থেকে। পদ্ধতিটি অবশ্য ইংরেজরা আসার আগেও ঘটেছে। একই পেশায় একদল স্পৃশ্য অন্যদল অস্পৃশ্য থেকেছে। বাংলায় 'নবশাখ'-রা গড়েই উঠেছে এইভাবে।

মহারাষ্ট্রে পেশোয়াদের ব্রাহ্মণ্য শাসন ছিল সবচেয়ে কড়া। স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গণ আন্দোলন ঘটল সবচেয়ে আগে। এই আন্দোলন প্রথম শুরু করেন মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে। তিনি মধ্যস্তরীয় মালী গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত জ্যোতিবা জাতি-বর্ণ প্রথার তীব্র সমালোচক, কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগঠক ছিলেন। ১৮৭২ নাগাদ বের হয় তাঁর যুগান্তকারী রচনা গোলাম গিরি। বইখানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকারীদের উৎসর্গ করা হয়। বইখানার দাম অব্রাহ্মণ্যদের জন্য কম আর উপবীতধারীদের জন্য বেশি রাখা হয়। আসলে ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান কাণ্ডের অধিকারীভেদকে তীব্র ভাবে প্রতীকী সংঘাতের মুখে ফেলেন জ্যোতিবা। ক্রমে গড়ে ওঠে 'সত্য শোধক সমাজ'। ইতিহাসবোধহীন অবদমিত অবহেলিত মানুষরা ইতিহাসের সত্য শোধন করুক—এই তাঁর ইচ্ছা। ১৮৮৫তে কংগ্রেস অধিবেশন বসল বোম্বাই শহরে। জ্যোতিবা-র সংগঠন ইংরেজ বিরোধী মঞ্চ গড়তে চাইল না—তাঁর মতে অবদমিতরা বৃটিশ শাসনে ভালই আছে। তাঁরা সমদর্শী বিচার ব্যবস্থা আর সর্বজনীন শিক্ষা নীতির সুযোগ থেকে আবার চিরাচরিত বৈষম্যে যেতে চান না।

দাক্ষিণাত্যে গড়ে উঠল 'জ্যাস্টিস পার্টি'। তারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছোটো জাতদের সংঘবদ্ধ করল। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের সংগঠন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেল। জ্যাস্টিস পার্টি পরবর্তীকে দ্রাবিড়-আন্দোলনে পরিণত হয়। ডি. কে. দ্রাবিড় কাঝাগাম, ডি. এম. কে.—দ্রাবিড়—মুন্নেত্রা কাঝাগাম প্রভৃতি সংগঠনের জন্ম দেয়। এদের চোখে ভারতবর্ষ আসলে আগন্তুক আর্য আর দেশীয় অনার্যদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলাফল। এই দেশের সংস্কৃত শাস্ত্র বাহিত ধর্মাচার প্রকৃতপক্ষে অনার্য মূলবাসীদের উৎসাদনের জন্যই সৃষ্ট। হিন্দি—হিন্দু-হিন্দুস্তানের সমীকরণ তারা অস্বীকার করতে চাইলেন।

মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলের আন্দোলন বি. আর. আম্বেদকরের যোগ্য নেতৃত্বে নতুন চেহারা পেল। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ আম্বেদকর চৌদার পুষ্করিণীর আন্দোলন, কালারাম সত্যাগ্রহ প্রভৃতি সংগঠিত করেন। চৌদার একটি সার্বজনীন জলাশয়। এতে জলপান বা স্পর্শের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল অস্পৃশ্য মাহারের দল। আম্বেদকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর এই পুষ্করিণীর জলপানের আইনি সংগ্রামে লিপ্ত হন। বিচারে স্থির হয় এই জলাশয়ের জলপানের অধিকারী সবাই। কিন্তু আইনি-সংগ্রামে জয়ী হলেও তা কাজে পরিণত হয় না। আম্বেদকর প্রত্যক্ষ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। জলপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নিয়ে সারা দেশে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি। জলপানের অধিকার বাংলা সাহিত্যে জলদানের অধিকারে রূপান্তরিত হল। রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকা* স্মরণীয়। অস্পৃশ্য মানুষের জলপানের অধিকার যতটা মানবিক, ভিক্ষু শ্রমণ আনন্দকে জলপানের অধিকার তার তুলনায় অনেক ব্যক্তিগত। হয়ত আধ্যাত্মিক। কালারাম মন্দির নাসিকে। এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না অস্পৃশ্যদের। অথচ রথযাত্রার সময় রথের রশি টানার দায় অস্পৃশ্যদেরই নিতে হত। আম্বেদকর এর বিরোধিতা করেন। সত্যাগ্রহ চলার

মধ্যে রথযাত্রা এসে গেল। কাঞ্চীর শঙ্করাচার্যের উপস্থিতিতে চুক্তি হল। রথের রশি ধরা আর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার একসঙ্গে অস্পৃশ্যরা পাবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে উচ্চবর্ণের দল আম্বেদকর আর সঙ্গী নেতৃত্বকে এড়িয়ে রথ নিয়ে গেলেন মন্দিরে। অপমানিত আম্বেদকর বললেন, হিন্দু সমাজ ভদ্র হলে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেবে—নচেৎ নয়। এ নিয়ে আন্দোলন করে সময় নষ্ট না করাই ভালো। বছর তিন পরে নাসিকের কাছে ইয়োলো সম্মেলনে আম্বেদকর ঘোষণা করেন তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করবেন। আবার সারা দেশে তরঙ্গ ওঠে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর—প্রচুর বিবেচনার শেষে আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর (তাঁর পিতার মৃত্যুদিন) কয়েক লক্ষ অনুগামীর সঙ্গে নাগপুরের উপকণ্ঠে 'দীক্ষাভূমি'তে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার প্রকৃত বিকল্প।

আম্বেদকরের জীবন সাধনা ও সংগ্রাম ভারতে দলিত আন্দোলনকে নির্দিষ্ট দিশা দিয়েছে। 'দলিত' শব্দটি হিন্দি (ও হিন্দি প্রভাবিত মারাঠি প্রভৃতি ভাষায়) ভাষায় ব্যবহৃত হয়—বলপূর্বক অবদমনের ফলে যে বর্গের মানুষরা মানবিক অধিকার বঞ্চিত তারাই 'দলিত'। শব্দটি বাংলা ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়েছে—বহুদিন আগে থেকেই। তবে ভারতে বিশেষ কোনো বর্গের নাম হিসাবে শব্দটি নতুন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন এক পারিভাষিক শব্দ। শব্দটি যে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যবহৃত তারা এটি স্বেচ্ছায় আত্ম-ঘোষণার মধ্যে প্রয়োগ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গুজরাতি সন্ত কবি নরসিং মেহতা দেবদাসীদের পিতৃপরিচয়হীন সন্তানদের বলেছিলেন 'হরিজন'। মহাত্মা গান্ধী শব্দটি প্রয়োগ করেন পঞ্চম বা অনুসূচিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে। গান্ধীজীর শব্দটি মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে, পঞ্চম শব্দটি চিরাচরিত সামাজিক ভাবাদর্শের বিচারে আর অনুসূচিত তপসিলী জাতীয় শব্দ বৃটিশ শাসকদের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং তৈরি করা। তুলনায় দলিত শব্দটি আম্বেদকরের *বহিকৃত ভারত* (সম্পাদিত একটি পত্রিকা), বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অবদমিত জনগোষ্ঠী (Depressed Classes) প্রভৃতির ভাবনা চিন্তাকে আয়ত্ত করেছে। দলিত শব্দটি হয়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয় এক শক্তি যা একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্টতা দেয়। অনির্দিষ্ট জাত বর্গ, ক্রমিক উচ্চাবনতির ধারণা (আম্বেদকরের ভাষায় 'graded degradation'—যা কিনা ভারতীয় সমাজ ভাবনার অঙ্গ, অনিবার্য অংশ; এই ধারণা বাদ দিলে হিন্দুসমাজ ক্ষণমাত্র টেকে না বলে মনে করতেন তিনি) এবং পেশাগত, ভাষাগত, প্রদেশগত দূরত্বগুলি অস্বীকৃত হতে থাকে—শব্দটির আন্তঃশক্তি এতই সম্ভাবনাপূর্ণ। দ্বিতীয়ত এই শব্দটির আড়ালে আছে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর উভবলিতা (ambivalance)-র মনস্তত্ব। এর দ্বারা চিহ্নিত গোষ্ঠীটি একদিকে যেমন প্রবলভাবে হিন্দুত্বের দিকে আক্ষিপ্ত, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু সমাজ শরীরে মানবিক-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার। এমন যদি হত, গোষ্ঠীটি ভারতের বাইরে থেকে আসা কোনো ধর্ম গ্রহণ করল, তাহলে এই উভবলিতা থাকত না। ফলে হিন্দু সমাজ যেমন এই শ্রম-শীল জনসত্তাকে সম্মানের আসন দেয় নি অথচ কর্মীবাহিনী হিসাবে সমাজভুক্ত রেখেছে—নিতান্ত প্রান্তিকভাবে; এই নতুন শব্দটির দ্বারা এই গোষ্ঠী

সসম্মান সদস্যতার দাবি জানাচ্ছে, অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইছে—হিন্দু সমাজকে ভিতর থেকেই ধাক্কা দিতে চাইছে। ধাক্কা দেবার অর্থ কিন্তু ধ্বংস করা নয়, পরিশুদ্ধ করা। বস্তুত 'দলিত' নামধারী অংশটিকে পূর্ণাঙ্গ সসম্মান সদস্যতা দানের দাবিটি মেনে নিলে হিন্দু সমাজ ধ্বংস হবে না, শক্তিশালী হবে—আধুনিক সময়ের উপযোগী হবে। আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ ইতিহাসের দীর্ঘ এক যাত্রাকে সনাক্ত ও মূল্য প্রদান। ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে মানবিক মূল্যবোধে পরিশুদ্ধ করার সচেতন প্রয়াস। বিপরীত ধারাটিও ঐতিহাসিক। তা প্রতিবাদী নেতৃত্বকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে—বুদ্ধদেবকে যেমন বিষ্ণুর অবতার ভাবা হয়েছে, আর প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করা হয়—যেমন বৌদ্ধদের সম্পর্কে করা হয়েছে। সুতরাং হরিজন, অনুসূচিত, অনগ্রসর, তপসিলভুক্ত প্রভৃতি শব্দ অস্বীকার করে দলিত শব্দটিকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের শব্দ বলে গ্রহণ করার মধ্যে আধুনিক ভারতীয় সমাজের একটি প্রবল অভিঘাত কাজ করছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, বৌদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আরেকটি শব্দ ভাবা হয়েছে—বহুজন। শব্দটির মাধ্যমে দলিত জনসত্তার সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। এই জনসত্তার যে অংশ ধর্মান্তরিত তাদের সঙ্গে ঐক্যের ভাবনা এই শব্দে বিজড়িত আছে। বিষয়টি অল্পবিস্তর উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। তবে সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-নৃতত্ত্ব-ধর্ম ও রাজনীতির মাত্রা হিসাবে 'দলিত' শব্দের অভিঘাত আরও প্রবল, আরও নির্দিষ্ট।

বর্তমান অর্থে 'দলিত' শব্দটি সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রয়োগ করা হয় ১৯৭২ সালের ৯ জুলাই তারিখে—"দলিতপ্যান্থার" নামে আন্দোলন শুরু করার মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলন শুরু করেন কয়েকজন তরুণ—যথা : নামদেব ধাসাল, অর্জুন ডাংলে, জে. ভি. পাওয়ার, দয়া পাওয়ার, রামদাস সোরতে প্রভৃতি। এটি ছিল প্রাথমিকভাবে একটি সাহিত্য আন্দোলন—পার্শ্বত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। কিছুদিনের মধ্যে আম্বেদকরের প্রতিষ্ঠিত আর. পি. আই. (R.P.I—Republican Party of India)-এর পাশাপাশি দলিত প্যান্থার হল আম্বেদকরপন্থী তরুণদের মঞ্চ। ক্রমশ দলিত আন্দোলন আর দলিত সাহিত্য আন্দোলন মিলেমিশে গেল। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রধানত এবং অন্যান্য অঞ্চলেও অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়ল।

দলিত-আন্দোলনের বিস্তার ঘটল ডি-এস ৪ (ডি-এস ফোর) জাতীয় আন্দোলনে। ডি-এস ফোর বলতে বোঝায় দলিত-শোষিত-সমাজ-সংঘর্ষ-সমিতি। এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র-কর্নাটক-অন্ধ্রপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশে একসময় জনপ্রিয় হয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে *Dalit Voice* নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে দলিত ভাবনাকে সর্বভারতীয় মাত্রা দিয়েছেন জাতীয় সাংবাদিক হিসাবে একদা স্বীকৃত স্বেচ্ছা-অবসৃত ভি. টি. রাজশেখর। গেইল ওমভেট তাঁর *Dalit Vision* নামক গ্রন্থে এই সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবকে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন।

দলিত সাহিত্যের বিস্তারও ঘটেছে অতিদ্রুত। অধ্যাপক যশোবন্ত মনোহর যাকে বলেছেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া—আসলে ব্যাপারটি ঘটেছে তেমনি। সংস্কৃত

সাহিত্যের পর এত বড় সর্বভারতীয় সাহিত্য আন্দোলন ঘটে নি। ভারতের সর্বত্র দলিত সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মার্কিন গবেষিকা ড. এলিনর জেলিওট লিখেছেন : The Dalit Sahitya (literature of the oppressed) movement in Maharastra seems to be unique—not in the phenomenon of former untouchables writing literature, but in the quantity of writing, its variety its aesthetic considerations, its sense of being a movement, its tie to social action, and in the serious attention it receives as a school within the Marathi literary traditions. Parallel movements in Dalit writing have now appeared in the neibouring states of Karnataka and Gujrat, and Dalit Sahitya may someday be an all-India movement.'

দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অভিঘাত বাংলায়ও এসে পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ এ বিষয়ে পূর্বাবধি চেষ্টিত উৎসাহী থাকলেও প্রথম সংঘবদ্ধ প্রয়াস ১৯৯১-তে। দলিত সাহিত্য সংস্থা গড়ে ওঠে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। সভাপতি নির্বাচিত হন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচিন্ত্য বিশ্বাস (বর্তমান প্রতিবেদক)। পরের বছর ১৯৯২-এর ৫-৬ ডিসেম্বর নদিয়া জেলার ভায়না গ্রামে এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসে। কিছুদিনের মধ্যে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয় : *চতুর্থ দুনিয়া*। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অচিন্ত্য বিশ্বাস। সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংখ্যা'। ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার যুক্ত হওয়ায় বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলন গতি পায়। এখনও পর্যন্ত খুব সার্থক বা বিশিষ্ট কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে উক্ত পত্রিকায় এবং বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত প্রয়াসেও। তবু, এই কথা অবশ্য-স্বীকার্য রাজনৈতিক চাপ ও টানে এই সাহিত্য আন্দোলন খুব দানা বাঁধতে পারে নি।

দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মূল কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, এই সাহিত্য শুধু 'ললিত'-সাহিত্য নয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, স্ব-সমাজের সমস্যাবলীকে তুলে ধরা এর আসল লক্ষ্য। দলিত সাহিত্য প্রতিবাদী ধারার সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের অভিমুখ সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন। ফলে দলিত সাহিত্য আপত্তির সাহিত্য। কী চাই না—তাকে সনাক্ত করলেও দলিত সাহিত্যে প্রায়ই কী চাই, তা স্পষ্ট হয়ে আসে নি। দলিত সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—আত্মজীবনীমূলক রচনা। দয়া পাওয়ারের *বালুতা*, শঙ্কর রাও খারাটের *তরল-অতরল*, শান্তাবাই কাম্বলের *মাজিয়া জলমাচি চিত্রকথা*, কুমুদ পাউডের *অন্তস্পট*, শঙ্করকুমার লিম্বালের *অক্করমাশি* প্রভৃতি অজস্র জনপ্রিয় আত্মজীবনীমূলক রচনা দলিত সাহিত্যের সম্পদ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবেশ রায় মনে করেন এই ধারার সাহিত্যে উপন্যাসের সম্ভাবনা খর্বাকৃতি লাভ করেছে। হতে পারে, তবে দলিত সাহিত্যকদের ব্যক্তিগত বেদনার্ত অভিজ্ঞতাকে অন্যভাবে, কল্পনার দ্বারা মিশিয়ে রহস্য রোমাঞ্চে ভরে দিলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপ নষ্ট হয়ে যেত। দলিত সাহিত্যের আত্মজীবনীর ধারা—উপন্যাস না হয়ে ভালোই হয়েছে।

দলিত সাহিত্যের অন্যান্য ধারা—কবিতা, গল্প, নাটক, গান। এগুলি বেশ উন্নত, সার্থক। কবিতায় নামদেব ধাসাল, ভীমসেন দাঠে, যশোবন্ত মনোহর, হীরা ভোঁসলে, অর্জুন ডাংলে মারাঠী সাহিত্যে, নীরব প্যাটেল গুজরাতিতে বিখ্যাত। গল্পে বন্ধু মাধব, কেশব মেশরাম, আন্না ভাই সাঠে মারাঠিতে আর যোগেন্দ্র মাকওয়ানে এবং অরবিন্দ মালা গাট্টি যথাক্রমে গুজরাতি ও কন্নড় সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাবশালী। হিন্দি ভাষায় কুমুদ মেখওয়াল, বিমলা থোরাট এবং তেলুগু ভাষায় কাঞ্চা ইলাইয়া, ভোজ্জা থোরকম দলিত সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মালয়ালি-তামিল-ওড়িয়া-পাঞ্জাবী-ভাষাতেও দলিত সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

দলিত সমাজ যেহেতু অল্পবিস্তর শিক্ষিত হচ্ছেন, বিভিন্নক্ষেত্রে তাদের চাকরি বাকরি এবং অন্যবিধ পদ ও অধিকার-প্রাপ্তি ঘটছে আর যেহেতু সমাজ এখনও খোলা মনে বিষয়গুলিকে স্বীকার করতে পারছে না—ফলে সমাজ শরীরে এক ধরনের দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধ বজায় আছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে জাতপাতের গোপন ঘৃণা ও তার বিচিত্র প্রকাশ যেমন যেমন থাকবে—দলিত সাহিত্যে সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বহুমুখী ছাপ ছবিও উঠে আসবে। এই ব্যাপারটি কোনো ভাবেই আড়াল বা অস্বীকার করা যাবে না।

একটি ছবি দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মঞ্চে ব্যবহৃত হয়েছিল। একটি কলমের দিকে এগিয়ে যাওয়া হাতের ছবি। হাতটির চারটি মাত্র আঙ্গুল। বুড়ো আঙ্গুলটি খসে গেছে। সেখান থেকে রক্ত পড়ছে। তলায় শ্লোগান—'অঙ্গুঠা আপস দো'। ফিরিয়ে দাও আমার বুড়ো আঙ্গুল। খুবই শাদামাঠা কথা। একলব্যের পুরাকথাকে ভেঙে আজকের সময় সারণিতে এনে দাঁড় করানো। পুরাকথার একটি নতুন ভাষ্য রচনা। এই ভাষ্যটিকে আড়াল করা যায় না। এর পিছনে ভারতবর্ষের সুদৃঢ় অতীত যুগের স্মৃতির পরম্পরা আছে। সামনে আছে ইতিহাসের শাদা পাতা।

দ্বিবাচনিকতা

তপোধীর ভট্টাচার্য

দ্বিবাচনিকতা অর্থাৎ ডায়লগ-কে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন তত্ত্ববীজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ শতকের অন্যতম প্রধান সাহিত্য-ভাবুক মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)। রুশ-দেশীয় এই চিন্তাবিদের তত্ত্ববিশ্বের প্রধানতম ভিত্তি এই উপলব্ধি : সত্য মূলত দ্বিবাচনিক। সমস্ত মানবিক সম্পর্ক ও মানবিক প্রবণতা ঐ সত্য হয়ে ওঠার ফসল। মানুষের সমস্ত নান্দনিক ও সামাজিক উচ্চারণ গড়ে ওঠে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায়; তখন তথ্য রূপান্তরিত হয় বার্তায়। বোধ যতক্ষণ একবাচনিক, ততক্ষণ তা শিল্প বা সত্যের পদবি অর্জন করতে পারে না। প্রতিটি উচ্চারণ সার্থক হয় শুধু গ্রহীতার উপস্থিতিতে। *Art and Answerability* (১৯৯০) বইতে বাখতিন আমাদের যে সম্বোধক (addresser) ও সম্বোধিত (addressee) সত্তার পাঠ দিয়েছেন—তা-ই সংযোগের আবশ্যিক প্রাক্‌শর্ত। এইজন্যে সংযোগ হতে পারে শুধু দ্বিবাচনিকতার মধ্য দিয়ে। সম্বোধনের প্রক্রিয়া সার্থকতায় পৌঁছায় কেবল গ্রহীতার সক্রিয় যোগদানের ফলে। এরই নাম দ্বিবাচনিকতা।

বাখতিনের মতে উপন্যাস শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মাধ্যম কেননা দ্বিবাচনিক কল্পনায় জন্ম নেয় সার্থক উপন্যাস। জন্ম নেয় এবং ঘটনা-সংস্থান চরিত্র-উপস্থাপনা বহুমুখী ভাবনার বিন্যাস-প্রতিন্যাসের মধ্য দিয়ে পুষ্টিও লাভ করে। *The Dialogic Imagination* (১৯৮১), *Problems of Dostoevsky's Poetics* (১৯৮৪), *Speech Genres and other Late Essays* (১৯৮৪) প্রভৃতি বইতে বাখতিন তাঁর অনন্য তত্ত্ববীজকে নানাভাবে বিকশিত করেছেন। বস্তুত তাঁকে শুধু উপন্যাস-তাত্ত্বিক বলা সমীচীন নয়; তিনি মূলত জীবন-তাত্ত্বিক। অজস্র টানাপোড়েন আর চড়াই-উৎরাইতে গ্রথিত আমাদের জীবন আসলে বারবার নির্মীয়মাণ পাঠকৃতি—এই সত্য উচ্চারণে কোনো ক্লান্তি ছিল না তাঁর। জীবনের বয়ানে অন্তঃসার ও প্রকরণ—দুটোই আগাগোড়া দ্বিবাচনিকতায় পরিশীলিত।

মানবিকী বিদ্যার নানা আয়তনে ইদানীং যে দ্বিবাচনিকতায় পরিশীলিত চিন্তাপ্রণালী প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার ভয়ঙ্কর নির্মাণবায়ন-পন্থী প্রবণতার কার্যকর প্রতিষেধক হতে পারে। কেননা দ্বিবাচনিকতার অস্তিত্ব মানবিক নিষ্কর্ষ ও পুনর্নবায়িত সৃজনধর্মী উদ্যমের প্রত্যয় ছাড়া অসম্ভব। এই তত্ত্ববীজের অনুশীলন

আমাদের প্রাথমিকভাবে এই সচেতনতায় অন্তত উদ্বুদ্ধ করে যে জীবন ও কৃতি পরস্পর-নিরপেক্ষ সমান্তরাল অস্তিত্ব নয়। আর, ব্যক্তিসত্তাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্মিতি হতে পারে না কখনো। যখন ভাবি, বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে আমি মিথ্যা, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক এবং আমি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি শুধু অন্য আরেক অস্তিত্বে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে—গড়ে ওঠে দ্বিবাচনিকতা। সত্তা মানে তাই অপরতা যেহেতু অপর পরিসর ছাড়া দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া অসম্ভব। সত্তা যখন অপরের দর্পণে বিম্বিত হয়, তখনই তাকে প্রকৃত জানি এবং চিনি।

জগৎ ও জীবনের অজস্র সমারোহ ও টানাপোড়েন ব্যক্তিসত্তাকে অনবরত পরীক্ষিত ও পুনঃপরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়। বস্তুত এক জীবনে জন্ম-জন্মান্তর ঘটে যাওয়াটা কবির বিহ্বল উচ্চারণ নয় কেবল, দ্বিবাচনিকতারই অভ্রান্ত প্রমাণ এই নিয়ত পরিবর্তনের ধারা। প্রতিটি উত্থানই মানবিক, প্রতিটি প্রকাশ আসলে মানবিক প্রকাশ। বাধা-বিঘ্ন-রুদ্ধতা-গতিহীনতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিপ্রতীপতা মাত্র; এসব না-থাকলে মানুষের চিন্তা ও কর্ম দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হত না। স্পষ্টত বাখতিনের কাছে দ্বিবাচনিকতা মানে উপলব্ধির নিরন্তর পুনর্নির্মাণ; মানবিক সত্তার যথার্থ প্রতিবেদন উপস্থাপিত করার জন্যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্তর থেকে স্তরান্তরে যাত্রা। মানবিকী বিদ্যার আয়তনগুলি পুনর্নির্মাণ করার জন্যে তাঁর অধ্যবসায়ের তুলনা বিরল। প্রচলিত বিশ্লেষণ-পদ্ধতিগুলি তিনি পরখ করে দেখেছেন, পুনর্বিন্যস্ত করেছেন এবং, সবচেয়ে বড়ো কথা, সময় ও সমাজের জটিল দ্বন্দ্বময় আবহের সঙ্গে তাদের মিলিয়েও দেখেছেন। তাঁর পদ্ধতিগত সংগ্রাম গভীর অন্তর্বৃত স্বরূপে রাজনৈতিক মাত্রা সম্পন্ন। সাহিত্যতত্ত্ব-দর্শন-বিজ্ঞানচেতনা-ভাষাতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব সমস্তই তাঁর কাছে অবিভাজ্য মানবসত্যে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ধাপ এবং উপকরণ। সেই সঙ্গে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামঞ্জস্য পরীক্ষাও তাঁর কাছে সত্যভ্রম ও সত্যবোধের পার্থক্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন, একবাচনিক অবস্থান ও প্রক্রিয়া কীভাবে সত্যভ্রমের আয়তনকে বাড়িয়ে দেয় এবং দ্বিবাচনিক জগৎ ও বয়ানের নির্মাণ-সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে। একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের আকল্পকে বাখতিন ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একথা বলা যেতে পারে।

আজকের জটিল আধুনিকোত্তর কাল-পর্বে দ্বিবাচনিকতা সময়োপযোগী ভাষ্য দাবি করে। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সহ অপরতার স্বাভাবিক পরিসরও যখন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ামক চরম উদ্ধত প্রতাপের আস্ফালনে চূর্ণ-বিচূর্ণ, দ্বিবাচনিকতার দর্শনকে কী ফিরিয়ে দেব ব্যর্থ নমস্কারে? দ্রুত রূপান্তর-প্রবণ সাম্প্রতিক প্রেক্ষিতে আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠা জটিল আর দুরধিগম্য হতে বাধ্য। অপর অস্তিত্ব যখন আপন স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখতে মরণপণ সংগ্রাম করে কিংবা বিপুল অস্থিরতায় কণ্টকিত হয়, ক্রমাগত কেন্দ্র-চ্যুতির মোকাবিলা করতে-করতে আত্মতার অবস্থান ও ধারণা রূপান্তরিত হয়ে যায়। জীবন যখন নতুন-নতুন প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে, ব্যক্তি-সত্তা ও অপরতার অন্যোন্য-সম্পর্ক ঐ প্রত্যাহ্বানের উপযোগী প্রতিবেদন গড়তে থাকে

বারবার। এই প্রতিবেদনের উৎস এবং আশ্রয় হল দ্বিবাচনিকতা। মানুষের ভাষা ও তার শিল্প-অভিব্যক্তি যদি জীবনের ক্রমবর্ধমান গ্রন্থিলতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে আর উচ্চারণের বিশিষ্টতায় সম্ভাব্য মীমাংসার প্রতি ইশারা করতে পারে, তাহলে সার্থক হয় মানব-প্রকাশ। মানুষের সামাজিক ইতিহাস, বিজ্ঞান-চর্চা এবং মানবিকী বিদ্যার আয়তন যখন সর্বাধিক সংশয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, বাখতিন সেই পর্বে ইতিহাস-লালিত অবস্থান থেকে ব্যক্তি-সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক সম্পর্কের নির্যাস আহরণ করেছেন। নতুনভাবে নির্ণয় করেছেন আত্মতা ও নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আনুপাতিক গুরুত্ব; সময় ও পরিসরের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এমন কিছু সূত্র উপস্থাপিত করেছেন যা সাম্প্রতিক মানবিকী বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন আয়তনকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। আজ আমরা জেনেছি, দ্বিবাচনিকতা নিছক সাহিত্য-চিন্তার অনুষঙ্গ নয়—তা জীবনস্থাপত্যের দর্শন। এই দর্শনের মৌল পাঠ : প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা অর্থাৎ প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক। পরস্পরকে নিরন্তর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ করে তুলি কেননা মানুষ স্বভাবে-প্রকাশে-বিবর্তনে সামাজিক।

শিল্প সংস্কৃতি এইজন্যে দ্বিবাচনিক সংযোগের নির্মাণ। বাখতিন মনে করেন, 'to be means to communicate dialogically. When the dialogue ends, everything ends' (১৯৮৪-৮৫)। দ্বিবাচনিকতা আছে মানে সম্পর্ক আছে, জীবন আছে, উচ্চারণের পরম্পরা আছে। হওয়া আর হয়ে-ওঠা মানে যেহেতু দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়ায় সংযোগ গড়ে তোলা—এর অভাব মানে অস্তিত্বের অবসান। ইতিহাস-নির্দিষ্ট বস্তুবিশ্ব ও নির্যাস-কেন্দ্রিক চিহ্নবিশ্ব : এই দুইয়ের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত প্রত্যুত্তরযোগ্যতা। অর্থাৎ সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় ঈপ্সিত তাৎপর্যের উপকূলে পৌঁছানো। এই অর্জনের কোনো শেষ নেই; তাই দ্বিবাচনিকতা বারবার নতুন হয়ে ওঠে। তা সর্বদা মুক্ত, আপেক্ষিক ও অফুরান। জীবনকে চিরনির্মীয়মাণ প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করার তাগিদ-ই আসল। বিশ্বাস নয় কেবল, সংহত চর্যার কথাও বলতে চান বাখতিন। তাঁর উপন্যাসতত্ত্ব তাই জীবনতত্ত্বের অপরিহার্য একটি অংশ। কী মুক্ত জীবনে কী সার্থক উপন্যাসে প্রতীতি নিয়ত জায়মান। বুঝে নিতে হয়, মানুষের পৃথিবীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় না কখনো। জগতের কোনো কথাই শেষ কথা নয়, বস্তুত এই পৃথিবী কিংবা মানবিক পরিসর কিংবা সাহিত্যিক প্রতিবেদন সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটি কেউ বলতে পারে না। অস্তিত্বের দর্পণে যতটুকু এই জগৎকে বুঝি, তার বাইরে এর কোনো উপস্থিতি নেই কোথাও। আসন্ন অথচ অস্থির ভবিষ্যতের পটে সত্তা ও জগৎ বিধৃত যেন। উপলব্ধির সব আয়তন উচ্চারণে ধরা পড়ে না; তবু উচ্চারণের নিরন্তর নির্মাণ-ই মানুষের ভবিতব্য। এই তো দ্বিবাচনিকতার পটভূমি—নিয়ত অপসৃয়মান আবার নিত্য নবায়মান।

ধ্বনিবাদ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

পারিভাষিকতার দৃষ্টিতে দেখলে 'ধ্বনি' শব্দটি আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নয়, যদিও পরবর্তীকালে আলঙ্কারিকদের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবেই ধ্বনি শব্দটি চিহ্নিত হয়েছে। ধ্বনির সংজ্ঞা হিসেবে *কাব্যপ্রকাশ*-এর লেখক মম্মট লিখেছিলেন—যা নাকি শব্দের বাচ্য বা অভিধেয় অর্থের বাইরে অতিরিক্ত একটি অর্থ বোঝায় সেই ব্যঙ্গ্য অর্থকেই ধ্বনি বলে অভিহিত করেছেন পণ্ডিতেরা—ইদুমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনি বুধৈঃ কথিতঃ। এই পঙ্‌ক্তিতে 'পণ্ডিতেরা' বলতে বৈয়াকরণদের কথা স্মরণ করেছেন মম্মট। বৈয়াকরণেরা যে স্ফোটবাদের কথা বলেছেন, তার মধ্যেই যেহেতু ধ্বনির বীজটুকু সম্পূর্ণ ধরা আছে (দ্র. স্ফোট), তাই বৈয়াকরণরাই রসশাস্ত্রসম্মত ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা বলে সম্মানিত হয়েছেন।

ধ্বনিতত্ত্বের সর্বকালীন তথা সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য হলেন *ধ্বন্যালোক*-রচয়িতা আনন্দবর্ধন। তিনি লিখেছেন—শব্দের অর্থ দু-রকম হতে পারে—বাচ্য এবং প্রতীয়মান। আমরা জানি—প্রত্যেক শব্দেরই একটা প্রসিদ্ধ লোকসম্মত অর্থ আছে। শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে-অর্থের বোধ হয় সেইটাই শব্দের মুখ্য অর্থ। অথবা সেটাই শব্দের বাচ্য অর্থ বা অভিধেয় অর্থ। গোরু শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লেজ-শিঙ্-গলকম্বলওয়ালা যে-জন্তুটির প্রতিভাস মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, গোরু শব্দের মুখ্য তথা বাচ্য অর্থ সেটাই। যে শক্তির মাধ্যমে গোরু বলতে আমরা গলকম্বলওয়ালা প্রাণীটিকে বুঝি, শব্দের সেই শক্তিকে বলে অভিধা। অভিধা শক্তি দিয়ে আর যাই হোক, এর দ্বারা কোনো মহৎ কাব্য হয় না। অভিধা শক্তি কাজে লাগিয়ে, যতটুকু কবিতা হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বড় জোর—পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল / কাননে কুসুম-কলি সকল ফুটিল—এই পর্যন্ত।

শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যে-অর্থের প্রতীতি হয়, সেই বাচ্যার্থও কিন্তু তার চেয়ে বেশি অর্থ বোঝাতে পারে। যেমন, গোরু বলতে আমরা পূর্বোক্ত প্রাণী বুঝলেও একজন মাস্টারমশাই যখন ছাত্রকে গোরু বলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তার লেজ-শিঙ-গলকম্বলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কথা বলেন না। কেননা সেই মুহূর্তে ছাত্রের নির্বুদ্ধিতা, জড়তা অথবা নিরুদ্যোগই তাকে গোরু হিসেবে চিহ্নিত করছে। তার মানে, এখানে গোরু শব্দটার একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ ঘটছে। আনন্দবর্ধনের 'বাচ্যার্থ'

অনেকটা এইরকম। শব্দ এবং তার অর্থকে তিনি এতটা মন্দ বলেন না, যাতে শব্দের আক্ষরিক অর্থটুকুই সর্বস্ব হয়ে যায়। তিনি মনে করেন—অতি উত্তম কাব্যের অবলম্বন যেহেতু শব্দার্থই, অতএব শব্দের বাচ্যার্থও কাব্যের মাধুর্য তৈরি করতে পারে উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে। নির্মল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে—এই কথাটাকে যদি অভিধাবৃত্তি অতিক্রম করে কাব্যের বিষয় করে তুলতে হয়, তাহলে বলতে হবে—'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা / সোনার আঁচল খসা' / অথবা 'সন্ধ্যাতারা ধীরে / সন্তর্পণে নদীতীরে / অরণ্যশিয়রে'।

এখানে উপমা এবং সমাসোক্তি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটায় সন্ধ্যাকালের প্রাকৃতিক পরিবর্তনটুকুর মধ্যে শব্দার্থের যেটুকু চমৎকারিত্ব তৈরি হয়েছে, তা বাচ্যার্থের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে বলে আনন্দবর্ধন মনে করেন। উপমা ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমেও বাচ্য অর্থ কাব্যের পদবি লাভ করতে পারে। কিন্তু সে কাব্যও তেমন সরস বলা যায় না, কেননা কাব্যের প্রাণ হল ধ্বনি—যা শব্দের প্রতীয়মান অর্থের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে যে কথাটা আসবে সেটা ওই শব্দের শক্তির কথাই। শব্দের অভিধা শক্তির মাধ্যমে যেমন গোরু বলতে লেজ-শিঙ-গলকম্বলযুক্ত প্রাণীকেই বুঝি, কিন্তু শব্দের শক্তি বেড়ে গেলে, তার চেয়ে বেশি অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন যদি বলি—আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি, তাহলে দক্ষিণেশ্বর শব্দের মুখ্যার্থে শ্রীরামকৃষ্ণের যে পূজাস্থান কালীমন্দির বোঝায়, আমি নিশ্চয়ই সেই কালীমন্দিরে থাকি না। কিন্তু থাকি এমন একটা জায়গায় যার সঙ্গে কালীমন্দিরের সংযোগ আছে, অথচ সেটা কালীমন্দিরও নয়। তাহলে শব্দের শক্তি কিন্তু বাড়ল। শব্দের এই বাড়তি শক্তির নাম লক্ষণা। যদি বলি—'কোনোদিন ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী'—তাহলে 'মুকুলিকা' বলতে নিশ্চয়ই এখানে স্ফুটনোন্মুখ কমলকলির কথাই শুধু ভাবব না। বরঞ্চ মুকুলিকার স্ফুটনোন্মুখতার ভাবটুকু বালিকা-বয়সীর সঙ্গে অন্বিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে থাকা এমন এক রহস্যময়ী রমণীর সন্ধান আমরা পেয়ে যাব মনে মনে, যা মুকুলিকা শব্দের অর্থ থেকে অনেক মধুর।

তবু এমন লক্ষণার মাধ্যমেও মহৎ কাব্য সৃষ্টি হয় না। তার জন্য দরকার শব্দের অতিশায়িনী শক্তি—যা অভিধা, লক্ষণার পরিসর নয়। শব্দের সেই শক্তি আছে ব্যঞ্জনার মধ্যে। ব্যঞ্জনার শক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ তো অতিক্রম করেই, এমনকি শব্দের দ্বারা লক্ষিত অর্থ অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিকেও তা অতিক্রম করে। ব্যঞ্জনার শক্তি এমনই যাতে কবি-সাহিত্যিকের উচ্চারিত শব্দগুলি পদ-পদার্থের অতীত এর অলৌকিক অনুভূতি তৈরি করে। ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থ সাধারণ শব্দার্থের মতো তো নয়ই, এমনকি এমনও হয়, যে ব্যবহৃত শব্দ উলটো অর্থও বোঝাতে পারে। আলঙ্কারিকরা যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন, সেই 'ভ্রম ধার্মিক বিশ্রব্ধঃ'...শ্লোকে প্রেমিকের সঙ্গে নির্জনে মিলিত এক প্রেমিকা হঠাৎ ফুল কুড়োতে-আসা এক সাধুকে বলছে—সাধুবাবা! এখন আপনি নিশ্চিন্তে ফুল তুলতে পারেন। কেননা যে কুকুরটাকে আপনি খুব ভয় পেতেন, সেই কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে গোদাবরীর বন থেকে বেরিয়ে-আসা এক সিংহ।

এই শ্লোকটি একটি বিধিসূচক বাক্য। বৃদ্ধ ধার্মিককে বিধিসূচক শব্দার্থের মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হলেও এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা একেবারে উলটো। অর্থাৎ এখনই পালাও। যে মানুষ কুকুর দেখে ভয় পায়, সেখানে এখন সিংহের ভয় উপস্থিত। অস্ত্যর্থক বিধিবাক্যের মাধ্যমে এখানে করণীয়তার নির্দেশ থাকলেও ব্যঞ্জনায় এখানে অকরণীয়তা বা নিষেধ বোঝাচ্ছে। শব্দের এই শক্তিই ব্যঞ্জনা, আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তরা যাকে বলেছেন 'ধ্বনি'। ব্যঞ্জনা যে সব সময় এমন উলটো অর্থই বোঝায় তা নয়, তবে এই উদাহরণ এই জন্য দেওয়া যে, ব্যঞ্জনার অর্থ কতদূর যেতে পারে। কবিতার মধ্যে এই ব্যঞ্জনার উদ্ভাস সুন্দরী রমণীর অঙ্গলাবণ্যের মতো। সমস্ত কবিতা-শরীরের মধ্যে ঢলঢলে ভাবে ভেসে বেড়ায় ব্যঞ্জনা—প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব...বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।

ধ্বনিবাদীদের মতে—অলঙ্কারও যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করলে চলবে না, অলঙ্কারও ব্যঞ্জিত হওয়া চাই। যদি বলি—প্রবল পরাক্রান্ত বীরের দৃষ্টি প্রিয়তমার কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত স্তনমণ্ডলের দিকে তেমন আকৃষ্ট হয় না, যেমনটি হয় শত্রুপক্ষের হাতির মাথায় সিঁদুরের রঙ দেখলে—তাহলে প্রিয়ার কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত স্তনমণ্ডলের চেয়ে সিন্দুররাগরঞ্জিত শত্রুহস্তীর মস্তকের আকর্ষণ বীরের কাছে বেশি হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হল বটে, তবে ব্যতিরেকের এই যান্ত্রিকতা এখানে প্রধান নয়, এখানে প্রধান হল বীরত্বের ব্যঞ্জনা, যাতে রমণীর উত্তমাঙ্গের আকর্ষণ লঘু হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের গর্বচিহ্নিত হাতির মাথার দিকে হত্যার দৃষ্টি ধ্বনিত হতে থাকে। অলঙ্কারধ্বনির পরেই বস্তুধ্বনির কথা বলেছেন ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকেরা। পূর্বোক্ত ফুল-কুড়োতে আসা বৃদ্ধ ধার্মিকের প্রতি নিভৃত মিলনকামিনী প্রেমিকের প্রস্তাবটা যতই ইতিবাচক থাকুক, রমণীর বস্তুগত বিবক্ষা যেহেতু উলটো, তাই এটাকে বলা যায় বস্তুধ্বনি।

ধ্বনির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রসধ্বনির মধ্যে। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে প্রকটভাবে রসের আমদানি ঘটবে না, রসকেও ব্যঞ্জিত হতে হবে। শুধু 'ভালবাসি ভালবাসি' বললেই শৃঙ্গার রস পুষ্ট হয় না, শৃঙ্গার রস ফুটে উঠবে ধ্বনির মাধ্যমে। কালিদাস লিখেছেন—মহর্ষি অঙ্গিরা যখন পিতা হিমালয়ের কাছে মহাদেবের জন্য তাঁর কন্যা পার্বতীকে প্রার্থনা করলেন, তখন পিতার পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতী অধোমুখে কমল-কলির পাপড়ি গুনতে আরম্ভ করলেন— লীলাকমলপত্রালি গণয়ামাস পার্বতী। এখানে কমলকলির পত্রগণনার কোনও অভিধেয় তাৎপর্য নেই। মহর্ষি অঙ্গিরার বৈবাহিক প্রস্তাবের সঙ্গে এই পত্রগণনার বা কী সম্পর্ক অথবা অন্বয় আছে? কিন্তু বিবাহের কথা শুনে পিতার পাশে দাঁড়ানো যুবতীর সমস্ত লজ্জা যখন ওই কমলকলির পত্রগণনার মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হল, তখন শৃঙ্গার-রসটুকুও ধ্বনিত হল ব্যঞ্জনায়। রসধ্বনি বলে একেই।

শব্দ এবং পদের ব্যবহার বৈচিত্র্য শত শত রকমের ধ্বনির বিচার করেছেন আলঙ্কারিকেরা। যেগুলির বিবরণ পাওয়া যাবে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর-এ এবং অবশ্যই আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক*-এ তথা অভিনবগুপ্তর *ধ্বন্যালোকলোচন* গ্রন্থে।

ধ্রুপদ ও খেয়াল

অম্লান দাশগুপ্ত

উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের আলোচনায় চারটি বিশিষ্ট গায়নপদ্ধতি সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়। এগুলি হল ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি। এর মধ্যে ধ্রুপদ ও খেয়ালের জায়গা নিঃসন্দেহে অন্য দুটির উপরে। ভারতীয় রাগসংগীতের সর্বাঙ্গীণ এবং পরিপূর্ণ প্রকাশ এই দুটি পদ্ধতিতেই সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই দুটির মধ্যে আবার ধ্রুপদকে অনেকসময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, কেননা ধ্রুপদের গায়নশৈলী বেশি গম্ভীর এবং শাস্ত্রসম্মত। লক্ষ করা উচিত যে এই তাত্ত্বিক মত যখন থেকে প্রচলিত, তখন থেকেই জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ধ্রুপদ খেয়ালের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে।

গত অর্ধ সহস্রাব্দ ধরে ভারতীয় সংগীতের বিবিধ রাগ এবং গীতি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, এবং কালের স্রোতে অনেকগুলি অবলুপ্ত হয়েছে। কয়েকটি আবার ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান। বিভিন্ন সূত্রে নানারকমের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় : সবগুলির (অথবা অধিকাংশের) উৎপত্তি এবং বিকাশের ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা। ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি নিয়ে নানা বিবাদ দেখা যায়; এগুলির জন্মক্ষণ এবং সৃষ্টিকর্তা নিয়ে নানা নির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করা হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমরের রাজত্বকালে ধ্রুপদের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য ধ্রুপদের প্রাচীনত্বের দাবিও করা হয় : বহু সহস্রাব্দ ধরেই নাকি এর সন্ধান মেলে। প্রাচীন 'প্রবন্ধ' গানের একটি বিশেষ রাগ থেকেই ধ্রুপদের জন্ম। কিন্তু সংগীতের ইতিহাসে গীতিরাগের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা যেমন অনস্বীকার্য, তেমন এও মনে হয় ধ্রুপদের প্রচলিত ধারা খুব পুরোনো নয়। আকবরের সভাগায়ক মিঞা তানসেনের হাতে ধ্রুপদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে।

যদিও আজ ধ্রুপদের 'ঘরানা'-র কথা বলা হয়, পণ্ডিতেরা ধ্রুপদের চারটি 'বানি' বা বিশিষ্ট শৈলী স্বীকার করেন। এগুলির নাম শুদ্ধবানি (অথবা ডাগুরবানি), গোব্‌হার বানি, নওহারবানি এবং খাণ্ডারবানি। এই গায়কির বিভাজন গায়ক চারিতার অথবা গায়ক সমষ্টির মাধ্যমে হয়েছে বলে মনে করা হয়। এদের পুত্রাদি এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বাণীগুলির প্রচার হয় এবং ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এগুলি ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারগুলির মধ্যে যেমন নিজস্ব গায়নশৈলী এবং রচনার সম্ভার রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে, তেমন বিবাহ এবং শিষ্যতার মাধ্যমে এগুলির মধ্যে সাংগীতিক আদান-প্রদান ঘটেছে।

অধিকাংশ প্রাচীন ধ্রুপদে দেবদেবীর মহিমাবর্ণন এবং রাজা-বাদশাদের প্রশস্তি পাওয়া যায়, যদিও প্রকৃতি ও প্রেমবিষয়ক রচনাও উপস্থিত। ধ্রুপদ গানে চারটি অংশ বা 'তুক' থাকে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কেউ কেউ 'ভোগ' নামে একটি পঞ্চম তুকের কথাও বলেন। ধ্রুপদ গাওয়ার আগে আলাপ গাওয়ার রীতি আছে; আলাপের শেষে পাখোয়াজের সহযোগিতায় তালবদ্ধ গান গাওয়া হয়। মীড় এবং গমক ধ্রুপদের বিশেষ অলঙ্কার। গানের পদের অংশগুলি বিভিন্ন লয়ে গেয়ে ধ্রুপদের বিস্তার ঘটানো হয়। একে 'বাঁট' বলা হয়, এবং এই অঙ্গ সুষ্ঠু এবং নান্দনিকভাবে সম্পন্ন করা ধ্রুপদিয়ার উৎকর্ষের পরিচায়ক। সচরাচর চৌতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, সুরফাক্তা (সুলতাল) এবং তেওরা তালে ধ্রুপদ শোনা যায়, যদিও অন্য কূটতালেও ধ্রুপদের রচনা প্রচুর পাওয়া যায়। দশ মাত্রার ঝাঁপতালে নিবদ্ধ ধ্রুপদকে 'দাদ্‌রা' এবং চোদ্দমাত্রার ধামার তালে গাওয়া ধ্রুপদকে 'ধামার' বলা হয়। ধামারে সাধারণভাবে কৃষ্ণের হোলিখেলার বর্ণনা থাকে, এবং এগুলি অন্য ধ্রুপদের তুলনায় আবেগময় এবং ছন্দবহুল।

খেয়ালের উৎপত্তি নিয়েও নানা মত পাওয়া যায়। তিনটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি আলাউদ্দিন খিলজির সমসাময়িক সংগীতনায়ক আমীর খুসরো-র সময়কাল। 'খেয়াল' কথাটির উৎপত্তি পার্সি থেকে, যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কথাটি প্রচলিত। কথাটির অর্থ 'কল্পনা', 'চিন্তা', 'ভাবনা' ইত্যাদির অনুরাগ : যদিও আমীর খুসরো-র আমল থেকেই সম্ভবত কথাটি একটি বিশিষ্ট গায়নশৈলী অর্থে ব্যবহার করা হত। অবশ্য এই খেয়ালের চরিত্র সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায় না। তবে আমীর খুসরো কাওয়ালি গানেরও প্রবক্তা হিসেবে খ্যাত। হয়ত এই দুটি গায়নপদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। এর পরে বলতে হয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জৌনপুরের বাদশা হুসেন শাহ্ শর্কি-র রাজত্বকাল। তাঁর সভাগায়কেরা খেয়ালের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন বলে জানা যায়।। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগের আগে খেয়ালের বিশেষ প্রচার ছিল বলে মনে হয় না। মুঘল বাদশা মহম্মদ শা (রঙ্গীলে)-র সভাগায়ক নিয়ামৎ খাঁ খেয়ালের আমূল সংস্কার করেন। 'সদারঙ্গ' ছদ্মনামে তিনি প্রচুর খেয়াল বন্দিশ রচনা করেন। এই গানগুলি বলা যেতে পারে পরবর্তী যুগের খেয়াল গায়কদের যৌথ সম্পত্তি এবং সব ঘরানায় এই বন্দিশ গাওয়া হয়। 'সদারঙ্গ' নিজে প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ও বীণবাদক ছিলেন, এবং তানসেনের কন্যা বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু খেয়াল গানের নবজন্ম তাঁর শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক অবদান।

মিঞা সদারঙ্গ প্রবর্তিত খেয়ালের প্রথমে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। দিল্লির 'জাওয়াল-বচ্চে'দের তিনি নিজে তালিম দিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। খেয়াল গায়কির বিকাশ এবং বহুল প্রচার গোয়ালিয়র-স্থিত গায়কবর্গের মাধ্যমে হয়। এই গানের জনপ্রিয়তার জন্য মনে হয় যে ধ্রুপদ গায়কেরাও খেয়ালের দিকে আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে টপ্পা গায়করাও গোয়ালিয়রের খেয়াল শৈলীকে প্রভাবিত করেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা যায় যে জীবিকার সন্ধানে বহু গায়ক তাঁদের মূল বাসস্থান থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের মাধ্যমে ধ্রুপদ এবং

খেয়ালের অনেক নতুন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিশেষ করে দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাপে নতুন আশ্রয়স্থল এবং আশ্রয়দাতার খোঁজ করেন। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন মারাঠা রাজ্যে বিশেষ করে খেয়াল গানের বিকাশ ঘটে। এই সময়ে গায়কেরা তাঁদের মূল বাসস্থানের ভিত্তিতে নিজেদের গায়কি প্রচার করেন। 'ঘরানা' কথাটি এই সময় থেকেই বিশেষ ভাবে চালু হয়, এবং আগ্রা-অত্রৌলি-কিরানা-জয়পুর ইত্যাদি উত্তর ভারতের শহর এবং গ্রামের নামে ঘরানার বিকাশ 'দরখন'-এর বিভিন্ন রাজ্যে হয়।

খেয়ালের বন্দিশ দেখলে বহু সাংগীতিক ধারার মিশ্রণের আভাস পাওয়া যায়। খেয়ালের রচনা বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষাতে (যেমন পারসি, খারবোলি ব্রজভাষা, অবধি, রাজস্থানি ইত্যাদি); বন্দিশের গঠনেও ভিন্নতার আভাস পাওয়া যায়। ধ্রুপদের তুলনায় খেয়ালের বিবর্তনও দ্রুতগতিতে হয়েছে। খেয়ালের বন্দিশে সাধারণভাবে দুটি ভাগ বা 'তুর্ক' থাকে স্থায়ী ও অন্তরা। চার তুকের খেয়ালও অবশ্য পাওয়া যায়। পুরোনো খেয়াল গানের রীতি 'বন্দিশ-প্রধান', অর্থাৎ বন্দিশের অন্তর্গত স্বরক্রম অনুযায়ী রাগের চরিত্র প্রকাশ পেত। তাই গায়কেরা বন্দিশ শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতেন। একটি রাগে অনেকগুলি বন্দিশ শিখলে রাগের রচনার সঙ্গে সঙ্গে তারানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, সরগমগীত প্রভৃতিও খেয়াল গায়কের শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। এও শোনা যায় যে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বহু ধ্রুপদ গানও অধ্যয়ন করা হত। খেয়ালে সচরাচর যেই তালগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি : ত্রিতাল, একতাল ও বিলম্বিত একতাল, ঝুমরা, আড়া-চৌতাল, তিলওয়ারা, ঝাঁপতাল ও রূপক। কুটতালেও বন্দিশ পাওয়া যায়। খেয়াল গাওয়ার সঙ্গে আলাপ গাওয়ার রীতি সাধারণ ভাবে নেই। যদিও কয়েকটি ঘরানায় খেয়ালের আগে আলাপ পরিবেশন করা হয়। বন্দিশের বিস্তার আলাপি, বহলওয়া, সরগম, তান ইত্যাদি বিশিষ্ট অঙ্গের মাধ্যমে করা হয়। খেয়াল গানের বিশেষ সম্পদ তান। স্বর ও বাণীর সমন্বয়ে রাগচরিত্র ফুটিয়ে তোলায় তানের বিশেষ ভূমিকা। বহু ধরনের তানের কথা শোনা যায়, এবং এগুলি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতা দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

ধ্রুপদী নৃত্য

সুশীল সাহা

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যশিল্পের এমন উচ্চস্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে তা থেকে মনে হয় অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে নৃত্যের বিকাশলাভ ঘটেছিল। বিশ্বের নিয়ামক শক্তিকে নটরাজ কল্পনা করে তার বিগ্রহ চিদাম্বরমের মন্দিরে স্থাপন করা আছে। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন গোপুরমের দেয়ালে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত একশো আটটি করণের চিত্ররূপ খোদিত আছে। মন্দিরের গায়ে কেবল নয়, ভারতীয় নৃত্যের অনুষঙ্গে দেবতার প্রতি অর্ঘ্যদান তথা তার বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয়েছে, গৃহীত হয়েছে নানা আখ্যান ও ঘটনা।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিম মানুষের নৃত্যগীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। তাদের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে যাদু অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের প্রাধান্য ছিল। নৃত্যের বিচিত্রভঙ্গির ছলে মানুষ তার ভয় ও ভক্তিতে যাদু ও অতিপ্রাকৃতের গূঢ়শক্তিকে বন্দনা করেছে। এই নৃত্যধারা রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা থেকেই ক্রমবিবর্তনে ধ্রুপদী নৃত্যের জন্ম। এক এক প্রদেশে তা এক এক ছন্দবিভঙ্গে বিধৃত হয়েছে। সাধারণত ধ্রুপদী নৃত্যকে ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক এই চারটি বিভাগে ভাগে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বর্গিকরণ অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়। কেননা কুচিপুড়ি, ওড়িশি, সেরাইকেল্লার ছৌনাচ, অসমের আঙ্কিয়ানটি ও কর্নাটকের যক্ষগণও ধ্রুপদীনৃত্যের দাবিদার। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে মোহিনী আট্যম ও কৃষ্ণনাট্যম নামে দুটি অধুনা ক্ষয়িষ্ণু নৃত্যধারা আছে। সাদির নাট্যম ভরতনাট্যম নৃত্যের শুদ্ধ মৌলিকরূপ। বহু শতাব্দী ধরে মন্দির ও রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্যানুষ্ঠান হত। সাদির নাট্যম, দাসী আট্যম-চিন্নমেলনম্, ভোগমেলম্ তাঞ্জোরিনাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। ক্রমে এই সমস্ত নাচ মন্দির ছেড়ে সাধারণের মঞ্চে এসেছে কিন্তু ব্যাকরণের গূঢ় অনুশাসন ত্যাগ করেনি। আধুনিককালে কৃতবিদ্য শিল্পী ও গবেষকদের হাতে এই শিল্পক্রমে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপে পরিগণিত হয়েছে এবং দেশেবিদেশে আদৃত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি এক নয়নাভিরাম শিল্পরূপে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এই ধ্রুপদী নৃত্য।

কেরলপ্রদেশের অনন্য সম্পদ 'কথাকলি'। কোমল, কঠোর, মধুর ও ভয়ংকরে পূর্ণ প্রাণবন্ত মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকলি নৃত্যে।

বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্রের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে প্রাচীনকাল থেকেই। এ অঞ্চলের প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির নৃত্যধারা শৌর্য ও বীরত্বগাথায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বীররসের প্রাবল্যে-ঘেরা এই নৃত্যধারা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই সুন্দর।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভারতসীমান্তে অবস্থিত মণিপুর রাজ্য। পর্বতমালায় বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকেই সংগীত ও নৃত্যের এক জাতিগত প্রবণতা দেখা যায়। তবে মণিপুরী সংস্কৃতি বিকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এর নৃত্যকলায়। সমষ্টিগতভাবে একে 'মণিপুরি নর্তন' বা 'মৈতে জাগোই' বলে। বৈষ্ণবধর্ম ও মৈতে আদিমধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এই নৃত্য আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতের ধ্রুপদী নৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গ রূপের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি 'ভরতনাট্যম'। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা তথা সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারস্বত মহিমায় সমুজ্জ্বল। এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি একসময় সমগ্র ভারতেই প্রচলিত ছিল। তবে নানাকারণে অন্যান্যপ্রদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে রাজানুগ্রহে একমাত্র দক্ষিণ ভারতেই এর প্রচার ও প্রসারলাভ ঘটে, আজও সেখানে এই ধারা বহমান।

'কুচিপুড়ি' নৃত্যধারা অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণানদীর তীরে কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নৃত্যপদ্ধতির প্রবর্তক। এই নৃত্যে আঙ্গিকের প্রাধান্যই বেশি। জিয়নগর রাজবংশ এই নৃত্যধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল।

বর্তমান কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নৃত্যধারা 'কত্থক'। কথিকা শব্দটি থেকে কত্থকের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে দেবতাদের লীলা ও পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনায় কত্থক, গ্রন্থিক, গাথাকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রথমে কাহিনি অংশে বর্ণনা করে তারপর ভাবাভিনয়, নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে সেই কাহিনিটি বর্ণনা করতেন। এই কাহিনি বর্ণনাই কালক্রমে কত্থকনৃত্যে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য নৃত্যধারায় বাহ্যত স্থির প্রসন্ন রূপকল্পনার রেখাই ছন্দসৃষ্টি ও গতি সঞ্চার করে কিন্তু কত্থক নৃত্যপদ্ধতিতে ইসলামিয় প্রভাবে মূলত তালাশ্রয়ী রঞ্জনাশক্তির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। এই নৃত্যধারায় বৈষ্ণবদর্শন ও ইসলামির সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে এই মেলবন্ধন সমগ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীতে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার নিয়ামক হয়েছে।

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। লোকনৃত্যে আদিমনৃত্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য পুরোপুরি বজায় না থাকলেও আবেগ প্রকাশের ধারা অবিকল রয়েছে। তবে ধ্রুপদী নৃত্য রচিত ও প্রসারিত হয়েছে কঠিন ও কঠোর ব্যাকরণের নির্দেশ এবং প্রকরণে। বস্তুত উন্নতসভ্যতার সৃষ্টি এই ধ্রুপদী নৃত্য। লোকনৃত্যের আঙ্গিক ক্রমে রূপান্তরিত ও শোধিত হয়েই ধ্রুপদী নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তা আধুনিককালে সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হিসেবেই স্বীকৃত।

নক্‌শা প্রহসন

আশিস খাস্তগীর

ইংরেজি Sketch শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা নক্‌শা-কে মেনে নিলে এতে কয়েকটি স্বভাববৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তখন নক্‌শা-র মধ্যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের আপাতগ্রাহ্য একটি রূপরেখা স্পষ্ট হয়। সেই রূপরেখা-র ইংরেজি বলতে পারি Outline। চিত্রশিল্পে স্কেচ-এ শিল্পী যেমন আউটলাইনের সাহায্যে উদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় রেখাঙ্কিত করেন, নক্‌শা-ও একইভাবে লেখকের লক্ষ্যের আউটলাইন। লক্ষ্যটিকে হতে হবে বাস্তব। তাতে কল্পনার রঙের আলতো ছোঁয়া থাকতেই পারে। কল্পনার রঙটি আসলে লেখকের বিশ্বাসের জগৎ। সে-জগতের ভিত্তিভূমি লেখকের চারপাশের চেনা মহল। চেনা হয়েও যা সর্বতোমান্য বা গ্রহণীয় নয়, যার কৌণিক-তীক্ষ্ণ পর্যাবলোকনে লেখক খুঁজে পান ব্যতিক্রম, ব্যভিচার, ত্রুটি বা অসঙ্গতি। সেই ত্রুটি-অসঙ্গতি-ব্যভিচারের নিখুঁত পূর্ণচিত্রের নীরস কাঠামোকে লেখক সজীব করে তোলেন তাঁর অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাসের নির্মম কশাঘাতে। আর এখানেই লেখকের কঠিন পরীক্ষা। কারণ শ্লীলতা, সুরুচি ও পরিমাণজ্ঞানের অভাবই নক্‌শার প্রকৃত গুণমানকে ক্ষুণ্ন করে।

সুতরাং নক্‌শা-র একমাত্র বিষয়—সমসাময়িক সমাজ। লেখকের মূল লক্ষ্য থাকে সমাজ-সংস্কার বা সামাজিক দোষ, অনাচার, ব্যভিচারের সমুৎপাটন। এজন্য কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষ অথবা শ্রেণিবিশেষ লেখকের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। সে আক্রমণে ঝাঁঝ থাকলেও কুৎসাপ্রচার থাকে না। নক্‌শা-র অবলম্বন অবশ্যই লঘু ভাষা। তবে সেই লঘু ভাষাপ্রয়োগে লেখককে হতে হয় সতর্ক। যাতে ভাষার অতিতারল্য নক্‌শা-র রসগ্রহণে ব্যাঘাত না ঘটায়। আবার এ-ও দেখা প্রয়োজন ভাষারীতি যেন গুরুগম্ভীর সংস্কৃতবহুল না হয়।

নক্‌শা-কে অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, এটি Plan শব্দের দ্যোতনা আনে। প্ল্যান হয় বাস্তব থেকে ছোটো, রঙ থাকে আবশ্যিক ক্ষেত্রে। বাস্তবকে পুরোপুরি ধরে নিয়েও এটি হবে তার নিখুঁত মিনিয়েচার। নক্‌শাও তা-ই। বাস্তব থেকে ছোটো হয় বলেই নক্‌শা-র আয়তনটিও নাতিদীর্ঘ। ফলে ধূমায়িত বিস্তারের সুযোগ লেখক এখানে পান না। আয়তনের দিকে তাকিয়েই তিনি বর্ণনার বাহুল্য ত্যাগ করে ইঙ্গিতধর্মিতাকে আশ্রয় করেন।

দৈর্ঘ্যের হ্রস্বতা যেমন নক্‌শার একটি লক্ষণ, অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন, অত্যুক্তি তেমনই নক্‌শার প্রাণ। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে ইংরেজি Comic Sketch

শব্দটির কথা। কমিক স্কেচ-এ চিত্রকর চিত্রিত ব্যক্তির শারীরিক অবয়বের বিশেষ লক্ষণটি অতিরঞ্জনের মাধ্যমেই হাস্যরসের উদ্রেক করেন। কার্টুনিস্ট-এর ধর্মও তা-ই। ভোবড়ানো গাল, টিকালো নাক, বিরলকেশ মস্তক, চওড়া গোঁফ ইত্যাদির অতিরঞ্জনের দ্বারাই উদ্দিষ্ট মানুষটি 'সত্য'-রূপে ধরা দেন দর্শকের কাছে।

নক্‌শা-চিত্রণের মাধ্যম কী হবে—সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। গদ্য-মাধ্যমে নক্‌শা-র উপস্থাপন স্বাভাবিক। তবে পদ্য-মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতেই পারে। দেখা দরকার, গদ্য অথবা পদ্য—যে মাধ্যমেই হোক না কেন, তাতে যেন গল্প বা কাহিনির মৃদু স্পর্শ থাকে। বিষয়নির্ভর স্বচ্ছন্দগতি নক্‌শা-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নক্‌শা এবং প্রহসন—এ দুটিকে এক করে ফেলার প্রবণতা আমরা প্রায়শ দেখি। একথা মেনে নিতেই হয়, নক্‌শা এবং প্রহসন—দু'ধারারই মূল রস হাস্যরস। নক্‌শা-র মত প্রহসন-লেখকেরও মূল লক্ষ্য সামাজিক দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি, ব্যাভিচারের উন্মোচন। এখানেও ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষ তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য এবং এতে তাঁর হাতিয়ার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত। অতিকথন, আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা সার্থক প্রহসনে বর্জনীয়। নির্লিপ্ত, অপক্ষপাতী দৃষ্টি, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রহসন-লেখকের সম্পদ।

বিষয়বস্তু, উপাদান, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যেমনই হোক না কেন, প্রহসনের গঠনকে হতে হয় অবশ্যই সংলাপ-চরিত্র-কাহিনিনির্ভর। অর্থাৎ নাট্যলক্ষণটি তার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। এখানেই নক্‌শা-র সঙ্গে প্রহসনের ভিন্নতা। নাট্যলক্ষণ নক্‌শার আবশ্যিক শর্ত নয়। বরং রচনাধর্মিতার দিকেই তার ঝোঁক বেশি। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক ইত্যাদি যে-কোনো মাধ্যমেই নক্‌শা লেখা হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, সমসাময়িক সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, ব্যক্তিবিশেষের ভণ্ডামি-জুয়াচুরিকে শ্লেষ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করার সময় নক্‌শা-লেখকের উপদেশ দেবার প্রবণতা সবিশেষ লক্ষণীয়, যা প্রহসন-রচয়িতার ধর্ম নয়।

যতদূর জানা গেছে, *সমাচার দর্পণ*-এ ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে দু'কিস্তিতে প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের *বাবুর উপাখ্যান* বাংলা নক্‌শা ধারায় প্রথম উদাহরণ। এরপর ১৮২২-এ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংবাদ কৌমুদী*-তে *বাবু রচনা*, এবং ভবানীচরণের *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩), *নববাবুবিলাস* (১৮২৫) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নক্‌শার প্রাথমিক চেহারা। এই আদর্শকে সামনে রেখে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নক্‌শার প্রকৃত যাত্রা হল শুরু। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা* বাংলা নক্‌শা-সাহিত্যে বেগের সঞ্চার করে। এরপর ক্রমান্বয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের *আপনার মুখ আপনি দেখ* (১৮৬৩), নিশাচর-প্রণীত *সমাজ কুচিত্র* (১৮৬৫), টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র (চুণিলাল মিত্র-প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র) রচিত *কলিকাতার নুকোচুরি* (১৮৬৯), কেদারনাথ দত্তের *সচিত্র গুলজারনগর* (১৮৭১) ইত্যাদি বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুক, নক্‌শা পরিবেশনের জন্যই প্রকাশিত হল। যেমন, *বিদূষক* (১৮৭০, সম্পাদক-ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), *বসন্তক* (১৮৭৪, সম্পাদক-প্রাণনাথ দত্ত), *হরবোলা ভাঁড়* (১৮৭৪, সম্পাদক-দুর্গাদাস

ধর), *পঞ্চানন্দ* (১৮৭৭, সম্পাদক-ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), *রসিকরাজ* (১৮৮১, ?) ইত্যাদি। এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রকৃত নক্‌শা এবং নক্‌শাধর্মী অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ-ধরনের রচনায় সেকালে নাম করেছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমনই অগণিত রচনা ও কয়েকটি হাতেগোনা নক্‌শাচিত্র-ই যে পরবর্তীকালের প্রহসনের স্বর্ণসম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় সম্ভবত নেই।

দশম শতাব্দীর আলঙ্কারিক ধনঞ্জয় *দশরূপক* গ্রন্থে দশ ধরনের রূপকের কথা বলেছেন। এর মধ্যে একটির নাম 'প্রহসন'। অন্যদিকে ইংরেজি Farce শব্দটি লাতিন Farclo শব্দজাত। এর আক্ষরিক অর্থ মনে রেখে বলতে হয় ফার্স একধরনের নাটক, যা নিকলের ভাষায় 'stuffed with low humour and extravagant wit'। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংলন্ডে 'ফার্স' শব্দটির ঘন ঘন প্রয়োগ দেখা যায়। ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংলন্ডে কমেডি রচনা ধারায় অবনতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জনরুচি তখন হাস্যরসাত্মক দুর্বল নাটকগুলি চাইছিল। এর ফলে তিন অঙ্কের নাটক লেখার ফ্যাশান দেখা দিল। নতুন ধারার তিন অঙ্কের নাটকগুলিকে বলা হত 'ফার্স'। এই সময় 'ফার্স' বলতে বোঝাত simplex a short humorously.। ছোটো আয়তনের নাটকে চরিত্রচিত্রণ ও বৃহৎ প্লট-সন্নিবেশ সম্ভব নয় বলে ক্রমে ফার্সগুলিতে অতিরঞ্জন প্রশ্রয় পেল। তারই ফলে এখানে অসম্ভাব্য হাস্যকর ঘটনা স্থান করে নিল।

গ্রিক কমেডি-লেখক নরউডের দেওয়া ফার্সের সংজ্ঞা এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—'Farce may bc defined as exaggerated Comedy; its problem is unlikely and absurd; its action ludicros and one sided; it mannar entirely laughful'

অধ্যাপক নিকল বলেছেন চরিত্র যেখানে পরিস্থিতি-নির্ভর, যেখানে ওই পরিস্থিতি অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব রকমের এবং অসঙ্গতি ও স্থূলতার চূড়ান্ত—সেখানেই প্রকৃত ফার্স। বলা বাহুল্য, নরউড এবং নিকল দুজনেই ফার্সকে শিল্পমূল্যে উচ্চ আসন দেননি। ট্র্যাজেডির তুলনায় মেলোড্রামা যেমন শিল্পমূল্যে নিকৃষ্ট তেমনি কমেডির তুলনায় ফার্সও নিম্নমানের। যে কমেডিতে ঘটনাধারার মধ্যে কার্যকারণসূত্রের যোগ খুবই শিথিল, ঘটনা উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য, চরিত্র অতিরঞ্জিত এবং যেখানে চরিত্রে জীবনরহস্য প্রকাশে কিছুমাত্র প্রয়াস নেই ও যার হাস্যরস স্থূল তাকেই আমরা ফার্স বলে গ্রহণ করতে পারি।

ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে যেমন আছে ফার্স, তেমনি আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে আছে 'প্রহসন'। আচার্য ভরত এবং বিশ্বনাথ প্রহসনের পরিচয় দিয়ে এর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এঁদের মতে প্রহসনের বিষয়বস্তু নাট্যকার স্বাধীন কবি-কল্পনার বলে সৃষ্টি করেন। প্রহসনে তপস্বী, ধার্মিক বা ব্রাহ্মণকে নায়ক করার নির্দেশ আছে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের হাবভাব নিয়েই হাস্যরস সৃষ্টি করা হত। প্রহসনে সন্ধিযুক্ত কাহিনীতে একটি অঙ্ক থাকত। মূলরস হাস্যরস।

আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ প্রহসনকে শুদ্ধ ও সংকীর্ণ—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেখানে উদ্ধত তপস্বী ধার্মিক বা ব্রাহ্মণকে হেয় করার চেষ্টা, ভাষা ও আচার অবিকৃত, সেখানে শুদ্ধ প্রহসন। আর যেখানে নপুংসক বিট ধূর্ত প্রভৃতি চরিত্রাশ্রয়ী, সেখানে সংকীর্ণ প্রহসন।

বাংলা নাটকে প্রহসন কথাটি সংস্কৃত প্রহসন থেকেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনের সব লক্ষণ বাংলা প্রহসনে অবিকল গৃহীত হয়নি। শুধুমাত্র সীমিত আয়তন, অঙ্গীরস হাস্যরস এবং প্রধান চরিত্রকে হেয় করার বিষয়টিই বাংলা প্রহসনে গৃহীত।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ছাড়া অধিকাংশ বাঙালি নাট্যকার পাশ্চাত্য ফার্স এবং কমেডি এই দু'য়ের কথা মনে রেখে হাস্যরসাত্মক নাটক লিখেছেন। কিন্তু কমেডি ও ফার্সের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, সেকথা তাঁরা মনে রাখেননি সবসময়। এজন্য হাস্যরসাত্মক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন সব রচনাই বাংলা প্রহসন নামে অভিহিত হচ্ছে। অধ্যাপক নিকল কমেডির যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তার আলোকে এ পর্যন্ত বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ হয়নি। এই কারণেই রামনারায়ণের উভয় সংকট, চক্ষুদান ইত্যাদির সঙ্গে মধুসূদনের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, দীনবন্ধু-র *সধবার একাদশী*, *জামাই বারিক* ইত্যাদি এক পঙক্তিতে আসন গ্রহণ করে। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, বাংলা প্রহসনে ইংরেজি ফার্স ও কমেডির একটি মিশ্ররূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে।

নক্সা কিস্‌সা বাতেলা

আশিস খাস্তগীর

একটি প্রায়শ-শ্রুত সংলাপ : *বেসি নক্সা কোরো না, মুখের নক্সা একদম পাল্টে দেবো।*—যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, বলুন তো কোথায় শুনেছেন? আপনি ভাবার সময় বিন্দুমাত্র না নিয়ে বলবেন, কেন, ওই যে রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল, উর্ধ্ব-কলার, শীর্ণতনু, মধ্যদিনেও রক্তনয়ন, কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠ, ঘূর্ণিত কুঞ্চিত কেশাধিকারী নব্যযুবকটি।

এই বিশেষায়িত নব্যযুবকটিকে আপনি আপনার চারপাশে কখনো না কখনো দেখেছেন। সাহিত্যে বা টি ভি-র মনোরঞ্জক চ্যানেলে তার সরব উপস্থিতির প্রমাণও পেয়েছেন। সে-সময় কি নিজের অজান্তেই মুখের জ্যামিতিকে মেপে নেননি? সত্যি কথা বলতে কি, শুধু মুখ কেন, পুরো বডির নক্সা পাল্টে দেবার লোকের অভাব আজ আর নেই। এঁরা দু'জগতের বাসিন্দা। একদল সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দা, ডাক্তার। ছুরি কাঁচি নিয়ে পেশাদারি দক্ষতায় খাঁদা নাককে টিকালো, তোবড়ানো গালকে তৈলচিক্কণ, পটলচেরাকে ডাগর ডাগর বানিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। এ তো আংশিক নক্সা পাল্টনো। পুরো নক্সা পাল্টাতে অবশ্য খরচটা একটু বেশিই পড়ে। ছেলেকে মেয়ে বা মেয়েকে ছেলে করে প্রকৃতির মুখের ওপর বক্রহাস্য করতে গেলে সে নিয়ে ভাবলে চলে না। তাই আংশিক নক্সা পাল্টানোর জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত উচ্চবিত্ত মানুষের আকুলতা চোখে পড়ার মতো। এ কারণে আপনার পার্শ্ববর্তিনীর সৌন্দর্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। ওই সৌন্দর্যের কতটা নিজস্ব আর কতটা আরোপিত, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে।

আর একদল মানুষও নক্সা পাল্টান। তাঁদের কাছে হত্যে দিয়ে পড়া দূরে থাক, আমরা তাঁদের থেকে শত সহস্র যোজন দূরে থাকতে চাই। এঁরা অন্ধকারের বাসিন্দা। টাকাকড়ির বিনিময়ে, কখনো বা বিনে পয়সাতেই এঁরা কেবল মুখ নয়, পুরো বডির নক্সা পাল্টে দিয়ে দেয়ালে ছবি করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। নক্সা পাল্টানো এঁদের 'বাঁয়ে হাত কা খেল্'। চোখের পলকে এঁরা 'কাজটি' সারেন। সময়ের অনেক দাম যে! আর যাঁরা শুধু হুঙ্কারই ছাড়েন, তাঁরা হলেন 'গুরু'র ভৃঙ্গির ফোর্থ কার্বন কপি।

ভূগোল / জিয়োগ্রাফি, জ্যামিতি, আকার, চেহারা, নক্সা, ম্যাপ—এখন সমার্থক শব্দ। অবশ্যই বিশেষ অর্থে। সে তো না হয় বুঝলাম। কিন্তু 'নক্সা করা'? যাঁরা নক্‌শা করেন তাঁদের আমরা জানি 'শিল্পী' হিসেবে। উচ্চারণ-বিকৃতিতে নক্‌শা নক্সা-য়

রূপান্তরিত। তাই অর্থটিও তার স্বদেহ ত্যাগ করেছে। এখন নক্সা করতে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। জানার দরকার কিছু ঢং কিছু ন্যাকামি ও ছলাকলা। এঁদের আমরা বলব ঢঙি বা ন্যাকা। মুশকিল হল, যাঁরা নক্সা শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাঁরা কখনই 'ঢং' বা 'ন্যাকামি' শব্দযুগ্ম মুখে আনবেন না। কারণ ওই দুটি শব্দের ওপর মেয়েমহলের অধিকার। ইতি-উতি নারীকণ্ঠে শুনবেন : আহা, ঢ-য়ে কিংবা ন্যাকা, কিছুই বোঝেন না! আবার এর বদলে নক্সা করা শুনবেন খালবাতি এলাকার বাসিন্দাদের মুখে।

মূল আরবি শব্দ নক্স। যার অর্থ কারুকাজ, ছবি, রেখাঙ্কন। নক্স থেকে উৎপন্ন নক্সা বা নকশা-র শিষ্ট অর্থও একই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের আগে এই শব্দের বানান ছিল নক্সা। রবীন্দ্রনাথ 'নক্সা' বানানটি প্রয়োগ করেছিলেন 'হাট' কবিতায়—*শীতের ব্যাপার নক্সা কাটা*। জসিমুদ্দিনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নামটিও স্মরণে রাখব—*নক্সী কাঁথার মাঠ*। কারুকাজ, ছবি, রেখাঙ্কন অর্থপরিবর্তনের চক্রে পড়ে দাঁড়াল মিথ্যাভাষণ, ধাপ্পা-য়। অপরাধ জগতের অতিরিক্ত অর্থ—চক্রান্ত, মেয়ের চেহারা। প্রয়োগ অনুসারে অর্থের হেরফের ঘটে। যেমন, আর *নক্সা দিস্ না, মাল্লু ছাড়্*। (আর ধাপ্পা দিস না, টাকা-পয়সা বার কর্) *আঃ, চামকির কী নক্সা!* (আহা! মেয়েটির কী চেহারা!) *ও মাল নক্সায় ওস্তাদ*। (লোকটা মিথ্যা ভাষণে ওস্তাদ) ইত্যাদি।

নক্সা-র নবার্থ ন্যাকামি বা ছলাকলা। তাহলে অর্থের এই রূপান্তরের রহস্যটি কী? একটু অনুমান করা যেতে পারে। নকশা-র কারুকাজ বা রেখাচিত্রে কিছুটা জটিলতা বা রহস্যময়তা থাকতে পারে। তার মধ্যে রয়ে যায় জানা বা না জানার ধাঁধা। ঢং বা ন্যাকামিতে সেই জানা অথবা না জানার ব্যাপারটি থাকে। সম্ভবত নক্সা করা-র মধ্যে একই জটিলতা তৈরির চেষ্টা দেখেই দুটিকে এক গোত্রে ফেলা হয়েছে।

পাশের বাড়ির বৌদি স্বামীর ঘর ত্যাগ করে তার দেওরের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। খুব মুখরোচক সংবাদ সন্দেহ নেই। পাড়ার ফন্টে এসে বলল : *দাদা, শুনেছেন তো, কী কেলোর কেচ্ছা! ভদ্রলোকের পাড়ায় এসব কী কাণ্ড!*

কেলো কে, তা জানি না। সে কোনো 'কেচ্ছা' করেছিল কিনা তা-ও জানি না। অথচ কেচ্ছা শব্দটির সঙ্গে তার নাম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। সে কথা থাক। ভাবলাম, ফন্টে তো ছ্যা-ছ্যা করে গেল। তার ঘৃণা, প্রকাশের শব্দ কেচ্ছা। ফন্টে জানে কেচ্ছা শব্দের অর্থ কেলেঙ্কারি। তার কোনো দোষ নেই। অধিকাংশ মানুষই তা-ই জানেন। সেজন্য *কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি* শব্দযুগল হামেশাই লোকমুখে শোনা যায়। যেন দুটি শব্দ যমজ ভাই।

কিন্তু ফন্টে যদি জানত, কেচ্ছা শব্দটির উদ্ভব নিরীহ সাদামাটা আরবি শব্দ কিস্সা থেকে, যার অর্থ—গল্প, তবে কি ও দ্বিতীয়বার ভাবত না? খুঁজত না কি আরও শক্তিশালী কোনো শব্দ, যাতে আরও জোরদারভাবে মনের ঘৃণা-রাগ-অবহেলা প্রকাশ পায়?

কিস্সা বাঙালির মুখে তেমন প্রচলিত নয়। যতটা পরিচিত কেচ্ছা। তদ্ভব *কেচ্ছা*-র মধ্যে আছে অশালীনতার প্রতি ইঙ্গিত, যা আদপেই কিস্সা-র পরিচায়ক নয়। বরং সেদিক থেকে কুৎসা-র সঙ্গে এর অর্থগত নৈকট্য যেন কিছুটা বেশি। কুৎসা-র অর্থ

নিন্দা, অপবাদ, অখ্যাতি। *অমুকের কেচ্ছা গাওয়া* বললে সেই অর্থই দাঁড়ায়। আবার কেচ্ছার একশেষ বললে কেলেঙ্কারি অর্থটিই সামনে আসে।

হাজার এক রাত্রির আরব্য কিস্‌সা আমাদের কাছে আরব্য উপন্যাস হিসেবেই পরিচিত। শাহ্‌রিয়ার এবং শাহ্‌জমান নামে দুই রাজভ্রাতা তাঁদের দুই বিশ্বাসঘাতিনী মহিষীর কারণে ফকিরি গ্রহণ করে তীর্থে বেরিয়েছিলেন। পথে এক সুন্দরী তাঁদের সাবধান করে বলে : নারীর শপথকে বিশ্বাস করতে নেই। তাদের প্রেম-প্রণয় মিথ্যা। আসল কথা তাদের কামনার পরিপূরণ।—এ-কথা শুনে দুই ভাই দেশে ফিরে প্রতি রাত্রে একজন নারীকে বেগম হিসেবে গ্রহণ করে পরদিন তাকে হত্যা করতে লাগলেন। শেষে বিবাহযোগ্য কন্যার আকাল ঘটল। সেই সংকটকালে পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিলেন উজির-কন্যা বিদূষী শাহ্‌রাজাদ। বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ শাহ্‌রাজাদ কিস্‌সা-র জালে জড়ালেন সম্রাট শাহ্‌রিয়ারকে। কিস্‌সা বলা শুরু করলেন ছোট বোন দুনিয়াজাদকে। আড়াল থেকে সে-গল্প শুনে মুগ্ধ হলেন সম্রাট। গল্প চলতে লাগল রাতের পর রাত। কেটে গেল তিন-তিনটি বছর। ততদিনে শাহ্‌রাজাদ রাজার তিন সন্তানের জননী এবং প্রধান মহিষী। আর দুনিয়াজাদ শাহ্‌জমানের বেগম। শাহ্‌রাজাদের বলা সেই এক হাজার এক-টি কিস্‌সাই আরব্য উপন্যাসের মণিমুক্তা।

বাতেলা শব্দটি শিষ্ট সমাজে তেমন প্রচলিত ছিল না। এখন আর তা নেই। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দ হয়ে অফিসের সর্বকনিষ্ঠ কেরানির মুখে এই শব্দটির অবাধ গতায়াত। মসৃণভাবে বাতেলা চলছে সমাজের নিচুতলা ওপরতলা সব মহলেই। বাতেলা-র মূল অর্থ ধাপ্পা। বর্তমানে একটু সরে এসে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলা। এককথায় বলা যায় অতিশয়োক্তি। যিনি ধাপ্পা দেন তাঁর উদ্দেশ্য লোক-ঠকানো বা প্রতারণা করা। আর যিনি বড়ো বড়ো কথা বলেন বা বড়াই করেন, তাঁর উদ্দেশ্য নিজের সম্বন্ধে অপরের মনে উঁচু ধারণা বা বিস্ময় সৃষ্টি করা। বাতেলা-র সঙ্গে জুড়ে যায় নিন্দার্থক ফারসি অনুসর্গ '-বাজ'—বাতেলাবাজ। অর্থাৎ যিনি বাতেলা দেন। বাংলায় '-বাজ'-যুক্ত শব্দ আরও খুঁজে পাওয়া যাবে। সবক'টি নিন্দার্থক। যেমন, চালবাজ, চিটিংবাজ, ধড়িবাজ, ফাটকাবাজ, ফাঁকিবাজ, ফেরেব্‌বাজ, মামলাবাজ, রকবাজ, হামলাবাজ ইত্যাদি। অতি-সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে বাংলাবাজ শব্দটি। নারীসঙ্গ-লোলুপ মানুষের বিশেষণ আলুবাজ, মাগিবাজ।

বাতেলাবাজের সঙ্গে মিথ্যেবাদীর সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মিথ্যে একেবারে শূন্য থেকে উদ্ভূত। বাতেলা-র পায়ের তলায় সামান্য হলেও মাটি আছে। ধাপ্পাবাজের সঙ্গ আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু বাতেলাবাজ-কে নিয়ে আড়ালে-আবডালে ঠাট্টা-তামাশা করি। সে হয়ে ওঠে আমাদের কৌতুকের পাত্র।

বাতেলা শব্দের মূলে রয়েছে হিন্দি বাত্। আবার সংস্কৃত বাতুল (অর্থাৎ প্রলাপ বকে যে) শব্দের সঙ্গেও এর অর্থগত সাদৃশ্য দেখি। কারণ প্রলাপ যে বকে, তার পক্ষে বাড়িয়ে কথা বলা-ই স্বাভাবিক। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-র মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে চৈতন্য রায় রামানন্দকে বলেছিলেন : গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ। / আমার

বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস।। / আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। / অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥ আর একটি শব্দের মধ্যে বাতেলা-র উৎস থাকা সম্ভব। সেটি ফারসি বাকতাল্লা। বাতেলা-র সমার্থক বা প্রতিশব্দ হিসেবে এটিও লোকমুখে মাঝেমাঝে শোনা যায়। উত্তরাপথে বাতেলা-র ধ্বনিগত সাদৃশ্যে প্রচলিত একটি শব্দ *বাত্তেল্লা* < *সং-বার্তালু* (হিন্দি-বতোলা), যার অর্থ—অতিশয়োক্তিমূলক গল্প। দেখা যাচ্ছে, এখানেও 'অতি'-রূপটি থেকেই গেছে। কোনো ব্যক্তির অতিশয়োক্তিতে বিরক্ত হয়ে আমরা বলি আর বাত ঝেড়ো না। তখন বাত বলতে সেই অতিকথনকেই বোঝাই। কিন্তু বাতচিৎ শব্দে অর্থটি আবার ফিরে আসে স্বস্থানে, 'কথোপকথন'-এ।

এ প্রসঙ্গে বাতেলা-র বহু প্রচলিত সমার্থক কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। গাঁজা (গ্যাঁজা), গুল, গ্যাস, ঢপ ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঢপ ছাড়া বাকি তিনটি শব্দে রয়েছে ফেনায়িত ধূমায়িত বিস্তার। আবার গ্যাস দেওয়া এবং গ্যাস মারা-র মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্যাস দেওয়া হল অপরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিথ্যে স্তুতিবাক্য বা প্রশংসাবাক্য শোনানো। গ্যাস মারা ঠিক তা নয়। যিনি কোনো বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেন, তিনি শ্রোতার কাছে গ্যাস মারেন। ঢপ (দেওয়া), ঢপের চপ (খাওয়ানো), ঢপের কিত্তন (গাওয়া) মোটামুটি একই গোত্রের।

লক্ষণীয়, বক্তার বয়স, কর্মস্থান, শিক্ষা, রুচি, বুদ্ধিমত্তা অনুসারে ক্ষেত্রবিশেষে শব্দপ্রয়োগে তারতম্য ঘটে। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর মুখের ভাষায় যে শব্দ শোনা যায়, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার কাছে তা অপ্রত্যাশিত।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৯০ সালের ১ অক্টোবর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছিলেন, নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। এই ঘোষণার স্থান, কাল এবং পাত্রই জানিয়ে দেয়, কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য কী। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপর্যস্ত, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বলে পরিচিত মানচিত্রে পালাবদল বহুলাংশে সম্পূর্ণ। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রশক্তির যে ভারসাম্য চলে আসছিল, তার অবসান ঘটেছিল এই পালাবদলের ফলে। সুতরাং সময়টি নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্মঘোষণার মাহেন্দ্রক্ষণ বইকী। আর, যে দুই মহাশক্তির ভারসাম্য এতদিন জারি ছিল, তার একটির বিপর্যয়ের ফলে অন্যটি প্রবল হয়ে উঠবেই, দুই মেরুর টানাপোড়েনের অবসানে আন্তর্জাতিক শক্তি একটি মেরুতে কেন্দ্রীভূত হবেই, সুতরাং সেই প্রবল রাষ্ট্রের প্রধান ছাড়া কেই বা নতুন বিশ্বব্যবস্থার আগমনবার্তা জানাবেন? পাত্রটিও তাই যথাযথ ছিল। আর স্থান? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী চার দশকে বিশ্বব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রটি ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই প্রতিষ্ঠান, বিশেষত তার নিরাপত্তা পরিষদ ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং সেই ভারসাম্য বজায় রাখার সর্বাধিক পরিচিত প্রকরণ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ওই ঘোষণায় একটি ইঙ্গিত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, নতুন বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকাও পরিবর্তিত হবে। তার গূঢ় অর্থ : নতুন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তি তথা অদ্বিতীয় মেরু ওয়াশিংটনের প্রাধান্য রাষ্ট্রপুঞ্জকেও স্বীকার করতে হবে। এই ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যে জর্জ বুশের ইরাক অভিযান এবং সেই অভিযানকে বৈধতা অর্পণে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকার তাৎপর্য অবিসংবাদিত। বাগদাদে যথেচ্ছ মার্কিন বোমাবর্ষণ জানিয়ে দেয়, নতুন বিশ্বব্যবস্থা সত্য সত্যই কায়েম হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের আগে ওইভাবে ওই বোমাবর্ষণ সম্ভব ছিল না।

নতুন বিশ্বব্যবস্থার মূল চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-সামরিক। যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গেল এবং যে ক্ষমতার মেরুকরণ ঘটল আশির দশকের শেষে ও নব্বইয়ের গোড়ায়, তা অবশ্যই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা। কিন্তু এই পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মৌলিক নয়। মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল দুই শিবিরে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার, বিশেষত

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংকটের মূলে ছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। বলা বাহুল্য যে, সে বিপর্যয় অকস্মাৎ ঘটেনি, দীর্ঘ দিন ধরে তার কারণগুলি পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। এককথায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক দক্ষতার সাধনায় ব্যর্থ হয়। সেই ব্যর্থতাই তাদের রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ডেকে আনে। পুরানো বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়ে দুই শিবিরে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার ফলে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা সেই অর্থে বিশ্ব অর্থনীতির সন্তান। মার্ক্সীয় দর্শনে অর্থনীতির প্রধান ভূমিকার তত্ত্বটি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপর্যয়ের সত্য হয়ে ওঠে—ইতিহাসের পরিহাস বইকী।

কিন্তু ইতিহাসের পরিহাসপ্রিয়তা এখানে শেষ হয়নি। গত কয়েক বছরে নতুন বিশ্বব্যবস্থার গর্বিত প্রচারকদের নিয়েও ইতিহাস কম পরিহাস করেনি। একমেরু দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতির ভূমিকা ভালো করে উপভোগ করার সুযোগ পায়নি ওয়াশিংটন। নানা সমস্যায় ইতিমধ্যেই বিক্ষত তার আধিপত্য। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে, কিন্তু রাশিয়া আজও পরমাণুশক্তিধর, এবং ক্রমশই সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রবল ও দৃঢ়মূল রুশ জাতীয়তাবাদ। ওয়াশিংটনের পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির ময়দানে নানাদিক থেকে প্রতিযোগিতা আসছে, আসবে—ইউরোপীয় গোষ্ঠী এবং জাপানের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মহড়া নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একধরনের নীতি সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ এনে দিয়েছে এশিয়ার উদীয়মান মহাশক্তি—চীন। এখানেও অর্থনৈতিক সামর্থ্য দ্রুত সামরিক ক্ষমতার এক বিপুল সম্ভার সৃষ্টি করছে, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং পারমাণবিক ক্ষমতার সমন্বয়ে আগামী শতাব্দীতে চীন হয়ে উঠতে পারে প্রথম ও প্রধান প্রতিস্পর্ধী রাষ্ট্র। তৃতীয়ত, নতুন বিশ্বব্যবস্থার জঠরে জন্ম নিয়েছে নতুন সন্ত্রাসবাদ যাকে কোনো একটি রাষ্ট্র বা কোনো একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এককভাবে চিহ্নিত করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে, যে সন্ত্রাসবাদের কারবারিরা এখন অবলীলাক্রমে ক্রমশই উন্মুক্ত হচ্ছে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা কথিত ইতিহাসের অবসানে পুলকিত হয়ে যাঁরা ভেবেছিলেন, এবার ওয়াশিংটনের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের যুগ এল, তাঁরা এখন বিস্ফারিত নয়নে ওসামা বিন লাদেনদের কেরামতি দেখেছেন। শতাব্দীর শেষে এবং নবশতাব্দীর অভ্যুদয়ে বিশ্বব্যবস্থার নতুনত্ব নিয়ে আর উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করতে ভারত খুব দেরি করেনি। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নরসিংহ রাও আর্থিক নীতির কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে নেহরু-ইন্দিরা-রাজীব অনুসৃত বিদেশনীতি থেকে সরে আসতে প্রবৃত্ত হন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দুনিয়ায়, 'নির্জোট' অবস্থানে দাঁড়িয়ে দুই মহাশক্তির কাছে সুবিধা পাওয়ার বিশুদ্ধ সুবিধাবাদী বিদেশনীতির সুযোগ ফুরোয়, একমেরু দুনিয়ার মরু-রাষ্ট্রের কাছাকাছি যাওয়ার বিশুদ্ধ বাস্তববাদী বিদেশনীতি তার স্থান নেয়। গত কয়েক বছরে সেই নীতির রূপায়ণ আরো একটি ধাপ অগ্রসর হয়েছে। ওয়াশিংটনের কাছাকাছি যাওয়ার আগ্রহ থেকে এখন জন্ম নিয়েছে ওয়াশিংটনের বলয়ে নিজের স্থান করে নেওয়ার ব্যগ্রতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বার্থ তাতে। সরাসরি বা ষোলো আনা তাঁবেদার

রাষ্ট্রের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব জারি রাখার সমস্যা উপলব্ধি করে মার্কিন নীতিকাররা এখন অন্যধরনের কৌশল অনুসরণ করতে চাইছেন। প্রতিনিধি নিয়োগের কৌশল। বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে আঞ্চলিক নানা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী, তারা হবে ওয়াশিংটনের অংশীদার, সেই আঞ্চলিক নিরাপত্তার গোটা আয়োজনটির পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এই ছকে এশিয়ার স্থান স্বভাবতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং, ওয়াশিংটন পরিচালিত এশীয় আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভারত অংশিদারের ভূমিকা খুঁজছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় এটাই তার লক্ষ্য।

নভেলাইজেশন

তপোধীর ভট্টাচার্য

এই শব্দটি বিশ শতকের অনন্য উপন্যাসতাত্ত্বিক ও দ্বিবাচনিকতা তত্ত্বের প্রবক্তা মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর কল্যাণে বিশিষ্ট পরিভাষার মর্যাদা পেয়ে গেছে। এর বাংলা রূপান্তর করা যেতে পারে উপন্যাসীকরণ। যে-প্রক্রিয়ায় জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ উপন্যাস হয়ে ওঠে, এর তাৎপর্য কত অনেকান্তিক—তা এই পারিভাষিক শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নভেলাইজেশন বা উপন্যাসীকরণ কথাটার ভিত্তিমূলে ধারাবাহিক এক প্রক্রিয়ার দ্যোতনা অনুভব করতে হয় আমাদের। সেই সঙ্গে লক্ষ করতে হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভাবনার সঞ্চালক উপস্থিতিও। বাখতিন নভেলনেস বা উপন্যাসত্ব বলতে জীবনকেই বোঝান। সেই জীবন যাতে কোনো অস্তিত্ব কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। অপর সত্তাদের সঙ্গে আপন অস্তিত্বকে ভাগ করে নেওয়া মানেই কোনো-না-কোনো ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা। এই সক্রিয়তার প্রতিবেদনে দ্বিবাচনিকতা কেন্দ্রীয় সত্য। আর, দ্বিবাচনিক সত্যের বিশিষ্ট বিচ্ছুরণে একদিকে গড়ে ওঠে জীবনের পাঠকৃতি, অন্যদিকে উপন্যাসের বয়ান।

কোনো সংশয় নেই যে উপন্যাসীকরণ জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধনের চিহ্নায়ক; এ শুধুমাত্র কাহিনি ও কুশীলবদের মনোরঞ্জক বা ইচ্ছাপূরক গ্রন্থনার ইঙ্গিত নয়। ব্যক্তিকে সামাজিক স্বরে অন্বিত করার দায় যে পালন করে উপন্যাস, তাতে এই নভেলাইজেশনের ভূমিকাই প্রমাণিত। এর মধ্য দিয়ে উপন্যাস এই বার্তা পৌছে দিচ্ছে আমাদের কাছে : প্রতিটি সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিটি উচ্চারণই সামাজিক উচ্চারণ। অর্থাৎ উপন্যাসীকরণ মানে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও একক মুহূর্তগুলির অন্বয় সাধন ও সামাজিকীকরণ। এই চিন্তাসূত্রকে প্রসারিত করে বুঝতে পারি, সার্থক উপন্যাসে বহমান কালের ব্যাপকতর মাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বর্তমানের একক মুহূর্ত বা অবস্থান উপস্থাপিত হয় না। কেননা আমরা এমন দ্বিবাচনিক জগতের অধিবাসী যেখানে সার্বিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরোপুরি নিজের পথে কেউ বিকশিত হতে পারে না কখনো। প্রতিনিয়ত আমাদের অজস্র অপর সত্তার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, দ্বন্দ্বে-সংগ্রামে যুক্ত হতে হয়। এমনকী, নিজেরই সঙ্গে নিজের ব্যবধান তৈরি হয় কখনো কখনো; সেইসব মুহূর্তে নিজেরই মধ্যে অনুভব করি সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া। এইসব বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মাপে ও স্বভাবে পরিশীলিত করে এই প্রক্রিয়া।

তাতে যা ছিল বহমান মূল ধারার সঙ্গে আপাতভাবে সংযোগহীন, তা সংলগ্নতা অর্জন করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। এ যেন গণতন্ত্রীকরণেরও প্রস্তাবনা যাতে সামাজিক অস্তিত্বের প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া একরৈখিক ও একমাত্রিক নয়। দ্বিবাচনিক জগতে জীবনের কোনো তাৎপর্য স্বতশ্চল ভাবে দেখা দেয় না; নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাকে অর্জন করে নিতে হয়। তার মানে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি শেষ হয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না তাৎপর্য। দ্বিবাচনিকতার সীমা নেই কোথাও : এই উপলব্ধি উপন্যাসীকরণের সঞ্চালক। তাই উপন্যাসত্ব অন্বিষ্ট হলেও এই প্রক্রিয়া কোনো পিঞ্জর হয়ে ওঠে না। বরং ঘটনা-কুশীলব-কথকতার সমন্বয় সাধন করেও তা কথারূপকে আকরণোত্তর অর্থাৎ সীমাতিসায়ী বিন্যাসে উত্তীর্ণ করে। এই প্রক্রিয়ায় বাচনের শক্তি ও লাবণ্য যুগপৎ উদ্‌ভাসিত হয়। একদিকে যেমন ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে সাম্প্রতিক আয়তনে, তেমনই ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনাও প্রতিফলিত হতে পারে আজকের কথারূপে। এমন যদি না হত, উপন্যাসের আরেক নাম হত ওষধি এবং পাঠ-প্রতিক্রিয়ার আশ্চর্য রহস্য নিয়েও এত তত্ত্বকথা রচিত হত না।

উপন্যাসত্বের প্রকাশ হিসেবে জীবনকে যেহেতু দেখেছেন বাখতিন, উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ার অজস্র বিস্ফুরণকে তিনি যে কাব্যিক ও দার্শনিক মাত্রা দেবেন তা প্রত্যাশিতই। দ্বিবাচনিকতায়, উপন্যাসীকরণ নামক পরিশ্রুতির মধ্য দিয়ে যে তাৎপর্য ব্যক্ত হচ্ছে, তাকে চূড়ান্ত বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা উপন্যাস হয়ে ওঠার লিখন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে শেষ হয়ে গেলেও উপন্যাসত্ব সম্পর্কিত পাঠকের ধারণা একটি বিন্দুতে স্থির থাকে না। ফলে আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসীকরণ যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়েছিল, গ্রহীতার উপন্যাসত্ব বিষয়ক ধারণার অনিবার্য চাপে তা পুনর্বিবেচিত হতে পারে। বলা ভালো, হয়েও থাকে। সেক্ষেত্রে জীবন ও জগতের বিভিন্ন উপকরণ কীভাবে উপন্যাসের আধার ও আধেয় হয়ে উঠেছিল, সেই ধরন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও বিনির্মিত না হয়ে পারে না। সুতরাং গ্রহীতাকে যদি উপন্যাসের তাৎপর্যের নিয়ামক বলি, উপন্যাসত্ব কোনও অনড় বিন্দুতে স্থির থাকে না এবং উপন্যাসীকরণ বিষয়ে আমাদের পূর্বানুমান কিংবা প্রতীতি অবধারিত ভাবে বদলে যায়।

অতএব ভাবনার পুনর্নবায়নের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য-সন্ধানের দ্বিবাচনিকতা প্রমাণিত হচ্ছে বলে উপন্যাসীকরণও হয়ে উঠছে অনেক অর্থাৎ বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক ও বহুবাচনিক। তাহলে জীবনের মতো উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যমেও সব মুহূর্তেই নতুন সূচনার মাহেন্দ্রক্ষণ : শেষকথা বলে কিছু নেই। প্রতিটি ধারাই মোহনায় পৌঁছে উৎসে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। পুরোপুরি হারিয়ে যায় না কিছুই; প্রতিটি তাৎপর্য গড়ে ওঠে প্রত্যাবর্তনের উৎসব-মুখরতায় যাতে চলমানতা একমাত্র আধেয়। যদি এই ভাবনায় প্রাণিত হই, উপন্যাসীকরণের প্রক্রিয়ায় ও তার অভিব্যক্তিতে অজস্র উচ্চাবচতা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে। জীবন ও উপন্যাসের সমান্তরাল প্রতিবেদনে আমরা খুঁজে পাই অনেকার্থ-দ্যোতনার প্রতিষ্ঠা। জীবনের অন্ত নেই, তাই শেষ নেই উপন্যাসীকরণেরও। স্বর থেকে স্বরান্তরে যেতে যেতে অনবরত সমৃদ্ধ হয় জীবন, উপন্যাসের প্রকরণও হয়ে

ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই জীবনের মতো উপন্যাসও চিরমুক্ত। সমস্ত সমাপ্তি তাতে আপাত-সমাপ্তি।

উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেসব ভাববীজ ওতপ্রোত সম্পৃক্ত, তাদের মধ্যে রয়েছে চিহ্নায়কের সামাজিক বহুস্বরিকতা। উপন্যাসের বিভিন্ন উপকরণ যখন সত্যে সমর্পিত, তাদের বস্তুরূপ ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে চিহ্নায়ক-সত্তা। সময় ও পরিসরের প্রত্নায়, যাকে বাখতিন ক্রনোটোপ বলেন, তাদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। আর, আমাদের মনে রাখতে হয় এই কথা যে শিল্প মূলত প্রত্যুত্তর-যোগ্যতার অভিব্যক্তি। এই প্রত্যুত্তর-যোগ্যতাকে নির্মাণ করতে হয়। পাঠকৃতির নির্মিতি-বিজ্ঞান বা আর্কিটেক্‌টোনিস সম্পর্কিত বাখতিনের চিন্তাবীজ এইজন্যে উপন্যাসীকরণ আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উপন্যাস যেহেতু বিশিষ্ট সংগঠনেরও নাম, সম্বোধক ও সম্বোধিতের উপস্থিতিতে সম্বোধ্যমানতার (অ্যাড্রেসিভিটি) তাৎপর্য সম্পর্কিত বক্তব্যও মনে রাখতে হয়।

নভেলাইজেশন বা উপন্যাসীকরণ এইজন্যে জড়িয়ে যায় সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র, কার্যত পরস্পর-বিরোধী, অনুষঙ্গ-বিন্যাসে। এর অনেকার্থ-দ্যোতনার পরিসরে সক্রিয় থাকে নানা ভাবাদর্শের বিচ্ছুরণ, আধিপত্য-বিরোধী প্রতিবাচন জেগে থাকে কার্নিভাল। প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারি মতাদর্শ প্রাণিত বয়ানের সঙ্গে সমান্তরাল অপ্রাতিষ্ঠানিক বেসরকারি বয়ানের বিভিন্ন প্রকরণ পরিধির নৈঃশব্দ্য থেকে আলোকিত বাচনের দিকে উঠে আসতে থাকে। সেইসব প্রতাপের সংকেতগুলিকে অন্তর্ঘাত করে; এ ধরনের সমস্ত প্রয়াসই যে সার্থক হয়, তা কিন্তু নয়। কিন্তু এই প্রবণতা যুগে যুগে প্রত্নস্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে বলে উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ায় তার উপস্থিতি আবিষ্কার করা যায়। সাম্প্রতিক উপন্যাস পাঠে এইজন্যে এই প্রক্রিয়া নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও জটিল বিতর্ক তৈরি করেছে।

নভেলাইজেশন আমাদের মানব-কেন্দ্রিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে—এইজন্যে তার গুরুত্ব কোনো একটি শিল্পমাধ্যমে সীমাবদ্ধ নেই। এর তাৎপর্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ পুনর্গঠনের সক্রিয়তাও অর্জন করে নিচ্ছি।

নয়া উপনিবেশবাদ

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের পরিপূরক হিসেবেই নয়া-উপনিবেশবাদ বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির জন্ম হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে উপনিবেশবাদের আত্মপ্রকাশ। কার্ল মার্ক্স ১৮৫৩-৫৫ সালে সর্বপ্রথম *নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন* পত্রিকায় ঔপনিবেশিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। যদিও মার্ক্স ও এঙ্গেলস উভয়েই উপনিবেশবাদ সম্পর্কে নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন, তবুও মার্ক্স সর্বপ্রথম বললেন যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাঁচামালের উৎস ও যোগানের পীঠস্থান হল ভারত ও চীনের মতো উপনিবেশগুলি এবং এই উপনিবেশগুলি পরিণতিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। ইংরেজরা তাই ভারতবর্ষের মতো দেশকে পদানত করে, তার রাজশক্তিকে চূর্ণ করে, অর্থনৈতিক সম্পদকে লুঠ করে নিজেদের এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।

মার্ক্স-এর উপর্যুক্ত তত্ত্বকেই আরো বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করলেন বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম কাণ্ডারী লেনিন। তাঁর *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (১৯১৬), সংক্ষেপে 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থে লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যবাদ তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইমারত নির্মাণ করে অনুন্নত দেশগুলির ভগ্নস্তূপের ওপর। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে গেলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই উপনিবেশের প্রশ্নে লেনিন শ্রমিক বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিশ্ববিপ্লবের মৌল উপাদান হিসেবেই দেখেছেন। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ যেহেতু কালিক ও স্থানিক সেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার ভূমিকা ইতিবাচক হতে বাধ্য। কেননা শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান কাল ও মাত্রাভেদে পরিবর্তনশীল। সর্বত্র তার শক্তিও সমভাবে বণ্টিত নয়। ফলে অনুন্নত দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে দেশ ও কাল বিবেচনা করে অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণিগুলিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সঙ্গী করে নিতে হয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে অবশ্য বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন দেখা দেয়। মিত্রশক্তিগুলি ধীরে ধীরে ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল (স্যার জন মার্শাল) পরিকল্পনার

সাহায্যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি, বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির অর্থনীতিকে এক শক্তিশালী ও সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ফলে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয়। সদ্যোজাত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি তাদের অনুন্নত পরিকাঠামোর জন্য এবং অংশত তাদের অসমাপ্ত বিপ্লবের ফলে উন্নত দেশগুলির কাছে এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলতে কিছুই থাকে না। সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করেও তৃতীয় বিশ্বের ওপর প্রথম বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদ হল সাবেকি সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক পরিকল্পনার ও মতাদর্শের এক পরিমার্জিত ও পরিশোধিত রূপ। এমন কী স্তালিনোত্তর রাশিয়াও একইভাবে অনুন্নত দেশগুলির ওপর তার কর্তৃত্ব অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সৌজন্য : হাঙ্গেরি (১৯৫৬), চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৬৮) ও আফগানিস্থান (১৯৭৯)।

বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রগুলি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এমনকী ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিনদের ইরাক ও কসোভোর ওপর আক্রমণ, অধুনালুপ্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও ইথিওপিয়ায় অনুগত শাসকগোষ্ঠীর প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রিটেনের ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর সরাসরি আঘাত নয়া-উপনিবেশবাদী নীতির স্বাক্ষর বহন করছে। বস্তুত নয়া-উপনিবেশবাদ একুশ শতকের বিশ্ব-রাজনীতিতে অভিনব সংকটের সূচনা করেছে।

নয়া গণতন্ত্র

অমিতাভ চন্দ্র

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর সফল বলশেভিক বিপ্লবের পরিণতিতে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, আবির্ভাব ঘটেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের। পরবর্তী কালে ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীন বিপ্লবের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মহাচীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পৃথিবীতে এক নতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বিপ্লবোত্তর গণসাধারণতন্ত্রী চীনের। এই চীন বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে এই বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছিলেন মাও জে-দং (মাও সে-তুং নামে সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ) গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সফল রূপকার হিসাবে মাও জে-দং-এর সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তাই সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ও তত্ত্বচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ ভাবেই জরুরী। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিগুলিকে অনুসরণ করেই লেনিন তাঁর 'ঔপনিবেশিক থিসিস্'-এ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যে কর্মসূচি ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন, চীন বিপ্লবের পটভূমিকায় মাও জে-দং তার বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, এবং চীন বিপ্লবের নিজস্ব প্রয়োজনের নিরিখে এই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রে মাও জে-দং-এর তাত্ত্বিক সংযোজন ও অবদানগুলি বর্তমান বিশ্বে সামগ্রিক ভাবে 'মাওবাদ' (Maoism) বা 'মাও জে-দং-এর চিন্তাধারা' (Mao Ze-Dong Thoughts) নামে পরিচিতি অর্জন করেছে। মার্ক্সীয়-লেনিনীয় রাষ্ট্রচিন্তায় ও রাজনৈতিক দর্শনে মাও জে-দং-এর তাত্ত্বিক সংযোজন ও অবদানসমূহকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ধারাটি নিয়ত প্রবহমান। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্রচিন্তায় ও রাজনৈতিক দর্শনে মাও জে-দং-এর 'নয়া গণতন্ত্র'-এর তত্ত্বটি এক অভিনব সংযোজন ও অবদান হিসাবেই সুপরিচিত, এবং একই সঙ্গেই প্রবল ভাবে বিতর্কিত।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানত মাও জে-দং-এর উদ্যোগেই এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় প্রয়াসে চিয়াং কাই-শেক পরিচালিক জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ ভিত্তিতে জাপানী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক 'যুক্তফ্রন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েই মাও জে-দং-এর

নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের নিমিত্ত সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল : কারণ 'যুক্তফ্রন্ট'-ই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পথ, যার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি এই 'যুক্তফ্রন্ট' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং কুয়োমিন্টাং দলের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহ ও চরিত্রকে জনসমক্ষে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে দিতে পেরেছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত নির্বাচনের ভিত্তিতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে (Shensi-Kansu-Ninghsia Border Region) 'যুক্তফ্রন্ট' ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই নতুন শাসনব্যবস্থাকেই মাও জে-দং 'নয়া গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (New Democratic Republic) আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন। এই শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মাও জে-দং রচনা করেছিলেন তাঁর *On New Democracy* নামক পুস্তিকাটি। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত *On New Democracy* নামক এই পুস্তিকাটিকে মাও জে-দং তাঁর 'নয়া গণতন্ত্র' (New Democracy) নামক তত্ত্বটিকে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদে এক অভিনব সংযোজন হিসাবে এই তত্ত্বটির এক পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। সুতরাং মাও জে-দং-এর তাত্ত্বিক উপস্থাপনা 'নয়া গণতন্ত্র' একদিকে যেমন একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মতাদর্শ, আবার একই সঙ্গে এই তত্ত্বের অনুসারী একটি বিশেষ বিপ্লবোত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আয়োজন। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে চীনের ইতিহাস ও অবস্থার উপযোগী করে তোলার প্রয়াসেই মাও জে-দং কর্তৃক এই বিশেষ তত্ত্বটির উদ্ভাবন।

'যুক্তফ্রন্ট' পরিচালিত মুক্ত অঞ্চলগুলিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতিগুলিকে অনুসরণ করাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল একদিকে ভূমি সংস্কার, এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিকল্প একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ।

মাও জে-দং উদ্ভাবিত 'নয়া গণতন্ত্র'-এর তত্ত্বের উদ্দেশ্যাবলী ছিল মূলত দ্বিবিধ। প্রথমত, কুয়োমিন্টাং দলের শাসনব্যবস্থায় ও নেতৃত্বে চীনে পুঁজিবাদের যে প্রসার ঘটেছিল, তার বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এই তত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। মাও জে-দং-এর প্রধানতম উদ্দেশ্যই ছিল 'যুক্তফ্রন্ট'-এর পরিচালনায় চীনের প্রবহমান বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করা। কিন্তু পুঁজিবাদকে সুসংহত করার পরিবর্তে মাও পরিকল্পিত এই বিপ্লবের প্রধানতম লক্ষ্যবস্তুই হবে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র-এর বিকল্প একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যেটি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় হিসাবেই গণ্য হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়েই মাও জে-দং 'নয়া গণতন্ত্র' তত্ত্বটিকে উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তার কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন।

এই বিশেষ উদ্দেশ্যটিকে বাস্তবায়িত করার জন্যই মাও জে-দং 'নয়া গণতন্ত্র'-এর এই তত্ত্বটির ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এটিকে 'নয়া গণতন্ত্র'-এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ-পর্বের উপযোগী এই রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে তিনি

সাধারণভাবে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমত, সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণির সর্বময় নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা পরিচিত হয়ে আছে 'শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র' বা 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' (Dictatorship of the Proletariat) নামে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এই ব্যবস্থার আদর্শ উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, মাও জে-দং উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত একাধিক শ্রেণির যৌথ একনায়কতন্ত্র, যেটিকে তিনি তৎকালীন চীনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হিসাবে অনুভব করেছিলেন ও এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। মাও জে-দং-এর বক্তব্য ও যুক্তি ছিল যে, যেহেতু জাপানের সাম্রাজ্যবাদই ছিল সেই যুগে চীনের জনসাধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং যেহেতু নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চীনের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি অবস্থার চাপে জাপানি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সামিল হয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথ ভাবে 'যুক্তফ্রন্ট'-এ অংশ গ্রহণ করেছিল, সেহেতু চীনের ক্ষেত্রে এই যৌথ একনায়কতন্ত্রটি গঠিত হবে শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে। মাও জে-দং তাঁর বক্তব্য ও যুক্তির ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। যেহেতু চীনের ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধটি ছিল জাপ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনের জনসাধারণের, সেহেতু একমাত্র মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা ব্যতীত অপরাপর সব কটি শ্রেণিই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, এবং সেই কারণেই এই সব কটি শ্রেণিকে নিয়েই যৌথ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ-পর্বে এক অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় হিসাবে এই ধরনের একটি নতুন রাষ্ট্রশক্তি গঠন করাই ছিল চীনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভাবেই একান্ত প্রয়োজনীয়। মাও জে-দং-এর অভিমত অনুসারে চীনের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই বাস্তবভিত্তিক ও বাস্তব সম্ভাবনাসম্পন্ন।

১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর সফল চীন বিপ্লবের পরিণতিতে গণসাধারণতন্ত্রী চীন নামে যে নতুন রাষ্ট্রশক্তিটির গঠনে মাও জে-দং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেখানেও চারটি শ্রেণির এই যৌথ একনায়কতন্ত্রের ধারণাটি অব্যাহত ছিল। বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের এই রাষ্ট্রশক্তিটি 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' (People's Democratic Dictatorship) আখ্যায় অভিহিত ছিল। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তিটির এটি ছিল এক অভিনব নামকরণ।

১৯৫৪ সালে গৃহীত চীনের তৎকালীন নতুন সংবিধানেও 'নয়া গণতন্ত্র'ভিত্তিক 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র'-এর এই ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছিল। সংবিধানে বর্ণিত হয়েছিল যে, যদিও চীনের সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রকেই আকাঙ্ক্ষা করে, তবুও সমাজতন্ত্রে চূড়ান্ত উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন এই পর্যায়ে ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

'নয়া গণতন্ত্র'-এর এই বিশেষ পর্যায়টির অবসান চীনে ঠিক কোন্ বছরে হয়েছিল, তা নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই মতবিরোধ ছিল, এবং এই প্রসঙ্গে কোনো সুস্পষ্ট ও সঠিক বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে এই মতটিই গৃহীত হয়েছে যে, ১৯৫৬ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস আহ্বানের সময়টিই 'নয়া গণতন্ত্র'-এর পর্যায়ের অবসান এবং 'সমাজতন্ত্র'-এর সূচনা হিসাবে গণ্য করা হবে।

মাও জে-দং উদ্ভাবিত 'নয়া গণতন্ত্র'-এর দ্বিতীয় ভিত্তিটি হল অর্থনীতি। মাও-এর অভিমত অনুযায়ী 'নয়া গণতান্ত্রিক' অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও শিল্পগুলির জাতীয়করণ। এই জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একথাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বড় বড় জমিদারদের জমি জাতীয়করণ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। কিন্তু যেহেতু 'নয়া গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' নয়, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেমন শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়, 'নয়া গণতান্ত্রিক' এই অর্থনীতিতে তা করা হয় নি। তাই সাধারণভাবে বেসরকারি পুঁজির ক্ষেত্রে 'নয়া গণতান্ত্রিক' অর্থনীতিতে তাকে বহুল পরিমাণে খর্ব করে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সরাসরি সার্বিকভাবে তার অবসান ঘটানো হয় নি।

'নয়া গণতন্ত্র'-এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটি ছিল সাংস্কৃতিক। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের সংমিশ্রণে চীনে যে জনস্বার্থবিরোধী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা স্মরণে রেখে মাও জে-দং 'নয়া গণতন্ত্র'-এর উপযোগী পূর্ববর্তী জনস্বার্থবিরোধী সংস্কৃতির বিকল্প এক নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন। মাও এই নতুন ও বিকল্প সংস্কৃতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী এই নতুন সংস্কৃতি হবে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়, বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত চীনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সুস্থ ও সৃষ্টিশীল সমস্ত কিছুকেই গ্রহণ করে মাও এই নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতির অবৈজ্ঞানিক সমস্ত উপাদান কঠোরভাবে বর্জন করার ডাকও তিনি দিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শে এই নতুন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে পুষ্ট করে তোলার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার ওপরই তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মাও-এর অভিমত ছিল, জনস্বার্থে রচিত এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চীনের মানুষকে এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে মাও জে-দং এই বিষয়টির ওপরও জোর দিয়েছিলেন যে, এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে প্রকৃত গণমুখী। এর অর্থ হল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা জনস্বার্থ বিরোধী সংস্কৃতিকে বা তার উপাদানগুলিকে পরিহার করে এবং জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণাঙ্গ সঙ্গতি রেখেই 'নয়া গণতন্ত্র'-এর উপযোগী এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

মাও জে-দং এই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে, শুধু 'নয়া গণতান্ত্রিক' বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনেই নয়, ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত সমাজের পুনর্গঠনেও 'নয়া গণতন্ত্র'-এর আদর্শ, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী হবে।

নাগরিক সমাজ

প্রদীপ বসু

নাগরিক সমাজ সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার উদ্ভব পশ্চিমে সপ্তদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে। পশ্চিমে নাগরিক সমাজের এই ধারণার উদ্ভব সংকেত দেয় এক সামাজিক পরিবর্তনের, বিশেষত ব্যক্তির অধিকার, রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে তার এক নতুন ধরনের সম্পর্কের। নাগরিক সমাজের ধারণা এক আধুনিক ধারণা এইজন্যও যে অন্তত তাত্ত্বিক স্তরে এখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে একটা পরিষ্কার বিভাজন আছে, যে বিভাজন এর আগে ছিল না। লক ও হব্‌স-এর রচনায় নাগরিক সমাজের এক প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। দুইজনের তত্ত্বেই নাগরিক সমাজ এক কৃত্রিম সৃষ্টি। প্রকৃতি হল ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক আবাস, নাগরিক সমাজকে নির্মাণ করতে হয়। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন ও সমান, নাগরিক সমাজে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, কারণ তা না হলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

নাগরিক সমাজের যে ক্ষেত্র সেখানে ব্যক্তি তার সামাজিক সত্তার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই যে ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণ হতে পারে এটা সে বুঝতে পারে নাগরিক সমাজেই। হেগেল লিখেছিলেন, পারিবারিক বৃত্তে নয়, নাগরিক সমাজেই মানুষ তার সামাজিকতাকে উপলব্ধি করে। যেহেতু ব্যক্তি-মানুষের উন্নতি নির্ভর করে অন্য মানুষের উন্নতির উপর, তাই নাগরিক সমাজ মানুষকে সহযোগিতা, শ্রেষ্ঠতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা, এইসবের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। তাই নাগরিক সমাজের এক শিক্ষামূলক দিকও আছে। নাগরিক সমাজ মানুষকে যৌথভাবে কাজ করার মূল্য শুধু শেখায় না, এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে যৌক্তিক, স্বনির্ভর ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মূলে আছে এই যুক্তিপূর্ণ হিসেব যে অন্যের সাহায্য ছাড়া ব্যক্তি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তাই নাগরিক সমাজ যেমন মাত্রাতিরিক্ত আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইরকমই নিয়ন্ত্রিত করে মাত্রাতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতাকেও এবং এইভাবেই এক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মাত্রাধিক্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপর নাগরিক সমাজ তাই এক প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ, এই ছিল লিবারেল তাত্ত্বিকদের মত। গ্রামসি লিখেছিলেন, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং দমনমূলক রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে আছে নাগরিক সমাজ, ফলে অর্থনীতি ও রাষ্ট্র দুই-ই নাগরিক সমাজকে গঠিত করেছে।

লিবারেল তাত্ত্বিকরা, যেমন ডিটকেভিল, নাগরিক সমাজকে দেখেছেন এমন এক পরিসর হিসেবে যেখানে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে প্রতিহত করতে পারে। নাগরিক সমাজ হল সেই নাগরিক অধিকার ও আইনের ক্ষেত্র যা রাষ্ট্রপ্রদত্ত। এ হল নাগরিক অধিকার, স্বাধীন সভাসমিতি, প্রকাশ, প্রচার, বিতর্ক, যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্র। অন্যদিকে হেগেলীয়-মার্ক্সীয় পরম্পরায় নাগরিক সমাজ হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলনের ক্ষেত্র, এখানে অহংবাদী, স্বার্থসন্ধানী ব্যক্তি ক্রমাগতই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। এই পরিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বিরোধ সব সময়েই বিদ্যমান কারণ আগের যুগের সামাজিক বন্ধন অবলুপ্ত হয়েছে। মার্ক্সীয় ধারণায় তাই নাগরিক সমাজ হল এক অবিরাম বিরোধের ক্ষেত্র, যেখানে কোনো সার্বিক নৈতিকতার বিধি নেই। নাগরিক সমাজের এই নৈতিকতার প্রশ্নটি কান্টের রচনায়ও বার বার এসেছে। মোট কথা হল নাগরিক সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার সব প্রচেষ্টায় যে সমস্যাকণ্টকিত প্রশ্নগুলি বারবার এসেছে তা হল এই সম্পর্কগুলির : পাবলিক ও প্রাইভেট, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পাব্লিক নৈতিকতা, ব্যক্তি ও সমাজ। নাগরিক সমাজ হল সেই পরিসর যেখানে বাস্তব ব্যক্তি, তার প্রয়োজন, স্বার্থ, বিচারবুদ্ধি নিয়ে তার 'স্বার্থপর' লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা চায়। কারণ নাগরিক সমাজ যদি গঠিত হয়ে থাকে গণ পরিসরের স্বীকৃত রীতিনীতির মাধ্যমে, তা গঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত পরিসর আছে বলেই। ফলে প্রাইভেট ও পাব্লিকের একটা ডায়ালেকটিক সব সময়ই নাগরিক সমাজে কাজ করে।

এই প্রসঙ্গেই নাগরিক সমাজের পাব্লিক স্ফিয়ার (Public Sphere) বা গণ পরিসরের কথা আলোচনা করা যায়। কিছু তাত্ত্বিকের মতে যেমন হান্না আরেন্ট, আধুনিক রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজের উদ্ভবের ফলে এই গণপরিসরের ক্রমশ পতন ঘটেছে। অন্যদিকে হ্যাবারমাস বলেছেন গণ পরিসরের উত্থান ও পতনের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে আধুনিকতার ইতিহাসেই। হ্যাবারমাসের তত্ত্বে এই গণপরিসরকে দেখা হয়েছে বুর্জোয়া হিসেবে, যেখানে স্বাধীন সম্পত্তির মালিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির অংশীদার হিসেবে সৃষ্টি করেছে এই পরিসর এবং এটা সৃষ্টি হয়েছে যুক্তি, হিসেব ও অবাধ যোগাযোগের মাধ্যমে। হ্যাবারমাসের মতে এই পরিসর লিবারেলও বটে কারণ এই পরিসরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কিছু নির্দিষ্ট অধিকারও আছে (বাক্‌স্বাধীনতা, স্বাধীন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, যোগাযোগ), একই সঙ্গে আছে ব্যক্তির প্রাইভেসির অধিকারও। এই নিয়েই গঠিত হয়েছে নাগরিক সমাজের প্রাইভেট ও পাব্লিক বলয়। এই নাগরিক সমাজ নীতিতে গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্রক্ষমতার আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে এবং তাকে এক সীমার মধ্যে রাখতে সক্ষম। বর্তমান যুগে অবশ্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে নাগরিক সমাজ সত্যি প্রতিহত করতে পারে কি না এই প্রশ্নে নাগরিক সমাজের এক শক্তিশালী সমালোচনা করেছেন মিশেল ফুকো। উনিশ শতকে নাগরিক সমাজের এক শক্তিশালী সমালোচক ছিলেন মার্ক্স নিজে। ফুকোর এই সমালোচনা তাঁর সমসাময়িক তাত্ত্বিকদের চেয়ে মার্ক্সের কথা বেশি মনে করিয়ে দেয়। মার্ক্সের মত ফুকোও বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক ক্ষমতার প্রণালীগুলিকে। ফুকো বেছে নিয়েছেন নাগরিক সমাজের মূল

ক্যাটিগরিগুলিকে—যেমন, আইন, অধিকার, সাবজেক্টিভিটি, প্রচার, সামাজিকতা ইত্যাদি এবং দেখিয়েছেন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে প্রতিরোধ বা সীমিত করার বদলে এরা রাষ্ট্র ক্ষমতাকেই সমর্থন ও সহায়তা করে।

বর্তমান সময়ে নাগরিক সমাজের প্রশ্নটি আবার নতুন করে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষত পূর্ব ইউরোপে পালাবদলের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ'-এর প্রশ্নটি যেমন আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে, সেই রকম ভারতের মতো উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্রে নাগরিক সমাজের গুরুত্ব ও কার্যকারিতার প্রশ্নও উঠে এসেছে (দ্রষ্টব্য: জীন কোহেন ও অ্যান্ড্রু আরোটো, *সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিয়োরি*, ১৯৯৪)। ভারতের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন 'জাতীয়' নাগরিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের রাজনীতিতে এই শহুরে নাগরিক সমাজের বাইরে জনগণের এক বিশাল অংশ রয়ে যায়, যাদের ওয়েলফেয়ার বা কল্যাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। কেউ কেউ নাগরিক সমাজের বাইরে এই বৃহত্তর সমাজকে 'পলিটিক্যাল সোসাইটি' বা রাজনৈতিক সমাজ আখ্যা দিয়েছেন। এই রাজনৈতিক সমাজই জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। নাগরিক সমাজের মতো এই সম্পর্ক অধিকারের নয়, বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বস্তুত ভারতের মতো দেশে দুর্বল নাগরিক সমাজের সীমানার মধ্যে থেকে এই বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের প্রশ্ন বিচার করা সম্ভবও নয়। গান্ধী তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে এই জনগণ ও ভবিষ্যত রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও এই কলাকৌশল কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে গণতন্ত্রই রাজনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, নাগরিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যা কোনোদিনই সম্ভব ছিল না।

নারীবাদ

যশোধরা বাগচী

নারীবাদের কোনো একক সংজ্ঞা আজকের দুনিয়ায় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার গোড়ার কথার মধ্যে যদি প্রবেশ করবার চেষ্টা করি, তাহলে হয়ত নারীবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা একটু স্বচ্ছ হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণির অভ্যুত্থানের মধ্যেই আজকের নারীবাদের বীজ নিহিত আছে। বুর্জোয়া শ্রেণি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ওপরে দাঁড়িয়েছিল, তার শ্রমবিভাজনের রূপটি ছিল লিঙ্গভিত্তিক অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ অনুসারে পুরুষের জন্য বরাদ্দ হল বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী ভূমিকা। এই ভূমিকাকে মুখ্য ভূমিকা বলে স্বীকার করে নেওয়াটাকেও স্বাভাবিক মনে করা হয়েছিল। আর মেয়েরা তার পরিপূরক হিসাবে পেল অন্দরমহলে প্রজননমুখী ভূমিকা। সন্তানপালন, পরিচর্যা মারফত রোজকার দৈনন্দিন জীবনের নবীকরণ, এই হল বুর্জোয়া সমাজে স্বীকৃত নারীর সামাজিক ভূমিকা। এখানে উৎপাদনের তুলনায় প্রজনন হয়ে রইল গৌণ। সেজন্যই এই সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়া নারীর সামাজিক অবস্থানকে Second Sex (দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত) বলে অভিহিত করলেন প্রতিবাদী স্বরে।

এই প্রতিবাদ অবশ্য আগে থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল। বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের মধ্য থেকে আঠার শতকের বুদ্ধিজীবী মেরি উলস্টোনক্রাফ্‌ট্‌ এবং উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল মেয়েদের শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে অন্দরমহলে আটকে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এঙ্গেলস ব্যক্তিগত মালিকানাতে পরিবার ও রাষ্ট্রের উৎস সন্ধানে নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের গোড়াপত্তন করেন।

পশ্চিমে এইসব কণ্ঠস্বর আবার নতুন করে শোনার এবং শোনানোর প্রবণতা দেখা দিল উনিশ শতকের ষাটের এবং সত্তরের দশকে—যখন ইউরোপ ও আমেরিকাতে নারীবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ল। এই সময় থেকেই নারীবাদ সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ধনতন্ত্র যখন সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে মরিয়া তখন দেখা গেল মেয়েরা রয়ে গেছে দারুণ বৈষম্যের শিকার। কাজের জগতে তাদের স্বীকৃতি কিছুই বাড়েনি, বরং কমেছে। সৃজনশীল শিল্পে তাদের জন্য ধরা থাকে এক ইচ্ছাকৃত এবং সম্মিলিত বিস্মৃতি। ইতিহাসে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ থাকে না, সাহিত্যে নারীচিত্রণ প্রায়শই হয় পুরুষের যৌনতার শিকার। বাজারি সভ্যতার প্রধান

বাহক যে গণমাধ্যম সেখানে মেয়েদের চিত্রায়ণ ক্রমশ অবদমিত হয়ে পুরুষের লালসার ইন্ধন জোগায়। মেয়েদের ওপরে হিংসাত্মক আচরণের স্বরূপটিও সুখকর নয়। পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিকতার মুখোশ পরে অত্যাচার করা হয় নারী ও শিশুদের। নারী আন্দোলন এই নতুনভাবে দেখার রীতিগুলিকে আন্দোলনের কাজে লাগায়।

সচেতনভাবে নারীবাদ যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকায় তখন পিতৃতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। মতাদর্শগত ভিত্তিকে আশ্রয় করে যেসব নারীবাদ গড়ে উঠেছিল, বিভিন্ন নামে তাদের অভিহিত করা হয়, যেমন, উদারনীতিক নারীবাদ (Liberal Feminism), সমাজবাদী নারীবাদ (Socialist Feminist)। যে নারীবাদ পিতৃতন্ত্রকেই একটি স্বতন্ত্র শোষণব্যবস্থা বলে মনে করে তাকে র‍্যাডিকাল নারীবাদ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। র‍্যাডিকাল নারীবাদ অনেকাংশে পুরুষবিরোধী।

তবে নারীর স্বীকৃতির লড়াই নিয়ে এই বিভিন্ন মতাবলম্বী নারীবাদের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে যথেষ্ট, যতই এগুলিকে আপাতবিরোধী মনে হোক না কেন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দেখলেও বেশিরভাগ নারীবাদী মনে করেন মেয়েদের শরীর বিশেষ করে তাদের প্রজননক্ষমতা ও যৌনতার ওপরে তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরো অনেক বেশি বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং কাজের অধিকার ও তার স্বীকৃতি এইসব ক্ষেত্রেই তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াটা সমাজের ন্যায়বোধের পরিপন্থী। এরফলে উন্নয়নও লক্ষ্যচ্যুত।

নারীবাদের উৎপত্তি পশ্চিমি শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও এর উপযোগিতা আজকে সমাজের শোষিত অংশের মধ্যে বহুলস্বীকৃত। দাসপ্রথা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা যে গরিব খেটে খাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়কে চরম অবহেলার জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন প্রতিবাদ এসেছে কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদের মধ্য থেকে—যাদের মধ্যে নোবেলজয়ী টোনি মরিসন অন্যতম। তেমনি পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে যে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব হয় সেখানেও সমাজ, পরিবার এবং সাম্প্রতিককালে বাজারের শোষণের বিচিত্র বীভৎস চেহারা বেরিয়ে এসেছে নারীবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে। শিল্পী-সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, গণমাধ্যমের প্রতিবাদী কর্মী, সকলেই সামিল এই কর্মযজ্ঞে।

যে নারী পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ কাজ করে এক-তৃতীয়াংশ স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করে (যার মধ্যে আবার শ্রেণি এবং ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য বেশিরভাগ নারী বঞ্চিত) তার স্বীকৃতি এবং সমানাধিকারের লড়াইয়ের নাম নারীবাদ। মনে রাখতে হবে নারী এবং পুরুষ সমান মানে তারা এক নয় এবং পুরুষের অধিকার বেশি বলে কিন্তু তারা-ই মনুষ্যজাতির আদল নয়। অর্থাৎ নারীকে নারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর অর্জিত ক্ষমতার বিশেষ দিকগুলি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নারীবাদ অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন মতাদর্শ থেকে গড়ে ওঠা নারীবাদ আজকের চিন্তাজগতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের কষ্টিপাথরে এর শেষ যাচাই। নারীবাদের অন্যতম শ্লোগান Personal is Political—নারীবাদী চেতনা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

ন্যাচারালিজম

রাখী মিত্র

দর্শনে আর সাহিত্যে রিয়ালিজম ভিন্নার্থবাহী হলেও, ওই দুই ক্ষেত্রে ন্যাচারালিজম প্রায় সমার্থক। দর্শনশাস্ত্রে ন্যাচারালিজম বলতে বোঝায়, এই মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুবিশ্ব ও ঘটনা পরম্পরাই প্রাকৃতিক, তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে যে কোনো কিছুকেই সম্পূর্ণত বুঝে ওঠা সম্ভব। ফলত মেটিরিয়ালিজমের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে সাহিত্যে ন্যাচারালিজমের সূত্রপাত। সেখানে রিয়ালিজমের ক্রমপরিণতি হিসেবে চিহ্নিত এই ন্যাচারালিজম।

রিয়ালিজমের পরিণতি হিসেবে ন্যাচারালিজমকে চিহ্নিত করার আগে মনে রাখা দরকার ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের তত্ত্ব। জীব অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রবল আলোড়ন তোলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। সেই মতানুসারে মানবসৃষ্টি ও মানবসভ্যতার অগ্রসৃতি নেহাতই একটি প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র; সেখানে মানুষ যে সভ্যতার কালে-কালান্তরে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে তাও শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে। অর্থাৎ, সোজা কথায়, মানুষ এই হিসেবে উন্নততর একটি প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। জৈব প্রয়োজনে ও তার তাড়নাতেই মানবজীবন অতিক্রান্ত হয় বলে মনে করেন ডারউইনপন্থীরা। সেই হিসেবে খাদ্য-বাসস্থান ও বংশরক্ষার তাগিদেই মানবজীবনের সিদ্ধি সীমাবদ্ধ। ন্যাচারালিজমের প্রবক্তারা এই দিক থেকেই মনে করেন ব্যক্তিচরিত্র 'হেল্পলেস প্রোডাক্টস অফ হেরিডিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'।

১৮৮০ সালে এমিল জোলার লেখা 'দ্য এক্সপেরিমেন্টাল নভেল' শীর্ষক রচনাটিকে ন্যাচারালিজমের ইশতেহার হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে তিনি বলেন, ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক মানুষের রুচি আবেগ সংবেদনশীলতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করবেন। রসায়নবিদ যেভাবে বস্তুবিশ্বের সমস্ত যৌগকে কতিপয় মৌল উপাদানে বিশ্লিষ্ট করেন, সাহিত্যিকও সেইভাবে বিশ্লিষ্ট করবেন আবেগ ও সংবেদনকে। বলা বাহুল্য, ন্যাচারালিস্টদের কাছে ডারউইনের সঙ্গেই গৃহীত হয়েছেন তেইন। রেস-মিলিউ আর মোমেন্ট-এর মধ্যে বেঁধে তেইন দেখিয়েছিলেন ব্যক্তিসত্তার বিকাশে পরিবেশ ও সময়ের অনিবার্য প্রভাব।

জোলার লেখায় ন্যাচারালিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সার্থক হলেও, এর প্রবক্তা নিঃসন্দেহে ফরাসি ঔপন্যাসিক ফ্লোরেয়ার। তাঁর লেখা *মাদাম বোভারি* (১৮৫০)তে

একইসঙ্গে রিয়ালিজমের চূড়ান্ত প্রকাশ ও ন্যাচারালিজমের সূচনাও। অন্যান্য ন্যাচারালিস্ট লেখকদের মধ্যে আছেন, গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, গি দ্য মোপাসা-র মতো ফরাসি লেখকরা, আর মার্কিন লেখকদের মধ্যে আছেন স্টিফেন ক্রেন, হ্যামলিন গারল্যান্ড, জ্যাক লন্ডন প্রমুখ। জার্মান ও রুশ সাহিত্যেও এই ন্যাচারালিজম প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলা সাহিত্যে বস্তুত রিয়ালিজমের সঙ্গে ন্যাচারালিজম মিলে মিশে প্রকাশিত হয়। বা বলা ভালো ন্যাচারালিজমের হাত ধরেই রিয়ালিজমের চর্চা শুরু হয় এখানে। জোলা মানবের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করে মানুষের আধিভৌতিক তথা জৈবসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এমিল জোলা 'মেটাফিজিক্যাল ম্যান'-এর মৃত্যু ঘোষণা করে 'ফিজিওলজিক্যাল ম্যান'-এর আগ্রাসীসত্তার কথা বলেছিলেন। সেই 'ফিজিওলজিক্যাল ম্যান' বাংলা সাহিত্যে পা রেখেছিল জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্যে। পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর বহু রচনায় নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কোনো কোনো গল্পে প্রকৃতির অধীনস্থ মানুষ দেখা দিয়েছে।

রিয়ালিজমের এই রূপকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি। একে 'রিয়ালিটির কারিপাউডার' বলে এখানে তিনি লক্ষ করেছেন 'লালসার অসংযম'। শরৎচন্দ্রও সহমত পোষণ করেননি ন্যাচারালিস্টদের সঙ্গে। তাঁর মতে 'আর্ট জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সেটা নেচার নয়'।

মানবসত্তাকে চূড়ান্তরূপে অস্বীকার করা এই ন্যাচারালিজম, না বাংলা সাহিত্যে না আন্তর্জাতিক সাহিত্যে দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। তবে এ বিলীন হয়েছে বা তা বিলীয়মান এমন কথাও বলা যাবে না। এখনও কদাচিৎ কোনো কোনো ছোটগল্পে এই ফিজিওলজিক্যাল ম্যান উঁকি দেয়।

ন্যাটো (N. A. T. O.)

অনীক চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিমেরু প্রবণতা লক্ষ করা যায়—অর্থাৎ দুই বৃহৎ শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির চালিকাশক্তি হবার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে শুরু হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা Cold War। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় দুই বৃহৎ শক্তিই আক্রান্ত হবার মানসিকতায় ভুগতে থাকে। পরমাণু শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। এবং উভয়েই অপরের দ্বারা আক্রান্ত হবার চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পূর্ব ইউরোপের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরের দ্বারা আক্রান্ত হবার চিন্তার পাশাপাশি দুই বৃহৎ শক্তিই ইউরোপে নিজেদের অনুগামী দেশগুলির সামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। মূলত এই চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় ইউরোপের দুটি প্রধান সামরিক জোট—NATO এবং Warsaw Pact; প্রথমটির নেতৃত্ব দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়টির সোভিয়েত ইউনিয়ন।

NATO বা North Atlantic Treaty Organization-এর জন্ম ১৯৪৯ সালে। মজার কথা হল, NATO-র জন্মের কারণ যতটা না সোভিয়েত-ভীতি, তার চেয়েও বেশি ছিল জার্মান-ভীতি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রধানত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের তত্ত্বাবধানে যখন পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য ব্রাসেলস্ চুক্তি (Brussels Pact) স্বাক্ষরিত হল, তখন চুক্তিভুক্ত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানির আগ্রাসী পুনরুত্থান রোধ করা। ব্রাসেলস্ চুক্তি হল NATO-র পূর্বসূরি। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাসেলস্ চুক্তিভুক্ত দেশগুলি অনুভব করে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং সামরিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থের, যে-অর্থের জোগান দিতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিক বৃহৎ শক্তি। এর পরেই উদ্যোগ শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে আরো বৃহৎ একটি জোট তৈরি করবার। প্রায় বছরখানেক আলাপ-আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে North Atlantic Treaty স্বাক্ষরিত হয়,—জন্ম হয় NATO-র। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির ফলে NATO সোভিয়েতবিরোধী সামরিক জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ যে-জোট তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়েছিল জার্মান-ভীতির কারণে, জোট গঠন সম্পূর্ণ হবার সময় থেকেই মার্কিন নেতৃত্বের ফলে সেই জোটের কর্মসূচি সোভিয়েত ভীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। জন্মলগ্নে ১৯৪৯ সালে NATO-র সদস্য সংখ্যা ছিল ১২,—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, কানাডা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, আইসল্যান্ড, নরওয়ে এবং পর্তুগাল। যদিও NATO-তে অভ্যন্তরীণ বিবাদ ছিল—ফ্রান্স অনেকক্ষেত্রেই মার্কিন প্রাধান্য নীরবে মেনে নেয়নি,—তবুও ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে NATO সোভিয়েত-বিরোধী রাজনৈতিক ও সামরিক জোট হিসাবে নিজেকে অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

North Atlantic Treaty-র পঞ্চম ধারা (Article V), যাকে এই চুক্তির প্রাণকেন্দ্র বলা হয়ে থাকে,—ঘোষণা করে যে, চুক্তিভুক্ত কোনও দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে চুক্তিবদ্ধ অন্য সব দেশ আক্রান্ত দেশকে সামরিক সাহায্য প্রদান করবে এবং আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয় NATO। এই জোটের ওপর আমেরিকার প্রভাব এতটাই ছিল যে NATO-র সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে সবসময়ই বহাল থাকতেন একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসার। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা তিন লক্ষেরও বেশি সেনা নিয়োগ করে পশ্চিম ইউরোপে। এই সময় অত্যাধুনিক মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঠে পশ্চিম ইউরোপ। অথচ মজার ব্যাপার হল যে, এত সমর সজ্জা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় NATO-কে উল্লেখযোগ্য কোনও সামরিক অভিযানে যেতে হয়নি। NATO-র প্রথম সক্রিয় সামরিক অভিযান ঘোষিত হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরে, ১৯৯৪ সালে বসনিয়ায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UNO) শান্তিসেনাকে সাহায্য করতে জাতিপুঞ্জেরই তত্ত্বাবধানে বসনিয়ায় সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে NATO। তবে ১৯৯৫ সালে বসনিয়ায় NATO বাহিনীর বোমাবর্ষণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। রাশিয়া এই বোমাবর্ষণের নিন্দায় সোচ্চার হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে কসোভো এবং ২০০১ সালে ম্যাসেডোনিয়ায় সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে NATO। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে NATO-র প্রথম সামরিক অভিযান ঘোষিত হয় ২০০১ সালেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর। পশ্চিম ইউরোপের নেতৃত্বে NATO সেই সময় মার্কিন অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংকল্পে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একেই কি বলা যাবে কালের পরিহাস? যে পশ্চিম ইউরোপকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় রক্ষা করতে আমেরিকার নেতৃত্বে তৈরি হল NATO, সেই NATO-র অন্যতম সামরিক অভিযান ঘোষিত হল ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর আমেরিকার সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার সংকল্পে! আর এই ঘোষণার নেতৃত্ব দিল মার্কিন অর্থ ও অস্ত্রে বলীয়ান পশ্চিম ইউরোপ!

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর NATO-র আকৃতি এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। NATO-র সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের ফলে পূর্ব ও

পশ্চিম ইউরোপের মতপার্থক্য দূরীভূত হয়। পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক এবং হাঙ্গেরি NATO-র সদস্যপদ গ্রহণ করে। এছাড়াও স্পেন, গ্রিস, নেদারল্যাণ্ডস্ ও টার্কি (তুরস্ক) NATO-র অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম জার্মানির স্থান নেয় নতুন ঐক্যবদ্ধ জার্মানি। NATO-র বর্তমান কর্মসূচি হল আরো পুব দিকে এগিয়ে চলা (Eastward Expansion)। ভবিষ্যতে NATO-র আরো প্রসার ঘটানোর প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রসারের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যারা NATO-র সদস্যপদ প্রার্থী, যেমন ইস্টোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, ম্যাসেডোনিয়া এবং আলবানিয়াকে NATO-র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাশিয়া অবশ্য NATO-র এই 'পূর্বগামী' কর্মসূচিকে ভালো চোখে দেখছে না। রাশিয়ার মতে, পূর্ব ইউরোপে NATO-র প্রসার আগ্রাসী এবং রাশিয়া-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। আর যারা NATO-র 'পূর্বগামী' কর্মসূচির সমর্থক, তাদের মতে পূর্ব ইউরোপের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে NATO-র এই প্রসার অবশ্য প্রয়োজনীয়। পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশের অভিমতও একইরকম।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে NATO জোর দিচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মসূচির ওপরে। আর রাশিয়ার ভয় এখানেই। তবে কি NATO ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর সামরিক মুখোশকে আড়াল করতে চাপিয়ে নিয়েছে অর্থনীতির সুন্দর এবং গ্রহণীয় মুখোশ? রাশিয়ার এই সন্দেহ ও 'পূর্বগামী' কর্মসূচির প্রতি তার আপত্তি দূর করতে NATO তৈরি করেছে কিছু নতুন পথ। এই পথের অন্যতম হল 'শান্তির সহযোগী' (Partnership for Peace) প্রতীকী সদস্যপদ (Symbolic Membership)। এই প্রতীকী সদস্যপদ, যা অবশ্যই প্রকৃত সদস্যপদ (Actual Membership) নয়, গ্রহণ করেছে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ। ভবিষ্যতে NATO-র প্রসারের মাধ্যমে প্রতীকী সদস্যদের অনেকেই প্রকৃত সদস্যপদ লাভ করবে। তবে রাশিয়া এই প্রকৃত সদস্যপদ গ্রহণ করবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ১৯৯৫ সালে বসনিয়ায় এবং ১৯৯৯ সালে সার্বিয়ায় NATO-র বোমাবর্ষণ রাশিয়ার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। ঘরের কাছে রাশিয়ার সীমান্তে NATO-র এই বোমাবর্ষণ অবশ্যই বিব্রত করেছে রাশিয়াকে। সে কারণেই NATO-র 'পূর্বগামী' কর্মসূচিকে বিরোধিতা করছে রাশিয়া। ভবিষ্যতই বলে দেবে নতুন অর্থনীতির মোড়ক কতটা সাফল্য দেবে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংগঠন বা NATO-কে।

ন্যাশনালিজম

সেমন্তী ঘোষ

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের একটা বড় অংশ ধরে সারা পৃথিবীতে নানা আন্দোলন-বিপ্লব-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের রাজনীতি, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস আমরা সমানেই পড়ে আসছি বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষিতে। কিন্তু, ঠিক কী বুঝি আমরা 'জাতীয়তাবাদ' বলতে, কীভাবেই বা অন্যান্য ধরনের রাজনীতিক বা সামাজিক মতবাদ থেকে আলাদা করা যায় একে, কিংবা, ঠিক কোন্ কোন্ কারণে হঠাৎ আধুনিক যুগে এই মতবাদের এত অসীম প্রতিপত্তি হল বিভিন্ন দেশের সমাজে—এইসব প্রশ্নের ব্যাখ্যায় অনেকদিন পর্যন্তই ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিকরা খুব তৎপর ছিলেন না। কিছু কিছু লেখাপত্র অবশ্যই হয়েছে আগে, কিন্তু কেবলমাত্র সত্তরের দশকের শেষ থেকেই বেশ একটা সমাজ-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয়েছে। হঠাৎ নতুনভাবে এই অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠার কারণ কী—এ নিয়েও ভাবনার অবকাশ আছে নিশ্চয়ই। অনেকেই মনে করবেন—ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন অংশে 'জাতীয় রাষ্ট্র' (Nation-State) তৈরি হওয়ার পরেও জাতীয়তাবাদের ভাবধারার যে অব্যাহত গতি দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের ভিতরকার আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলির মধ্যে (যাদের আমরা সাধারণত 'ethnic movements' বলে থাকি)—সেটাই 'জাতীয়তাবাদের' স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিষয়ে এখনকার চিন্তাবিদ্‌দের নতুন করে ভাবাচ্ছে।

এইসব আলোচনা-গবেষণা থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে উঠেছে—'জাতীয়তাবাদের' সঙ্গে 'আধুনিকতার' এক স্পষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। অ্যান্টনি স্মিথ এবং তাঁর অনুসরণে জন ব্রুইলি মনে করেন—ঠিক 'গণতন্ত্র' বা 'ব্যক্তিস্বাধীনতার' মতোই—জাতীয়তাবাদ হল আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের এক আবশ্যিক ফল। আর্নস্ট গেলনারের আলোচনার আমরা দেখি কীভাবে আধুনিক যুগের শিল্প-নির্ভর সমাজের প্রয়োজনে শাসকশ্রেণি তৈরি করে তুলেছে জাতীয়তাবাদের মতো এক আকর্ষক মতবাদ। গেলনারের এই আলোচনায় একটি বড় ফাঁক অবশ্য থেকেই যায়। আমরা বুঝি না সমাজের সমষ্টিগত কল্পনা (Collective Imagination) কীভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণা সৃষ্টিতে ও প্রসারে সাহায্য করে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন এই ফাঁক পূরণ করে প্রথমে স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা

করেন—কেন, কীভাবে এই সমষ্টিগত কল্পনাশক্তি আধুনিক কালে এক 'জাতীয় বন্ধনের' বোধের জন্ম দিল। যতই বাস্তব আর সত্য মনে হোক, 'জাতি' শেষ পর্যন্ত এক 'কল্পিত সমাজ' (Imagined Community) ছাড়া কিছুই নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের নানা প্রয়োজনে এই কল্পনা তৈরি হয়ে ওঠে, আর ধনতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্ট এক মহোন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সম্ভব হয় এর প্রসার। জাতীয়তাবাদের নানারূপ আলোচনা করেছেন অ্যান্ডারসন—'ক্রিওল' (Creole) জাতীয়তাবাদ, যা দেখা গিয়েছিল আমেরিকা মহাদেশে, ইউরোপের ভাষা-নির্ভর (Linguistic) জাতীয়তাবাদ, বা রাশিয়ার সরকারি (Official) জাতীয়তাবাদ। সব কটি ধরনেরই মূল ভিত্তি কিন্তু ছিল এই নতুন যুগের প্রচার-তন্ত্রের (Print Capitalism) মধ্যেই।

বিংশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে পাশ্চাত্যশক্তির বিরুদ্ধে যেসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে—তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কিন্তু মেলে না অ্যান্ডারসনের লেখায়। তিনি এগুলিকে মনে করেছেন, নিতান্তই পশ্চিমের ওই মূল তিন রকম জাতীয়তাবাদের আদলে গড়ে ওঠা আন্দোলন-মাত্র। পশ্চিমের 'মৌলিক' (Modular) ধরন সচেতনভাবে অনুসরণ করে ছড়িয়ে পড়ে উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এক দশক আগে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Nation and its Fragnrents* (১৯৯৩) বইতে বেশ জোর দিয়েই তর্ক করেছেন অ্যান্ডারসনের আলোচনার এই অংশটুকু নিয়ে। তিনি সংগতভাবেই প্রশ্ন তোলেন—সবটাই শুধু 'অনুসরণ'? কিছুই কি নতুন ছিল না উপনিবেশের এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে? তাহলে কীভাবে উপনিবেশিত মানুষেরা পশ্চিমের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য (Difference) ঘোষণা করল? এই পার্থক্যের বোধের উপরে ভিত্তি করেই কি উপনিবেশী জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়ে ওঠে নি?

এইসব জরুরি প্রশ্ন তুলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করেন উপনিবেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়ে। এই জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা ছিল—একই সঙ্গে পশ্চিমি ধ্যানধারণা গ্রহণও করা প্রয়োজন (যেমন, 'জাতীয়তাবাদ' ধারণাটি নিজেই, এবং এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অন্যান্য নানা ধারণা পাশ্চাত্য আধুনিক ভাবধারার প্রত্যক্ষ অংশ) আবার, উপনিবেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য কোনোভাবে পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে এক 'পার্থক্যবোধ'ও তৈরি করতে হবে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উপনিবেশী জাতীয়তাবাদের বিকাশ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়—এক ধরনের বিভাজনের সাহায্যে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয় উপনিবেশে। তিনি আমাদের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে দুই ভূমিতে দেখতে বলেন—'বহির্ভূমি' (Outer Domain) আর 'অন্তর্ভূমি' (Inner Domain)। বহির্ভূমিতে থাকে জাগতিক (Material) নানা ভাবনা এবং ক্রিয়া—রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এর অন্তর্গত। 'অন্তর্ভূমি' তৈরি হয় অধি-জাগতিক (Spiritual) ভাবনা দিয়ে—ধর্ম বা সামাজিক নীতিবোধ, সংস্কৃতি এইসব পড়ে এই অংশে। উপনিবেশী জাতীয়তাবাদ যখন তৈরি হয়ে ওঠে, উপনিবেশিত মানুষ বহির্ভূমিতে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা গ্রহণ করে নেয় দ্বিধাহীনভাবে, কিন্তু অন্তর্ভূমিতে নিজেদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে জোরের সঙ্গে।

এমন স্পষ্ট কোনো বিভাজন সত্যিই সম্ভব কিনা ভাবধারার ক্ষেত্রে, সে বিষয়ে কিন্তু তর্ক উঠতে পারে। প্রাচ্য দেশগুলির সমস্ত জাতীয়তাবাদীর চিন্তাভাবনাকে এভাবে এক মাত্রায় দেখে বিচার করা সংগত কিনা—এ প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তোলা মূল প্রশ্নটির গুরুত্ব এসব সত্ত্বেও থেকেই যায় যে এখন উপনিবেশী জাতীয়তাবাদের গভীরতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তখনই সমাজের সমষ্টিগত কল্পনার (Collective Imagination) ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে।

নিউওয়েভ বা ন্যুভেলভাগ

সত্যজিৎ চৌধুরী

নিউওয়েভ বা ন্যুভেল ভাগ ১৯৫০-এর দশকের শেষে ফরাসি সিনেমার এক নবতরঙ্গ। মূলত বিখ্যাত ফরাসি পত্রিকা *কাহিয়ের দ্যু সিনেমা*-র লেখক-সমালোচকরাই চলচ্চিত্র পরিচালনায় নেমে বিশিষ্ট এক শিল্পাদর্শের পত্তন করেন—যা ন্যুভেল ভাগ নামে পরিচিত। ফরাসি নিউ ওয়েভের দুটি পর্ব—১৯৫৮-৬২ এবং ১৯৬৬-৬৮

ফরাসি দেশের সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি অগ্রাহ্য করার মেজাজ প্রকট ছিল। নিউওয়েভ আন্দোলন জেগে ওঠে পঞ্চম রিপাবলিক-এর সময়ে যখন রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণহীন সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সে সময়েই আলজেরিয়ায় চলেছিল ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম। ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা সাধারণভাবে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতির প্রবল বিরোধী ছিলেন। রাজনৈতিক পরিবেশে যেমন, তেমনি চলচ্চিত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপত্তি অত্যন্ত দৃঢ় তখন। একই ছকে ছবি বানানোর বাধ্যবাধকতা, ছবি তৈরির পদ্ধতিতে—অর্থাৎ স্টুডিও-নির্ভর শ্যুটিং, চিরাচরিত অভিনয় প্রথা—এসব রীতিনীতি *কাহিয়ের দ্যু সিনেমা*-র সমালোচকদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা বলতেন, ফিল্ম একটি শিল্পবস্তু। তা যদি হয় তবে স্রষ্টা-পরিচালকের নিজস্ব সংকল্প এবং অভিপ্রায় সব কিছুর উপরে স্থান পাবে। শিল্পী-ব্যক্তি হিসেবে পরিচালক স্রষ্টার পূর্ণ মর্যাদা পাবেন। তিনিই রচয়িতা, auteur। এ আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন পত্রিকার সহ সম্পাদক আঁদ্রে বাজাঁ (১৯১৯-৫৮)। প্রতিষ্ঠান বিরোধী চলচ্চিত্র সমালোচকেরা নিজেরাই ছবি করতে এলেন। ইতালির নিও রিয়ালিজম আন্দোলনের দৃষ্টান্ত এঁদের সামনে ছিল। তাই সম্বল সংগতি কিছু না থাকা সত্ত্বেও এক ঝাঁক নতুন পরিচালক সীমাবদ্ধ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ফরাসি সিনেমায় নতুন শৈলী প্রবর্তন করলেন। ন্যুভেল ভাগ আন্দোলনের নেতৃ ভূমিকায় ছিলেন ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (১৯৩২-১৯৮৪), ডাক রিভেত্তে (জ. ১৯২৮) জাঁ-লুক গোদার (জ. ১৯৩০) এবং ক্লদ শ্যাব্রল (জ. ১৯৩০)। ফরাসি ফিল্মে প্রচলিত নির্মাণ সৌকর্যের ধারণা এঁরা ভাঙেন, আনেন পরিচালকের ব্যক্তিগত দর্শন ও নির্মাণ পদ্ধতির অনন্যতা। বাণিজ্যিক সফলতার কৌশল বর্জন করে এঁরা ব্যক্তিগত নন্দনরুচি অনুযায়ী স্বাধীন পরীক্ষার পথ খুলে দিলেন। শিল্পী হিসাবে পরিচালক কোনো বাণিজ্যতন্ত্র বা বাঁধাধরা প্রথাপ্রকরণের পরবশ নয়, ফরাসি সিনেমায় এই এক বিকল্প অবস্থান তৈরি হল। স্বীকৃত

হল, ফিল্ম পরিচালকের শিল্পীব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করবে, ফিল্ম অন্য শিল্পসৃজনের মতো পরিচালকের নিজস্ব শৈলীর সিগনেচারের পরিচয়ে পরিচিত হবে।

ফিল্ম নির্মাণের কৃৎকৌশলের দিক থেকে এঁরা অনেক সময়ে আলফ্রেড হিচককে (১৮৯৯-১৯৮০) অনুসরণ করতেন। লক্ষ্য ছিল অল্প খরচে ছবি করা। সিনেমা শিল্পে মন্দা চলায় অনেক প্রযোজক কম খরচের ছবির জন্য টাকা জোগান দিতে সহজেই রাজি হতেন। ফলে প্রতিবাদী ও পরীক্ষামূলক কাজে আগ্রহী ন্যুভেল ভাগ পরিচালকরা, ছবি করার সুযোগ পেলেন। বিরাট বাণিজ্যিক সাফল্য এঁরা আশা করতেন না, কিন্তু রুচির হাওয়া বদলে যাওয়ায় দর্শক পাওয়া যেত। ছবি একেবারে মার খেত না। নিউ ওয়েভ আন্দোলনে ফরাসি শিল্পের প্রকাশভঙ্গি এবং বিষয়বস্তুতে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন এল। ঠাসবুনোট গল্প-বলার বদলে সাংকেতিক ঘটনা বিন্যাসে ফিল্মে ধরা হল বাস্তবের নানা সমস্যা। এজন্য মসৃণ সম্পাদনা প্রায় বর্জিতই হল। এল দ্রুত দৃশ্য বদল এবং জাম্প কাট-এর পদ্ধতি। ফলে ফিল্মে এল তীব্র গতি। আখ্যান বা চরিত্র বিকাশের পরম্পরা, যুক্তিক্রম, দর্শক নিজস্ব কল্পনায় ভরাট করে নিতে পারবে মনে করা হল। অনেক সামাজিক বিধি-নিষেধ ভেঙে দেওয়া হল। যেমন নরনারীর যৌন জীবনের বাস্তব দেখানো হল খোলামেলা ভাবে। অনেক সময়ে নারী-ব্যক্তিত্বের উপরে জোর পড়ল বেশি। নারীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে গল্প-বোনার ঝোঁকের পেছনে সমাজে নারীর অধিকার স্বীকারের নীতি কাজ করেছে মনে করা যায়। নতুন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পায় ১৯৫৯ সালে কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে। ত্রুফোর 'লে কত্র সঁ কু' পরিচালনার জন্য এবং অ্যালাঁ রেঁনে 'হিরোসিমা মন্ আমুর' ছবির জন্য আন্তর্জাতিক সমালোচকদের পুরস্কার পেলেন। এর ফলে দেশে দেশে ন্যুভেল ভাগ আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে যায়।

ন্যুভেল ভাগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের স্থিতিকাল ধরা যায় ১৯৬৬-৬৮। এ পর্বের শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং চলচ্চিত্রের ইতিহাসেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদায় ভূষিত পরিচালক জাঁ-লুক গোদার। দ্বিতীয় পর্বে ন্যুভেল ভাগ আন্দোলনে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের তীক্ষ্ণ বিতর্কিত বিষয় এসে গেছে এবং এনেছেন গোদার। যাবতীয় সামাজিক রাজনৈতিক অনাচার, ভ্রষ্টতা, নীতিহীনতাকে আঘাত করা গোদারের সৃজন-নীতির অঙ্গ। ফরাসি দেশে এ সময়ে দ্য গল-এর স্বৈর-শাসনের কাল। এই সময়ের প্রবল ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ১৯৬৮-র মে মাসে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। সামাজিক রাজনৈতিক বিক্ষোভের সেই অভিঘাত যেন ফিল্মের ভাষাকে আঘাত হানার তীরমুখ অস্ত্র করে তুলল এবং এই শাণিত ভাষার স্রষ্টা জাঁ লুক গোদার। পরিচালকের ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক মতাদর্শ এত তীব্র প্রত্যক্ষভাবে ফিল্মে এর আগে আর কখনো অভিব্যক্তি হয়নি। প্রতিবাদী ফিল্মের এক অমোঘ ভাষা গোদার নির্মাণ করেছেন। এ তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি। পৃথিবীর যেখানেই প্রতিরোধ প্রতিরোধের বাস্তব ফিল্মে ধরার চেষ্টা হয়েছে, অনিবার্যত গোদারের প্রভাব পড়েছে সেই সব সংগ্রামী ফিল্মের নির্মাণে। ফিল্ম তৈরির প্রযুক্তিগত রীতিনীতি গোদার গ্রাহ্য করেননি। হাতে ধরা ক্যামেরা নিয়ে পথে

প্রান্তরে শুটিং করতে যান তিনি। ছবিতে আসে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। সেই অমসৃণতাকেই তিনি কাজে লাগান। দৃশ্যের বিন্যাসেও সর্বদা তথাকথিত শিল্পিত ধরনধারণ উপেক্ষা করেন। প্রয়োজনে প্রক্ষিপ্ত ভয়েস ওভারে বা চরিত্রের সংলাপে প্রাবন্ধিকের মতো যুক্তিবিন্যাস শুরু করে দিতে পারেন। জীবন-ভাষ্যের দিক থেকে বা ফিল্ম-ভাষার দিক থেকে—সর্বত্রই গোদার এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। ফরাসি পরিচালকদের মধ্যে আর কেউ তাঁর মতো প্রতিষ্ঠানকে, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে আক্রমণ করেননি। গোদার চর্চায় অভিজ্ঞ ফিল্মডাবুকদের মনে আসবে, ভিয়েতনামের উপরে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের অনাচার গোদারের বিভিন্ন ছবিতে কীভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ হত। তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রেথলেশ, পিয়েরো লে ফ্যু, ম্যাসকুলিন-ফেমিনিন, ব্রিটিশ সাউন্ডস্ (টেলিফিল্ম), প্রাভদা, ন্যুমেরো দ্যু। সমকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মনে না রাখলে তাঁর ছবির ভেতর জগতে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না সর্বদা। কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁর ছবিতে এসে যায় আলজেরিয়ার, ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ, কখনো বা মার্ক্সবাদী তত্ত্বগত বিতর্ক, যেমন প্রাভদায় এসেছে রিভিসনিজ্‌ম্ বিষয়ে বিতর্ক।

ফরাসি নিউওয়েভের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অবশ্যই জাঁ-লুক গোদার। তাঁর সাহসিক পরীক্ষায় ফিল্মের অভ্যস্ত ভাষা সম্পূর্ণ বদলে গেল, যথার্থ আধুনিক ফিল্মের নতুন পর্ব শুরু হল তাঁর কাজে। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে ('অ্যান ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভ' প্রবন্ধ, *আওয়ার ফিল্মস্ দেয়ার ফিল্মস্*) বলা যায়, গোদারের আঙ্গিক তার বিষয়-ভাবনা থেকেই গড়ে ওঠে। সমকালীন সন্নিহিত জীবনের দ্বন্দ্ববিরোধ, ভাঙাগড়া রূপ দেবার জন্য আধুনিক জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়া মানুষদের আনেন তাঁর ছবিতে। এসব চরিত্রের সত্যিই জমাট কোনো গল্প নেই জীবনে। সংহতিহারা, ছিন্নভিন্ন জীবন। এ জীবনের রূপ নির্মাণে গোদার অমসৃণ, সৌষম্যহীন এক আঙ্গিক ব্যবহার করেন—যার মধ্যে জুড়ে দেওয়া যায় তথ্যচিত্রের টুকরো, সাংবাদিক বয়ান, বিজ্ঞাপন কিংবা প্রশ্নোত্তরের পর্ব। আপাতদৃষ্টিতে গোটা উপস্থাপনাটাই মনে হতে পারে বেখাপ, যার পদে পদে ঝাঁকুনি। কিন্তু চলচ্চিত্র ভাষার শুদ্ধতা তাতে আহত হয় না। তাঁর ছবি দেখতে হয় অত্যন্ত সতর্কভাবে, চোখের পেছনে তীব্র সজাগ মগজ দিয়ে।

ফরাসি নিউওয়েভ আন্দোলন সারা বিশ্বে প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের অন্যধারার ছবি নিয়ে ভাবিত পরিচালকেরা এ আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করেছেন। বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগ ছাড়াও যে ছবি করা যায়, বাণিজ্যিক ফিল্মের প্রমোদ পণ্যের উৎপাদন রীতির বাইরে এসেও যে কিছু কাজ করা যায়, বিশেষত শিল্পী-ব্যক্তি হিসাবে পরিচালক যে স্বল্প আয়োজনে নিজের কথা বলার জন্য ছবি করতে পারেন এ শিক্ষা কোনো কোনো পরিচালক আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। নিউওয়েভ-আন্দোলন থেকে বিশেষ করে গোদার সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় অবশ্য গল্পরেখা ভেঙে দিয়ে গোদারের পদ্ধতিতে ছবি করেননি। নিউ ওয়েভের আঙ্গিকে, নীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন মৃণাল সেন। বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে

এসে পরিচালকের ছবি, auteur ফিল্ম যে করা যায়, খুব অল্প খরচে 'ভুবন সোম' (১৯৬৯) হিন্দি ছবিটিতে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য ছবিতেও গল্পরেখা ভেঙে দিয়ে তীব্র সংবেদনাময় মুহূর্ত-মালা-নির্ভর শৈলী দেখা যায়—যার মূলে ন্যুভেল ভাগ চলচ্চিত্র নীতির প্রভাব আছে। মৃণাল সেন-এর সফলতা একটা সাহস এনেছিল সাময়িকভাবে। হিন্দিভাষায় বেশ কিছু অল্পটাকায় তোলা ভালো ছবি হয় ৬০-এর দশকের শেষ থেকে। শ্যাম বেনেগল, বাসু চ্যাটার্জি, মণি কাউল, কুমার সাহানি—এঁরা পরীক্ষামূলক কাজের সফলতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। জীবনভাষ্য বা প্রকাশশৈলী কোনো দিক থেকেই এঁদের অবশ্য এক সুতোয় গাঁথা যায় না। তবু ন্যুভেল ভাগ আন্দোলনের দূরতর ঢেউ এঁরাই ভারতে বয়ে আনেন মানতে হয়।

নিউ লেফট

শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে

১৯৬০-এর দশক বিশ্বজুড়ে 'নয়া বাম' তত্ত্বের উদ্ভাবনা ও প্রয়োগের যুগ। ভিয়েতনামে মার্কিনি আগ্রাসন এই তত্ত্বকে জোরদার করেছিল, যদিও ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কই এই 'নয়া বাম' তত্ত্বের মূল উদ্ভাবক। এইভাবে বলা ভাল যে, ষাটের দশকে নতুন এই বিপ্লবী ঝোঁককে একটা নতুন দার্শনিক মাত্রা ও প্রতীক দান করেছিল ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণার বেদী থেকে বিচ্যুত, চীন কার্যত সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। 'ওল্ড লেফ্‌ট্' বা 'সনাতন বাম দর্শন' তখন পার্টি-লাইন-আঁকড়ে-থাকা দাসত্বের শিবির হিসাবে চিহ্নিত। তারই প্রেক্ষিতে এক নতুন মার্ক্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নয়া বাম-গোষ্ঠীর মার্ক্সবাদ।* নতুন এই তাত্ত্বিকরাও কেউ কেউ ছিলেন নিখাদ বুদ্ধিজীবী যেমন জাঁ পল সার্ত্র, হাবার্ট মার্কিউজ; কেউ ছিলেন পুরোপুরি বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে, যেমন চে গুয়েভারা; ছিলেন ফ্র্যান্জ্ ফ্যানন-এর মতো তাত্ত্বিক লেখক ও গেরিলা যোদ্ধাও। এঁরা প্রত্যেকেই জোর দিয়েছিলেন গোঁড়া মার্ক্সবাদীদের বিপরীতে মতাদর্শগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার-এর ওপর।

এতদিন ধরে কেতাবি মার্ক্সবাদীরা দুনিয়া জুড়ে শ্রমিকশ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার মার্গদর্শনের তত্ত্ব ঘোষণা করছিলেন। তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে 'নয়া বাম' তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করলেন—সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজেই বিপ্লবের বাহক হিসাবে আসবে শ্রমিক শ্রেণি—মার্ক্সের এই ঘোষণা জীর্ণ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণিই যে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণি এই তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়ে 'নয়া বাম'-পন্থীরা বললেন সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকরা বুর্জোয়া শ্রেণিরই রূপান্তর মাত্র। তার বদলে আজকের দুনিয়ায় 'নয়া প্রলেতারিয়েত' বা নতুন অধোবর্গ বা সর্বহারা শ্রেণিকে খুঁজে পেতে হবে তৃতীয় বিশ্বে।

আলজিরীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তত্ত্ববিদ ফ্রানজ ফ্যানন এই 'অধোবর্গ' শ্রেণি বা নয়া প্রলেতারিয়েত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র কৃষক ও গ্রামীণ

---

* এঁদের মার্ক্স *Das Capital*-প্রণেতা অর্থনীতিবিদ মার্ক্স নন, Scientific Determinism-এর প্রবক্তা মার্ক্স নন; বরং শুরুর দিকের দার্শনিক সমাজতান্ত্রিক মার্ক্স, অনেকটা তাঁদের নিজেদের মতো হেগেলের অনুসরণে ভাববাদী মার্ক্স।

মজদুরদের, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ 'ঘেটো' বা বস্তির সমাজের বিদ্রোহী মানুষদের, আর পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া সমাজের থেকে খসে-পড়া কিছু শিকড়হীন মানুষদের। হ্যারিংটন তাঁর *The Other America* বইতে দেখালেন আমেরিকার সাদা চামড়ার শ্রমিক মানুষদের ঘরের দারিদ্র্য ও শোষণের চিহ্ন। আমেরিকার দক্ষিণের কৃষ্ণাঙ্গদের আইনি সাম্যের জন্যে লড়াই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বর্ণবৈষম্যের গোপন ক্ষত, লড়াকু মেয়েটার খেটে খাওয়ার লড়াইয়ে দাবি জানাল স্থায়ী উপার্জনের (আমেরিকার চলমান নারী আন্দোলনের যা ছিল একটি দিক) অধিকারের। ইউরোপে প্রচলিত 'একমাত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ বামশক্তির' বিপরীতে আমেরিকায় নয়া বাম শক্তি জন্ম দিল 'বহুমাত্রিক সংখ্যালঘু অধোবর্গ' শিবিরের। একজন মার্কিন যুব আন্দোলনের নেতা বললেন, 'পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল এবং এর পর উৎপাদনের উপকরণগুলিকে আয়ত্তে আনা। আন্তর্জাতিক যুব বিপ্লব পশ্চিমি দুনিয়ার প্রত্যেকটি সংস্থায় চূড়ান্ত ভাঙন, গণ-বিদ্রোহ ও সম্পূর্ণ অরাজকতা দিয়ে শুরু করবে। লম্বা কান-ঢাকা চুলওয়ালা তরুণ-তরুণী, কৃষ্ণাঙ্গ, সশস্ত্র নারী, শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্ররা ক্ষমতার হাল ধরবে।'** এই মতবাদীরা বললেন শ্রমিকশ্রেণি কলুষিত হয়ে গেছে এবং বুর্জোয়া স্থিতাবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে, তাই ছাত্র-যুবকদের সমাজের প্রত্যন্ত অংশে অবস্থিত অন্যান্য শ্রেণিগুলিকে (Marginal Sections of Society) অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৯৫৯ এই 'নয়া বাম' অনুসারী ছাত্র শিবির SDS বা Students for Democratic Society তৈরি হয়, (১৯৬৪ সালে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের উদ্যোগে মূলত ছাত্রস্বার্থে আন্দোলন হয়), যারা অচিরেই রাজনৈতিক দাবিদাওয়া তোলে। এরা জানায়, ধনতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু সব কিছুই তৈরি হয় পুঁজির বিকাশ ও বিস্তারের লক্ষ্যে, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালগুলিতে ছাত্রদেরও তালিম দেওয়া হয় সংকীর্ণ আমলাতন্ত্রের স্বার্থে। নয়া বাম ছাত্ররা এই চক্রান্ত রুখবে।

এই বিদ্রোহী ছাত্রশক্তির ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল মার্ক্সের চেয়েও C. Wright Mills-এর লেখা। মার্কিন দেশে 'নয়া বাম' আখ্যাকে জনপ্রিয় করেছিলেন এই মিলস্-ই। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বই *The Power Elite* (১৯৫৬), যেখানে তিনি নির্দিষ্ট শাসকশ্রেণির পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন এলিট জনগণের দ্বারা শাসনের মডেল। SDS-এর গৃহীত ১৯৬২ সালের দলিলটি শেষমেষ কমিউনিজম্-কেই তত্ত্ব হিসাবে খারিজ করে জানায় দুনিয়া জুড়ে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে এই তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে।

'নয়া বাম' চিন্তাধারার আরেকটি চমকপ্রদ দিক হল হিংসার রাজনীতির মহিমা কীর্তন। বৈপ্লবিক ক্রিয়ায় হিংসা জরুরি জেনেও মার্ক্স তাকে নৈরাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসাবেই দেখেছিলেন। ফ্রান্জ্ ফ্যানন হিংসাকে দেখলেন শোধনকারী শক্তি হিসাবে

** উদ্ধৃতিটি রণবীর সমাদ্দারের একটি প্রবন্ধ থেকে 'বাংলার বিদ্রোহী যুব-ছাত্র আন্দোলন' (১৯৬৬-৭০) পৃ. ১৩৮, ষাট-সত্তর, অনুষ্টুপ, বইমেলা ১৯৯৮ নেওয়া।

(Cleansing force)। উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী জগতের শেষ প্রতিনিধি বার্টান্ড রাসেল, জাঁ পল সার্ত্র কিংবা হার্বার্ট মার্কিউজ, এলরিজ ক্লিভার, স্টোকলি কারমাইকেল, আর. ডি. লেইং প্রমুখ এই তত্ত্বকে সমর্থন জানালেন। 'Violence frees the native from his inferiority complex and from his despair and inaction, it makes him fearless and restores his self-respect' ফ্যাননের অনেক আগেই সার্ত্র হিংসার জয়গান গেয়ে বলেন গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসের আশ্রয় না নিলে রাজনীতিতে ন্যায় আনা অসম্ভব। (*Les Mains Sales*—১৯৮৪; *He Diableet le Bon Dieu*--১৯৫১)। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই Critique de la raison dialectique-এ সার্ত্র লিখলেন সমস্ত রাজনৈতিক সমাজ ও সংগঠন সন্ত্রাসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করে। যেহেতু অভাব-ই মানুষকে পরস্পরের শত্রু বানায়, সেহেতু সেই সমাজ তৈরি করতে হবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্বারা যেখানে মানুষ বাধ্য হবে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে সমষ্টির প্রয়োজনের কাছে বলি দিতে।

আর এক তাত্ত্বিক হার্বার্ট মার্কিউজও শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। স্টোকলি কারমাইকেল কালো চামড়ার মানুষদের অধিকার আদায়ে মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে বাতিল করে হিংসাকেই অনিবার্য অস্ত্র হিসাবে তুলে ধরেন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যকেই হাতিয়ার ঘোষণা করে কারমাইকেল নয়া বাম তত্ত্বকে মার্ক্সবাদ থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

মার্ক্সবাদকে বাদ দিয়ে এই নয়া মার্ক্সবাদীদের উত্থান, যা কমিউনিজমকে বাদ দিয়ে প্রায় 'সর্বতত্ত্বসমন্বয়বাদে'র নামান্তর ছিল, বেশিদিন টেঁকেনি। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এত বেশি খোলামেলা, মুক্তমনস্কতা তৈরি করার চেষ্টা হয় যে কোনো সাধারণ আদর্শ ঘোষণা করা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদের জটিল প্রক্রিয়া, তার শাখা-উপশাখাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এই অস্বচ্ছ মানবতাবাদ কোনো অস্ত্রই ছিল না। ভিয়েতনাম থেকে পরবর্তীকালে আমেরিকা নিজেকে সরিয়ে নিলে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অঙ্গনে ক্রমশ নিস্তব্ধতা নেমে আসে—১৯৬৯ সালে SDS-এর অধিবেশন বানচাল হয়ে গিয়ে কার্যত নয়া বাম শিবির ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীকালে 'পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি' তত্ত্বের সূত্র ধরে পোস্ট-মডার্নিজম বা উত্তর-আধুনিক মতবাদও শ্রেণিস্বার্থের বদলে 'আইডেনটিটি' বা 'সত্তা'র আদর্শ তুলে ধরে, যা মূলগতভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। সত্তর ও আশির দশকে 'পোস্ট-মার্কসিস্ট' তাত্ত্বিকরা 'শ্রেণিবাদ'-এর তত্ত্ব খারিজ করেন। ফরাসি নয়া বাম চিন্তাবিদ লুই অ্যালথুসার (১৯০৮-৯০) গ্রামসি-র অনুকরণে 'আধিপত্যবাদী মতাদর্শের' তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। পূর্ব ইউরোপে ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নানা স্তরে ও পর্বে 'মতাদর্শ অবসানের' তত্ত্ব প্রচারে উৎসাহ দিয়ে অন্যভাবে 'নয়া বাম' আন্দোলনে নতুন মাত্রা দান করেছে।

নিউ হিস্টরিসিজম

স্বপন চক্রবর্তী

নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ সাহিত্যের ইতিহাসমনস্ক বিচারের একটি ধারা, যদিও ইতিহাসচর্চার সাম্প্রতিক কিছু প্রবণতার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ আছে। ১৯৮০ সালে *জঁর* পত্রিকা রেনেসাঁসের সাহিত্য বিষয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ভূমিকায় স্টিফেন গ্রিনব্ল্যাট জানান যে সংকলনটির প্রবন্ধগুলি এক 'নিউ হিস্টরিসিজম্' সূচিত করেছে। সেই থেকে নামটির চল হয়।

গ্রিনব্ল্যাট ছাড়াও সংখ্যাটির বেশ কয়েকজন লেখক ছিলেন মার্কিন। ১৯৮০ সালে আমেরিকার বার্কলিতে পড়াতে আসেন মিশেল ফুকো এবং প্রবন্ধকারদের অনেকের উপর তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। ১৯৬৮ সালের প্যারিস অভ্যুত্থানের বিপর্যয়ের পর অনেক ফরাসি বুদ্ধিজীবীর মতই ফুকো বুঝেছিলেন যে ক্ষমতা ভাবাদর্শে ও ভাষায় অন্তর্ব্যাপ্ত, তা বয়ান বা ডিসকোর্সের বাইরের কোনো বস্তু নয়। রোলাঁ বার্ত যেমন বলেছিলেন, ভাষা মানেই বিধান, ভাষামাত্রেই শাসন। ভাষা, সংস্কৃতি ও ক্ষমতায় এই নিগূঢ় ঐক্যের ধারণার মধ্যে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের সময় তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন সাহিত্যের বহু মার্কিন ছাত্র।

কোনো ঐতিহাসিক কালপর্বের সংহতির চাইতে তার অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুকোর লেখায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এছাড়া ফুকোপন্থীরা জোর দেন প্রতিবাদী সম্ভাবনা কীভাবে ডিসকোর্সের শাসনে নিয়ন্ত্রিত বা আত্মসাৎ হয় তার উপর। এই বিচারে সত্য তথা ইতিহাস হল ক্ষমতা ও অধিষ্ঠিত জ্ঞানের সমবায়ের একটি প্রতিক্ষেপণ এবং টেক্সটের মধ্যস্থতা বিনা এই সত্য ও ইতিহাস অধিগম্য নয়। ইতিহাস কেবলমাত্র টেক্সট, বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়—এমন চরম কথা নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীরা বলেন না। কিন্তু আমাদের ধরাছোঁয়ার নাগালে যে-ইতিহাস, তার পাঠ্য-চরিত্র সম্পর্কে তাঁরা সতর্ক। পক্ষান্তরে, টেক্সটকে তাঁরা দেখেন একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে। সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনার সাবেক রীতিতে যেমন পুরোভূমিতে পাঠ্যবস্তু ও পটভূমিতে ইতিহাস অথবা যুগমানসকে কল্পনা করা হত, তেমন প্রকল্প এই নব্য বিচার পরিহার করে। সাহিত্যের টেক্সটের সঙ্গে অন্য গোত্রের পাঠ্যবস্তু যেহেতু এ-ব্যাপারে অভিন্ন, তাই নব্য ঐতিহাসিকতাবাদী আলোচনায় এই দু-ধরনের টেক্সটকে প্রায়ই একত্রে অথবা পাশাপাশি পড়া হয়ে থাকে। উভয় জাতের টেক্সটেই শাসন-অন্তর্ঘাত-নিয়ন্ত্রণের বৃত্তটির ক্রিয়া

বিদ্যমান, কারণ উভয়ই একটি সংস্কৃতির ব্যাপকতর প্রতীক ব্যবস্থার শরিক। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের প্রতীক-বিশ্লেষণ প্রণালী প্রয়োগ করেছেন গ্রিনব্ল্যাট ও তাঁর অনুগামীরা। গ্রিনব্ল্যাট তাঁর এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'সংস্কৃতির কাব্যতত্ত্ব'।

ফুকো ছাড়াও অন্য তাত্ত্বিকদের চিন্তার কমবেশি ব্যবহার করেছেন গ্রিনব্ল্যাট ও তাঁর অনুবর্তীরা। এগুলির মধ্যে আছে গ্রামসির হেজেমনি-তত্ত্বও আলথুসারের আইডিওলজি বিষয়ক ব্যাখ্যা, মারক্যুসের দমনপন্থী সহিষ্ণুতার ধারণা, বাখতিনের প্রতিবাদী ডিসকোর্স-বিশ্লেষণ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাজশ সম্পর্কে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের চিন্তা। প্রবণতার সাদৃশ্য সত্ত্বেও নানা নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীর রচনায় তাত্ত্বিক সংহতি অতএব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

নিউ হিস্টরিসিজ্‌মের বিরোধীরা অবশ্য এঁদের লেখায় কয়েকটি মৌলিক প্রসঙ্গে মতৈক্য লক্ষ করেন। রক্ষণশীল উদারপন্থী ও কট্টর মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে এই ধারার বিবাদ তো রয়েছেই—কিন্তু একদা নিউ হিস্টরিসিস্টদের সহযাত্রী, রেমন্ড উইলিয়ামসের অনুগামী ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীরাও গ্রিনব্ল্যাট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের আশঙ্কা যে মার্কিন বিনির্মাণবাদীদের মতো গ্রিনব্ল্যাট-শিবিরও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দায় থেকে পিছু হটছেন। তার বদলে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রায় স্বশাসিত একটি সংস্কৃতির বা প্রতীক-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণেও বেশি জায়গা জুড়ে আছে রিপ্রেজেন্টেশন বা প্রতিরূপায়ণের বিচার। বিজ্ঞাপন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এক প্রায় পরাবাস্তব সমাজে 'মাইমেটিক ক্যাপিটালের' সংবাহনের প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ স্বাভাবিক, বিশেষত এই প্রক্রিয়া যখন আধিপত্যের মুখ্য হাতিয়ার। কিন্তু এই অতি-মনোযোগের ফলে প্রতিরূপ নির্মাণের বাস্তব ইতিহাস হয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে।

পাঠ্যবস্তুকে, বিশেষ করে মহাফেজখানার সরকারি বৃত্তান্তের বাইরে অবস্থিত সাহিত্যকে, সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ এক নিরন্তর সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে। ডিসকোর্স এই সংঘর্ষের মাধ্যমে বদলায় এবং পাঠ্যবস্তুর ব্যাখ্যারও তাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। শাসন-বিচ্যুতি-নিয়ন্ত্রণের প্রায় ছেদহীন বৃত্তে লেখকের প্রতিরোধী ভূমিকার পরিসর কম। অতীতের পাঠ্যবস্তু বর্তমানে যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে প্রশ্ন করাও জনাথন ডলিমোর, অ্যালান সিনফিল্ড প্রমুখ সাংস্কৃতিক বস্তুবাদীরা তাঁদের সামাজিক দায় বলে মনে করেন।

অন্যদিকে পেশাদার ইতিহাসবিদরা বলেন যে নব্য ঐতিহাসিকতাবাদীরা প্রায়শই সাক্ষ্যবিচারে পক্ষপাত দেখান, টুকরো বৃত্তান্ত বা অ্যানেকডোটের উপর নির্ভর করেন বেশি, ঘটনার অনুপুঙ্খ ধার করেন পুরোনো ঐতিহাসিকদের সেকেলে গবেষণা থেকে। সংঘর্ষ ও দমনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার এবং তার বিরোধীদের ছোটোখাটো আপোস-রফা তাঁদের নজর এড়িয়ে যায়। নব্য ঐতিহাসিকতাবাদ রেনেসাঁসের প্রতিষ্ঠিত পুরুষ লেখকের বাইরে তাকাতে নারাজ, এমন অভিযোগ করেছেন কিছু নারীবাদী সমালোচক। সেরা নিউ হিস্টরিসিস্ট কাজে আজকাল এইসব অভিযোগের মোকাবিলার চেষ্টা চোখে পড়ে।

নিও রিয়ালিজম

সত্যজিৎ চৌধুরী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিধ্বস্ত ইতালির চলচ্চিত্রে নিও-রিয়ালিজম আন্দোলনের সূত্রপাত। লুচিনো ভিসকন্তির (১৯০৬-৭৬) 'ওস্‌সেসিওনে' ('অবসেসন', ১৯৪২) ছবির সমালোচনায় আন্তেলিও পিয়েত্রাফেলি নিও-রিয়ালিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন (১৯৪৩)। ইতালিতে এই আন্দোলনের স্থিতিকাল এক দশক মাত্র—'ওস্‌সেসিওনে' থেকে দে সিকার 'উম্‌বারতো ডি' (১৯৫২) অবধি, কিন্তু বিশ্বচলচ্চিত্রে এর প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক।

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট শাসনকালে ইতালিতে কঠোর সেনসর নিয়ন্ত্রিত ফিল্মের একটি বাঁধা ছক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের বিলাস-ব্যসন নিয়ে উপভোগ্য মেলোড্রামা তৈরির বাইরে অন্য কোনো বিষয়-ভাবনা প্রায় অসম্ভব ছিল। ফিল্ম হবে সফল প্রমোদ-পণ্য। এক সুখী সমাজের উজ্জ্বল ছবি মেলে ধরবে। স্বৈরশাসনের কোনো সমালোচনা, কোনো প্রতিবাদী স্বর বা সমাজের অন্তর্গত শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা দৈন্য দুর্দশার বাস্তব ফিল্মে আনা নিষিদ্ধ ছিল। ইতালির চলচ্চিত্র সংস্কৃতির এমন দুর্দিনেও কোনো কোনো পরিচালকের কাজে রূঢ় সমাজবাস্তবতা তির্যকভাবে ফুটে উঠত। স্বৈরতন্ত্র কখনো প্রতিবাদী স্বর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে নিতে পারেনি। বামপন্থী চিন্তা-চেতনার প্রচ্ছন্ন বহতা থেকেছে। গোপন কমিউনিস্ট আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি। কথাসাহিত্যে এসেছে দুঃস্থ সমাজের বাস্তব চিত্র। সাহিত্যের উৎস থেকে সে সব নজির চলচ্চিত্রে এসেছে। অস্ফুট প্রচ্ছন্ন সে প্রতিবাদী চেতনা এক বিস্ফোরিত প্রবল অভিব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো সমর্থ এবং সাহসী প্রতিভার আবির্ভাব অপেক্ষিত ছিল। লুচিনো ভিসকন্তি, সেই প্রত্যাশিত ক্রান্তিকারী প্রতিভা। ইতালির সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ফ্যাসিস্ট শাসকচক্রের বুদ্ধি-বিকারে গভীর সংকটে পড়েছিল। ভিসকন্তি সেই সংকট থেকে ত্রাণের পথ নির্দেশ করলেন। তাঁর কাজ চলচ্চিত্রে—কিন্তু ইতালির সমকালীন গোটা সাংস্কৃতিক জগৎ তাঁর কাজে এক ক্রান্তির উপায় পেল। অনুভব করতে পারল, চরম দুর্দশাগ্রস্ত হলেও সেই জীবনের বাস্তবে যুক্ত না হয়ে কোনো শিল্পমুক্তি সম্ভব নয়। বস্তুত ফিল্মে নিও-রিয়ালিজম আন্দোলনের তাৎপর্য ও ভূমিকা সমকালীন ইতালির ইতিহাসের পট মনে না রাখলে স্পষ্ট হয় না।

শিল্প-সাহিত্যে কোনো চিন্তা-বীজ, কোনও অভিজ্ঞতা কোথায় যে ফলবান হয় সে খুব আশ্চর্য! যেমন নিও-রিয়ালিজমের প্রবল আন্দোলন-এর প্রেরণা-সূত্র সন্ধানে সামনে

এসে যান ফরাসি দেশের ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রকার জাঁ রেনোয়া (১৮৯৪-১৯৭৯), যিনি কলকাতায় 'দি রিভার' (১৯৫০) ছবি তৈরি করতে এসেছিলেন, এবং তারই প্রভাবে সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে যুগান্তকারী 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের সংকল্পে একত্রিত হয়েছিলেন। হলিউডের কাণ্ডকারখানায় বিতৃষ্ণ রেনোয়া ফিল্মের ভাষা নিয়ে পরীক্ষায় উৎসাহ দিতেন। স্বদেশের বাস্তবে শিকড় চারিয়ে কাজ করতে উপদেশ দিতেন। ভিসকন্তির সৌভাগ্য, তিনি রেনোয়া-র 'টোনি' (১৯৩৪) ছবিতে সহযোগী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। রেনোয়া ফরাসি পোয়েটিক রিয়ালিজম্ ধারার পরিচালক। তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পেত এবং বাস্তবকে উপলব্ধির এই শিক্ষাই দূর-প্রভাবে ভিসকন্তির কাজে নিও-রিয়ালিজমে পরিণতি পায় বলা চলে। ইতালির বাস্তব জীবন তখন রূঢ়, ছিন্নভিন্ন, সংহতিহীন। সেই বাস্তবকেই ফিল্মে ধরেন নিও-রিয়ালিজমের প্রধান দ্রষ্টারা—ভিসকন্তি, ভিত্তোরিও দে সিকা, রোস্‌সেল্লিনি। সামাজিক দায়বদ্ধতা, সুস্থ মানবিক নৈতিকতা এঁদের জীবনদর্শনের ভিত্তি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল সভ্যতার সংকটের দিনে ইতালিয় সমাজে মানবিক মূল্যবোধের ভাঙন প্রতিরোধ। স্টুডিওর কৃত্রিম রমণীয় পরিবেশ ছেড়ে এঁরা হাতে ধরা ক্যামেরা নিয়ে হাটেবাজারে, পথেঘাটে, জীবনপ্রবাহের মাঝে এসে দাঁড়ান, শুটিং করেন স্বাভাবিক আলোয়, বাস্তব জীবনযাত্রার শৃঙ্খলাহীন ধ্বনি এঁরা সাউন্ড ট্র্যাকে রেখে দিতেন। ফলে ছবির শৈলীতে উঠে আসে একেবারেই বাস্তব জীবনের অমার্জিত রূঢ়তা। সংলাপের ভাষাও হল অমার্জিত, আঞ্চলিক উচ্চারণের বাক্‌ভঙ্গি আশ্রিত। ফোটোগ্রাফিতে এল তথ্যচিত্র ঘেঁষা কৃৎকৌশল। স্টার সিস্টেমের বাইরে এসে অভিনয়ের জন্য বাছা হল আনকোরা সব মুখ—যাঁরা সাধারণ জীবনে খেটে খাওয়া মানুষজন। জমাট কোনো গল্প বলার জন্য নয়, গল্পের সুতোটুকু ধরে জীবনের আঁকাড়া অভিজ্ঞতা গেঁথে তোলা এই নব্য আন্দোলনের লক্ষ্য হল।

এই হাওয়াতেই রোবার্তো রোস্‌সেল্লিনি (১৯০৬-৭৭) তথ্যচিত্রের কাজ করতেন। নতুন পরিকল্পনায় তিনি বিরাট মাপের কাজে হাত দেন—যার স্মরণীয় ফসল 'রোমা চিত্তা আপেরতা' (রোম, ওপেন সিটি, ১৯৪৫)। বিষয় জর্মান অধিকৃত ইতালি। ইতালির প্রতিরোধ আন্দোলনের বাস্তব ইতিহাস ধরা হল এই ফিল্মে মানফ্রেদি চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করে। জর্মান গেস্টাপোদের তাড়া খেয়ে নানা আশ্রয়ে আত্মগোপন করেও সে আত্মরক্ষা করতে পারল না, প্রণয়িনী মারিনার বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ল। মৃত্যু হল তার। এইটুকু আখ্যানের পটে ইতালির ইতিহাসের এক দুর্যোগের কাল ধরা আছে 'রোম, ওপেন সিটি' ফিল্মে। রোস্‌সেল্লিনি সমকালীন বাস্তব গেঁথে দেওয়ার প্রয়োজনে এ ছবিতে তথ্যচিত্র জুড়ে দিয়েছেন। কাহিনিচিত্র এবং তথ্যচিত্র তাঁর শিল্পনৈপুণ্যে মিলেমিশে একটা সময়ের দলিলে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের আখ্যানে মিশে গেছে যুদ্ধের বাস্তব।

এ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল মনে করা হয় ভিত্তোরিও দে সিকার (১৯০১-৭৪) 'লাদরি দে বিসিক্লেত্তে' (বাইসাইকেল থিভস্ ১৯৪৮)। বেকার মজুর আন্তোনিওর গল্প। বস্তুত কোনো গল্পই নেই ছবিটিতে। বিমর্ষ বেকার আন্তোনিও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর

চাকরির ডাক পায়। পোস্টার লাগিয়ে বেড়ানোর কাজ। তার কাজের জন্য দরকার একটি সাইকেল। ঘরের তুচ্ছ সব সামগ্রী বাঁধা দিয়ে সেই টাকায় জোগাড় করে সাইকেল। সাইকেলটি চুরি যায়—যার মানে চাকরি যাওয়া। আন্তোনিও ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে খুঁজে বেড়ায় হারানো সাইকেল। এই খোঁজার সূত্রেই রোমের গরিব পাড়া, পথ, বেশ্যালয়, বাজার, রেস্তোরাঁ, নানান ধরনের লোকজন এসে যায় ছবিতে। আসে দুঃস্থ জীবন-পরিবেশ থেকে মুক্তির উপায় জানার জন্য গণৎকারের কাছে ভিড়, চার্চের ভণ্ডামি। বেপরোয়া আন্তোনিও শেষ অবধি একটি সাইকেল চুরি করে। লাঞ্ছিত হয় ধরা পড়ে গিয়ে। সে দৃশ্য দেখে তার বাচ্চা ছেলেটি। বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত—চোর বলে লাঞ্ছিত আন্তোনিও আর তার ছেলেটির মধ্যে অপরাধবোধ-লজ্জা-অভিমান বিমিশ্রিত পাশাপাশি হাঁটা, আবার দুজন দুজনকে সহজভাবে ভালোবাসার অনুকাঙ্ক্ষা।

শিল্পে কেমন করে মলিনতার মধ্যে, দুঃসহ জীবনযাত্রার গ্লানির মধ্যে, অমল মনুষ্যত্বের মহিমা প্রকাশ করা যায়, কত অনায়াসে সামান্য আয়োজনে সৃষ্টি করা যায় মহৎ শিল্প—দে সিকা এই ছবিতে অব্যর্থভাবে দেখিয়ে দিলেন। এর আগে তৈরি 'শু সাইন' (১৯৪৬) ছবিতেই তাঁর বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি এবং নতুন চলচ্চিত্র শৈলী এক নবীন প্রতিভার আবির্ভাব প্রমাণ করেছিল। 'বাইসাইকেল থিভস্'-এ তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পেলেন। এ ছবি কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে দেখার সুযোগ হয় ১৯৫২-য়। সে অভিজ্ঞতা আমাদের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতিতে, চলচ্চিত্র-মননে গভীর প্রভাব রেখে যায়। স্টুডিওর কৃত্রিম বাস্তব ছেড়ে জীবনের বাস্তবে নেমে আসার সাহস জোগায়। দেশ ভাগের দুর্দৈব কোটি কোটি মানুষের অস্তিত্বের শিকড় ছিঁড়ে দিয়ে গেছে সদ্য। সেই বাস্তব ধরার জন্য নিমাই ঘোষ ক্যামেরা হাতে প্লাটফর্মে, রেল কামরায়, রাজপথে শ্যুটিং করেছিলেন তাঁর 'ছিন্নমূল' (১৯৫০) ছবিতে। আমাদের সিনেমায় খোলা আকাশের নিচে কাজ করার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এই সময়ে, যেমন সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'বাঁশের কেল্লা' (১৯৫৩)। এই সব উদ্যম রুচির সংহতি পেল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে (১৯৫৫)। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে জরাজীর্ণ ভারতীয় বাস্তবের এই চলচ্চিত্ররূপ কল্পনা করার আগে সত্যজিৎ রায় নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর মতো 'বাইসাইকেল থিভস্' বহুবার দেখেছিলেন। 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় সিনেমার বিকাশের ইতিহাসে বড়ো বাঁক। বাণিজ্যিক সিনেমার পাশে ভিন্ন ধারার যে সিনেমা নিয়ে ভারত গৌরব, তার মূলে ইতালিয় নিও-রিয়ালিজম আন্দোলনের প্রভাব ঐতিহাসিক সত্য।

নিও-রিয়ালিজম আন্দোলনের ইতালিতে উল্লেখযোগ্য ছবি যা তৈরি হয়েছিল তার একটি বৈশিষ্ট্য—সমালোচক, সাহিত্যিক, পরিচালক—সবাই একসঙ্গে কাজ করতেন। এঁদের অনেকে চিত্রনাট্য লেখার বা সমালোচনার কাজ থেকে পরিচালনায় এসেছেন। যেমন 'ওপেন্ সিটি'তে কাজ করেছেন ফেদেরিকো ফেল্লিনি (১৯২০-৯৯)। তেমনি 'এ পাইলট রিটার্নস্' ছবি নির্মাণে সহযোগিতা করেন মিখেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি (জ. ১৯১২)। পরে এঁরা ইতালির চলচ্চিত্রে মহান স্রষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এঁদের কাজে চলচ্চিত্র শিল্পসৃষ্টির মহত্তম চূড়া স্পর্শ করেছে। এই পরিণতিকে বলা যায় নিও রিয়ালিজমেরই ভিন্ন মাত্রায় উত্তরণ।

নিয়ন্ত্রণরেখা বা লাইন অব্ কন্ট্রোল

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of control) রাজনৈতিক ভূগোলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুটি রাষ্ট্রের সীমানায় তৈরি হয় নিয়ন্ত্রণরেখা। নিয়ন্ত্রণরেখার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গিয়েছিল স্থায়ী ভৌগোলিক চিহ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটি পাহাড় বা নদী বা গাছ সরাসরি নিয়ন্ত্রণরেখাকে পরিস্ফুট করত। গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলিতে প্রাচীর অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণরেখার কাজ করত। নিয়ন্ত্রণ এই শব্দের অর্থ হল পরিচালন, শাসন, নিয়মন, সংযমন, নিবারণ, প্রশমন (দ্র. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)। এই অভিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রণরেখাকে নিবারণরেখা বলা যায়। নিয়ন্ত্রণ এখানে নিবারণ অর্থাৎ দু'দেশ যেখানে তাদের প্রবেশ নিবারিত করে রাখে। *সংসদ সমার্থক শব্দকোষ* (অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশিত, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮) নিয়ন্ত্রণ শব্দের যে সব অর্থ ও সমার্থক শব্দ দেওয়া আছে তার ভেতরেও নিবারণ শব্দটি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of control) যে বিন্দুতে গিয়ে শেষ হচ্ছে, সেই সীমারেখাকেও line of control বলা হয়ে থাকে। এইখান পর্যন্ত রাষ্ট্র একটি ব্যবস্থাকে পরিচালন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই বিন্দু বা Point-এ এসে সে নিবারিত করতে চায় অন্যদেশের প্রবেশকে। এই line of control বা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরোলে অনুপ্রবেশ হয়েছে ধরতে হবে।

১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপে সুস্পষ্টভাবে line of control তৈরির চেষ্টা চালিয়েছিল। বিভিন্ন দেশের নতুন সীমারেখা তৈরি এবং তার ব্যাখ্যা ও সীমানা চিহ্নিত করণের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণরেখার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেস যেহেতু ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মেলন ছিল সেহেতু একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতে নিয়ন্ত্রণরেখার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় শক্তিসাম্য (Balance of Power) নীতির ক্ষেত্রে। এরপর গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে এবং সৈন্যসমাবেশের ক্ষেত্রে line of control গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল line of control নামে এই concept বা ধারণা ক্রমশই প্রসারিত হয়ে উঠছে বিংশ শতাব্দীতে। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যাবার পর ইংরেজ সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে বারবার মাথা ঘামাচ্ছিল তা তাদের Frontier

policy বা সীমান্ত নীতির ব্যাখ্যা দেখলে বোঝা যায়। নর্থওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি এবং নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি বজায় রাখতে শুধু সীমানা চিহ্নিতকরণ নয়, তাদের যুদ্ধও করতে হয়েছিল। এইসময় উল্লেখযোগ্য হল McMahon line (ম্যাকমেহন লাইন)। সিমলা কনফারেন্স-এ ১৯১৪ সালে ব্রিটেন, তিব্বত ও চীনের মধ্যে স্যার হেনরী ম্যাকমেহনের সভাপতিত্বে যে নিয়ন্ত্রণরেখা তৈরির সূচনা হয় এবং যার ফলে ঐ বছর যে নিয়ন্ত্রণরেখা স্বীকৃত হয় তা ম্যাকমেহন লাইন বলে স্বীকৃত হয়। পরে ১৯৫১ সাল থেকে চীনের সঙ্গে এই ম্যাকমেহন লাইন নিয়েই দ্বন্দ্ব বাধে এবং ১৯৬২ সালে যার পরিণতিতে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণরেখা ঠিক হয়েছিল পূর্বে এবং পশ্চিমে কিন্তু উত্তরে কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে প্রবল বিতর্ক আজও রয়ে গেছে। এটি অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ঘটনা। ভারতবর্ষ যেহেতু পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকেই নির্জোট পররাষ্ট্রনীতির কথা বলে আসছিল, সেহেতু ভারতের কাছে নিয়ন্ত্রণরেখার গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। ভারতবর্ষে নিয়ন্ত্রণরেখাকে আঁকড়ে থাকতে হয়েছিল। এজন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধবিরোধী, এবং নির্জোট আন্দোলনের কথা বারবার বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ব্যবহার করছিল নিয়ন্ত্রণরেখা, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা প্রভৃতি শব্দ। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে যে দশটি নীতি গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমকতাকে বজায় রাখা এবং নিয়ন্ত্রণরেখা ধরে তার অধিকার বজায় রাখাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কাল থেকে যে Cold War বা আমেরিকা ও রাশিয়া পরিচালিত অর্থাৎ দুই বিবদমান মহাশক্তি পরিচালিত দুটি শিবিরের সংঘাত বা Bipolar conflict শুরু হয় সেখানেও line of control বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নানা জায়গায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে line of control এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 38th parallel অর্থাৎ ৩৮০ অক্ষরেখা ধরে রুশ ও আমেরিকা প্রভাবিত উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভাজন, বার্লিন প্রাচীর তুলে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে বিভাজন সম্পূর্ণ করা, ১৯৫৪ সালে জেনেভা কনফারেন্স (Geneva Conference) 17th parallel ধরে ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি line of control-এ ভাগ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন বিরোধ, লেবাননে খ্রিষ্টান ও মুসলমান প্রভাবিত এলাকার মধ্যে সংঘর্ষ, ইজরায়েল প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্ব, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান লড়াই বা চীন-ভারত সীমানা বিরোধ প্রভৃতি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে line of control নিয়ে সংগঠিত দ্বন্দ্বের জন্যই এইসব অঞ্চলে যুদ্ধ বজায় থাকছে। সীমানা চিহ্নিতকরণ নিয়ে অসন্তোষ, সীমানা লঙ্ঘন, এমনকি line of control পেরিয়ে No man's land পেরিয়ে অন্য দেশে ঢুকে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণরেখা তছনছ করে দেওয়া এইসব অঞ্চলে যুদ্ধের রেশ থেকে যাবার একটি কারণ। এছাড়া অন্যান্য কারণ আছে।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়ন্ত্রণরেখার পরেও দুপক্ষের জন্য কিছুটা ফাঁকা জমি থেকে যায়। সাধারণত এই খোলা জমির বা নদীর ভৌগোলিক অবস্থানকে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'

বলা হয়। এই 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' দুই নিয়ন্ত্রণরেখায় মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অংশ। Push back-এর সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র বের করে দিয়েছে যে অনুপ্রবেশকারীকে বা অনুপ্রবেশকারীদের, তারা 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' বসে আছে। অপর রাষ্ট্র তাদের ফিরিয়ে নিতে চাইছে না, কথা চলছে। 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে' পারস্পরিক বার্তা পাঠিয়ে দুপক্ষই আসতে পারে। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে নিয়ন্ত্রণরেখা পর্যন্ত রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী ও নিয়ন্ত্রণ দুইই বজায় রাখতে পারে চুক্তিমতো। মানসিকভাবেও নিয়ন্ত্রণরেখা পর্যন্ত সার্বভৌমত্বের অনুভব থাকতে পারে। রাজনৈতিক ও সাময়িকভাবেও থাকছে। পৃথিবীতে রাষ্ট্রভিত্তিক নিয়ন্ত্রণরেখা কিন্তু পরিবর্তনশীল এমন দেখা গেছে। নব নব যুদ্ধের নান্দীরোল এই রেখা পরিবর্তন করতে চেয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখার উপর লক্ষ্য স্থির রেখে দেশে দেশে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে আছে। গড়ে তুলেছে বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ। প্রকৃতির অনাবিল আলো বাতাসের মধ্যে, সরবতা ও নির্জনতার মধ্যে, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের বিভেদের সৃষ্টি করে অদৃশ্য হয়ে আছে নিয়ন্ত্রণরেখা। যাকে চোখে সাধারণ রেখার মতো দেখা যায় না। পিলার, পাঁচিল, কাঁটাতার, নদী, জমি, গাছ যে রেখার অস্তিত্বের কথা জানান দেয়। জানান দেয় বুটের শব্দ। অতিকায় মানচিত্রে লাল দাগে আঁকা থাকে।

নেগ্রিচ্যুড

সুরঞ্জন রায়

নেগ্রিচ্যুড কথাটির অর্থ হল দাসপ্রথা ও সব রকমের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ। ওয়েস্ট-ইন্ডিজের লেখক মার্কাস গারভি ও ক্লদ ম্যাক স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন আফ্রিকার। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সমাজের কালো মানুষদের প্রতি তাঁদের সংরক্ত আহ্বান ছিল 'ফিরে যেতে হবে আফ্রিকায়'। এর আগেই ১৯১৯ সালে প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গিয়েছে প্যারিসে। কাজেই এই জাগরণের আহ্বান তখন ছিল হাওয়ায়। এরপর মার্তিনিকের কবি ও রাজনৈতিক নেতা এমে সেজেয়ার ও আরো অনেক কালো ছাত্র মিলে গড়ে তোলেন সংগঠন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লেওপোল্ড সোর সেংহের—পরবর্তীকালে যিনি সেনেগালের রাষ্ট্রপ্রধান হন। সেংহের সঙ্গে মিলে ১৯৩৪ সালে সেজেয়ার *লেতুদিয়াঁ নোয়া* নামে একটি কাগজ বার করেছিলেন। যদিও এর একটি মাত্র সংখ্যাই বের হয়েছিল, কিন্তু পরে সেটিই হয়ে ওঠে এক মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল—কারণ এরই পাতায় প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে নেগ্রিচ্যুডের ধারণা। নেগ্রিচ্যুড আসলে কালো মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি—নিজের সংস্কৃতি, নিজের সভ্যতা আর স্বদেশ সম্পর্কে কালো মানুষকে সজাগ ও সচেতন হবার ডাক। নেগ্রিচ্যুড কথাটা রচনা করেছিলেন সেজেয়ার স্বয়ং এবং এই তত্ত্বটাই সক্রিয় ছিল সেজেয়ার ও সেংহেরের সৃষ্টিশীলতার পেছনে। উপনিবেশিত মানুষগুলোর দুর্ভাগ্যকে অনুভব করতে গিয়ে আমাদের চোখ ফেরাতে হয় তাদের সমাজ-সম্বন্ধ, ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাসের দিকে—ঔপনিবেশিক প্রভু যেগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে কদাকার করে তুলেছে। আর্থনীতিক বিন্যাস সমাজকল্যাণমূলক না হওয়ায় ব্যক্তি তার গোষ্ঠীচেতনা হারিয়ে হয়ে উঠেছে স্বার্থপর, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধগুলো কৃত্রিম হয়ে ওঠায় সমাজের ভিত্তিই হয়ে পড়েছে দুর্বল। ভাষা ও ইতিহাসচেতনা যেহেতু চর্চার মধ্যে দিয়েই হয়ে ওঠে মার্জিত, ঔপনিবেশিক প্রভু তাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চাপিয়ে দেয় তার আপন ভাষাকেই, শাসকপ্রভুর ইতিহাসই হয়ে ওঠে উপনিবেশিত মানুষের ইতিহাস—'কালো চামড়া শাদা মুখোশে'র মানুষগুলোর মধ্যে ঐতিহ্যের শিকড় ক্রমে শিথিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এক দাসত্বের মনোভাব। আর এর সঙ্গে এসে যখন যুক্ত হয় পরধর্মের প্রভাব তখন ছিন্নমূল মানুষগুলোর আর্ত হাহাকার ডেকে নিয়ে আসে এক অতলান্তিক বিষাদকেই। ফ্রানৎজ ফ্যানন বলেছেন : 'ফ্রান্স জাতিবিদ্বেষের দেশ'। আসলে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশই তাই,

যাদেরই উপনিবেশ ছিল বা আছে, তারা সবাই তাই। সেজেয়ার, ফ্যানন ও অন্য অনেকেই তাই এই নেগ্রিচ্যুড আর মার্ক্সবাদেই খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির পথ। সেংহের আর সেজেয়ার দুজনেই যদিও কালোকে সুন্দর বলে ঘোষণা করেছিলেন, পরে কিন্তু দুজনেই নেগ্রিচ্যুড সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সেংহের নেগ্রিচ্যুডকে প্রায় অতীন্দ্রিয় ও মরমি অভিজ্ঞতায় পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। সেজেয়ারের কাছে কিন্তু নেগ্রিচ্যুড রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির হাতিয়ার। তাই তাঁর নাটকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কী করে সাম্রাজ্যবাদীরা ও রাষ্ট্রসংঘ হত্যা করে স্বাধীন প্যান আফ্রিকার স্বপ্নকে ধ্বংস করেছিল।

নৈরাজ্যবাদ

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

জনমানসে নৈরাজ্যবাদীদের সম্পর্কে ধারণা হল, এরা বোমা হাতে একদল সন্ত্রাসবাদী। বাস্তবে, নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে সেরকম ব্যক্তিসন্ত্রাসের ভূমিকা খুবই সীমিত। একইভাবে, ইংরেজিতে anarchy শব্দটি ব্যবহার করা হয় সমাজে বিপর্যয়, জীবনের সাধারণ সুবিধা হারানো, এমন একটা পরিবেশকে বোঝাতে। অথচ অধিকাংশ নৈরাজ্যবাদী দাবি করেন, তাঁদের লক্ষ্য গঠনমূলক। নৈরাজ্যবাদ কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী? একদিক থেকে মনে হয়, নৈরাজ্যবাদ ব্যক্তিকে সমস্ত সামাজিক বাঁধনের উর্ধ্বে তুলে ধরতে চায়। অন্যদিকে, নৈরাজ্যবাদীরা বলবেন, তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ সামাজিক ব্যক্তি-সৃজন, যে ব্যক্তি সমষ্টির প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আজকের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকবে। সুতরাং নৈরাজ্যবাদকে কোনো অখণ্ড তত্ত্ব হিসেবে দেখা সম্ভব নয়, বরং তার মধ্যে একাধিক ধারার অস্তিত্ব চিনতে হবে।

নৈরাজ্যবাদের প্রতি সংবেদনশীল লেখকরা প্রাচীনকাল থেকে এই মতাদর্শের উৎপত্তি দেখতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল থেকে যা পাওয়া যায় তা হল শোষণ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতি মানুষের ক্ষোভ এবং রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার স্বপ্ন। তাই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রীরা এবং নৈরাজ্যবাদীরা, উভয়েই ওই ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিজেদের পূর্বসূরি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু নৈরাজ্যবাদ নিজে একটি আধুনিক মতাদর্শ। এর মূল বক্তব্য হল রাজনৈতিক কৃতিত্বের নীতিকে অস্বীকার করা, এবং দাবি করা যে, তেমন কোনো কর্তৃত্ব-নিরপেক্ষভাবেই সমাজকে উন্নতভাবে বজায় রাখা সম্ভব। আধুনিক রাষ্ট্রের মূল উপাদানগুলি নৈরাজ্যবাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু। তার সীমান্ত সংক্রান্ত ধারণা, তার সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি, দমনপীড়নের উপর যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে সে সেই সার্বভৌম ক্ষমতাকে বজায় রাখতে চায়, তার আইন ব্যবস্থা, যা অন্য সব আইন ও প্রথাকে নাকচ করতে চায়, এবং জাতির ধারণা, যে-জাতিকে দেখা যায় সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে।

নৈরাজ্যবাদের দার্শনিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি উদারপন্থী। নৈরাজ্যবাদের প্রথম স্পষ্ট তত্ত্বায়ন করেন উইলিয়ম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬)। গডউইনের চিন্তা রবার্ট আওয়েনের অনুগামী সমবায়ভিত্তিক সাম্যবাদীদের কিছুটা অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু গডউইন নিজে ছিলেন জেরেমি বেন্থামের ধাঁচের উপযোগবাদী। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ

নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিক ছিলেন জার্মান হেগেলীয় দার্শনিক ম্যাক্স স্টার্নার। তাঁর প্রধান রচনা *দ্য ইগো অ্যান্ড হিজ ওন* এক দিক থেকে ছিল গডউইনের মতের বিপরীতে। গডউইন মনে করেছিলেন, সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী মানুষ সকলের শুভ চাইবে। স্টার্নার দাবি করেছিলেন যৌক্তিকভাবে সমর্থন করা যায় এমন একমাত্র অবস্থান হল পুরোমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু দুজনে একমত ছিলেন যে রাষ্ট্র তথা সবরকম কর্তৃত্ব বর্জনীয়। দুজনেই একমত যে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্বও অন্যায়। কিন্তু স্টার্নারের আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যা হল, তা কোনো নৈতিকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট নয়। সকলের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত, এই প্রস্তাব তো আত্মকেন্দ্রিকতার দাবির বিরোধী, কারণ স্টার্নারের মতে কোনো ব্যক্তিকে সবার স্বার্থ দেখতে হবে না, বরং নিজের স্বার্থে বাকিদের সে ব্যবহার করতে পারে। তাহলে স্টার্নারের দর্শন অনুযায়ী যারা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে, যারা চুক্তি রক্ষায় বিশ্বাস করে, তাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থরক্ষা করায় কোনো অন্যায় নেই। এই ধারণার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমরা দেখতে পাব পিয়ের জোসেফ প্রুধঁ এবং মিখাইল বাকুনিনের তত্ত্ব আলোচনা করলে।

প্রুধঁ ছিলেন ফরাসি তাত্ত্বিক। তিনি বাম হেগেলীয় চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর খ্যাতি আসে সম্পত্তি সম্পর্কিত রচনার ফলে, যেখানে তিনি বলেন, সম্পত্তি হল চৌর্যবৃত্তি। প্রুধঁ সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রই পুঁজির ক্ষমতার স্রষ্টা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে শ্রমিক নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। তিনি পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজেছিলেন পেটি বুর্জোয়া উৎপাদনের স্বাধীনতাকে চিরস্থায়ী করার পথ ধরে। তাঁর প্রস্তাবিত পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল বাজারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে, একচেটিয়া ক্ষমতাকে খর্ব করার প্রস্তাব।

প্রুধঁ ও বাকুনিনের সমর্থকদের দেখলে বোঝা যায়, নৈরাজ্যবাদের সামাজিক ভিত্তি ছিল আধুনিক শিল্প-ধনতন্ত্রের উত্তরণের পর্বে ধনতন্ত্রের অগ্রগতিতে আক্রান্ত গোষ্ঠীরা। পেটি বুর্জোয়া কারিগর, ছোটো উৎপাদক, এবং প্রাক-শিল্পবিপ্লব সমাজের দক্ষ শ্রমিক, শিল্প বিপ্লব যাদের আয়, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাপনের পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছিল, তারা ছিল প্রুধঁ ও বাকুনিন উভয়েরই সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য অংশ।

আধুনিক নৈরাজ্যবাদীরা ও নৈরাজ্যবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু উদারপন্থী, মনে করেছেন, নৈরাজ্যবাদ হল মানবিক, মুক্তপন্থী সমাজতন্ত্র, আর মার্ক্সবাদ হল হুকুমশাহি সমাজতন্ত্র। কিন্তু প্রুধঁর রচনাবলি থেকে নৈরাজ্যবাদের অন্য একরকম ছবিও বেরিয়ে আসে। প্রুধঁর *দারিদ্র্যের দর্শন* বইয়ের সমালোচনায় মার্ক্স তাঁর *দর্শনের দারিদ্র্য* বইটি লিখলে ফিশু প্রুধঁ তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, এই ঘৃণ্য জাতিকে (অর্থাৎ ইহুদিদের) ঠেলে এশিয়ায় ফেরত পাঠানো উচিত, বা শেষ করে দেওয়া উচিত। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে 'রাজনীতিবিরোধী' প্রুধঁ সংবিধান সভায় নির্বাচিত হন, এবং নিজের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন, 'আমিই বিপ্লব' (la revolution, c' est moi), যা হল ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী স্বৈরতান্ত্রিক রাজার অনুকরণ। তিনি আরো বলেন, 'আমি একবার চালকের পদে আসীন হলে আর কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না।'

যদি মনে করা হয়, এ হল প্রুধঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার—নৈরাজ্যবাদের তত্ত্বে এর কোনো স্থান নেই, তাহলে বলা দরকার, প্রুধঁ ও প্রুধঁপন্থীদের 'আন্তর্জাতিকতার' অর্থ ছিল ফরাসি জাতির প্রাধান্য সর্বত্র জাহির করার চেষ্টা। ফ্রান্সেও, শ্রমিক আন্দোলনের উপর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ফৌজ গুলি চালালে প্রুধঁ লিখেছিলেন, পিতার অধিকার রয়েছে, সন্তান অন্যায় করলে শাস্তি দিয়ে তাকে সৎপথে টেনে আনার।

প্রুধঁ নৈরাজ্যবাদকে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু নৈরাজ্যবাদ আন্দোলনে পরিণত হয় মিখাইল বাকুনিনের প্রভাবে। বাকুনিন ছিলেন রুশ বাম হেগেলীয় তাত্ত্বিক। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দুটি পর্যায় দেখা যায়। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে তিনি অংশগ্রহণ করেন প্যানস্লাভবাদী মতাদর্শের প্রবক্তা হিসেবে। ১৮৬৪-এর আগে পর্যন্ত এই ছিল তাঁর মূল পরিচয়। প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাতে অংশ নেন, এবং এই সময় থেকে তাঁর নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব স্পষ্ট হতে থাকে, যদিও প্রুধঁর সঙ্গে তাঁর আগে পরিচিতি ও বন্ধুত্ব ছিল।

বাকুনিন ১৮৬৪-র পর প্রথম উদারপন্থী সংগঠনে যোগদান করে সেখানে সাম্যবাদী মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হলে তিনি ও তাঁর সমর্থকরা 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর সোশালিস্ট ডেমোক্রেসি' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠন প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ চায়। কিন্তু সংগঠনগুলির ঘোষণাপত্র প্রথম আন্তর্জাতিকের মতের বিরোধী, একথা মনে করে আন্তর্জাতিক তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তখন বাকুনিনপন্থীরা বলেন, তাঁরা তাঁদের সংগঠন ভেঙে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিকের সদস্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিজেদের সংগঠনকে গোপন সংগঠন হিসেবে চালু রাখেন।

প্রকাশ্যে, বাকুনিনের বক্তব্য ছিল যে কর্তৃত্ববাদ অন্যায়। বিপ্লব করবে সমগ্র জনগণ। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি ও সব ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যৌথ সমাজ গঠন করতে হবে। বাকুনিনের উত্তরসূরি পিওতর ক্রপোটকিন নৈরাজ্যবাদী সাম্যবাদের তত্ত্বের আরো বিকাশ ঘটান। তবে বাকুনিনের *রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্য* এবং ক্রপোটকিনের *রাষ্ট্রতার ঐতিহাসিক ভূমিকা*, দেখায় যে তাঁরা সাম্যবাদের কথা বললেও শ্রেণিসংঘাতের চেয়ে, রাষ্ট্রকে স্বাধীন একটি শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখে তার বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়াইয়ের বর্শামুখ ঘোরাতে চেয়েছিলেন।

রুশ আধা-বিপ্লবী, আধা-দুর্বৃত্ত নেচায়েভের সঙ্গে সহযোগিতায় বাকুনিন যে গোপন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন, তা ছিল অসম্ভব কর্তৃত্ববাদী, নেতানির্ভর। প্রথম আন্তর্জাতিকের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কর্তৃত্ববাদী বলে আক্রমণ করার পাশে তিনি এই গোপন কর্তৃত্ববাদ চালিয়ে যান।

বাকুনিন, ক্রপোটকিন, মালাতেস্তা, রেক্লুস প্রমুখ সাম্যবাদী-নৈরাজ্যবাদীর বিশ্লেষণের সূচনা অনেকাংশে মার্ক্সবাদের মতোই। বস্তুত, *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের বিশ্লেষণকে বাকুনিন বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুঁজির শোষণ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের চেয়ে তাঁরা জোর দিয়েছিলেন গোটা ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা ও সংখ্যালঘুর দাপটের ওপর।

উপরন্তু, তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণির কোনো স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি একটি ভাঁওতা, কারণ যে নির্বাচিত হবে সে কেবল নিজের স্বার্থই দেখবে। এখানে নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটির সমালোচনা করা হচ্ছে না, গণতন্ত্রকেই ভাঁওতা বলা হচ্ছে।

সাম্যবাদী-নৈরাজ্যবাদীদের মতে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অর্থ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসা। বরং দরকার সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রচার করা এবং বিপ্লবের পর উৎপাদনের উপকরণ সরাসরি উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণে আনা। কিন্তু কীভাবে তা হবে? বাকুনিন এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলেননি। এই ধাঁচের নৈরাজ্যবাদীদের মতে উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক। ধনতন্ত্র তাকে আটকে রাখে। বিপ্লব এই ক্ষমতাকে মুক্তি দেবে। রাষ্ট্র ভেঙে পড়লে শ্রমজীবী মানুষ স্বেচ্ছায় উৎপাদন করবেন। কিন্তু হাজার হাজার ফ্যাক্টরি, খামার ইত্যাদির সংগঠন কীভাবে হবে? প্রথমত, নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় শিল্পায়ন অনেকটা যেন থেমে যাবে। প্রতিটি জেলা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

অন্যদিকে বলা যায়, স্টার্নারের অনুবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদীদের কথা। বেঞ্জামিন টাকার প্রমুখ অনেকে এই মত গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদীরা সমাজতন্ত্রী নন। জোশিয়া ওয়ারেন ন্যায়সঙ্গত বাজারের লেনদেনের উপর জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবজীবনে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কাজ করতে পারে শুধু এমন এক সমাজে, যেখানে সকলেই ছোটো বা মাঝারি চাষি এবং কারিগর অর্থাৎ যেখানে ধনিকশ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি উভয়েই অনুপস্থিত। টাকার চেয়েছিলেন ওয়ারেনের মতের সঙ্গে মার্ক্সের মেলবন্ধন ঘটাতে। তার ফল দাঁড়াল, প্রধান শত্রু হিসেবে দেখা হল ভূস্বামী ও ব্যাঙ্কমালিকদের। অর্থাৎ 'উৎপাদক পুঁজিপতি' এবং 'অনুৎপাদক পুঁজিপতির' মধ্যে পার্থক্য করা হল। টাকার নিজে উগ্র দক্ষিণপন্থী ছিলেন না। কিন্তু উগ্র দক্ষিণপন্থী জনবাদী (populist) বা ফ্যাসিবাদী তত্ত্বে পেটি বুর্জোয়া জনসমাবেশের জন্য যখন 'পুঁজির' নিন্দা করা হয়েছে, তখন তা ওই পৃথকীকরণের উপর জোর দিয়েছে। ফেডার, স্ট্র্যাসার ইত্যাদি নামী 'র‍্যাডিক্যাল'-দের বক্তব্য এখানে লক্ষণীয়। আধুনিকযুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদীরা খোলাখুলি ধনতন্ত্রের পক্ষে। মারে রথবার্ড মনে করেন, গরিব মানুষ গরিব, কারণ তাদের দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। রবার্ট নোজিকের মতো তাত্ত্বিক তো কার্যত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটু লঘু সংস্করণকে রেখে দিতে চান।

নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব নৈরাজ্যবাদী অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত। কীভাবে সংগঠন তৈরি হবে? কীভাবে বিপ্লব হবে? বিপ্লবী বা সাম্যবাদী নৈরাজ্যবাদ, ট্রেড ইউনিয়নবাদী নৈরাজ্যবাদ, এবং শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদ, ভিন্নভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। প্রতিটি উত্তরই আংশিক, প্রতিটি সম্পর্কেই প্রশ্ন রয়ে গেছে। সাম্যবাদী-নৈরাজ্যবাদ মার্ক্সকে সমালোচনা করে বলেছিল, তাঁর প্রস্তাবিত বিপ্লবী দল হবে শ্রমিকের গুরুমশাই এবং এক নয়া আমলাতন্ত্র। যখন আধুনিক নৈরাজ্যবাদীরা বলেন, ইতিহাস প্রমাণ করেছে তাঁরা সঠিক, তখন বুঝতে হবে, তাঁরা মার্ক্সবাদ ও স্তালিনবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা নিজেকে হয় বাকুনিনের মতো স্বৈরতান্ত্রিক সংগঠন

করেছিলেন, অথবা সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেছিলেন। ১৯১৮-২০তে ইউক্রেনে নেস্তর মাখনোর আন্দোলনকে নৈরাজবাদীদের অন্যতম আদর্শ হিসেবে দেখানো হয়। মাখনো-শাসিত এলাকায় যে মানবাধিকার বলশেভিক এলাকার চেয়ে বেশি মানা হত, ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না।

বরং, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথ ধরেছিলেন যে সব নৈরাজ্যবাদীরা তাঁরা অনেকটা বিকল্প গড়তে পেরেছিলেন। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাদ এবং নৈরাজ্যবাদ অভিন্ন নয়। কিন্তু সিন্ডিক্যালবাদীরা মনে করতেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবেন, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণির নিজের সংগঠন হিসেবে ইউনিয়নের মাধ্যমে তলা থেকে উৎপাদন সংগঠিত করবেন এবং বিপ্লবী সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উচ্ছেদ করবেন। নৈরাজ্যবাদীদের কাছে এই মত গ্রহণযোগ্য ছিল। নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিক্যালবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এমিল পুগে, পিয়র মোনাত, রুডলফ রকার এবং স্পেনের আইবেরীয় নৈরাজ্যবাদী ফেডারেশনের নেতৃত্ব। কিন্তু লক্ষণীয়, ইতিহাসে সবচেয়ে সফল নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালবাদী আন্দোলনে, স্পেনে, নৈরাজ্যবাদীদের যে পন্থা গ্রহণ করতে হল, তা হল সচেতন, সংখ্যালঘু বিপ্লবীরা স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হবেন, এবং ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। লেনিনবাদকে তীব্র সমালোচনা করার পর, প্রকারান্তরে লেনিনবাদী সংগঠন তত্ত্বের সাফল্যকেই এখানে স্বীকার করা হল। উপরন্তু, সংখ্যালঘু বিপ্লবী সংগঠনের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্দেশ না করায়, স্পেনের বিপ্লব শুরু হলে নৈরাজ্যবাদীদের একাংশ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে 'সমাজতন্ত্রী-সাধারণতন্ত্রী' মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈরাজ্যবাদের একাংশ জোর দিয়েছে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের উপর। আধুনিক যুগে এই ধারা উৎসাহ পেয়েছে গান্ধীজির রচনা ও কাজ থেকে। এর যে দুটি দিক—অহিংস প্রতিবাদ এবং গঠনমূলক কাজ—তা বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার আনতে সাহায্য করেছে এবং স্থানীয়ভাবে মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কিন্তু দেশজোড়া বিকল্প গঠনের দিকে তা কোথাওই যেতে পারেনি।

নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন কোথাও সফল না হলেও নৈরাজ্যবাদীদের অন্যতম সাফল্য হল, বুর্জোয়া উদারপন্থী এবং মার্ক্সবাদের নামে বিংশ শতাব্দীতে যে সব ধরনের অনুশীলন হয়েছে তাদের সমালোচনা করা ও মানবাধিকারের কথা জোরের সঙ্গে বলা।

পজিটিভিজম

স্বপন বসু

পজিটিভিজম (Positivism)-এর প্রতিশব্দ ধ্রুববাদ, প্রত্যক্ষবাদ বা প্রামাণিকবাদ। এটি একই সঙ্গে দর্শন এবং নতুন একটি ধর্মপ্রণালী। এই মতবাদের উদ্ভাবক এবং প্রচারক বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক অগস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭)। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্রের ঘোর বিরোধী এই মানুষটি ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত চিন্তাবিদ সেন্ট সাইমনের সেক্রেটারি হন। ছ-বছর ধরে তাঁর কাছে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করার পর দু-জনের মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ হওয়ায় কোঁত সাইমনের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময় থেকে প্রচলিত ধর্মধারণাকে অস্বীকার করে, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনে বিশ্বাস নিয়ে তিনি প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হন। প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাভাবনাকে সেই সময়ের বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০-এ কোঁত-এর প্রত্যক্ষবাদের প্রথম ভাগ ও ১৮৪২-এ শেষভাগ প্রকাশিত হয়। ছটি খণ্ডে বিভক্ত এই যুগান্তকারী বইটির নাম *Philosophie Positive*। এতে তিনি বললেন, যুক্তিবাদী দার্শনিকের কাছে স্বর্গ, আত্মা, অমরতা, অতীন্দ্রিয় লোক এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। চারপাশে যা ঘটছে তার বাইরে আমরা আর কিছুই জানি না। পর্যবেক্ষণ (Observation) পরীক্ষা (Experiment) ও উপমা (Comparison) এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জগৎকে দেখি এবং বুঝি, বিভিন্ন ঘটনা এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবন করার চেষ্টা করি। বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষের ধারণা তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ধর্মপ্রধান (Theological), দর্শনপ্রধান (Metaphysical) ও প্রত্যক্ষধর্মী স্তর (Positive or Scientific)। প্রথম অবস্থায় মানুষ যখন বিশ্ব ব্যাপার বুঝতে যায়, তখন প্রকৃতির সমস্ত কাজের এক একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার (দেবতার) কথা কল্পনা করে। এর পর এল দর্শন অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির কাজের পিছনে একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার কথা কল্পনা করে নিল। এই সত্তাকে কোঁত বলেছেন Force বা Power। এরপর প্রত্যক্ষধর্মী স্তর। দৈবী বা কোনো নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অস্তিত্ব এখানে অনুপস্থিত। এই অবস্থায় বিজ্ঞান বিশ্বাস করে অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বে।

কোঁতের মতে মানুষের মানসিক বিবর্তনও এই একই পথ ধরে এগিয়েছে। প্রথম অবস্থায় দৈবীশক্তিকে, পরবর্তী অবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বকে আশ্রয় করে মানুষ সবকিছুকে

ব্যাখ্যা করতে চায়, পরিশেষে সে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে জীবন ও জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, আদিম অবস্থায় বা পৌরাণিক যুগে মানুষ অগ্নিকে দেবতা ভাবে, দার্শনিক স্তরে বুঝতে পারে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলেই সব কিছু দগ্ধ হয়, পজিটিভ স্তরে মানুষ অগ্নিকে রাসায়নিক কার্যবিশেষের ফল বলে ভাবতে শেখে। কোঁতের মতে পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম মেনে হয়। আকাশে মাঝে মাঝে যে ধূমকেতুর উদয় হয় বা মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা জাগে সবকিছুই নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানের বিবর্তন ও মানুষের মনোবিবর্তন একই ধারাকে আশ্রয় করে ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন। প্রত্যক্ষবাদ প্রচারের পর ধর্মযাজকরা কোঁতকে নাস্তিক ও পাষণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করলেন, তাঁর নামে নানা কুৎসা প্রচার করা হতে লাগল। সে যাই হোক, মানবসমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়াই ছিল কোঁতের মূল লক্ষ্য, দুঃখীর দুঃখ মোচনকে মানুষের জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন।

১৮৪৫-এ কোঁতের জীবনে নতুন এক নারীর আবির্ভাব হয়। ক্লোতিল্‌দ দিভোর সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর মনের ভাব পরিবর্তিত হয়। ক্লোতিল্‌দের মৃত্যুর পর তিনি মানুষের জীবনের প্রেমের মাহাত্ম্য নতুন করে উপলব্ধি করেন। পরিবর্তিত মানসিক পরিস্থিতিতে ১৮৫১-য় রাজনীতি ও সমাজদর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই *The positive Polity* প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। চারখণ্ডে বিভক্ত এই বইটি বেরোয় চার বছর ধরে। এই বইতে তিনি বললেন যে শুধু বুদ্ধিকে আশ্রয় করে মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়, প্রেম, অনুভূতি আর ভক্তি জীবনচলার পথে অপরিহার্য। তিনি বললেন, পরোপকারেই জীবনের সার্থকতা। মানবজাতিকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করে তার সেবায় ব্রতী হওয়াই মানুষের জীবনের প্রধান কর্তব্য। এই দেবতাকে তিনি চিহ্নিত করলেন 'পরম সৎ' হিসাবে। তিনি বললেন, কালে মানুষ অন্যসব দেবতার উপাসনা ত্যাগ করে পরম সতের উপাসনা করবে। কোঁতের মতে 'ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা ভার্যা এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।' আদর্শ মানুষকে তিনি ভগবানের জায়গায় বসালেন। মা মেরির বদলে কল্যাণরূপী প্রেয়সী নারীর ধ্যানরূপকে বেশি মর্যাদা দিলেন।

এই বইটি প্রচারিত হবার পর এক ধরনের ধর্মের ছোঁয়া লাগল কোঁতের যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদে। কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ আর শুধু দর্শন রইল না, তা হয়ে উঠল নতুন এক ধর্মও (স্মরণীয় *ধর্মতত্ত্ব*-এ বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি 'কোমৎ নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা')। যদিও তাঁর মূল দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে এই ধর্মের বিশেষ কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না।

কোঁতের নতুন মতবাদ অনেকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর পজিটিভিস্টরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যান। একদল তাঁর প্রথম মতকেই আঁকড়ে থাকেন, অন্যদল তাঁর পরিবর্তিত মতকে গ্রহণ করেন।

কোঁত প্রচারিত প্রত্যক্ষবাদ সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই মতবাদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একাধিক বিশিষ্ট বাঙালিকে প্রভাবিত করে।

এঁদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (বেঙ্গলি সম্পাদক), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কোঁতের মতবাদ আলোচনার জন্য কলকাতায় 'সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অফ পজিটিভ রিলিজন ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছাড়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, নীলমণি কুমার এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০২-এ যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই সমিতি উঠে যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে 'যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পর এদেশে Positivism-এর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না।'

পট ও পটের গান

শান্তি নাথ

রাজা হর্ষবর্ধন ধনুকে শরযুক্ত করে ধাবমান হরিণের গতি লক্ষ করে শর নিক্ষেপ করার কালে শঙ্কিত হলেন দূতের উপস্থিতিতে। দূত তাকে বিনত ভঙ্গিমায় সংবাদ দেন রাজা প্রভাকর বর্ধন অসুস্থ—কুমারকে রাজধানীতে উপস্থিত হতে হবে। হর্ষবর্ধন নগরে প্রবেশ করে বড় সড়কের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওখানে রাস্তার পাশে বেশ কিছু দোকান আছে, তার সামনে খোলা চত্বরে বালক ও যুবক পরিবৃত হয়ে এক যমপট্টিকার ব্যবসায়ী যমপট দেখাচ্ছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়ে চিত্র দেখিয়ে গান গাইছেন সেই পট্টিকার। ভীষণ মহিষারূঢ় প্রেতনাথ প্রধান মূর্তি। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন—পাপ করলে, নরকের কোন্ স্তরে তার স্থান হয় এবং কী কী শাস্তি হয় তার বর্ণনা ছবি সহ গান গেয়ে শোনানো হচ্ছে।

বাণভট্টের আত্মচরিতে হর্ষবর্ধনের এই যমপট প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। বাণভট্টের আত্মচরিত সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত।

লক্ষণীয় পট্টিকারকে ব্যবসায়ী বলা হয়েছে, ভিক্ষুক বলা হয়নি। অর্থাৎ এটা পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। জাতিচ্যুত হয়নি। *মুদ্রারাক্ষস* নাটক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত—তাতে উল্লেখ আছে দুই পট্টিকার পট দেখাতে দেখাতে হঠাৎ এক ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তাদের পরিচয় দিয়ে সংবাদ দিতে থাকেন এবং সংবাদ নিতে থাকেন। অর্থাৎ পট্টিকার সেজে গোয়েন্দাগিরির কাজ চালু ছিল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এই গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

এই দুই অংশে পট্টিকারদের দুটো পরিচয় পাওয়া গেল ১. তাঁরা ব্যবসাদার ২. তাঁরা গোয়েন্দাগিরিও করেন। কিন্তু যে পেশায় নিযুক্ত থাকুন, এঁদের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যায়। আরো প্রাচীনের দিকে যাওয়া যেতে পারে যেমন কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* বা *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে চিত্র রচনা এবং তার প্রদর্শনের বিশেষ উল্লেখ আছে। আরো প্রাচীনতম দিকে কি যাওয়া যায় না? নিশ্চয়, যাওয়া যায়। খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে রাজা অশোক যখন কলিঙ্গযুদ্ধে ব্যস্ত, কলিঙ্গের জনপথ রক্তে জমাট বাঁধছিল তখন আজকের মেদিনীপুর বা সে দিনের তাম্রলিপ্ত শহর ছিল ব্যস্ত বন্দরনগরী। এখান থেকে নদী ও সমুদ্র পথে যোগ ছিল দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে। অর্থাৎ দ্রাবিড়দের

সঙ্গে এই নগরবাসীর সখ্য ছিল। ফলে আর্য প্রবর্তিত রীতিনীতিগুলি এখানে শিথিল ছিল। সুদূর অতীতে কাঁসাই নদী (কপিলা) আর বৈতরণী নদীর (জাজপুরের নিকটবর্তী) মধ্যবর্তী মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার বেশ কিছু অংশকে উৎকল বলা হত। অন্য দিকে বৈতরণী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড কলিঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব; চতুর্থ শতকে মহাপদ্মনন্দ কলিঙ্গ অধিকার করেন। কলিঙ্গ অশোকের হস্তগত হয় খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে। দ্রাবিড়রা খুব বেশি মিশ্রণ চাননি; ভারতীয় সভ্যতার উষালগ্নের যে আগুন, যে সূর্যের তেজ দেখা দিয়েছিল, তাকে বুকের তলায় নিয়ে পালিয়ে এসে এই জায়গায় স্থায়ী বসবাস শুরু, রাজা অশোকের অনেক আগেই। তাঁরা মানতে চাননি আর্য ধারাকে, চার্বাক চিন্তার চারণভূমি ছিল এই অঞ্চল। চার্বাক বুদ্ধের উদ্ভবের ফলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তারা লিপ্ত থাকবে। ফা হিয়েন (৪০১-৪১০ খ্রিষ্টাব্দ) যিনি তাম্রলিপ্ত পৌঁছেছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে—তাঁর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, তাম্রলিপ্ত ছিল বন্দর শহর, সমুদ্রের কিনারে এর অবস্থান। এখানে ছিল বাইশটি বৌদ্ধবিহার। আর প্রত্যেক বিহারে শতাধিক করে ভিক্ষু বাস করতেন। তিনি দু'বছর ধরে এখানে বসে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র নকল করেছিলেন এমনকী এখানে বসে তিনি ছবি আঁকার পাঠও নিয়ে ছিলেন।

বোঝা যায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চিত্ররচনার গভীর যোগাযোগ ছিল যা আর্য সভ্যতায় ছিল না। ফা-হিয়েন'-এর ছোট্ট মন্তব্য স্মরণীয়—তিনি এই পট্টিকারদের নিকট থেকেই শিল্প শিক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রায় ২২৫ বছর পরে আসেন হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫)। তাঁর বিবরণী থেকে পাওয়া যায় এখানে বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস করেন। এই দেশে দশটির বেশি বিহার আছে। এছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। এই ২০০-২২৫ বছরের ভিতর তাম্রলিপ্ত নগরে অন্তর্ঘাতমূলক যুদ্ধ চলবে। বৌদ্ধধর্ম এবং আর্যধারা অদ্ভূত হিন্দুধর্ম যা আবার বৌদ্ধধর্মের গর্ভ থেকেই উদ্ভূত হবে. এই উদ্ভবকালে রক্তপাত নিত্যসঙ্গী ছিল এবং নবম দশক থেকে এই যুদ্ধ আরো বিস্তারিত হবে, এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সৃষ্টি হবে মঙ্গলকাব্য। শেষতম কাব্য *শূন্যপুরাণ* রচিত হবে ত্রয়োদশ শতকের দিকে। তবুও আজও সেই তাম্রলিপ্ত বা আজকের মেদিনীপুর সেই পট্টিকারদের স্বর্গভূমি। এই শিল্পীরাই অজন্তায় গুহাচিত্রের শিল্পী, এঁরাই আবার আকবরনামার চিত্র অঙ্কন শিল্পী। এঁদের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের সমান দৈর্ঘ্যের। প্রশ্ন উঠতে পারে শিল্পী না বলে পট্টিকার বলা হচ্ছে কেন?

সেই প্রাচীনযুগে চিত্র রচনার উষালগ্নে কোনো কাগজের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এবং বৃক্ষছাল কিংবা ভূর্জপত্রের উপর চিত্ররচনা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। তাই ছেঁড়া কাপড়ের উপর মাটির লেই ধরিয়ে, তাতে চালগুঁড়োর শাদা রঙ দিয়ে চিত্র রচনার পটভূমি তৈরি করা হত।

পটের উপর ছবি আঁকা হত বলে এদের শিল্পী না বলে পট্টিকার বলা হত। সংস্কৃত ভাষায় পট্ট বা পট মূলত কাপড় বোঝায়। পট শব্দের উত্তর সম্বন্ধ বাচক 'উয়া' প্রত্যয় যোগে পটুয়া শব্দের উৎপত্তি। তাই ওঁরা পটুয়া নামে বেশি পরিচিত।

প্রাচীনকালে রং হিসাবে ব্যবহার করা হত নানান দ্রব্য—যেমন চালের গুঁড়ো থেকে শাদা রং, বা হলুদ থেকে হলুদ রং, মাটির হাঁড়ির তলার কালি থেকে কালো রং। সিনের পাতা থেকে সবুজ রং। আজ আর এ সবের চল নেই। সরাসরি বাজার থেকে রং কেনা হয়। আগে শিল্প রচনাকে বলা হত শিল্প লেখ্য অর্থাৎ লেখা।

এই পটুয়াররা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁরা জাত হারাতে থাকেন। হিন্দু ঔদ্ধত্যের যুগে তাঁরা বর্ণচোরা হতে থাকেন, এবং স্থায়ী বসবাস ছেড়ে পুনরায় যাযাবর জীবনযাত্রা শুরু করেন। তাই অনেক চিত্রবিজ্ঞানী তাঁদের 'বেদে' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হিন্দু সমাজে তাঁরা ব্রাত্য পর্যায়ের ছিলেন। মুসলমান যুগ বিশেষ করে আকবরের সময়ে তাঁদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং ক্রমে তাঁরা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন। ফলে হিন্দু ধর্মের প্রবল জোয়ারের টানে তাঁরা হয়ে পড়েন অন্ত্যজ। তাই ধর্মমঙ্গলে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'পূজি শ্রী নৈরাচার, / শূন্য মূর্তি ধ্যান করি / সাকার মূর্তি ধরি'। অর্থাৎ শূন্য মূর্তি ধ্যান করি আর সাকার মূর্তি ভজি। আর মুসলমান আমলে তাদের গানে আনতে হল :

হিন্দুদের নারায়ণ তুমি মোসলমানদের পীর।
দুই কুলে পুজো খেয়ে বাবা হয়েছে হাজির।।
সত্যপীর বলে আমি নাম সত্য হব।
সিন্ধু রাজার দেশে পূজা প্রচার করিব।।

ফলে জাতি হিসেবে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে তাঁরা হিন্দুও বটে আবার মুসলমানও বটে। ওঁদের প্রত্যেকের এখন দুটো করে নাম থাকে। হিন্দু নাম দুখু হলে, মুসলমান নাম হবে দুখুউদ্দিন।

যেমন কালীঘাটের পটশিল্পী, শেষতম পটশিল্পী শ্রীশ কর্মকার; কিন্তু তাঁর কাকা থাকেন বহরমপুরে তাঁর নাম রহমত। গুরুসদয় দত্ত বীরভূমে যখন জেলাশাসক ছিলেন (১৯৩০-১৯৩৩) তখন পটুয়া শিল্প এবং তাদের জীবনচর্চা এবং তাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, সেগুলি তিনি সংগ্রহ করার কালে, তাদের সম্পর্কে প্রায় দশটা কবিতা লিখেছিলেন। যেন ব্যক্তিগত ডাইরির অংশ—'মুসলমান ও হিন্দু দুয়েই / এদের করে ঘৃণা / মুসলমান কি হিন্দু এরা / সেটাও বোঝা ভার / এদের কাছে দুয়েই করে / রুদ্ধ তাদের দ্বার। ...নামাজ পড়ে মুসলমানে / নাম ধরে হিঁদুর'; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে একাদশ দ্বাদশ শতকে এঁদের শ্রেণিগত যে বিন্যাস করা আছে, তাতে একটা মজার গল্প জুড়ে দেওয়া আছে।

ইন্দ্রের সভায় ঘৃতাচী অপ্সরা নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করেন। তিনি কামদেবের আদরের রতিসঙ্গিনী। রতিকার্য সম্পন্ন করে ঘৃতাচী তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন, বসন গিয়েছিল আলগা হয়ে, বিশ্বকর্মা সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ কামার্ত হয়ে রতি সুখ প্রার্থনা করেছিলেন। ঘৃতাচী তাঁকে জানিয়েছিলেন—আজ তিনি তাঁর গুরুপত্নী সুতরাং আজকে মিলন অসম্ভব। এর বারো বছর পর যখন ঘৃতাচীর সঙ্গে বিশ্বকর্মার দেখা হয় তখন ঘৃতাচী গুরুপত্নী নন, তখন তিনি বিশ্বকর্মার আহ্লাদ পূর্ণ করেছিলেন। চৌদ্দ বছর তারা একত্রে ছিলেন, তখন তাদের ন' পুত্রের জন্ম হয়। এঁদের সপ্তম পুত্র এই চিত্রকর। সমাজে এঁদের কোনো মান মর্যাদা নেই। এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণি।

এই গণতান্ত্রিক যুগেও এঁদের কোনও জাতিভুক্ত করা হয়নি। অন্ত্যজের শেষধাপে এঁরা আছেন। এঁদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুরুসদয় দত্ত তাঁর এক মর্মস্পর্শী কবিতায় জানিয়েছেন—

'খ্যাও এরা পটুয়া নামে / পেশায় চিত্রকর। / শীর্ণ এদের শরীর গুলি / জীর্ণ এদের ঘর।। / গ্রামের সকল দরিদ্রদের / চেয়েও এরা দীন। / এদের পাড়া গ্রামের ভিতর / সব চেয়ে মলিন।।'

আবার অপর এক কবিতায় এঁদের শিল্পধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন—

'এরাই ছিল প্রাচীনযুগে / বিশ্বকর্মার জ্ঞাত। / রাজার চিত্রশালার চিত্র / এদের শুধু হাত।। / ময়দানবের পুরীর ছবি / এরাই দিত এঁকে। / অজন্তায় দেয়াল রঙ্গে / এরাই দিত মেখে।। / জ্ঞানীর গুণীর কীর্তি এঁকে / রচত এরা ছবি। / এরাই ছিল জ্ঞানের গুণের কীর্তি-গাথার কবি।। গানের সুরে পুরাণ শ্রুতি / ইতিহাসের বাণী। / দেশের নর নারীর ঘরে / এরাই দিত আনি।।'

পটের কাহিনিতে থাকে পুরাণ কাহিনি যেমন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণলীলা, দুর্গাপট, জগন্নাথপট, যমপট, যাদুপট, হরদুর্গাপট চৈতন্যপট ইত্যাদি ধর্মীয় চেতনামূলক পট। লক্ষণীয় এগুলি কেউই বর্ণহিন্দুদের দেবতা নয়, এঁরা হিন্দুদের দেবতা হলেও, দেবকুলে এঁরা ব্রাত্য। আর সাঁওতালদের আছে চক্ষুদান পট। ওঁরা নিজেরা যেমন ব্রাত্য তেমন কাহিনিগুলোও ব্রাত্য। এগুলো মূলত বৌদ্ধদেবদেবী, কায়দা করে হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন জগন্নাথ ছিলেন উড়িষ্যায় জেলেদের আরাধ্য দেবতা, লোকায়ত দেবতা। তাঁকে জোর করে বর্ণহিন্দুদের দেবতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এখনো উড়িষ্যার গ্রামগুলিতে সমীক্ষা করলে দেখা যায় তাঁরা জগন্নাথের জায়গায় এখনো বুদ্ধের মুখ বসিয়ে দেন, তাঁরা জগন্নাথকে বৌদ্ধতন্ত্রের বুদ্ধ বলে ভাবেন তাই ওখানে এক নারীর উপস্থিতি পাওয়া যায়, নাম সুভদ্রা। 'মা' বৌদ্ধতন্ত্রে, বজ্রযানে— আদ্যাশক্তি পরবর্তীকালে ইনিই শ্রীচণ্ডী। কবি দ্বারিকাদাস ওড়িয়া হরফে বাংলা ভাষায় মনসামঙ্গল লিখেছিলেন। তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে মনসার কাহিনি ঢুকে যায়। নীলাম্বর আর ছায়ার উপাখ্যান রূপে নীলাম্বর ইন্দ্রপুত্র, লোভের জন্য পাপভ্রষ্ট হয়ে এক বণিকের পুত্র হল, তার নাম হবে লক্ষ্মীন্দর। আর তার পত্নী ছায়াও শাপভ্রষ্ট হবেন। তিনি হবেন বেহুলা কিন্তু স্বর্গলোকে কি নামের অভাব ছিল? ছায়া সূর্যের পত্নী, কোনারকে তার মন্দির আছে, নীলাম্বর নিশ্চয় সূর্য দেবতা। এঁরা বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবী, বর্ণহিন্দুদের হাতে পড়ে পাপে ভ্রষ্ট হবেন না? নিশ্চয় হবেন। ফলে দেবতা কেবল কুলীন দেবতা নয়। আর কাহিনিতে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব পট। ব্রাহ্মণ্যবাদে সৃষ্টিতত্ত্বে দেবতা একাই পৃথিবী সৃষ্টি করে ছিলেন। বাইবেলে ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এঁদের সৃষ্টিতত্ত্বে একা কোনো দেবতা পৃথিবী সৃষ্টি করেননি। ওঁদের আদি দেবতা জলের জীব, সাপ, কচ্ছপ আর বান মাছ। এঁদের ডেকে আদেশ দেবেন, যাও মুখে করে মাটি তুলে এনে পৃথিবী তৈরি করো। এই মাটি তুলে অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি হল। তারপর দুটো পাখির জন্ম হয়। এই পাখির লালা থেকে ডিম হয়, ডিম ফুটে দুটো মানুষের জন্ম হয়— পিংটু হারাম, পিংটু বুড়ি। পাখি থেকে মানুষের জন্ম।

মুক্তির স্বাধীনতা নিয়ে মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু এই পটুয়ারা কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে নি। তাঁরা অন্তরে তীব্র স্বাধীনতা রেখে দেন, সেই গর্ব হতেই তাঁদের পট ও গান তৈরি হয়। শুধু পট একা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তার সঙ্গে গান থাকে, বিচ্ছিন্নভাবে গানগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, দুটোই একত্রে মিশে তবে দৃশ্যপটের খোলতাই হয়।

আজকাল সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে পট লেখা হয়, যেমন—বন্যা, স্বাধীনতা, নেতাজি, পণপ্রথা, সাক্ষরতা, বধূহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীদের নিজস্ব কাহিনি নিয়ে পট, তাও মুগ্ধকর।

গুরুসদয় দত্ত বীরভূমের বহু পট ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি জাতীয় সম্পদ। গানের মাধুর্য ও গায়নরীতি, বাক্যগঠনেই বুঝিয়ে দেয়। সেই গানের অংশ বিশেষ যেমন

১. এক চুমুক, দুই চুমুক, তৃতীয় চুমুকের বেলায় পূতনা বধ হল।
পূতনা ম'ল ভালই হ'ল শব্দ গেল দূরে—
পূতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভুবন পর্ব্বত সমান জুড়ে (কৃষ্ণলীলা)
২. সব সখী পার করিতে নিব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে নিব কানের সোনা।
বলে বৃন্দাবনে থাক কৃষ্ণ রাধের কিবা দুঃখ
ভাঙ্গা নায়ে খেয়া নিতে কত পাবে সুখ। (কৃষ্ণলীলা)

শূদ্ররা শ্রম করবে, তবে ব্রাহ্মণ বাঁচবে। শান্ত প্রতিবাদ বার হয়ে এল। এই প্রতিবাদ তাঁরাই রচনা করতে পারেন যাঁদের কোনো রামায়ণ কিংবা মহাভারত নেই। তাই তাঁরা নিজেদের জন্য নিজস্ব রামায়ণ ও মহাভারত রচনায় ব্যস্ত সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত। ওঁদের রামায়ণ মহাভারত হল ওঁদের পটচিত্র আর তার গান। এখনো চারণের মতো ওঁরা গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ান। বিনয় ঘোষ মেদিনীপুরে পট খুঁজতে গিয়ে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন, পটের আর সেদিন নেই। তবুও বলি পট আবার নতুনভাবে পুরনো ধারাকে নিয়ে গড়ে উঠছে, সেই মেদিনীপুর থেকেই। ওঁদের জন্য আজ হস্তশিল্প মেলায় বিশাল মণ্ডপ সাজানো হয়।

ভাসা ওরে ডিঙ্গা সাগরে—
ডিঙ্গা ভাসাও সাগর সাথীরে
সাত ডিঙ্গা সাজন করলে মনেরই হরষে। (মনসাপট)

গানগুলি লোকসংগীতের সম্পদ আর এঁদের চিত্র রচনায় রেখার প্রাধান্য থাকে। সরল এবং গতিময় রেখা যা মনের সরাসরি প্রকাশ, এর ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল অজন্তা থেকে।

ভারতীয় চিত্র ইতিহাসের ও সংগীত চর্চার ইতিহাসে পটুয়ারা ব্রাত্য নন। বৌদ্ধ পরবর্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার আত্মসংস্কৃতির ও সভ্যতার মূল উৎসের সন্ধান এই পটগীতি বা পটুয়া সংগীতগুলিতে যে সহজ সরল, সুস্পষ্ট ও অনাড়ম্বর ভাবে পাওয়া যায় সেরকম আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পপ আর্ট

শোভন সোম

পপ আর্ট অভিধার প্রথম শব্দটি পপুলার শব্দের খণ্ডরূপ বা অপভ্রংশ। ১৯৫০-৬০-এর মধ্যে উদ্ভূত ব্রিটিশ ও মার্কিন শিল্পকলার একাধিক প্রবণতার মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত প্রবণতাকে চিহ্নিত করার জন্যে শিল্প সমালোচক লরেন্স অ্যালোওয়ে এর নামকরণ করেন পপ আর্ট।

এই প্রবণতার তিনটি বিশেষ লক্ষণ হল, ১. এই শিল্পকলা অবয়বধর্মী এবং 'বাস্তবধর্মী'। ১৮৬১-তে ফরাসি চিত্রকর গুস্তাফ কুর্বে বাস্তববাদী শিল্পের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সময়ের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থাকে শিল্পকলায় স্থান দেওয়াই বাস্তববাদ। একশো বছর পরে মার্কিন পপ শিল্পী রয় লিখ্‌টেনস্টাইন বলেছিলেন, পপ আর্ট চতুর্দিকে বিকীর্ণ পৃথিবীর দিকেই তাকায়। পপ আর্টে এই 'বাস্তববাদ'কে সমকালিক রহস্যবাদী অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখতে হয়। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে মনোজগতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার প্রতিফলনের কথা, আকস্মিকতার কথা, স্বতঃচলনের কথা বলা হয়, কিন্তু পপ আর্টে দৃষ্টজগতের যেকোনো মানবসৃষ্ট রূপের মধ্যে নিহিত নান্দনিকতার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ২. পপ আর্ট আদ্যোপান্ত নগরকেন্দ্রিক নাগরিক শিল্প এবং বর্তমান সভ্যতার কল্যাণে উপভোগযোগ্য যেকোনো বস্তুর আকার-আকৃতি, উত্থাপন ইত্যাদির মধ্যে এই শিল্পকলা গণসংস্কৃতির অভিব্যক্তি দেখেছে এবং তথাকথিত বাণিজ্যিক শিল্প বা কমার্শিয়াল আর্ট ও চারুকলা বা ফাইন আর্টের মধ্যে পপ আর্ট কোনো ভেদাভেদ মানে না। ফলে পপ আর্ট কেবল দেয়ালের শোভার জন্য বা ঘরের সৌন্দর্যসাধনে ব্যবহৃত জিনিসে সৌন্দর্য দেখেনি। এ যাবৎ যে-সকল 'শিল্প'কে শিল্পকলার মর্যাদা দেওয়া হয়নি অথচ যে সকল জিনিস প্রতিনিয়ত নাগরিক জীবনে—আমাদের দৃষ্টিকে আনন্দ দিয়ে চলেছে, তার মধ্যেও পপ আর্ট সৌন্দর্য দেখেছে। যেমন কমিক স্ট্রিপ্, যে কোনো বিজ্ঞাপন, যে কোনো প্যাকেজিং, চিত্রতারকাদের জনপ্রিয় ছবি, কনজিউমার ডিউরেবল বা যন্ত্রোৎপাদিত ভোগযোগ্য জিনিস—সবকিছুর অঙ্কনে, গঠনে, বিশেষভাবে উত্থাপনে, পপ আর্টের দর্শনে নান্দনিকতা দেখা হয়েছে। একই কারণে জ্যাসপার জোন্স দুটি এইল্ বা বিয়ারের খালি টিনকে একটি বেদীতে শিল্পকলা হিসেবে সাজিয়েছিলেন; অ্যান্ড ওয়ারহোল 'মোনালিসা'র প্রতিকৃতির পোস্টার পরপর ছেপেছিলেন; তিনিই পরপর উপর থেকে নীচে

সাজানো কোকাকোলার সার সার খালি বোতল এঁকে নিচে 'কোকাকোলা' লিখেছিলেন; রিচার্ড হ্যামিলটন বিজ্ঞাপন থেকে কাটা ছবি জুড়ে জুড়ে নাম দিয়েছিলেন 'এই-ই কি সেই বস্তু যা আজকের গৃহকে এত আলাদা, এত আকর্ষণযোগ্য করেছে?' এবং রয় লিখ্‌টেন্‌স্টাইন কমিক্‌স্ট্রিপ্‌ থেকে ব্লার্ব-সহ এক একটি অংশকে বৃহদাকারে সিল্ক স্ক্রিনে ছেপেছিলেন। পপ আর্ট কেবল নাগরিক জীবন সম্পৃক্ত শিল্পকলাই নয়, এই শিল্পকলা পুঁজিবাদের বিকাশেরই শিল্পকলা, কারণ এই শিল্প বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড থেকে উপভোগের যাবতীয় বস্তুতে, এমনকী পেশিবহুল নগ্ন পুরুষের ও সুকুমারী নারীর যৌন-আবেদনমূলক পোস্টারেও নান্দনিকতা দেখে। এর দর্শন, চিত্রের ভাষায় অহরহ যে আবেদন আমাদের দেখাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে, তাকে শিল্পভাবনা বর্জিত বলা যায় না। বস্তুত আজকের বিজ্ঞাপন শিল্পের সাইনবোর্ডের উৎকর্ষের, প্যাকেজিং-এর উদ্ভাবনের পেছনে সক্রিয় রয়েছে পপ দর্শন। ৩. পপ আর্টের বিষয় বা রূপের উত্থাপনও সাবেক থেকে আলাদা। পপ আর্টে যে সকল বিষয় ও মোটিফ বা রূপের একক ব্যবহৃত হয়, সে সব প্রাক্তন কোনো শিল্পকলায় বিষয় বা অঙ্কনযোগ্য রূপ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। যেমন কোকাকোলার বোতল, যেমন রোড সাইন, এবং এইভাবে বিশ শতকে যন্ত্রসভ্যতার অনুকূলে পপ আর্ট একধরনের সাংস্কৃতিক আইকন বা সাংস্কৃতিক নবপ্রতিমা বা সংস্কৃতির নবীন ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

রূপগতভাবে পপ আর্ট যে স্বনির্ভর ছিল, তা বলা যায় না। কোথাও পপ আর্টের মধ্যে দাদাইস্ট ভাবনা মিশে গেছে, কোথাও পপ আর্টকে মিনিম্যাল আর্ট থেকে স্বতন্ত্র করাও কষ্টসাধ্য। ক্লিস্‌ ওল্ডেনবার্গ যখন বিশাল আকারে ক্যানভাসের হ্যামবার্গার তৈরি করেন বা লাইটের সুইচ তৈরি করে ভোগ্যপণ্যের রূপের মধ্যে সৌন্দর্য দেখান, তখন দাদাইস্টদের দর্শনের আভাস তাতে লাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দাদাইস্টরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে প্রচলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, সাবেক মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করেছিলেন ও দীর্ঘদিনের নন্দনচেতনাকে আঘাত করেছিলেন। মিনিম্যাল আর্টেও রূপের জ্যামিতিক সরলীকরণ করা হয়েছিল, যে ধরনের সরলীকরণ ও বাহুল্যবর্জন পপ আর্টে দেখা যায়।

তথাকথিত উচ্চ শিল্পকলা বা হাই আর্টের উন্নাসিকতা থেকে দর্শকদের মুক্তি দিয়ে পথঘাটে যথতত্র চিত্রভাষা প্রকাশিত ভোগবাদী সমাজের বস্তু নিয়ে সৌন্দর্য দেখার কথা বলেছে পপ আর্ট। এদিক থেকে গ্যালারিবদ্ধ আর্টের বাইরে বিকীর্ণ চতুর্দিকের মানুষের তৈরি আধুনিক জীবনের জিনিসের নকশার উন্নয়নে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পপুলার কালচার

রংগন চক্রবর্তী

রেমন্ড উইলিয়ামসের মতে 'কালচার' হল ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে জটিল দুটো তিনটে শব্দের মধ্যে একটা। কালচার নিয়ে আলোচনা যে সহজ নয়, বলাই বাহুল্য। কালচারকে বাংলায় আমরা সংস্কৃতি বলে থাকি। উইলিয়ামস সংস্কৃতির সংজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে তিন ধরনের ধারণার কথা বলেছেন। প্রথমত, আমরা সংস্কৃতি বলতে একটা জাতির মননের বিকাশ, আত্মিক উন্নতি, সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ ইত্যাদি বোঝাতে পারি, যে ভাবে ধরা যাক আমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা বলি। দ্বিতীয় অর্থে দেখলে সংস্কৃতির ধারণা একটা জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের প্রথাগুলোকে বোঝাতে পারে। এই অর্থে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বলতে খেলাধুলো, আচার ব্যবহার সবই ঢুকে পড়বে। তিন নম্বরভাবে সংস্কৃতিকে দেখলে এটা সমাজের বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে শিল্পীদের কাজগুলোকে বোঝায়, যার মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রভাবশালী রূপকগুলো তৈরি হয়। নাটক, গান, ফিল্ম, নভেল, কবিতা—এইগুলো থেকে একটা সমাজের ধ্যান ধারণার প্রতিফলন পাই, সেই সমাজ কী কী রকম ভাবে সেই সময়ের পৃথিবীর, অতীত আর ভবিষ্যতের মানে তৈরি করছে, এবং ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, সেটা টের পাই।

পপুলার কালচারের আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা সংস্কৃতিকে মূলত এই শেষ দুভাবেই দেখি। একটা হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে ফুটে ওঠা সংস্কৃতি, আরেকটা হচ্ছে সেই যুগের চালু সাংস্কৃতিক অভ্যাসগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত ধ্যান ধারণা—এই দুইকে বোঝার চেষ্টা করেই আমরা পপুলার কালচারকে বোঝার চেষ্টা করি। অনেক সময় 'সংস্কৃতি' কথাটার মধ্যে কেমন একটা মহত্ত্বের গন্ধ থাকে, একটা ঊর্ধ্বমুখী দিশার ইঙ্গিত থাকে, পপুলার কালচারে যেন সেটা একেবারেই নেই। ম্যাথু আর্নল্ড ইংরেজি ভাষায় বড় হাতের সি দিয়ে শুরু কালচার আর ছোটো হাতের সি দিয়ে শুরু কালচারের তফাৎ করেছিলেন, সেটাই যেন কালচার আর পপুলার কালচারের তফাৎ নির্দেশ করে দেয়। এই ধারণাটা কতটা সত্যি তাই নিয়ে অবশ্য এখন প্রশ্ন উঠছে।

আমাদের পক্ষে বাড়তি জটিলতা হল যে এই আলোচনাটা বাংলায় সংস্কৃতি আলোচনার দীর্ঘ ঐতিহ্য ও দৈনন্দিন অভ্যাসের থেকে আলাদা করে তো করা যায় না। সেখানে আবার অপসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বোধের লম্বা ইতিহাস

আছে। লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি সেটা ইংরেজিতে যাকে ফোক কালচার বলা হয় তারই কাছাকাছি। সরল করে বলতে গেলে বলা যায় কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যুগযুগ ধরে চালু সাংস্কৃতিক অভ্যাস ও চর্চাকেই আমরা লোকসংস্কৃতি বলি। বামপন্থী ভাবধারায় এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিপ্লব চেতনা ঢুকিয়ে যে নতুন রাজনৈতিক চেতনার সংস্কৃতি তৈরি করা যায় তাকেই গণসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। আর প্রচলিত বাম দৃষ্টিতে শাসকদের স্বার্থে প্রচারিত যে-সংস্কৃতি মানুষকে বিপ্লবের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, ব্যক্তিগত উন্নতির স্বপ্ন দেখায়, কাম-মোহ-ভোগের চক্রে ভুলিয়ে রাখে তাঁকে অপসংস্কৃতি বলে। এ সবের মধ্যে পপুলার কালচারকে তাহলে কোথায় রাখব? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে পপুলার কালচার বলতে কী বোঝায় সেটা জেনে নেওয়া যাক।

আবার উইলিয়ামসের শরণাপন্ন হলে আমরা দেখব যে উনি বলছেন পপুলার কালচারকে চার ভাবে দেখা যায়। ১. 'অনেক মানুষের ভালো লাগে', ২. 'নিকৃষ্ট মানের', ৩. 'লোককে খুশি করার উদ্দেশ্যেই তৈরি', ৪. 'যে সংস্কৃতি মানুষ নিজেদের জন্য, নিজেরাই তৈরি করেছে'। ধারণাগুলো আমাদের পরিচিত লাগছে কি? টেলিভিশনে জনপ্রিয় সিরিয়ালের কথা ভাবুন। ১. অনেকের ভালো লাগে, ২. অনেকে মনে করেন নিকৃষ্ট মানের (এত জোরালো এই মত যে যাঁদের ভালো লাগে তাঁরাও একটু সঙ্কুচিত ভাবেই যেন বলেন ভালো লাগে) ৩. এগুলো অবশ্যই মানুষকে ভালো লাগিয়ে পয়সা করার জন্য তৈরি, অন্য কোনো কারণ এঁর নির্মাতারাও দাবি করবেন বলে মনে হয় না। ৪. সিরিয়ালের ক্ষেত্রে বলা না গেলেও বাংলা ব্যান্ডের ক্ষেত্রে অবশ্যই চতুর্থ কথাটাও বলা যেতে পারে—মানুষ নিজেরাই নিজেদের জন্য তৈরি করেছে, প্রধান বাহন অবশ্যই ক্যাসেটের বাজার।

সংস্কৃতি নিয়ে চালু আলোচনায় 'পপুলার কালচার'-এর সবচেয়ে কাছের ধারণা হবে 'অপসংস্কৃতি'। 'লোক' বা 'গণসংস্কৃতি' নয়। এর মূল কারণ হল পপুলার কালচার বলতে আমরা যা বুঝি সেটা একটা বাণিজ্যিক কারণে তৈরি হয়, এবং আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। বাংলায় সংগঠিত মার্ক্সবাদী বিতর্ক থেকে শুরু করে নানান ধরনের মানবতাবাদী শিল্প সংস্কৃতি আলোচনার ঘরানা আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও বাজার বিরোধিতায় এঁরা অনেক দূর পর্যন্ত এক। এই বিরোধিতার মধ্যে নানান সুর থাকে—বাজার সংস্কৃতিকে পণ্যে পরিণত করে মানবিক মূল্যবোধগুলোকে বাজারের মাল করে তুলেছে। বাজার নিজেদের স্বার্থে পলায়নপর মনোবৃত্তির প্রসার ঘটাচ্ছে, বাজার যুবশক্তিকে বিপথে ঠেলছে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই কারণে পপুলার কালচারের বাংলা হয়ে উঠেছে বাজারি সংস্কৃতি।

এই বাজারি সংস্কৃতির বিপদ সম্পর্কে আলোচনার সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ভিৎ পাওয়া যায় ফ্রাংকফার্ট স্কুল, বিশেষ করে থিওডোর অ্যাডোর্নোর লেখায়। অ্যাডোর্নো ধনতন্ত্রের নেতৃত্বে উৎপন্ন মাস কালচারের বিপদ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী করেছিলেন। তাঁর মতে এই বাজারি সংস্কৃতি মননকে ধ্বংস করে দেয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও প্রথাগত বাম সমালোচনা এর থেকে খুব বেশি এগোয় নি বলেই মনে হয়।

গত কয়েক দশকে বৃহদর্থে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী বেশ কিছু শিবিরে সংস্কৃতি নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তার ফলে পপুলার কালচার নিয়ে নতুন ভাবে ভাববার কিছু খোরাক আমরা পাচ্ছি। ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট হল প্রমুখের নেতৃত্বে বার্মিংহামে যে প্রচেষ্টা শুরু হয় সেখান থেকে দুনিয়া জুড়ে কালচারাল স্টাডিজ নামে একটা নতুন অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদে সমাজকে বুঝতে গিয়ে অর্থনীতির ওপর যে প্রায় একক ঝোঁক থাকে, এই চর্চা তার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে। পপুলার কালচার নিয়েও নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। পুরোনো দৃষ্টিতে বাজারে তৈরি সাংস্কৃতিক পণ্য যেন শুধুই মানুষকে জোর করে গিলিয়ে দেওয়া হত, মানুষ যেন হয় মননহীন, নয় অসহায় শিকার। আজকে প্রশ্ন উঠছে গল্পটা কি অতই সরল? না কি পপুলার কালচারের মধ্যে মানুষ প্রতিদিনের লড়াইয়ের, জীবনের মানে তৈরি করার রসদ খুঁজে পায় বলেই এই পণ্যগুলো এত জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশেও রাজ কাপুরের, অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা থেকে শুরু করে দেবদেবী-ক্রিকেটার-ফিল্মস্টার-পোস্টার কী ভাবে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস অবিশ্বাসের গল্প বলে তাই নিয়ে সমালোচকরা নতুন করে সজাগ হচ্ছেন। মাদার ইন্ডিয়ার নার্গিসকে কি বাজারের তৈরি আজগুবি অপসংস্কৃতি বলে উড়িয়ে দিয়ে কোনো লাভ আছে? এই ভাবে কি ভারতবর্ষ নামে ১০০ কোটির দেশকে বোঝা যাবে? যে প্রদেশে মার্ক্সবাদীরা প্রায় তিন দশক ধরে ক্ষমতায় সেখানে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' নামের ছবি সুপারহিট হয় কেন? পরীক্ষিৎ বালা বলে একজন গায়কের রসের গান শুনতে আসর ভেঙে পড়ে কেন? গণসংগীতের ক্যাসেট জীবনেও এদের সঙ্গে বিক্রির দৌড়ে কোথাও দাঁড়াতে পারে না কেন? সবটাই শুধুই বাজারের চক্রান্ত আর অবুঝ শ্রোতাদের মগজ ধোলাইয়ের গল্প? পপুলার কালচার চর্চা আমাদের এই সব অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনুপ্রাণিত করে।

পর্নোগ্রাফি

সুমন ভট্টাচার্য

যে লেখা বা ছবি বা চলচ্চিত্র কেবলমাত্র যৌন-উত্তেজনা সঞ্চারের জন্যই 'নির্মিত' হয়—তা-ই পর্নোগ্রাফি।

পর্নোগ্রাফি-র যথার্থ বাংলা পারিভাষিক শব্দ এখনো নেই। তার কারণ এই শব্দের উদ্ভব যে সামাজিক পরিস্থিতিতে, ভারতবর্ষে তার উপস্থিতি থাকলেও 'স্থিতি' প্রথমত সংগুপ্ত, দ্বিতীয়ত বিচলিত। গ্রীক Pornela শব্দের অর্থ গণিকা বা পণ্যমানবী। আর সম্ভাব্য উদ্ভবসূত্র—Pernemi—যার অর্থ বিপণন। বন্দী, বিশেষত বন্দিনীদের বিক্রি করার ইতিহাস ধরা আছে এই শব্দে। এ পর্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাস। 'সভ্যতা'র জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এই অসভ্যতা সমাজের যাপন থেকে 'বিলগ্নীকৃত' করা যায়নি। আর যৌনপল্লী ও যৌনপণ্যায়ত নারীদের বিষয়ে লেখাই প্রাথমিকভাবে পর্নোগ্রাফি-র জন্মসূত্র। অনুমান করা হয় যে, গণিকা এলাকায়, বেশ্যাবাড়ির দরজায় ঝোলানো বিশেষ চিহ্ন থেকেই এই পর্নোগ্রাফির ক্রমিক বিকাশ। সম্ভবত তারই ভিন্নমাত্রা—যৌনপল্লীতে সাধারণ বসতবাড়ির গায়ে 'ভদ্রলোকের বাড়ী, গৃহস্থের বাড়ী' প্রভৃতি লিখে রাখা ('রুক্মিনীকুমার' / কমলকুমার মজুমদার)। আর সেই একটি বিশেষ চিহ্ন-সংস্থাপনই একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে গণিকাদের বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণীর আকার নেয়।

নারীর পণ্যরূপ এক আদিম প্রকরণ। নারীত্বের অবমাননার প্রসঙ্গটিও সেখানে স্থিতিশীল। কিন্তু গোল বাধে—যখন পণ্যমানবী তাঁর যৌনসামর্থ্য ও চাহিদাকেই ব্যবহার করে সমাজে এক অন্যতর প্রভাব সৃষ্টি করেন। তা সমাজ-স্বীকৃত হয় না, কিন্তু তাকে গোপন করাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যেমনটা ঘটেছিল দশম শতকের ভ্যাটিকানে—পোপতন্ত্রের মাঝখানে প্রাধান্য বিস্তার করেন মারোজিয়া আর তাঁর মা থিওডোরা। গড়ে ওঠে পর্নোক্র্যাসি।

প্রকৃতপক্ষে, পর্নোগ্রাফি, একটি বিতর্কিত ও আপেক্ষিক শব্দ। এখনো পর্যন্ত এর কোনো আইনি সংজ্ঞা নেই, যাকে স্থিতিশীল বলা যায়। বিশেষত নারী ও নারীত্বের দৃষ্টিতে পর্নোগ্রাফি, এই হিংস্র, অমানবিক ও অবমাননাকর সামাজিক নির্মাণ রূপে চিহ্নিত হলেও, একই সঙ্গে নারীর যৌনসামর্থ্যের সামনে, যৌন-আকর্ষণের সামনে পুরুষের ক্রীতদাসসম আচরণের একটি রূপও মূর্ত হয় বলে এখানে নারীরও আগ্রাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত একথা বলা হচ্ছে। আর বলতে গেলে শব্দটির 'মৌলবাদী' অর্থও

ওই অভিমতের সমর্থক। কারণ—পর্নিরাস্টিক (Pornerastic) বা কামতাড়িত নারীর অনুগত পুরুষের রূপও পর্নোগ্রাফির এক মুখ্য নির্মাণ—আর এই আনুগত্যেই পর্নোগ্রাফির সূচনা।

যদিও গণিকা আর গণিকালয়ের তথ্যকে পঞ্জিকৃত করার সেই প্রয়াস যে বিকৃত যৌন মানসিকতার পরিচায়ক সেখানে পুরুষের আধিপত্যবাদী মনকে অস্বীকার করা যায় না। আর এখন পর্নোগ্রাফি সীমিত হয়েছে 'হলুদ বই' আর 'নীল ছবি'র গণ্ডিতে।

দৃশ্যমাধ্যমের এই অনায়াসগম্য যুগে নীল ছবি-ই পর্নোগ্রাফি-র পরম মোক্ষ—তবু তারও একটি চিত্রনাট্য লিখতে হয়, অর্থাৎ কাহিনিরূপ দাঁড় করাতে হয়, আর শেষত যৌনকর্মকেন্দ্রিক তথা যৌন-উত্তেজনার পরিতোষসাধ্য লেখাপত্রই পর্নোগ্রাফি। 'আবহমানকাল' ধরেই পর্নোগ্রাফির একটি সামাজিক চাহিদা আছে আর দৃশ্যরূপপ্রধান যুগেও এই বই-এর বাজার যথাপূর্বম্। আর 'সে যুগের কেচ্ছা এ কালের ইতিহাস'-এর অমোঘ সূত্রে যাবতীয় কামাত্ম-'রচনা'ই শিল্প অথবা অশ্লীলতা সংক্রান্ত বিতর্কে হাবুডুবু খেয়ে ক্রমাগত গ্রাহকের জন্ম দেয়।

পর্নোগ্রাফি-র বহমানতায় তার কিছু চরিত্রগত প্রভেদ আছে। একদিকে—ইরোটিকা, যেখানে বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ গান, কবিতা, ছবি, কাহিনি, ভাস্কর্যের আকারে ঈষৎ বিস্তৃত অনুপুঙ্খে রূপায়িত। আর অন্যদিকে—এক্সোটিকা, যা অস্বাভাবিক যৌনাচার, সমকাম, মর্ষকাম, যৌনবিকারের বহুরূপতাকে ক্রমাগত আবিষ্কারে ব্যস্ত। ওভিদ্-এর *আর্স আমাতোরিয়া* (খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতক) বা বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক) বা ক্যাসানোভা-র *মেময়্যার্স* (১৮২৬-৩৮) কে ধরা যায় ইরোটিকা-র পরিচয়ে। আর সাদে-র জাস্তিন (১৭৬৮), *দ্য ১২০ ডেজ্ অব সডম* (১৭৮৫), সাচের মাসোচ-এর *ভেনাস ইন ফার্-স* (১৮৭০) গণ্য হবে এক্সোটিকার পরিচয়ে।

তবে পর্নোগ্রাফির অধুনায়ত সামাজিক রূপ বা তার 'পরিষেবা'-র রূপ আরো ভয়ংকর এবং বিকৃত। আদিম সেই বিক্রেয় মানবী বা মানবের সঙ্গে এখন পাল্লা টানে যৌন 'খেলনা'—জাম্পিং জ্যাক বা রবার মানবী, আর ডিলডো বা নকল পুরুষাঙ্গ—এখন হোর বা গিগোলো-র সমরূপতায় প্রতিষ্ঠিত। একে সামাজিক ঔচিত্যবোধে অশ্লীল বলে দেগে দেওয়া সহজ। কিন্তু সেই 'ভদ্র' আর 'সভ্য' সমাজমানুষই তো এর গ্রাহক—সেখানেও তো সংখ্যাধিক্যের সমর্থন আছে, যা কিনা গণতন্ত্রের শর্ত!

সাহিত্যের প্রকরণে দেখা যায় *আরব্যরজনী, দেকামেরন, কুট্টনীমতম্, বিদ্যাসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*-পর্নোগ্রাফি নয় কিন্তু পাঠকের এক বৃহদংশ পর্নোগ্রাফির উৎসাহ নিয়েই পাঠ করেন। আর পর্নোগ্রাফির সঙ্গে আঁটো হয়ে বসে পর্নোগ্রাফিক্ বা কঠিন পর্নোর সমান্তরালে 'পেলব' পর্নো-র চলে চোরাগোপ্তা অথবা বেপরোয়া কারবার।

সম্প্রতি, পর্নোগ্রাফি-র সামাজিক চাহিদা বা ক্রমবিবর্ধিত গ্রাহকতা এক সামাজিক সমস্যার আকার নিয়েছে। যৌনকর্ম এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু তা যদি মস্তিষ্কের যাবতীয় প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সমাজমন আক্রান্ত হয়, মনন বিনষ্ট হয়। বস্তুত কামানুষঙ্গ বা কামকথা সাহিত্য বা শিল্পের কোনো সমস্যা নয়, বরং 'মাটি, জল,

নীলাকাশ'—তার অতিরেক তো শিল্প নয়, অবান্তর কখনো না। সুতরাং কাম-তর্পণের নবনবোন্মেষ-যাত্রায় যেখানে পর্নোগ্রাফি উপভোগের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত যৌনানুষঙ্গী চিন্তা, আলাপ ও তার রূপায়ণের সুযোগ-সন্ধান—সেখানেই সভ্যতা পরাস্ত হয়। এখানেই পর্নোগ্রাফির নেতিসত্তা। কারণ—পর্নোগ্রাফির নারী—বিকৃত যৌনাচারের আহ্বায়ক বা আক্রান্ত যা-ই হোন, তা মানবসত্তার পরাভব। আবার সেই নারী / নারীবর্গই যখন সেই বিকৃতির প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন অর্থাৎ যৌনমানসিকতার বিকারকেই গ্রহণ করেন, তখন সমাজও তার প্রতি বিরুদ্ধযাত্রার শক্তি হারায়। অর্থাৎ যৌনবিকারকেই স্বাভাবিকতার পরিচয়ে সমাজে সংক্রমিত করে পর্নোগ্রাফি। 'পর্নো-পুরুষ'ও মেধাবর্জিত যৌনাচারের ক্রীতদাস।

আর এখানেই প্রশ্ন আর বিমূঢ়তা মাথা ঠোকাঠুকি করে—সমাজের বৃহদংশের চাহিদাই যদি সামাজিক চাহিদার কল্যাণমূর্তির আকারে গৃহীত হয় সেখানে—ফ্যাশন-প্যারেড, বিউটি কনটেস্ট-এর রমরমা বাজার কোন মানসিকতাকে স্বাভাবিক বলে চেনাবে? যখন প্রণয়চর্চার গাইডবুক-স্বরূপ পত্রিকা প্রকাশ পায়, পিতামাতা-ই পুত্রকন্যাকে কিনে দেওয়ার আয়োজন করেন—সমাজের সিংহভাগ যদি যৌনবিকারকেই উপভোগ করে—তাহলে পর্নোগ্রাফি-ই কি হবে সমাগত কালের শিল্পসাহিত্যের শিল্পমান-নির্ধারণের মাপক? আর নন্দনতত্ত্ব-ও রচনা করতে বসবে পর্নোগ্রাফিক শিল্প-সামর্থ্যের সূত্র বা তত্ত্বযাত্রা?

পরিবেশ

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইকোলজি আলোচনা করতে গিয়ে পরিবেশ-কথা এসে পড়ে। আমাদের চারপাশের পৃথিবীই তো পরিবেশ। জলজীবন, বায়ুপ্রাণ এবং প্রাণ-প্রাণীময় পৃথিবী নিয়েই আমাদের এই পরিবেশ। জীব ও জড়কে প্রায় সমছন্দে মিলিয়ে নেয় এই বসুন্ধরা।

পরিবেশের প্রভাব যেকোনো জীবদেহে পরিবর্তন আনতে পারে। জীব প্রাণের অস্তিত্বরক্ষা, বৃদ্ধি ও উন্নতি প্রায় অনেকটাই নির্ভর করে স্থানীয় পরিবেশের ওপর। সেই স্থানের তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, পরিসর, জলীয় দেহ, সবই মানুষ ও তার কাছের প্রাণ-প্রাণীজগতকে প্রভাবিত করে। সুপরিবেশ, আমাদের প্রাণে গতি সঞ্চার করে; জীবনে আনন্দ এনে দেয়। বাসভূমিকে, বিশ্বপ্রাণভূমিতে উত্তীর্ণ করাই সুস্থ পরিবেশ-এর বড়ো কর্তব্য। পরিবেশ সহায়ক জীবন যাত্রা একে অপরের প্রতি যে আত্মীয়তার ডাক দেয়, তা থেকেই গড়ে ওঠে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিত্য কথোপকথন—সার্থক মানবিক গৃহবাণী।

পরিবেশের সুরক্ষার সব থেকে বড়ো দায়িত্ব মানুষের। বৃহত্তর মানবসমাজ তার কাছের পরিবেশের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে সামগ্রিক পৃথিবী-পরিবেশ-ভবিষ্যৎ। প্রকৃতি পরিবেশমুখী জীবনযাত্রা, প্রাচীনকালে আমাদের তপোবন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নানা দেশের আদিবাসীদের সমাজ যুগযুগ ধরে অরণ্য প্রকৃতি পরিবেশ-মাঝে তাদের জীবন ও জীবিকা গড়ে তুলেছিল। পাখির কলতান, জীববৈচিত্র্য, প্রাণী সম্পদ ও মানুষ এককালে এই পৃথিবীতে সহাবস্থান-সুনীতি নিয়েই নানান ছন্দে গড়ে উঠেছিল। বিস্তীর্ণ জলপ্রাণ, সামুদ্রিক জীবন, বায়বিক পরিমণ্ডল একে অপরকে মানিয়ে নিয়ে প্রাণশৃঙ্খলকে সচলায়িত রেখেছিল। পৃথিবী পরিবেশ বৃহত্তর বিশ্ব আকাশে তার নিত্যসঞ্জীবিত ধারায় প্রকৃতির আতপ্ত স্পর্শকে সজাগ রাখতে পেরেছিল। পরিবেশ ঐকতান প্রাণ ও প্রাণীর ছন্দোময় জীবনকে রেখেছিল সুরক্ষিত।

এই সুরক্ষা বা পারস্পরিক ভারসাম্যের পরিবেশে আঘাত হানল মানুষ। তার বিশিষ্ট বুদ্ধি বলে, প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেই চলল। তারপর বেহিসেবি উন্নতির মত্ততায় নানান মারাত্মক শক্তি প্রয়োগে পরিবেশের স্থায়ী পরিবর্তন এনে ফেলল। জয়ী মানুষ শিল্পবিপ্লবের সাফল্যে আত্মহারা হয়ে, স্থিতিযোগ্য পরিবেশ উন্নয়নের আবশ্যিক শর্তগুলিকে হারাল। বিস্মৃত হতে থাকল মানুষের মানবিক

আত্মপরিচয়। আরো বৃহত্তর পরিবেশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। আত্মহারা উল্লাস, জীবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রযুক্তির অপব্যবহার—সামগ্রিক পরিবেশের অবনয়নও ডেকে এনেছিল। অসহায় বিস্তীর্ণ জীবমণ্ডল, সবুজ সম্পদ, বায়ুমণ্ডল, জলদেহ, মানুষেরই সঙ্গে সঙ্গে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু এত বড়ো মাপের পরিবেশ সংকট থেকে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। পুনর্গঠন সভ্যতার রূপায়ণে প্রযুক্তির যখন ডাক পড়ল, তখন কত দ্রুত সেই ক্ষমতাকে কে কতটা প্রয়োগ করবে সেই নিয়েও রাতারাতি প্রতিযোগিতা তুঙ্গে উঠল। সুযোগ এসেছিল পুনর্গঠন কর্মগুলিকে পরিবেশমুখী করে গড়ে তোলার। কিন্তু মানুষ শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথাই সব থেকে আপন করেছে। তার সময় ও উৎসাহ কোনোটাই ছিল না, আরো দুটি প্রাণ-প্রাণী জগতের কথা ভাবার। পরিবেশ চেতনা তো কোন সে সুদূরের কথা!

এমন অবজ্ঞা, দলন কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে প্রকৃতির প্রতিশোধের পালা। শুনতে যতই নাটকীয় হোক না কেন, আসলে ঘটনাটা কিন্তু তেমনই প্রায় ঘটেছিল। ১৯৬২ সালে, আকস্মিক একটি বিজ্ঞান সাহিত্য-র আবির্ভাব ঘটে। একটি বই—বিদগ্ধ বিজ্ঞানী-লেখিকা র‍্যাচেলকারসন-এর *The Silent Spring* প্রথমে আমেরিকায়, তারপর দিকে দিকে সাড়া ফেলে। এই পৃথিবী এক মানবিক বাসভূমি, বাস্তুভূমিতে প্রাণ-প্রকৃতি সকলের সমান অধিকার—এই নৈতিক সত্যকে হাজির করল বইটি। আধুনিক পরিবেশ চেতনা ও চর্চা এই বইটির কাছে আজও ঋণী। ঘটনাটি নিঃসন্দেহেই ঐতিহাসিক।

বসন্তকাল আসে আনন্দ সত্য নিয়ে আমাদের জীবনে। আসে পাখিরাও তাদের সংগীত নিয়ে। পৃথিবী যেন ফিরে পায় তার প্রতিদিনের সবাক ছন্দকে। খেতে ভরা ফসল, কীটপতঙ্গ, প্রাণ-প্রাণী, ফলফুলের মানুষী আনন্দেরই দান যেন পূর্ণতা ফিরে পায় বসন্তে পাখির গানে, কলতান-ধ্বনির ফল ফলানোর ছন্দে। ষাটের দশকে অধিক ফলনের, অতি দ্রুত কৃষি উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষায় আমেরিকায় যুগান্তকারী কীটনাশক রাসায়নিক ডিডিটি-র যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়। এই ডিডিটি-র প্রকোপে যেসব জীবাণু শস্য নষ্ট করে, তারা মরল, সেই সঙ্গে একই মরণযাত্রায় শামিল হল নানাবিধ কীটপতঙ্গ এবং এমন সব জীবাণু যারা শস্যের ক্ষতি করেই না বরং জমিকে আরো উর্বর করে। পাখিরা তাদের খাবার হারাল। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে তারা যেতে থাকল খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু যাবে আর কোথায়, আমেরিকায় সর্বত্রই তো ডিডিটি আর ডিডিটি। উপবাস এড়াতে পাখিরা মৃত কীটপতঙ্গই খেতে থাকল। ডিডিটির বিষ পাখিদের দেহে প্রবেশ করল। কী ভয়ঙ্কর সেই কুফল। পাখিদেহ বিকলাঙ্গে বেঁকে যেতে থাকল, প্রাণ আছে সুর নেই। পরবর্তী প্রজন্ম শিশুপাখিরা অসময়ে ফুটে বেরোল, বিকলাঙ্গ দেহমনে। পাখির ডিমের খোসা অতি পাতলা, চোখ ফুটতে না-ফুটতেই তাদের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। প্রায় এক দশক ধরে ডিডিটির কুফলে, আমেরিকার হলুদ বসন্তকে স্বাগত জানাতে রইল না পাখির কলতান, বসন্তসংগীত। সংগীতহারা প্রকৃতি সাক্ষী রইল সেই ঐতিহাসিক নির্বাক বসন্তের। বাস্তুতন্ত্রের ছন্দমালায় হরিণ শেয়াল প্রাণ-

প্রাণীজগতের কেউই বাদ গেল না। শেষমেষ মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্য পথে ডিডিটি হাজির হল এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ সমস্যাকে নিয়ে। উন্নত, দরিদ্র কোনও দেশই বাদ যায়নি; এই সমস্যার বেড়াজালে আটকা পড়েছে বৃহত্তর পৃথিবী।

দূষণের বিরুদ্ধে, মানুষের আচরণের বিরুদ্ধে, দেশ কাল সীমানা-গণ্ডি ছাড়িয়ে যেন এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদের দলিল *দি সাইলেন্ট স্প্রিং*। সেই সময়ে র‍্যাচেল কারসন যে সত্য হাজির করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ বলা যায় পরিবেশ-সচেতনতা এবং পারিবেশিক সুব্যবস্থাপথের ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৬৯ সালে, প্রথমে আমেরিকায় 'জাতীয় পরিবেশ পলিসি', ১৯৭০ সালে প্রথম 'পৃথিবী দিবস', ১৯৭২-এ স্টকহোমে মানব-পরিবেশ শীর্ষক কনফারেন্স, ৮০-র দশকে লন্ডন ব্যাসেল, ভিয়েনা কনভেনশন, ১৯৯২-র রিয়োতে বসুন্ধরা সম্মেলন এবং কিয়োটোতে পরিবেশ মহাসম্মেলন, সবই মানবিক পরিবেশ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীবপ্রাণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছে। প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আধুনিকতম প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেও যে স্থিতিশীল সামগ্রিক উন্নয়ন করা সম্ভব, এখন তারই ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রয়োগ-চর্চা চলেছে। বিস্তৃতভাবে একেবারে স্কুল থেকে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পরিবেশ-শিক্ষাকে প্রায় আবশ্যিক করা হচ্ছে। বিভিন্ন বর্জ্য দূষণ থেকে জলপ্রাণ, মৃত্তিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বায়ুদূষণে স্বাস্থ্যহানি ঘটে; শব্দ দৃশ্য দূষণে জীনবটাই হয়ে পড়ে ছন্দহীন; সব মিলিয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক দূষণের যেন রূপ নেয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়—যা থেকে প্রায় সমগ্র জীবমণ্ডল আজ দূষণ ছায়ায় আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে, পরিবেশ আইন, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, গ্রিনবেঞ্চ এমনকী জাতীয় পলিসিও গড়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ না পরিবেশ চেতনার গভীরে প্রবেশ করে, জীবন ও জীবনের কথা ভাবছে এবং তা থেকে পরিবেশমুখী আচরণ গড়ে তুলছে—ততক্ষণ পর্যন্ত সুপরিবেশ কাঠামোকে সর্বত্রগামী করা যাবে না। পরিবেশ সহায়ক আচরণ ও প্রকৃতিসনিষ্ঠ জীবনাদর্শকে জীবনে আবার ফিরিয়ে আনতেই হবে। চেষ্টা চলছে দেশে দেশে। অধিকাংশ দেশের (আমাদের ভারতেও) দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অরণ্য প্রকৃতি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। আজ মানুষ-ভূমি-পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রায় অতি প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে আমাদের জীবনে স্থান পেয়েছে। ভারতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে—কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্যে পরিবেশ দপ্তর, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, দি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট ১৯৭৪, দি ওয়াটার অ্যাক্ট ১৯৮১, দি এয়ার অ্যাক্ট ১৯৮১, দি ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, দি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট ১৯৮০। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব অনুমান করা আবশ্যিক হয়েছে আমাদের দেশে।

মানুষ ও পরিবেশ নিয়ে বিশ শতকের উত্তরভাগ থেকে বিদ্যাশিক্ষা ও প্রয়োগচর্চার ব্যাপক পরিবর্তন যে এসেছে সেটা যেমন কল্যাণকর আবার মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জও বটে। এই প্রথম আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত মুক্ত মনের পরিবেশ জীবনসাধন

চর্চার ডাক এসেছে। ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে, ক্ষুদ্রমনস্কতা থেকে সরে এসে, মানবিক আচরণভিত্তিক একটি বৃহত্তর বিশ্ববীক্ষা গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবী, প্রাণ, প্রকৃতি পরিবেশকে নিয়ে যেন একটি বড়ো সমাজ। এই ভূমিশ্রীকে মর্যাদা দিতে হবে। বুঝতেই হবে এই বসুন্ধরার বাস্তুব্যবস্থারও একটি সীমা আছে। দূষণ তার সহন ক্ষমতার প্রায় শেষমাত্রায় এসে পৌঁছেছে এই পৃথিবী।

পরিবেশ কাঠামোকে আমূল সংস্কার করতে প্রযুক্তি ব্যবস্থা, আইন, সংরক্ষণ, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবার মতো প্রয়োজনীয় দিকগুলি নিয়ে বহুমাত্রিক কর্ম ব্যবস্থার রূপায়ণ দরকার। একই সঙ্গে ব্যাপক পরিবেশ চেতনা গড়ে তুলতে বিস্তৃত সমন্বয়ী স্থিতিযোগ্য পরিবেশ সংস্কৃতির প্রয়োজন। মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে পরিবেশমুখী জীবনযাত্রা। আগামীদিনের পরিবেশ চর্চায় প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী—সকলকেই বৌদ্ধিক সততা নিয়ে হাজির হতে হবে, জীবনের টানে জীবনে। পৃথিবীর ইতিহাসে আগে এমন গভীর সমস্যাও যেমন আসেনি, সুযোগও তেমন বোধহয় হয়নি যেখানে প্রাণের সংরক্ষণে মিলবে এসে প্রত্যেকে। ভবিষ্যতের পরিবেশ কিন্তু এমনই আশ্চর্য এক আত্মনির্মাণ অবয়ব, যেখানে 'সবায় নিয়ে সবার মাঝে'র আনন্দ আত্মপ্রকাশ করে।

পাওয়ার

অভ্র ঘোষ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পাওয়ার (Power) বা ক্ষমতার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে। নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর আলোচনা আমরা দেখতে পাই। সাবেকি সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে 'ক্ষমতা'কে বিচার করা হত ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দমন বা পীড়নের শক্তি হিসেবে, তার প্রভাবকারী কর্তৃত্ব হিসেবে। এর সঙ্গে আলোচনা দেখা যেত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, না বিকেন্দ্রিত করে দেওয়া হবে—তা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে 'ক্ষমতা' সম্পর্কে এই সাবেকি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়িয়ে এক নতুন মাত্রার বিশ্লেষণ চোখে পড়ছে। মূলত আচরণবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন, চার্লস ই. মেরিয়াম (C. E. Marrium), হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল (H. D. Lasswel), আব্রাহাম ক্যাপলান (A. Kaplan), জর্জ ক্যাটলিন (G. Catlin), রবার্ট ডাল (R. Dahl), ভি ও কী (V. O. Key.), হানস মরগেনথ (H. Margenth) প্রমুখ 'ক্ষমতা'র ধারণাটিকে একটি সামাজিক সম্পর্কের ধারণা, আচরণগত ধারণা, বিশেষ পরিস্থিতিগত ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন ক্ষমতা আসলে একধরনের কার্যাবলি এবং সামাজিক (আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সর্বপ্রকার অর্থে) সম্পর্কের আবর্তে কার ক্ষমতা, কীভাবে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, তার ফলাফল কী—ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সেখানে জরুরি হয়ে ওঠে। সাবেকি রাজনীতি শাস্ত্রে ক্ষমতা বিচার করা হত রাষ্ট্র, সরকার বা বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আইনগত অবস্থান থেকে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে এই প্রাতিষ্ঠানিকতা, আইনানুগত্যতার সীমা অতিক্রম করে ক্ষমতার আচরণগত প্রক্রিয়া, তাকে এক সামাজিক প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এদিক থেকে একালে ক্ষমতাতত্ত্বের গতি ও মাত্রার ধারা একেবারেই পালটে গেছে।

ক্ষমতা মূলত এক সম্পর্কের ধারণা। কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা আছে কি নেই তা বোঝা যাবে যখন সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করতে পারে যা সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করত না। অর্থাৎ ক্ষমতা হল একধরনের দক্ষতা বা প্রভাব যা অন্যের ওপর প্রযুক্ত হয়। অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হলে তবেই কারোর ক্ষমতার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তাহলে, ক্ষমতার ধারণা সবসময়েই দুই বা

ততোধিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, জাতি বা অনুরূপ কারকের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। পারস্পরিক সম্পর্কের আবর্ত ব্যতিরেকে ক্ষমতা অনুধাবন করা যাবে না। ক্ষমতা আবার আচরণকেন্দ্রিক ধারণাও বটে। অর্থাৎ ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদ্বয়ের সম্পর্ক বুঝতে হলে তাদের পারস্পরিক আচরণ ও তজ্জনিত প্রভাব ইত্যাদির চরিত্র বুঝতে হবে, নাহলে কে কীভাবে কার আচরণ পরিবর্তন করতে পারেন, তা বোঝা যাবে না। এই অর্থে ক্ষমতা আচরণকেন্দ্রিক। ক্ষমতার ধারণা পরিস্থিতি নির্ভর। অর্থাৎ দুই ব্যক্তির সম্পর্ক কোন্ পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে এবং ক্রিয়াশীল থাকছে, তার বিশ্লেষণ না করলে ক্ষমতার প্রকৃতি বোঝা যাবে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যতক্ষণ তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আছেন, পদচ্যুত হলে তাঁর ক্ষমতার অনুরূপ চরিত্র বজায় থাকবে না। এসব কথা বিবেচনা করেই সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন, ক্ষমতা সম্পর্ক, আচরণ ও পরিস্থিতিকেন্দ্রিক এক ধারণা।

ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন ক্ষমতা এক ডিসপোজিশ্যনাল ধারণা। যেমন, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস মনে করতেন, 'Power of man's present means to any future apparent good.' ক্ষমতা মানুষের এমন এক সামর্থ্য যা হয়ত এখুনি প্রকাশমান নয়, ভবিষ্যতে প্রকাশ পেতে পারে। কর্তৃপক্ষের শাস্তির ভয়ে আমরা অপরাধ করিনি, কিন্তু জানি অপরাধ করলে কী শাস্তি কপালে জুটবে। এই ভবিষ্যৎ শাস্তির আশংকার নিরিখে ক্ষমতার চরিত্র ব্যাখ্যা করা যাবে। আবার এর ঠিক বিপরীত মেরু থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল ক্ষমতার প্রকাশ্যতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে 'Power is the production of intended effects', ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতার চরিত্র বুঝতে হবে কতখানি তিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতাধীনের আচরণকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন তার পরিমাণের ওপর।

একালের এক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডেনিস রঙ (Dennis Wrong) ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কতকগুলি জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন ক্ষমতার সঙ্গে অভিপ্রায়ের সম্পর্ক। সাধারণভাবে সমস্ত ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবানের অভিপ্রায়টি আমরা চোখে দেখতে পাই এবং তার বাস্তবিক চরিতার্থতার রূপ দেখে ক্ষমতার প্রকৃতি নিরূপণ করি। কিন্তু সবসময়েই কি অভিপ্রেত ফল পান ক্ষমতাপ্রয়োগকারী ব্যক্তি? মা সন্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন তার মঙ্গলের জন্য, কিন্তু অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে দিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের সঙ্গে ক্ষমতাপ্রয়োগের সম্পর্ক মেলে না। অথবা কতকগুলি মুরগিছানার সঙ্গে বৃহদাকার হাতির নাচার ইচ্ছে হতে পারে, কিন্তু এতে যে মুরগিছানাগুলির জীবনসংশয় হবে হাতির এমন অভিপ্রায় না থাকলেও ওই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এসব সমস্যা থাকতে পারে। এই সমস্যাটিকে মাথায় রেখেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে ক্ষমতা অভিপ্রায় অনুযায়ী ফলদায়ক না হলে তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। রঙ বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা অনুপস্থিত। তিনি আরো বলেছেন, যদি দেখা

যায়, কোনো ক্ষেত্রে, পূর্বে ক্ষমতাপ্রয়োগ করার পর অভিপ্রেত ফল পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এখন তা আর ঘটছে না, সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে ক্ষমতার সম্পর্ক ভেঙে গেছে তা তার অবসান ঘটেছে।

সুপ্ত বা সম্ভাব্য এবং প্রকাশ্য ক্ষমতার প্রসঙ্গগুলিও আলোচনা করতে হবে। সাধারণভাবে ক্ষমতার চরিত্র বোঝা যায় প্রকাশিত বা প্রযুক্ত ক্ষমতার বহর দেখে। কিন্তু ক্ষমতাকে তো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা সুপ্ত সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও ভাবা যেতে পারে। ক্ষমতাবান ব্যক্তি ক্ষমতার প্রকাশ না ঘটিয়ে বা ক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছা ব্যক্ত না করেও অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারেন। কার্ল ফ্রিডরিশ যাকে বলেছিলেন, 'the rule of anticipated reaction'। এক্ষেত্রে যারা ক্ষমতাশালীকে মেনে নিচ্ছে তারা আনুগত্য প্রকাশ না করার প্রক্রিয়াটি ভেবে নিয়েই তাকে মেনে নিচ্ছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির আদেশ যে সবক্ষেত্রে মানা হচ্ছে তা নয়। কিন্তু তার পছন্দ কী হতে পারে একথা ভেবে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু অভ্যস্ত বা প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার অস্তিত্ব লক্ষণীয়। ক্ষমতাবানের প্রত্যাশামত যখন তাঁর আদেশ বা ইচ্ছা সম্মান পায়, যে আদেশ বা ইচ্ছার প্রকাশ তিনি বাস্তবে করেননি, তখন সুপ্ত ক্ষমতার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। মার্কিন কংগ্রেস যখন রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রদানের ক্ষমতার ভয়ে কোনো বিল পাশ করার কাজ থেকে বিরত থাকে তখন রাষ্ট্রপতির সুপ্ত বা সম্ভাব্য ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। সুতরাং, ক্ষমতা বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, ক্ষমতাবানের প্রত্যাশা কি, ক্ষমতাবানের অভিপ্রায় সম্পর্কিত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানের সচেতনতা কতটুকু, ক্ষমতা প্রসঙ্গে এগুলি অবশ্যই বিচার্য।

ক্ষমতার সম্পর্ক বিচার করে সাধারণভাবে একথা বলা যেতেই পারে যে সমাজে এই সম্পর্ক অপ্রতিসম (asymmetrical)। কারণ ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাধীনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও অধীনতামূলক। কিন্তু সমাজে এমন সম্পর্কের ঘটনাও তো বিরল নয় যে দুইপক্ষের ক্ষমতা সমান সমান। তাহলে সাধারণভাবে দৃষ্ট অপ্রতিসম ক্ষমতার সম্পর্ক একমাত্র বাস্তবতা নয়। সমক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিপাক্ষিকতার অস্তিত্বও আছে। পিটার ব্লাউ (Peter Blau) অবশ্য বলবেন, আন্তঃনির্ভরশীল এবং সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইপক্ষের পারস্পরিক প্রভাববিস্তারের সম্পর্ক ক্ষমতার অপ্রতুলতাকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু ডেনিস রঙ এই মতামতটিকে সঠিক কারণেই তেমন গুরুত্ব দেননি, কারণ সামাজিক সম্পর্কের জগতে ক্ষমতার সম্পর্কের অপ্রতিসাম্য থাকলেও সেই দুই অপ্রতিসম ক্ষমতাপক্ষের অবস্থান পালটে যেতে পারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বা কাজের ভূমিকাগত ক্ষেত্রে। যেমন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো দেখাই যায় যে গৃহকর্ত্রীর গৃহস্থালি কাজে ক্ষমতা থাকলেও, গৃহকর্তার প্রাধান্য থাকে আর্থিক ক্ষেত্রে। তাহলে ক্ষমতার সম্পর্ক একান্তভাবে এবং নির্ভেজাল অপ্রতিসম, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ক্ষমতার ভারসাম্যের কথাটাও চিন্তা করতে হবে। ক্ষমতাবান একক্ষেত্রে ক্ষমতাধীনকে প্রভাবিত করতে পারলেও অপরক্ষেত্রে ক্ষমতাধীন হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতাবান। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেচনা করে ভারসাম্যের ধারণাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই ভারসাম্যের কথা বলতে গিয়েই

রঙ 'Intercursive' ক্ষমতা-সম্পর্কের কথা বলেছেন। বস্তুত Integral বা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিপরীত ক্ষমতা Intercursive-ক্ষমতা-সম্পর্কের ধারণাটি এসেছে। আধুনিক বহুত্ববাদী সমাজে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয়, উচ্চারিত এই প্রশ্ন যে ক্ষমতাবানকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং কারাই বা তা করবে? সাধারণত আধুনিক উদারনৈতিক রাষ্ট্রসমূহে আইনব্যবস্থা বা সংবিধান ক্ষমতাবান শাসককে নিয়ন্ত্রণ করে।

আদালতের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো নানা উপায় রয়েছে—(ক) কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিভাজন করে বিকেন্দ্রীকরণের ধারা তৈরি করা, (খ) ক্ষমতাবানের ক্ষমতার ব্যাপকতা ও পরিধি নিয়ন্ত্রণ করা, (গ) কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী শাসককুলকে উৎখাত করে ক্ষমতাধীন কর্তৃক ক্ষমতা দখল ইত্যাদি। এইভাবে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরো বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা রয়েছে। এসবের সূত্রে আমরা বলতেই পারি যে আধুনিকযুগে রাজনীতি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, ক্ষমতাকে সীমায়িত করা বা ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার লড়াইও বটে।

এতক্ষণ ক্ষমতার ধারণাটি যেভাবে বিশ্লেষিত হল তাতে ক্ষমতা বলতে বুঝি একটা বিশেষ গুণ যার মাধ্যমে ক্ষমতার অধিকারী আরেকজনের ওপর ক্ষমতা আরোপ করতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষমতার একটি কেন্দ্র খুঁজে নেওয়া দুষ্কর হয় না। কিন্তু ভিন্ন এক দার্শনিক প্রত্যয় থেকে ক্ষমতার সর্বাধুনিক এক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault, ১৯২৬-৮৪) রচনায়। ফুকো দেখিয়েছেন ক্ষমতা কেন্দ্রহীন, রাজ্যহীন। ক্ষমতা চারদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে বা থাকতে পারে। ক্ষমতা মানে কেবলই শাসকের নিষেধাজ্ঞা নয়, আইনের আদেশ নয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আইনানুগ আদেশ প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষাতেও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। এই অর্থে ক্ষমতা গড়ে ওঠে শক্তির সম্পর্কের বৃদ্ধিতে, ক্ষমতার প্রকাশ নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্যে। উৎপাদনের উপায়সমূহ বা যন্ত্রাদি, সামাজিক ছোটোবড় সংস্থা, পরিবার, ছোটোবড় গোষ্ঠী, শ্রেণি ইত্যাদির নিরন্তর সংঘাতে বিচিত্রভাবে সমাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নানাধরনের বিদারণ—এই সবের মধ্যেই ক্ষমতার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে। মার্ক্সবাদী কায়দায় ফুকো ক্ষমতাকে শ্রেণি-সংঘর্ষ বা শ্রমিক-মালিক সংঘাত বা ওই ধরনের অন্য কিছুতে কেন্দ্রীভূত করতে নারাজ। ক্ষমতাকে কেন্দ্রচ্যুত করে ফুকো বলেছেন, ক্ষমতাকে কোনো কেন্দ্রবিন্দুর প্রাথমিক অস্তিত্বের মধ্যে সন্ধান করা উচিত হবে না। ক্ষমতার ভিত সবসময়েই গতিশীল।

আসলে ফুকো হেগেলীয় বা মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাস বিচারে আস্থা রাখেননি। তাঁর বিশ্বাস নিৎসে কথিত Genelogy বা বংশানুচরিত পদ্ধতিতে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে আকস্মিকতা, আশাতীত দুর্বিপাক, অবিশ্বাস বা দুর্জ্ঞেয়তার স্থান নেই। একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ দ্বান্দ্বিকতায় কাজ করে। দ্বন্দ্ব তত্ত্বানুযায়ী প্রতিটি যুগে এক-একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তার নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আরো উন্নত কোনো অবস্থায় পৌছে যায়। সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতি ঘটে এবং সমস্ত

ধরনের সভ্যতাতেই ক্ষমতার বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। ফুকো এর পরিবর্তে জিনিওলজির পদ্ধতির কথা বলেন, যে-পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্যবোধ কাজ করে না। কোনো ধারাবাহিক প্রগতির চিন্তা নেই। ফুকো দেখাতে চান যুগে যুগে সংস্কৃতি, চিন্তার ধরন, ধ্যানধারণার বিপুল পরিবর্তন ঘটে বটে, কিন্তু ক্ষমতার প্রয়োগপদ্ধতির (Technology of Power) মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। উনিশ শতকের দার্শনিক বেন্থামের প্যান অপটিকাল চিন্তার পিছনে মানব-হিতৈষণার আদর্শ ছিল ঠিকই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার প্রকরণ ও প্রয়োগপদ্ধতিকে আরো উন্নতমানের করে তোলা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজার হাতে প্রাণদণ্ড হত সাধারণ্যে, অবিশ্বাস্য রকমে নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রকাশ ছিল তার। উনিশ শতকের বুর্জোয়া যুগে শাস্তির ধরন পাল্টানো, সাধারণতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতা তার প্রয়োগ পদ্ধতি বদলাল। শাস্তির উন্মুক্ত অনুষ্ঠান থেকে গোপন মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচার স্থান পেল।

আরো একটি দিক থেকে ফুকো ক্ষমতার ধরনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সপ্তদশ শতকের ইউরোপে যে যুক্তিবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন রনে দেকার্ত (Rene Descartes, ১৯৫৬-১৯৬০)। দেকার্তের মতে মানুষের শুদ্ধ চিন্তা ও যুক্তি এক ও অভেদ। যুক্তির নির্ভরতা ছাড়া সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানই ক্ষমতা। ফুকো ধ্রুপদীযুগের এই যুক্তিবাদী দর্শনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানের এষণা সমাজের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যুক্তির সার্বভৌম প্রাধান্যকে অস্বীকার করে একদল মানুষ যখন অন্যবিদ আচরণ করে (যুক্তিবাদীদের মতে যা অযুক্তির প্রকাশ) তখন তারা আইনভঙ্গকারী, অসামাজিক জীব বা একটা সামাজিক টাইপ হিসেবে 'উন্মাদ' বলে আখ্যায়িত হন। ফুকো দেখান এই ধরনের অযুক্তির মানুষজনকে দমনের জন্য এবং যুক্তির স্বরাটত্ব প্রমাণের জন্য কীভাবে যুক্তিবাদ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ঘটায়। অযুক্তিকে ক্ষমতার সাহায্যে সবশে আনার জন্যই যেটা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় তা হল অযুক্তিকে অসুস্থতা বা রোগ হিসেবে ঘোষণা করা। অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা করে সংস্কৃত করে তোলার এই যে মানবহিতৈষী ব্রত তার মধ্য থেকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতার সদম্ভ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। যুক্তিবাদী ধ্রুপদী যুগের সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে এই ক্ষমতার সম্পর্কই নিহিত হয়েছে।

পার্সিধর্ম বা জরথুষ্ট্রবাদ

পীযূষকান্তি রায়

পরম পবিত্র 'অগ্নি'র মহিমায় বিশ্বাসী জরথুষ্ট্রবাদীরাই হলেন পার্সি। তাদের আদি নিবাস ইরান বা পারস্যের 'ফারস' প্রদেশে। এ কারণেই তারা পার্সি নামে আখ্যাত, যা তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়ও বহন করে। এ ধর্মের প্রচারক জরথুষ্ট্র।

৬০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের অ্যাকিমেনীয় (Accemenian) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাসের (Cyrus) রাজত্বকালেই জরথুষ্ট্র প্রচারিত এ ধর্ম পারস্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাইরাস ও জরথুষ্ট্রের যুগপৎ অবস্থান পারস্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে পারস্য দুইভাবে বিভক্ত। একদিকে উচ্চকোটির মেসোপটেমিয়া সংস্কৃতির প্রভাব, অপরদিকে মধ্য এশিয়ার স্তেপ ভূভাগ যেখানে ক্ষীণ বসতিসম্পন্ন যাযাবরি মানব গোষ্ঠীর বাস ছিল। এ কারণে ই. কুলকের মন্তব্য করেছেন : 'While the Persian Polity originated in western Iran under the Achemendian cyrus, the teachings of Zoroaster were conceived in the east in direct confrontation with the nomadic culture on the thereshhold of myth and history. The dichotomy represents the basic principles of Iranian history; the call to establish a universal political order and the divine mission of Ahura Mazda'. (*The Parsees in India* by E. Kulker)

জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল ও জন্ম বৃত্তান্ত বিষয়ে তথ্যাবলি তেমন উপলব্ধ নয়। কারণ, প্রাচীন পারস্যের রাজধানীতে অবস্থিত রাজকীয় গ্রন্থাগার 'তখত্-ই-জামসিদ' ভবনে রক্ষিত যাবতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাহিত্য ভাণ্ডার আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করেছিল। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণচিহ্ন সমূহও অষ্টম শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। ইতিহাসের উৎস সন্ধানের শেষ সঞ্চয় শ্রুতি ও শিলালেখ থেকে যতদূর আহরণ করা গেছে, তা থেকে ঐতিহাসিকরা মনে করেন আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ উত্তর ইরানের রেই (Rae) নামক জায়গায় জরথুষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। ইরানের বিস্তৃত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে তিনি তাঁর বাণী ও 'মাঝদয়াসন' প্রচারের পর আফগানিস্থানের 'বাল্‌খ' প্রদেশে নিকেত হন। আভেস্তা অনুসারে 'মাঝদয়াসনে'র ব্যাখ্যা হল 'ঈশ্বর উপাসনা'।

বাল্‌খ প্রদেশের স্থানীয় শাসক 'ভিসতসপ' (Vistasp)-এর সহায়তায় তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সে একদিন মন্দিরে উপাসনায় মগ্ন থাকাকালীন তুরানি দস্যুরা তা অপবিত্র করলে জরথুষ্ট্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দেন। মাসানীয় শাসকদের রাজত্বকালে জরথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্ম পারস্যে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল একেশ্বরবাদী—যিনি হলেন 'আহুরমাঝদা', সর্বব্যাপী অনন্তকালের ঈশ্বর। 'আহ্' অর্থ জীবন, 'রা' অর্থ দেওয়া এবং 'মাঝদা' অর্থ মহান দাতা। জরথুষ্ট্র বললেন এ পৃথিবী হল এক সংগ্রামভূমি, এখানে নিরন্তর চলেছে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তি শুভ ও অশুভর সংগ্রাম। এ অশুভ শক্তির নাম হল 'অহরিমান'। সংগ্রামের এক কাল হল দীর্ঘ ১২,০০০ বছরের যা আবার প্রতি ৩০০০ বছর ধরে চারভাগে বিভক্ত। চতুর্থ পর্বে তাঁর আবির্ভাব ও শুভশক্তির পক্ষে বাণী প্রচারের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় লাভ। এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য সমগ্র মানবজাতির প্রতি রয়েছে তাঁর আহ্বান। হিন্দু ভাবনাতেও কালকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—যেমন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। গীতাতেও 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র কথা উচ্চারণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ—দুষ্কৃতীদের বিনাশ ও সাধুদের পরিত্রাণসহ সত্যধর্ম স্থাপনের জন্য!

পার্সি ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে 'অগ্নি'র অবস্থান, অথচ তাদের ভাবনায় অগ্নি দেবতা বলে কিছু নেই। তাই তাদের অগ্নির উপাসক বলে নির্ণীত করাও সঠিক নয়। অগ্নি মন্দিরে ধুনুচির মত রৌপ্য পাত্রে পবিত্র অগ্নি সংরক্ষণ করা হয়, যা অনির্বাণ। আর পবিত্র অগ্নি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব অর্পিত এক বিশেষ ধরনের পুরোহিতদের হাতে যাদের আভেস্তীয় নাম 'অথ্রবন'। পালা করে তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। হিন্দু বৃত্তের ব্রাহ্মণদের মতো তাঁরাও উপবীত জাতীয় এক ধরনের সূত্র ধারণ করেন, তবে তা আড়াআড়ি ভাবে কাঁধ থেকে নিচের দিকে নেমে আসে না। নাভির উপরে পেটে পিঠে তা বৃত্তাকারে বাঁধা থাকে। এ অগ্নির শাস্ত্রীয় নাম 'ইরান লাহ'। পার্সিদের ধর্মানুষ্ঠানের মুখ্যভাগই হল শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। মানবদেহ ও প্রকৃতির তাবৎ পদার্থ সমূহের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি কঠোর নির্দেশ পার্সি ধর্মে। তা কোনো মৃত বস্তুর সংস্পর্শে এসে অপবিত্র হয়। এ কারণেই পার্সিদের মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তা গগনচুম্বী স্তম্ভের মুক্ত শীর্ষভাবে স্থাপন করা হয় চিল ও শকুনদ্বারা উদরসাৎ করার জন্য। এ স্তম্ভের নাম 'দখমা', যা ইংরেজিতে বলা হয় Tower of Silence। অগ্নিমন্দির দুই বর্গের—যথা আতস বেহরান ও আতস আদরন বা আগিয়ারি। অগ্নি মন্দিরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বর্তমান লেখককে মন্দিরের সিঁড়ির কাছেও যেতে দেওয়া হয়নি দুবছর আগে। পার্সি ধর্মগ্রন্থের নাম হল আভেস্তা বা ঝিন্দ আভেস্তা। প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত দুটি ভাষার একটিতে এ গ্রন্থ রচিত। পার্সিধর্ম সংসারবাদী, এতে রয়েছে প্রয়োগবাদী ভাবনায় মানবজীবনের প্রতি আহ্বান। জলথুষ্ট্রের একটি বাণী হল, 'তোমরা সবাই জেনো, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব, তাঁরই নির্দেশিত নির্দিষ্ট কর্ম তোমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার জন্য।'

পার্সিদের ধর্ম বিশ্বাসে পরলোকে শাস্তি বা পুরস্কার ইহলোকে মানুষের কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের দরবারে তার বিচার হয়। এ ধর্মে ক্ষমার কোনো স্থান নেই। জরথুষ্ট্র মানবজীবনে পূর্ণতা লাভের পাঁচটি পথ নির্দেশ করেছেন, যা হল— সততা, নিষ্কলঙ্ক বংশ, কৃষিকর্ম, মেষপালন ও কায়িক শ্রমে দক্ষতা অর্জন। আভেস্তায় কৃষিনির্ভর জীবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে আর্থিক সমৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু তাতে নৈতিক দায়িত্বের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে নানা উদাহরণের মাধ্যমে। এ ধর্ম জন্মগত, অন্যবৃত্তের কেউ তা গ্রহণ করতে পারে না। গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ পার্সি সমাজে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোনো পার্সি রমণী অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করলে সে চিরদিনের জন্য স্বধর্ম থেকে চ্যুত হল, কোনো পার্সি পুরুষ অন্য ধর্মের রমণীর পাণিগ্রহণ করলে এমন স্ত্রী বা তার গর্ভজাত সন্তানরা পার্সি ধর্মে গৃহীত হন না। এক কথায় এসব ব্যাপারে তারা খুবই রক্ষণশীল। পুরোহিতদের ভূমিকা পার্সি সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, অবশ্য মাজাই (জ্ঞানী পুরুষ) ও অগ্নি মন্দিরের পুরোহিতের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় পার্সি সমাজে তারা 'দস্তুর' ও 'মোবেদ' নামে আখ্যাত। প্রাচীন পারস্যের পার্সি সমাজব্যবস্থায় বৃত্তি-নির্ভর বিভাজনের প্রথা ছিল, কিন্তু তা হিন্দু বৃত্তের বর্ণ ব্যবস্থার রূপ পায়নি কোনো দিন। বিস্ময় যে তাও ছিল চার ভাগে! তবে শব বাহকরা অচ্ছুৎ রূপে গণ্য।

তাদের প্রধান উৎসব 'নওরোজ'। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র পারস্যেই তা এক পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ উৎসবরূপে আজও পালিত হয়। ইসলাম গ্রহণ করেও পারস্যবাসীরা এ উৎসব ত্যাগ করেননি। এ উৎসব বসন্তের আগমন ও শীত ঋতুর বিদায় ঘোষণা করে। এ উৎসবের পুরা নাম হল 'জামশেদি নওরোজ'। এ উৎসবের সূচনা হয়েছিল জরথুষ্ট্রের জন্মেরও ২০০০ বছর আগে। পারস্যের পেশাদানীয় বংশের নৃপতি জামশেদ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ দিনে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীতে স্বধর্ম রক্ষার জন্য মুসলমান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিজভূমি পারস্য ত্যাগ করে ভারতবর্ষের অভিমুখে পার্সিরা যাত্রা করেছিলেন। নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আনুমানিক ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে 'দিউ'তে এসে প্রথম উপস্থিত হন। তাদের ভারত পর্বের ইতিহাস নৌশেরির পার্সি পুরোহিত রেহমান কাইকোবাদ সঞ্জনা রচনা করেছিলেন ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে। এ গ্রন্থের নাম কিসসা-ই-সঞ্জনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, দাদাভাই বেহরনজি বানাজি নামে একজন পার্সি বণিক সর্বপ্রথম নবনির্মিত নগরী কলকাতায় আসেন। এ পরিবারেরই এক বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন রুস্তমজি কাওয়াসজি বানাজি। নানা শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে তিনি মহানগরীর ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম হতে পেরেছিলেন। কলকাতায় তিনিই প্রথম 'অগ্নিমন্দির' ও 'দখমা' প্রতিষ্ঠা করেন। সে অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৯ সালে যা বহু পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে। বি. বা. দী বাগ অঞ্চলে এ মন্দিরের পাশেই পার্সি চার্চ স্ট্রিট। তাদের বর্তমান মন্দির ৯১ মেরেডিথ স্ট্রিটের জমিতে অবস্থিত যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের 'দখমা'র অবস্থান বেলেঘাটা অঞ্চলে।

ভারতের পথে আর্যরা প্রথম উপনীত হয়েছিল ইরানে। ওখানে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর ইন্দো ইরানীয়দের একটি দল এসে উপস্থিত হয় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সিন্ধু নদের অববাহিকাভূমিতে। এ নদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসের কারণে গ্রিকরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ইন্ডো'। এ নাম থেকেই আর্যরা চিহ্নিত হয়েছিল 'হিন্দু' নামে। তারা সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে আসেনি। ভারতবর্ষে আর্যদের আদি পর্ব বিধৃত রয়েছে ঋগ্বেদ সংহিতায়। তাই পারস্যের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের আর্য (হিন্দু) সংস্কৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান লেখককে একজন ভারতীয় পার্সি মহোদয় বলেছিলেন তাদের বিবাহের একটি মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হয়। পার্সিরাও পারস্যেরই অধিবাসী ছিলেন। এ বিষয়ের উপর সুদূর অতীতে গবেষণা শুরু হয়েছিল ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য-বন্ধু পরধর্ম গ্রহণকারী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাদীপ্ত *বেদসংহিতা*-র আলোচনার মাধ্যমে। ১৮৭৫ সালে তিনি ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন। তার মুখবন্ধে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন : 'Not only the Zenda-Vesta, but also the Assyrian inscription prove singularly valuable auxiliaries in the exegesis of the Vedas on question relating to the past history of the Indo-Aryans. The Assyrian inscriptions, in addition to the light they have thrown on other subjects, give us wonderful assistance in tracing the line of route followed by our primitive ancestors in their migration to India'.

এক কথায়, পার্সি ধর্ম বা জরথুষ্ট্রবাদ স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় আর্যধর্ম (হিন্দু) ও সংস্কৃতির সঙ্গে দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা।

পুথি

বিশ্বনাথ রায়

পুথি / পুঁথি অর্থাৎ ছাপাখানা পূর্বযুগের হস্তলিখিত পুস্তক বা গ্রন্থাদি। পারসিক 'পুস্ত' বলতে বুঝিয়ে থাকে চামড়া। প্রাচীনকালে চামড়ার ওপর লেখার রেওয়াজ ছিল। তার থেকে 'পুস্তক'। সংস্কৃতে 'পুস্তিকা' > পুত্থিয়া > পোথি থেকে বাংলায় পুথি। পশ্চিমবঙ্গের অনুনাসিক উচ্চারণে 'পুঁথি'; ইংরেজিতে Manuscript (সংক্ষেপে Mss.) পাণ্ডুলিপি অর্থে।

আধুনিক সভ্য সমাজে গ্রন্থ বা বই-এর যে ভূমিকা, পৃথিবীর সবদেশেই প্রাচীনকালে পুথির ভূমিকা ছিল তদ্রূপ। বহিরঙ্গের বিচারে দু' ধরনের পুথি দেখতে পাওয়া যায়। ক. পাণ্ডুলিপি আকারে এবং খ. পাতড়া রূপে (দু-এক পৃষ্ঠায় পুথি বা হাতে লেখা পুরাতন কাগজ-পত্র)। পাণ্ডুলিপি আকারে যেসব পুথি পাওয়া যায় তার সিংহভাগই সাহিত্যগ্রন্থ, পরিমাণের হিসাবে তারপরেই আছে ধর্ম-শাস্ত্রাদির পুথি। এছাড়াও সাহিত্য বহির্ভূত যেসব বিষয়ের পুথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ অলংকারশাস্ত্র অভিধান ভাষাতত্ত্ব কবিরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র কৃষিবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান গণিত বাস্তুবিজ্ঞান, গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী, কামশাস্ত্র প্রভৃতি। টোল-পাঠশালার পাঠ্য বিষয়ক, এমনকি আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁকের পুথিও পাওয়া গেছে অজস্র। অপরপক্ষে দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র, সেরেস্তার কাগজ, চিঠি, কর্জপত্র, দানপত্র, চুক্তিপত্র, হিসাবের খাতা প্রভৃতিকে 'পাতড়া' শ্রেণিভুক্ত পুথি বলা যায়। শেষোক্ত পুথিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া না হলেও এর মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের আকর উপাদান। বুদ্ধদেব আচার্যের *সুরুলনথি সংকলন* কিংবা প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী* থেকে অন্তত সে কথাই প্রমাণ হয়।

পাণ্ডুলিপি আকারের পুথিগুলি যে-কোনো দেশের মূল্যবান সম্পদই শুধু নয়, জাতীয় সম্পত্তি। এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় জাতির সার্বিক ঐতিহ্যের উপকরণ;—ধর্ম সাহিত্য শিল্পকলা সমাজ-সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান লোকাচার—এককথায় আত্ম আবিষ্কারের যাবতীয় উপাদান। কোনো ভাষার লিপির বিবর্তন ইতিহাস জানতে গেলে যেমন বিভিন্ন যুগের পুথির হস্তাক্ষরের (Calligraphy) ওপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি বানান ও উচ্চারণ বিধির বহু রহস্য-কুঞ্চিকাও উদ্ঘাটিত হতে পারে প্রাচীন পুথির মধ্য থেকে। বিশেষ করে লিপিতত্ত্বের চর্চায় পুথি একমাত্র না হলেও অন্যতম সহায়ক।

একটা 'বই' বললে আমাদের মনে যে প্রতিভাস তৈরি হয়, আধুনিক কালের সাধারণ পড়ুয়ার কাছে 'পুথি' বললে পাঠ্য কোনোকিছুর ধারণা তেমনভাবে জন্মায় না। কারণ একালে 'পুথি' বস্তুটি গড়পড়তা শিক্ষিতের নাগালের বাইরে। হাত বাড়ালে একটা বই পেতে পারি কিন্তু পুথি নৈবচ। সুতরাং পুথির বাহ্যরূপটি জানতে হবে আগে এবং এর প্রধান তিনটি উপকরণ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া দরকার। ১. কিসের ওপর পুথি লেখা হয় ২. কী দিয়ে পুথি লেখা হয় এবং ৩. সেই লিখিত বস্তু কীভাবে উপস্থাপিত করা হয়। এর মধ্যে প্রথম দু'টির উপকরণ প্রধানত বৃক্ষজাত ও প্রাণীজাত। একালে যেমন কাগজের ওপর লেখা হয় প্রাচীনকালে মধ্যপ্রাচ্যে সে কাজটি সারা হত 'প্যাপিরাস'-এ এবং য়ুরোপে 'পার্চমেন্ট'-এ। ভারত উপমহাদেশে ব্যবহৃত হত ভূর্জপত্র তালপত্র তেরেট পাতা এবং তুলট কাগজ। প্রাদেশিক সাহিত্য পুথিগুলির বেশির ভাগই তুলট কাগজে লেখা, আর দক্ষিণ ভারত বা উড়িষ্যায় তালপত্র বা তেরেট পাতার প্রাধান্য। সংস্কৃত পুথির ক্ষেত্রে আবার এই ধরনের বৃক্ষজাত উপাদানই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি'র পুথিটি তালপাতার। আবার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যে একটিমাত্র পুথি আমাদের সম্বল সেটি তুলট কাগজের। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী) যে পুথিটি পাওয়া গেছে সেই 'গিলগিট' পুথি লেখা হয়েছে জর্জপত্রে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তালপাতায় লেখা পুথি পাওয়া গেছে 'অভিনব গীতগোবিন্দ'। দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত এইসব পুথির পত্রগুলির প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। দু'ফুট আড়াই ফুট লম্বা পুথিও পাওয়া গেছে। বিশ্বভারতীর চীন ভবনে পালিশ করা হালকা নীল রঙের চামড়ার ওপর লেখা এরকম লম্বা তিব্বতী পুথিও আছে। বাংলা পুথির বেশিরভাগই তুলট কাগজে লেখা।

পুথির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কালি ও কলম। প্রাচীন বঙ্গদেশে কালি তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে অনেক ছড়া প্রচলিত ছিল :

লোধ লোহা লোহার গুঁড়ি।
অর্কাঙ্গার জবার কুঁড়ি।।
গাবের ফল হরিতকী।
ভৃঙ্গার্জুন আমলকী।।
বাবলা ছাল জাঁটির রস।
ডালিম সেচে করিবে কষ।।
ভেলায় কর্য্য এক আলি।
চারিযুগ না উঠিবে কালি।।

এছাড়াও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে পুথির কালি তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত কাজল গোমূত্র লাউ ছেঁচাজল ছাগদুগ্ধ, তিল ত্রিফলা শিমূল গাছের ছাল ইত্যাদি। লাক্ষারস বা আলতা দিয়ে প্রস্তুত হত লাল কালি। হলুদ রঙের কালিতে লেখা পুথিও পাওয়া গেছে।

মাটির দোয়াত বা খাগের কলমের কথা আমরা শুনেছি। ধাতুর মসীপত্র বা পালকের কলমও পুথি লেখায় ব্যবহার করা হত। বাঁশের কঞ্চি বা শরকাঠির টুকরো

অংশ সূচাগ্র করে কলম তৈরির রীতি বেশ প্রাচীন। গাছের সরু ডালের আগায় 'তীক্ষ্ণ ধাতব শলাকা' লাগিয়ে পুথি লিখন কার্যের রীতি অনেক কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত।

আজকের দিনে বই-এর প্রতিটি পাতা যেমন এক সঙ্গে বাঁধাই করা থাকে এবং ডানদিক থেকে বামে পাতা উল্টে পড়তে হয়, পুথিতে সেরকম নয়। পুথির প্রতিটি পত্র বিচ্ছিন্ন। এক একটি আলগা পাতার দু'পিঠে লিখনকার্য সমাপ্ত হলে তলা থেকে ওপরে পর পর সাজিয়ে রাখা হত। প্রতিটি পত্রের মাঝে একটি অথবা দুই পাশে দু'টি ছিদ্র করে (ছিদ্র করার স্থানটিতে লিখন কার্য হত না) সুতো দিয়ে চারদিকে বেঁধে দেওয়া হত যাতে প্রতিটি পাতার বিন্যাস এলোমেলো না হয়। তাই পুথি পড়তে হয় ওপর থেকে নিচের পৃষ্ঠার ক্রমানুসারে তলা থেকে ওপরের দিকে পাতা উল্টে। বিকল্প আর একটি রীতিও ছিল। পুথির পাতাগুলি পত্রাঙ্ক অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে তলায় ও উপরে সমমাপের কাঠের পাটা দিয়ে অনেকটা বড়ো ল্যাজওয়ালা ঘুড়ির আকৃতির লাল সালু বা খেরো কাপড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে শক্ত করে মুড়ে ওই কাপড়ের সঙ্গে যুক্ত ল্যাজ দিয়েই পাকিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

প্রাচীনকালে পুথি সংরক্ষিত হত দেওয়ালের কুলুঙ্গি, সিন্দুক, কাঠের বাক্স, তোরঙ্গ বা মাচায়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে পুথি পাওয়া যায় দেবস্থানে, বৈষ্ণবের আখড়ায়, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে, কবিরাজ বাড়িতে এবং জমিদার গৃহে। কোনো এক স্থানে পুথি পাওয়া গেলে তার আশপাশে আরো পুথি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধর্মীয় স্থান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তেমন যত্নে রক্ষিত হয় না পুথি। ফুল-বেলপাতা-গঙ্গাজলে অনেক মূল্যবান পুথি যেমন নষ্ট হতে দেখা গেছে তেমনি সংস্কারবশত ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলকে পুথিতে হাতও দিতে দেওয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রে।

পুথি সাধারণত দু' ধরনের। মূল পুথি, যা কবি বা লেখকের স্বহস্ত লিখিত। এরকম পুথি প্রায় দুর্লভ। বেশিরভাগ পুথিই লিপিকরের (copiest) অনুলিখিত। ছাপাখানা আসার আগে লিপিকররাই ছিলেন প্রাচীন গ্রন্থাদির নির্মাণ-রূপকার। পুথি-লেখন কার্যকে এঁরা বৃত্তি বা পেশা হিসাবে গ্রহণ করতেন। অবশ্য অপেশাদার বা সৌখিন লিপিকারের লেখা পুথিও পাওয়া গেছে। শিক্ষিত হওয়া ততটা নয়, অনুলিপি (copy) কর্মে দক্ষতাই ছিল এঁদের অন্যতম যোগ্যতা। নিম্নবর্গের মানুষেরাই এই পেশা গ্রহণ করতেন বেশি। পুথির অনুলিখন, পাঠ, সংগ্রহ ইত্যাদিতে সেকালের নারীদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। সে দলে রাজরানি থেকে বারাঙ্গনা সকলেই আছেন। পেশাদার লিপিকরেরা যেমন ফরমায়েস মতো মূল বা আদর্শ পুথি থেকে অনুলিখন করতেন, তেমনি চাহিদা অনুযায়ী একাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থের পুথির নকল সঙ্গে রাখতেন বিক্রয়ের জন্য। শাস্ত্র বা কাব্যপাঠে আগ্রহী ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে পুথি সংগ্রহ করতেন বা নকল করাতেন।

পুথি লেখার সময় লিপিকর পৃষ্ঠার চারদিকের মার্জিনে অনেকটা করে ছাড় দিতেন পুথির নাম, পত্রাঙ্ক, তোলাপাঠ ইত্যাদি লেখার প্রয়োজনে। হিন্দু পুথি বাম থেকে ডাইনে এবং মুসলমানী পুথি ডানদিক থেকে বামে লেখা হত। প্রথমোক্ত শ্রেণির পুথিতে পত্রাঙ্ক

থাকলেও ইসলামিক পুথিতে থাকত না। অবশ্য এসবের ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। দুটি মাত্র যতি চিহ্ন (এক দাঁড়ি ও দু দাঁড়ি) অবলম্বনে টানা গদ্যের মত ছিল পুথি লেখন রীতি। কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসৃত। ছাপা গ্রন্থে কবিতার প্রতিটি লাইন যেমন ওপর থেকে নিচে বিন্যস্ত হয়, পুথিতে সেরকম নয়। দ্বিতীয়ত লিপিকরেরা লেখার সময় পুথির পৃষ্ঠা থেকে সাধারণত কলম ওঠাতেন না বলে প্রতিটি শব্দ পরস্পর জোড়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। পুথি পড়ুয়াদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সংকট এই পাঠ সমস্যা; টানা বর্ণ বিন্যাসের মধ্য থেকে শব্দগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে উঠতে না পারলে পুথি পাঠ সম্ভব নয়। তার ওপর উচ্চারণনির্ভর বানান লেখার প্রবণতায় বর্ণাশুদ্ধির গুরু-চণ্ডালী দোষ অশিক্ষিত-পটু লিপিকরদের সহজাত ছিল বলা যায়। একই শব্দ পর পর দু'বার থাকলে একবার লিখে পাশে '২' সংখ্যা বসানো পুথির একটা লিখন রীতি। উনিশ শতকের ছাপা গ্রন্থেও সে রীতি চলে এসেছে।

পুথিতে এক একটি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হলে দু' একটি পুষ্পচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হত। গ্রন্থের সমাপ্তিতে থাকত অনেকগুলি পুষ্পচিহ্ন। এছাড়াও ত্রিশূল স্বস্তিক বৃত্ত বিন্দু শঙ্খ পদ্ম সূর্য তারকা প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্ন পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পুথিলেখা শুরু হয় সাধারণত 'ওঁ' 'ৎ' দিয়ে। কবিতার শেষে কিংবা এক একটি অংশ শেষ হলে কবি 'ভণিতা' দেন। তার মধ্যে থাকে কবির নাম ও পরিচয়। লিখতে লিখতে ভুল হয়ে গেলে পুথির মার্জিনে বা লাইনের ওপরে লেখা হত শুদ্ধপাঠ বা অংশ। একেই বলে তোলাপাঠ বা তৌলন পাঠ। পুথির সমাপ্তিতে থাকে 'পুষ্পিকা'। পুষ্পচিহ্ন আঁকা শেষপত্র তাই পুষ্পিকা। গদ্যে অথবা পদ্যে পুষ্পিকায় লিপিকর নিজের কথা লেখেন। পুথি লিপিকরণের সাল তারিখ দিনক্ষণ ছাড়াও কোথায় কী কারণে কেমন ভাবে পুথি লেখা হল তার বিবরণও পাওয়া যায়। অনেক সময় মূল গ্রন্থের রচনাকালও সংখ্যাবাচক শব্দ সাজিয়ে হেঁয়ালির মাধ্যমে জ্ঞাপন করা হয়। পুথির কাল নির্ণয়ে পুষ্পিকার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের বিপুল উপকরণও এখানে প্রাপ্তব্য। একটি পুথির পুষ্পিকায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিবরণ পাওয়া গেছে। পুষ্পিকা থেকেই জানতে পারা যায় লিপিকরেরা পুথির আকার-প্রকার অনুযায়ী অনুলিপি কর্মের পারিশ্রমিক পেতেন পয়সাকড়ি ছাড়াও ধান কাপড় গামছা ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণেই জনপ্রিয় পুথির অনুলিপি হত বেশি। ফলত 'সাত নকলে আসল খাস্তা' বচন থেকেই বোঝা যায় কী পরিমাণ পাঠ ভেদ হত একটি গ্রন্থের বিভিন্ন পুথিতে। একটি পুথিতে আছে : 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিসাই খরসোতা বামুনের খানা।' এই কথাটির ভিন্ন পাঠ পাচ্ছি অন্য আর একটি পুথিতে : 'ধাইল কাঁসাই মহানন্দা বড়াই খরস্রোতে বামুনের খানা।' পুথি সম্পাদনা কালে কেবল পাঠোদ্ধার নয়, বহু প্রক্ষিপ্ত পাঠের জঞ্জাল ঠেলে একাধিক পুথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে যথাসম্ভব মূল লেখার কাছাকাছি পৌছানোর চেষ্টা করেন সম্পাদক।

একালে গ্রন্থ মুদ্রণ কালে তার অঙ্গ সৌষ্ঠবের কথা যেমন মাথায় রাখতে হয় তেমনি পথির ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পেয়েছে অলঙ্করণ। বই-এর প্রচ্ছদের মত পুথির মলাট ও প্রচ্ছদ

হচ্ছে তার পাটা। পাটায় বিচিত্র চিত্র যেমন পাওয়া গেছে তেমনি পুথির পাতাও হত চিত্রশোভিত। তালপাতায় চিত্রিত এরকম পুথি 'চিত্রপুথি' নামে খ্যাত।

প্রাচীন পুথির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদেশে সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বিদেশীদের দ্বারা। উনিশ শতকে দেশীয় শিক্ষিতরা এ বিষয়ে সচেতন হন এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ায় পুথি সংগ্রহ হতে থাকে। এ বিষয়ে সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাধাকৃষেণ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বিখ্যাত বাঙালি পুথি সংগ্রাহকদের মধ্যে নাম করা যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দীনেশচন্দ্র সেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নগেন্দ্রনাথ বসু মহম্মদ শহীদুল্লাহ সরসীকুমার সরস্বতী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পঞ্চানন মণ্ডল মানিকলাল সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের। পেশাদার সংগ্রাহকদের মধ্যে সেকালে ছিলেন ঈশানচন্দ্র বসু রামকুমার দত্ত আর একালের অক্ষয়কুমার কয়াল। ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা বাদ দিলে যেখানে হাজার হাজার পুথি সংরক্ষিত আছে বঙ্গদেশের এমন বিখ্যাত পুথিশালাগুলি হল—এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত কলেজ, বরাহনগর পাঠবাড়ি প্রভৃতি। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে পুথির মুদ্রিত ক্যাটালগও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। পুথি-পাঠ, সম্পাদনা ইত্যাদি (Manuscriptology) কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের পুথির ভাঁড়ারটি বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। যদিও তখন থেকেই হাজার হাজার পুথি বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ অজস্র পুথি নিয়ে গেছেন কুড়িটি গোড়ার পিঠে চাপিয়ে। আধুনিককালে বিদেশে পুথি পাচার বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিদেশের গ্রন্থাগার মিউজিয়মগুলিতে ভারতীয় পুথির সংখ্যা কয়েক সহস্র। ভারতবর্ষে আজও বহু পুথি যেমন সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে, নষ্ট হয়ে গেছে তার অনেক গুণ বেশি; গোপনে হস্তান্তর হয়ে দেশের বাইরেও চলে যাচ্ছে প্রচুর। এর জন্য দায়ি আমাদের ইতিহাস চেতনার অভাব। অথচ প্রাচীন কালে পুথিকে পুত্রবৎ পরিপালন করার রীতি ছিল। গ্রন্থ অপহরণ দোষের নয় বলে বই চুরিতে অন্যায় দেখেন না পণ্ডিত পড়ুয়ারা। পুথিও চুরি হত, এখনও হয়। কিন্তু ছেড়ে কথা বলতেন না পুথির লিপিকরেরা। পুষ্পিকায় তাঁরা সাবধানবাণী, অভিসম্পাত এমন কি কাঁচা গালাগালি লিখে দিতে দ্বিধা করেন নি :

দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থ চৌরেণ নিয়তে যদি।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য গর্ধবঃ।।

কিংবা পুথির মালিকের পরামর্শে লিপিকরের সতর্কবাণী ও অভিশাপ :

আমার পুস্তক যেইজন হরিবেক।
তাহার বাপের মুখে বিষ্ঠা পড়িবেক।।
তেইপাকে বলি পুঁথি কেহ না হরিবে।
হরিবেক যে জন সে নরকে পড়িবে।।

প্লুরালিজম

সুমন ঘোষ

সমস্ত সৃষ্টির মূল একটাই—এ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের অদ্বৈতবাদী বলা হয়। এই মূল কেন্দ্র, যা থেকে সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি, তা আদতে একটি ধারণা—এই মতে বিশ্বাসী যাঁরা, প্লেটো এবং হেগেল, তাঁদের অন্যতম। অপরপক্ষের মত ছিল যে এই কেন্দ্রের আধার বস্তুতত্ত্বে—সৃষ্টির সমস্ত নির্দশনই কোনো না কোনো ভাবে বস্তুর প্রকারভেদ। এই দ্বিতীয় ঘরানার অদ্বৈতবাদীদের একটা মুখ্য অংশই বামপন্থী তাত্ত্বিকরা, মার্কসবাদী চিন্তন ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণার প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা নিয়ে, যদিও এটা মনে রাখা দরকার যে কার্ল মার্ক্সকে এই অংশের মধ্যে আনা যায় না।

এই দুই ধরনের অদ্বৈতবাদীদের ঠিক বিপরীত মেরুতে যাঁদের অবস্থান, তাঁরাই নানাত্ববাদী। এঁদের কাউকে ইতিহাস আশ্রয় করে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ছকে বেঁধে ফেলা যাবে না, এই মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন যুগে এসেছেন। এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না ঠিক এই কারণেই নানাত্ববাদের কোনো এটা মূল সূত্র বা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

সংজ্ঞায়িত করলেই তাকে একটা নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা হয় যা শেষ পর্যন্ত একত্ববাদেরই কোনও একটা অঙ্কের রকমফের। এটাও মনে রাখা দরকার যে নানাত্ববাদ অন্যান্য সাহিত্য, ভাষাতাত্ত্বিক, বা শৈল্পিক আন্দোলনের মতো এ কোনো একটা নির্দিষ্ট 'বাদ' নয়, কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার কোনো অভীপ্সা বা প্রয়োজন তার নেই। নানাত্ববাদীদের চিন্তাধারার রকমফের ও গতিপ্রকৃতি বিচিত্র, কিন্তু একটা মূল বিশ্বাসের জায়গায় তাঁরা সকলেই একমত যে, সৃষ্টির মূলকে কোনো একটা উৎপত্তির কেন্দ্রে, অথবা কোনো একধরনের কার্য-কারণ সম্পর্ক কিংবা তত্ত্বে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। সৃষ্টিতে যা কিছু বর্তমান তার মূল একটা নয়, অনেকগুলো এবং এই ভিন্ন বস্তুগুলোর কোনোটার ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের পরিমাপ সম্ভব নয় সুতরাং অবস্থাগতভাবে এরা কেউ কারোর চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়।

অদ্বৈতবাদী ও নানাত্ববাদীদের মধ্যে আরেকটা দল ছিল, তারা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। রেনে দেকার্ত থেকে ইম্যানুয়েল কান্ট, সকলেই এ পথের পথিক। দ্বৈতবাদীদের মতে বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত তত্ত্বগুলো সমমানের। এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা অদ্বৈতবাদী ও নানাত্ববাদী এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী একটা স্থানাঙ্ক নির্দেশ করতে কিছু

সমর্থ হয়েছিলেন—দুই পক্ষের দ্বন্দ্বগুলোও কিছু পরিমাণে মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং নানাত্ববাদকে যদি অদ্বৈতবাদের বিপরীত বলে ধরে নিই, তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে দ্বৈতবাদীরা এক অর্থে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে থেকেও কিন্তু নানাত্ববাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটেন না।

নানাত্ববাদের সবচেয়ে সাড়াজাগানো কাজটা অবশ্যই করেছেন জার্মান দার্শনিক লিবনিৎজ (১৬৪৬-১৭১৬)। মৃত্যুর দুই বছর আগেই তিনি লিখেছিলেন *মোনাডোলজি*। সেখানে তিনি নানাত্ববাদের দার্শনিক ধারণাকে একেবারে প্রাক্ বৈজ্ঞানিক চর্চার এক্তিয়ারে টেনে নিয়ে গিয়ে, সৃষ্টির মূল উৎস হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছেন এক বিশেষ ধরনের অভাজ্য, আত্মিক পদার্থ। লিবনিৎজ এই পদার্থের নামকরণ করেন 'মোনাড'। লক্ষণীয় এটাই, যে আজকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আমরা যাকে পরমাণু বলি, লিবনিৎজের 'মোনাড'-এর ধারণার মধ্যে তার একটা অস্পষ্ট ছায়া ছিল। 'মোনাড' অসংখ্য, স্বয়ংক্রিয়, এবং তার গতি-প্রকৃতি পরিচালিত হয় পূর্বনির্ধারিত সঙ্গতির সংজ্ঞাকে মান্য করে। এই সংজ্ঞার নিয়ামক যিনি, তিনিই হলেন সর্বোচ্চ 'মোনাড'—স্বয়ং ঈশ্বর। এ ধরনের যুক্তি কাঠামো সৃষ্টির মধ্য দিয়েই নানাত্ববাদী দার্শনিকদের একটা বড়ো অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিজ্ঞানসাধনার একটা বড়ো ক্ষেত্র। সাম্প্রতিককালের ভাববাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা ক্রমশই নানাত্ববাদের দিকে ঝুঁকছেন নিজেদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে। এই তালিকা থেকে বাদ যান না প্রায় কেউই—প্রয়োগবাদী, অস্তিত্ববাদী, নব্য-দৃষ্টিবাদী সকলেই—অন্তর্ভুক্ত। এই ঝোঁকের কারণ হল এই যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামো (ও তার দৈন্যদশার) সম্মুখীন হয়ে ও তার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তাঁরা অনেকেই বস্তুবাদী ও ভাববাদী দ্বৈতবাদের মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠতে চাইছেন।

নানাত্ববাদের অভিলক্ষ্য অনুসারে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দ্বৈতবাদ'ই তার মূল বিরোধের ক্ষেত্র। সমাজতাত্ত্বিকদের মহলে অবশ্য নানাত্ববাদের অন্য একটা মহত্ত্ব আছে। নানাত্ববাদী মতাদর্শের ব্যবহার করে সর্বব্যাপী সমাজ ও নির্ধারক বা নিয়ন্ত্রণ সূত্রের যে কোনো সম্ভাবনাকে। নানাত্ববাদী সমাজবিদদের কাছে ইতিহাস শুধুমাত্র কোনো একটি সূত্রদ্বারা গ্রন্থিত ঘটনা বিবর্তনের রেখাপট মাত্র নয়। ইতিহাস তাঁদের কাছে একটা স্রোতের মতো, যেখানে অজস্র আপতিক ঘটনার সঙ্গম ঘটে। সুতরাং এই তাত্ত্বিকদের মতে সামাজিক পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলোই অগ্রাহ্য, সুতরাং তার বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নানাত্ববাদের ভূমিকা অনন্য। উত্তরগঠনবাদী সাহিত্য সমালোচনা যে পন্থা অনুসরণ করে, তা নানাত্ববাদের আধারেই প্রতিষ্ঠিত। লেখকসত্তার মৃত্যু থেকেই সাহিত্যের জন্ম, এই তত্ত্ব থেকে প্রতিপন্ন হয় যেকোনো বিশেষ সাহিত্য কর্মের নির্দিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত, কোনো একটি পাঠ সম্ভব নয়। নিজের মতো করে পাঠ তৈরি করে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যে পাঠকের আছে—এই ভাবনা সাহিত্য সমালোচনার গোটা ধারাটাকেই পাল্টে দিয়েছে বিশ শতকে। এই চিন্তাধারার ফল

দুরকম। 'লেখকের অভিপ্রায়' আর পাঠকের স্বাধীনতার ঘাড়ে চেপে বসে না। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন সময়ে, একই সাহিত্য কর্মের অজস্র ভিন্ন পাঠ তৈরি করা সম্ভব।

ইদানীং নানাত্ববাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটা অবশ্য শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে। শিল্পসমালোচনার দিগন্ত অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে এই মতবাদ থেকে—যার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আছেন জন বার্জার—যিনি তাঁর *আর্ট অ্যান্ড রেভলিউশন* গ্রন্থে চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের তত্ত্বের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে এই তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতিবাদের রকমফের মাত্র। *ওয়েজ অফ সিইং* বইতে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে একের পর এক ছবি সাজালে সেই বিন্যাস থেকে বেরিয়ে আসে একটা বক্তব্য / অর্থ, যার মর্মে কোনো একটা ছবিকে বিচার করে পৌছনো সম্ভব নয়। সুতরাং শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ের পরে প্রবন্ধধর্মী সমালোচনা কার্যত নির্বাক। সেখানে ছবিকে তার নিজের কথা নিজেকেই বলতে হয়, শিল্প তখন সবাক হয়ে ওঠে। ঠিক এখানেই নানাত্ববাদের জয়।

পোস্ট কলোনিয়াল

রংগন চক্রবর্তী

১৯৩০ সাল নাগাদ গোটা বিশ্বের ৮৪.৬ শতাংশ জমিই ছিল কোনো না কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন উপনিবেশের অন্তর্গত। এ থেকেই বোঝা যায় উপনিবেশবাদ বা কলোনিয়ালিজম আমাদের পৃথিবীর ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক মানচিত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া। পোস্ট কলোনিয়াল কথাটি এই বিশাল ইতিহাসকে বোঝার পদ্ধতি এবং তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিতর্কিত একটি পদ। পোস্ট-কলোনিয়াল বিষয়ে ধারণা করবার জন্যে একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে পোস্ট-কলোনিয়াল চিন্তার ভাবনাকে নির্দিষ্ট প্রাঙনিষ্পন্ন একটি তত্ত্ব হিসেবে না দেখে একটি প্রশ্নক্ষেত্র হিসেবে দেখা ভাল। এই চিন্তা একক নয় বরং বহুমুখী প্রশ্নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে—যা বোধহয় এর আসল গুরুত্ব।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে কলোনিয়ালিজম-এর আগে এসে বসা এই উপসর্গের মানে নিয়ে। পোস্ট বা উত্তর মানে কী? এটি কি সময়নির্দেশক? তার মানে কি ধরে নেওয়া হবে যে কলোনিয়ালিজম শেষ হয়ে গেছে? দ্বিতীয়ত, যদি পোস্ট সময়গতভাবে ব্যবহৃত না হয়ে আদর্শগত পরিবর্তন বা পরিবর্ত বোঝায় তা হলে কি এই তত্ত্বের এটাই সম্পাদ্য যে কলোনিয়ালিজমের অভিজ্ঞতায় ছেদ ঘটেছে, ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশগুলির মধ্যে অসম সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছে?

বলা বাহুল্য এই প্রশ্নগুলির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ রয়েছে। পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্বের কঠোর সমালোচকদের মতে এই মতবাদ এক ধরনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ফসল। এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির নামে আসলে উপনিবেশের ওপর ভিত্তি করে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে যে শোষণের ইতিহাস আজও চলেছে তাকে লঘু করে দেওয়া হচ্ছে। পোস্ট কলোনিয়াল সব কুশীলবদেরই এক আপাতসমতার এবং যৌথ অভিজ্ঞতার অংশীদারির চোখে দেখে যা এই শোষণকে চেনার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে তোলে।

এই সমালোচকরা তাই প্রশ্ন তোলেন পোস্ট কলোনিয়াল কবে থেকে শুরু? পোস্ট কলোনিয়াল কোথায়? পোস্ট কলোনিয়াল কারা? উপনিবেশ থেকে জাতি-রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কি উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্নিত করেছে? না নতুন নতুন পন্থায় অসাম্যকে চালু রেখেছে? শুধু তাই নয়, আরো জোরদারও হয়ত করেছে। একইভাবে,

এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা যে অর্থে পোস্ট কলোনিয়াল, ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-স্পেন-পর্তুগালও কি সেই একইভাবে পোস্ট কলোনিয়াল? ঔপনিবেশিক শোষক ও উপনিবেশের শোষিতদের অবস্থান কি একই তাত্ত্বিক মানচিত্রে আঁটানো যাবে?

আবার, ভারতের মানুষ, আফ্রিকার কালো মানুষ আর অস্ট্রেলিয়ার বসতি গেড়ে বসা শাদা মানুষ—সবাই কি এক অর্থে পোস্ট কলোনিয়াল? পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্ব কি বর্তমান বিশ্বের অসম সম্পর্কের রাজনীতিকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করে? না কি এর যোগ্য বিশ্লেষণের জন্যে আমাদের নয়া উপনিবেশবাদ, প্রথম ও তৃতীয় বিশ্ব—এই ধরনের চিন্তার কাঠামো আরও বেশি জরুরি?

কেবল পোস্ট নিয়েই যে পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাও নয়। প্রশ্ন ওঠে কোনো একটি দেশে কলোনিয়ালিজমের ভূমিকার গুরুত্ব নিয়েও। সমালোচকরা প্রশ্ন করেন একটি সমাজের জীবনে কলোনিয়াল ক্ষমতা / ক্ষমতাহীনতা বা অত্যাচার / অত্যাচারিতের সম্পর্ক ছাড়াও শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক যে নানা বৈষম্য থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে কলোনিয়ালিজমকে একটি উপনিবেশের জীবনে পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে কি সার্বিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা কিংবা প্রকৃত ইতিহাসকে সীমিত চোখে দেখা নয়? বর্তমান বিশ্বে 'বিশ্বায়নে'র প্রেক্ষাপটে আমরা বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদের যে উত্থান দেখছি তাতে এই প্রশ্নের গুরুত্ব বোধহয় আরও বেড়ে উঠছে। ঠিক কোন্ অর্থে 'জাতি' আমাদের প্রতিনিধিত্বের একক হওয়ার যোগ্যতা বা ক্ষমতা অর্জন করে?

বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে উপনিবেশবাদের চলমান ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর, ফলাফল, পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে পোস্ট কলোনিয়াল তকমা দিয়ে বিভিন্ন গবেষক, চিন্তাবিদের কাজ নিঃশর্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন না করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ধ্রুব সত্যের সন্ধান না করে উঠে আসা প্রশ্নগুলোকে খতিয়ে দেখতে ক্ষতি নেই। যাঁরা পোস্ট-কলোনিয়াল তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে রাজি তাঁরাও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন : তাঁরা বলছেন এ কথা সত্যি যে উপনিবেশবাদ পুরোপুরি মৃত নয়। তার নিজের শুরু করা প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সে বেঁচে রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার বর্তমান রূপকে কি তুলে নিয়ে তার ইতিহাসের আগের অধ্যায়ে মাপ মতো বসিয়ে দেওয়া যায়? না কি এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে যা তার আগের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরিভাবে মিলতে পারে না, তাকে বোঝবার জন্য নতুন ভাবনার কাঠামোর প্রয়োজন? আজকের ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার গোটাটাকেই কি নয়া উপনিবেশবাদ, উপনিবেশবাদ-বিরোধী বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইত্যাদি মোড়কে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়? না কি উপনিবেশবাদের শিকড় আমাদের সমাজ-জমিতেও এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে, আমাদের মানব-জমিনে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তার ফল হয়ে উঠেছে আরও অনেক জটিল ও মিশ্রিত। পোস্ট কলোনিয়াল কি তাই ভালমন্দের সহজ বিভাজন যে কত অসম্পূর্ণ সেই বাস্তববোধই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়? পোস্ট-কলোনিয়াল কি বলে যে সহজ শিবিরভাগ অলীক স্বপ্নমাত্র, অস্বস্তিকর

আত্মবোধ এড়িয়ে চলারই এক অজুহাত ছাড়া কিছু নয়? পোস্ট-কলোনিয়াল কি শোষক-শোষিত, ঔপনিবেশিক শক্তি ও প্রাক্তন উপনিবেশ জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদির মধ্যে প্রায় আক্ষরিক অর্থে শাদা-কালোর বিভাজনকে প্রশ্ন করে এবং ক্ষমতার জটিল অসাম্যে আমাদের অংশীদারীকে চিহ্নিত করে?

এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোধ হয় একটা বিষয় পরিষ্কার যে প্রশ্নগুলি জটিল ও জরুরি। উপনিবেশবাদ আমাদের পৃথিবীর অসাম্যের চলমান ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমাজে আরও বিভিন্ন অসাম্যের কাঠামো ও সংস্কৃতি আবশ্যিকভাবেই সম্পৃক্ত। এই সব শক্তির বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া আমাদের সমানভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা প্রয়োজন। পোস্ট কলোনিয়াল চিন্তার গুরুত্ব এখানেই যে এই ভাবনার কাঠামো কিছু নিরাপদ বিভাজনের, আমরা-ওরা জাতীয় নিশ্চিন্ত দর্শনের অসৎ আত্মশ্লাঘা ও রাজনৈতিক পক্ষাঘাত থেকে নতুন প্রশ্ন ও উত্তর খোঁজার পথে কিছুটা হলেও যেতে উৎসাহিত করে।

পোস্ট-মডার্নিজম

অভীক মজুমদার

পোস্ট-মডার্নিজম বলতে বোঝানো হয় আধুনিক-বাদ পরবর্তী দর্শন। এই দর্শন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে চায় জীবন-জগৎ-ইতিহাস-সংস্কৃতি। এর পরিধিতে রয়েছে স্থাপত্য, সাহিত্য, ভাষা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, ভিডিও, নৃত্য, সংগীত, ক্ষমতা, রাষ্ট্রশক্তি, মার্ক্সবাদ, যাবতীয় পূর্ববর্তী দর্শনচিন্তাও। তবে, প্রসঙ্গত একথা মনে রাখতে হবে যে, উত্তর-আধুনিক দর্শন আধুনিকবাদের নিছক সম্প্রসারণমাত্র নয় বরং আধুনিকবাদের সমালোচনা এবং তার বিরোধিতায় মুখর।

ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে, উত্তর-আধুনিকবাদ বিশ শতকে তিন বা চারের দশক থেকেই নানা ক্ষেত্রে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। প্রথম এই মতবাদকে চিহ্নিত করা যায় নগর-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি ঘটনাধারা উত্তর-আধুনিক দর্শনের অভিমুখ নির্মাণ করে তোলে। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৬৮ সালে ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-তরুণদের বিভিন্ন আন্দোলন এবং বিদ্রোহ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা জুড়ে উপনিবেশবাদ আর নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীবাদের উত্থান, যোগাযোগ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ব্যাপক বিস্তার, আর পরে কম্পিউটার সংস্কৃতির আগ্রাসন, বিশ্বায়নের 'তুমুল হৈ হল্লা', বহুজাতিকের 'দারুণ দামামা' প্রভৃতি। আর, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত নয়ের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের পতন, যেটি সাধারণভাবে 'সমাজতন্ত্রের পতন' হিসেবে চিহ্নিত এবং পাশাপাশি ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান।

আধুনিকবাদের প্রধান নির্মাণ গড়ে উঠেছিল দীপায়ন যুগে। এক নিটোল, নিশ্ছিদ্র, আদি-মধ্য-অন্ত্য নির্দিষ্ট ইতিহাসের আখ্যান গড়ে উঠেছিল দীপায়ন যুগে, যেখানে এক নিশ্চিতি কাজ করে যাচ্ছিল 'আধুনিক যুগ' প্রসঙ্গে, যেন আধুনিক যুগে পৌঁছে ইতিহাস প্রগতির বাঁধা সড়ক খুঁজে পেয়েছে—এইবার সেই পথে আলো জ্বেলে মানুষের ক্রমমুক্তি ঘটতে থাকবে। কিন্তু, একটু মনোযোগী বিশ্লেষণে এই ইতিহাস নির্মাণের বড়ো একটা গলদ ধরা পড়বে। এই 'আধুনিক' ইতিহাস-নির্মিত 'মানুষ' আসলে, ইউরোপের শ্বেতকায়, 'মহাপরাক্রান্ত' আত্মগর্বী মানুষ। ফলে দীপায়ন যুগে পুঁজির যে বিশেষ

চেহারা, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহজ পরিণতি হিসেবে দেখা হতে থাকে 'মানব বিশ্ব'। ইউরোপের অজানা জগৎ 'বর্বর', 'অশিক্ষিত' 'অসভ্য' জগৎ। 'কেন্দ্র' থেকে নির্ধারিত হতে শুরু করে 'প্রান্ত'—মানুষের ইতিহাস নির্মিত হয় ইউরোপকে 'প্রগতি'র ধারক বাহক হিসেবে বিশ্বাস করে। 'যুক্তি' দিয়ে, 'প্রযুক্তি' দিয়ে, 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধনের' প্রতিশ্রুতি দেয় এই দীপায়ন যুগ সৃষ্ট মতাদর্শ—যদিও সেই সময়টাই ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপন করে চলার যুগ—উপনিবেশের 'নিগার' প্রজাকে শোষণ করে, অত্যাচার করে, ইউরোপীয়দের সুখসাধন হয়ে ওঠে প্রগতিবাদী 'আধুনিক' ইতিহাসের মৌল লক্ষণ।

দীপায়ন যুগের সমালোচনা পৃথিবীর নানা চিন্তাবিদ-ই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৪ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থিওদোর আদর্নো আর ম্যাক্স হর্কহেইমার *ডায়ালেকটিক অব এনলাইটেনমেন্ট*-এ এদিকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোকপাত করেন। ইতিহাসের এই পরিচিত নির্ধারিত ধাঁচ—'আধুনিকতা', 'প্রগতি', 'সার্বিক (total) ইতিহাস'—এই ধারণাগুলি ধাক্কা খেতে থাকে—কার্ল মার্ক্সের *পুঁজি, দাস ক্যাপিটাল* গ্রন্থে যার প্রথম বীজ উপ্ত রয়েছে। নতুন ধারণা নিয়ে পুরনো 'আধুনিক' ধাঁচকে স্থানান্তরিত করতে শুরু করে আধুনিকোত্তরবাদ। যেখানে ইতিহাস হয়ে ওঠে বহুত্বময়, নানা নকশার, নানা অভিমুখের জটিল বয়ন।

দর্শনের ক্ষেত্রেও আধুনিকোত্তরবাদ নিজস্ব বৈনাশিক, বহুত্বময়তা নিয়ে উপস্থিত। দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে, হ্বিটগেনস্টাইন, কোয়োইন প্রমুখ দার্শনিকদের বিশ্লেষণ বিচার শেষে ডেভিডসন, রোর্‌টি, দেরিদা প্রমুখ দার্শনিকরা 'অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ শব্দতালিকা'র বদলে বহু বিকল্প-সমৃদ্ধ তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা খুঁজছেন। দেরিকাকল্পিত 'বি-নির্মাণ' পদ্ধতি এই চিন্তাধারার খুব বড়ো হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সর্বকালজয়ী দার্শনিক ব্যাখ্যার বদলে আধুনিকোত্তরবাদের ঝোঁক আপেক্ষিকতার দিকে।

আধুনিকোত্তরবাদের অপর একটি বড়ো ক্ষেত্র ভাষাবিজ্ঞান আর চিহ্নতত্ত্ব। সুইজারল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্যা সোসুর (১৮৫৭-১৯১৩) কথিত কয়েকটি মৌল ধারণা নির্ভর করে যে গঠনবাদী ভাষাতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, তার গ্রহণ-বর্জন ঘটিয়ে গড়ে উঠল উত্তর গঠনবাদী ভাষাদর্শন। যার সম্প্রসারণ দেরিদার 'বি-নির্মাণ' পদ্ধতি সৃষ্টিতে।

আধুনিকোত্তর দর্শনের প্রধান তিন ব্যক্তিত্ব বলা চলে—মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) এবং জ্যাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪)। এঁদের লেখাপত্রগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ফুকো যেমন সমাজ, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা'র ভূমিকা এবং চাপের সর্বগ্রাসী অবয়ব বিশ্লেষণ করে দেখান। লাকাঁ উত্তরগঠনবাদী প্রক্রিয়ার মনঃসমীক্ষণের চেষ্টা করেন। লাকাঁ মানবমনকে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে 'পাঠ' করতে চান, অন্য দিকে জ্যাক দেরিদা—ভাষাক্ষেত্রে দর্শনক্ষেত্রে চূড়ান্ত বৈনাশিক, বহুত্বময়, অনির্দিষ্টতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই তিনজন ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য রঁলা বার্ত (১৯১৫-১৯৮০), কোনো রচনা বা টেক্সটকে 'পাঠ'

করার ক্ষেত্রে যাঁর মৌলিক চিন্তা আর তত্ত্বগুলি গুরুত্বপূর্ণ। বার্ত কথিত 'পাঠকর্তার মৃত্যু' আলোচ্য প্রেক্ষিতে স্মরণীয় ভাবনা।

'মার্ক্সবাদ' বিষয়েও আধুনিকোত্তরবাদের বিশেষ একটি ধারার মতামত মূল্যবান। তার মধ্যে সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) *কারাগারের লেখালেখি* এবং অন্যান্য ভাবনাচিন্তাগুলি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনঃপাঠের প্রবণতা। রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব বিষয়ে গ্রামসির মৌলিক চিন্তা সবসময়ে মার্ক্সীয় চিন্তার প্রেক্ষিতে খুবই প্রয়োজনীয়। আধুনিকোত্তরবাদকে যে সব সংশয়বাদীরা পুঁজির এক বিশেষ অবস্থায় সৃষ্ট দর্শন হিসেবে দেখতে চান বা আধুনিকোত্তরবাদকে মনে করেন পুঁজিবাদে সর্বসমর্পিত দর্শন হিসেবে—তাঁদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আধুনিকোত্তরবাদের কোনো কোনো ধারা মার্ক্সবাদের সঙ্গে এক সংলাপ চালাতে বদ্ধপরিকর। ফুকোর চিন্তাধারার অন্তিমে গ্রামসির 'প্রতি-আধিপত্যবাদের' (Counter Hegemony) প্রসঙ্গে তারা উৎসাহী। এই প্রেক্ষিতে লুই আলথুসার-এর (১৯১৮-১৯৯০) মার্ক্সপাঠ প্রকল্প আর ব্যাখ্যা এবং য়ুর্গেন হাবেরমাস (১৯২৯ জ.) আলোচিত সমাজতত্ত্বচিন্তা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

পোস্ট-মার্ক্সিসিজম

তপোধীর ভট্টাচার্য

মার্ক্সবাদ, প্রগতি, বিপ্লব, ইতিহাস—সমস্ত কিছুকে মহাসন্দর্ভ বলে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে যে-আধুনিকোত্তরবাদ তার প্রতিবেদনের জন্যে অপরিহার্য এই পোস্ট-মার্ক্সিসিজম বা উত্তর মার্ক্সবাদের তত্ত্বায়ন। বিশ্বপুঁজিবাদের নিয়ন্তা প্রতাপ-কেন্দ্র বহু দশক ধরে উন্নততর তথ্য-প্রযুক্তি ও কূটনীতিকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং পরিপোষক ভাবাদর্শ-লালিত চিন্তাবিশ্বে সর্বাত্মক অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮৫-৮৬ নাগাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা পত্তন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৯৯১ নাগাদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ধ্বসে পড়ার আগেই তত্ত্ববিশ্বে বিদূষণ সংক্রমণের প্রকল্প ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। মার্ক্সবাদী চিন্তাভুবনও বহুধাবিভক্ত হয়ে গেল ধ্রুপদী ও উত্তর-মার্ক্সবাদ সহ আরও কিছু ছোটো-ছোটো বৃত্তে। এখানেই শুভঙ্করের ফাঁকি যে আধিপত্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়ায় লালিত এইসব বর্গ-বিভাজনকে যথাপ্রাপ্ত বলে মান্যতা দিয়ে যাবতীয় কূট-ভাষ্য, প্রতিবেদন, যুক্তিশৃঙ্খলা ঐ সূচনাবিন্দু থেকে উৎসারিত হচ্ছে।

সর্বত্রব্যাপ্ত প্রচারের সুযোগে একবাচনিক তথ্য ও যুক্তি প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, মার্ক্সীয় বীক্ষণে সামাজিক সংকটের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন আবশ্যিক কেননা সংকট-ই ঐ বীক্ষা-প্রসূত আলোচনা-পদ্ধতির প্রধান উপজীব্য। অথচ সার্বিক আত্ম-সমালোচনার তাত্ত্বিক অনিবার্যতা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদ কখনও স্বীকার করে না, কী ভাবাদর্শের পরিসরে কী প্রায়োগিক ক্ষেত্রে, তা অভূতপূর্ব সংকটের চোরাবালিতে ডুবে গেছে। বলা হচ্ছে, বিশ শতকের নানা বাস্তব ঘটনায় ও তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষায় অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণিত যে কোনোমতেই ঐ চোরাবালির সমাধি থেকে তার পরিত্রাণ নেই আর। স্তালিনের পরে মার্ক্সবাদী ঘরানায় বিপ্লব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা প্রতীচ্যে ছিল না। বিশেষত পুঁজিবাদী বিশ্ব মনের মতো 'খাদ্য' পেয়ে গিয়েছিল সোলঝেনিৎসিনের *গুলাগ আর্কিপেলাগো*-র মধ্যে। বাস্তব নয়, বাস্তবের উপস্থাপনাই সত্য; এই মৌলিক তত্ত্ববীজকে শাঁখের করাতের মতো নিপুণভাবে ব্যবহার করেছে ওরা। সমস্ত বিপ্লবী ও বামপন্থী আন্দোলন নাকি স্তালিনের বন্দিশিবিরের ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে ক্রমশ।

১৯৬৮ সালে পারি নগরে ছাত্রবিক্ষোভ ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা যে সাধারণভাবে ভাবাদর্শভিত্তিক গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনায় এবং বিশেষভাবে প্রতীচ্যের চিন্তাজগতে

কুঠারাঘাত করে হয়ে উঠেছে ইতিহাসের জলবিভাজনরেখা—তা মেনে না-নিয়ে অবশ্য উপায় নেই। পুঁজিবাদী বিশ্বের আধিপত্যকামী বৌদ্ধিক বর্গ ক্লান্তিহীনভাবে সেদিকে তর্জনি সংকেত করে জানিয়েছেন, ঐ ঘটনার পরে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী পথ পরিত্যাগ করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এরপরে নব্য দক্ষিণপন্থী ভাবাদর্শ ও প্রতিবেদনগুলি আবার শক্তি সঞ্চয় করেছে। একদিকে এদের সঙ্গে বিতর্কে ও তাত্ত্বিক মোকাবিলায় এবং অন্যদিকে মার্ক্সবাদের মৌলিক চিন্তাবীজগুলি সম্পর্কে সংশয়-প্রসূত জিজ্ঞাসা উত্থাপন করে ধীরে ধীরে পোস্ট-মার্ক্সিসজম বা উত্তর-মার্ক্সবাদ নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেছে। ইতিহাসের এ এক বিচিত্র কৌতুক যে শোষণজীবী ও প্রতাপপন্থী প্রতীচ্যের প্রতিবেদকরাই পোস্ট-মার্ক্স কিংবা পোস্টমডার্ন মার্ক্স সম্পর্কে প্রবলভাবে উৎসাহী। কেননা প্রগতি বিপ্লব ইত্যাদি বাতিল ধারণাগুলি তো এখন আলোচ্যসূচির বাইরে। প্রাচীনপন্থী বা মধ্যপন্থী উদারনীতিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, স্বাধিকার ইত্যাদি কোন্ মাপে ও ওজনে পাওয়া যেতে পারে—তা ঠিক করে দিচ্ছে বিশ্বপ্রতাপকেন্দ্র—এবং এর যথার্থতা প্রমাণ করতে তত্ত্ববিশ্বে আঁধি ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রতীচ্যের আধুনিকোত্তর প্রতিবেদকেরা।

বস্তুত আধুনিকোত্তরবাদই সেই মূল স্নায়ুকেন্দ্র যা আমাদের কাছে ক্রমাগত বিচ্ছুরিত করে চলেছে পোস্ট-হিউম্যানিজম পোস্ট-রেনেশাঁস পোস্ট-এনলাইটেনম্যান্ট পোস্ট-মার্ক্সিসজম-এর নতুন নতুন বিভঙ্গ। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—বিশ্ব জুড়ে একটাই ছাঁচ গড়ে তোলা যার দাপটে সমস্ত অপরতার অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে নিরাকৃত হয়ে যায়। সেইজন্যে রিৎসক্রিগ বা আউসহ্বিৎস থেকে বেশি প্রাধান্য পায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুচতুর দানবায়ন। সুতরাং টমাস ডোশের্টি-র মতো আধুনিকোত্তর প্রতিবেদক তো লিখবেন-ই 'Postmarxism, like postmodernism, strives to make the possibility of thinking of an unpoliced, undisciplined thought, or of thinking, differently—available once more.' (*After Theory*; 1996 : 245)। অথচ যদি বাস্তব বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করি, দেখব, আধুনিকোত্তরবাদী বিশ্বপ্রতাপকেন্দ্র চেকোশ্লোভাকিয়ায়—ইরাকে-উত্তর কোরিয়ায় হিংস্র আধিপত্যবাদের কাছে 'স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার' বা নিজস্ব উপায়ে বেঁচে থাকার ন্যূনতম মানবিক অধিকারও পদদলিত। তাহলে, ডোশের্টি যেমন বলেছেন, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের জুলুম থেকে মুক্ত চিন্তা কিংবা উদ্যমের অস্তিত্ব কোথায় রইল? একদিকে সত্যকে মহাসন্দর্ভ বলে উপহাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে উদ্ধত দম্ভে, নিছক আগ্রাসী রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যবহারিক স্বার্থে, সমগ্র বিশ্ববিবেককে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়ে সত্য ও মিথ্যা উৎপাদন করা হচ্ছে।

তাহলে, উত্তর-মার্ক্সবাদ কোথায় এবং কাদের স্বার্থে কাজ করবে? যে সঠিক ঐতিহাসিকতা এবং সন্ত্রাস আর পীড়নের কবল থেকে মুক্তির সম্ভাবনা পুনর্নির্ণয় করবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তার গোড়ায় গলদ। অন্তত ইরাক-সংশ্লিষ্ট ঘটনা-প্রবাহ চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ঐতিহাসিকতা কিংবা সব ধরনের পীড়ন ও সন্ত্রাস থেকে মুক্তির বাগাড়ম্বর আসলে বিশ্ব-প্রতাপ-কেন্দ্র পরিপুষ্ট প্রতিভাবাদর্শের ছলনা মাত্র। কৌতুক এখানেও যে উত্তর-মার্ক্সবাদীরা দাবি করেন, মার্ক্সবাদ শুধু যে ইতিহাসের মহাফেজখানায় বন্দি হয়ে পুরোপুরি অবান্তর হয়ে গেছে, তা-ই নয়; রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একধরনের নৈতিক করুণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের দায়। তাছাড়া সাম্প্রতিক আধুনিকোত্তর পরিস্থিতি অর্থাৎ যন্ত্র-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ এমন সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক-বিন্যাস গড়ে তুলেছে, ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী ভাবনা দিয়ে যার মোকাবিলা করা অসম্ভব। অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচারের দ্বন্দ্ব কিংবা সত্য ও বাস্তবতার অন্তর্বর্তী ভাবাদর্শের অভিব্যক্তি সম্পর্কে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা এখন পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। কেননা স্বয়ং বাস্তবই তো অজস্র প্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছে আজ এবং বস্তুত হারিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্নায়নের তোড়ে। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর সীমারেখাগুলি এখন আর কার্যকর নয়; স্বভাবত শ্রেণী-সংঘর্ষের ধারণাও বিপ্লব ও ভাবাদর্শের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবান্তর হয়ে পড়েছে। অন্যদিক দিয়ে মার্ক্সবাদের অতি প্রাতিষ্ঠানিকতা সময়-বাহিত পরিবর্তনের পরিপন্থী। পোস্ট মার্ক্সিজম যুগপৎ চিন্তাবিশ্ব ও প্রায়োগিক বিশ্বের এই স্থিতাবস্থাকে বিনির্মাণ করতে চাইছে।

কিন্তু এখানেও রয়েছে প্রতীয়মান ও অন্তঃসারের জটিল দ্বান্দ্বিকতা, রয়েছে যুক্তি-শৃঙ্খলায় সুচতুরভাবে লুকিয়ে-রাখা অন্ধবিন্দু গুলি। তবু এতে সন্দেহ নেই যে উত্তর-মার্ক্সবাদ ইতিহাস নির্দিষ্ট দুরূহ প্রত্যাহ্বানেরও নাম। শুধু কাকে বলব প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিভাবাদর্শ আর কাকে বলব প্রাতিষ্ঠানিকতা কিংবা কাকে বলব ব্যাধি আর কাকে প্রতিষেধক—তা বিচার ও উপলব্ধির সামর্থ্য অর্জন করতে হবে আগে।

পোস্ট হিউম্যানিজম

তপোধীর ভট্টাচার্য

পোস্ট-হিউম্যানিজম বা উত্তর-মানবতন্ত্রী ভাবনা বিশ শতকের অন্তিম দশকগুলিতে ক্রমশ আলোচ্য হয়ে উঠেছে। এর অভিধাই এমন যে বিতর্ক রয়েছে ধারণাটির অস্তিত্বগত যাথার্থ্য নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে, মানববিশ্ব সংক্রান্ত বিশ্বাস আর সর্বজনগ্রাহ্য নয়; মানুষ আর জীবন ও জগতের কেন্দ্রে নেই। রেনেশাঁস ও দীপায়নের শেষতম বিচ্ছুরণও এখন অস্তগোধূলির সঙ্গে মিশে গেছে। যুক্তিবাদ ও পর্যায়ক্রমিক প্রগতির প্রাসঙ্গিকতা নেই কোথাও। এ সময় কোনো কিছুতে কোথাও কেন্দ্র বা ধারাবাহিকতা নেই, নেই কার্য-কারণের অটুট শৃঙ্খলা। উপগ্রহ-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে মানুষের সামাজিক সংরূপ, পরিসরের স্থায়িত্ব ও সময়বোধের বিশ্বাস্যতা। মানুষ এতদিন ধরে নিজের অন্তর্জগৎ গড়ে তুলছিল যেসব মতবাদ দিয়ে, সর্বগ্রাসী অনুপস্থিতি ও নেতিবোধে তাদের হারিয়ে যেতে দেখছি। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে, সেই ১৯৪৭ সালে, দার্শনিক মার্টিন হাইপেগের মানববিশ্বে ঘনায়মান সংকট লক্ষ করে মানুষের চিন্তন-প্রক্রিয়া ও তার পরিণতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে লিখেছিলেন : 'The market of public opinion continually demands new ones.' (১৯৯৩ : ২১৯)!

প্রতিনিয়ত নতুন মোড়ক চায় এই উৎকেন্দ্রিক সভ্যতা। তাতে পুরোনো বিশ্বাসের, অনুভূতির, অভিজ্ঞতার ভিতসুদ্ধ উপড়ে যায় যদি, ক্ষতি নেই। আধুনিকতাবাদ থেকে আধুনিকোত্তরবাদে বিবর্তন মানে বিমানবায়ন থেকে নির্মাণবায়নের স্তরে পৌঁছে যাওয়া। একুশ শতকের গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দাপটে একদিকে বিপন্ন হচ্ছে যাবতীয় অপরতা-সার্বভৌমত্ব-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনন্যতা এবং অন্যদিকে আঁধিকে চিরস্থায়ী করার জন্যে তত্ত্ববিশ্বে আয়োজন চলেছে মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞান ও পরম্পরা যাতে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। তাই সাম্প্রতিক পৃথিবীতে প্রতাপবান অপমানুষেরা মানবতন্ত্রের নিষ্ঠুরতম আততায়ী। আধিপত্যবাদী যুক্তি-শৃঙ্খলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাত্ত্বিকেরা তথ্য-বিনোদন প্রযুক্তির উপর নিঃসপত্ন কর্তৃত্বের সুবাদে মানুষের দুর্বহতম সংকটকে সর্বজনীন পণ্য করে তুলেছেন। উত্তর-মানবতন্ত্র তাঁদের গোকুলে বাড়তে-বাড়তে এখন নিছক প্রবণতার চেয়ে ঢের বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। মানুষকে পাঠ দিচ্ছে সীমাহীন আত্ম-ঘৃণায়; প্রচার করছে, আত্মধ্বংসের মাদকে অভ্যস্ত হওয়ার বাইরে কোনো বিকল্প নেই এখন।

যুক্তির সংকট কৌশলে উৎপাদন করছে যারা, তারাই আবার উৎপাদিত সত্যভ্রমকে যুক্তিবিনাশের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছে। অন্তর্ঘাতকদের চাতুর্যে এখনকার পৌর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের উচ্চাবচতা কোথাও অবশিষ্ট নেই। বৌদ্ধিক বর্গ সাধারণভাবে সর্বব্যাপ্ত প্রতাপের ক্রীড়নক, এমনকী, স্বেচ্ছাবৃত ভৃত্য-পরিকর। তাই মানবিকতা জাতীয় ভাবনাকে অন্তঃসার-রিক্ত বলে প্রমাণ করার জন্যে তাদের মেধাশ্রমে ও উৎসাহে কোনো ঘাটতি নেই। আজকের পণ্যায়িত ও আত্মসমর্পিত মানুষদের মধ্যে এমন-এক বিরল প্রজাতিকে দেখছি, যাদের আত্ম-সংরক্ষণের স্বাভাবিক জৈব তাগিদও নেই—আছে কেবল আত্মহননের উত্তেজনা। ইহাব হাসানের মতো চিন্তাবিদকেও তাই অসহায় নিয়তিবাদীর মতো এই মন্তব্য করতে দেখি : 'We need to understand that five hundred years of humanism may be coming to an end, as humanism transforms itself into something that we must helplessly call posthumanism.' (১৯৭৭ : ৮৪৩)।

প্রশ্ন এই, পুঁজিবাদী সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌছে গেছে যে ইউরোপীয় ও মার্কিন সমাজ—তাদের নিষ্ঠুর-কৃত্রিম-লুব্ধ অমানবিক প্রেক্ষিত তো তৃতীয় বিশ্বের নয়, ভারতীয় উপমহাদেশেরও নয়। তাহলে কেন শঙ্কিত হব এই ভেবে যে ওদের আধুনিকোত্তর দীপায়নোত্তর উত্তর-মানবতন্ত্রী পরিস্থিতির করাল ছায়ায় কুঁকড়ে যাব আমরাও? শঙ্কিত হব, গত দশ-পনেরো বছরে সাবেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের সমান্তরালতা ও অপরতা বারবার আক্রান্ত-দলিত-বিধ্বস্ত হয়েছে বলে। শঙ্কিত হব, কারণ, তথ্য-বিনোদন প্রযুক্তির সর্বাত্মক সন্ত্রাসে ও অন্তর্জালের অপ্রতিরোধ্য সঞ্চরণে আমাদের বহু শতাব্দী-ব্যাপ্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, এক কথায় আমাদের স্বতন্ত্র হওয়ার অধিকার, বিপন্ন হয়েছে বলে। যাঁরা ভাবতেন মানবতাবাদ মানে যুক্তিবাদিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তি-চৈতন্যের জয় ও পিতৃতন্ত্র সহ যাবতীয় নিপীড়ক ব্যবস্থার পরাজয়—পোস্ট-হিউম্যানিজম একটা-একটা করে তাঁদের অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে আধুনিকোত্তর ও উত্তরমানবতন্ত্র নানা কক্ষপথে যুগলবন্দি রচনা করে। যুক্তিকেও অন্ধবিন্দুর সমষ্টি বলে অযৌক্তিক হিসেবে দেখাতে চায়, বিশ্বব্যাপ্ত আধিপত্যবাদী চক্রান্তকে নিষ্কণ্টক করার স্বার্থে চূড়ান্ত ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, ব্যক্তি-সত্তাকে নিরালম্ব ও বিচূর্ণিত করে দেয়, নারীচেতনাকে নানাভাবে বিপথগামী করে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেয়।

সুতরাং ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভাবে যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের ওপর উত্তরমানবতন্ত্রী ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করবে। স্বভাবত আমাদের অভিমতের পুরোপুরি বিপরীত মেরুতে থাকবেন সমৃদ্ধ প্রতীচ্যের চিন্তাবিদেরা। এইজন্যে সাম্প্রতিক পশ্চিম ইউরোপীয় দার্শনিকদের কাছে মানবতাবাদ প্রগতিশীল ধারণা নয়, তা প্রতিক্রিয়াশীল। কেননা এর বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে কল্পিত সর্বজনীন মানবিক নির্যাসের অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রত্যয় যা সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রমহীনভাবে উপস্থিত। তাঁরা এ ধরনের কোনও অন্তঃসারের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। কেউ কেউ ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেন যে এই ভাবনার সঙ্গে যুক্তিহীন ধর্মীয় সংস্কারের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

কেউ কেউ আবার ফিরে যান মানবতাবাদের অন্যতম প্রধান স্থপতি দেকার্তের কাছে, তাঁর বয়ানের অন্তর্বৃত অন্ধবিন্দু আবিষ্কার করার জন্যে। সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করে দেখানোর ক্ষমতা সমস্ত মানুষের মধ্যে সমান মাত্রায় রয়েছে কিংবা যুক্তিবাদী চিন্তাই মানুষকে মানুষ করে তোলে : দেকার্তের এইসব বক্তব্য তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। উপলব্ধিনির্ভর দ্বিরালাপ ও সক্রিয়তাই মানবিক অভিজ্ঞানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্যও তাঁদের কাছে অকাট্য মনে হয়নি। উত্তরমানবতন্ত্রী পর্যায়ে মার্ক্স এবং ফ্রয়েড—দু-জনই সমান অপ্রাসঙ্গিক। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না-গিয়েও বলা যায়, আত্মতা ও বস্তুত্ব—কোনও কিছুই আর যথাপ্রাপ্ত নয়; চিরন্তন মানবতা বলে কিছু হয় না।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদ আসলে মানবতাবাদের প্রত্যাখ্যানে গতি সঞ্চার করেছিল। সচেতন মনের বিধি বিন্যাসকে এড়িয়ে যেতে চায় যে-মানুষ, সে শেষপর্যন্ত জগৎ-ব্যাপারে তার অবস্থানকেই নড়বড়ে করে দেয়। তাছাড়া মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের চিরাচরিত গ্রন্থনাও শিথিল হয়ে পড়ে। মানুষের পরিচয়কেই মনোবিকলনবাদ নানা ধরনের সংশয় ও জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে দিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংগঠিত ভাবে মার্ক্সবাদের অপব্যাখ্যা অর্থাৎ মানব-মুক্তি এবং সমাজে ও ইতিহাসে ব্যক্তির প্রকৃত স্থান সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছিল। সবই যেহেতু হচ্ছিল আধিপত্যবাদীদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে, একতরফা প্রচার পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আধুনিকোত্তর পর্বের সূচনায় বিশেষত আকরণবাদী ও আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে, মানবতাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জাক লাকাঁ কোনো ধরনের সামগ্রিক মানবতাবাদী ঐতিহ্য মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। মিশেল ফুকো বললেন মানুষের (আসলে মানবতার) মৃত্যু-পরোয়ানার কথা। তাঁর মতে, মানুষের সমাজে যদি মৌলিক পরিবর্তন আনতে হয়, মানবতাবাদের বিরোধিতা করতে হবে এবং পার্থক্য-প্রতীতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে 'the future world begin with the end of man' (২০০০ : ৭)। অর্থাৎ ইতিহাস-ভাবাদর্শ-সত্যের মতো মানুষেরও অবসান হয়ে গেছে।

প্রত্নতত্ত্ব

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

'প্রত্নতত্ত্ব' শব্দটা উচ্চারণ করলেই একটা ছবি ভেসে ওঠে। একটা দাড়িগোঁফওলা ঝুলকালিমাখা বুড়ো লোক প্রাণপণে কোদাল-শাবল দিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢাকা ঢিবি খুঁড়ে চলেছে...হঠাৎ ঠং করে শব্দ। ইউরেকা, পাওয়া গেছে সাতরাজার ধন এক মানিক! খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। গুপ্তধন খোঁজার এমনতর গল্পের সঙ্গেই যেন প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এটা পুরোপুরি মিথ্যেও নয় যে অনেক দিন পর্যন্ত অমূল্য পুরাবস্তুর অনুসন্ধানই ছিল প্রত্নতাত্ত্বিকের মূল উপজীব্য। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই অন্য অনেক কিছুর মতোই এ ক্ষেত্রেও ধ্যানধারণা বদলাতে থাকে, আর আজ পৃথিবী জুড়েই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিয়েছে। খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন আজও আছে, থাকবেও। কারণ মানুষের অতীতের অনেকটাই লুকিয়ে আছে মাটির তলায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব আজ ওই গুপ্তধনের ঢিবি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ছড়িয়ে পড়েছে নানা মাত্রায়। প্রত্নতত্ত্ব (archaeology) শব্দটির উৎস গ্রিক arkhaiologia, অর্থাৎ প্রাচীন জিনিস নিয়ে চর্চা। আজকের প্রত্নতত্ত্বের চোখে এই 'প্রাচীন' বা অতীত গতকাল থেকে শুরু করে মানুষের প্রথম হাতিয়ার ব্যবহারের কাল (এখন পর্যন্ত অনুমান, অন্তত ২৫ লক্ষ বছর আগে, পূর্ব আফ্রিকায়) পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজের ক্ষেত্র সারা পৃথিবী—পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, সমুদ্রতল বা মহাকাশ সবই হতে পারে। এখনও সুদূর অতীতই অধিকাংশ প্রত্নবিদের আলোচ্য। অল্প হলেও বিশেষত বিদেশে সাম্প্রতিক অতীত চর্চার প্রবণতা বাড়ছে, যেমন নাৎসি বুঙ্কার বা বার্লিন প্রাচীর নিয়ে। মানুষই কিন্তু এই চর্চার কেন্দ্রবিন্দু, তার কাজকর্ম, জীবনচর্যা নিয়েই প্রত্নতাত্ত্বিকের চিন্তাভাবনা। এই ভাবনার শুরু কবে, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। প্রথম বিশিষ্ট ব্রিটিশ প্রত্নানুসন্ধানী উইলিয়াম ক্যামডেন ষোড়শ শতকের শেষে বলেছিলেন, প্রত্নবস্তুর চর্চা আসলে অতীত সম্পর্কে জানার ইচ্ছে। অতীতের মানুষও যে তার অতীত নিয়ে ভাবিত ছিল, তার প্রমাণ আছে। সে অর্থে ব্যবিলনের সম্রাট নবনিদাসকে প্রাচীনতম প্রত্নানুসন্ধানী বলা যায়—খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তিনি তারও হাজার বছর আগেকার এক মন্দিরের ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে দেখেছিলেন। আবার জুলিয়াস সিজারের সেনারা ইতালি ও গ্রীসে বহু প্রাচীন সমাধি থেকে লুঠপাট করেছিল। মিশরে এমন কোনো সমাধি পাওয়া যায়নি (এমনকী তুতানখামেনেরও নয়) যেখানে কখনো চোর ঢোকেনি। কিন্তু ফরাসি বাহিনীর মিশর অভিযানে প্রত্নতাত্ত্বিক

অনুসন্ধানে জোর দিয়েছিলেন নেপোলিয়ন, আর তাতেই আবিষ্কৃত হয় ত্রিভাষিক রোসেটা স্টোন—যা হায়ারোগ্লিফিক্স বা চিত্রলিপির চাবিকাঠি। প্রথম পর্বের অভিযাত্রী-পর্যটকরাই সর্বত্র প্রত্নানুসন্ধান চালিয়েছেন, এবং তাতে কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়ে জাদুঘর বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষা পেলেও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। কারণ তাঁরা এমন অনেক কিছু নষ্ট করেছেন গুরুত্বহীন বলে, যা আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে অমূল্য। অতীতের সামগ্রিক পরিচয় উদ্ধার নয়, মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করাই সে যুগে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অরেল স্টাইনের মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত রেশম পথের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা লুপ্ত শহরগুলির অনুসন্ধানকে একদা প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় দিকচিহ্ন মনে করা হলেও আজ তা এমনই এক ধ্বংস আর লুঠপাটের আখ্যান বলে চিহ্নিত। উনিশ শতকের গোড়া থেকে মাঝামাঝির মধ্যে এই ধারা বদলাতে লাগল। মাটি খুঁড়ে প্রত্নবস্তু তুলে আনা নয়, সে কালের মানুষ কেমন করে থাকত, কী করত তার হদিশ করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। যথাসম্ভব নিদর্শন স্বস্থানে রক্ষা করার চেষ্টাও আজকের প্রত্নতত্ত্ব চর্চার অন্যতম অঙ্গীকার।

ভারতে প্রত্নচর্চার সূচনা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের হাতেই। ব্রিটিশ সরকারি অফিসার, ফৌজি, শিল্পী-আলোকচিত্রীদের বর্ণনা থেকেই হদিশ মিলেছে বহু অজ্ঞাত পুরাক্ষেত্র আর পুরাকীর্তির। অজন্তা গুহা আবিষ্কার বোধহয় তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য। সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভারহুত থেকে বৌদ্ধস্তূপের যাবতীয় অবশেষ তুলে এনে রেখেছিলেন কলকাতা জাদুঘরে, আজও তা সেখানে আছে। অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপ থেকে পাথরের ভাস্কর্য তুলে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছিল চুন বার করার জন্য, সরকারি হস্তক্ষেপে তা রক্ষা পায়, তবে অধিকাংশই চলে যায় লন্ডনে। স্বাধীনতার পরে আবার অন্ধ্রের নাগার্জুনকোন্ডায় জলাধার তৈরির প্রয়োজনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুরো অঞ্চল খুঁড়ে ফেলে স্থাপত্য নিদর্শন সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তেলকুপি অবশ্য সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়েছে, সেখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলি আজ জলের তলায়। পুরাণকাহিনি থেকে 'সত্য' ইতিহাস খুঁজতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হাইনরিখ শ্লিম্যান যেমন 'ট্রয়' খুঁজে পেয়েছিলেন, এ দেশেও তেমন চেষ্টা হয়েছে রামচন্দ্রকে নিয়ে। সে বিতর্ক আজও মেটেনি, প্রত্নতত্ত্ব জড়িয়ে গেছে রাজনীতির সঙ্গে। তবে আকস্মিক আবিষ্কার থেকে ইতিহাসের ফাঁক ভরাট করার ঘটনাও ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালেই মালদহের জগজীবনপুরে পালরাজ মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসন আবিষ্কার থেকে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে পাওয়া গেছে বিশাল বৌদ্ধবিহার আর অজস্র টেরাকোটা ফলকে বিধৃত এক অজ্ঞাতপূর্ব শিল্পধারার ইতিবৃত্ত! তবে এখন উৎখনন অনেক বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে, অত্যন্ত ধীর লয়ে করতে হয়, প্রাপ্ত প্রতিটি নিদর্শন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিজ্ঞানের নানা শাখা। প্রাচীন নিদর্শনের কাল নির্ণয়ের নানা নতুন পদ্ধতি, আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্র, শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে মাটির তলায় পুরা নিদর্শনের খোঁজ, ভূতাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক গবেষণা আজকের প্রত্নতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বাঙালিদের ভূমিকা বড়ো কম নয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাদ দিয়ে ওড়িশার প্রত্নতত্ত্ব ভাবা যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের গল্প যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়ের দিকেও কিন্তু রাখালদাসই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ রাখালদাসের হাতে গড়া। উত্তরবঙ্গে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে কেন্দ্র করে প্রত্নচর্চায় নামেন, আর নলিনীকান্ত ভট্টশালী গড়ে তোলেন ঢাকা জাদুঘর (আজকের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)। এ থেকে শুরু করে আজকের বহু শাখায় বিভক্ত প্রত্নতত্ত্ব চর্চাও লিপিতাত্ত্বিক দীনেশচন্দ্র সরকার, মূর্তিতাত্ত্বিক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকী একদা প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবলা মিত্রের মতো বাঙালির কৃতিত্বে উজ্জ্বল।

এক অর্থে প্রত্নতাত্ত্বিকরা চূড়ান্ত আশাবাদী। শুধুমাত্র বস্তুগত অবশেষ থেকে অতীত সম্পর্কে সত্যিই কতটুকু বলা সম্ভব? অতীতে যা কিছু ঘটেছে, তার খুব কম অংশই রক্ষা পেয়েছে, তারও খুব সামান্য অংশ প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্ধার করতে পেরেছেন, আর তারও ক্ষুদ্রতম অংশ ঠিকমতো চিহ্নিত বা ব্যাখ্যা করা গেছে। প্রাগৈতিহাসিক পর্বের তো এই দশা। ঐতিহাসিক পর্বের অবস্থাও কিছু ভাল নয়। লিখিত বিবরণ আছে বলে একটু বেশি জানা যায়, এই মাত্র। কিন্তু আমরা ভালই জানি, সদ্য ঘটে যাওয়া কোনও কিছু নিয়েও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া বিবরণ এক সুরে কথা বলে না! আর অতীতের লিখিত বিবরণ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একতরফা। তখন প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যই জরুরি ইতিহাস পুনর্গঠনে। রাজারাজড়ার ইতিহাস নয়, সাধারণের বারমাস্যার লিখিত বিবরণও তো দুর্লভ, এমনকী সাম্প্রতিক অতীতেরও! কেউই যে হেতু নিশ্চিত জানে না অতীতে ঠিক কী হয়েছিল, তাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কোনো শেষ নেই। তত্ত্ব আসে যায়, নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার অতীত সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রতি নিয়তই বদলে দেয়। প্রত্নতত্ত্ব তাই এক অবিরাম অনুসন্ধান।

প্রলেতারিয়েত

অমিয়কুমার বাগচী

প্রলেতারিয়েত কথাটার উৎপত্তি লাতিন প্রোলেতারিয়ুস্ থেকে, সেখান থেকে ফরাসি ভাষায় প্রলেতারিয়াত, ইংরেজিতে প্রোলেটারিয়েট, বাংলায় 'সর্বহারা'। প্রাচীন রোমে অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দ শুরুর দু তিনশ' বছর আগে থেকে রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্যন্ত সময়ে প্রলেতারিয়ুস বলতে রোম শহরের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষদের বোঝাত—যারা ক্রীতদাসও নয়, অথচ যাদের সম্পত্তি বা নিয়মিত আয় বলতে কিছু ছিল না। প্রলেতারিয়াত কথাটা নতুন মাত্রা পেল উনিশ শতকের গোড়াতে সমাজতন্ত্রী অথবা সাম্যবাদী (Communist) আন্দোলনের উদ্ভবের সময় থেকে। একথা স্মর্তব্য যে, মার্ক্স এঙ্গেল্‌স যাদের জন্যে *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* লেখেন, সেই কমিউনিস্ট লিগের জন্ম তার আগেই ঘটেছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রকাশের আগেই ১৭৮৪ সালের অক্টোবর নভেম্বর নাগাদ এঙ্গেল্‌স 'কমিউনিজমের নীতি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখেন—সেটি এঙ্গেল্‌সের জীবদ্দশায় প্রকাশ হয়—কিন্তু তার বহু কথাই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মান ভাষায় লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, প্রোলেতারিয়াত কথাটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে মার্ক্স এঙ্গেল্‌স থেকে শুরু করে পরবর্তী মার্ক্সপন্থী লেখক এবং বিপ্লবীদের রচনায়। ১৮৮৮ সালে কমিউনিস্ট ইশ্‌তহারের এক ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেল্‌স প্রোলেতারিয়াতের সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'প্রোলেতারিয়াত আধুনিক বেতনভোগী মজদুর যাদের নিজস্ব কোনো উৎপাদন সামগ্রী নেই এবং যাদের বাঁচার জন্যে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচতে হয়।'

আমরা এখন থেকে প্রোলেতারিয়াতের জায়গায় সর্বহারা কথাটা ব্যবহার করব। সর্বহারা বলতে বহুক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে সেই সব নিঃসম্বল শ্রমিকদের যারা আইনের দিক থেকে মুক্ত—তাদের সম্পত্তিও যেমন নেই তেমনি তারা কারো বাঁধা চাকর বা ক্রীতদাস নয়। তার সঙ্গে আরো একটি সংকোচনের চেষ্টা হয়েছে—সর্বহারা হল সেই সব শ্রমিক যারা আধুনিক অর্থাৎ বড়ো যন্ত্রচালিত কারখানার কাজ করে জীবিকা অর্জন করে। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের চিন্তায় সর্বহারাদের এই অংশই প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে নতুন ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় এই শ্রেণির লোকেরাই সমাজবিপ্লবের প্রধান শক্তি হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারবে যে ধনতন্ত্রীশ্রেণির হাতে ক্ষমতা থাকলে তারা সর্বক্ষণ শোষিত হবে এবং তাদের জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা

ঘূর্ণিঝড়ে ওলোটপালোট হতে থাকবে। আর অন্যদিকে তাদের সম্পত্তিবিহীনতার সমতা থেকে এক সামগ্রিক চেতনার জন্ম হবে যে, নতুন শ্রেণিহীন সমাজে, শ্রমজীবীরাই সকলের স্বার্থে সমাজনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াবে।

মার্ক্সের উত্তরসূরিদের মধ্যে বিশেষ করে যে লেনিনপন্থীদের চিন্তাধারায় আরেকটি বিশ্বাসের জন্ম নিল, তা হল সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণা। ধনতন্ত্রের যুগে বিশেষ করে ধনতন্ত্রের উত্থানের সময়ে রাষ্ট্র নিয়ন্তা ছিল এবং আছে বুর্জোয়া অথবা ধনতন্ত্রী শ্রেণি। বাইরে গণতন্ত্রের পোষাক থাকলেও, ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা আসলে সম্পত্তিশালীদের একনায়কতন্ত্র। একইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে যে রাষ্ট্র গড়া হবে তার ভিত্তি হবে তার ভিত্তি হবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। সোভিয়েত বিপ্লবের পরবর্তী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল এই প্রত্যয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র পরবর্তীকালে পার্টির একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং পার্টির আমলারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের একটি প্রধান কারণ সর্বহারার একনায়কতন্ত্র এবং পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিকৃত রূপায়ণ।

সর্বহারাশ্রেণি প্রকৃত অর্থে একটি সমগুণবিশিষ্ট শ্রেণি কিনা, সর্বহারা শ্রেণির চৈতন্য বলে আলাদা কিছু আছে কিনা এবং থাকলে সেই চৈতন্য কীধরনের প্রভাবে গড়ে ওঠে এ নিয়ে বহু বিতর্ক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বহুযুগ ধরে অনুরণিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের প্রভেদ, উদীয়মান শিল্প ও অস্তমান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে অবস্থাবৈগুণ্য, তথাকথিত বর্ণ বিভেদের ফলে বৈষম্য, অনেক সময় ধর্ম অথবা ভাষার ভিত্তিতে শ্রমিকের প্রতি ব্যবহারের বৈষম্য এবং তৎসম্পৃক্ত শ্রমিক চেতনায় বিভাজন—সবই গবেষকদের আলোচনায় উঠে এসেছে। একটা বড়ো বিতর্ক তৈরি হয়েছে কখন শ্রমিক শ্রেণিকে সত্যিকারের শ্রেণি বলা যাবে আর কখন তাদের মার্ক্সের ভাষায়, আলুর বস্তার মধ্যে আলাদা আলাদা আলু হিসেবে দেখতে হবে—এই বিতর্কের মীমাংসা শুধু শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান দিয়ে হয় না—তার জন্যে শ্রমিক রাজনীতির বিশ্লেষণও প্রয়োজন। শ্রমিক বা সর্বহারার সমষ্টি তখনই নির্বিধ শ্রেণিতে উন্নীত হবে, যখন তারা রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিজেদের জন্যে লড়তে পারবে : যখন শুধু সংজ্ঞাবাহী শ্রেণি, নিজের ভোগ্যের জন্যে লড়াই করতে পারবে।

গত তিরিশ বছরে অধিকাংশ দেশে শ্রমিকশ্রেণি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। তাই বলে সর্বহারা পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। বরং বলা যায় জগদ্‌ব্যাপী মন্দা, এবং গরিব দেশগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমিকের দেশ বিদেশ অভিগমনের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ এবং একই সঙ্গে ধনতন্ত্রীদের উপর সমস্ত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে সর্বহারার সংখ্যা বেড়েছে এবং বহুদেশে মজদুরের সত্যিকারের হার কমে গিয়েছে। এর ফলে সর্বহারার আন্তর্জাতিক সখ্যের প্রয়োজন অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ সত্ত্বেও বলা যায় 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই স্লোগান কার্যে পরিণত হতে এখনো বহুদূর হাঁটতে হবে।

প্রসিনিয়ম

শেখর সমাদ্দার

প্রসিনিয়ম (Prosceenium) এই লাতিন শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক proskenion শব্দটি থেকে। 'Pro' অর্থ সামনে, 'Skene' হল মঞ্চ, অর্থাৎ মঞ্চের সামনের অংশ হল প্রসিনিয়ম। শব্দটির উদ্ভব সুপ্রাচীনকালে। আধুনিককালে শব্দটির আদি অর্থ বিবর্তনের ফলে অনেকখানি বদলে গেছে। গ্রীসের এপিডোরাসে প্রথম পাথরযুক্ত নাট্যশালা, যার নাম 'ডায়নিমাস থিয়েটার' গড়ে ওঠে স্থপতি লাইকারগাসের চেষ্টায়। তখন পলিক্লিটাসের রাজত্বকাল (৩৩৮-৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) চলছিল। অ্যারিস্টোফেনিসের 'প্লুটাস' অভিনীত হয়েছিল এখানে। ক্রমে হেলেনীয় গ্রিসে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আগ্রহে ভাঁটা পড়ে। লাইগারগাসের সময়ই শুরু হয় নতুন কমেডির অভিনয়। আগে এই থিয়েটার ছিল এইরকম—এক বৃত্তাকার বৃহৎ অভিনয়ক্ষেত্র, যার নাম 'অর্কেস্ট্রা', সেই 'অর্কেস্ট্রা'-কে ঘিরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে বৃত্তাকার দর্শকাসন—আর সেই 'অর্কেস্ট্রা'র পিছনে উঁচু থামওয়ালা বারান্দা, তাতে 'Paraskenia' নামে অস্থায়ী আচ্ছাদন, যার পিছনে ছিল সাজসজ্জার ব্যবস্থা। 'অর্কেস্ট্রা'য় কোরাসের প্রাধান্যই ছিল বড়ো, অভিনেতারা পিছনের দাওয়া থেকে নেমে এসে অভিনয় করে চলে যেত। এখন নতুন কমেডির বৈশিষ্ট্য হল, অভিনয়কেই চরম উৎকর্ষ বলে মনে করা এবং চরিত্রায়ণই হল নাটকের সব। ফলে অভিনেতার গুরুত্ব বাড়ল, তাকে প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু হল একটি উঁচু ক্ষেত্র (Logeion) তৈরি করা। 'অর্কেস্ট্রা' ছোটো হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেল, 'Paraskenia' অংশটি ঢালু হয়ে এগিয়ে এল সামনের দিকে, তার দুপাশের স্তম্ভের উপর আশ্রয় করে প্রসেনিয়ম তৈরি হল। রেনেশাঁসের যুগে ইতালিতে এই প্রসিনিয়মের চেহারা আরো স্পষ্ট হল, যখন মঞ্চের চার দিকে ঘিরে একটা সজ্জার ভাব আনবার জন্য ঝালর ঝোলানো হল। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির পারমা শহরের ফারনিস থিয়েটারে সভাপতি গিয়ামবাতিস্তা আলিওত্তি এই চেহারাটি রচনা করেন। মঞ্চের সামনের দিকের কিছুটা জুড়ে এর ফলে ছবির পর্দা বা Curtain-এর ব্যবহার। রেস্টোরেশন যুগের ইংলন্ডে এই 'পিকচার ফ্রেম' মঞ্চ চালু হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী দৃশ্যপট রচয়িতা ইনিগো জোনস (১৫৭৩-১৬৫২)। তিনি ছিলেন 'কোর্টমাস্‌ক্‌স্' বা সঙজাতীয় প্রহসন নাট্যের রচয়িতা। ইতালি এবং ডেনমার্কে শিক্ষানবিশিসূত্রে জোনস যুবরাজ হেনরির পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন। দেশে ফেরার পর তিনি হন

'কোর্টমাস্‌ক্‌সে'র শিল্পগত পরিচালক। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ হলে প্রথম ইতালীয় পদ্ধতিতে মঞ্চচিত্রণের ব্যবস্থা করেন।

থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থায় প্রসিনিয়মের আনুষঙ্গিক কতকগুলি উপাদান আছে, প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে। আধুনিককালে যাকে আমরা 'পিকচার ফ্রেম' মঞ্চ বলি, সেখানে প্রসিনিয়ম অর্থ হল দুপাশে দুটি স্থায়ী (অস্থায়ী মঞ্চের ক্ষেত্রে অস্থায়ী) দেয়াল, সারা মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে আলাদা করে। এই দুটি দেয়াল মঞ্চকে 'পিকচার ফ্রেমে' পরিণত করে এবং সম্মুখভাগের পর্দাটি তাদের অবলম্বন করে থাকে। অথচ প্রথমে এর অর্থ ছিল, যা আমরা আগে বলেছি—মঞ্চের সামনের অংশ, পরে অর্থ দাঁড়াল পর্দার সামনের মঞ্চ। অবশেষে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে মঞ্চের চারিধার। রেস্টোরেশন যুগের ইংলন্ডে এই প্রসিনিয়মের গায়ে অভিনেতাদের মঞ্চপ্রবেশের জন্য এক থেকে তিনটি পর্যন্ত দরজার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই দরজাগুলিতে বেল পর্যন্ত লাগান থাকত। রেস্টোরেশন যুগের কিছু পরে এই দরজা প্রসিনিয়মের বাইরে-স্থায়ীভাবে করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে দু'পাশে একটি করে দরজার ব্যবস্থা হল, উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় অভিনেতারা একটি দরজা দিয়ে ঢুকে মধ্য মঞ্চ পর্যন্ত এলে অভিবাদন করে অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। তখন একে বলা হত 'কল ডোর'।

প্রসিনিয়মের ভেতরে উইং এবং উপরের চিত্রিত ঝালরযুক্ত বর্ডারসহ প্রসিনিয়ম আর্চের খোলা অংশকে যখন ঢাকার ব্যবস্থা হল, তখন এর নাম হল 'মেকি' (False) প্রসিনিয়ম। দুপাশের দুটি বড়ো ফ্ল্যাট কিংবা তার গায়ে দরজা লাগিয়ে প্রসিনিয়ম আর্চের পিছনে পরস্পরের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে তার গায়ে যখন দৃশ্যপট টাঙানো হত, তখন তাকেও বলত 'মেকি প্রসিনিয়ম', ওই দুটি ফ্ল্যাটের উপর একটি 'সিলিং' লাগিয়ে একটি গুহার মতন ব্যবস্থা করা হত, যার ভেতরে থাকত দৃশ্যপট। মঞ্চের পিছনে 'সাইক্লোরামা' বা আকাশপট টাঙাবার জন্যেও 'মেকি প্রসিনিয়মে'র প্রয়োজন হত। যতদিন না স্থাপত্যধর্মী মঞ্চসজ্জা ত্রিমাত্রিক ছোটো ছোটো দৃশ্যপট ব্যবহার কিংবা বিস্তারিত দৃশ্যব্যবস্থা করা হয়েছে, ততদিন এই 'মেকি প্রসিনিয়ম' ছিল মঞ্চের অত্যন্ত জরুরি অংশ।

প্রসিনিয়মের একটি অভ্যন্তরীণ অংশের নাম 'Inner Proscenium'। প্রসিনিয়ম আর্চের বিস্তৃত চওড়া খোলামুখ, তাকে ছোটো করার জন্য প্রয়োজনে এর ব্যবহার হয়। নানা আকারের মঞ্চে দৃশ্যপটের সংস্থান ঘটাতে দুপাশের উইংসকে ছোটো করে এর চেহারাটা তৈরি হয়। এর আকৃতিটা হয় ঈষৎ তেরছা (Profile) হয়ত একেবারে পর্দার মাপসই এবং দুপাশকে জোড়া দেয় উপরকার গাঢ়রঙের বর্ডার। চিত্রবিচিত্র ঝালর, অলংকৃত দৃশ্যপট বা মঞ্চোপকরণের স্বার্থে এর ব্যবহার করা হয়। একে বলে tormentor, দৃশ্যপট শিল্পী এটির গায়ে দৃশ্যপট ঝোলাবেন বলে প্রয়োজন অনুসারে এর মাপ করে নেন। মঞ্চের গঠন ও উচ্চতা অনুযায়ী এর উচ্চতা ও গঠনও নানারকম করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এদের মঞ্চ থেকে পাদপ্রদীপ পর্যন্ত কমানো-বাড়ানো বা স্থানান্তরিত করা হয় এবং দৃশ্যপট অনুযায়ী কাজে লাগানো যায় বলে এরা ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলের পক্ষে খুবই দরকারি।

দুটি tormentor-এর মাঝখানকার আড়াআড়ি যে কাপড় বা পর্দা ব্যবহৃত হয়, tormentor দুটির রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার রঙ রাখা হয়। এর জন্য মঞ্চের ভেতরে ছবির আদলটা তৈরি হয়ে ওঠে। একে বলে teaser। দড়ির সঙ্গে বাঁধা এই teaser-টি প্রাচীনকালে খুব জমকালো করা হত—উচ্চতা অনুযায়ী একে উঁচু নিচু করা যায়। মঞ্চের সামনের পর্দার জন্য যে বর্ডারটি প্রসিনিয়ম আর্চের উপর থাকে, তাকে সরানো যায় না। এই স্থায়ী বর্ডারকে বলা হয় 'প্রসিনিয়ম বর্ডার'।

'প্রসিনিয়ম আর্চ' বা খিলানের সামনে ঝোলানো পর্দাটি কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগে অপরিচিত ছিল। রেস্টোরেশন যুগে নাটকের প্রস্তাবনা শেষ হলে এই পর্দা ওঠার ব্যবহার হল। নাটকের পরিসমাপ্তি উচ্চারণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একে অদৃশ্য রাখার ব্যবস্থা থাকবে—'পর্দা পড়া'র অর্থ হল নাটকের শেষ। এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কে যাবার জন্য কেবল দৃশ্যপট বদলাত, অভিনেতারাও সরাসরি অন্য অঙ্কে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিত। এই পর্দা দীর্ঘকালের ব্যবহার পেরিয়ে প্রসিনিয়মের খোলা দিকটার উপর আবরণ হিসাবে নাট্যক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে—এর উপর নানান ছবি, লেখা আরম্ভ হয়েছে। তখন এর নাম হয়েছে 'Act drop'। উনিশ শতকের মাঝামাঝি, স্যার হেনরি আর্ভিংয়ের সময়ে এই পর্দা দৃশ্যের বিরতিকালে মঞ্চকে আড়াল করতে শুরু করেছে—দৃশ্যসংস্থানের বদল ঘটাবার জন্য। ক্রমশ এই সম্মুখ পর্দার ব্যবহার বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে ফেস্টুনের মত কাজ করেছে। আজকাল এই ধরনের পর্দার ব্যবহার আলাদাভাবে করা হয়ে থাকে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের ড্রুরি লেনে প্রসিনিয়মের গায়ে আরো একটা পর্দার ব্যবহার হয়, যার কাজ অগ্নিসংযোগ থেকে মঞ্চকে বাঁচানো। এর চালু নাম ছিল 'Iron'—এর ফলে মঞ্চগুলি অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। 'inner proscenium' এর tormentor-এর উপরের ফাঁকা অংশটির নাম 'ফ্লাই' (flies)। এখানে দর্শকদের কাছে অদৃশ্য দৃশ্যপটগুলি ঝোলে, দড়ির সাহায্যে 'ফ্লাইম্যান'রা সেগুলিতে ওঠানো-নামানোর কাজ করে। এরা প্রসিনিয়মের উপরে মঞ্চের যে ফাঁকা অংশে কাজ করে, অর্থাৎ যেখানে ও 'Pin-rail' অংশে দড়ির সাহায্যে দৃশ্যপটগুলি ঝুলন্ত থাকে, তাকে বলা হয় fly flour।

প্রসিনিয়ম মঞ্চরীতি দীর্ঘদিনের পুরনো এবং এর সমগ্র ব্যবস্থাপনাও বেশ জটিল। গোড়ার দিকে এই ব্যবস্থাপনাই দর্শক ও দৃশ্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ করেছিল। কিন্তু আধুনিক ইউরোপে একমাত্র শেকসপিয়ারের নাটকগুলি এবং আধুনিক ধ্রুপদী নাট্যগুলি ব্যতিরেকে নাট্যপ্রয়োগে বাঁধা গণ্ডিকে অতিক্রম করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। গ্রিক ও এলিজাবেথীয় যুগের অভিনয়রীতিতে ফেরবার জন্য অথবা বলা যায় প্রসিনিয়মের 'পিকচার ফ্রেম' মঞ্চদাসত্ব মোচন করে দর্শকদের আরো কাছে গিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করবার জন্য টেরেন্স গ্রে ১৯২৬-এ কেমব্রিজে তিন-দিক-খোলা একটি মঞ্চ বানান—যার তিনদিকেই দর্শকরা বসবে। একই কাজ করেন রবার্ট অ্যাটকিন্স ১৯৩৬-এ। এই পরীক্ষানিরীক্ষার আগে, ১৯২০ সালে রবার্ট এডমন্ড জোন্স গড়ে তুলেছিলেন 'Theatre-in-the-round'। কিন্তু তিনি এই প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করতে পারেননি। গ্লিন হিউজেস্ ১৯৪০ সালে সিয়াটলে ওয়াশিংটন

বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তোলেন পেন্থাউস থিয়েটার। ডালাসে শ্রীমতী মার্গো জোন্স এইরকমই থিয়েটার গড়ে তোলেন। ইউরোপে মায়ার হোল্ড এবং রাইনহার্ট এই জাতীয় মঞ্চব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মস্কোয় তিরিশের দশকে এইরকম মঞ্চেই অকলোপকভ্ বাস্তববাদী নাটকও অভিনয় করে দেখান। ক্রমশ লন্ডনে এবং ইউরোপের নানাদেশে এই ধরনের মুক্ত থিয়েটার জনপ্রিয় হয়। ওল্ড ভিক্ থিয়েটারের মতো আধুনিক কালের অনেক মঞ্চ একদিকে দর্শক বসাবার ব্যবস্থা করলেও প্রসিনিয়ম আর্চ ভেঙে মঞ্চের সম্মুখাংশকে অনেকখানি দর্শকদের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়েছে। প্রথমদিকে অবশ্য এই ধরনের খোলামঞ্চের উপযোগী নাটক তৈরির পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল ১. দর্শকদের সঙ্গে দূরত্ব বিলোপ, ২. প্রথাগত প্রসিনিয়ম মঞ্চের বাইরেও অভিনয়ের সুযোগ।

এখন পৃথিবীর নানাদেশে আধুনিক মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের স্থাপত্যে কিছুটা বদল এসেছে—ঘোড়ার খুরের মত তিনদিকে দর্শকদের বসিয়ে মঞ্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃত্তাকারে প্রসারিত করে এবং পিছন থেকে পুরানো চেহারা রেখে মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে পৃথিবীর নানাদেশে। মহারাষ্ট্রের মুম্বইতে এমনই একটি নাট্যভবন নির্মাণ করেছেন টাটা উদ্যোগ।

বাংলা থিয়েটার আধুনিককালে গেরাসিম লিয়েবেদেফের সময় থেকেই (১৭৯৫ খ্রিৎ) প্রসিনিয়ম মঞ্চকে অনুসরণ করে আসছে। রবীন্দ্রনাথ এই শতাব্দীর প্রথমদিকে জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবনে এবং শান্তিনিকেতনে ঠিক 'Theatre-in-the-round' নাহলেও অনেকখানি মুক্ত নাট্যরীতি প্রয়োগ করেন তাঁর লিখিত 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী' ইত্যাদি নাটকের অভিনয়ে। এ ব্যাপারে যেমন একদিকে তাঁর তত্ত্বগত প্রেরণা ছিল সংস্কৃত নাটক ও যাত্রা, অন্যদিকে জাপান, চীন, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণসূত্রে সেখানকার দেশীয় নাট্যপদ্ধতি দেখে আসার প্রেরণাও কাজ করেছিল। কিন্তু মূলত পশ্চিমি ধারার আধুনিক বাংলা থিয়েটার দেশি রীতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হবার তেমন চেষ্টা কখনো করেনি। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' প্রযোজনা থেকে প্রসিনিয়ম মঞ্চকেই তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণে কাজে লাগিয়েছিলেন। উৎপল দত্ত মিনার্ভা মঞ্চে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকের প্রযোজনায় 'প্রসিনিয়ম আর্চ'-কে অতিক্রম করে মঞ্চক্ষেত্রকে দর্শকাসন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। অভিনয় চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে দর্শককে তুলে নেওয়া কিংবা মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহে নেমে এসে প্রসিনিয়মের সীমারেখাকে নাটকীয়ভাবে প্রথম লঙ্ঘন করেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর 'শেষরক্ষা' বা 'রীতিমত নাটক' প্রযোজনায়। পরে, এই কৌশল নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে প্রয়োগ করেন এবং তারপর বহু নাটকেই প্রযুক্ত হয়ে চলেছে। বাদল সরকার সত্তরের দশকে প্রসিনিয়ম মঞ্চ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই আন্দোলন 'Theatre-in-the-round' প্রকল্পের একটি ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে কিছুকাল আগেও সক্রিয় ছিল। কিন্তু এসব প্রয়াস সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও প্রধানত প্রসিনিয়ম মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনয়রীতি এখনো প্রধান ও প্রচলিত হয়ে আছে।

প্রিমিটিভিজম

কৌশিক ঘোষ

সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ*, ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক', সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'আগন্তুক' থেকে শুরু করে গগ্যাঁর তাহিতি-দৃশ্যাবলি বা প্যারিসের সেরা দর্শকদের জন্য জোসেফিন বেকারের 'জংলিনৃত্য', এই বিশাল, আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের কর্মক্ষেত্র যেন এক বিশেষ অনুভূতি-আশ্রয়ী। এ সকলের মাঝেই সর্বাপেক্ষা মৌলিকরূপে রয়েছে 'আদিম', 'অসভ্য' ও 'বর্বরের' প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ। অসভ্য, জংলি মানুষের মধ্যে এই শিল্পকর্ম যেন খুঁজে পায় এক জিয়ন-কাঠি যার স্পর্শে হঠাৎই প্রাণ ফিরে পাবে শিল্পীর—এবং আমাদের / পাঠক-দর্শকের—অধুনা আধুনিকতা-জর্জরিত, ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্ব, চেতনা ও মন। আধুনিকতার মধ্যেই বর্তমান ও সৃষ্ট অথচ প্রবলরূপে আধুনিক-বিরোধী এই আদিমতা-নির্ভর চেতনাকেই আমরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে Primitivism শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। শিল্প-সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রচলন ও কৃষ্টিলাভ হলেও Primitivism (আদিমতাবাদ?) আরো নানাভাবে আমাদের আধুনিক সত্তার মধ্যে কাজ করে। সাধারণত এই কল্পনার শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক বলেই ধরা হয়।

এখানে অবশ্যই মনে রাখা আবশ্যক যে Primitivism-এর বর্বর মানুষকে কল্পনা করার অনেক আগেই এবং আরো সাধারণভাবেই আধুনিকতার মধ্যে Primitive নামে গভীর ও মৌলিক জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই সাধারণ অর্থেই আজ আমরাও অসভ্য বা জংলি ব্যবহার করি। ১৪৯২-এর ইউরোপের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই ধীরে ধীরে সভ্যতার (অর্থাৎ ইউরোপীয়, খ্রিষ্টীয়, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক) বাইরের বিস্তৃত অ-শ্বেত জগৎকে অসভ্য ও ঐতিহাসিকরূপে পিছিয়ে থাকা বলে চিহ্নিত করা হয়। ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার এই বিধির ফলে ইতিহাসের সর্বাধিক ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের নাটক রচিত হয় : আমেরিকার আদিবাসীদের (Native American) প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া genocide এবং আফ্রিকানদের ব্যবহার করে পুঁজিবাদী দাসপ্রথার জন্ম ও ব্যাপক প্রসার। সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব আজও এই ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার ফল প্রতিদিন উপলব্ধি করে। এই 'Primitive' শব্দের মাধ্যমে অ-শ্বেত জগতের নিকৃষ্টতা ও সেই মানুষদের হীনতা নির্দিষ্ট হতে থাকে এবং তার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপের এক স্বচ্ছন্দ যৌক্তিকতা খাড়া করাও সম্ভব হয়।

কিন্তু প্রায় চার শতাব্দীর মারাত্মক ধ্বংস ও শোষণের পরে, দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ নিজের করতলে করার পরে, আধুনিক ইউরোপের পক্ষে অবশ্যই এবার সম্ভব হল একটু সহানুভূতির জায়গা সৃষ্টি করার। আমাদের আলোচ্য বিষয় Primitivism সেরকমই এক জায়গা।

Primitivism-কে যদি আমরা অ-সভ্য মানুষকে নিয়ে একধরনের সহানুভূতিশীল ভাষ্য বলে মনে করি এবং ঐতিহাসিকতার স্বার্থে আমরা যদি Primitivism-এর শুরুর সন্ধান চালাই, তাহলে অন্যান্য অনেক আধুনিক ভাষ্যের মতই Primitivismও আমাদের চালিত করবে অশেষ এক অতীত-বিন্দুর পথে। রুসোর 'Noble Savage', মনটেনের 'On Cannibals' দিয়ে শুরু করে 'Calivan-Prospero'-র গল্প ছুঁয়ে, মধ্যযুগ হয়ে, একলব্যের গল্পে অসভ্যের প্রতি সভ্যতার নির্মম 'দাক্ষিণ্য' দেখে, Ur-সভ্যতার আখ্যান কাব্য 'Epic of Gilgamesh'-এ জঙ্গল-মানব Enkidn-এর আত্মাহুতির মাধ্যমে সভ্যতার প্রগতির খবর পাব। কিন্তু এই ঐতিহাসিক উৎস-সন্ধান কখনোই শেষ হবে না।

বরঞ্চ আমরা যদি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়টায় যখন নৃতত্ত্বে, শিল্পে ও সাহিত্যে অ-সভ্য মানুষ ও তার সমাজকে নিয়ে নজিরহীন এক নতুন discoursc তৈরি হতে শুরু করল, তার প্রতি মনোযোগ দিই, তাহলে হয়ত এই সূত্রপাতের এক সন্ধান পাব। আদিমতাকে সভ্যতার অপর করে দাঁড় করিয়ে, বুর্জোয়া ও ঔপনিবেশিক মন যেন আধুনিকতার নানা অন্ধগলি থেকে মুক্তি পেতে চাইল ঐ অপর, অজানা, 'কৃষ্ণকায়' জগতের মধ্যে। এভাবে আধুনিকতার অপর হয়ে 'আদিম-অসভ্য' সমাজ তাই বহন করতে লাগল নানা নতুন চিহ্ন : অসভ্যেরা এক অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সাম্যের ধারক, মিথ্যাবাকরহিত, শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক তাদের যৌনতা, অনাড়ম্বর অথচ তৃপ্ত তাদের জীবনযাত্রা। অর্থাৎ অকৃত্রিম, মুক্ত ও অসঙ্গতিহীন; প্রতি বিন্দুতে যেন সে আধুনিকতার বিপরীত, যেন আধুনিকতাকে খণ্ড করতেই সৃষ্ট হয়েছে।

হঠাৎই তৈরি হল এক আদিম, বর্বর জগৎ যার মধ্যে রইল আধুনিকতার সঙ্কটে আকীর্ণ মেট্রোপলিটান মানুষের নবজন্ম লাভের এক সম্ভাবনা। আধুনিক নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অবগুণ্ঠনের আড়ালে নীরবে কাজ করতে থাকল এই নতুন অনুভূতি। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব এই মনগড়া আদিমসমাজের সঙ্গে সাদৃশ্য টেনে চাইল অবচেতনের রহস্য উন্মোচন। শিল্প-সাহিত্যে এই নবচেতনা আরো প্রকটরূপে আলোড়ন আনে ইউরোপীয় সমাজে, এমনকী স্বাধীন, বিপ্লবমুখর মেক্সিকো ও অন্যান্য বহু ল্যাটিন আমেরিকান জাতীয়তাবাদে। গগ্যাঁ তাঁর নিজের মতো করে তাহিতি সৃষ্টি করেন ইউরোপের দর্শকের জন্য। ডিয়োগো রিভিয়েরা আপন ভঙ্গিমায় নির্মাণ করেন এক অপূর্ব, নিষ্পাপ প্রাক-কোলাম্বীয় মেক্সিকো। আধুনিকতার কৃত্রিমতা, রুদ্ধ যৌনতা, বাজারের ছন্দে সাজানো সময় ও জীবন—এসব থেকে মুক্ত এক স্বর্গ তাই গগ্যাঁর তাহিতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, ইউরোপীয় চিন্তার মধ্যে, সমাজ-জীবনের সঙ্কট (crisis) হয়ে উঠেছিল এক সাধারণ বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেন এই আশঙ্কারই

বাস্তবায়ন। যুদ্ধ পরবর্তী ফ্রান্সে Primitivism প্রায় একটা আন্দোলনের বিস্তার নিল। পিকাসো বা জর্জ বাতাইয়ের সৃষ্টি-চিন্তার মধ্যে এই সময় আদিমতার যে গভীর প্রভাব চোখে পড়ে তা সম্ভব হয় তাঁদের নৃতত্ত্বের সঙ্গে সামগ্রিক সম্পর্কের সৃষ্টির ফলে। উপনিবেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তি বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক অভিযান চালাতে থাকে। এই সকল অভিযানে জড়ো হয় নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিদ, মিশনারি, ব্যবসায়ী এমনকী শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও। ১৯৩১-এ Marcel Giraule-এর নেতৃত্বে আফ্রিকা অভিযানে যায় ফরাসি Dakar-Djibouli Expedition। এই অভিযানেরই সদস্য Michel Leiris-১৯৩৪-এ লেখেন L' A frique Fatome, বইটি ছিল অভিযানের বিবরণ। আফ্রিকার অ-সভ্য জগতকে প্যারিসের মানুষের কাছে আবার নিয়ে আসেন Leiris। এর প্রবল প্রভাব পড়ে প্যারিসের সমাজ-জীবনে। এই ধরনের অভিযানে লুণ্ঠিত দৈনন্দিন আফ্রিকার ব্যবহার-সামগ্রী, শিল্প, ধর্মীয় নানা বস্তু, এমনকি জ্যান্ত আফ্রিকান মানুষও শোভিত হয় ইউরোপের মিউজিয়ামে। আফ্রিকার 'অকৃত্রিম' 'অসভ্য' জীবনযাত্রা ধরা পড়ে অভিযানের দিনলিপির পাতায়, শিল্পীদের স্কেচে, ছবিতে বা মুভি ক্যামেরায়। এই বিশাল লুণ্ঠিত ধন ও সংস্কৃতি তখন 'আফ্রিকা' হয়ে দেখা দেয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে, ছবিতে এবং লেখায়। সারা সমাজে এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই Primitivism-এর ভাষা। ইউরোপের যুদ্ধ-ক্লান্ত সমাজে আলোড়িত হয় এই নতুন অনুভূতি, এই নতুন আদিমতা-নির্ভর আধুনিকতা-বিরোধ।

এখানে লক্ষ করা প্রয়োজন যে Romanticism-এর সাথে Primitivism-এর একটা মিল থাকলেও এ দুয়ে ফারাক যথেষ্ট। Romanticism-এর মধ্যে আমরা দেখি সুদূরের প্রতি এক আকর্ষণ। কিন্তু এই সুদূর যে সবসময়ই ইউরোপীয়, আধুনিক মানুষের সঙ্গে কোথাও যুক্ত। প্রাচীন গ্রিস বা Industrial Revolution-এর ফলে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া এক ইউরোপীয় গ্রাম-সভ্যতা আধুনিক চেতনার সুদূর হলেও, য়ুরোপীয় আধুনিকতার স্বরচিত ইতিহাসে ঐ 'সুদূর' খুবই কাছের। ইউরোপীয় আধুনিক মন তাই যেন সহজেই এক যোগসূত্র খুঁজে পায় ঐ অন্য সময় ও সমাজের সঙ্গে। Nostalgia-র সৃষ্টি হয়, Romantic মন তাই সহজেই এই 'সুদূর', 'অপর'কে নিজেরই আদিকথা ভেবে আত্মসমর্পণ করে তার মধ্যে। অথচ Primitive বা উপনিবেশের আদিম মানুষের সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিক মন কোনো ঐতিহাসিক কিংবা nostalgic যোগসূত্র খুঁজতে পারে না। এই Primitive যেন আধুনিকতার চরম বিপরীত, আধুনিক চেতনার চূড়ান্ত অপর। Romanticism-এর nostalgia-র জন্য প্রয়োজন যে 'নিজ-অপর' (self-other)-এর ঐতিহাসিক সম্পর্ক তা এখানে একেবারে অনুপস্থিত। Primitivist চেতনায় আদিম, বর্বরকে কোন আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা সম্ভব নয়, ইউরোপের ইতিহাসে এর সন্ধান মেলে না।

নব আবিষ্কৃত এই আদিমতার কাছে যাওয়া মানে আধুনিকতার প্রতীকগুলোকে উল্টে দেওয়া। এই উল্টে দেওয়ার মাঝেই ছিল Primitivism-এর সকল বৈপ্লবিক

প্রচেষ্টা। সভ্যতার প্রতীকগুলোকে অস্বীকার করে আদিমতাকে এভাবে নিজস্ব ও সামাজিক জীবনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এই আন্দোলনের শিল্পী সাহিত্যিকদের নামও দেওয়া হয় Fauve অর্থাৎ জংলি জানোয়ার। কিন্তু যদিও এই আন্দোলন বুর্জোয়া সমাজের নানা ভণ্ডামিকে সকলের সামনে খুলে ধরতে সমর্থ হয়, তবু এই আন্দোলন আদিমতার এক ভাষ্য সাজাতে গিয়ে বেশ কিছু প্রতীক তৈরি করে নেয় যার সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রবল প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। যেমন, ঐ সব সমাজের সকল ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা যেন বিলীন হয়ে যায় এক সমরূপী আদিম-সমাজের ছবির মধ্যে। যেহেতু তার সকল সংজ্ঞা আধুনিকতার বৈপরীত্বে নির্ধারিত সেহেতু শেষমেষ সে সম্পূর্ণ আধুনিকতা-নির্ভর, অসভ্য মানুষের তাই নিজস্ব কোনো গতি থাকে না, থাকে না কোনো অন্য দিকনির্দেশ বা সম্ভাবনা।

একই সাথে যৌনদমন (repression) থেকে মুক্তির সঙ্কেত হিসেবে যেহেতু তার সৃষ্টি, সেহেতু অসভ্যের Primitivist শরীরটা যেন তৈরি হয় শুধু এক মাদকীয়, মুক্ত যৌনতার প্রাঙ্গণ হিসেবে। Josephine Baker-এর জংলি-যৌনতা প্যারিসে নির্মিত হয়ে সেঁটে যায় সকল কৃষ্ণকায় মানুষের গায়ে। আধুনিকতার বিরোধিতা করেও Primitivism আধুনিকতার মতোই আদিম মানবকে তিন মারাত্মক কল্পনা—Race (জাতি), যৌনতা ও ইতিহাসহীনতা—দিয়েই নির্মাণ করে।

বাংলা আধুনিকতার মধ্যেও Primitivism-এর প্রভাব গভীর যদিও এ সম্বন্ধে আলোচনা খুব বিস্তৃত নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের *পালামৌ* নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি যার মধ্যে কোনো আন্দোলন হিসেবে না হলেও Primitivism-এর একটা ছাপ সুস্পষ্ট। ছোটোনাগপুরের জংলি কোল সমাজকে এক ধরনের অকৃত্রিমতার আলোয় ধরে সঞ্জীবচন্দ্র আধুনিক বাঙালি সমাজকে নানা সমালোচনার মধ্যে টেনে আনেন। কিন্তু এই অকৃত্রিম আদিমতার সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ মুছে ফেলেন কোলদের সকল ঐতিহাসিকতা—ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের মধ্যে তাদের মারাত্মক শোষণ, বিদ্রোহ ও পরিবর্তন। এখানে 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'র আগের লাইন দুয়েক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

> 'যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোল মাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। (*পালামৌ* : ১০)।

সঞ্জীবচন্দ্র কোল নারীর যৌনতাকে সর্বত্র ব্যবহার করেছেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে গেঁথে দিয়েছেন। আদিবাসী রমণী এক অকৃত্রিম যৌন-মুক্তির আহ্বান হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালি পুরুষের চেতনায়।

সঞ্জীবের *পালামৌ*, সুনীল-সন্দীপন-সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি', ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক', সত্যজিতের 'আগন্তুক'—এরকম সকল text-এর মধ্যেই আমরা দেখি এই Primitivism-এর রেখা। একাধারে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সমাজের কমবেশি সফল

সমালোচনা, অথচ ঐ সমালোচনা, ঐ বিরোধিতার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক জাত (Race) ও যৌনতা দিয়ে গড়া আদিবাসী মানুষ। ইউরোপে বা বাংলায় Primitivism আধুনিকতার, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ এক প্রবল উচ্চারণ। কিন্তু এই উচ্চারণের সম্পূরক হিসেবে উদয় হয় 'আদিমতার' এই মারাত্মক, ঔপনিবেশিক সৃষ্টি।

এটা অবশ্যই মনে রাখা ভাল যে Primitivism-এর মধ্যেও সমরূপতা নেই। এখানেও নানান বক্তা, নানান বিভাজন। আমাদের তাই যথাসম্ভব পৃথকভাবেও ভাবতে হবে এই নানা 'লেখক'দের। 'অযান্ত্রিক' কি অন্য কোনো আদিমতার সৃষ্টি করে যা সঞ্জীবচন্দ্রে নেই? এই নানান চিন্তাধারাকে আমরা আধুনিকতার সমালোচনা হিসেবেও বা তুলনা করব কেমন করে?

এবারে Primitivism-এর সমসাময়িকতা নিয়ে একটু ভাবা যাক। Primitivism কি শুধুই একটা অতীত ভাষ্য? বোধহয় সেটা ভাবার কারণ নেই। বর্তমানের Late capitalist বা Post-Industrial যুগেও Primitivism ব্যাপকভাবেই আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। Green বা Eco-friendly পণ্য সামগ্রীর বাজার বেশ বড়ো ও তা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা বিশ্বে Body shop নামে Cosmetics কোম্পানির বাজারও বিরাট। এরা বলে থাকে যে এরা প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে নানা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই তাদের সৌন্দর্যের সামগ্রী তৈরি করে। এরা আরো বলে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উপজাতির প্রাকৃতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে ও ঐ উপজাতির কোণঠাসা মানুষদের উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে এরা উপজাতিদের সাহায্য করছে। Body Shop-এর দোকানে গেলে দেখা যায় সারা দেওয়াল জুড়ে উপজাতীয় ব্যক্তিবিশেষের বিশালায়তন ছবি। তারা যেন Body shop-এরই প্রতীকচিহ্ন। Body shop-এর বাজারি চাহিদা ঐ প্রকৃতি-উপজাতির অবিচ্ছিন্ন এক ভাবমূর্তির ফল। বড়ো বহুজাতিক সংস্থার পণ্য যারা বর্জন করতে চান পশ্চিমি দুনিয়ায়, যাঁরা অনেকেই ন্যায্য কারণেই প্রকৃতিকে বাঁচাতে চান, যাঁরা চান উপজাতি আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা ও বাঁচার অধিকার, তাঁরা অনেকেই Body shop জাতীয় সংস্থার নিয়মিত খদ্দের। এটা তো প্রায় একটা জীবনদর্শন এখন। কিন্তু বহু সমালোচকই এটা মনে করেন যে Body shop আসলে নামমাত্র প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে এবং নামমাত্র কয়েকজন উপজাতীয় মানুষের কর্মসংস্থান করে। তাঁরা বলেন মানুষ Body shop-এ যেটা পণ্য হিসেবে কিনছে সেটা হল একটা আদিম, অকৃত্রিমতার আশ্বাস বা Primitivist ছবি। ঐ বাজারে আদিবাসী মানুষকে বিনা খরচায় modelling করানো হচ্ছে একটি ক্রমবর্ধমান niche market-এ।

Green Capitalism-এর থেকেও অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে আজ বিরাজ করে Biodiversity। এই জটিল বিষয়ের মধ্যে না গিয়েও আমরা দেখতে পারি কীভাবে একদা অসভ্য, বর্বর যে মানবগোষ্ঠীকে শোষণ করা হয়েছিল, আজ সেই মানুষদেরই মনে করা হচ্ছে প্রকৃতির জ্ঞান ভাণ্ডার। তাদের জ্ঞান তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত হচ্ছে, বাজারের মতো করে ঢেলে নেওয়া হচ্ছে সেই জ্ঞান ও জীবনদর্শন। অ-সভ্য

মানুষের জ্ঞানের ও জীবনের ভিন্নতা, ইতিহাস ও নিজস্বতাকে অস্বীকার করে সম্ভব হচ্ছে আবার এক আদিম মানবতার আবিষ্কার, যার সাহায্যে পুঁজিবাদের মধ্যেকার পরিবেশসংক্রান্ত (ecological) সঙ্কটকালের এক বাজারি সমাধান প্রতিনিয়ত প্রস্তুত করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক সময়কার আধুনিকতা ও পুঁজিবাদের নানা সঙ্কটের মধ্যে যেমন হাজির করা হয়েছিল এক অকৃত্রিম, যৌনদমনহীন অসভ্য মানুষ বা Primitive-কে, আজ তেমনি এক নতুন সঙ্কটের মোকাবিলায় আধুনিকতা আবার তলব পাঠিয়েছে তার সহোদর ও অপর Primitivism-কে।

ফর্মালিজম

সুমন ঘোষ

প্রকরণবাদের প্রাথমিক চিন্তাভাবনা আরম্ভ হয় রুশ বিপ্লবের কিছু আগেই। অবশ্য বিপ্লবের পরেও কিছুদিন—এই শতকের তিনের দশক পর্যন্তও তা বলবৎ ছিল, যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মূলত রুশ প্রতীকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই প্রকরণবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্যতাত্ত্বিক এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা একত্রে এই ভাবনার সৃষ্টি করেন।

এ তত্ত্বের মধ্যে অবশ্য গোড়া থেকেই মতভেদ ছিল। দুই পক্ষের অবস্থান দুই শহরে। একদিকে মস্কোর ভাষাতাত্ত্বিক-বৃত্ত, যার সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন রোমান য়াকব্‌সন্। অন্যদিকে, সেন্ট পিটারস্‌বার্গ শহরে ছিল ওপায়াজ গোষ্ঠী, যাঁরা সাহিত্য সমালোচনাতেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এবং যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ভিক্টর শক্লভ্স্কি (জন্ম ১৮৯৩)। দুই মতাবলম্বীদের উদ্দেশ্য অবশ্য একই ছিল, পরীক্ষামূলক, নিয়ম-ব্যতিরেকী সাহিত্য ও শিল্পের সমর্থন ও গঠন।

শক্লভ্স্কি 'কৌশলরূপে কলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন যা ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওপায়াজ গোষ্ঠীর প্রবক্তা বোরিস আইখেনবাউমের মতে এই প্রবন্ধটিকে একদিক থেকে 'প্রকরণবাদের ইশতেহার' বলা চলে। রুশ প্রতীকতার প্রধান তাত্ত্বিক মুখপাত্র গোটেবন্‌য়ার মতবাদকে যুক্তির ভিত্তিতে খারিজ করে দেওয়া এ লেখার ভাবানুভার পরিসর খুব অল্প। সেই রোমান্টিক ভাবাবেগ যা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রতীকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাহিত্য পঠনের একটা সুচিন্তিত, নির্দিষ্ট, নিশ্ছিদ্র বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিকাঠামো তৈরি করা আরম্ভ করেছিলেন রুশ প্রকরণবাদীরাই। পরবর্তী সময়ে, বিশ শতকের তিনের দশকে প্রাহা স্কুলের হাত ধরে ছয়-সাতের দশকে গঠনবাদে পৌঁছেই এ সফরের শেষ হয়।

প্রকরণবাদীদের কাছে প্রকারটাই গুরুত্বপূর্ণ, বক্তব্যটা নয়। শক্লভ্স্কির মূল প্রশ্নই হচ্ছে, : 'কীসে কবিতার কবিত্ব? কবিতার সঙ্গে পদ্যের মূল ভাষাগত তফাতটা কোথায়?' এটা লক্ষ করার বিষয় যে প্রায় একই সময়ে এই একই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন অংক কষে খুঁজেছেন আই. এ. রিচার্ড্‌স্, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য সমালোচনার প্রধান তাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁকে গণ্য করা হয়।

রোমান য়াকব্‌সন্ (১৮৯৬-১৯৯২) রুশ ভবিষ্যৎবাদী কবিদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, এবং আধুনিক পরীক্ষামনস্কতার ষোলো আনা কদর করতেন। ১৯২০ নাগাদ

তিনি তাঁর জন্মস্থান রাশিয়া ছেড়ে চলে যান চেকোস্লাভাকিয়া। প্রাহাতে স্থাপন করেন একটি ভাষাতাত্ত্বিক বৃত্ত, যেখানে তিনি ও তাঁর সহযোগী চিন্তাবিদরা গঠনবাদী সমালোচনার মূল সূত্রগুলোকে নির্দেশ করেন।

১৯৩৯ সালে নাৎসি আক্রমণে আবার বিদেশের পথে পাড়ি দিতে হয় য়াকব্সন্‌কে। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌছোন ও সেখানে কাজ করেন আমরণ। ভবিষ্যৎবাদীদের প্রতি য়াকব্সনের আস্থা ছিল অনড়, ফলত ভবিষ্যৎবাদী চিন্তাসূত্র অনুসারে কবি-শিল্পীকে কারিগর হিসেবে কল্পনা করে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। কবি একজন কর্মী মাত্র এই মতবাদ পরে অন্য রূপ নেয়, তখন লেনিনের ভাষায়, সাম্যবাদী প্রলেতারিয়েত-এর জন্য সাহিত্য কখনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য হতে পারে না। প্রলেতারিয়েত-এর খাতিরে সাম্যবাদী-গণতান্ত্রিক জাঁতাকলের অন্তর্গত হতে হবে সাহিত্যকে। যে লেখক তার প্রকাশকের জন্য কারখানার মত গ্রন্থ রচনা করে, লেনিনের মতে সে-ই নাকি সৃষ্টিশীল কারিগর। *প্যারাডাইস লস্ট*-এর রচয়িতা মিলটন, সেই অর্থে, নাকি সৃষ্টিশীল নন।

একদিকে যেমন প্রকরণবাদের থেকে এই ধরনের সব সূত্রে পৌছান সম্ভব, অন্যদিকে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তা আরেকটা দিক খুলে দিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রত্যক্ষবাদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে প্রকরণবাদীরা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাইলেন এবং তার শৃঙ্খলার দিকটাতে আলোকপাত করলেন। য়াকব্সন্ 'সাহিত্যগুণ'কে সংজ্ঞায়িত করলেন, এবং দেখালেন যে তা ব্যবহার করে কোন পদ্ধতিতে সাহিত্যপাঠ নির্দিষ্ট করা যায়।

সাহিত্যগুণকে সংজ্ঞায়িত করাতে, একথাটাও স্পষ্টভাবে বলা গেল যে, কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয়, তা বিষয়বস্তুর দ্বারা নির্ধারিত নয়, অতএব সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে হবে বিষয়ে নয়, তার উপস্থাপনার ভঙ্গিতে। প্রতীকবাদীরা বলেন কবিত্ব নিহিত আছে শব্দচয়নে, আবেগে নয়। সুতরাং ছন্দই হচ্ছে কবিতার মূল এবং ছন্দের ধারণাকে পদবিন্যাস, স্বরক্ষেপ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে ব্রিক, আইকেএবম ও অন্য সমালোচকেরা কবিতাকে বিভিন্ন উপাদানের সক্রমক্ষেত্র হিসেবে দেখেছেন।

অন্যদিকে কবিতায় প্রতিমার ব্যবহারের বিরুদ্ধমত পোষণ করে প্রকরণবাদীরা একটা সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, যা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। 'বিপরিচিতিকরণ' নামক এই তত্ত্বে শক্লভ্স্কি দেখান যে পরিচিতির গণ্ডি কীভাবে প্রতিটি বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন আমাদের নজরের আড়াল করে দেয়—সেই চিহ্নগুলো দেখেও আমরা ঠাহর করতে পারি না। কোনো ভিন্ন বীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছেদ পড়ে, অন্যভাবে দেখতে বাধ্য হই আমরা। এই 'বিপরিচিতিকরণ'-এর ধারণাটাকেই সাহিত্যগুণ নির্ধারণ করার কাজে ব্যবহার করেছেন প্রকরণবাদীরা।

প্রকরণবাদীদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে তর্কগুলো উঠে এসেছিল, তার অনেকগুলোরই নিষ্পত্তি হয়নি আজও। এতগুলো দশক পরেও, সে কারণেই অনেকের লেখাতেই এই

সমস্যাগুলো উঠে আসে বারবার। অনেককেই (যেমন—মিখাইল বাখতিন) এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তাই নিয়ে সংশয় ক্রমাগতই বর্ধমান। প্রকরণবাদের অবসান ঘটেছিল সেই তিনের দশকেই, তবে যে প্রশ্নগুলো তৈরি হয়েছিল, তাই বদলে দিয়েছে বিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার আবহ।

ফলসিফায়াবিলিটি

আশিস লাহিড়ী

বিজ্ঞানের দর্শন-এর একটি অতিপরিচিত টার্ম ফলসিফায়াবিলিটি। স্যার কার্ল রেমন্ড পপার (Sir Karl Raimond Popper. ১৯০২-৯৪) এই টার্মটিকে বিশেষভাবে পরিচিত করান।

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) আর পদ্ধতিতন্ত্রের (Methodology) একটা বহু পুরোনো প্রশ্ন হল : বিজ্ঞান ঠিক কোন্ জায়গায় অ-বিজ্ঞান থেকে আলাদা? ফ্রান্সিস বেকন্-এর মতে, আরোহবাদী (inductive) পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বলেই বিজ্ঞান মানুষের অন্য সমস্ত চর্চার ক্ষেত্র থেকে আলাদা, ঐ কারণেই বিজ্ঞান মানুষকে সুনির্দিষ্ট ও প্রকৃত জ্ঞান সরবরাহ করে। হিউম এই ধারণার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, আরোহবাদী প্রণালীতে সুনিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করা যায় না। যেমন, দশ হাজারটা শাদা রাজহাঁস দেখার পর আমরা এই সামান্য সিদ্ধান্তে আসি যে সব রাজহাঁস শাদা। কিন্তু দশহাজার এক-তম রাজহাঁসটি যদি কালো হয়, তাহলে পূর্বোক্ত সামান্যকৃত বিবৃতিটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে। তাই হিউমের মতে আরোহী পদ্ধতিতে আহরিত জ্ঞানের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়।

রাসেল, হিউমের এই সংশয়বাদী যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও বিশেষ জোর দিয়েই বলেন যে আরোহী পদ্ধতি ছাড়া বিজ্ঞানের গতি নেই—যুক্তিশাস্ত্র যাই বলুক।

পপার এই জায়গা থেকে শুরু করলেন। তিনি আরোহবাদ সম্বন্ধে হিউমের যুক্তি মেনে নিলেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা (metaphysics) প্রভৃতি ক্ষেত্রের প্রধান পার্থক্য এই যে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে, তা ঐ তত্ত্বের মধ্যেই বলে দেওয়া থাকে। শুধু তাই নয়, নীতিগতভাবে যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই falsify করা সম্ভব। এই falsifiability-র সম্ভাবনাই বিজ্ঞানকে জ্ঞানচর্চার অন্য সমস্ত ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে দিয়েছে। পপারের মতে, একটি সমস্যার মুখোমুখি হলে একজন বিজ্ঞানী মনে মনে আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে অনেকগুলি তত্ত্বপ্রস্তাব (hypothesis) তৈরি করে নেন। তারপর পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে সেইসব তত্ত্বপ্রস্তাবগুলোর সত্যাসত্য নিরূপণ করতে থাকেন। এইবারে এক এক করে falsify করতে করতে শেষপর্যন্ত যে-তত্ত্বপ্রস্তাবটাকে আর falsify করা সম্ভব হয় না, সেটিকেই তখনকার মতো 'তত্ত্ব' বলে মেনে নেওয়া

হয়। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে অন্যধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার আলোকে সে-তত্ত্বও 'মিথ্যা' বলে প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। পপারের মতে falsified হবার এই সম্ভাবনা, অর্থাৎ (falsifiability), নিজের অন্তরে নিহিত থাকে বলেই বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না—যদিও ঐ একই কারণে, বিজ্ঞান কখনো কোন চরমতত্ত্বে পৌঁছতে পারে না, কোনও 'শেষকথা' বলতে পারেনা। Falsifiability-র সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে বলেই অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয় আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হয়, বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে না।

নিজের সমর্থনে পপার, নিউটন আর আইনস্টাইনের উদাহরণ দেন। নিউটনের তত্ত্ব প্রায় দুশো বছর ধরে অবিসংবাদিত সত্য বলে গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিউটন-তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেয়। মহাকর্ষের টানে আলোকরশ্মি ঠিক কতটা বেঁকে যায়, তা নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে সঠিক গণনা করা যায় না। পক্ষান্তরে আইনস্টাইনের আঙ্কিক গণনা যে সত্য তা প্রমাণিত হয়ে যায় ১৯৯১ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে। লক্ষণীয়, আইনস্টাইন প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে যদি পরীক্ষার ফল তাঁর গণনার সঙ্গে না মেলে, অর্থাৎ যদি তা পরীক্ষার দ্বারা falsified হয়, তাহলে তিনি মেনে নেবেন, তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব ভুল। পপার এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাব। ধর্মতত্ত্ব অধিবিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো 'বিদ্যা' কেবল আপন ধারণার verification খোঁজে। কোন কোন ঘটনা একটি প্রস্তাবিত ধারণাকে ঠিক বলে প্রমাণ করবে, শুধু সেইগুলিরই সন্ধানে ব্যস্ত থাকে তারা। কোনো একটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেলেই তারা দাবি করে এর ফলে তাদের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু আরো হাজারটা ঘটনা যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তখন তাঁরা বলেন না যে এতদ্দ্বারা অমুক ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। কেননা এসব ধারণার সত্যাসত্য পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না। পপারের মতে মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্বও একই দোষে দোষী—অর্থাৎ তারাও শুধু verification-এর ভিত্তিতে নিজেদের অভ্রান্ততার কথা বলে, কী হলে সে-তত্ত্ব অ-প্রমাণিত হবে, তা বলে না। পপারের মতে এগুলি 'মেকি বিজ্ঞান'।

মার্ক্সবাদী দার্শনিক মরিস কর্নফর্থ প্রকৃতি-বিষয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পপারের এই Falsifiability তত্ত্বের উপযোগিতা সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষত মার্ক্সবাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা এই রকম।

যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে একটি বা কয়েকটি 'নিষেধাজ্ঞা' থাকে। অর্থাৎ ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী কী কী জিনিস ঘটা সম্ভব নয়, তা ঐ তত্ত্বের মধ্যেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া থাকে। যেমন theromodynamics-এর প্রথম সূত্র অনুযায়ী, চির-সচল কোনো যন্ত্র কখনও বানানো সম্ভব নয়। আর ওর দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, কোনো মেশিনের কর্মদক্ষতা কখনও শতকরা একশোভাগ হতে পারেনা। এবার কল্পনা করা যাক (এরকম কল্পনা করতে কেউ আমাদের বাধা দিচ্ছে না), কেউ কোনোভাবে এমন

একখানা যন্ত্র বানিয়ে ফেলল যা বিনা জ্বালানিতে চলতে পারে, অর্থাৎ যা চির-সচল, কিংবা যার কর্মদক্ষতা একশো শতাংশ। তখন কিন্তু তাপগতিবিদ্যায় সূত্রগুলো আর গ্রাহ্য থাকবে না। অর্থাৎ ঐ তত্ত্ব তখন খণ্ডিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলোকে কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত কেউ খণ্ডন করতে পারেনি। পারেনি বলেই ঐ তত্ত্ব আজও কার্যকর বলে গণ্য। অর্থাৎ নীতিগতভাবে তা নিশ্চয়ই খণ্ডনযোগ্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা এখনো খণ্ডিত নয়। এরই সূত্র ধরে কর্নফর্থ বলেন, মার্ক্স যেসব মৌলিক নীতিগুলি প্রণয়ন করেছিলেন, তদনুযায়ী কিছু কিছু জিনিস 'ঘটতে পারে না।' যেমন আধুনিক প্রযুক্তির সমস্ত শক্তিকে মানুষের মঙ্গলসাধনের কাজে লাগানো নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু সম্পত্তিসংক্রান্ত সম্পর্কগুলোকে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বদলে না নিতে পারলে সে কাজ কখনোই সম্ভব হবে না। নীতিগতভাবে মার্ক্সের এই তত্ত্বকে নিশ্চয়ই Falsify করা সম্ভব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে থার্মোডাইনামিকসের সূত্রগুলির মতো মার্কসের এই তত্ত্বও মোটেই Falsified হয়নি এবং এই Falsified না হওয়াটা মোটেই মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে যায় না। সুতরাং মার্ক্সবাদকে মেকি-বিজ্ঞান বলাটা, কর্নফর্থ-এর মতে, পপারের নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ীই ভুল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরোহবাদের উচ্চারিত বিরোধিতা পপারের অনেক আগেই করেছিলেন এঙ্গেলস। এমনকি Falsifiability তত্ত্বেরও পূর্বাভাস পাওয়া যায় তাঁর কিছু কিছু লেখায়। এঙ্গেলস অবশ্য falsify শব্দটা ব্যবহার করেননি, তিনি বলেছিলেন (ইংরেজি অনুবাদে) 'weed out' করার কথা। এর কোনো স্বীকৃতি পপারের লেখাতে নেই। হয়তো এ তথ্যটা তাঁর অজানা ছিল।

ফ্যাসিজম

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০-এর দশকে ইতালিতে জন্ম হয় ফ্যাসিবাদের। পরে এই আন্দোলন অন্যান্য দেশে প্রসারিত হয়ে জটিলতর হয়। এতই জটিল যে শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যায় নানা অস্বচ্ছতার জন্ম হয় এবং এই শব্দটি ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির অবস্থান ছিল বিচিত্র। শক্তিমান বিজয়ীদের দলেই ছিল ইতালি, যদিও মিত্রদের মতো শক্তি তার ছিল না। অথচ যুদ্ধে তার শক্তিকে যথেষ্টই নিয়োগ করতে হয়েছিল, তার নিজের জমিতে, মিত্রদের চাইতে বেশি। যুদ্ধ যতই এগোতে থাকে, ইতালির সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অসাম্য বাড়তে থাকে। যুদ্ধাবসানে শুরু হয় মুদ্রাস্ফীতি, সম্পত্তির মালিকেরা, শিল্পক্ষেত্রেই হোক কৃষিক্ষেত্রেই হোক, মুদ্রাস্ফীতিতে ঘায়েল হল না। শ্রমিকেরা হল না কেননা যুদ্ধে লোকক্ষয়ের ফলে শ্রমিকসংখ্যা কমে গেছে ফলে কলকারখানায় তাদের চাহিদা এবং মজুরি বাড়ল। ঘায়েল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি, বাঁধা মাইনেতে জীবন চলে যাদের। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল জাতীয়তাবাদী, ইতালি রাষ্ট্রের একীকরণ যেটা পরিণতি পেয়েছিল ১৮৭০ সালে তার প্রবল সমর্থক, এবং তৎপরবর্তী যে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল ইতালিতে তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল। কিন্তু বিশুদ্ধ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিঃস্বতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিলে সংসদে সমাজতান্ত্রিক সমর্থকরা প্রবল হয়ে উঠল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইতালিতে সাম্যবাদীদের উৎসাহিত করে তুলল। এতে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল রোমান ক্যাথলিক চার্চ, যার প্রভাব ইতালিতে বিশাল। চার্চের প্ররোচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিরক্ত হয়ে উঠল সাম্যবাদীর আন্তর্জাতিকতাবাদে, হয়ে উঠল প্রবল জাতীয়তাবাদী।

এই অবস্থায় নেতৃত্বে এলেন বেনিটো মুসোলিনি। একদা সাম্যবাদী এই সাংবাদিক এবং সৈনিক ১৯১৯ সালে একটি আন্দোলনের জন্ম দিলেন, ফাসিও ডি কম্বাটিমেন্টো বা সংগ্রামের জন্য ঐক্য। যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এর লক্ষ্য, তার জন্য তরুণ শুদ্ধবাহিনীর হিংস্রতাতেও কুণ্ঠাবোধ নেই। হিংসার লক্ষ্য প্রথমে সমাজতান্ত্রিক সমর্থক, তারপর শ্রমিক, তারপর নিজ সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রতিষ্ঠিত শাসক সম্প্রদায় এর মোকাবিলা করতে পারল না, ফ্যাসিস্টরা ক্রমশ শাসক দলের সরকারি এবং বেসরকারি প্রশ্রয় পেতে শুরু করল, গুণ্ডারাজ কায়েম হল, এবং পরিণামে নির্বাচনেও তারা জয়ী

হল। মুসোলিনি এইবার সরকার গঠন করলেন। গণতন্ত্র শেষপর্যন্ত ১৯২৬ সালে ইতালিতে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হল। ১৯৩০-এর দশকে ফ্যাসিবাদের বিস্তার হল নাৎসি দলের শাসিত জার্মানিতে এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের পিছনে সন্ধান করা হয়, কোন্ কোন্ অর্থনীতি আর সমাজনীতির সমস্যায় এই আদর্শের জন্ম হয়, আর কীভাবে এই আদর্শ শ্রমিকদের শোষণে ব্যবহার করা হয়। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস করা হয়, ধনতন্ত্রের শেষপর্বে, ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদ। একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিণতি ফ্যাসিবাদে; যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র অনুকূল নয়, একচেটিয়া পুঁজির সাহায্যে আসে স্বৈরতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের সামাজিক বিন্যাসে প্রবল হল পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণির বৃহত্তর অংশকে ক্ষীণবল করে, বুর্জোয়াদেব অধিকাংশ শ্রেণিসত্তা হারিয়ে পরিণত হয় পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তে। এরাই স্বৈরতন্ত্রে ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া, ডিফেন্স লিগ জাতীয় জঙ্গি সম্প্রদায়ের প্রধান সদস্য— এদের গণতন্ত্রবিরোধী, কট্টর জাতীয়তাবাদ জঙ্গিয়ানা ফ্যাসিবাদের মূল স্তম্ভ। অর্থনৈতিক সংকট নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণিকে মোহগ্রস্ত করে, এরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলের আনুগত্য ছেড়ে ভিড় জমায় মিলিশিয়াতে। ধনতন্ত্রের সংকটে পুঁজির মালিকেরা, মুনাফার হ্রাসে শঙ্কিত হয়ে শ্রমিকদের অধিক শোষণ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে। এই ধ্বংসে গণতন্ত্র অনুকূল নয় বলেই স্বৈরতন্ত্রের দিকে পুঁজির মালিকেরা পা বাড়ায়। ন্যাশনাল সোশ্যালিজম বলে যে আদর্শের উদ্ভব হয় তার অর্থনৈতিক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় কম্যান্ড ইকনমি অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক শাসন। ইতালির চাইতেও বেশি সংকটাপন্ন জার্মানিতে তাই ফ্যাসিবাদ আরো জোরে মাথা চাড়া দেয়। এই শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্র সমাজের সর্বস্তরে হাত বাড়ায়, শুধুই অর্থনীতিতে নয়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব যার উদ্দিষ্ট।

যে কোনো ধনতন্ত্রেই উদ্ভূত হতে পারে ফ্যাসিবাদ, যেখানে আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্রকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে ওঠে। অবশ্য এর পিছনে সামাজিক এবং জাতীয়তাবাদভিত্তিক সমর্থন থাকতেই হবে। যেখানে কর্মহীনতা প্রবল, জাতীয়তাবাদ জঙ্গি, সাবেকি অর্থনীতি দেশের গরিষ্ঠ অংশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে, সেসব স্থানে ফ্যাসিবাদ চড়াও হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। শিল্পসাহিত্য তখন রাজনীতির তল্পিবাহক হয়ে দাঁড়ায়।

ফিউচারিজম

অরূপ রুদ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইউরোপে আর্টের জগতে প্রায় একই সঙ্গে নানারকমের ইজম্ শুরু হয়। সমাজ, রাজনীতি ও কালচারের সঙ্গে নানারকম 'ইজম্' আবির্ভাবের সম্পর্ক আছে। একস্প্রেশনিজম্, সুররিয়েলিজম্, দাদাইজম্ এবং ফিউচারিজম্—সব ইজমই অতীত ট্র্যাডিশনকে নানারকমভাবে আঘাত করে বা বর্জন করে নতুন ফর্মের আবির্ভাব ঘটায়।

ফিউচারিজমের মধ্যে দুটি দিক আছে। একদিকে দেখি রাশিয়ান বিপ্লবের প্রভাব ও ধারা এবং অন্যদিকে দেখি ফ্যাসিজমের প্রভাব। যেহেতু মায়াকোভ্স্কি রাশিয়ান বিপ্লবের ফল এবং মারিনেত্তি ফ্যাসিজ্মের অনুরাগী—ফিউচারিজম্ এমন একটি আধুনিক আন্দোলন, যাকে আভাঁ গার্দের (Avant garde) বিশিষ্টতার চিহ্ন বলে মনে করা যায়।

১৯১০ সালে ফিউচারিস্টরা প্যারিস এবং মিলানে তাদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে। রেমন্ড উইলিয়ামস্ *The Politics of Modernism* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ফিউচারিস্টদের ওপর স্ট্রিন্ডবার্গ এবং নিৎসের প্রভাব ছিল। ফিউচারজ্মের সঙ্গে সমাজবোধ, রাজনীতি ও ইতিহাসবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উইলিয়ামস্ স্রেব নিবন্ধের মধ্যে একসপ্রেশনিস্ট অযৌক্তিকতা (Irrationalism) লক্ষ করেছেন।

আভাঁ গার্দ 'আধুনিকতা' মূলত বুর্জোয়া ডিসিডেন্ট হলেও ফিউচারিজম্ যেহেতু দুধারায় বয়েছিল—বুর্জোয়া অ্যানার্কিজম এবং বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা, একই আন্দোলনের মধ্যে ধরা হয় কেন তা একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন। প্রশ্নটা শুধু এখানেই শেষ নয়। এর সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার টাকার ঘূর্ণনও এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে Battleship Potemkin-এর বিখ্যাত জাহাজের কলকব্জার ঘূর্ণন, মায়াকোভস্কির বৈপ্লবিক উত্তেজনা আর মারিনেত্তির স্পিড্ ইমেজ মিশে যায়। ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে আমরা লক্ষ করি একধরনের কালচারাল লড়াই—'Take up your pickaxes, our axes and hammers, and wreck, wreck the venerable cities, pitilessly. Come on, set fire to the library shelves. Turn aside the canals to flood the museums...so let them come, the gay incendiaries with charred fingers...Here we are! Here we are!' (Apollonio, Umbro ed. *Futurist Manifestos*. London, 1973, p 23)'

বিংশ শতাব্দী জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছিল। যখন আমরা কালচারাল পরিবেশের সঙ্গে ইতিহাসের অমোঘ গতিকে যুক্ত করি তখনই বুঝতে পারি যুবকদের উত্তেজনা। অতীত অর্থাৎ ট্র্যাডিশনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হাওয়ায় ভাসমান ছিল। আধুনিক সভ্যতা যা মূলত নাগরিক তার মধ্যে ভেঙে নতুন করার বাসনা প্রবল। Le Corbusier এর *Mauiere do Penser L' Urbanisme*—এ যার আলোচনা পাই। তারই পাশে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের লেখায় অতীতকে ভেঙে তার মধ্যে থেকে যুগের প্রয়োজন উদ্ধারের প্রয়াস দেখি। তবে ফিউচারিজমের মধ্যে যুবকদের উত্তেজনা বা উন্মাদনার সাহিত্যিক ফলশ্রুতি কালচারের বিশিষ্টতার চিহ্ন নির্দেশ করে। আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না যখন এ-যুগে বসে পড়ি—'We will sing of great crowds excited by work, by pleasure and by riot...the multicolured polyphonic tides of revolution.' (*Futurist Manifestos. p 22*) এর মধ্যে আমরা বাখ্‌তিনের কার্নিভালের গন্ধ পাই।

মায়াকোভস্কির কাব্যের মধ্যে—আমরা একটা বিবর্তন লক্ষ করি। *A Cloud in Trousers* (১৯১৫) ফিউচারিস্ট কবিতা হিসেবে রাশিয়ান কবিতায় আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটায়। প্রচলিত কাব্যধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে মায়াকোভস্কি বিস্ময়করভাবে যুক্তি উর্ধ্ব শব্দ চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। সমকালীন 'ডাডাইস্ট' আর ফরমালিস্টদের সঙ্গে এক যোগ আছে। এই প্রসঙ্গে ম্লেব্ নিকমভের 'Incantation to Laughter,'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কবিতার কবি রাশিয়ান শব্দ Smekh (হাসি) নিয়ে খেলা করেছেন এমনভাবে, যাতে ভাষার ইতিহাসের ওপর তাঁর দখল এবং একই সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের নতুনত্বে traditional পদ্ধতিকে আঘাত করার পন্থা লক্ষ করি। মায়কোভস্কি Mystery Buffo (১৯১৮) কবিতায় বিপ্লবকে ডেকে আনেন যখন রাশিয়ান্ রাজনীতিকরা আধুনিকতাকে বর্জন করছিল। The Bedbug (১৯২৯) কবিতায় তিনি সম্ভাব্য নতুন জগৎকে ব্যঙ্গ করেন।

মারিনেত্তির অনুপ্রেরণা ছিল Italian ফ্যাসিজ্‌ম। *First Futurist Manifesto*-তে তিনি বলেছেন—'Upto now literature has exalted a pensive immobility, ecstasy and sleep. We intend to exalt aggressive action, a feverish insomnia, the racer's stride, the mortal leap, the punch and the slap.'

ফিউচারিজম্ আধুনিক শিল্পজগতের নানা আন্দোলনের মধ্যে এই দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ফিল্ম স্টাডিজ

মৈনাক বিশ্বাস

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে হিউম্যানিটিজ-এর অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যার বা ডিসিপ্লিনের সংজ্ঞায় যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, (যার পরিণতি হিসেবে কয়েকটি নতুন বিদ্যার সূত্রপাত হয়েছে) ফিল্ম স্টাডিজ-এর উদ্ভব তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ফিল্ম জিনিসটাকে 'স্টাডি' করার অভ্যাস অনেক পুরনো, প্রায় চলচ্চিত্রের জন্মক্ষণ থেকেই তার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু একটা বিশেষ বিদ্যাচর্চা তথা পাঠ্যক্রমের মাত্রা যোগ না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমালোচনা মাত্রই ফিল্ম স্টাডিজ-এর আওতায় পড়ে না। ফিল্ম স্টাডিজ সাতের দশক থেকে পশ্চিমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যক্রমের অংশ হয়ে ওঠে, প্রকাশনা জগতেও ওই দশকেই প্রথম ওই নামে কিছু গবেষণাকে বিশেষ আখ্যা দেওয়া হতে থাকে, বেশ কিছু জার্নাল সম্পূর্ণত এ বিষয়ে রচনা প্রকাশনায় নিযুক্ত হয়। যদি ইংরেজি-ভাষী দেশগুলোকে লক্ষ করি তাহলে দেখব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন এইরকম শিক্ষকেরা ফিল্ম স্টাডিজ পড়াতে চলে এসেছেন। এটা একটা লক্ষ করার মতো বিষয়। সাহিত্যের লোকেরা ক্রমশ জেন্ডার স্টাডিজ এবং কালচারাল স্টাডিজ-এর পাঠ্যক্রমগুলিও শুরু করেন, গত দশবছরে অনেকে একইভাবে পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজ বা ডায়াস্পোরা স্টাডিজেও চলে এসেছেন। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ না খুলে ইংরেজি বিভাগে বা তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এইসব পাঠ্যক্রমকে গবেষণার স্তরে আলাদা একটা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। পুরনো প্রথাগত সাহিত্যের পাঠ্যক্রম পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম্ নামক ইন্টেলেকচুয়াল আন্দোলনের অভিঘাতে প্রায় সর্বত্রই অনেকটা বদলে গেছে। চিহ্ন, ভাষা, আখ্যান এই জাতীয় ক্যাটিগরি সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস নামক প্রথাগতভাবে বিচ্ছিন্ন বিদ্যাগুলির মধ্যেকার ব্যবধান অনেকটা মুছে দিয়েছে। নারীবাদী জ্ঞানচর্চা ও একধরনের মার্ক্সবাদী সংস্কৃতিচর্চা এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সাত ও আটের দশকে। খানিকটা আলগাভাবে যাকে কালচারাল স্টাডিজ বলা হয় তার চরিত্র দেখলেই আমরা বুঝতে পারব এই সীমান্ত-সংকটকে। খাদ্যাভ্যাস থেকে ক্রিকেট, শরীরচর্চা থেকে উপন্যাস, সংগ্রহশালা নির্মাণ থেকে ভ্রমণকাহিনি রচনা সবকিছুই টেনে আনা যায় কালচারাল স্টাডিজের আওতায়। নিউ হিস্টোরিসিস্টরা যখন সাহিত্য সমালোচনা করেন বা ফ্রেডরিক জেমিসন ম্যাজিক রিয়ালিজম নিয়ে লেখেন তখন সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব,

নন্দনতত্ত্ব সব একে অপরের সঙ্গে সংলাপে রত হয়, একে অপরকে স্থানচ্যুত করে, একটি বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এসে দাঁড়াবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় সমালোচনার মধ্যে। এই পট-পরিবর্তনকে কখনো বলা হয়েছে 'লিঙ্গুইস্টিক টার্ন', কখনও বলা হয়েছে 'কালচারাল টার্ন'। ভাষা দেখা দিয়েছে সর্বব্যাপী এক ক্যাটিগরি হিসেবে আর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে গোটা সামাজিক জীবনের সমার্থক।

স্ট্রাকচারালিস্ট ও পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট সাহিত্যতত্ত্ব, নারীবাদ, লাকা-পন্থী মনঃসমীক্ষণ ও আলথুসেরীয় মার্ক্সবাদ—এই চারটি প্রবণতা হিউম্যানিটিজ-এর বিভিন্ন শাখায় যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল তার মধ্যে থেকেই অনেকাংশে ফিল্ম স্টাডিজ-এর জন্ম। প্রথম দিককার কাজের পরিচয় পাওয়া যাবে যদি আমরা ১৯৬৮-উত্তর *কাইয়ে-দু-সিনেমা*, *সিনেথিক* বা *স্ক্রিন* পত্রিকার লেখালেখি দেখি। কিন্তু বলাবাহুল্য পঁচিশ-তিরিশ বছরে নানারকম পরিবর্তন এসেছে ফিল্ম স্টাডিজে, নানারকম বিবাদী ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক প্রত্যয়গুলি পরিবর্তিত হয়েছে, কখনো আংশিক বর্জিতও হয়েছে হিউম্যানিটিজ-এর অন্যান্য শাখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু মূলকথা হল, ভাষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটা তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর চলচ্চিত্র বিদ্যাকে দাঁড়াতে হয়েছে। একধরনের লিবারেল আর্টস চর্চা বা লিবারেল হিউম্যানিস্ট অবস্থান থেকে এই তাত্ত্বিক বিশ্বকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। ফিল্ম স্টাডিজ আসার আগে থেকেই 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন' নামক এক ধরনের অনুশীলন চালু আছে। 'আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন'-এর আদলে তৈরি এই ধরনের চর্চায় চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে বুঝতে, তার নান্দনিক কৌশলগুলি চিনতে শেখানো হত। ফিল্ম স্টাডিজ এ কাজটাও করে, কিন্তু চলচ্চিত্রকে শুধু একটা শিল্পবস্তু হিসেবে দেখে না। চলচ্চিত্র এখানে চিহ্নের একটি বিশেষ সমন্বয় যার মাত্রা কোনো স্থির নান্দনিক মূল্যের সীমানায় আটকে নেই। একটি ছবি গেঁথে আছে বহু ছবির শরীরে, চলচ্চিত্র নামক প্রতিষ্ঠানের জমিতে, গোটা সাংস্কৃতিক পরিসরে, এবং সামাজিক, ঐতিহাসিক অস্তিত্বের নানাস্তরে। শুধু কাহিনিকে অনুধাবন করা ফিল্ম স্টাডিজের কাজ নয়, বরঞ্চ আঙ্গিকের সামাজিক মাত্রার দিকে, আখ্যানের রাজনীতি ও ইতিহাসের দিকে তার নজর বেশি। আর কাহিনির মধ্যেও খুঁজতে চাওয়া হয় আরো অজস্র কাহিনির অবদান, তাদের সঙ্গে লেনদেন। বা কাহিনির নিচে থেকে টেনে বার করা হয় না-বলা লুপ্ত কাহিনি। এইজন্যে অনেকসময় ফিল্ম স্টাডিজ ভাল-মন্দ ছবির বিভেদকে বা 'আর্ট' আর 'পপুলার' ছবির বিভেদকে খানিকটা অগ্রাহ্য করে। যদি কেউ দেখতে যায় কীভাবে দাদাসাহেব ফালকের পৌরাণিক ছবি থেকে একটি ভাষা তিনের দশকের স্টুডিওযুগের 'সামাজিক' ছবিতে বিবর্তিত হল, অভিজ্ঞতাকে দৃশ্য ও শব্দের আয়তনবদ্ধ করা এবং নির্মাণ করার ধরন কীভাবে এখানে ইতিহাসের সঙ্গে বদলাচ্ছে—তাহলে নান্দনিক ভালোমন্দ বিচার সবক্ষেত্রে তার কাজে লাগবে না। সম্পাদনা কীভাবে পর্দার ওপর স্থান-কাল নির্মাণ করছে এটা একটা বিশেষ সামাজিক মন বা মতাদর্শকে চিনিয়ে দিতে পারে—এখানে প্রথাগত নান্দনিক বিচার বা গল্পের (বক্তব্যের) বিশ্লেষণ অনেকসময় গৌণ হয়ে পড়ে। ফিল্ম স্টাডিজ-এ যখন হিচ্‌ককের ছবির আলোচনা হবে

তখন সে-ছবিকে একটা গতিশীল সাংস্কৃতিক-সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হবে। হলিউডের স্টুডিও-ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি কোথায় কতগুলো শৈল্পিক নির্বাচনের জন্ম দিয়েছে, কীভাবে গোত্রবদ্ধ ছবি তৈরির রীতি শিল্পীকেই নির্মাণ করেছে—এই প্রশ্নগুলো গুরুত্ব পাবে। শিল্পীর অভিপ্রায়, মানসিকতা, শুদ্ধ সৃজনশীলতা ইত্যাদি ততটা নয়। অন্যদিকে ছবির চরিত্র আর তাদের মনস্তত্ত্ব বিচারের চেয়েও হয়ত বড় হয়ে দেখা দেবে দৃষ্টি ও শ্রুতির নকশায় দর্শকের চৈতন্যের একটি বিশেষধরনের আপাত-নির্মাণ। কাহিনির পাশাপাশি নানান অ-কথিত কাহিনির বা মহাআখ্যানের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে। হিচককের কথা বলছি কারণ ওঁর খুব সাধারণ ছবিও বারবার আলোচিত হয়েছে ফিল্ম স্টাডিজে এবং এইসব আলোচনা একটা উদাহরণ কীভাবে চৈতন্য, অভিলাষ, সামাজিক ভেদ (যেমন লিঙ্গভেদ), অর্থনীতি ও প্রযুক্তি এইসব একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে এসে জড়ো হতে পারে। নিজেদের মধ্যেকার বিভাজন অনেকটা অস্বীকার করতে পারে।

বই

অভিজিৎ গুপ্ত

বই বলতে আমাদের চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তা বইয়ের অনেকগুলি সম্ভাব্য দশার মধ্যে একটি। বইয়ের এই অতিপরিচিত চেহারার পারিভাষিক নাম কোডেক্স (Codex), যার প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নরূপ :

১. একাধিক মুদ্রিত বা চিহ্নিত পৃষ্ঠার সমষ্টি
২. পৃষ্ঠাগুলি দুই মলাটের আধারে রক্ষিত
৩. পাঠ করার জন্য পাঠককে পৃষ্ঠা উল্টোতে হবে
৪. যে কোনো দুটি উপর্যুপরি পৃষ্ঠা পাশাপাশি বা পিঠোপিঠি বিন্যস্ত

বইয়ের কোডেক্স দশা সর্বব্যাপী কিন্তু নানা সময়ে বইয়ের অন্য দশাও দেখা গিয়েছে। যেমন গোটানো পুথি বা scroll, যা প্রাক্-মুদ্রণ যুগে প্রায় নিরঙ্কুশ ছিল। এছাড়াও আমরা পাই মিশরীয় সভ্যতার মৃৎফলক (clay tablet), সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহর, মায়ান সভ্যতার পুঁথির বই (bead books)। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির যুগেও বই শব্দের নানা নতুন প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন 'অডিও বুক', অর্থাৎ শ্রুতিপাঠ; এবং ই-বুক, অর্থাৎ কম্পিউটার বা অনুরূপ কোনো যন্ত্রের পর্দায় পাঠ্য লেখন।

সভ্যতার ইতিহাসে কোডেক্সের আবির্ভাব নিয়ে সংশয় আছে। খ্রিষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই খ্রিষ্টান জগতে গোটানো পুঁথির জায়গায় প্যাপিরাসে লিখিত কোডেক্সের প্রচলন লক্ষ করা যায়। এই কোডেক্সের সিংহভাগই বাইবেল বা চার্চ-পিতাদের জীবনী সংক্রান্ত (hagiography)। বরং সমসাময়িক গ্রিক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা তখনো অনেকাংশেই গোটানো পুঁথি-নির্ভর। কিন্তু মোটামুটি চতুর্থ শতাব্দি থেকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে কোডেক্স প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে।

পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে হস্তলিখিত কোডেক্সের নানা বিবর্তন ঘটে—বিশেষ করে পাণ্ডুলিপি অলংকরণ (illumination) এক বর্ণাঢ্য শিল্পকলায় উন্নীত হয়। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে মুদ্রণ বিপ্লব ঘটে তা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। জার্মানির মাইনস (Mainz) শহরের যোহান গুটেনবার্গ movable type দ্বারা মুদ্রণ রীতির বহুল প্রসার ঘটান। এর ফলে বইয়ের উৎপাদন ও বণ্টন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তবে কোডেক্সের মূল শর্তগুলি অক্ষুণ্ণই থাকে। গুটেনবার্গ-প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত বই দৃশ্যত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসারী। বইয়ের ইতিহাসে এই জলবিভাজিকা ঘটনাটিকে

চিহ্নিত করার জন্য প্রাক ১৫০০ খৃষ্টাব্দের সমস্ত বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে Incunabuula।

গুটেনবার্গ-প্রক্রিয়ার অনেক আগেই কিন্তু প্রাচ্য জগতে মুদ্রণ প্রচলিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে চিনে টেরাকোটার অক্ষর ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোরিয়ায় ধাতব অক্ষর মুদ্রণ-প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এরও আগে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই দুই দেশে xylography বা কাঠের ওপর অক্ষর খোদাই করে ছাপার প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। তাই গুটেনবার্গের movable typeই যে একমাত্র মুদ্রণ-প্রক্রিয়া তা কিন্তু নয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Roger Chartier-এর মন্তব্য : 'Gutenberg's invention...is not the only technology capable of ensuring the broad dissemination of the printed book.'

এবার আসা যাক 'বই কি' থেকে 'বই কেন' এ প্রশ্নে। খ্রিষ্টোত্তর প্রথম সহস্রাব্দে খ্রিষ্টধর্মের নানা প্রয়োজন মেটাত বই—যেমন সুসমাচার প্রচার, পূজা ও প্রার্থনা। বস্তুত, গুটেনবার্গের সময় পর্যন্ত বেশির ভাগ বই উৎপাদন করতেন মঠের সন্ন্যাসীরা এবং মঠের বাইরে বইয়ের তেমন চল ছিল না। কিন্তু movable type বা বিচল হরফ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের পর থেকে ধর্মীয় বলয়ের বাইরেও বইয়ের চর্চা হতে থাকে—পরিভাষায় যাকে বলে secular literature। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের উৎপাদন বাজারের নিয়ম মেনে খরচ কমাতে সচেষ্ট হয়, যার প্রধান লক্ষণ কাগজের দু'দিকে ছাপার প্রচলন।

আরও নানা কারণে বইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ে—পৃষ্ঠা চিহ্নিতকরণের সুবিধা, ইন্ডেক্স ও কনকর্ডেন্স তৈরির সুযোগ, তুলনামূলক পাঠের সম্ভাবনা, এবং সর্বোপরি, বইয়ের মধ্যে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা। গোটানো পুঁথির একবার একটি অংশ পড়া হয়ে গেলে সেখানে ফিরে যাওয়া খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু বইয়ের পাতার পাশাপাশি বিন্যাসের ফলে এই সমস্যা দূর হয়। এই সুবিধাও কিন্তু প্রথমে গ্রহণ করেছিল গির্জা, ফলে ধর্মীয় প্রচারে বইয়ের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া পুঁথি পড়তে গেলে দুটি হাতই ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে একটি হাত ব্যবহার করলেও চলে, অন্য হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজও করা যায়।

বইয়ের ব্যবহারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে পাঠকের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এক সময়ে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য বই পঠিত হত। নিছক বিনোদনের জন্য পাঠ পাশ্চাত্য জগতে ১৮শ শতাব্দীর আগে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু উপন্যাসের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বইয়ের কদর বাড়তে থাকে। এর ফলস্বরূপ বই পড়ার ভঙ্গিও পাল্টাতে থাকে; চার্চ-পিতাদের যুগে দাঁড়িয়ে পড়ার রীতি ছিল, লেকটার্নের ওপর বই রেখে। বসে বই পড়া তখন অস্বাভাবিক বলেই গণ্য হত। আর শুয়ে বা আরামকেদারায় বসে পাঠ তো রীতিমতো আধুনিক অভ্যাস। ইদানিং অডিও-বুকের দৌলতে অন্য কাজ করতে করতে শ্রুতিপাঠ সম্ভব হচ্ছে, যদিও তাতে শ্রোতার অখণ্ড মনোযোগ হয়ত থাকছে না। পাশাপাশি বইয়ের অবয়বেরও নানা

পরিবর্তন ঘটেছে—উনিশ শতকের তিনখণ্ড উপন্যাসের জায়গায় এসেছে একখণ্ড উপন্যাস, হার্ডব্যাকের জায়গায় পেপারব্যাক।

বিশ শতকের শেষ দিকে বইয়ের প্রযুক্তিতে যে বিপ্লব ঘটে যায় তা সম্ভবত গুটেনবার্গের বিচল হরফের উদ্ভাবনের চেয়ে অনেক গুণ যুগান্তকারী। শব্দের এই নবতম অবতারের নাম ডিজিটাল (digital) শব্দ, যার প্রযুক্তি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন, ফলে অশরীরী। কাগজ-কালি-হরফের মধ্যস্থতায় তৈরি বই এমন একটি বস্তু যা হাতে নেওয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিন-বই কম্পিউটারের পর্দায় ইলেকট্রনের নিরন্তর আনাগোনার আলোয় আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

কম্পিউটারে পাঠসাধ্য বইকেও আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, যে বই floppy disc, CD-Rom বা সমতুল কোন আধারে রক্ষিত—যা হতে পারে একটিমাত্র কবিতা বা *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র সবকটি খণ্ড। এই disc বা CD-ROM প্রতিটি স্বতন্ত্র কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে গেলে একটি যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন, যেভাবে একটি টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা ভিভিডি বাজাতে গেলে একটি player-এর প্রয়োজন। একইভাবে, বৈদ্যুতিন-বই পড়তে গেলে আমাদের প্রয়োজন অন্য একটি যন্ত্রের, যাকে আমরা বলতে পারি viewer বা reader। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই viewer / reader কম্পিউটারেরই নামান্তর কিন্তু ইদানীং বাজারে কিছু কিছু e-reader পাওয়া যাচ্ছে যাদের কাজ শুধুমাত্র e-book পাঠ।

বৈদ্যুতিন-বইয়ের দ্বিতীয় রূপটি অপ্রত্যক্ষ, অলীক। ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে virtual reality-র যে অনন্ত মহাকাশ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, সেখানেও নানা পাঠের অবস্থান। সাবেকি বইয়ের একটা শুরু ও শেষ আছে, যার সীমানা চিহ্নিত করে মলাট। প্রতিটি বইয়ের সীমানাও একইভাবে চিহ্নিত, ফলে একটি বইয়ের সঙ্গে অন্য বইয়ের মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। ইন্টারনেটের পাঠে কিন্তু বইয়ের সীমানা না থাকলেও চলে, কেননা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো কারণে পৃষ্ঠাসংখ্যা সীমিত রাখার কোন দায় virtual text-এর নেই। ফলে যে কোনো text / বই-এর কলেবর বাড়তে বাড়তে অচিরেই হয়ে উঠতে পারে hypertext। এর ফলে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে অমোঘ ব্যবধান, তাও মুছে যেতে শুরু করে। আজকে আমার লেখা কোনো text-এর জের ধরে হয়ত কোনো এক পাঠক করলেন তাঁর নিজের ভাষ্য, উপর্যুপরি পাঠকদের টীকাকরণের ফলে আমার লেখা প্রতিনিয়ত বদলে যেতে থাকে। সেক্ষেত্রে একটি text-এর প্রামাণ্য সংস্করণ বলে আর কিছু থাকল না, একাধিক সংস্করণের মুকুরে আমরা text-এর বিভিন্ন দশা লক্ষ্য করতে পারি। ইন্টারনেটে লভ্য প্রতিটি text-ই যে এভাবে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে এমন নয়, কিন্তু যে প্রযুক্তির দ্বারা ইন্টারনেটের text লভ্য, তাতে এই ধরনের textual বিবর্তন অনায়াসেই সম্ভব। এছাড়াও আছে HTML (hyper-text marked-up language) প্রযুক্তির দ্বারা নির্মিত link-এর সাহায্যে একটি text থেকে অন্য text-এ অবাধ গতিবিধি, ফলে আমাদের পাঠ শুধুমাত্র x-অক্ষের অনুসারী না হয়েও y-অক্ষ বরাবরও অগ্রসর হতে পারে।

মুদ্রিত বইয়ের যুগ কি তা হলে শেষ হয়ে এল? আদৌ নয়, কারণ তা নিছক পাঠ ছাড়াও অন্য চাহিদা পূরণ করে। আমরা বই উপহার দিই, বইয়ের আখ্যাপত্রে নিজের বা অপরের নাম লিখি, গন্ধ শুঁকি, নাড়াচাড়া করি, সাজিয়ে রাখি। যে বই অপ্রত্যক্ষ বা virtual, সে বই এই চাহিদা পূরণে অক্ষম। তাছাড়া নিছক আনন্দের জন্য যে পাঠ, তাতেও শরীর ও চোখের আরামও আমরা দাবি করি। বৈদ্যুতিন বই সেই পাঠের আরাম এখনো আমাদের দিতে পারে না। বরং ব্যবহারিক কারণে যে পাঠ, সেখানে বৈদ্যুতিন বই হতে পারে নিরঙ্কুশ। মুদ্রিত বইয়ের তুলনায় বহুগুণ কার্যকর। একুশ শতকে আমাদের পাঠ একাধারে এই দুই স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করবে বলে মনে হয়।

বক্রোক্তি

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার নিও-ক্রিটিকদের পুরোধাপুরুষ আই. এ. রিচার্ডস্ তাঁর *Principles of Literary Criticism*-এ যখন শব্দের Scientific use এবং Emotive use এই দু'ধরনের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন এবং কাব্যার্থের সম্যক উপলব্ধির জন্য জোরটা দিয়েছিলেন Emotive use-এর ওপর, আমাদের কাছে তখনও ফার্দিনান্দ দ্য স্যোস্যুর বিশেষ কোনো পরিচিত নাম ছিল না। যতদূর ধারণা, কাব্যসমালোচকদের জগতে Structuralism, Post-structuralism, Semiotics এবং শেষ পর্যন্ত Deconstruction কথাগুলো নিয়ে সমালোচকদের বপ্রক্রীড়া চলাকালেই স্যোস্যুর তাঁর অলিখিত সংলাপে যে বেশ কিছু মহামূল্য কথা বলেছিলেন সেদিকে নজর পড়েছে দুনিয়ার। স্যোস্যুর-উত্তর কালে এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বজন-সমর্থিত যে, কাব্যবিচার প্রায়-অসম্ভব গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে। ১৯৭৪-এ মিলান-এ 'International Association for Semiotic Studies'-এর প্রথম মহাসম্মেলন-এ জড়ো হয়েছিলেন ৬৫০ জন প্রতিনিধি, যাঁদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'Science of Signs'। 'শব্দ' যে চিহ্নক এবং চিহ্নিত হল 'বাচ্যার্থ' স্যোস্যুর-এর পর থেকে এই ব্যাপারটাই সমালোচকদের আবিষ্ট করল নানাভাবে। তারপর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রাজ্ঞজন দেরিদা'র নেতৃত্বে তুলকালাম আলোচনা শুরু করে দিলেন এই বলে যে, শব্দের অর্থ নয়, শব্দ থেকে নতুনতর শব্দের জন্মই হল মূল ব্যাপার। পূর্বের আমরা পরম বিস্ময়ে শুনলাম পশ্চিমের এই সব কথা। এমনতর বিস্ময় নিয়ে উলফগ্যাং ইসার-এর 'Reader response' তত্ত্ব পাঠ করলাম। কিন্তু কজন আর ভেবেছি যে ইসার-এর তত্ত্বের নির্যাস 'সহৃদয় সামাজিক' কথাটার মধ্যে ছিল? রিচার্ডস এবং তার বন্ধু অগডেন ধ্বনিবাদীদের ছাড়িয়ে যেতে পারেননি? অথবা, 'শব্দ', 'অর্থ' নিয়ে স্যোস্যুর থেকে দেরিদা যে যাই বলুন ভামহ, দণ্ডী বা কুন্তকের তত্ত্বকে ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে? মনে হয় অতীতের পুঁজি ভাঙতে পারলে দেখা যাবে মিলছে এমন সব কথা যা উচ্চারণ করতে পশ্চিমের মনীষীদের সময় লেগেছে আরো হাজার বছর। অতীত-বিস্মৃতের পক্ষে অধমর্ণ হওয়া হয়তো সহজ, কিন্তু গৌরবময় ঐতিহ্যের বিস্মরণ সাংস্কৃতিক সন্নিপাতের আবশ্যিক কারণ (necessary condition)—ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে এই সত্য। আমাদের প্রাচীন মনীষীরা যাঁদের 'সমালোচক' বলা হয় না, বলা হয় 'আলঙ্কারিক',

'শব্দ' এবং 'অর্থ' নিয়ে ভেবেছেন তাঁরা এবং বলেছেনও বিস্তর কথা। তবে বেশ কিছু বিশিষ্টজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন রাজানক কুন্তক (কুন্তল?) তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত* গ্রন্থের জন্য।

সময়ের হিসেবে অর্বাচীন টিলিয়ার্ড যখন বলেছিলেন, কবিতামাত্রই তির্যক তখন কিন্তু আসলে 'বক্রোক্তি' তত্ত্বই প্রতিপাদন করতে চেয়েছিলেন তাঁর মতো করে। কিন্তু এরকম দু'একটি বাক্যে নয়, 'বক্রোক্তি' কথাটা তত্ত্বগতভাবে কুন্তকের মতো সবিস্তার বলেননি কেউ। আজ থেকে অন্তত হাজার বছর আগে কুন্তক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে ভামহাচার্যের মতবাদকে নতুন ব্যাখ্যার আলোয় উদ্ভাসিত করলেন। কুন্তক কি পরিচিত ছিলেন ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে? স্ফোট, ধ্বনি—এ সবের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি অসম্ভব নয়, কিন্তু আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত—এই দুইয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতীয়মানার্থের গৌরব না-জানা থাকা সম্ভব, কারণ অভিনবগুপ্ত তাঁর উত্তরকালীন।

ভামহ, দণ্ডী, বামন তথা কুন্তকের পূর্বাচার্যদের কাছে 'বক্রোক্তি' ছিল একটি মুখ্য শব্দালঙ্কার মাত্র। কিন্তু কুন্তক বক্রোক্তি-কে পৃথক করে নিলেন 'অভিধা-প্রকার-বিশেষ' রূপে গণ্য করে। সাধারণ অলঙ্কার বাহ্য আভ্যন্তর বা বাহ্যাভ্যান্তর যাই হোক না কেন, ধ্বনিবাদীদের আগে তা ছিল শব্দ ও অর্থে সীমাবদ্ধ। বক্রোক্তিও ছিল বিশেষ শব্দালঙ্কার মাত্র। আলঙ্কারিক রুদ্রট এবং মম্মট এই মতের পোষকতা করেছিলেন। তাঁরা অলঙ্কারকে 'কাকু' এবং 'শ্লেষ' এই দু'ভাগে ভাগ করে নিলেন। প্রথমটি নির্ভর করে উচ্চারণভঙ্গির ওপর এবং দ্বিতীয়টিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও থাকে অন্য একটি অর্থ। শ্লেষ নির্ভর করে অপহ্নব এবং গূঢ়ার্থপ্রতীতির ওপর। ভামহ কিন্তু গুণ ও অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন বক্রোক্তিকে। ভামহ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রসঙ্গে 'বক্রোক্তি'র কথা বলেছিলেন, তথাপি তিনি বক্রোক্তিকে 'শব্দালঙ্কার' বলে গণ্য করেননি। ভামহ বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের কথা বললেও হেতু এবং সূক্ষ্মকে অলঙ্কার বলে মানেন নি, কারণ এদের মধ্যে 'বক্রোক্তি' নেই। ভামহ মনে করতেন, অলঙ্কার মাত্রই বক্রোক্তি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল মহাকাব্য, নাটক, কথা এবং আখ্যায়িকা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং বক্রোক্তি হচ্ছে লোকাতিক্রান্ত-গোচর বচন। 'লোচন' টীকায় অভিনবগুপ্তাচার্য বক্রতা বলতে বুঝিয়েছেন 'লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'। 'লোকাতিক্রান্ত' বা 'লোকোত্তীর্ণ' বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন সেই জগতের ভাষাকে যা কিনা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা থেকে পৃথক। কুন্তকাচার্য ও তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত*-র তৃতীয় উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায়, 'লোকোতিক্রান্ত গোচরা' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন 'প্রসিদ্ধ ব্যাপারাতীত' অর্থে। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে 'আদ্যা অলঙ্কৃতিঃ' বা প্রথম কাব্যলঙ্কাররূপে উল্লেখ করে যাবতীয় অলঙ্কারকে বললেন—বক্তোক্তি। 'বক্রোক্তি' প্রসঙ্গে দণ্ডী বললেন :

শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্।
দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।।

দণ্ডীর মতে, বাঙ্ময় কাব্য স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি এই দু'ভাগে বিভক্ত। আর বামনাচার্য রুদ্রটের মতোই বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত অর্থালঙ্কার বলে চিহ্নিত করলেন। এইভাবে বক্রোক্তি শব্দটি ভামহ ও দণ্ডীর কাছে একরকম এবং বামন রুদ্রটের কাছে অন্য। কুন্তকের *বক্রোক্তিজীবিত*-এর তত্ত্বভিত্তি ছিল ভামহের সিদ্ধান্তে। *বক্রোক্তিজীবিত*-এর প্রথম উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় কুন্তক লিখছেন :

লোকোত্তর চমৎকারকারিবৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।
কাব্যস্যায়মলঙ্কারঃ কোঽপ্যপূর্বো বিধীয়তে।

কারিকার প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'অসমান্যাহ্লাদ বিধায়িবিচিত্র ভাবসম্পত্তয়ে' অর্থাৎ অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হল অসামান্য আনন্দদান। পরবর্তী কারিকার শেষাংশে বললেন 'কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ' অর্থাৎ সর্গবদ্ধ কাব্যের লক্ষ্য হল অভিজাতদের হৃদয়ে আহ্লাদ বা আনন্দসৃষ্টি। 'অভিজাত' বলতে বৃত্তিতে বুঝিয়েছেন রাজপুত্র ইত্যাদি। ষষ্ঠশ্লোক পর্যন্ত অলঙ্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার পর সপ্তম কারিকায় কুন্তক বললেন :

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি।

তৃতীয় কারিকায় অভিজাতদের হৃদয়ে আনন্দদানের মধ্যে কাব্য-সার্থকতা সন্ধান করা হয়েছিল। সপ্তম কারিকায় কুন্তক বললেন 'তদ্বিদ্'গণের আহ্লাদ সৃষ্টির কথা। নবমে তিনি পুনরায় ব্যবহার করলেন, 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ' কথাটি। সুতরাং বক্রতা ব্যবহারের লক্ষ্য হবে সহৃদয় পাঠকদের আনন্দদান। অর্থাৎ শুধুই বাহ্যসৌষ্ঠব বা চারুত্ব সৃষ্টির জন্যে নয়, পাঠকচিত্তে রসসৃষ্টির জন্যই কুন্তকাচার্য বক্রোক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। সপ্তদশ কারিকায় শব্দার্থের এই অলৌকিকতা বিধানের জন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন শব্দের বিন্যাসভঙ্গির ওপর। এই বিন্যাসভঙ্গি কেমন হবে? কুন্তক বলছেন, 'অন্যূনানতিরিক্ত মনোহারিণী পরস্পরস্পর্ধিত্বরমণীয়া'। বৃত্তিতে বলেছেন শব্দ ও অর্থের এই 'পরস্পরস্পর্ধিত্ব' এবং 'অন্যূনাতিরিক্তত্ব' সহৃদয়গণের প্রীতির কারণ হয়। সুতরাং বারংবার এই সত্যটি যেন কুন্তক-কর্তৃক প্রতিপাদিত হচ্ছে যে সহৃদয়ের প্রীতির কারণ হল ভাষার বক্রতা। এই 'বক্র' ব্যাপারটা কী সপ্তম কারিকার বৃত্তিতে সে কথা বললেন কুন্তক—'শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধ শব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকী'। অষ্টাদশ কারিকার বৃত্তিতে সে কথা বললেন, বক্রোক্তি হল শাস্ত্রাদিতে শব্দার্থের যে মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত তার থেকে ভিন্ন। মহিমভট্ট বলেছিলেন, বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ মার্গ পরিত্যাগ করে অন্যভাবে বলা হয় বলে তাকে 'বক্রোক্তি' বলা হয়। যদিও কবিমাত্রকেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শব্দার্থের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করতে হয়, তথাপি নতুনত্ব সৃষ্টি ছাড়া কোনো কবি খ্যাতি লাভ করতে পারেন না। নতুনত্ব সৃষ্টি মানেই হল প্রচলিত মার্গ বা পন্থাকে বর্জন করে নতুন কিছু বলা। *বক্রোক্তিজীবিত*-এর প্রথম উন্মেষের দশম কারিকায় কুন্তক বলছেন, বক্রোক্তি হল 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গিভণিতিঃ'। ব্যাখ্যায় বলেছেন—'বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্মকৌশলং তস্যভঙ্গি বিচ্ছিত্তিঃ তয়া ভণিতিঃ বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তিরিত্যুচ্যতে'। অর্থাৎ কবির

কাব্যরচনার যে বিশেষ ভঙ্গি বা কৌশল তাই হল বক্রোক্তি। রুষ্যক একেই বলেছেন 'উক্তি বৈচিত্র্য'।

যে-বক্রোক্তির কারণ 'কবি-ব্যাপার' কুন্তকাচার্য তাকে ছ'ভাগে ভাগ করেছেন : ক. বর্ণবিন্যাস বক্রতা, খ. পদপূর্বার্ধবক্রতা, গ. প্রত্যয়াশ্রয় বক্রতা, ঘ. বাক্যবক্রতা, ঙ. প্রকরণ বক্রতা, চ. প্রবন্ধ বক্রতা।...প্রতিটি শ্রেণির বক্রতাকে তিনি যেভাবে আরো বিশ্লিষ্ট করেছেন তাতে আমেরিকান দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স (Charles Sanders Peirce)-এর Semiotics তত্ত্ব সম্পর্কে জোনাথান কালার (Jonathan Culler)-প্রযুক্ত বিশেষণটি ব্যবহার করা যেতে পারে 'taxonomic speculatios'। অবশ্য *ধ্বন্যালোক*-এর কারিকাকারও ধ্বনির এই রকমই বিচিত্র ভাগ করেছিলেন। অথবা বলা যায়, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের রচনারীতিগত বৈশিষ্ট্যই ছিল এই রকম। কিন্তু 'বক্র' শব্দটি কুন্তকাচার্য যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা বুঝে নিতে পারলে বক্রোক্তির প্রাসঙ্গিকতা যে আজও গুরুত্বপূর্ণ তা একালের ভারতীয় সমালোচকেরা স্বীকার করে নেবেন। পশ্চিমের আলোতে পূর্বের দিগন্তকে চেনাই যখন আজ অনিবার্য এবং নিয়তিনির্ধারিত তখন ফার্দিনাদ দ্য স্যোস্যুর-পরবর্তী Structural linguistics-এর সঙ্গে বক্রোক্তিবাদকে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এমনকি যাঁরা Stylistics চর্চা করেন কুন্তক তাঁদেরও নিরাশ করেননি তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত* গ্রন্থে।

বাংলা ব্যান্ড

কাজী কামাল নাসের

সংগীতের ক্ষেত্রে ইংরেজি 'ব্যান্ড' শব্দের অর্থ মূলত কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংগীতিক দল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংজ্ঞা থেকে কিছুটা সরে এসে কণ্ঠশিল্পীদের ব্যান্ডের আওতাভুক্ত হতে দেখা যায়। পশ্চিমের সংগীত জগতে এই দলগত সংগীতরীতির উৎস সন্ধানে গেলে আমরা পৌঁছে যাব আমেরিকান ব্যান্ডের ঐতিহ্যে। শাদা এবং কালো—উভয় গোষ্ঠীর ব্যান্ডই উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকাবাসীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুত প্রতিটি গ্রামেরই একটি নিজস্ব ব্যান্ড ছিল যারা পিকনিক, কুচকাওয়াজ, রাজনৈতিক সমাবেশ, নাচের আসর অথবা কার্নিভালে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করত। আমেরিকান জ্যাজ সংগীতের প্রাথমিক পর্যায়ের আঙ্গিক বা তাল-ছন্দের নানা প্রকরণকে ব্যান্ড সংগীত যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মার্চিং ব্যান্ডে ব্যবহৃত যন্ত্রের অনেকগুলিই—যেমন ট্রাম্‌পেট, কর্নেট, ট্রম্বোন, টিউবা, ক্ল্যারিনেট ও ড্রাম্‌স্—প্রথম পর্বের জ্যাজ সংগীতেও ব্যবহৃত হত। পশ্চিমী পপ্ সংগীতের ধারায় এমন অনেক সাংগীতিক দলের নাম উল্লেখ করা যায়, যেগুলি আসলে ব্যান্ড সংগীতেরই নামান্তর মাত্র। এদের মধ্যে ষাটের দশকের ইংল্যান্ডের গানের দল 'বীট্‌ল্‌স'-এর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বেতার ও টেলিভিশনবাহিত হয়ে এই সব গানবাজনা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে আমাদের এই উপমহাদেশেও পৌঁছতে লাগল। ক্রমবর্ধমান গতিশীল জীবনের সঙ্গে এই ধারার সংগীতের উদ্দাম গতিময় তাল-ছন্দের সাযুজ্য যুব সমাজের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করল। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে যখন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কর্মহীনতা, দুর্নীতি, রাজনীতিক অন্তঃসারশূন্যতা যুবসমাজের মনে কোনো আশার সঞ্চারে ব্যর্থ, তখন চরম হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ এই জাতীয় উদ্দাম, স্নায়বিক উত্তেজনাসঞ্চারী গানবাজনায় নিজেদের পরিত্রাণ খুঁজবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

তবে ব্যান্ড সংগীতের ধারা অনুসরণ করে বাংলা ভাষাতেও যে গান-বাজনা করা যেতে পারে, তার প্রমাণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশই প্রথম দিয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাংলা ব্যান্ডের একটি ধারা ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মূল ধারার বাংলা গান অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি বা লোকগীতির প্রতিস্পর্ধী না হলেও প্রায় সমান্তরাল তার অবস্থান। বাংলা ব্যান্ডের গানের যা কিছু

রমরমা, তা যদিও অধিকাংশেই রাজধানী শহর ঢাকা-কেন্দ্রিক, তথাপি জেলা-মফস্‌সলের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষের কাছেও এ গানের আবেদন ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশের ব্যান্ড-সদস্যদের তৈরি করা গানের কথা-সুর ও যন্ত্রায়োজনে, সর্বোপরি তাঁদের পোষাকে, উচ্চারণ ভঙ্গিমায় ও ব্যক্তিগত জীবনচর্যার প্রতিটি অনুষঙ্গে পশ্চিমের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। তাঁদের গান সব নিরিখেই ইংরেজি গানের আক্ষরিক বাংলা তর্জমা বলে মনে হয়। মূলত রোম্যান্টিক প্রেমই এঁদের গানের প্রধান উপজীব্য। এর বাইরে কয়েকটি দল আছেন, যাঁরা ওই পশ্চিমী যন্ত্রানুষঙ্গ ও গায়নরীতির প্রতি মান্যতা দিয়েই বাংলাদেশের বেশ কিছু জনপ্রিয় লোকগানকে নতুন মোড়কে শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করছেন। বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীতের বয়স নয় নয় করেও প্রায় তিরিশ বছর হল। ঢাকার শহুরে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই গান ও তার গায়ক-গায়িকাদের ঘিরে প্রবল উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। ওদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যান্ডের নাম হল— ফীডব্যাক, ফীলিংস, ঢাকা, এল. আর. বি., সোল্‌স্ ও মাইলস্।

এপার বাংলায় ব্যান্ড সংগীতের সূত্রপাত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'মহীনের ঘোড়াগুলি'-এর গানে। উনিশশো পঁচাত্তরে তাঁদের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়। শব্দচয়ন, সুরপ্রয়োগ, গায়নরীতি ও যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক প্রবল আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধে ঋদ্ধ তাঁদের গান সেই সময়ে শহুরে যুবসমাজের কিছু অংশের মধ্যে সাড়া ফেললেও বাণিজ্যিক নিরিখে পশ্চিমবাংলার আমজনতার শ্রবণরুচিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অভিঘাত তৈরি করতে পারেনি। তৎকালীন সরল, অনাড়ম্বর, শ্লথ জীবনযাপনের ধারায় অভ্যস্ত বাঙালির শ্রবণ ও মননে উত্তম-সুচিত্রার ঠোঁটে হেমন্ত-সন্ধ্যার রোম্যান্টিক গান যে প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল, তাতে অন্য কোনো নিরীক্ষাধর্মী গানের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন কিছুটা কষ্টকল্পিতই ছিল। সব মিলিয়ে 'মহীনের ঘোড়াগুলি' বাংলা গানের দিগন্তে এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেও বাংলা গানের বিস্তৃত বাজারে সেই সময়ে তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারল না। 'মহীনের ঘোড়াগুলি'-এর সমসাময়িক আরও একটি ব্যান্ডের নাম 'নগর ফিলোমেল'।

এরপর সত্তরের দশকে পশ্চিমবাংলার বুকে শুরু হয় তুমুল রাজনৈতিক টানাপোড়েন। তীব্র সন্ত্রাসের আবহে বাংলা গানের নতুন কোনো সম্ভাবনা তৈরি তো হলই না, বরং তথাকথিত স্বর্ণযুগের উত্তরাধিকার বয়ে বেড়ানো আধুনিক বাংলা গানেরও অবক্ষয়ের সূচনা হল এই সময়েই। গোটা আশির দশক বাংলা গানের এক চরম হতশ্রী রূপ প্রত্যক্ষ করলেন এ গানের শ্রোতারা। এর অনিবার্য ফল বাংলা গানের থেকে শ্রোতাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এই ছবিটা আবার অন্যরকম হল নব্বইয়ের গোড়ায় সুমন চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে। কথা-সুরের চূড়ান্ত দৈন্যে বাংলা গান যে রক্তাল্পতায় ভুগছিল, সুমনের গান তাকে আক্ষরিক অর্থেই পরিত্রাণের সুযোগ দিল। বাংলা গানের শরীরে আবার নতুন রক্তের সঞ্চার ঘটল। বাঙালি শ্রোতারা আবার হৈ-হৈ করে বাংলা গান শুনতে লাগলেন। এ গানের বাজার পুনরুজ্জীবিত হল। সুমনের পাশাপাশি নচিকেতা, অঞ্জন দত্ত প্রমুখ বেশ কয়েকজন শিল্পী এই সময়ে উঠে এলেন, যাঁরা নিজেরা গান লিখে, সুর করে, গেয়ে, বাজিয়ে শ্রোতৃহৃদয়ে ঝড় তুললেন। প্রচারমাধ্যম এঁদের গানকে 'জীবনমুখী' নামে আখ্যায়িত করল।

এরই মধ্যে পুরনো দিনের জনপ্রিয় গানগুলিকে এ যুগের শিল্পীদের কণ্ঠে নতুন প্রযুক্তির সহায়তায় নতুন যন্ত্রায়োজনে রেকর্ড করার এক প্রচেষ্টা বেশ ভালরকম সাফল্য এনে দিল। 'রিমেক' নামে চিহ্নিত এই গানের ধারার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পী হলেন শ্রীকান্ত আচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রাণী সেন প্রমুখ।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকেই আবার ব্যান্ড সংগীতের পুনরুজ্জীবন ঘটল। কলকাতার কয়েকটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কিছু ছাত্র-ছাত্রীর দল বেঁধে গিটার হাতে গান-বাজনা করার মধ্য দিয়েই এই পুনরুত্থান শুরু হয়েছিল। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা পুস্তক মেলায় 'আবার বছর কুড়ি পরে' শিরোনামে 'মহীনের ঘোড়াগুলি'-এর একটি নতুন ক্যাসেটের প্রকাশ ব্যান্ডের গানের পুনরুজ্জীবনকে ত্বরান্বিত করল। এই অস্থির সময়ে নিজেদের আশা-নিরাশা, প্রেম-ভালবাসা, স্বপ্ন-যন্ত্রণার এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের তাগিদ থেকেই এই প্রজন্মের তরুণ-তরুণীর দল নিজেদের গান বাঁধতে লাগলেন। উল্লেখ থাকতে পারে, এই ছেলেমেয়েরা অধিকাংশেই 'মহীনের ঘোড়াগুলি'-এর গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ভাবশিষ্য। তাই গৌতমের গানের শৈলী অনুসরণের পাশাপাশি তাঁর জীবন যাপনের নানা মুদ্রা, তাঁর বাউণ্ডুলেপনা—এ সবই এঁদের মধ্যে কমবেশি অনুসৃত হতে দেখা গেল। বিষয়ের ক্ষেত্রে মিষ্টি প্রেমের পাশাপাশি যুগযন্ত্রণার নানা অভিব্যক্তিও এঁদের গানে পরিলক্ষিত হল। এই পর্বে প্রাথমিকভাবে উঠে আসা কয়েকটি ব্যান্ডের নাম—ক্যাকটাস, পরশপাথর, অভিলাষা প্রভৃতি। ব্যান্ডের অন্যতম প্রধান দর্শনগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই দলগুলির কোনোটিতেই বাইরের যন্ত্রশিল্পী ভাড়া করে আনা হয় না। নিজেদের গানে ব্যবহৃত যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র তাঁরা নিজেরাই বাজান। সমবায়ী নীতিতেই এঁদের প্রতিটি গানের উৎসার ঘটে। গায়নে, উচ্চারণ ভঙ্গিমায় বড় বেশি পশ্চিমি প্রভাব। মূলত রক সংগীতের ধারায় জারিত এঁদের গান। তবে এরই পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার ক্যারিবীয় সংগীতের তাল-ছন্দের স্ফূর্তির সঙ্গে নাগরিক ফিচলেমি ভরা তির্যক, শ্লেষাত্মক শব্দের সুচারু মিশেল লক্ষ করা যায় চন্দ্রবিন্দুর গানে। লোকসংগীতের সুর থেকে উপাদান নিয়ে তৈরি গানে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় যন্ত্রানুষঙ্গের মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস ভূমির গানে। আবার বাংলার লোকগানকে অবিকৃত অবস্থায় শ্রোতার সামনে হাজির করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন বাংলা গানের দল দোহার। এছাড়াও ফসিল্‌স্, লক্ষ্মীছাড়া, শহর, একলব্য, আগন্তুক, কালপুরুষ, কায়া, অর্ক, নিষিদ্ধ পল্লীর শিশুদের ব্যান্ড 'জবালার হোটরা' প্রভৃতি দ্বিশতাধিক বাংলা ব্যান্ড এই মুহূর্তে বাঙালি শ্রোতার শ্রবণরুচিকে শাসন করে চলেছে। এইসব দলের কিছু কিছু গানের তুমুল জনপ্রিয়তা রীতিমত বিস্মিত করে। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে এমন কি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যসহ বিদেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিদের কাছেও বাংলা ব্যান্ডের গান বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ব্যান্ডের গায়ক-গায়িকাদের সাংগীতিক শিক্ষা বিষয়ে কিছু বিতর্ক চালু থাকলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা ব্যান্ডের গান বাংলা গানের শরীরে তারুণ্যের অন্যতর দীপ্তি এনে দিয়েছে। আপাতত সেই দীপ্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত বাংলা গানের গোটা আকাশ।

বাঙালি উদ্বাস্তু

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের তুলনায় পূর্ব ভারতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সাল থেকে এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা, সম্পত্তি ও প্রাণহানির ভয়, হিন্দু নেতাদের দেশত্যাগ, পাসপোর্ট প্রচলন লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবারকে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করে। বহুসংখ্যক হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়, কেউ কেউ চলে যায় অসম, ত্রিপুরা, বিহার এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৬-৫২ সালে বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২৫.১৮ লক্ষ, এবং ১৯৭০-৭১সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮.৪১ লক্ষে। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা অত্যন্ত কম। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। ১৯৫০-৫১ সাল থেকেই বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই রাজনীতির কয়েকটি দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাক। বাঙালি উদ্বাস্তুরা প্রথমেই যে রাজনীতির মুখোমুখি হয় তা হল সংখ্যার রাজনীতি। সংখ্যার ভিত্তিতে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ বরাদ্দর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতর মোট বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৪০ লক্ষর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পুনর্বাসন সমিতি গঠন করে, তার হিসাব মতে ১৯৭১-এর মাঝামাঝি অবধি মোট বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪ লক্ষর কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবানুযায়ী যেহেতু উদ্বাস্তু সংখ্যা কম, তাই পুনর্বাসনের জন্য প্রাপ্য অঙ্কের রাশিও হয় কম। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেশি দেখিয়ে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ নিয়ে নেয় দিল্লি ও পাঞ্জাব। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয় ক্ষতিপূরণ ও গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ। উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকারকে নিতে হয়েছিল।

এই সংখ্যার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্ররোচনা। নিপীড়ন চালিয়ে উদ্বাস্তুদের পূর্ববঙ্গে ফিরিয়ে দেবার নানান প্রচেষ্টা। সুদূর দিল্লিতে নেহরু একের পর এক বৈঠক করেন, বাঙালি উদ্বাস্তুদের ফিরে যেতে অনুরোধ করা হয়। অনেক বাঙালি কংগ্রস নেতাও বলতে শুরু করেন ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো এ তরী। কিন্তু উচ্চ ও নিম্নবর্গের বাঙালি, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। এদের অনেকে

স্বাধীন ভারতে থাকার জন্যই তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এরপর পাসপোর্ট প্রথা প্রচলন করে জনস্রোত বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালান হয়। সরকার জানায় ১৯৫৮ সালের পর প্রবেশকারী কেউ পুনর্বাসনের জন্য কোনো অর্থ সাহায্য পাবে না।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে জনস্রোত একটু কমে আসে, আর তখন শুরু হয় পুনর্বাসন নিয়ে আর এক রাজনৈতিক চাতুরি। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সব উদ্বাস্তু ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে কারণ উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি হয়েছে বাসস্থান সুদূর উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দণ্ডকারণ্যে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য সব রকম আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও জানানো হয়। সরকারি কঠোর নীতি ২৪৪৮ পরিবারকে ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করে।

সরকারি পক্ষপাতিত্ব, নির্যাতন যতই বাড়তে লাগল ততই দেখা গেল উদ্বাস্তুদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা। শুরু হল আবালবৃদ্ধবণিতার পথে নেমে আসার পালা, দিকে দিকে চলল মিটিং আর মিছিল। এই সবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তি ছিল সচেতন। শত শত উদ্বাস্তু পরিবারের উপর চলল পুলিশি নির্যাতন। এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর *The Marginal Men* গ্রন্থে। যে ইতিহাস পুলিশের ফাইলে চাপা পড়েছিল বছরের পর বছর, তা বিস্তৃতভাবে লেখা হয় এই বইটিতে। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লড়াই করে উদ্বাস্তু বাঙালি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাঁদের স্থান সুচিহ্নিত করে।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের লড়াই কিন্তু থেমে যায়নি। ১৯৭৯ সালে ১৫,০০০ উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে এসে সুন্দরবন অঞ্চলের এক দ্বীপ মারিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। সেখানে চলে নির্যাতন, উদ্বাস্তুদের মারিচঝাঁপি ছেড়ে যেতে বলা হয়। ক্ষমতাসীন নেতারা, যাঁরা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই ছিলেন মারিচঝাঁপি সন্ত্রাসের নায়ক। এই লড়াইতে বহু উদ্বাস্তু প্রাণ হারান।

উদ্বাস্তু বাঙালির ইতিহাস এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের একটা দিক ছিল রাষ্ট্রের পুনর্বাসন রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করা। রাষ্ট্রশক্তির নির্যাতন যতই কঠিন হয়েছে ততই উদ্বাস্তুরা হয়েছেন সংগঠিত। তাঁদের সংগ্রাম পেয়েছে ব্যাপকতা। এই সংগ্রামই তাঁদের দিয়েছে বেঁচে থাকার মন্ত্র।

বিকল্প পরিবার

মল্লিকা সেনগুপ্ত

দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা, আজ্ঞাবহ গিন্নি এবং গোবেচারা ছেলেমেয়েরা—এই হল পরিবারের সর্বজনস্বীকৃত চেহারা। যৌথ পরিবার হলে এর আগে পিছে আরো দু-এক প্রজন্ম যোগ হবে—এই আর কি। ছবি তোলার সময় কাঁধে চাদর ফেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরা বা স্যুট পরা টাই লাগানো কর্তা দাঁড়াবেন সবার মাথার উপর চালচিত্রের মতো। তার ছত্রছায়ায় একটি চেয়ারে বসবেন গিন্নি, তাঁর কোলে কাঁখে পায়ের নিচে সন্তানেরা। নিখুঁত পিরামিড। কর্তা এবং গিন্নির উর্ধ্বঃ-অধ সম্পর্ক এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এই হল প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আসল এবং প্রতীকী চেহারা। তাহলে কী হবে অয়ন এবং অরিত্রদের, যারা কোর্টের আদেশে মা কিংবা বাবার যে কোনো একজনের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়? মা আর অয়ন কিংবা বাবা আর অরিত্র কিংবা ঠাকুমা ঠাকুরদা আর বিন্নি, বা বাবা এবং সৎমায়ের সঙ্গে রিঙ্কু, সৎবাবা, মা আর তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পূজা—এরা কী পরিবার নয়? এদের ভাঙা সংসার বলার মতো নিষ্করুণ কাঠিন্য আর হয় না। সুখী প্রথাগত পরিবারের আশেপাশেই যে ছড়িয়ে আছে দুঃখী বিকল্প পরিবারগুলি। আমরা তাদের ভাঙা সংসার বলি। কিন্তু বললে ওদের ওপর অন্যায় হয়। ওদের অপমান হয়।

এদেশে ততটা না হলেও বিদেশে হরবখত্ দেখা যায় সমকামী জুটির সংসার পত্তন। যেমন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ও জুড়ি লেনসন রীতিমতো বিয়ে করে সংসার পেতেছিলেন। ষাটের দশকে মার্কিন কবিদম্পতি হিসেবে নিজেরে বিখ্যাত করেছিলেন দুই পুরুষ অ্যালেন গিন্সবার্গ এবং পিটার অরলোভ্স্কি। এইসব জুটি আমাদের চোখে অদ্ভুত হলেও ওদের দেশে রীতিমতো বাস্তব এবং আইনসিদ্ধ।

প্রথাগত পরিবারের কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে লিঙ্গবৈষম্যের বুনিয়াদ। ইউরোপের মেয়েরা এই সত্য উপলব্ধি করে সবার আগে। আর এই ঐতিহাসিক উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল এঙ্গেল্সের *দি অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি, অ্যান্ড দি স্টেট*। পরিবারের মধ্যেই লিঙ্গবৈষম্যের উৎস একথা বোঝার পর থেকেই ইউরোপ আমেরিকায় কয়েকটি পরিবর্ত-ব্যবস্থা জনপ্রিয় হতে থাকে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হল সহবাস বা লিভ টুগেদার, সমকামী দাম্পত্য, একক মাতৃত্বের সংসার, একক পিতৃত্বের সংসার, যৌথ গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাস ইত্যাদি। এগুলো যে একদম ছিলই না তা

নয়, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিমি সমাজে ক্রমশ এইগুলোই আইনসিদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। বিকল্প ব্যবস্থাগুলি সব সমস্যা সমাধান করছে এমন নয়। কিন্তু পরিবার মানুষ তৈরি করেছিল—মানুষই তা ভেঙে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়।

স্যারোগেট মাতৃত্বও একটা নতুন ধারণা। সন্তানহীনতা চিরকালীন এক সমস্যা। প্রাচীন ভারতে ছিল নিয়োগ প্রথা, দত্তক প্রথা ইত্যাদি। কিন্তু পিতার শুক্রাণু স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর গর্ভে চিকিৎসকরা স্থাপন করবেন এবং সেই সন্তানের জন্মের পর পিতা ও তার স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব নেবেন—এ একেবারেই নতুন ব্যবস্থা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ছাড়া যা সম্ভব হত না। ভবিষ্যতে হয়ত ক্লোনিং-জাতককে নিয়েও সংসার পাতবেন বাবা মায়েরা। সেও তো এক বিকল্প পরিবার, যা খোদ সৃষ্টিতত্ত্বকেই অস্বীকার করে গড়ে উঠবে।

পরিবারেব অন্যতম শর্ত হল যৌন একনিষ্ঠা। কার্যক্ষেত্রে তা শুধু মেয়েদের ওপর চেপে বসে এবং ছেলেরা চিরদিন ধরেই কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, পরকীয়ার কল্যাণে বিধিনিষেধমুক্ত। গণিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় খারাপ মেয়ে বলে আর যেসব 'একনিষ্ঠ' পুরুষেরা গণিকালয়ের নিত্যযাত্রী তারা চিহ্নিত হন না। দম্পতি সন্তানহীন হলে স্ত্রীকেই বাঁজা বলা হয়, পুরুষটির পরীক্ষা না করেই।

জীবন যত আধুনিক হচ্ছে, সম্পর্ক যত বিচলিত হচ্ছে ততই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভিত। কিন্তু বিকল্প পরিবারগুলি যেমন একদিকে সমাজতত্ত্বের পাঠ্যবইয়ের পাতায় উঠে আসছে, অন্যদিকে নড়বড়ে হয়েও পরিবার প্রতিষ্ঠানের অনন্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। বিকল্প খোঁজা হচ্ছে কিন্তু সত্যিকারের বিকল্প তৈরি হচ্ছে কতটা, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বার্জার এবং বার্জার বলেন যে বিকল্প খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ছোটো ছোটো 'বাচ্চাদের মুক্তিহীনতা উপহার দেয়।' বিকল্প খোঁজা চলছে চলবে। কিন্তু আসল রহস্য লুকিয়ে আছে লিঙ্গ বৈষম্যের ফাঁদে। পরিবার যদি সমানাধিকারের ওপর আস্থা রাখতে শেখে, বিকল্প খোঁজার দরকার হবে না আর। আসল সমাধান হবে তখনই যখন স্বামীরা আর স্ত্রীদের ওপর প্রভুত্ব ফলাবেন না, বন্ধু হয়ে উঠবেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদ

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোনো কোনো গোষ্ঠী বা তার জনসংখ্যার কোনো অংশ কখনো কখনো সেই জাতি বা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠাই এসব ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নিজ গোষ্ঠীর উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা থেকেও কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব বা মানসিকতা জন্ম নেয়।

আবার কোনো কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা / এবং সাম্রাজ্যবাদ নিজ স্বার্থ সাধনে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দেয়। কোনো রাষ্ট্রকে দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে বা সেই রাষ্ট্রে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্যে তারা সেই রাষ্ট্রের ভেতরে কোনো কোনো গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও আন্দোলন গড়ে তুলতে নানাভাবে উৎসাহ দেয় ও সাহায্য করে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে এই পথ নিতে পারে এবং নিয়ে থাকে।

সাধারণত দেখা যায়, নানারকম সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উপাদানকে অবলম্বন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে। এক বা একাধিক উপাদান ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় হতে পারে। এইসব উপাদানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, জনসংখ্যার কোনো অংশ বা কোনো গোষ্ঠীর মনে উপেক্ষিত বা অবহেলিত হওয়ার অনুভূতি, কারও মনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, জনসংখ্যার বৃহত্তর বা / এবং উন্নততর অংশের চাপে তার মধ্যে ক্ষুদ্রতর বা / এবং পশ্চাৎপদ অংশের বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি।

এই ধরনের মানসিকতা এবং আশঙ্কার অনুভূতি গড়ে ওঠার পেছনে নানা জাতির ইতিহাস, কারও বিলীন হয় যাওয়ার ইতিহাস কারও গিলে ফেলার ইতিহাস, কাজ করে। অস্তিত্বের বিপন্নতা নিয়ে বিপর্যস্ত কোনও গোষ্ঠীর মনে পড়ে যেতেই পারে আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ান'দের কথা অথবা অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের কথা। রেড ইন্ডিয়ানরা আর নেই। তারা বিলীন হয়ে গেছে বহু পরে এসে তাদের দেশ দখল করে নেওয়া অ্যাংলো স্যাকসনদের 'মূল স্রোতে'। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে—উভয় ক্ষেত্রেই 'অবাধ্য' আদিবাসীদের এক বৃহদংশকে হত্যা করা হয়েছে। বাকিদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলীন করে দিয়ে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে 'মূলস্রোতে'।

কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর মনে পড়ে যেতে পারে আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশের আদি ধর্মের কথা। প্রাচীন কিছু লোকাচার আজও সেসব সমাজে টিকে থাকলেও সে ধর্ম উধাও হয়ে গেছে। কোথাও তরবারি কোথাও বা রৌপ্যমুদ্রার দাপটে সে ধর্মকে সরে গিয়ে জায়গা করে দিতে হয়েছে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মকে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক বা আন্দোলনের দাবি বা লক্ষ্য দু'রকম হতে পারে। এক, রাষ্ট্রের মধ্যেই পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও সেই স্বীকৃতিকে কাঠামোগত রূপ দান। যেমন গোর্খাল্যান্ড বা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। দুই, রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপন। যেমন, রুশ দেশে চেচেনিয়া বা কানাডার কুয়েবেক অথবা ভারতের মণিপুরে কোনো কোনো গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলন।

ধর্ম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের এক প্রধান ভিত্তি। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। এই দাবি পূরণের সূত্র ধরেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে গড়ে তোলা হয় পাকিস্তান। বর্তমানে রুশ দেশের চেচেনিয়ায় ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে রুশ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্যে তীব্র সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রামে অসংখ্য চেচেন প্রাণ দিয়েছেন। বহু রুশ সৈন্যও প্রাণ হারিয়েছেন এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে। ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এমন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

ভাষা আর একটি বড় উপাদান। সর্বকালে সর্ব দেশেই মাতৃভাষার প্রতি মানুষের প্রাণের টান প্রবল। নিজের ভাষাকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গ ভাষাভাষীরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রচণ্ড অত্যাচার ও পীড়ন সে আন্দোলনকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। বরং তার ফলে আন্দোলন প্রবলতর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গড়ে তোলে ভাষাভিত্তিক এক সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। বিশ্বের আর এক প্রান্তে কানাডার অঙ্গরাজ্য কুয়েবেকেও চলছে প্রায় একই ধরনের আন্দোলন। কানাডার রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি। কুয়েবেকের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ফরাসি ভাষাভাষী। তাঁদের এক বৃহৎ অংশ কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফরাসি ভাষাভাষীদের জন্যে পৃথক এক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে চলেছেন।

ভাষার মতোই জাতিগোষ্ঠী বা জাতীয়তার বোধও বিচ্ছিন্নতাবাদের এক বড় উপাদান। এই বোধ থেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকগুলি জাতি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করেছে। ইউরোপের ইউক্রেন থেকে এশিয়ার উজবেকিস্তান পর্যন্ত অনেকগুলি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র এভাবেই গঠিত হয়েছে। একই ব্যাপার ঘটেছে যুগোশ্লাভিয়ায়। সেখানেও যুগোশ্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে এসে অনেকগুলি জাতি ম্যাসিডোনিয়া, বোসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।

কখনো আবার জাতীয়তা ও ধর্ম মিলে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়। সার্বিয়ার অন্তর্গত কোসোভোর অধিকাংশ মানুষ জাতি হিসাবে আলবেনীয়; ধর্মে মুসলমান।

সার্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে তাঁদের আন্দোলন একসময় গেরিলাযুদ্ধের চেহারা নেয়। কোসোভো থেকে খ্রিষ্টান সার্বরা বিতাড়িত হতে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদ কোসোভোর এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে যায়। একই ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিশ্বের অন্য এক প্রান্তে কুর্দদের মধ্যে এক ধরনের জাতিগত সংহতি গড়ে উঠেছে। ইরাক, ইরান ও তুরস্কের সীমানা যেখানে সংলগ্ন, সেই অঞ্চলেই, ওই তিনটি রাষ্ট্রে তাঁদের বাস। এই অঞ্চলটিতে তাঁরা তাঁদের জাতিসত্তার ভিত্তিতে তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্র, 'কুর্দিস্তান' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে চলেছেন। এ জন্যে তাঁদের অনেক দমনপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। অসংখ্য কুর্দের প্রাণ গেছে। তথাপি তাঁদের সংগ্রাম চলছে।

দেশের কোনো অঞ্চলের মানুষের বৃহৎ এক অংশ যদি মনে করেন, রাষ্ট্রের কোনো কাজ বা নীতির ফলে তাঁদের স্বার্থ বিপন্ন, তা হলেও বিচ্ছিন্নতার ঝোঁক গড়ে উঠতে পারে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের সময় ক্রীতদাস ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেলে রাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক অঙ্গরাজ্য ও বহু মানুষ বিদ্রোহ করে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়। দক্ষিণের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ক্রীতদাসদের শ্রম। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই উদ্যোগ ব্যর্থ করতে লিঙ্কনকে ফৌজ ব্যবহার করতে হয়। শুরু হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত, উভয় পক্ষের বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমেরিকার ঐক্য রক্ষিত হয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পরাস্ত হয়।

নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং কাম্য উন্নতি অর্জন করা যাচ্ছে না—এমন অনুভূতি থেকেও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরই দৃষ্টান্ত গোর্খাদের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ও আদিবাসীদের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। গোর্খাদের জন্যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আদিবাসীদের নিজস্ব রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিসগড় প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের ক্ষোভ প্রশমিত হয় ও আন্দোলনের অবসান ঘটে।

আবার রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোনো গোষ্ঠী বা জাতি যখন মনে করে বৃহত্তর ও উন্নততর গোষ্ঠীর চাপে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন, তাদের মনে যদি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা গড়ে ওঠে, তখন তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ বেছে নেয়। দেশভাগের পর ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যক বাঙালি উদ্বাস্তুর আগমন সেখানকার আদি অধিবাসী ত্রিপুরীদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে। তাদের আশঙ্কা হয়। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি জমিজমা সম্পত্তি সবই বিপন্ন। জাতি হিসাবে তারা বিলুপ্তির পথে। এই আশঙ্কাজাত মানসিকতা সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়। তারই অংশ হিসাবে বহু ত্রিপুরি 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা'-র মতো সংগঠনের নেতৃত্বে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

প্রায় এই ধরনেরই চিত্র দেখা যায় মণিপুরে। সেখানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী 'মণিপুর পিপলস্ লিবারেশন আর্মি' এমন সশস্ত্র কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে যে সেখানে প্রায় স্থায়ীভাবেই ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। একই ঘটনা ঘটছে নাগাল্যান্ডেও।

আসামে বোড়োদের মধ্যেও পশ্চাৎপদতা থেকে গড়ে ওঠা অসন্তোষকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। সে আন্দোলনের একাংশ গোর্খাল্যান্ডের মতো স্বায়ত্তশাসনের আয়োজন হওয়াতে অস্ত্র ত্যাগ করে শাসন ও উন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু আর এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অস্ত্র হাতে লড়াই করে চলেছে।

পশ্চাৎপদতার কারণে অসন্তোষ থেকে উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠে কামতাপুরি আন্দোলন। ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেই পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের একাংশ সংবিধানসম্মত অহিংস আন্দোলন করে গেলেও আর এক অংশ সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। বোড়োল্যান্ডে বা আসামে সহিংস আন্দোলনরত 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম'-র মতো নানা সংগঠনের সাহায্যে তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এবং সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের ট্রেনিং নেয়।

সাম্রাজ্যবাদের লম্বা হাত, রাজনীতির মারপ্যাঁচ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতালোভ, অন্যান্য রাষ্ট্রের বৈরিতা ইত্যাদি যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ, তেমনই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা, এক জাতি বা গোষ্ঠীর তুলনায় অন্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, অর্থনৈতিক-সামাজিক পশ্চাৎপদতা, তীব্র ও ব্যাপক বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিত্তিভূমি হয়ে ওঠে। বৈরি মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বার্থান্বেষী মহল এইসব পরিস্থিতি কাজে লাগিয়েই বিচ্ছিন্নতাবাদে উসকানি ও মদত দেয়। কাজেই এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারলে বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ যে তার ভিত্তিভূমির অনেকটাই হারাবে এবং তার ফলে রাষ্ট্র তথা দেশের সংহতি সুরক্ষিত হবে একথা বোঝা খুব কঠিন নয়।

বিজ্ঞাপন

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

সভ্যতায় বিজ্ঞাপনের ইতিহাস মাত্র-ই তিন হাজার বছরের। থিবসের পুরনো পুঁথি থেকে জানা যায়, ঠিক ততদিন আগে, পালিয়ে যাওয়া এক ক্রীতদাসকে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ওই নগরে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া পম্পেই নগরী ছাড়াও আথেন্সের রাস্তায় নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চিৎকার, রোমের প্রাচীরপত্র—এসবের কথাও আমরা জানি। কোনো বিষয় একাধিক জনের নজরে আনা যদি হয় বিজ্ঞাপনের মর্মবস্তু, তবে তা অবশ্য মানবসভ্যতায় আরো প্রাচীন ইতিহাসের দাবিদার। প্রস্তর যুগ থেকেই তার অস্তিত্ব। নজর কাড়া বা কাউকে কোনো তথ্য দেওয়ার স্তর থেকে বাণিজ্যিক তথ্যের জানান ও মনোযোগ আদায় করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা,—এই সমূহ বিবর্তনের নানা স্তরের যথাযথ হদিশ ও বিন্যাস, বিজ্ঞাপনের ইতিহাস-সন্ধানীদের কাজ আরো কঠিন করে দিয়েছে। বিবর্তনের সঙ্গেই মিশে আছে সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের বাস্তব প্রশ্ন। সেই যোগসূত্রের নাগাল পাওয়া ছাড়াও বিজ্ঞাপনের আড়ালে থাকা পণ্যের গুণ, উপযোগিতা, উৎপাদকের অস্থির, পরিবর্তমান মন ও উদ্দেশ্যকেও হিসেবে রাখতে হয়েছে সব ক্ষেত্রেই।

১৬০০ শতকের ইংলণ্ডে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার সংগঠিত উদ্যোগ প্রথম দেখা যায়। লন্ডনের সেন্ট পলসের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রাচীরপত্র দেওয়া হত। পরে তা ছড়াতে শুরু করে। তবে সেই সবই ছিল ব্যক্তিগত স্তরের কেনাবেচা সংক্রান্ত। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, পরিচারকের খোঁজ, ঘোড়া বা কুকুর বেচাকেনা, এরকম। এখন যাকে আমরা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বলি, তার মতো। বেশি উদ্যোগ দেখা যেত বই, ওষুধ আর ডাক্তারের জন্য। দাঁতকে মুক্তোর মতো ঝকঝকে করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তখনও ছিল। শতকের শেষ দিকে সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য বিকাশে বিজ্ঞাপনেরও স্থায়ী জায়গা হয়ে যায় জনমানসে, অর্থনীতিতে। বিজ্ঞাপনে প্রতিশ্রুতি ও মোহ ছড়ানোর বাড়াবাড়ি তখনও ছিল। বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্কেচ ছাপা হত সঙ্গে। যেমন, পালিয়ে যাওয়া পরিচারকের খোঁজ পেতে বয়ানের সঙ্গে থাকত একটি পেছন ফেরা মানুষের স্কেচ।

শিল্পবিপ্লব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিজ্ঞাপনে মৌলিক বদল আনে। সে সময় অত্যধিক কর দিতে হত বলে বিজ্ঞাপনের বিকাশ স্বাভাবিক হয়নি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি সত্ত্বেও। ১৮৫৩ ও ১৮৫৫ সালে দু দফায় যাবতীয় কর ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাহার

করে নিলে, সংবাদপত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যে বিজ্ঞাপনেরও রমরমা শুরু হয়। তবু দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দেওয়া, অন্যের পোস্টারে কালি ছিটিয়ে দেওয়ারও অন্ত ছিল না। শতাব্দীর শেষ দশকে সাময়িকপত্রে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী শরীরের ছবি ছাপা শুরু হয়, আকার-আয়তনেও বৈচিত্র্য আসে যা এতদিন সংবাদপত্র মালিকদের জন্য সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞাপনের প্রথাগত চেহারার, আয়তনের কোনো বদলে এই মালিকরা অরাজি ছিলেন। বিজ্ঞাপনে নিয়ন্ত্রণের আইনও চালু হয় ১৮৯৮ সালে, ইংল্যাণ্ডে। আধুনিক বিজ্ঞাপনের যুগ শুরু ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে। বাজারের সব শর্তই তখন বিজ্ঞাপনকে প্রভাবিত করতে থাকে, তার ব্যাপ্তিকেও নিশ্চিত করে। উৎপাদক গোষ্ঠীগুলি বাজারে নিজেদের পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য 'বিজ্ঞাপন' দিতে থাকে পাতাজোড়া, কখনো সমস্ত পাতা দাবি করে। বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র, এজেন্সি গড়ে ওঠা ছাড়াও সংবাদপত্রের নিজস্ব বিজ্ঞাপন দপ্তর, ম্যানেজার, কর্মী নিয়োগ—চালু হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থরক্ষার সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে সংবাদপত্রের বিক্রি সংখ্যার হদিশ পেতে অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন তৈরি হলে বিজ্ঞাপনের স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্বের কাল শুরু। অর্থনীতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই, যে বিজ্ঞাপন এতদিন ছিল তথ্যভিত্তিক, কখনো প্রতিশ্রুতি, তা মানুষের মনের গহনকে ছোঁয়ার দিকে ডানা মেলতে থাকে। মুদ্রণ-মাধ্যম ছাড়িয়ে প্রথমে রেডিও, পরে টেলিভিশনকে (১৯৫০) মাধ্যম করতে থাকে। শুরু হয় রাজনৈতিক আবেদনের বিজ্ঞাপন। সংগঠিত বিজ্ঞাপনের বয়স, সেই আধুনিক মাধ্যমগুলির সূত্রে, প্রায় অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশি। আমাদের আজকের বিজ্ঞাপনের উৎসমুখ, বিচার-বিশ্লেষণের উপকরণও সেই সঙ্গে। বিনোদন, তারকাদের ব্যবহার করা, স্পর্শকাতর ভঙ্গিমায় উপস্থাপন—সবমিলিয়ে শুধু পণ্যের বিক্রিতে ব্যস্ত একসময়ের বিজ্ঞাপন এখন জনরুচির নির্মাণে সবচেয়ে বেশি টাকা ও সময় খরচ করে। জনরুচি, পছন্দ ও ভোক্তা বা ক্রেতার অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করতে পারলে শেষ পর্যন্ত পণ্যের বিক্রি বাড়বে, এবং ওই নির্দিষ্ট পণ্য সেই বিক্রির তালিকার শীর্ষে থাকবে, এই লক্ষ্যে। বিজ্ঞাপনের বয়ান তৈরি হয়, নির্দিষ্ট একটি সঙ্কেত বা বার্তা দর্শক, পাঠক ও শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কখনো পেশ করা হয় একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনার পরিস্থিতি, যা থেকে রেহাই দিতে পারে বলে প্রচার করা হয় বিশ্বাস, ওই পণ্যের প্রতি। পেশ করা হয় তারকাদের (খেলার মাঠ এবং সিনেমা) শরীর, অবস্থান, বক্তব্য, পছন্দ। যে সমাজে বিপণন অন্যতম চালিকাশক্তি, অর্থনীতি আর রাজনীতিও সেই সমাজে বিজ্ঞাপনের আড়ালে থেকে এক পরাক্রান্ত শক্তিসম্মেলন গড়ে তোলে। যা সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপ্ত হতে থাকে।

বিপণন আর তখন বিপণনে থাকে না সীমিত। সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, শিক্ষাদীক্ষাতেও টান পড়ে। ভেঙে যায় কঠিনতম প্রতিরোধও, বিজ্ঞাপনের আবেদন ও বার্তার কাছে। আধুনিক সামাজিক সংযোগের ভাষা হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপনেরই ভাষা।

সমাজকে চেনা যায় তার বিজ্ঞাপনের ভাষা দিয়ে এক নতুন পথে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য, উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। উৎপাদন বজায় রাখতে হলে পণ্যের এক সর্বজনীন ও আকর্ষণীয় বাজার চাই। বিজ্ঞাপন সেই বাজারে পণ্যকে ক্রয়যোগ্য হিসেবে প্রচার করে। উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলে। বিজ্ঞাপনের সামাজিক ভূমিকার সেই শুরু। পণ্য বিক্রির কাজে ব্যবহার করা হয় মিথ, স্বপ্ন, ব্যক্তিমন যা ছুঁতে চায়, পেতে চায়। এক বস্তুবাদী সমাজ গড়তে চেয়ে, যে সমাজে বস্তুর বা পণ্যের ভোগই মূলকথা, স্বপ্ন বা মিথের ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন গড়ে তোলে এক যাদু বিশ্ব বা magic World. বস্তুগত উদ্দেশ্য পূরণ করতে ভাব, স্বপ্ন, কল্পনা, আশঙ্কার ব্যবহার, ওই যাদুবিশ্বের নির্মাণে ও এক আদর্শ জীবনযাপন পদ্ধতির উপস্থাপনে, এই স্ববিরোধ বিজ্ঞাপনে মিশে থাকছে। এই প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলা হচ্ছে সব ঐতিহ্যের বিস্তার, উপড়ে ফেলা হচ্ছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অভ্যাসের সব শিকড়।

বিজ্ঞাপনহীন কোনো পণ্যের কথা আজকের সমাজ ভাবতেই পারে না। বিজ্ঞাপনের ব্যাপকতা প্রচার মাধ্যমের অস্তিত্বেরও নিয়ন্তা। বিজ্ঞাপন এক গণতান্ত্রিকতার স্বাদ দেয় ক্রেতাকে। উচ্চবিত্তদের জীবনপ্রণালীও এখন বিজ্ঞাপনের সুবাদে সকলের জানা। কোনো একটি পণ্য কিনেও এক নিম্নবিত্ত ক্রেতা ওই জীবনপ্রণালীকে ছোঁয়ার সাধ পূরণ করতে পারে, স্বাদ পেতে পারে। তা সে কন্ডোম হোক, অথবা মদ, অথবা পোশাক। ক্রেতা শুধু পণ্যই কেনে না, কেনে সামাজিক মর্যাদা, সংকল্প, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সাফল্য, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, সেইসঙ্গে, বিজ্ঞাপনের মায়াবী জগতের মোহ। ধনতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ হিসেবে ভোগবাদকেই জীবনের আসল মানদণ্ড হিসেবে পেশ করে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপিত পণ্যটি কেনা এবং ব্যবহারের সূত্রে এ সমাজে ব্যক্তিও সামাজিক সম্মান বাড়িয়ে নিতে পারে। এই সূত্রে এক ধরনের সামাজিক সচলতাও বিজ্ঞাপনের অবদান।

বিজ্ঞাপন এ সমাজে শিল্পসৃষ্টির এক নতুন ক্ষেত্র। বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প-ই এই সমাজের 'official art'। শিল্পী, লেখক, গায়ক, খেলোয়াড় সবাই বিজ্ঞাপনের হাতে বন্দী, তাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই। বিজ্ঞাপন নিজে যেমন এক শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে, তেমনই শিল্পের অন্যান্য শাখার প্রচারেও সে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের এই সর্বত্রমুখিনতার মধ্যেও একটা আশঙ্কা থাকেই, তা প্রত্যাখ্যানের। জনগণ সবসময় বিজ্ঞাপনের ভাষা ও বয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ না-ও করতে পারে, এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপনদাতাকেও অহরহ সজাগ, সতর্ক, পরীক্ষায় মগ্ন থাকতে হয়। নতুন কৌশল খুঁজতে হয়। এই পুনর্বিবেচনা ও পুনর্নির্মাণ-এর space বা অবকাশ বিজ্ঞাপনদাতারাও মেনে নেন। বিজ্ঞাপন ও কেনাকাটার মধ্যে এই দ্বান্দ্বিকতা না থাকলে বিজ্ঞাপনেরও বিকাশ হয় না, সমাজও অচলায়তনের নমুনা হয়ে ওঠে। যা অসম্ভব।

বিজ্ঞাপন আমাদের জীবনের বহিরঙ্গের নির্মাতা। চেতনার দিকে যার হাত বাড়ানো। ধর্মীয় বিশ্বাস আর বিদ্যালয়ের চেয়ে এমন ব্যাপ্ত প্রভাব আর কোনো

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেই। এক সকাল থেকে পরের সকাল, সমস্ত গণমাধ্যম জুড়ে বিজ্ঞাপনের শাসন। অভিমুখ একটাই, ব্যক্তির মন। ধনতন্ত্রের ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠার পর গত ৫০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞাপনের জগতেও চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞাপনের বিকাশেও রয়েছে সেদেশের উৎপাদক সংস্থাগুলির ভূমিকা, অবশ্যই নিয়ন্তার। মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতায়, বয়ানের সত্য-মিথ্যায়, স্বাদুতায়-স্বাদহীনতায়, জীবন ও মূল্যবোধের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারে বিজ্ঞাপন আমাদের অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে। তবে এত চর্চার মধ্যেও কিছু অবিবেচনা থাকে বিজ্ঞাপনদাতারও। খাওয়ার সময় কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে রেহাই-এর বিজ্ঞাপন থেকে দর্শক বা শ্রোতাকে কে বাঁচাবে?

বিশ্বায়ন

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বায়ন শব্দটিতে একটি বিশেষ মাত্রা এসে গেছে। বিশ্বায়ন চিন্তার জগতে হতে পারে, বাণিজ্যের জগতে হতে পারে, প্রযুক্তির জগতে হতে পারে, এমনকী লোকচলাচলের ক্ষেত্রেও হতে পারে। কিন্তু এই দশকে এর বিশেষ অর্থ মহাজনি মূলধনের বিশ্বায়ন।

উনিশ শতকে বাষ্প, বিশ শতকের প্রথমে বিদ্যুৎ এবং শেষের দিকে মাল্টিমিডিয়া (কম্পিউটার, টেলিফোন আর টেলিভিশনের একসূত্রে ব্যবহার)—মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিশ্বায়নের গতি দ্রুত হয়। পরিব্রাজকেরা আগে পদপরিক্রমায় বা পশুপৃষ্ঠে একদেশ থেকে অন্যদেশে যেতেন, চিন্তার আদানপ্রদান করতেন। বণিকেরা নৌযান, বাষ্পীয় জাহাজ, রেল, উড়োজাহাজে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য করতেন। বলা চলতে পারে, সভ্যতার জন্ম থেকেই বিশ্বায়ন শুরু, মানুষ কখনোই একস্থানে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু গতিবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বায়নের চরিত্র পালটে যায়।

আধুনিক বিশ্বে ইউরোপ এবং পরে আমেরিকা অর্থনীতি ও রাজনীতির স্বার্থের নিজের দেশ জুড়ে অন্যদেশে প্রভাব বিস্তার শুরু করে—আরম্ভ হয় উপনিবেশ স্থাপন। কখনো ধর্মপ্রচারের সূত্রে, কখনো বাণিজ্যের সূত্রে, এই বিদেশাভিমুখ শেষপর্যন্ত রাজনীতি ও অর্থনীতির অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

ধনতন্ত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুনাফা যে অর্থনীতিতে প্রাথমিক গুরুত্ব পায়, পুঁজি প্রথমে একচেটিয়া পরে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে দাঁড়ায়। নিজের দেশে বাজারে চাহিদা কমে যায় কেননা সমৃদ্ধির ফলে সেসব দেশের অধিবাসীরা সুখ-সুবিধার প্রাচুর্যে বাস করে, নিজের দেশে শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে যায় কেননা তারাও কিছু পরিমাণে সেই সমৃদ্ধির অংশীদার। অন্য দিকে গরিবদেশে চাহিদা বেশি, কেননা সেখানকার অধিবাসীরা সুখসুবিধা তুলনায় কম পেয়েছে। সেসব দেশে মজুরিও কম। অতএব বাজারের খোঁজে পুঁজিসমৃদ্ধ দেশ (সংখ্যায় অল্প) গরিব দেশের (সংখ্যায় বৃহৎ) দিকে ধাওয়া করে। গরিব দেশে বাজার দুর্বল, সেই বাজার সবল করে সেখানে বাণিজ্য বৃদ্ধি পুঁজির ধর্ম। গরিব দেশে পুঁজি স্বল্প, পরে তারাও আমন্ত্রণ জানায় বিদেশি পুঁজিকে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বিশ্বায়নে কিছু ভাঁটা এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে, সমাজতান্ত্রিক দেশ আর ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া

সর্ব অর্থেই কমে যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে যেগুলো সবে স্বাধীন হয়েছিল, তারাও স্বয়ম্ভর হওয়ার চেষ্টায়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। অর্থাৎ বাণিজ্যে, রপ্তানি ও আমদানিতে, বিদেশি পুঁজির লগ্নিতে, নানারকম বাধানিষেধ আরোপ করেছিল। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানে ১৯৯০-এ দশকে, এই বাধানিষেধ বহুলাংশে অপসারিত হয়েছে। কারণ, গরিব দেশের অর্থনীতিতে পুঁজির অভাব, ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়ছিল। বাধানিষেধ উঠে যাওয়ায়, বিদেশি পুঁজির যাওয়া-আসা বহুলাংশে বেড়ে যায়।

যে বিশ্বায়নের কথা সম্প্রতি সবসময়েই শোনা যায়, সেটা এই মুক্ত অর্থনীতির বিশ্বায়ন। এর ফলে সমৃদ্ধ দেশগুলো খুশি হবে, কারণ তাদের অলস পুঁজি লগ্নির ক্ষেত্র পাবে, বিদেশের বাজার তাদের হাতে আসবে। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন কাম্য হলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশ্বায়নের ফল শুভ হয় না। কারণ সবল সক্ষম দেশগুলোই এর ফায়দা তোলে, তাদের চাপে পড়ে দুর্বল দেশগুলো আত্মরক্ষার নানান বেড়া ভেঙে দিতে বাধ্য হয়। পুঁজির বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্য মুনাফার বৃদ্ধি, অন্তত হ্রাসের সঙ্কোচন—মানবকল্যাণ এর লক্ষ্য নয়। সেইজন্য যেসব দেশ বিশ্বায়নের পথে এগোচ্ছে, তাদের মধ্যে সক্ষম দেশ বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণ করার সময়, সতর্ক থাকে যাতে নিজেদের স্বার্থহানি না হয়, এবং সমৃদ্ধ দেশগুলোকেও চাপ দিতে থাকে যাতে সেসব দেশ তাদেরও আমদানি-রপ্তানির বেড়া ভাঙতে বাধ্য হয়।

পুঁজির বিশ্বায়নে অবশ্যই সহগামী এবং সহযোগী তথ্য আদানপ্রদানে অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত উন্নতি। টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইলেকট্রনিক মেল, ইন্টারনেট বিশ্বকে আয়ত্তে এনেছে, মুহূর্তমধ্যেই বিশ্বের যেকোনো কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। পুঁজির বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির বিশ্বায়নে, বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও লোপ পেতে পারে। বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে বিশ্বায়ন আগেই শুরু হয়েছিল, আজ তার গতি তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও মুছে যেতে বসেছে। একের অনলে বহুকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তবে সেই আগুন থেকে কোনো 'বিরাট হিয়া'র জন্ম হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

বুর্জোয়া

অমিয়কুমার বাগচী

বুর্জোয়া একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ গোড়াতে ছিল ইউরোপের মুক্ত নগরের মুক্ত নাগরিক। মুক্ত নগর মানে যার ওপর সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য নেই, আর মুক্ত নাগরিক হল তার মধ্যে যারা কারও দাস নয়, এবং যারা নগরপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বুর্জোয়ার সঙ্গে পার্থক্য ছিল সামন্ত প্রভুদের এবং সাধারণ চাষির অথবা সাধারণ কারিগরদের। এদের ওপর নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিগড় চাপানো ছিল।

ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া কথাটার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি। ব্যবসায়ী সম্বন্ধে তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির উন্নাসিকতা ছিল, বিশেষ করে যদি সেই ব্যবসায়ী অভিজাতদের আচার ব্যবহারের নকল করে। মলিয়েরের *বুর্জোয়া জাঁতিলোম* অর্থাৎ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ব্যঙ্গনাটকটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' গল্পে মহিম হালদারের প্রতি জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের অবজ্ঞাপ্রদর্শন একই শ্রেণির মনোবৃত্তির পরিচায়ক। দুই ক্ষেত্রেই ইতিহাসের অট্টহাসি নেপথ্যে শোনা যায়, কারণ এই নবধনী ব্যবসায়ীই উঠতি শ্রেণি এবং সামন্ত প্রভুরা অস্তায়মান সূর্য।

বুর্জোয়া কথাটা নতুন মাত্রা পেল মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের বিপ্লবের ধারণা এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থেকে। ১৮৪৪-৪৫ সালে লেখা কিন্তু অপ্রকাশিত *German Ideology* বইতেই তাঁরা বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংল্যান্ডে সতেরো দশকে দুটি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছিল। ১৬৪০-এর দশকে পার্লামেন্ট ও রাজার দলের মধ্যে যুদ্ধে পার্লামেন্ট বিজয়ী হয় এবং রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়। ১৬৮৮ সালে চার্লসের ছোটো ছেলে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের প্রধান দোষ ছিল পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করে রাষ্ট্রের মদতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। এই পার্লামেন্ট-রাজা, প্রোটোস্টান্ট ধর্ম-রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সংঘাতের তলেতলে যে বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে ক্ষীয়মাণ সামন্ততান্ত্রিক প্রথার শেষ লড়াই চলছে এই মতের জোরালো প্রবক্তা ছিলেন মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স। এইভাবে তাঁরা ১৭৮৯ সালে যে ফরাসি বিপ্লবের শুরু তাকে বুর্জোয়া বিপ্লব নামে অভিহিত করেছিলেন।

বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্য ঘটে। তার সঙ্গে সাম্য, মুক্তি ইত্যাদি কথাগুলোও নতুন মাত্রা পায়। কিন্তু সব বুর্জোয়া বিপ্লব সমান নয়। বহুক্ষেত্রে

বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাপ্ত থাকে, পুরোনো সামন্ত বা জমিদার শ্রেণি শাসনযন্ত্রের অংশী হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৪৮ সালের বেশির ভাগ ইউরোপীয় বিপ্লবই এই ধরনের অসমাপ্ত বিপ্লব বা প্রতিক্রিয়ার শাসনে শেষ হয়েছিল।

কিন্তু বুর্জোয়া কারা? সেই শ্রেণির চেতনার চরিত্র কী? বুর্জোয়াদের মধ্যেও শ্রেণি বিভাগ আছে কিনা—এই সব প্রশ্ন মার্ক্স এঙ্গেল্‌সের লেখার পর থেকে বহু বিপ্লবপন্থীকে এবং অগণিত সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিককে তাড়া করে বেরিয়েছে। জার্মানির ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে যে-জার্মানি উনিশ শতকের শেষে ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ হয়ে দাঁড়াল তার শাসকশ্রেণি কি বুর্জোয়া ছিল? না তারা ছিল বুর্জোয়াশিখণ্ডী ধরে পুরানো সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ? না কি সেটা এর বিপরীত ছিল—কাউন্ট, ব্যারন ইত্যাদিদের সামনে রেখে আসলে ক্রুপ, ফেবার, হেবাররাই দেশটার শাসন পরিচালনা করত?

অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের একটি প্রকৃতি হল যে বুর্জোয়াচেতনা সেখানে ধীরে, নকলনবিশি করে বিকশিত হয়। সেই ধরনের পরিবর্তনকে আন্তোনিও গ্রামসির পথ অনুসরণ করে কেউ কেউ 'নিস্তেজ বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আখ্যা বদলালেই সমস্যার প্রকৃত বিশ্লেষণের দায় চলে যায় না। ভারতবর্ষের বুর্জোয়া এত বেশি পরমুখাপেক্ষী কেন এ প্রশ্নের উত্তর নতুন করে খুঁজতে হয়।

মাও জে-দং চীনা ধনতন্ত্রীদের দুভাগে ভাগ করেছিলেন—মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর জাতীয় অথবা স্বাতন্ত্র্যমুখী বুর্জোয়া। তিনি একথাও বলেছিলেন দেশের মধ্যে সমাজবিপ্লবের ধারা যদি প্রখর থাকে বহু মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী হয়ে যাবে। আর বিপ্লব স্তিমিত হলে অনেকেই বিদেশি পুঁজির দালালি করতে নেমে যাবে। বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র একই সময়ে দেশে একভাবে এবং বিদেশে অন্যভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ইংল্যান্ডের যে বুর্জোয়া শ্রেণি রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারাই আবার ছিল আফ্রিকা থেকে বন্দী করে ক্রীতদাস বেচার ব্যবসায় সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বণিকগোষ্ঠী। ইংল্যান্ডের প্রগতিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণির মুখপাত্র জেম্‌স্ এবং জন স্টুয়ার্ট মিল ভারতে ইংরেজদের স্বৈরতন্ত্রের মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন।

বুর্জোয়াশ্রেণি বহুক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া এবং সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের প্রক্রিয়ার প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাতিন আমেরিকায় সামরিক এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসন দেশি বুর্জোয়া এবং বিদেশি (প্রধানত মার্কিন) সরকারের মদতে প্রবর্তিত হয়েছে।

বুর্জোয়া সমাজকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স্, লেনিন, ট্রটস্কি এবং মাও জে-দং। পূর্ব ইউরোপে যে রাষ্ট্রসর্বস্ব সমাজতন্ত্র তৈরি হয়েছিল তা আজ ধূলিসাৎ। কিন্তু গরিব দেশে একদিকে পশ্চাদ্‌মুখী বুর্জোয়া এবং জমিদারশ্রেণি, অন্যদিকে বিদেশি শক্তির অত্যাচার থেকে মুক্তির সংগ্রাম আজও চলছে। মার্ক্সবাদী না হলেও রুশোর মতো করে আজও বলা যায় সাধারণ মানুষ অধিকাংশ দেশেই মুক্তির আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা যদি সেই আলো না দিতে পারে, মানুষ বিকল্পের স্বপ্ন দেখতেই থাকবে।

বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

সত্যবতী গিরি

বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল গুপ্ত বংশীয়দের রাজত্বকাল থেকে। কিন্তু সেই বৈষ্ণবধর্ম পৌরাণিক। আর বাংলাদেশে সেন রাজাদের আমলে যে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটল তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ভাগবত। কিন্তু সেন রাজত্বে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* পুরাণাশ্রয়ী কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গগুলোকে গ্রহণ করলেও, তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগে পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের কোনো চিহ্ন থাকল না। রাধাকেন্দ্রিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার যে কাব্যটি তিনি রচনা করলেন কবির নিজের দাবি অনুযায়ী সেটি একই সঙ্গে ভক্তি ও প্রেমের কাব্য। এই কাব্যে রাধা নায়িকা হলেও রাধাকে জয়দেব কিন্তু একবারও দেবী বলেন নি। বরং তাঁর রাধা প্রেমের গৌরবে দেবীদেরও পরাজিত করতে পারেন এই মন্তব্যটি করেছেন। তার আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাধাবাদ স্বীকৃত হলেও জয়দেবের মধ্যে যে একটা দ্বিধা ছিল, সেই প্রমাণই এইভাবে পাওয়া যায়। জয়দেবের সমকালীন সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এ আর তারও আগে বাংলাদেশে সংকলিত *সুভাষিতরত্নকোষ*-এ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সে শ্লোকগুলো পাওয়া যায় তাতে শুধু মধুর রস নয়; বাৎসল্যরসের আভাসও পাওয়া যায়। *সুভাষিতরত্নকোষ*-এ কৃষ্ণের শৈশবকালের বর্ণনাযুক্ত একটি শ্লোক সেন পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের প্রাকরূপ। বিনিদ্র দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের নিদ্রাকর্ষণের জন্য জননী তাকে শোনাচ্ছেন রামচন্দ্রের কথা এবং তাতে শিশুকৃষ্ণের মুখে দেখা দিয়েছে স্মিতহাস্য। নিজের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণ এখানে সচেতন হলেও জননী যশোদা মানবী মাতার মোহেই আবদ্ধ। তাঁর বাৎসল্যের স্ফুরণ অকৃত্রিম।

এই ধরনের আর একটি পদ দেখি, জননী যশোদা পুত্র কৃষ্ণকে বলেছেন হিংস্র জন্তুর সামনে পড়লে পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করতে। মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ অধর দংশন করে মৃদু হাস্য করলেন। এটিও অনুরূপ ভাব প্রকাশক। এই শ্লোকটি নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ কর্তৃক রচিত। অভিনব গুপ্ত তাঁর লোচনে এটিকে উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুরূপ ভাবের পদেও দেখি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বর্যভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

পরবর্তী সময়ে *সদুক্তিকর্ণামৃত* সংকলক শ্রীধর দাস কৃষ্ণলীলা নিয়ে অজস্র পদ সংকলন করেছেন। *কৃষ্ণকৌমারম্, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, কৃষ্ণযৌবনম্, বেণুনাদ, কৃষ্ণভুজ, গোবর্দ্ধনোদ্ধার, গোপীসন্দেশ* প্রভৃতি অংশে ভাগবত কাহিনীর বিচিত্র প্রসঙ্গকেই কবিতায়

রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি অসামান্য পদ পাওয়া যায়। যে পদটির রচয়িতা কবি উমাপতি ধর—

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াম্
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য
বিশ্বং পায়াণ্মসৃণ যমুনাতীর বাণীর কুঞ্জে
স্বাভীরস্ত্রীনিভৃতরচিত ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ।

[*সদুক্তিকর্ণামৃত*; দেবপ্রবাহ / ৬১ / ৩০১]।

এই একটি পদেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় দ্বারকালীলার পাশাপাশি বৃন্দাবনলীলার চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি উমাপতি ধর। তবে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিও এরা বাদ দিতে পারেন নি। আর এই ভক্তিভাবুকতারই প্রতিফলন দেখা গেছে চৈতন্যপূর্ব পদাবলিকার বিদ্যাপতির সৃষ্টিতে। আসলে তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী মধ্যযুগের বাংলাদেশে চৈতন্য আবির্ভাবের আগেই ব্রাহ্মণেরা নতুন করে নিজেদের ধর্মকে রক্ষণশীল করে তুলতে চাইলেন। সেই রক্ষণশীলতার দুইমুখ—একদিকে নব্যস্মৃতি শাস্ত্রের চর্চা অন্যদিকে লৌকিক দেবদেবীর অভ্যর্থনা। এছাড়া চৈতন্যপূর্বযুগের বাংলার বৈষ্ণবধর্ম কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তন্ত্রসাধকদের কাছে।

এই পটভূমিতে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের যে সংস্কার ঘটালেন সেখানে অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান আর ধর্মীয় আড়ম্বরের পরিবর্তে শুদ্ধ নির্মল সহজ আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি হল। শুধু তাই নয়, তার 'চণ্ডালহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ' এই একটি সিদ্ধান্তই আধ্যাত্মিক স্তরে গণতান্ত্রিকতার সূচনা করল। মানুষ আর সমাজ হয়ে উঠল গতিশীল। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ হিন্দুধর্মের আর হিন্দু সমাজের নানা দোষ ত্রুটি আর দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। আর এই দোষ ও ত্রুটি দুর্বলতা ঘটিয়ে তুলেছেন বিদ্যার অহংকার আর অর্থের অহংকারে স্ফীত সমাজের উচ্চকোটি মানুষেরা। চৈতন্যদেব এরই মূলে আঘাত হানলেন। তাঁর বৈষ্ণবধর্ম কীর্তনপ্রধান আনুষ্ঠানিকতাবিহীন প্রাণময় ধর্ম হিসেবে গড়ে উঠল।

কিন্তু চৈতন্যদেবেরই নির্দেশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রূপ গোস্বামীর নেতৃত্বে অন্য পাঁচজন গোস্বামীর সহায়তায় আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো পণ্ডিতের সক্রিয় প্রবল সহযোগিতায় গড়ে উঠল তার মধ্যে স্পষ্টতই পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে। সর্বপ্রথমে যেটি উল্লেখ করার বিষয় তা হল পুরুষসিংহ চৈতন্যের রাধাভাবোদ্যুতিসুবলিত পরিপূর্ণ প্রেমের দেবতায় রূপান্তর। রাধার প্রাধান্যও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এই নবনির্মিত ভক্তিদর্শনে রাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ নায়িকাই শুধু নয়, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও বটে।

চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবধর্মে এমনকি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ বাসের সময়ের যে বৈষ্ণব ধর্ম তাতে কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব যুক্ত হয়ে আছে। এর পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যাপতির 'পদাবলি'র সঙ্গে সঙ্গে মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যেও। চৈতন্যপূর্বযুগে বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি কৃষ্ণকথামূলক কাব্যের জোয়ারও লোকায়ত সাহিত্য আর ধর্মীয়

পরিমণ্ডলকে প্লাবিত করেছিল। এর পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। কিন্তু চৈতন্যদেবের নির্দেশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গড়ে উঠল তার দর্শন এমনকি সাহিত্যও আলাদা ধরনের। চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে এ বৈষ্ণবধর্মের যে রূপান্তর ঘটল চৈতন্যদেব কি প্রকৃতই তাই চেয়েছিলেন? রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আর *উজ্জ্বলনীলমণি* সনাতন গোস্বামীর *বৃহৎভাগবতামৃত* আর জীব গোস্বামীর *ষট্‌সন্দর্ভের* পাশাপাশি কাব্যনাটকও লেখা হল অনেক। রূপ গোস্বামী লিখলেন *বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী*, রঘুনাথ গোস্বামী রচনা করলেন *মুক্তাচরিতাম্* নামে চম্পু কাব্য। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের চৈতন্যব্যক্তিত্বমুগ্ধ রায় রামানন্দ লিখলেন জগন্নাথবল্লভ নাটক। যতদূর তথ্য পাওয়া যায় চৈতন্যদেব নবদ্বীপে যাত্রার ঢঙেই বৈষ্ণবীয় বিষয় অবলম্বন করে লোক নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। এমনকি নিজেও তাতে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী ও রায় রামানন্দের এইসব নাটক পুরনো সংস্কৃত নাটকের ছাপেই তৈরী হয়েছে। এরফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সর্বভারতীয় বিস্তার হয়ত ঘটেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে একধরনের কৃত্রিমতা তৈরী হয়েছে।

সাধারণভাবে বৈষ্ণবধর্মে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি। চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণবধর্মে জাতিভেদ প্রথাকেই অস্বীকার করলেন। কিন্তু *হরিভক্তি বিলাস*-এর মতো পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রন্থে আবার জাতিভেদ প্রথাকে ফিরিয়ে আনা হল। পঞ্চোপাসক হিন্দুদের অন্যতম ছিলেন বৈষ্ণবরা। কিন্তু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম একেবারেই পৃথক একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় শাখা হিসেবে প্রবল গুরুত্ব অর্জন করল।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার যে বিস্তার দেখা যায় সেই কৃষ্ণকাহিনী চৈতন্যদেবও ভাগবত থেকে গ্রহণ করলেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ দিক থেকে এনেছিলেন বিল্বমঙ্গলের *কৃষ্ণকর্ণামৃত*। নবদ্বীপের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিরুদ্ধবাদীদের অতিক্রম করে চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে শুধু ঐশ্বর্যময় পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকেও বর্জন করা হয়েছে, প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভক্তিকে। আর মধ্যযুগে পাণ্ডিত্য ছিল সংস্কৃত ভাষা নির্ভর। অভিজাত হিন্দুদের পাঠ্যতালিকার যে বিবরণ মধ্যযুগের বিভিন্ন টেক্সট থেকে পাওয়া যায় তাও এই তথ্যকে সমর্থন করে। চৈতন্যদেব এই প্রচলিত পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী হওয়ায় তাঁর গড়ে তোলা বৈষ্ণবধর্ম বাংলা ভাষায় নিজেদের আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করলেন চৈতন্যজীবন সাহিত্য ও পদাবলি সাহিত্যের। অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নেতৃস্থানীয় বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা তাঁদের সর্বভারতীয় ধর্মের সুদৃঢ় কাঠামোয় তৈরির জন্য আবার সংস্কৃত ভাষাতেই ফিরে গেলেন। শ্রীচৈতন্যের উদার জাতিভেদবর্জিত মানবতার মূলমন্ত্র নির্ভর বৈষ্ণবধর্মের পরবর্তী উজ্জ্বল ও কৃত্রিম সংস্করণ হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম।

আমরা জানি চৈতন্যদেব নিজেই খোলাবেচা শ্রীধরের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। শাঁখারি, গয়লা, সোনার বেনে, মালী প্রভৃতি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দেখা যায় সমাজের অভিজাত অনেক মানুষেরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে

প্রাণহীন গোস্বামী শাস্ত্রের অনুসরণ গোবিন্দদাসের পর থেকে বৈষ্ণবকবিতা ও সংগীতকে নিষ্প্রাণ তত্ত্ব সর্বস্ব করে তুলল। এছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মধুর রসের আতিশয্য গৌরচন্দ্রিকার কঠোর সাবধানতা সত্ত্বেও এক ধরনের যৌনতায় পরবর্তী বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মান্দোলনের নানা বিচিত্র বিস্তার চৈতন্য পরবর্তী যুগে দেখা যায়। যেমন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আনুষ্ঠানিকতাবিহীন বৈষ্ণবধর্মের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে কৃত্রিম ও অভিজাত উত্তরণই সমাজের উচ্চতর গোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আর এঁদেরই দাক্ষিণ্যপুষ্ট বৈষ্ণব মহান্তরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর এক কৃত্রিম সাহিত্য নির্মাণ করতে থাকলেন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। অন্যদিকে এরই প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের উপভোগ্য কৃষ্ণলীলা কথা নিয়ে লেখা হতে লাগল অজস্র কৃষ্ণলীলামূলক আখ্যানকাব্য। আরও পরবর্তী সময়ে লোকায়ত ও পৌরাণিক কৃষ্ণলীলাকথার টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে রচিত হতে থাকল নানা ধরনের ছোট ছোট অভিনয়যোগ্য পালা। এরই উপর ভর করে গড়ে উঠল বাংলা লোকনাট্য ধারার বিশিষ্ট শাখা—কৃষ্ণযাত্রা।

চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কিছুটা রূপান্তরিত করে নিয়ে তৈরি হল রাধাতন্ত্রের মতো আরেক বিচিত্র ধর্মাশ্রয়ী শাস্ত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধা যেহেতু কৃষ্ণের শক্তি সেই কারণেই কৃষ্ণতন্ত্রসাধক শক্তিসাধনাই তার মূল লক্ষ্য। এই ধরনের বক্তব্য এইসব তন্ত্রকথায় পরিবেশিত হল অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিন্নতর আকার পরিবর্তনই এর মধ্যে দেখা দিল—একথাই নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এছাড়া সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব, বৈষ্ণবধর্মের নানা শাখা উপশাখার ক্রমান্বয়ী বিস্তার এবং সর্বশেষে পশ্চিমী সংস্কৃতির এক বিচিত্র বৈষ্ণবীয় উত্তেজনা এখন একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ধর্মীয় উন্মাদনার নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই পাশাপাশি বাংলার বিচিত্র বৈষ্ণব মেলার, নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত বিচিত্র বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যপ্রভাবের নানাসূত্রকে যেমন ধারণ করে আছে, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ধ্বংসাবশেষকেও এখন বহন করে নিয়ে চলেছে।

বোধ ও বোধিবিজ্ঞান

অমিতা চট্টোপাধ্যায়

প্লেটোর সময় থেকেই আমাদের মানস অবস্থা বা বৃত্তিগুলোকে তিনভাগে ভাগ করার প্রথা চলে আসছে। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক*-এ মনের তিনধরনের ক্রিয়ার কথা বলেছিলেন—ইচ্ছাপ্রসূত, যুক্তিপ্রসূত ও আবেগপ্রসূত। পরবর্তীকালে কান্টও অভিজ্ঞতামূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচনাপ্রসঙ্গে মানসিক বৃত্তিকে তিনপ্রকারে বিভক্ত করেছিলেন : ইচ্ছামূলক, জ্ঞানমূলক ও আবেগমূলক। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান ও দর্শনে জ্ঞানমূলক বৃত্তিগুলো সবসময়েই উপস্থাপিত হয়েছে ইচ্ছামূলক ও আবেগমূলক বৃত্তির বিপরীত কোটিতে, যদিও মনের সামগ্রিক আলোচনায় এই তিন বৃত্তিরই একত্র বিবেচনা প্রয়োজন। যে সকল মানস প্রক্রিয়াকে সাধারণ জ্ঞানমূলক বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই বর্গটিকে বোঝানোর জন্য আমি 'বোধ' শব্দটি ব্যবহার করব এবং এ-সকল প্রক্রিয়া যে-বিজ্ঞানের বিবেচ্য সেই বিজ্ঞানকে 'বোধবিজ্ঞান' নামে উল্লেখ করব। তাহলে 'বোধ' হল সে সকল মানস প্রক্রিয়ার বর্গনাম যার সাহায্যে যে কোনো প্রাণী তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে অবহিত হয়।

অন্নমভট্টর *তর্কসংগ্রহদীপিকা*-র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে 'বোধ', 'বুদ্ধি', 'প্রত্যয়', 'প্রতীতি', 'মতি', 'সংবিৎ', 'উপলব্ধি' প্রভৃতি 'জ্ঞান'-এর পর্যায় শব্দ। এই প্রতিটি শব্দেরই কিন্তু সাধারণ বাংলায় নির্দিষ্ট প্রয়োগ আছে। যেমন প্রচলিত বাংলায় 'বোধ' শব্দটি অনেকসময়েই 'অনুভূতি'র সমার্থকরূপে গৃহীত হয়। তবুও অন্যান্য পর্যায় শব্দগুলোকে বাদ দিয়ে 'বোধ'কেই পারিভাষিক ব্যবহারের জন্য বেছে নেওয়া হল। বোধ-বর্গের প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে বুদ্ধি (ইনটেলিজেন্স) ও উপলব্ধি (আন্ডারস্ট্যান্ডিং)—এই দুইয়েরই ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এবারে সেই প্রক্রিয়াগুলোর একটা তালিকা তৈরি করা যাক।

মনোবিজ্ঞানী ও বোধবিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যয় গঠন, অবধারণগঠন, নির্ধারণ ও যুক্তিপ্রয়োগকে বোধের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রত্যয় গঠন ও অবধারণ গঠনকে চিন্তনের অঙ্গরূপে এবং যুক্তিপ্রয়োগ, নির্ধারণ ও সমস্যাসমাধানকে চিন্তনের প্রকাররূপে বিবেচনা করা হয়। ইন্দ্রিয় সংবেদনকে বোধের অন্তর্গত করা যায় কিনা এ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিবাদ চলে আসছে। তবে প্রত্যক্ষণ সংবেদনভিত্তিক হওয়ার দরুণ প্রকল্পিত উত্তেজক-উত্তেজক সংযোগ অথবা সংবেদনমূলক অনুষঙ্গের

সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে গেস্টাল্ট্ মনোবিজ্ঞানীরা বোধ বলতে বোঝেন প্রত্যক্ষণগত সংগঠনকে, যা কিনা প্রাণীদের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা ব্যাখ্যা করার জন্য অনুমান করা হয়।

এবারে খুব সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক বোধের অন্তর্গত প্রক্রিয়াগুলোকে। যখন বাইরের জগৎ থেকে কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কোষে আঘাত করে তখন যে সরল অনুভূতির উদ্ভব হয় তাকেই সংবেদন বলা হয়। যেমন, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, আলো, তাপ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হলে সংবেদন উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষণ হল সংবেদনভিত্তিক জটিলতার প্রক্রিয়া। সংবেদনকে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করে অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে উপস্থিত সংবেদনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করে বস্তুর বিশদ পরিচয় পাওয়াকেই বলে প্রত্যক্ষণ। সংবেদন একটি অসংগঠিত প্রতিক্রিয়া কিন্তু প্রত্যক্ষণ একটি সংগঠিত প্রতিক্রিয়া। মূলত প্রত্যক্ষণের সাহায্যে প্রাপ্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্দীপনই হল স্মৃতি। স্মৃতির দুটি রূপ : পুনরুদ্রেক (রি-কল) ও প্রত্যভিজ্ঞা (রেকগনিশন)। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে চিন্তনকে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রত্যক্ষণমূলক আচরণরূপে গণ্য করা হয়। সাধারণত কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে চিন্তার সূত্রপাত হয়, সমস্যার কারণ হল একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু তথ্যের অভাব। চিন্তক প্রদত্ত তথ্য থেকে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করেন। শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য চিন্তক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট প্রতীক বা প্রতিরূপ ব্যবহার করেন এবং সে সমস্ত প্রতিরূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছকে সাজিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। সাম্প্রতিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা এই জটিল প্রক্রিয়াকেই চিন্তন বলে থাকে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত এ-সকল প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল এবং এ সকল প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ উৎপন্ন বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোচনা হত জ্ঞানদর্শনে। প্রথমদিকে মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানদর্শনের মধ্যে কোনো প্রাচীর ছিল না। কিন্তু পরে জ্ঞানদর্শনে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব ক্ষতিকর মনে করা হয় এবং জ্ঞানদর্শন মনোবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছেদের পেছনে ফ্রেগে ও লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের অবদান ছিল অনেকখানি। যাই হোক, এর ফলে জ্ঞানদর্শন জ্ঞান ও বিশ্বাসের উৎস সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বিরত হয়ে, জ্ঞান ও বিশ্বাসের স্বরূপ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমাসংক্রান্ত আলোচনায় আবদ্ধ থাকে। অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতি পরিত্যাগ করে জ্ঞানদার্শনিকেরা অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির সাহায্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করতে থাকেন।

এর মাঝখানে পঞ্চাশের দশকে আবিষ্কৃত হয় পরিগণক বা কম্পিউটার। মনোবৈজ্ঞানিকেরা কম্পিউটারের ক্ষমতায় প্রভাবিত হয়ে বোধেরও ব্যাখ্যা দেন পরিগণকের ক্রিয়ার আদলে। পরিগণক কাজ করে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতিতে। সংবেদন থেকে চিন্তন পর্যন্ত বোধের স্তরগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ফেলা যায় এই তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। এ-পদ্ধতির বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

বহির্জগতের উত্তেজনা ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ করলে উদ্দীপকগুলোর সংবেদী প্রতিরূপ খুব অল্পক্ষণের জন্য সংরক্ষিত হয় মস্তিষ্কে সংবেদী তথ্যভাণ্ডারে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের

জন্য সংবেদী তথ্যসমূহ প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় সংরক্ষিত হয় অল্পস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারে। প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পূর্ণ হলে এই তথ্য প্রেরিত হয় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারে যেখানে তথ্যগুলো বহুকাল সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন মতো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তথ্যগুলো ফিরিয়ে আনা হয় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারে। এরপরে সমস্যা অনুযায়ী নতুন তথ্যের সঙ্গে মিশিয়ে সঞ্চিত তথ্য ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা হয় চিন্তার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য চিন্তার ফসলও তথ্যাকারে সঞ্চিত থাকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারে। এই প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কম্পিউটারও কাজ করে।

এইভাবে কম্পিউটারের আদলে মানুষের বোধের ব্যাখ্যার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষকরা। তাঁরা উপলব্ধি করেন বোধসংক্রান্ত সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে সকলের সহায়তা প্রয়োজন। এরই ফলে উদ্ভব হয় এক নতুন বিজ্ঞানের যাকে বলা হয় 'বোধবিজ্ঞান'। বোধবিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত একটি শিশুবিজ্ঞান, কিন্তু প্রভূত সম্ভাবনাময়। বোধসংক্রান্ত সমস্যাবলি সমাধানের জন্য বোধবিজ্ঞানের পরিসরে একত্রিত হয়েছেন মনোবৈজ্ঞানিক, মনোদার্শনিক, যুক্তিবিদ, কম্পিউটারবিজ্ঞানী, স্নায়ুবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবাদী। বিভিন্ন পটভূমি থেকে আগত এ-সব গবেষকরাই কিন্তু বিশ্বাস করেন যে বোধবিজ্ঞানের পদ্ধতি হওয়া চাই অভিজ্ঞতানির্ভর, জ্ঞানদর্শনের মত অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ নয়। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন যে পরিগণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যেই সকল বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব (সকল মানসপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা নিয়ে এঁরা চিন্তিত নন, মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে এখানে বোধিবিজ্ঞানীর পার্থক্য)। এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত যে বোধের সঙ্গে চেতনার এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে। অচেতন কোনো তন্ত্রের বোধ থাকা সম্ভব নয়। চরম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবাদীরা কিন্তু বলেন যে কোনো বুদ্ধিজাত মানসক্রিয়া যা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব তা কম্পিউটারের পক্ষেও করা অসম্ভব নয়।

বোধবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ যুক্ত হয়ে আছে তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে। তাত্ত্বিকেরা মনে করেন বোধবিজ্ঞানই এই একবিংশ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।

বৌদ্ধধর্ম

সুমন ভট্টাচার্য

ঋগ্বেদীয় প্রজ্ঞা যখন অথর্ববেদীয় অনুজ্ঞায় রূপান্তরিত, সেই সামাজিক ক্ষোভ, যে ধর্মকথার আশ্রয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব আর মননকে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছে, তা-ই বৌদ্ধধর্ম। সেই—কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের স্ত্রী মায়াদেবীর শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন থেকে সিদ্ধার্থের জন্ম এবং নগরীর পথ পরিক্রমা কালে বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসীর দর্শনে তাঁর চিত্তবিচলন ও অতঃপর এই যাতনাচক্রের অনিবার্যতা থেকে মুক্তির সন্ধান আকাঙ্ক্ষায় সদ্যোজাত পুত্রসহ স্ত্রী যশোধরা-কে ত্যাগ করে মহাভিনিষ্ক্রমণ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধনা, ব্যর্থতার পর বৈশ্যবধূ সুজাতাপ্রদত্ত পায়সান্নভক্ষণ করে পুনর্বার তপশ্চর্যার পর্বে ঈপ্সিত চেতনার সন্ধান—এই কাহিনিক্রমকে, তার শব্দার্থগত গূঢ়বার্তায় পাঠ করলে রূপকের নির্মাণ তার অভিপ্রায়কে স্পর্শ করবে। আর এই আভিপ্রায়িক অর্থে পৌঁছনোই বৌদ্ধধর্মের যথার্থ পাঠ।

ঋগ্বেদ—যে অনুভূতজগৎ আর দৃষ্টির ব্যাপ্তিকে সঞ্চারিত করেছিল, পরবর্তী পর্বে তাকেই অনুশাসনের রীতিতে পরিণত করে প্রভুত্বকামী ব্রাহ্মণসমাজ। ফলত, দিনযাত্রার তালে তালে সেই কর্তৃত্বের কাঠামো ক্রমাগতই এঁটে বসতে থাকে জ্ঞানচর্চার বৃত্তে ও বৃত্তান্তে; যার ফলে বেদ বা জ্ঞান স্বয়ং অথর্ব হয়ে যায়—যুক্তিবিরহিত আচার-ক্রিয়ার আতিশয্যে, তাকে অবশ্যমান্যতার এক বাধ্যতামূলক নির্দেশনামায়। কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ এই নির্দেশ আর তার যুক্তিহীনতাকেই প্রশ্ন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য আচারবাদের ফাঁসে শ্বাসরুদ্ধ সমাজ-মানুষ সেই প্রশ্নকারীকেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ভাঙা-ভাষার আধারে খঞ্জ ও অবদমিত জিজ্ঞাসার প্রাণ দেওয়া সেই মানুষকে। যে-কারণে বৈদিক অথর্বতার উত্তরপাঠ হয়ে দেখা দেয়—বোধি-কেন্দ্রিত জীবনযাপনের নির্দেশ—বৌদ্ধধর্ম আর তার উদ্ভাবক—বোধিসত্ত্ব।

বৈদিক ভাষা আর তার সংস্কৃত রূপ যেমন বৃহত্তর সাধারণের নিত্যবৃত্তের ভাষা নয়, তেমনি তারই সমর্থন-অনুগৃহীত ব্রাহ্মণ-শ্রেণিও যে সেই ভাষার অর্জন ও চর্চাগত প্রগতির উত্তরাধিকার থেকে ক্রমাগত স্খলিত হচ্ছিলেন ইতিহাস তার প্রমাণবহ। সুতরাং প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই মানুষজনের নিত্যচর্চার ভাষাকে ব্যবহারের অধিকার তথা—সংস্কৃত বা তথাকথিত দেবভাষা-শিক্ষার অধিকারহীন মানুষের ভাষাকে ব্যবহারের প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা। জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, গৌতম তথা বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষের ভাষাকেই

আশ্রয় করলেন, সমষ্টিগতভাবে বোধি-বৃত্তের বিকাশের জন্য। একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে যা অসম্ভব ছিল 'সংস্কার'বদ্ধ শিক্ষায়—বৈদিক নির্দেশকে পরিহার বা সংস্কৃতভাষাকে প্রত্যাখ্যান—সিদ্ধার্থ জন্মসূত্রে সে সংস্কার থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই তিনি কথ্যভাষায় মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সমাজবুদ্ধির পাঠ ও যুক্তিসঞ্জাত ও যুক্তিসংগত বাস্তবতার বয়ানে। ব্রাহ্মণ্যবাদ যে বাস্তবতাকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে দিচ্ছিল কেবলমাত্র আধিপত্য রক্ষা আর ক্রিয়াকর্মগত উপার্জনকে বজায় রাখবার জন্য—বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্ম তাকে অঙ্গীকার করল সরল-বাস্তবতার আশ্রয়-অর্জিত প্রতিস্পর্ধায়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সেই প্রতিবাদী ধর্ম—কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদের ধারণাকে প্রশ্ন করেছিল, এই ধারণার আশ্রয়েই। ইচ্ছাকৃতভাবে অতিগ্রন্থিল আচার-প্রকরণের গ্রন্থিমোচন করে উচ্চারিত হয়—অষ্টাঙ্গিকমার্গ আর নির্বাণ-এর ধারণা। এই ধারণার আশ্রয় সমাজচেতনার আদিম অভিপ্রায়—যা ধর্মতন্ত্রের পেশাদারি পরিচালনায় মুছে যাচ্ছিল, অথচ মানুষ ক্রমাগত সেই সরলতারই সন্ধান করেছে—সদ্দৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ী জীবিকাবৃত্ত, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক সমাধি।

একটি অনুপ্রাসের আবহে যাপনের এই সরল বিভাজন মানুষকে অবশ্যই প্রত্যয় জুগিয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্য আচারবৃত্তে অতিষ্ঠ মানুষ, তাঁর শরণ নিলেন। এই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস—তার অভিপ্রায়ের শরণ ও স্খলনের এক দ্বান্দ্বিক বৃত্তান্ত। কারণ বৌদ্ধধর্ম—একাধিকবার রাজধর্মে উন্নীত এবং বিচ্যুত হয়েছে। আর লক্ষ করবার বিষয় এই যে, রাজধর্ম-ও এই অভিমতকে ব্যবহার করেছে, প্রজা নয় রাজতন্ত্রের সুবিধার্থে এবং বৌদ্ধধর্মও রাজধর্মের আশ্রয়ে তার অভিমতকে ব্যবহার করেছে অনুরূপ খণ্ডস্বার্থের পরিপূরণার্থে। যে-কারণে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে বৌদ্ধধর্ম শেষপর্যন্ত তার অভিযাত্রাকে রক্ষা করতে পারেনি। কারণ তারও অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল আধিপত্য। যার রূপ দেখা যায় বৌদ্ধমতাশ্রয়ীদের সংঘবিভাজনে। বিভাজিত অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিসংগ্রহের ভূমিতেই ক্রমবিকশিত হয় বৌদ্ধদর্শন। বুদ্ধের মূল বক্তব্য যে আত্মবোধ ও আত্মসম্মানবোধের বিকাশ—বৌদ্ধদর্শনের তত্ত্বকাঠামোর আকারেই তা অননুসৃতির পথ ধরে। মহাযান, হীনযান থেকে ক্রমান্বয়ে—মন্ত্র, বজ্র, সহজ-এর যান-জটে বিভ্রান্ত হয় বুদ্ধদেবের মৌল অভিপ্রায়।

সম্রাট বিম্বিসার যে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, সম্রাট অশোক অবশ্যই সেই বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিরক্ষার আকারে। বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধর্ম যে আকারে বিস্তার পায়, যে আশ্বাস মানুষ পেতে চেয়েছিল, তার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল বলেই তাকে এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়। যার পরিণাম বৌদ্ধদের ক্রমান্বয়ী আত্মগোপন। আর আচারতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের বার্তা ছিল বৌদ্ধদর্শনের মূল উপজীব্য—সেখানে যখনই তন্ত্রাচার প্রবিষ্ট হয়, তখন তা-ও অভিপ্রায়ের স্খলন। বৌদ্ধধর্ম-আদর্শ-এর প্রাথমিক ধারক—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটক। আর তারও বেশি মূর্ত হয়ে আছে জাতক কাহিনিধারায় তার কথন আর উনকথনের বৃত্তে।

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার অবশ্যই এই অভিমতের প্রাণময়তার সূচক। কিন্তু তার ক্রমিক রূপান্তর-ও তার বিচ্যুতিরই একটি সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু কালক্রমিক পরিবর্তন এবং অনভিপ্রেত রূপান্তর সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম এখনও পর্যন্ত তার মৌলিক স্বপ্নের একটি রূপকে রক্ষা করে চলেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিবর্ণকেন্দ্রিক পরিচয়ের প্রতিবাদী অবস্থানে বৌদ্ধধর্মের সামাজিক ভূমিকা এখনও যে প্রশ্নাতীত তার একটি সূত্র পাঠ করা যায় ভীমরাও আম্বেদকর-এর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঘটনায় বা অক্টোবর ২০০৩-এ যখন চল্লিশ হাজার দলিত দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে বা আশ্রয় নেন বৌদ্ধ সংঘের।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

অমিতাভ চন্দ্র

রাষ্ট্র সম্পর্কিত চরম কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার রূপ ধরেই রাষ্ট্রচিন্তায় ও রাষ্ট্রতত্ত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবির্ভাব। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে ও সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে এক প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও দীর্ঘকালীন অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ও তত্ত্বের জগতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে তৎকালীন ব্যাপক সরকারি তথা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক তাত্ত্বিকগণ ধনতন্ত্র ও তার বাজার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব প্রচারে নিজেদের নিরত করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শে পরিণত হয়েছিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের পরিধি যত বেশি সীমিত করা যাবে, ততই রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল সাধিত হবে। সুতরাং এই মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি যতটা সম্ভব সীমিত করার প্রবক্তা, এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হবে 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' ('minimum state')। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য, ব্যক্তির কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার স্বার্থেই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বা হস্তক্ষেপের সীমানা সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ততম হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির দাবি করেন না। তাঁরা রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধির যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সীমিত রাখার পক্ষপাতী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা হয় না, এই মতবাদে বিরোধিতা করা হয় সক্রিয় রাষ্ট্রের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিককুল রাষ্ট্রকে ত্রুটিপূর্ণ ও অনিষ্টকর কিন্তু প্রয়োজনীয় এক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ্য করেন, রাষ্ট্র তাঁদের চোখে 'necessary evil' হিসাবেই প্রতিভাত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রের কর্ম পরিধিকে সর্বাধিক মাত্রায় সঙ্কুচিত করে কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত রাখা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নেতিবাচক

দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র হবে প্রধানতর এক 'পুলিশি রাষ্ট্র' ('Police State')। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিকদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সর্বাধিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল প্রতিপাদ্য।

যেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হল ব্যক্তি, সেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিকবর্গ রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ক্রিয়াকলাপ সর্বাধিক প্রসারিত করার বিশেষ প্রবক্তা। এই তাত্ত্বিকদের মতে যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের শুভাশুভ ও স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ভাল বোঝে, সেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার স্বীয় মঙ্গলের জন্য প্রয়াসের অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূমিকা এক্ষেত্রে একেবারেই অনাবশ্যক।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তকেরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ প্রতিযোগিতার প্রবল প্রবক্তা। সেই কারণেই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব 'অবাধ নীতি' বা 'স্বাচ্ছন্দ্য নীতি' ('laissez faire theory') হিসাবেও সুপরিচিত। 'Laissez faire' হল একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ হল ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি অর্থনীতিবিদ্‌রা অবাধ বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ ধারণাটির প্রবর্তন করেছিলেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তির যৌথ সত্তার কথা বলা হয় না। এই মতবাদ প্রতিটি ব্যক্তিকেই এক-একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবেই দেখে থাকে। এই মতাদর্শে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ ব্যক্তিসত্তার ওপরই জোর দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তির সত্তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির ওপর থেকে যে-কোনো প্রকার বাধানিষেধের সম্পূর্ণ অপসারণই হল প্রকৃত স্বাধীনতা। ব্যক্তির এই স্বাধীনতার স্বার্থে এক সহায়ক পরিবেশ বা অবস্থা সৃষ্টি করাই হল রাষ্ট্রের একমাত্র দায়িত্ব। সুতরাং এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের ভূমিকা হতে হবে নেতিবাচক। রাষ্ট্র শুধুমাত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে বাধাগুলিকেই দূর করবে, এবং এটাই হবে রাষ্ট্রের কাজ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সকল রকম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এবং যে-কোনো রকম পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থারই বিরোধী। এই মতবাদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উদ্যোগকে স্বীকার ও সমর্থন করে, এবং তারই প্রবক্তা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গৌরবময় শতাব্দী বা সুবর্ণ যুগ হল উনবিংশ শতাব্দী। উনবিংশ শতাব্দীর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হিসাবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা হিসাবে জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, অ্যাডাম স্মিথ, সিজউইক, হেইক, সামনার প্রমুখ দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ্‌দের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই আদর্শবাদী বা ভাববাদী ইংরাজ দার্শনিক টমাস হিল গ্রীনের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাসমূহ প্রসারের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই এই মতবাদের নানা প্রকার বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। বাস্তবিকই পরবর্তী কালের পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তাদের যাবতীয় যুক্তি সম্পূর্ণ অসার হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মতাদর্শ হিসাবে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে দীর্ঘকালব্যাপী অব্যাহত রাখতে পারে নি। এই ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সমষ্টিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সমষ্টিবাদ বিশেষভাবেই সক্রিয় রাষ্ট্রের প্রবক্তা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে থেকেই সক্রিয় রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরুদ্ধে বা সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে উঠছিল। এই কারণেই পুনর্বার শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিধির বিস্তারের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তির ভূমিকার প্রসারের পক্ষে প্রয়াস। এই প্রতিক্রিয়াজনিত প্রয়াসটিই রূপ নিয়েছিল আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের। বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে নর্ম্যান অ্যাঞ্জেল, গ্রাহাম ওয়ালাস, বেলক প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রকে এক গোষ্ঠী সমবায় বা সংঘ সমবায় হিসাবেই দেখে থাকে। এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে গোষ্ঠী বা সংঘ স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলা হয় এবং অবাধ ও পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধিতাও করা হয়। একই সঙ্গে এই মতবাদ আদর্শবাদ ও সমষ্টিবাদেরও বিরোধী। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রের চরমত্বকে স্বীকার করে না। পরিবর্তে এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সমাজের সংগঠনসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসাবেই গণ্য করে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে জনসাধারণের নিরঙ্কুশ আনুগত্য আশা করতে পারে না। ব্যক্তি জীবনের কোনো বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নি। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র হল বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-মীমাংসার একটি প্রশাসনিক যন্ত্র মাত্র। রাষ্ট্রের কাজই হল সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংঘের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই মতবাদ অনুসারে গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের সীমানাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। এই মতাদর্শ জনমতকে নিষ্পেষণমূলক হিসাবে গণ্য করে ব্যক্তিকে রক্ষা করতেই আগ্রহী।

বক্তব্যের দিক দিয়ে এবং উদ্দেশ্যগত বিচারে উভয়ভাবেই ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় মতবাদই ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে ব্যক্তির স্বাধিকার এবং স্বাধীনতার প্রশ্নসমূহেও। কিন্তু বিন্যাসগত দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই দুই ধারা ব্যক্তিসত্তার চূড়ান্ত বিকাশের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিষয়ে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আধুনিক ও ধ্রুপদী উভয় ধারাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে ব্যক্তির স্বাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপরই বিশেষ জোর দিয়েছে। আধুনিক

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের অবাধ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হল সংঘ স্বাতন্ত্র্যবাদেরই ভিন্ন নাম। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচক এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গোষ্ঠী বা সংঘের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এর মাধ্যমে বহুলাংশেই বহুত্ববাদী ধারণাকেই সমর্থন করেছে। এই কারণেই সি ই এম জোড (C E M Joad) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে 'সংঘ-স্বাতন্ত্র্যবাদ' হিসাবেই অভিহিত করেছেন।

ব্রতকথা

পল্লব সেনগুপ্ত

ব্রত-জাতীয় গার্হস্থ্য ধর্মাচারমূলক বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিকোমের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও, 'ব্রতকথা' একান্তভাবেই বাংলার লৌকিক সাহিত্যধারার নিজস্ব ঋক্থ। আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ করার প্রয়াসে বাঙালি মহিলারা যে-সব ব্রত পালন করেন, তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই গড়ে উঠেছে একটা-না-একটা কাহিনী—আর সেগুলিই পরিচিত ব্রতকথা হিসেবে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, অধিকাংশ ব্রতকাহিনিই রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারভুক্ত (মূলত প্রাক্-আধুনিক গ্রামীণ সমাজের) নারী-পুরুষরাই এগুলির মুখ্য চরিত্র, তবে কখনো-সখনো রাজা-রাজড়া কিংবা সওদাগরেরাও এদের মধ্যে হাজির থাকেন। ব্রতসংশ্লিষ্ট বিশেষ দেবী / দেবতা এবং কখনো বা পশু-পাখি-সরীসৃপদেরও পার্শ্বচরিত্ররূপে এইসব কাহিনিতে দেখা যায়। ফলে, ব্রতকথার মধ্যে লোকপুরাণ (বা, মিথ), পশুকথা এবং রূপকথা—তিন প্রকরণের লোককথারই উপকরণ সমাহৃত হয়ে থাকে।

বাংলার ব্রতকথাগুলি মোটামুটিভাবে মধ্যযুগে গড়ে উঠতে শুরু করেছে বলা যায়। এদের অনেকগুলির মধ্যেই বাঙালি যখন সমুদ্রযাত্রার সূত্রে বিদেশে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যেত ব্যবসার প্রয়োজনে, তখনকার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তবে আরও পুরানো—এমন কি প্রাগৈতিহাসিক কালেরও কিছু কিছু সংস্কার ও বিশ্বাসের আভাস লোককথার মধ্যে মেলে কখনো-কখনো। মূল গল্পটি উত্তরকালে ব্রতের আচার-উপচার ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে কোনো-কোনো সময়ে, তা সত্ত্বেও গল্পটা প্রচলিত আছে যে, এমনও দেখা যায়। যথা : যমপুকুর ব্রতের কাহিনি।

ব্রতের গল্পগুলির মধ্যে সাধারণত তিনটি মুখ্য মোটিফ বা অভিপ্রায় দেখা যায়, যা রূপকথার সঙ্গে এদের আত্মীয়তার চিহ্নবাহী। এগুলি হল—(ক) কোনো-না-কোনো 'ট্যাবু' (তথা, নিষেধমূলক সংস্কার) ভেঙে ফেলে সাময়িকভাবে সেজন্য শাস্তিভাজন হওয়া; (খ) এরই সূত্রে কোনো দৈবী / অতিলৌকিক সত্তা / শক্তির কৃপায় ঐ শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া এবং পরিণামে সকলে মিলে সুখে-শান্তিতে থাকা। এই শেষ অভিপ্রায়টি অবশ্য সমস্ত ব্রতেরই—কাজে-কাজেই ব্রতকথাগুলিরও—মূল আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। রূপকথায় দৈবীশক্তি / দেবতা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি থাকে না—তবে তার

বদলে অতিলৌকিক শক্তি-ইত্যাদি সক্রিয়তা হামেশাই দেখা যায় এবং এই প্রেক্ষিতে ব্রতকথাগুলি রূপকথার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। আবার, দেবদেবীর মাহাত্ম্যের ব্যাপারটাও যেহেতু এদের মধ্যে ব্যাপক, ফলে এগুলি মিথের / লোকপুরাণের মতো 'পবিত্র' বলেও ধার্য হয় ব্রতিনীদের কাছে এবং তাই এগুলি মিথলক্ষণগ্রস্ত।

ব্রতের গল্পে সাধারণত দেখা যায় যে, দুটি পক্ষ থাকে—যাদের একটি সংশ্লিষ্ট দেবতাকে উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করে শাস্তি পায়, আর অন্যটি তাঁকে ভক্তিভরে মান্য করে, ফলে সুখসমৃদ্ধি লাভ করে। গল্পের কাঠামোর মধ্যে এই দুটি শক্তির দ্বান্দ্বিক অবস্থান একে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিশেষে দেবতার অনাদর করেছিল যে / যারা, সে / তারাও তাঁর জন্য ব্রতের কৃচ্ছসাধন করতে শুরু করে এবং সবাই দুঃখকষ্টকে কাটিয়ে ওঠে। ব্রত যে পালন করে—ব্রতকথার গল্পে এমনও দেখা যায় যে, সেও এক সময়ে প্রভূত দুঃখ ও যন্ত্রণা পায়—পরে তার সব কষ্টের নিরসন হয় সংশ্লিষ্ট দেবতার মহিমায়।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথে বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে বাংলার বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্যে আভাসিত হতে দেখা যায় বলে এখনি উল্লেখ করেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকার এবং সংগ্রহনির্ভর জীবিকার ছবি, কৃষির উদ্ভব, গ্রাম-নগর পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি সব স্তরগুলি সেখানে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি (যথাক্রমে), শিবরাত্রির ব্রতের গল্প, ক্ষেত্রলক্ষ্মীর ব্রতকাহিনি, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা এবং মনসাব্রতের কাহিনির নাম। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিরও প্রাথমিক কাঠামোগুলি ব্রতকথার মধ্যে লুকিয়েছিল—এটাও মনে করবার যথেষ্টই কারণ আছে।

প্রায় সবগুলি প্রধান ব্রতেরই অন্তত একটা করে 'কথা' আছে, যেটা ভক্তিভরে পড়া এবং শোনা ব্রতপালনেরই অনবচ্ছিন্ন অঙ্গ বলে ধার্য করেন ব্রতিনীরা। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী এবং চণ্ডী—মূলত এই তিন দেবীকে কেন্দ্র করেই ব্রতসাহিত্যের বৃহত্তম অংশটি গড়ে উঠেছে। তবে এখানে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, এই লক্ষ্মী এবং চণ্ডী সম্পূর্ণভাবেই লৌকিক দেবী—শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ শুধুমাত্র তাঁদের নাম-পরিচয়েই প্রাপ্য। এই তিন দেবীর উপলক্ষে রচিত ব্রত কাহিনি ছাড়া, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রতকথা হল মনসাকে উপলক্ষ করে গড়ে-তোলা গল্প। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, ব্রতকথাগুলির স্রষ্টাও মেয়েরাই। তাই ব্রতকথাগুলির গল্পের আবরণের অন্তরালে বাংলার সামাজিক ইতিহাসেরও কিছু সঙ্কেত মেলে—যা সাধারণভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে অপ্রাপ্য। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বাংলা ব্রতকাহিনীগুলির একটা বিশেষ ধরনের গুরুত্ব আছে যে, সে কথা না-মেনে উপায় থাকে না।

ভক্তি ও ভক্তিমার্গ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তি—ভারতীয় সনাতন ধর্মসাধনার প্রধান তিন প্রবাহ। অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা এই তিন প্রবাহকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে বরং সংলগ্ন করেই দেখেছেন। এক্ষেত্রেও ভারতের সংশ্লেষণী বা সমন্বয়ী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ, পুরুষার্থ যে অভিধাই দেওয়া হোক-না-কেন, এই তিনের লক্ষ্য একই। আর তাই অভিন্ন লক্ষ্যের দরুণ এই তিন মার্গের ভেতর পারমার্থিক ক্ষেত্রে অনৈক্য নেই। ঈশ্বর বা অন্তর্যামী বা পরব্রহ্মের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্তিকে শাণ্ডিল্য সূত্রে 'ভক্তি' বলা হয়েছে। ভক্তির লক্ষণজ্ঞাপনে নারদভক্তিসূত্রে 'আত্মরতি'-র কথাও বলা হয়েছে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগে সাধকের মন যখন একান্তভাবে নিবিষ্ট, সেই সময় তাঁর ভাবের সঙ্গে ভক্তির ঐক্যসাধন হয়ে থাকে। এই অনুরাগের জ্ঞানানুগ পরিণাম অপরোক্ষ অদ্বৈতানুভূতি। একে ব্রহ্মসদ্ভাবও বলা হয়। সাধকের মনে পরা ভক্তি বা প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হলে তাঁর দ্বৈতবোধের বিস্মরণ হয়। ভক্তি থেকে জ্ঞান, না জ্ঞান থেকে ভক্তির উদ্ভব, এ নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও, জ্ঞান এবং ভক্তির পারস্পরিক সংলগ্নতার মতো কর্মও উভয়ের সঙ্গে সংলিপ্ত। তত্ত্ববেত্তাদের অভিমত, শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি এবং তার ফলে মোক্ষের ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠে। তার থেকে নিত্য-অনিত্য বস্তুবিচার বা বিবেকের উদ্ভব হলে তখনই ভক্তির আগমন হয়। তাই কর্মকে বাদ দেওয়া যায় না।

ভক্তিধর্মের উৎস-সন্ধানে ঋগ্‌বেদে বশিষ্ঠাদির মন্ত্রে, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তবে যেমন ভক্তির ভাব লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তেমনি তার পরবর্তীকালে কোনো কোনো উপনিষদেও। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ডের পাশাপাশি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু ওই যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধতার আঘাতে আর্যদের জ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়দের ভক্তিভাব মিশে যে আধ্যাত্মিক ভাবনার উৎক্রমণ হয়, ভক্তিবীজের বিকশনও সেইসূত্রে হয়েছিল বলে ক্ষিতিমোহন সেনের মতো কেউ কেউ মনে করেছেন। আর্যদের অপেক্ষা দ্রাবিড়দের ভেতর ভক্তির ভাব বেশি ছিল। তাদের সূত্রে পারস্পরিক স্বীকরণে ভক্তি ও প্রেমভাব মিলে লোকমনে প্রভাব ফেলে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এর ওপর শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থাকার দরুন এটি প্রধান উপনিষদগুলির অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদের পর পুরাণগুলি ভক্তিতে আকীর্ণ।

পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে দ্রাবিড় দেশে ভক্তির জন্ম, কর্নাটে বৃদ্ধি, মহারাষ্ট্রে কিছুদিন অতিবাহিত করে গুর্জরে এসে তার জীর্ণ হয়ে যাবার কথা পাওয়া যায়। এর ভেতরে কিছুটা ইতিহাসের সমর্থনও হয়ত পাওয়া যাবে। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি প্রধান সম্প্রদায়গুলির ভেতর ভক্তির প্রাবল্য বিশেষভাবে বৈষ্ণবদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বল্লভাচার্যর সূত্রে বৈষ্ণবদের প্রধান চারটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল। প্রথম তিনজন দাক্ষিণাত্যের মানুষ এবং চারজনই মধ্যযুগের। এই সময়ই ভারতীয় সাধনার ধারায় ভক্তির প্লাবন দেখা যায়। কিন্তু এঁদেরও আগে থেকে দক্ষিণে আড়বাররা ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ছিলেন। শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্র মেনে না চলার পন্থী আড়বাররা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকতেন। স্বানুভবের প্রকাশ হত তামিল ভাষায় তাঁদের পদাবলি বা সংগীতে। মোট বারোজন আড়বারের ভেতর একজন মহিলাও ছিলেন। ব্রাহ্মণ থেকে পারিয়া পাঁচ বর্ণের মানুষই ছিলেন এদের ভেতর। জাতিভেদের কঠিন বাধা ভেঙে আড়বাররা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের সেই মহৎ ভূমিকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ভক্তি। তাঁদের পদাবলি 'দিব্যপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত এবং সামগ্রিকভাবে সেগুলিকে 'তামিলবেদ' বলা হয়। তাঁদের নিজস্ব অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সেই দিব্যপ্রবন্ধ বা তামিলবেদে যমুনাচার্য প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব আচার্যরাও পারদর্শী ছিলেন। যমুনাচার্যের প্রশিষ্য রামানুজও গভীর নিষ্ঠায় তার পাঠ নেন। রামানুজের শিষ্যদের ভেতর একপক্ষ ছিলেন শাস্ত্র মান্য করা পন্থী, অন্যপক্ষ ভগবদ্ভক্তির ওপর গুরুত্ব দিতেন, শাস্ত্রের পরিবর্তে। এই দুই পক্ষ 'বড়গলই' এবং 'তেনগলই' নামে অভিহিত হন। দ্বিতীয় পক্ষ জাতিভেদ মানতেন না এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করতেন। রামানুজের জীবন ও সাধনায় বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে তা দক্ষিণ থেকে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় উত্তর ভারতে এসে পৌছোয়। এই পরম্পরাক্রমেই রামানন্দ তা আরো প্রসারিত করেন।

কর্নাটকে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অল্লমপ্রভু, বসবেশ্বর এবং অন্যান্য 'বচন' সাহিত্যকারদের প্রযত্নেও ভক্তিধর্মের আরো বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। সাধক বসবেশ্বর সে যুগের বৈপ্লবিক চিন্তাবীর। কল্যাণে তিনি বিজ্জল রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণসন্তান হলেও নিজের উপনয়নের বিরুদ্ধাচরণ করেন। বীর শৈব বা লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের সংগঠনে তাঁর সাম্য ও প্রেমভিত্তিক সমাজদর্শন প্রচার করেন। 'ভক্তিভাণ্ডারী' রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন।

খ্রিষ্টীয় তেরো-চোদ্দ শতকে মহারাষ্ট্রে ভক্তি ভাবান্দোলনের উদ্ভবে গীতার মরাঠিভাষ্য জ্ঞানদের-রচিত *ভাবার্থদীপিকা* বা *জ্ঞানেশ্বরী*-র সূত্রে এবং পনঢরপুরের দেবতা বিঠ্ঠলকে কেন্দ্র করে নামদেবের কল্যাণে সেখানে 'বারকরী' সন্তদের ভূমিকা বিশিষ্ট হয়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল। এই পরম্পরায় ষোড়শ শতাব্দীতে সন্ত একনাথের মাধ্যমে মরাঠি ভাগবত-সমাজে নামদেবের যুগের পুরোনো গৌরব ফিরে আসে, ভক্তি-আন্দোলনকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর পরে তুকারামের আগমনে

সেখানকার ভক্তিধর্মের বিকাশ তার বৃত্ত পূর্ণ করে। মরাঠি ভাগবত-সমাজের দেউলের ভিত্তি জ্ঞানেশ্বরী-র সূত্রে গড়ে উঠলেও, নামদেবের ভূমিকা তাকে রক্ষার জন্য সংগঠনিক প্রাকার দেয়, একনাথ কর্তৃক ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ তাঁর স্তম্ভ রচনা করে এবং তুকারাম সেই দেউলের চূড়া হয়ে ওঠেন। সতেরো শতকের কবিনারী বহিনাবাই তাঁদের ভক্তিধর্মের বিকাশ ও প্রধান সন্তদের ভূমিকাকে এইভাবেই বর্ণনা করে গেছেন।

উত্তর ভারতে পনেরো-ষোলো শতকে কবীর এবং নানকের সূত্রে সন্ত-ভাবান্দোলনে ভক্তিধর্মের আরো প্রসার হয়। গুজরাটের প্রথম বৈষ্ণব সন্তকবি নরসি মেহতাও এ সময়ের মানুষ ছিলেন। পরবর্তী বিভিন্ন সন্ত পরম্পরায় কবীর ও নানকের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। উত্তর ভারতীয় সন্তদের পরম্পরা মহারাষ্ট্রের মতো শিক্ষিত এবং সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। এঁদের অধিকাংশ যেমন নিরক্ষর ছিলেন, তেমনি হিন্দুসমাজের নিম্নবর্গের মানুষজন ছাড়াও ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজেরও দরিদ্র, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রোহিদাস, দাদু, তাঁর শিষ্য রজ্জব প্রমুখ সেরকমই ছিলেন। এঁরা একেশ্বরে বিশ্বাসী এবং নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক 'প্রেমভক্তি'-র মার্গে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। নির্গুণ অর্থে গুণের বিলোপ নয়, এবং গুণাতিরিক্ত অবস্থা তাঁরা বুঝেছেন এবং নিজেদের পরমকে সগুণ-নির্গুণের অতীত করে এক অনুপম ব্যক্তিত্বও দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ভগবানের বিভিন্ন নামশব্দকে আশ্রয় করে। কালক্রমে ওই সময় নাগাদ বল্লাভাচার্যের পুষ্টিমার্গের অন্তর্ভুক্ত সুরদাস ছাড়াও রাজস্থানে মেরতার রাজকন্যা এবং মেবারের রাজকুলবধূ মীরাবাই এবং তুলসীদাস, ভক্তিমার্গের পথিক হয়ে তাঁদের গান ও রচনায় লোকসমাজে প্রভাব ফেলেন। এঁরা সগুণ উপাসক ছিলেন। অন্যদিকে বাংলার শ্রীচৈতন্য এবং অসমের শংকরদেবের কল্যাণে পূর্বভারতে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের জোয়ার আসে। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই, সামাজিক জীবনেও এই দুই যুগপুরুষের প্রভাব বাংলা এবং অসমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার অবকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের ভক্তিমূলক রূপান্তর প্রক্রিয়া, যা আমাদের আধুনিক ভাবনায় 'ভক্তি-আন্দোলন' নামে পরিচিত, তার গুরুত্ব কেবল ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাস পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মুসলমান আক্রমণও তাঁদের সাধনার প্রতিঘাতে সেদিনের হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব প্রেমভক্তির আদর্শের সঙ্গে সন্তদের সাধনা মিশে যে ভাবান্দোলন জাগ্রত হয়েছিল, ভারতীয় জনজীবনে ধর্মবিশ্বাসের গুণগত এবং পরিকাঠামোগত রূপান্তরকে বোঝার ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ। এইসূত্রে প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্যসমূহের বিকাশও ত্বরান্বিত হয়।

কপট স্বার্থরহিত, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত, ব্যক্তিগত জীবনে সদাচারী, সাম্প্রদায়িকতা ও বাহ্যাচার-অতিক্রান্ত সংযমী, আত্মনিষ্ঠ, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারে বিমুখ, অহিংসায় বিশ্বাস এবং নিরামিষাশী সন্তদের সাধনা পারিপার্শ্বিকে 'সৎসঙ্গ' প্রবর্ধনের সংগ্রামও ছিল। এর অনেকগুলিই বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে জৈন এবং বৌদ্ধদের

সূত্রে ভারতীয় ধর্মসাধনা অনুস্যূত হয়ে থাকলেও, কালক্রমে নানারকম দুর্বলতায় ভক্তি প্রেম ও অধ্যাত্মদৃষ্টি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ওঠার দরুন কথা শুধু কথার মনেই থেকে গিয়েছিল। তার ওপর মুসলমান আগমনের সূত্রে বিভিন্ন তীর্থমন্দির, ধর্মক্ষেত্র আক্রান্ত হলে বিপন্নতা ক্রমশ যখন বাড়তে থাকে, হৃদয়-মন্দিরের নিভৃতে তখন ধর্মসাধনা জাগ্রত হবার অবকাশও পেয়ে যায়। বিস্মৃত, অবহেলায় পরিত্যক্ত পুরোনো সেইসব আদর্শের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে জীবন ও সাধনায় তাদের প্রয়োগ করতে হয়েছিল। মধ্যযুগে নতুনভাবে ভক্তির উন্মেষ—সেই যুগের সাধনা এবং অধ্যাত্মদৃষ্টির উৎক্রমণ সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হলেও, ভারতীয় ধর্মসাধনায় ভক্তিধর্ম বা ভক্তিমার্গের ঐতিহাসিক গুরুত্বও এইসূত্রে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

ভাষা আন্দোলন

আশিস্‌কুমার দে

শিরোনামের শব্দটি আমাদের যথেষ্ট পরিচিত। এই শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভেসে ওঠে বাংলা ভাষা আন্দোলনের কথা। মনে পড়ে যায় বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার জন্য ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারোটি তরুণ তাজা প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি। ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আবার ঐখানেই মায়ের ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য তিনটি তরুণ প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে। আবার ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভূগোলের, রাষ্ট্রের, বেড়াজাল ডিঙিয়ে এক উত্তাল মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের সংক্ষোভ দুই বাংলাকে একাকার করে দেয়। ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি ও পদ্মাপারের বাঙালি কখন যেন এক সুতোয় বাঁধা পড়ে। সরকারি নির্দেশে পালিত হচ্ছে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস'। ১৯শে মে কিংবা ২১শে ফেব্রুয়ারি বরাক বা ভারতের একাংশ ও বাংলাদেশের সর্বত্র পালিত হয় ঠিকই। এক আবেগময়তা চেতনাকে স্পন্দিত করে। পুরোনো ইতিহাসের ধূলো ঝাড়া হয়। ভাষা শহিদের আত্মদানের কথা স্মরণ করি। গান কবিতা নাটক গল্পে বক্তৃতায় মাতৃভাষা দিবস পালনের তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে ২০শে মে ও ২২শে ফেব্রুয়ারিতে কি একইভাবে আমরা জাগ্রত এবং মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান থাকি? সারা বছর মাতৃভাষার জন্য অক্রিয় থেকে বিশেষ দিনে তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কি অকপট আত্মসমালোচনার অংশ? জানি অনেকেই এ ধরনের মতামত শুনে অস্বস্তিতে পড়ছেন, ভাবছেন তাদের বাঙালিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, একুশের চেতনাকে আমরা ধরাশায়ী করছি। এমনতর ভাবুকের জন্য একটু পরে সময় ব্যয় করা যাবে। আপাতত ভাবা যাক, ভাষা আন্দোলন ব্যাপারটা কী এবং কেনই বা ভাষা আন্দোলন হয়?

আসলে ভাষা বিশেষ করে মাতৃভাষা মানুষের সহজাত। অন্য ভাষা অর্জন করতে হয়। সেখানে ভালভাবে পড়তে শিখতে বলতে লিখতে পারলেও ঠিক প্রথম ভাষার সম্মান পায় না। দ্বিতীয় ভাষার লোকেরা পিঠ চাপড়ালেও বলে ওঠেন, ও অনেকটা আমাদের মতো। কিন্তু জলবায়ু, আকাশের, মাটির গন্ধ নিয়ে মাতৃভাষার জগতে এই পিঠ চাপড়ানো নেই, বক্রোক্তি নেই, বরং তা সবসময়ে প্রাণের প্রবাহ। এ ভাষায় আমি স্বজনকে চিনি জানি বুঝি। আবার নিজের মনের আগল ভেঙে অন্যের কাছে নিজের ভাবনা মেলে ধরি। তারাও শরিক হন। স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে যখনই মাতৃভাষা শুনি তখনই হৃদয়ের মধ্যে এক আনন্দ খেলা করতে থাকে। মনে পড়তে পারে তারাশঙ্করের

নিতাই কবিয়াল কি স্বস্তি পেয়েছিল ট্রেনযাত্রায় হিন্দি বলয় পেরিয়ে বাংলা ভাষা শুনে। আমরা তাই সাংস্কৃতিকভাবে, জাতীয় সত্তার এক শরিকানা অনুভব করি মাতৃভাষার সরব কোলাহলে, শরীর-মনে স্পন্দিত নীরব উপলব্ধিতে।

অথচ এই নিজের ভাষা, এক বিশেষ জাতির ভাষার জন্য একই ভাষাভাষী স্বজনের চেতনালোক বারংবার আন্দোলিত হয়। স্বজন বুঝতে পারে শুধু তার চেতনাই আন্দোলিত হচ্ছে না। সে এক বিরোধিতার মুখোমুখি। সে বিরোধিতা তার মাতৃভাষার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। আর নিজের ভাষার এই বিপন্নতাবোধ তার জাতিসত্তার ওপর আঘাত হানছে। জোসেফ স্তালিন এই ভাষা ও জাতিসত্তার সম্পর্ক, ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও ভাষার অধিকার নিয়ে চমৎকার আলোচনা করলেও তা আমরা স্মরণে রাখতে চাই না। কেননা তাহলে তো মাতৃভাষার মধ্যে যে ওপরতলা ও নিচুতলা আছে তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। আধিপত্যের চাপে অনেক ভাষাগোষ্ঠী যে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়েছে বা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, তা মেনে নিতে হয়। শাদা চোখে এই আধিপত্য বোঝা কঠিন। কিন্তু ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুরা কিভাবে গরিষ্ঠের শাসন মেনে নেয়, তার অজস্র দৃষ্টান্ত দেশে-বিদেশে পাই। এভাবে একই ভূখণ্ডে একটি ভাষা প্রবল হয়ে ওঠে। সে আস্তে আস্তে অন্য ভাষাদের গ্রাস করতে থাকে। এক সময় সেই ভাষা মান্য হয়ে ওঠে। বাকিরা গেঁয়ো বা উপভাষা বলে আলোচনার সীমান্তে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অনাদৃত, অচর্চিত ভাষা হিসাবে, নিরক্ষর প্রান্তবাসী মানুষের কথ্যভাষা হিসেবে সমবেদনা কুড়োয়। জাতে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে যায়। ভাষার মধ্যে কুলীন-অকুলীন, মান্য-অমান্য, সম্ভ্রান্ত-অনভিজাত শ্রেণিবিচারে মাতৃভাষী মানুষের দুঃখ বাড়ে বই কমে না।

যেহেতু মাতৃভাষা একজন বা বহুজনের সত্তা এবং অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত, তাই মাতৃভাষার অপমানে জাতিসত্তার আসন্ন বিলোপে মানুষ সংক্ষুব্ধ হয়। তাগিদ অনুভব করে এক জাতীয়তার সমভাবুকদের সঙ্গে মাতৃভাষা নিয়ে আন্দোলনের। হয়তো একে সংগ্রাম বললে আরেকটু জোরালো হয়। কেন মাতৃভাষার জন্য মানুষ সংগ্রামী হয়ে ওঠে? একি আবেগের প্রবল তাড়না অথবা বহিরঙ্গ শক্তির চাপের কাছে নতজানু হওয়া থেকে মুক্তির অভিপ্রায়? এই আবহাওয়াটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে শাসকের কথা আসবে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির কথা ভোলা যাবে না। বরাকে যখন ভাষা সংগ্রাম হয়েছিল, তখন তা অসমিয়া বনাম বাঙালির দ্বন্দ্ব। অসমিয়াকে বাংলা ভাষার জায়গায় স্থাপন করার জন্য শাসকদলের প্রয়াস ঔ ভূখণ্ডের অন্তর্গত এবং বহিরাগত ভাষার বোধ জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। শাসক চেয়েছিল অন-অসমিয়াদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিতে। তা কাড়তে গেলে প্রথমেই তাদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত হানা জরুরি। বরাক উপত্যকার মানুষ তা প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করেছে।

আবার পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো এবং শাসক সম্প্রদায় চেয়েছিল বাংলার বদলে উর্দু প্রচলন করতে। একটু আগে লক্ষ করেছি যে একটি তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক, বহুভাষী দেশে আঞ্চলিকতা কিভাবে ভারতের মধ্যেও ভাগাভাগির বোধ সঞ্চার করছে। আবার বাংলার জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকের ভাষা একটি

ভূখণ্ডে জোর করে চাপানো হল। একটি যদি হয় অন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগ্রাম, তাহলে আরেকটি হল আপাত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ভাষা ব্যবধানকে আমল না দিয়ে একটি ভাষা চাপানোর রাজকীয় অভিযান! এখানে বাংলা ভাষার সূত্রে অর্জিত একটি জাতিসত্তার শিকড়কে ধরে টানা হল। ধর্মের দোহাই রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে দুটি আলাদা ভাবিক সমাজকে একটি ঘেরাটোপে বন্দি করার চেষ্টা হল। শুধু শাসক নয়, ধর্মের একনিষ্ঠ প্রভুরা এখানে ইসলামের ও মুসলমানের শিকড় খুঁজতে মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা করলেন। দুঃখের বিষয় মধ্যপ্রাচ্যে উর্দু নেই। সেখানে ফার্সি আরবি ইরানীর চলন বেশি। আর ভাষার ইতিহাস দেখলে জানব উর্দু এক মিশ্র ভাষা যা সামরিক-অসামরিক মানুষের ভাববিনিময়ের স্রোতে ভারতে জন্ম নিয়েছিল। তার ইতিহাস বাংলার মতো প্রাচীন নয়। উর্দু বাঙালিকে শিখতে হয়, বাংলা তাকে শিখতে হয় না। এভাবে সামরিক শাসক এবং অসামরিক কর্তৃপক্ষের ফতোয়ায় এখনকার বাংলাদেশে ভাষা সংগ্রামের শুরু। ফলাফল বিমিশ্র। জাতপাত ভুলে বাঙালিত্বের সাধকরা এখনও একত্র আছেন ধরে নিতে পারি।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওপার বাংলার যেসব খবর পাচ্ছি তাতে মনে হয় এই ভাষাসংগ্রাম সত্ত্বেও, বাঙালিত্ব সত্ত্বেও ভাষা সংস্কৃতির ওপর মৌলবাদী খবরদারি ক্রমে বেড়ে চলেছে। ধর্ম এখানে আগের মতো বাইরের পোশাক হয়ে থাকতে পারত। ভেতরের বাঙালি প্রাণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারত না। অথচ সাময়িকপত্র সংবাদপত্র এবং গ্রন্থরচনায় এক বাঙালি জাতির মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের স্মৃতির সুরভি অনেকেই খুঁজে নিচ্ছেন পদ্মার ওপারে। যারা খুঁজছেন তাদের সকলে বাঙালিত্বের শরিক হয়েও প্রবলভাবে এক সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। ফলে ওপারের বাঙালি ভাষাসূত্রে যে একত্বের স্বাদ পেয়েছিল, তাকে বিনষ্ট করার জন্য অনেকে আগ্রহী। সেখানে তারা স্বধর্মের মানুষকেও কুফির বা কাফের বলতে চান, যদি তারা বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব দেখান। মনে পড়বে ঢাকায় কাজী আবদুল ওদুদ ও শিখা সম্প্রদায়ের হেনস্থার কথা যা বিশের দশকে ঘটেছিল। এই মুহূর্তে তাই বাঙালি হওয়ার সূত্রে বাংলাকে মাতৃভাষা করে যারা বাঙালি থাকতে চান, তাদের ভবিষ্যৎ যে 'বিপজ্জনক' এ কথা সকলের জানা। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো আন্দোলনের সম্ভাবনা যদি আবার দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে মাতৃভাষার শিকড় উপড়ে ফেলার বিরুদ্ধে সে এক মিলিত প্রতিরোধ, ঘৃণার জ্বলন্ত বিস্ফোরণ!

ভাষা সংগ্রাম শুধু বাঙালির একচেটিয়া একথা ভাবা ভুল। দক্ষিণে হিন্দি প্রচলনের শাসকীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানেও মানুষ তামিল, কন্নড়, তেলুগু, মালয়ালম, কোঙ্কনী ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দশকের পর দশক আন্দোলন করে মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুস্কিল হল সেই ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের বাঙালির কাছে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো। আমরা কখনো ভাবিনি যে কী করে ভাষাসূত্রে এরা আমার আত্মীয় হয়ে হিন্দিকে রাজভাষা করতে দিল না। বরং কিছু দল উপদল ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে পদযাত্রা করে মাঝে মাঝে কিছু সভা করে আমরা ভাষা সংগ্রামের ভান করি। যে মাতৃভাষার অপমানে, নির্বাসনে, সম্প্রচার মাধ্যমগুলি আগ্রাসী ভূমিকা নিচ্ছে, বাঙালি অবাঙালি-ইংরেজির ফোড়নমিশ্রিত ভাষায় (পিজিন?) যে ক্রমে অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছে, তাকে বিশ্বায়নের ফলাফল হিসেবে এরা নিচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব অনেক। তারা মাতৃভাষার জন্য, ভাষা সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব পণ করছেন, এমন দেখছি না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি প্রচেষ্টায় আইন আদালতে বাংলা চালু হলেও এখনও কাজ চলছে ইংরাজিতে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ফার্সিকে হটিয়ে আইনি ভাষা হিসাবে ইংরাজি ঔপনিবেশিক প্রভুরাই করেছিলেন। এখন বাংলা না জানা, বুঝতে না পারা, ইংরাজিতে চৌখস হওয়াই ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক হওয়ার সোজা রাস্তা। যখনই বাংলা কিংবা উপভাষার জন্য সচেতন মানুষের প্রতিবাদ শোনা যায়, তখন অনেকে মরমে মরে যান এই ভেবে যে আমরা কেমন প্রাদেশিক হয়ে যাচ্ছি। অথচ ভারতীয় বা আন্তর্জাতিক হতে গেলে নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে হবে, এমন কোনো ভারতীয় বা আন্তর্জাতিক নজির আমাদের জানা নেই। বরং নিজের শিকড় চেনা হলে তবে তার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের ভাষা শিকড় ও জাতিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখলে তবে বিশ্বের ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা সমব্যথী হতে পারবো।

ভাষা আন্দোলনের কোনো তাত্ত্বিক উপাত্ত এই রচনায় নেই। যেমন এই ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত নথিপত্র, বইপত্রের সুদীর্ঘ তালিকা। নেই অসামান্য উদ্ধৃতির উজ্জ্বল উদ্ধার। যা রইল তা হল ভাষা সংগ্রাম বিষয়ে একজন সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় খোঁড়ার প্রয়াস। এই খননে আবেগ নেই, আছে স্বজাতির স্বদেশের ভাষা মানুষ কাল নিয়ে বিবেকীর অনুভব। ভাষা-সংগ্রাম যে শিকড় টিকিয়ে রাখা স্বপরিচয়কে অক্ষুণ্ন রাখার এক কঠিন প্রয়াস—এরকম গভীর ভাবনাকে সঙ্গী করে নিলে স্বদেশ-বিদেশের ভাষাদ্বন্দ্বের অন্ধকার অনেকটা দূর হতে পারে। আধিপত্যবাদ, শাসন-শোষণের প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশবিক শক্তি বারবার দেশে-বিদেশে মানুষের ভাষিক অস্তিত্বকে চরম আঘাত হানছে। আহত ভাষাভাষীরা নিজেদের বাঁচাতে চাইলেই রাষ্ট্রীয় সংহতি ভাঙা হচ্ছে বলে প্রভুরা প্রমাদ গুনছেন। অন্যদিকে কোনো ভাষার লিখিত রূপ নেই, কোনো ভাষা মৃত ভাষা, কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যাল্প—এসব তথ্য সামনে এনে ভাষার জগতে এক শ্রেণিবিন্যাস করে কোনো কোনো ভাষাকে হরিজন ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রত্যেকের মাতৃভাষা এভাবে স্বদেশ-বিদেশের চাপে রদবদলের মুখোমুখি হচ্ছে। সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে অনেকদিন আরেক ভাষাকে প্রজার ভাষারূপে মানতে না পেরে রাজার ভাষার লোকগণনায় হাজির করেছি। মৈথিলী মানুষজন এভাবে হিন্দির অত্যাচার সয়েছে। সংবিধানে স্বীকৃত ভাষা হতে মৈথিলী, কোঙ্কনীর লেগেছে কয়েক দশক। সাঁওতালীকে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দী করে রেখে জনজাতির ভাষা মর্যাদা দিতে আমাদের সময় লেগেছে ঢের। আবার অন্যভাষাকে সচল রাখার মর্যাদাবোধ, প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত আমরা মূলভাষা-উপভাষাতত্ত্বের কূটকচালিতে অন্যান্য মানুষের ভাষিক সত্তা, সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে শারীরিক-সামরিক-আর্থিক দাপটে স্তব্ধ করে দিচ্ছি। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ক্ষমতায়নের দৃশ্য-অদৃশ্য শিকল একসময় একপ্রাণতার প্রবাহে ঝনঝন করে ওঠে। ভাষা সংগ্রামের অমোঘ মুহূর্ত আসে। রাষ্ট্রচালকরা আপোষকামী হয়। এভাবে নিরন্তর ভাষাসংগ্রামের আন্তর এবং বাইরের দ্বন্দ্ব মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদাবোধকে সচল করে রাখে।

ভাষার মৃত্যু

কেশব আড়ু

মানুষের চিন্তার অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি হল ভাষা। আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে ভাষার প্রবাহ বেরিয়ে আসে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা চিন্তাজাত উন্নততর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না, তাই তাদের কণ্ঠস্বরকে ভাষা বলা যাবে না। বস্তুত উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্যই মানুষের ভাষার প্রয়োজন হয়। একজনের মনের ভাব যখন আমরা অন্যজনের নিকট পৌঁছে দিতে চাই, তখনই জন্ম হয় ভাষার। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ভাষা সৃষ্টির জন্য অন্তত দুটি মানুষের প্রয়োজন হয়। এই এক থেকে দুই বা ততোধিক মানুষের অস্তিত্ব যখন আমরা অনুভব করি, তখনই এসে পড়ে সমাজ ভাবনার কথা। ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সমাজ বাঁধার বৃত্তি রয়েছে ভাষা সৃষ্টির মূলে। তাই বলা যেতে পারে, ব্যক্তি-মানুষের মন ও চিন্তা এবং সমাজবদ্ধ মানুষের ভাব-বিনিময়ের ইচ্ছা—এই দুয়ের জন্যই ভাষার সৃষ্টি। এজন্যই আমাদের মনন, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে ভাষার ধারা-উপধারা বহমান। এই সমস্ত দিক থেকে প্রবাহিত ধারা একত্রিত হয়ে ভাষা-নদী প্রবাহিনী। মানুবের জীবনের প্রয়োজনে ভাষা-নদীর সৃষ্টি, আবার মানুষের সামাজিক প্রয়োজনেই ভাষা-নদী খাত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এটাকেই ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় ভাষার বিবর্তন। এই বিবর্তন ঘটতে ঘটতে কখনো কখনো ভাষা-নদী মরুপথে হারিয়ে যায়। তাকেই বলা যেতে পারে 'ভাষার মৃত্যু'। তবে 'ভাষার মৃত্যু' অভিধাটি আরো বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ঐ সময় থেকে প্রায় ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বৈদিক সংস্কৃত ভাষাই ছিল যুগগত ভাষা-মান। ভাষাবিজ্ঞানীদের অভিধায় এটা প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগ। এরপর ভাষার বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে সৃষ্টি হয় প্রাকৃত-পালি-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষার যুগ। এর কালসীমা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কালের নাম দেওয়া হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা। এরপর এল নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। তার কালসীমা ধরা হয় আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই কালে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি। দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সংস্কৃত নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভাষায় রূপ লাভ করেছে। এই রূপান্তর এতখানি পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এগুলিকে পৃথক ভাষা হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই

দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়, সংস্কৃত আজ মৃতপ্রায় ভাষা এবং প্রাকৃত-পালি-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা মৃত। একদা সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য চরম সমৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য পঠন-পাঠনের মধ্যে কেবল সংস্কৃত ক্ষীণ অবস্থায় বেঁচে আছে। মৌখিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত মৃত।

ভাষার দুটি রূপ—কথ্য ও লেখ্য। ভাষা বিবর্তিত হয় কথ্যরূপের উপর ভিত্তি করে। তাই যে-ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা অধিকতর হয় সেই ভাষাই দ্রুত রূপান্তরিত হয়। প্রথমে সৃষ্টি হয় উপভাষার। তারপর আঞ্চলিক রূপগুলি পৃথক হতে হতে যখন পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পেয়ে যায়। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় এই ধরনের আঞ্চলিক উপভাষার সৃষ্টি হয়েছিল অনেকগুলি। সেগুলি হল : উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্য-মধ্যা, প্রাচ্যা, পৈশাচী প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত ও অর্ধ মাগধী এবং ঐসব প্রাকৃতের অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা। এগুলির মধ্যে কিছু ছিল জনসাধারণের জীবন্ত উপভাষা, কিছু সাহিত্যিক ভাষা। তবে সবই কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সময়ে মূলত মধ্যদেশের প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বয়ী ভাষা গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, সেই ভাষার নাম পালিভাষা। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম শিথিল হয়ে পড়লে পালি ভাষাও মরুপথে হারিয়ে যায়।

জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতায় আছে :

> মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
> থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আবহমান মানব-ধারা অব্যাহত থাকে ঠিকই, তবে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনায় আসে নতুন সমাজ-নির্ভর শব্দাবলি। Lexico-Statistics অনুসারে দেখা যায়, একই ভাষায় যুগে যুগে বহু শব্দাবলির আগমন হয় এবং প্রায় সম-সংখ্যক শব্দাবলির বিলুপ্তি ঘটে। প্রাচীন বাংলায় (খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) এমন বহু শব্দাবলি ছিল যা আজ আর নেই। যেমন চর্যাগীতির কবি লুই-এর একটি গানের অংশ বিশেষ :

> ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
> ধমণ-চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।।

আধুনিক বাংলায় এই পদের অর্থ এইরূপ : 'লুই বলছেন, আমরা ধ্যানে দেখেছি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দুই পিঁড়িতে বসেছি।' [ধমণ-চমণ] (= নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস), আমহে (= আমরা), ঝাণে (= ধ্যানে), দিঠা (= দেখেছি), বেণি (= দুই), পিণ্ডি (= পিঁড়ি), বইঠা (= উপবিষ্ট)]—বৌদ্ধধর্মের যোগসাধনার জন্য এই জাতীয় বহু শব্দাবলির আগমন হয়েছিল। চর্যাগীতিকাগুলির সৃজনের মূলে যে বৌদ্ধধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের বাতাবরণ ছিল, তা দ্বাদশ শতাব্দীতে ম্লান হতে থাকে। ফলে 'সন্ধাভাষা'-ভিত্তিক চর্যাগীতিকার ভাষা-ধারাও ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। সমাজ-বিবর্তনের ধারায় এল আদি-

মধ্যযুগের রূপরেখা (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ—১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)। আদি-মধ্যযুগের বাংলায় রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* দেখা গেল ভাষার নবতর ধারা :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।

[বাএ = বাজায়, নইকূলে = নদীকূলে, বেআকুল = ব্যাকুল, শবদেঁ = শব্দে, আউলাইলোঁ = অব্যবস্থা হল, রান্ধন = রন্ধন]

স্মরণ করা যেতে পারে, এই কালে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর, বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের বিস্তার ঘটেছে এবং ভাষা দ্রুত বিবর্তনমুখী হয়ে উঠেছে। ভাষার সাবলীল স্বচ্ছন্দ রূপটি ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধে উঠল, জীবনমুখী ও হৃদয়মুখী হয়ে উঠল :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।

সমাজ ও যুগ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাষার শব্দাবলির বিলুপ্তি ঘটতে পারে, তেমনি আবার ভাষার মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শব্দাবলি কিছু থাকে। এই জাতীয় শব্দভাণ্ডারকে বলা হয় Basic Core Vocabulary। এগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ও জাতির গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। আমূল সামাজিক বিপ্লব এবং ভাবগত বিবর্তন ব্যতীত এই জাতীয় শব্দাবলির পরিবর্তন হয় না। যেমন—বাবা, মা, আমি, তুমি, হাত, পা, মাথা, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি। বস্তুত ভাষা নদীর মতোই বিবর্তনধর্মী। আর সেই বিবর্তন সাধিত হয় দেশকাল-সমাজ প্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে। স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটির কিছু অংশ :

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এমন এক যুগ-নায়িকাকে চিত্রিত করেছেন, যে মুখে লোধ্ররেণু মাখে, হাতে লীলাপদ্ম ধারণ করে, কানে কুন্দকলি ও মাথায় কুরুবক ফুল গুঁজে আধো-আধো বাজা নূপুর পায়ে পরে প্রেমিকা-নায়িকা হয়ে উঠেছে। প্রেমিকা-নায়িকার এই প্রসাধন আধুনিক কালে অপ্রচলিত। ফলে ভাষার মধ্যে এই জাতীয় শব্দাবলি ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত-মুখী হয়ে যাবে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থে সেকালের কলকাতার চলিত ভাষার জীবন্ত রূপটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল :

> ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্যে মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘুরে যায়—দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এত দুঃখের ছেলে বড় হয়ে যদি সুসন্তান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীয়ন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়সির কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছে হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়ে যায়, আর মনে হয় যে পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই।

এই চলিত ভাষায় 'জীয়ন্তে', 'দোফাঁক', 'সেঁদুই' প্রভৃতি শব্দ সেকালের মাটির ফসল ছিল। কিন্তু এই ভাষাও ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে থাকে। একদিকে আরবি-পারসি-ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাব, তথা শব্দাবলির অনুপ্রবেশ, অন্যদিকে কথ্যভাষায় মার্জিত রুচির ছোঁয়া দেবার প্রবণতা শুরু হল। বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* গ্রন্থ থেকে তার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

> খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্‌কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ছুরিখান তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নখরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁ গা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিক্‌নেস্ হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে, পুঁথিতে কিছু পেয়েছো?

রামমোহন-বিদ্যাসাগর এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও পর্যুদস্ত হয়ে গেল কলকাতা-কেন্দ্রিক কথ্যভাষার কাছে। এজন্যই একদা বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।'

ভাষার এই গ্রহণ-বর্জনই হল ভাষার জন্ম-মৃত্যু। কোনো ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারে কখনো কখনো হুজুগে শব্দের আগমন ঘটে। যেমন, সিনেমা-অনুযায়ী শাড়ির নাম—পাকিজা শাড়ি, আরাধনা শাড়ি, বালিকা বধূ ব্লাউজ; মস্তান-গুণ্ডাদের ভাষা—'বড়খোকা' (= বোমা), 'মায়ের ভোগে' (= মৃত্যু) প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি ঐ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো অল্পকাল সাদরে প্রচলিত হয় মাত্র, দ্রুত এদের মৃত্যু ঘটে। আর এক প্রকারে ভাষার কিছু শব্দাবলির মৃত্যু হয়। মানুষের জীবন-ধারায় পরিবর্তন হলে কিছু শব্দের অপমৃত্যু ঘটে। যেমন, একদা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। তখন সাধারণেও জানত বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃহৎ প্রাণেশ্বর প্রভৃতি আয়ুর্বেদিক ঔষধের নাম, এখন যেমন জানে অনেক এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের নাম। প্রকৃত প্রস্তাবে, নদী আপন মর্জিতে বয়ে যায়। কিন্তু ভাষা-নদী বয়ে চলে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার মর্জিতে। তবে মানুষের জন্ম-মৃত্যু যেমন অনিবার্য, ভাষা-নদীরও বিবর্তন ও বিলুপ্তি তেমনি অপ্রতিরোধনীয়।

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব-জগতে সব থেকে প্রভাব বিস্তারকারী মনঃবিশ্লেষণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে মনশ্চিকিৎসায়, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই তত্ত্বের সারাৎসার হল, মনের গহনে অচেতনে বা অবচেতনে যে মননপ্রক্রিয়া ঘটে চলে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পীড়িত মানুষের মনশ্চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই কারণে অনেকে একে 'গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক মনস্তত্ত্ব'-ও বলে থাকেন।

এই তত্ত্ব বিষয়ক আলোড়নের সূত্রপাত ঘটান অস্ট্রিয়ার স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড, তাঁর রোগচিকিৎসার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই তত্ত্ব নির্মিত এবং এই 'মনঃসমীক্ষণ' (সাইকোঅ্যানালিসিস) নামটি তাঁরই উদ্ভাবন। ১৮৯০ সাল নাগাদ ফ্রয়েড, ভিয়েনায় তাঁর অন্য এক সহযোগী জোসেফ ব্রয়ারের সঙ্গে বায়ুরোগীদের চিকিৎসার জন্য সম্মোহন নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁরা দুজনেই লক্ষ করেন যখন এই ধরনের মনোরোগীরা সম্মোহিত অবস্থায় তাদের মনের গভীর গোপন ভাবনা ও উদ্দীপনা সজ্ঞান সচেতন স্তরে ভাবমোক্ষণ করে থাকে, তখন তারা অনেক সুস্থ বোধ করে।

ফ্রয়েড পর্যবেক্ষণ করলেন, সম্মোহিত অবস্থা ছাড়াও তাঁর রোগীরা অনর্গল, যথেচ্ছ ও সদৃচ্ছ প্রক্রিয়ায় কথা বলতে পছন্দ করে। তিনি তা অনুমোদন ও উৎসাহিত করলেন এবং এই পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ ভাবানুষঙ্গ (ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন)। এইভাবে এই পদ্ধতিতে কোনো প্রতিরোধ ছাড়া রোগীর যা মনে আসে সে ততই বলার সুযোগ পায়। এইভাবে বলতে দিয়েও ফ্রয়েড লক্ষ করলেন এমন বহু বেদনাদায়ক বা পীড়নমূলক স্মৃতি রোগীর মনের ভেতরে থাকে যা সে সজ্ঞান স্তরে তুলে আনতে চায় না। সে ঐ স্মৃতিগুলিকে অবদমিত করে রাখে বা তাদের কোনোভাবে প্রকাশ্যে আনতে চায় না। এইভাবে রোগীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ফ্রয়েড লক্ষ করলেন, প্রথমদিকে তিনি যতগুলি এই অবদমন করার রোগী পেয়েছেন, তার সব কয়েকটি যৌন-উদ্দীপনায় পীড়িত হওয়া সম্পর্কিত। এর থেকে তিনি প্রকল্পিত করলেন, আমাদের যৌন-উদ্দীপনার মধ্যে যে আবেগজাত চালিকাশক্তি (লিবিডো) প্রচ্ছন্ন থাকে, তা অবদমিত হবার ফলে আমাদের উদ্বিগ্ন অবস্থা তৈরি হয়। ক্রমে আমরা আমাদের এই অবদমিত লিবিডো হয়ত নানা রোগলক্ষণ-উপসর্গের মধ্যে প্রকাশ করে থাকি। কখনো তাকে আমরা মানসিক

আত্মরক্ষা প্রক্রিয়াও বলে থাকি। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা এই উদ্বিগ্ন বায়ু তৈরির ধারণাকে আরো বর্ধিত করে এই ধরনের বিভিন্ন অবস্থাগুলিকে সংযুক্ত করেন। তারমধ্যে ছিল—ভয়, আতঙ্ক, অপরাধবোধ, আক্রামক ও হিংসাত্মক মনোভাব সম্পর্কিত অলীক-কল্পনা, কোনো নির্ভরশীল আন্তঃমানবিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব বোধ ইত্যাদি।

ফ্রয়েড তাঁর অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিকে অন্যতম করণকৌশল হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই ধরনের অভিজ্ঞতা যথা স্বপ্ন, মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়া কথা, আত্মবিস্মৃতি, ঘটে যাওয়া নানা ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদির অর্থময়তা নিয়ে চর্চা শুরু করেন। ক্রমাগত এই ধরনের বিষয়গুলির অনুসন্ধানের ফলে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করেন এবং ঐ ধারণা প্রকল্প আকারে পেশ করেন। এই কাঠামোর অন্তর্বস্তু হল মনের মধ্যে ইদ, ইগো ও সুপারইগোর উপস্থিতি। এর মধ্যে ঈদ হল আমাদের আদিম অচেতন শক্তি-ভাণ্ডার। এর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে আমাদের মনের সমস্ত কামনা-বাসনা, জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য জিনগত ও অন্তর্নিহিত দৈহিক শক্তি। আর ইগো হল ঐ সমস্ত অবদমিত কামনা-বাসনা অচেতন থেকে সচেতন স্তরে যাতায়াত করার একটি মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তরে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করে বাইরের জগৎ থেকে পাওয়া সংবেদন ও জ্ঞানাত্মক ভাবনাচিন্তার উদ্দীপনাগুলির ভাবাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে কর্মসম্পাদনায় প্রয়াসী হয়। তেমনি সুপারইগো গঠিত হয় ব্যক্তির পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ থেকে পাওয়া এবং গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, জীবনচর্চার উঁচুস্তরের ভাবাত্মক বিষয়গুলি দিয়ে। ফ্রয়েডের মতে সুপার ইগো, ইগোর মানসপ্রহরীর কাজ করে থাকে।

ফ্রয়েডীর ভাবনাচিন্তার কাঠামোয়, এই তিন ধরনের প্রকোষ্ঠের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমাদের অবদমিত কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্য উদ্বিগ্ন বায়ু দেখা দেয়। যদি ঐ ব্যক্তি সময়মত তার আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়াগুলি, যা সে তার পরিবার ও সমাজ থেকে ক্রমাগত চর্চা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে শিখে থাকে, ব্যবহার করতে পারে তাহলে সে হয়ত এই সমস্যা থেকে রেহাই পায়। এই সমাজ-সংসারে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হলে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে মনোবিকার থেকে রক্ষা করতে হলে, তাকে ঐ আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়াগুলি শিখে ফেলতেই হয়। ফ্রয়েডের মতে, বায়ু রোগে ও উন্মাদ রোগে তুলনায় এই আত্মরক্ষামূলক অভিযোজন প্রক্রিয়ার কোন গুণগত পার্থক্য থাকে না, শুধুমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকে।

ফ্রয়েড এও লক্ষ করেছিলেন যে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেমন একটি আবেগজাত সম্পর্ক তৈরি হয় তেমনি চিকিৎসকের প্রতি রোগীরও একধরনের অভিভাবকের প্রতি আবেগজাত নির্ভরশীলতার সম্পর্ক (ট্রান্সফারেন্স) তৈরি হয়। ফ্রয়েড ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এই ধরনের জোরালো সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ফলে অচেতন বা অবচেতন ভাবে রোগী মনঃবিশ্লেষককে তার ঘনিষ্ঠ মানুষ মনে করতে পারে এবং তার অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে সুবিধা হয়। ফলে রোগী তার

অবদমিত কামনা-বাসনাকে প্রকাশ করার বিষয়ে কোনো মনোরোধ অনুভব করে না এবং তখন ঐ অবচেতন মনন-প্রক্রিয়ার উৎসগুলিকে খুঁজে বার করতে মনোবিশ্লেষককে তেমন বেগ পেতে হয় না। এরই ফলে মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব দ্বারা মনশ্চিকিৎসা সফল হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

ফ্রয়েড, আমাদের মনের জৈবিক প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে প্রকল্প চালু করেছিলেন তাতে শুরুতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে দেখা যায় তাঁর প্রকল্পিত তত্ত্বের বিষয়ে নানা ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে এবং অনেকগুলি গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে ফ্রয়েডের এককালের সহযোগীরাই এই ভাঙনের মধ্যে ছিলেন। যেমন কার্ল য়ুং, অটো র‍্যাঙ্ক, অ্যালফ্রেড অ্যাডলার, হ্যারি সুলিভ্যান প্রমুখের মূলগতভাবে ফ্রয়েডের মূল তত্ত্ব থেকে সরে আসেননি, শুধু এর টীকা-ভাষ্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে আপন আপন মতামত তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই তত্ত্বের আরো প্রবক্তরা হলেন এরিক এরিকসন, ক্যারেন হর্নি, এরিক ফ্রম প্রমুখেরা। এক সময় দেখা গিয়েছিল ফ্রয়েড যেন মনোরোগ চিকিৎসকদের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে রয়েছেন; কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল এই রাজত্বে মনোবিদ্‌রাও আসন বিছিয়ে নিয়েছেন এবং মনশ্চিকিৎসার কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কিত পরবর্তীকালে যে কাজ হয় তার সবটুকু শিশুদের বৃদ্ধি-বিকাশকে ঘিরে। ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বের মধ্যে মনকে ইদ্, ইগো, সুপারইগো ইত্যাদি যে তিনটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করেন তা তিনি পরবর্তীকালে আরো বর্ধিত আকারে পেশ করেন। এর মধ্যে নারীদের যৌন-আচরণের বিষয়টি এবং উদ্বিগ্ন বায়ু অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। তেমনি মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রোগচিকিৎসার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তা বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। যত দিন যা তত পরিলক্ষিত হয় যে সমাজভাবনা, নৃতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত দিককে এই তত্ত্ব প্রভাবিত করে চলেছে। বলা যেতে পারে, আমাদের আধুনিক সমাজ ও জীবনচর্চায় এমন কোনো বিষয় বা দিক নেই যেখানে ফ্রয়েডের এই মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেনি।

ফ্রয়েড ছিলেন ইউরোপীয় নবজাগরণের ফসল। তাই সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে বলা যায় ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব সেই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপে মন ও আত্মাকে সমাকলিত করে দেখা হত। এই প্রেক্ষাপটে ফ্রয়েড, মন সম্পর্কে আত্মার ধারণার ওপর জোরালো আঘাত হানেন এবং মন যে দেহের সঙ্গে যুক্ত পৃথক একটি ক্রিয়াশীল আধার, এই ধারণাটি ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠিত করেন। মনশ্চিকিৎসার জগতেও দেখা যায় প্রধান প্রধান যতগুলি ধারা এ বিষয়ে তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশের উৎসও হল মনঃসমীক্ষা ও মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব।

মঞ্চগীতি

দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় নাট্যচর্চার আদিতেই নাট্যসহায় হয়েছে গান—নাট্যসংগীত। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ মেলে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের সমাজে নৃত্য, মুদ্রা আর অঙ্গহারাদির মতো ব্যবহার ছিল গান তথা সংগীতের। সংস্কৃতধারা বাহিত ভারতবর্ষের নাট্যসৃজন পরবর্তীকালে ব্যাপ্তি পেল প্রদেশগত, অঞ্চলগত এবং ভাষাগত লোকনাট্যধারায়। প্রান্তে-প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা বহুবর্ণিল লোকজধারায় নাট্যভাবনা লালিত হল গানে গানেই। গুপ্ত এবং পাল যুগের গাথাকাব্যেও গানই ছিল মুখ্য। ষোল শতকের গোড়ায় শ্রীচৈতন্য-প্রসারিত যাত্রানাটকের গ্রন্থনও হল গানে গানে।

সংস্কৃত নাট্যধারা এবং পরবর্তী লোকনাট্যধারায় পুষ্ট ভারতীয় নাট্যচর্চা আঠারো শতকের শেষদশকে নতুন মোড় নিল থিয়েটার বা মঞ্চের প্রতিষ্ঠায়। কলোনিয়াল কালচারের প্রভাবে প্রসিনিয়ামের ঘেরাটোপে বহিরঙ্গনের নাট্যকলা ঠাঁই নিল মঞ্চে। পরিবেশন-রীতি গেল বদলে। প্রকরণের অনেক কিছু বাতিল হলেও সঙ্গী রয়ে গেল গান। সংলাপ-পরিবর্তে সে গানের পরিচয় 'থিয়েটারের গান' বা 'মঞ্চগান' বা 'মঞ্চগীতি'।

নাটককারের কল্পনায় জন্ম নেয় নাটক বা নাট্যলেখ। একক সাহিত্য-কীর্তিতে সঞ্জীবন আপন রচনার। প্রযোজনার সূত্রে সে রচনা বহুমানসের মননে রূপ পায় রঙ্গমঞ্চে। লিখিত নাটক মূল ভিত্তি হলেও অভিনয়, আলো, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা—এমত বিবিধ উপচারে পূর্ণতা পায় মঞ্চনাটক। স্থান-কাল-পাত্র বিচারে সংগীতও সেই অনুষঙ্গের দোসর। সংগীতের ব্যবহারিক প্রয়োগে আবহের পাশাপাশি জায়গা করে নেয় গান বা সুরনিবদ্ধ গীত। লিখিত নাটক যেমন মঞ্চনাটকের আধার মাত্র তেমনি সংশ্লিষ্ট গীতাংশ গীতিকাব্য মাত্র। তা পূর্ণতা পায় ভাষা, ভাব, সুর ও পরিবেশনার একত্র সম্মিলনে। লিখিত নাটকের অংশ হিসেবে নয়, নাট্যপরিবেশনের কালে যে গান মঞ্চভাবনার অঙ্গাঙ্গি সহায় তা 'মঞ্চগান' বা 'মঞ্চগীতি'। সে গান উপস্থাপিত হবে সংগীতধর্মিতায় নয়, নাট্যধর্মিতায়। সে উপস্থাপনের গান সংলাপের পরিবর্ত।

যাত্রানাটক, বেতারনাটক, পাঠনাটক, পথনাটক—এমন বহুধারার পাশাপাশি মঞ্চনাটকে স্বাতন্ত্র্যনির্ভর মঞ্চগান বা মঞ্চগীতি স্বনির্ভর সত্তা নয়, নাট্যনির্ভর অনুষঙ্গ। সেহেতু নাট্যগতিকে অব্যাহত রেখে সংলাপের পরিপূরক করে তুলতে হয় মঞ্চগীতিকে।

শুধুমাত্র দর্শক-শ্রোতার চাহিদায় নয়, অভিনেতৃদের ক্রিয়াদক্ষতায় নয়, কুশলী গীতরচনা বা সুররচনায় নয়, গতি সংযোজনায় মঞ্চে নাটক যদি সহায়-গতি পায় তবেই সে গান মঞ্চভাবনায় সার্থক। তখন মঞ্চের ওপর তো বটেই, মঞ্চের বাইরেও সে গান অনুরণিত হতে থাকে যুগ-যুগান্তরে।

ভারতীয় মঞ্চনাটকে গান, সংলাপের পাশাপাশি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। উপনিবেশ সংস্কৃতির বাস্তববাদী নাট্যধারায় গানের ব্যবহার কম হওয়ার কথা। কিন্তু ভারতীয় মননের সংগীতপিপাসা তা মেনে নেয় নি। তাই ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির বোলচালের সঙ্গে মিশেছে লোকায়ত কীর্তন-বাউল-ফকিরির অন্তরঙ্গতা। তমাসা-নওটঙ্কি-ছত্তিশগড়ি ছন্দসুরের পাশাপাশি সহজ ঠাঁই করে নিয়েছে খেউড়-খেমটা-ভাওয়াইয়া। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতিপর্বে বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে নাট্যগঠনে, ভাবনায় ও প্রয়োগে। কিন্তু দেখা গেছে গানের ব্যবহারে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—সব অঞ্চলই আস্থাশীল রয়ে গেছে।

মঞ্চ নাটকের শুরু পূর্বাঞ্চলে—বাংলায় তথা কলকাতায়। ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫—চৈতন্যযাত্রার ঐতিহ্যানুসারী বাঙালির জীবনে সূচনা হল নতুন অধ্যায়ের। এক ভিনদেশি সংগীতকারের হাত ধরে শুরু হল শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের মঞ্চপরিক্রমা। সৌভাগ্যের সন্ধানে সুদূর রাশিয়া থেকে মাদ্রাজ-ঘুরে (বর্তমান চেন্নাই) কর্নওয়ালিশের আমলের কলকাতায় এসেছিলেন গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্ (১৭৪৯-১৮১৭)। পেশা ছিল বেহালা আর চেলো বাজানো। দেশের মানুষের সঙ্গে মেশার তাগিদে শিখতে লাগলেন সংস্কৃত আর বাংলা ভাষা। সেই ভাষার টানেই এই বিদেশির মনে জন্ম নিল বাংলায় থিয়েটার করার একান্ত বাসনা। তাঁর কলমে অনূদিত হল The Disguise—*কাল্পনিক সংবদল*। দর্শকদাবি মেনে নিয়ে এ প্রযোজনায় সংযোজিত হল বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২-১৭৬০) গান।

মারাঠি থিয়েটারের সূত্রপাত ১৮৪৩-এ বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বই)। বিষ্ণুদাস ভাবের (১৮২৩-১৯১০) নির্মিতিতে গানে গানেই সৃজিত হল 'সীতা সয়ম্বরা আখ্যা'। ১৮৫৩-য় বোম্বাইতেই পার্সি থিয়েটারেরও প্রতিষ্ঠা হল গীতনির্ভর 'ইন্দ্রসভা'র প্রযোজনায়। উর্দু নাটককার আমানতের রচনায় গানই তৈরি করেছিল মঞ্চভূমি। হিন্দি থিয়েটারের শুরুতেও গান-মুখ্য। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের রচনায় ১৮৬৮তে নতুন চেহারা পেল বাঙালি কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। বাংলা-হিন্দি বলয়ের এমন এক সেতু রচনার কাজ নির্বাহ করল মঞ্চগীতি।

দু শতকের পরিক্রমায় মঞ্চগীতির ব্যবহারে বাংলা ও মরাঠি থিয়েটার ধারাবাহিক সৃষ্টিশীল থেকেছে। বাংলার মঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭), মরাঠি মঞ্চে আন্নাসাহেব কির্লোস্কার (১৮৪৩-১৮৮৫) মাস্টার দীননাথ (১৯০০-১৯৪২) শুধু নিজভূমে নয় সারা ভারতের মঞ্চগীতিতে নূতনের দিশারী। মঞ্চের দাবিতে লিয়েবেদেফ্ নিজে গান লিখতে পারেন নি বলে নিঃসংকোচে হাত পেতেছিলেন

কবি ভারতচন্দ্রের কাছে। মঞ্চ ইতিহাসে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বয়ং গান লিখলেও কাব্যরচনায় অপারগ নাট্যকারদের জন্য কলম ধরেছেন ভিন্ন কবি বা গীতিকার। প্রযোজনার দাবিতে মঞ্চগীতির বহু ইতিহাস তৈরি করেছেন সুরকাররাও।

মঞ্চনাটকের ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, বহুক্ষেত্রেই মঞ্চগীতি গড়ে তুলেছে নাট্যের প্রাণ, মঞ্চগীতির মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে নাট্যঘটনা ও নাট্যসংঘাত। সময়ের তালে পা ফেলে পালটেছে রূপরেখা। নানা প্রতিভার ছোঁয়ায় জন্ম নিয়েছে নয়া সংলাপধর্মিতা। গানও সেই নিরীক্ষার সঙ্গী। মঞ্চভাবনার বহুধা বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে সংগীতের সমৃদ্ধ ধারা—'মঞ্চগান' বা মঞ্চগীতি। কখনো সুরের মায়ায়, কখনো ভাবের আবেগে, কখনোবা কাব্যের টানে মঞ্চনাট্যে এনেছে গতি। মঞ্চগীতির সুরনিবদ্ধ সৌন্দর্যে প্রাণ পেয়েছে রঙ্গমঞ্চ।

মন্তাজ

সুরঞ্জন রায়

রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই লেনিন অনুধাবন করেছিলেন সিনেমার অন্তহীন সম্ভাবনাকে। তাঁর নির্দেশে তাই অজ্ঞান জনসাধারণের চেতনা উন্মেষের কাজে নিয়োজিত হল সোভিয়েত চলচ্চিত্র। আইজেনস্টাইন-পুদোভকিন-কুলেশভদের সাধনায় ঝলমল করে উঠল ছায়াছবির নির্বাক শরীর।

পরস্পর সম্পর্করহিত দুটি জগতের সংঘর্ষ বা দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি আইজেনস্টাইনের চেতনায় জন্ম দিল 'মন্তাজ' তত্ত্ব নির্মাণের প্রবল আগ্রহ। চলচ্চিত্রের আদিগুরু তাঁর 'অক্টোবর' (১৯২৮) সিনেমায় কেরেনেস্কি চরিত্রটি এবং সারি সারি মদের গ্লাস ও টিনের সেনাদের পরপর সাজিয়ে কেরেনেস্কির ক্ষণভঙ্গুরতার কথাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'মন্তাজ' তত্ত্বকে বুঝতে চেয়ে আমাদের সামনে বহুব্রীহি সমাসেরই একটা আদল স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। 'পীত অম্বর যাহার' বলতে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের চেহারাটা যেভাবে ফুটে ওঠে আমাদের মানস-পর্দায়, চলচ্চিত্রে মন্তাজের প্রয়োগ সেভাবেই আলোড়িত করে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে।

এই পদ্ধতির অসামান্য প্রয়োগে উজ্জ্বল হয়ে আছে চ্যাপলিনের 'মর্ডান টাইমস্' (১৯৩৬)-এর শুরুর দৃশ্যটি—বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে ভেড়ার পালকে মিশিয়ে তিনি ঘা দেন আমাদের চেতনার ভিত্তিমূলে! মনে করুন 'অপরাজিত' (১৯৫৬) ছবিতে হরিহরের মৃত্যু দৃশ্যটির কথা। সর্বজয়ার কোলে ধরা আছে মৃত্যুপথযাত্রী হরিহরের মাথা। অপুর আনা গঙ্গাজল স্বামীর মুখে ঢেলে দেয় সর্বজয়া, কষ বেড়ে গড়িয়ে পড়ে জল—মৃত স্বামীর বুকে আছড়ে পড়ে সর্বজয়া। ক্যামেরা কাট করে চলে আসে দশাশ্বমেধ ঘাটে—সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যায় প্রায়ান্ধকার আকাশের নিঃসীম শূন্যতায়, আবহে ভেসে আসে সর্বজয়ার কাতর কান্না-'একী হল, একী হল'। এখানে মন্তাজের প্রয়োগে দেখানো হল হিন্দুধর্মের বিশ্বাস মতোই এক সৎ ধর্মভীরু গ্রাম্য পুরোহিতের আত্মা ঊষার পবিত্র আলোয় ওই পায়রার ঝাঁকের মতোই মিলিয়ে গেল অনন্ত শূন্যতায়।

মন্তাজ প্রকরণের জন্ম যদিও সিনেমার শৈশবেই, আজ কিন্তু তার বিচিত্র প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমরা বিমোহিত। বহুল ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হলিউড যদিও এর প্রয়োগকে করে তুলেছে অনেকটাই তরল। গ্যাংস্টার ছবির অতি চেনা ব্যবহারগুলো আজ আমাদের

দেশের দর্শকদের কাছেও সুপরিচিত। খবরের কাগজের হেডিং থেকে বাস্তব ঘটনায় চলে যাওয়া, ট্রেনের ঘুরন্ত চাকার দীর্ঘ শট অথবা ক্যালেন্ডারের পাতার খসে খসে পড়া থেকে আমরা আজ ঘটনার নির্দেশ অনুভব করতে পারি। 'শাখা-প্রশাখা'-য় অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসা ছেলে-বউদের উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়ার পর শিল্পী খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যে মালা গেঁথে তোলেন তা হয়ে ওঠে মন্থরগতি যাপনের কাব্য।

মাইক্রোবায়োলজি

তুষার চক্রবর্তী

জীবাণুদের বিষয়ে সবরকম চর্চা ও গবেষণাই হল জীবাণুবিদ্যা বা (Microbiology)। বিষয়টিকে কেউ কেউ অণু-জীববিদ্যা বলেও উল্লেখ করেন। বাংলা ভাষায় যেহেতু 'অণু' শব্দটি একদিকে যেমন 'ক্ষুদ্র' অর্থে ব্যবহার হয়—তেমনি রাসায়নিক Molecule বোঝাতেও একই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে—সুতরাং, আমার মতে Microbiology অর্থে জীবাণুবিদ্যা এবং Molecular Biology অর্থে প্রাণাণুবিদ্যা ব্যবহার করলে সম্ভবত এই গোলমালটুকু এড়ানো যায়।

Microbe বা জীবাণু বলতে আমরা বুঝি অতিক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক এককোষী জীবদের যারা খালি চোখে অদৃশ্য এবং অণুবীক্ষণের দ্বারা যাদের দেখা ও সনাক্ত করা যায়। এদের মধ্যে একদিকে যেমন আছে ব্যাকটিরিয়া এবং আর্কা (Archae) শ্রেণীর কেন্দ্রক-হীন (prolcargotic) জীবাণু অন্যদিকে প্রোটিন শ্রেণীর ছত্রাক, ফাংগাস্, মোল্ড এবং প্রোটোজোয়া এবং অ্যালার্জি জাতীয় কেন্দ্রক-যুক্ত (eulcargotic) জীবাণু। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবটি সম্ভবত ঘটেছিল কেন্দ্রকহীন ব্যাকটিরিয়াদের আদি রূপের মধ্যে। এদের DNA সচরাচর বিরাজ করে নগ্ন, অতিকায় এবং বৃত্তাকার অণু হিসেবে। প্রোটিস্ট জাতীয় জীবাণুদের সংগঠন জটিলতর। এবং কোষাঙ্গ (orguncllc)-যুক্ত এবং এদের DNA থাকে উচ্চতর প্রাণীদের মতোই ক্রোমোজোমের মোড়কে আবৃত অবস্থায়। পৃথিবীতে উচ্চতর বহু-কোষী উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে প্রোটিস্টদের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

ভাইরাস যখন কোষের বাইরে থাকে তখন তারা বাস্তবিক পক্ষে নিষ্প্রাণ ও জটিল গঠনের মিশ্রকেলাস মাত্র (Virion)। কিন্তু, কোষের অভ্যন্তরে তারা সপ্রাণ জীবের মতই আচরণ করে। তাই প্রাণ ও অপ্রাণের সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা এই ভাইরাসদের চর্চা জীবাণুবিদ্যারই অঙ্গ।

এটা বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে জীবাণুবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত সূত্রপাতের মূলে রয়েছে লিউয়েন হুকের অণুবীক্ষণ আবিষ্কার—যা উন্মোচিত করে জীবাণুদের অদৃশ্য জগৎ। কিন্তু করণকৌশল হিসেবে জীবাণুদের ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনে মানুষ হাত পাকিয়েছে সভ্যতার আদি যুগ থেকেই। আদিম মানুষ যে সব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল তাঁর মধ্যে একটি হল fermenta-

tion বা সন্ধানক্রিয়ার সুলুকসন্ধান। একটি পাত্রে ফলের রস বা যে কোনো ভোজ্য তরল কিছুদিন রেখে দিলে তার মধ্যে যে সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে সন্ধান প্রক্রিয়া তাদেরই অন্যতম। এর ফলেই—ফলের রস পরিণতি লাভ করে মদিরায়। মাদকতা ও স্ফূর্তির এই অসামান্য উপকরণটির আবিষ্কার আদিম জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু তুখোড় ব্যক্তি বহুদিন নিজেদের মধ্যে গোপন রেখেছিল। অমৃত বা elixir of life-এর কল্পনার উৎসও সম্ভবত এই আবিষ্কার।

প্রাচীন উপকথা ও অতিকথাগুলির মধ্যে এমনই ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে। তথাকথিত দেবতা ও অসুরদের মধ্যে 'অমৃত'-কে কেন্দ্র করে বিবাদের মূল হেতুও ছিল সম্ভবত এই জ্ঞানের অধিকার।

এছাড়া, জীবাণুবিদ্যার অন্য একটি শিকড় ছড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধ এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস প্রথম এই মত ব্যক্ত করেন যে বহু রোগের কারণ হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অদৃশ্য জীব। যাই হোক, জীবাণু আবিষ্কারের (অনুবীক্ষণে) পূর্বাবধি বিষয়টি ছিল নানাবিধ হেঁয়ালিতে ভরা। অণুবীক্ষণের আবিষ্কার বিষয়টিকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করল।

জীবাণুদের সনাক্তকরণ, বর্গীকরণ, বিবর্ধন (Culture), তাদের গঠন ও কার্যকলাপের বিশ্লেষণ এবং জীবাণুদের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত ব্যবহার এসবই জীবাণুবিদ্যার চর্চার অঙ্গ। খাদ্য-সংরক্ষণ, অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধশিল্পে এবং জিন প্রযুক্তিতে জীবাণুবিদ্যার দৈনন্দিন প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল ব্যাকটেরিয়ার মত কেন্দ্রক-হীন এককোষী জীবাণুদের মধ্যে। আকারে ছোটো এবং খালি চোখে দৃশ্যমান না হলেও এইসব জীবাণুদের কার্যক্ষমতা অপরিসীম। সমগ্র জীবজগৎ এবং পরিবেশ জীবাণুদের জীবনচক্রের ওপর নির্ভরশীল। এদের বংশবৃদ্ধির হার যেমন চমকপ্রদ দ্রুত হতে পারে—তেমনি এরা বছরের পর বছর অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় 'সুপ্ত' বা dormant হিসেবে থেকে যেতে সক্ষম।

পরিবেশকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতায় এরা জীবজগতে অদ্বিতীয়। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে খনির অতল গভীর তলদেশ, সমুদ্রবক্ষ, মেরুপ্রদেশের শৈত্য বা হিমালয়ের চূড়া—সর্বত্রই এদের বাসভূমি। যে পরিমাণ বিকিরণ এক লহমায় মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয় তার হাজার গুণ বিকিরণ সহ্য করে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে এমন ব্যাকটেরিয়াদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

আমাদের দেহের চামড়ার প্রতি ইঞ্চিতে বাসা বেঁধে আছে গড়ে প্রায় এক লক্ষ জীবাণু। এক চামচ বাগানের মাটিতে পাব গড়ে হাজার কোটি ব্যাকটেরিয়া। সুতরাং সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে এরা যে জীবজগতের সিংহভাগ অধিকার করে আছে তা সহজেই অনুমেয়।

যদিও অনুবীক্ষণে জীবাণুদের আশ্চর্য জগৎ আবিষ্কারের কৃতিত্ব লিউয়েন হুকের প্রাপ্য—জীবাণু ও রোগের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন রবার্ট কক্। লুই পাস্তুর এটা

প্রমাণ করেন যে জীবাণুরাই জীবাণুদের জন্ম দেয়—এবং এদের স্বতঃ উৎপাদন অসম্ভব। জোসেফ লিস্টার জীবাণু ধ্বংস ও জীবাণুমুক্তকরণের জন্য তাপ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের দ্বারা শুধু যে অস্ত্র চিকিৎসাকে সঙ্কট মুক্ত করেন তাই নয়—গোটা সভ্যতার স্বাস্থ্যবিধিতে এক অসামান্য অবদান রাখেন। এই রবার্ট কুকের উদ্ভাবিত জীবাণুদের বিশুদ্ধভাবে বিবর্ধনের (culture) পদ্ধতিটি জীবাণুবিদ্যাকে পরীক্ষাগারের আওতায় নিয়ে আসে। অন্যদিকে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কার জীবাণুবিদ্যা-কেন্দ্রিক ঔষধ শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে।

যদিও কিছু কিছু জীবাণু এবং ভাইরাসদের রয়েছে পরজীবী সুলভ পটুত্ব যার ফলে তারা অন্য জীবের দেহে স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্তে থাকে এবং নিজেদের খাদ্য সেই জীবটির দেহ থেকে সংগ্রহ করে—এই বিপরীত মেরুতে রয়েছে স্বয়ং পোষিত (antotropic) ব্যাকটেরিয়া যারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ ও জীবন ধারণের জন্য চূড়ান্ত মাত্রায় স্বনির্ভর। এদের মধ্যে কারো কারো বাঁচার জন্য অক্সিজেনও লাগে না। তারা লোহা ও গন্ধকঘটিত যোগকে জারিত করে, বা অতিবেগুনী রশ্মি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। শিল্প উৎপাদনে এবং শক্তির বিকল্প উৎসসন্ধানে এইসব ব্যাকটেরিয়া ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। যদিও জীবাণুরা অভিযোজনপটু ও বিপরীত বা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে সক্ষম—পৃথিবীতে পরিবেশ রক্ষার মৌল ধাপগুলি যেমন কার্বনচক্র, নাইট্রোজেন চক্র, ইত্যাদির রূপায়ণে এদের ভূমিকাই প্রধান। মৃত জীব ও উদ্ভিদদের দেহ ও বর্জ্য পদার্থগুলিকে ভেঙ্গে এরা যেমন নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে পাশাপাশি পরিবেশকে নির্মল করে এবং জীব ও উদ্ভিদদের খাদ্যেরও যোগান দেয়। সুতরাং জীবাণুদের যে সচরাচর রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী ভীতিপ্রদ জীব হিসেবেই দেখা হয় তা খুবই একপেশে ধারণা। জীবাণুদের শেষ ধাপ মানব বন্ধু ও প্রকৃতির রক্ষক হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়।

এছাড়া বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রাণানুবিদ্যা এবং জিন প্রযুক্তির উত্থান সম্ভব হয়েছে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সরলজীব হিসেবে সপ্রাণ বস্তুদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে।

জিনের রাসায়নিক উপাদানটি যে DNA এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ব্যবহার করে। এবং অতঃপর প্রাণানুবিদ্যার প্রয়োগ শাখায় ব্যাকটিরিয়া ইকোলাই ছিল জীবজগতের মূল প্রতিনিধি। প্রাণানুবিদদের একটি ধরতাই বুলি ছিল—'যা ইকোলাইয়ের ক্ষেত্রে সত্যি তা হাতির বেলায়ও সত্যি হতে বাধ্য!' বস্তুত এই সোজাসাপটা মনোভাব অর্জন করার ফলেই অহেতুক জটিলতাগুলিকে পাশ কাটিয়ে সে যুগে প্রাণের মূল ও সর্বজনীন সত্যগুলিকে একের পর এক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। জিন প্রযুক্তি এবং জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও মূল পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল জীবাণুদের মধ্যে থেকে। জিন প্রযুক্তির আসল যন্ত্রপাতি বা ছুরি কাঁচির মতন যেসব উৎসেচক ব্যবহার হয় সেগুলির উৎস হল জীবাণুরাই। পলিমারেজ চেন রিকঅ্যাকশ নামের যে প্রযুক্তিটি আজ প্রাণানুবিদ্যার মূল হাতিয়ার তার মুখ্য

উপাদান পলিমারেজটি সংগৃহীত হয়েছে আর্কা জাতীয় জীবাণু থেকে। মানব জিনোম প্রযুক্তির সমাপনের পর আজ জিনোম প্রযুক্তির পরবর্তী ধাপ 'জিনোম থেকে প্রাণ' কর্মসূচিতে তাই বেছে নেওয়া হয়েছে জীবাণুদের। মনে হতে পারে এ যেন এক পা এগিয়ে দু পা পেছোন কিন্তু জীবাণুদের ক্ষেত্রে হাত না পাকিয়ে প্রাণশক্তিকে ইচ্ছেমত রূপান্তরকরণের দিকে পা বাড়ানো যে এক ধরনের চূড়ান্ত অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবাণুবিদ্যার ভবিষ্যৎ আজও অত্যন্ত উন্নত।

মার্ক্সবাদ

দীপক বিশ্বাস

১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে *প্যারিস পাণ্ডুলিপি* রচনা দিয়েই তরুণ কার্ল হাইনরিখ মার্ক্সের গভীর মানবিক সচেতনতার তাত্ত্বিক যাত্রা শুরু। এই গ্রন্থটি ও তার আগের কিছু রচনাতেও 'বিচ্ছিন্নতা' বা 'বিযুক্তি' তত্ত্বের (Theory of Alienation) সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন মানবদরদী মার্ক্স। মানবতাবাদী হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশের অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছে 'হেগেলীয় দ্বন্দ্বমূলক আদর্শবাদ' বা ভাববাদের সূত্র ধরে। পরবর্তীকালের পরিণত মার্ক্স ১৮৬৭ সালে রচিত *দাস ক্যাপিটাল*-এ হেগেলীয় 'স্ববিচ্ছিন্নতাবাদী নৈর্ব্যক্তিক দর্শন'-এর প্রভাব মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে আস্থা পোষণ করলেন। যদিও এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারায় তিনি মানবতাবাদী থেকে হয়ে উঠেছিলেন মূলত অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ। সুতরাং তরুণ মানবতাবাদী মার্ক্স এবং পরিণত বস্তুবাদী মার্ক্সের দুই আত্মিক সুর দুইরকম।

প্যারিস পাণ্ডুলিপি-তে মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার চারটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এক, ব্যক্তির সঙ্গে শ্রমপ্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্নতা; দুই ব্যক্তির সঙ্গে তারই সৃষ্ট বস্তুর বিচ্ছিন্নতা; তিন, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা এবং চার, ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রজাতি সত্তার (Species) বিচ্ছিন্নতা। এই শেষোক্ত বিচ্ছিন্নতাই মার্ক্সবাদের নিয়ন্ত্রক সুর। এই মতানুযায়ী ব্যক্তি তার সৃষ্টিশীলতার ভাগিদে তার শ্রমক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ সাধনে সক্ষম। কিন্তু পুঁজিবাদী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেহেতু সে একজন আজ্ঞাবহ দাস মাত্র সেহেতু সে তার সৃষ্টিশীলতার স্বাধীন প্রয়োগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এভাবেই সে নিজের আত্মিক ও মানবিক প্রজাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ও উৎসাহহীন।

যদিও মার্ক্সের এই শ্রমবিচ্ছিন্নতা তত্ত্বকেই মার্ক্সবাদের মূল ভিত্তি হিসাবে মেনে নিলে মার্ক্সকে আমরা শুধুমাত্র সংবেদনশীল শ্রমদরদী ভাবাবেগের অনুসারী হিসাবেই সীমায়িত করার দোষে দুষ্ট হব। অনেকের মতে পরিণত মার্ক্সের শ্রেণিবিশ্লেষণ ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা সর্বহারার শ্রেণিহীন কর্তৃত্বতত্ত্বের মতো গুরুগম্ভীর ও জটিল আলোচনা তাঁর মানবপ্রেমিক মননকে অনেকটাই ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্লেষণে *প্যারিস পাণ্ডুলিপি*-র বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব (অপরিণত) মার্ক্সের অর্থনৈতিক চিন্তাধারারই প্রাথমিক সোপান। ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা থেকে শ্রম-বিচ্ছিন্নতা এবং অনুষঙ্গ হিসাবে পুঁজিবাদী

উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিণত মার্ক্সকে অর্থনীতিবিদ হিসাবে উৎপাদন সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায়। সমাজমনস্কতার আঙ্গিকেই গড়ে ওঠে পরবর্তী *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* (১৮৪৮) ও *দাস ক্যাপিটাল* (১৮৬৭) রচনার অতি তাৎপর্যপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানীমুখী বস্তুনিষ্ঠ পরম্পরা। এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই জন্ম নিল একান্তভাবে মার্ক্সীয় মার্ক্সবাদ; যা তত্ত্বগতভাবে হেগেলীয় ভাবকেন্দ্রিক মানবতাবাদের বিরোধী। মানবতাবাদী বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এবং পর্যায়ক্রমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই উত্তরণ প্রক্রিয়া সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রমূলক নির্দেশাত্মক নীতির সীমা অতিক্রম করে সন্ধান দিল এক বৈপ্লবিক সমাজদর্শনের। ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ও বস্তুবাদী কার্ল মার্ক্স কালক্রমে হয়ে উঠলেন কালজয়ী রাজনীতিবিদ মার্ক্স।

১৮৪৫ সালে *The Holy Family* এবং ১৮৪৬ সালে *The German Ideology* গ্রন্থে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ যৌথভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক অবিচার, অসাম্য ও শোষণের মূল কারণগুলি যে মানুষের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করেই সৃষ্ট সেই বোধটারই বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা এবং বলতে চেয়েছেন, ইতিহাস হল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বস্তুকেন্দ্রিক পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকশিত রূপ।

উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সমাজবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। কেননা উৎপাদনের উপকরণগুলি ঐতিহাসিকভাবেই মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত থাকার ফলে উৎপাদন সম্পর্কটি হয়ে ওঠে বৈরদ্বান্দ্বিক—যে বৈরিতা তৈরি হয় উৎপাদনের উপকরণের মালিক আর উৎপাদনে সরাসরি নিযুক্ত অথচ মালিক নয় এমন দুই শ্রেণির মধ্যে। এভাবেই ঐতিহাসিক নিয়মেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব; যার অনিবার্য পরিণতি শ্রেণিসংগ্রাম। শোষণহীন, শ্রেণিহীন আদর্শ সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষে শ্রমিক শ্রেণিকে সুসংহত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব তাই প্রকৃত মার্ক্সবাদীর। সশস্ত্র শ্রেণিসংগ্রামকে হাতিয়ার করে বৈপ্লবিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল নেওয়াটাই তাই মার্ক্সবাদসম্মত।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়োজন হয় সংখ্যালঘুর দমনমূলক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার বা বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটাতে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রশক্তি শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং সংখ্যালঘু বুর্জোয়াশ্রেণির অবাধ মুনাফা ভোগের পরিধি বিস্তৃত করে। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে হেগেলীয় নিরপেক্ষতাবাদের কোনও স্থান নেই। মার্ক্স তাই দুনিয়ার শ্রমিককে আন্তর্জাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্যাপী এই ক্ষমতার লড়াই-এ সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শোষক ও শাসক শ্রেণির দমনমূলক প্রাধান্য বিস্তারকারী রাষ্ট্রকর্তৃত্ব শ্রমিক-শ্রেণি করায়ত্ত না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলতে থাকবে।

সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই হবে মার্ক্সীয় রাজনীতির লক্ষ্য। এরপর জনমুখী সামাজিক অগ্রগতির পথ ধরে

সমাজতান্ত্রিক স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদী, শ্রেণিহীন, শোষণহীন, উন্নয়ন-অনুকূল সমাজব্যবস্থা কায়েম হলে মানুষের জীবনযাপন ও জীবনদর্শনের সর্বতো উন্নতি ঘটবে। তখন সনাতনী ধারণার প্রথাসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকবে না। সেই অর্থেই মার্ক্সবাদ তথাকথিত রাষ্ট্রনায়ক শাসনযন্ত্রের অস্তিত্ববিরোধী। সুতরাং বলা যেতে পারে, শ্রেণিসংগ্রামের সূত্র ধরে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, Thesis, Anti-thesis এবং Synthesis-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই শ্রেণিহীন মার্ক্সীয় সাম্যবাদী সমাজগঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণই ছিল মার্ক্সের কালজয়ী গ্রন্থ *দাস ক্যাপিটাল* (১৮৬৭)-এর উপজীব্য বিষয়। *দাস ক্যাপিটাল*-এ উল্লিখিত মার্ক্সীয় অর্থনীতি সামাজিক শোষণ-প্রক্রিয়ার এক অতি বাস্তব বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ যা একান্তভাবেই দিন বদলের দলিল। উদ্বৃত্ত মূল্য, মূল্যমানের শ্রমতত্ত্ব, পুঁজিবাদী সঙ্কট ও ক্রমহ্রাসমান মুনাফার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে এক নতুন নিশানার দিশারী। মার্ক্স তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনার বিশ্লেষণে অনু তত্ত্বের বদলে ব্যাপক অর্থনীতির (macro-analysis) দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজির অনুপাতের অসমতার অসঙ্গতি সত্ত্বেও মূল্যমান ও উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের প্রয়োগগত ব্যাপকতার বিচারে তার যে বিশেষ তাৎপর্য আছে, সেই দিকটিতেই তিনি জোর দিয়েছেন।

আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে, মুক্তবাজারের পটভূমিতে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক ভাবনার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। যেমন, পুঁজিপতির পড়তি মুনাফাতত্ত্ব (falling rate of profit) উৎপাদন প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণের কারণে এবং উৎপাদন সম্পর্কে মূলধন নিবিড়তার প্রাধান্য বৃদ্ধির সুবাদে যথার্থ লাভে বঞ্চিত। আবার মার্ক্সীয় মূলধনের গঠনগত চরিত্রের অর্থাৎ স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন বা শ্রমের অনুপাতজনিত সরলীকরণ, যা উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের ও পড়তি মুনাফার হারের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে—তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। অন্যদিকে শ্রমের নিজস্ব অবদানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দুনিয়ার সব শ্রমিককে এক মাপকাঠিতে বিচার করা বিশ্ব-শ্রম সংহতির প্রয়োজনে রাজনৈতিকভাবে হয়ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অপরিহার্য। কিন্তু আজকের বাজার অর্থনীতিতে তথা বিশ্ববাণিজ্যের বাধ্যবাধকতায় আপেক্ষিক ব্যয় তত্ত্বকে এড়িয়ে শুধুমাত্র শ্রম-বিশ্বায়নের নিরিখে উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণ প্রক্রিয়ার মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনা ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *ক্যাপিটাল* তাত্ত্বিকবিচারে এক সংযত, সামগ্রিক, সুনির্দিষ্ট এবং সহনশীল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। সমাজবদলের অপরিহার্য অকাট্য যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক মননের মানবিকতাবোধে তা সম্পৃক্ত। এই সূত্রেই মার্ক্সবাদ চিরন্তন এবং সদা প্রাসঙ্গিক।

মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

শিল্পকলা বিষয়ে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ যা কিছু বিক্ষিপ্তভাবে বলেছেন, বেশির ভাগই চিঠিপত্রে, তার বেশির ভাগই সাহিত্যবিষয়ে—চিত্রকলা সংগীত ভাস্কর্য বিষয়ে তাঁদের মতামত বেশি পাওয়া যায় না। সাহিত্যবিষয়েও তাঁরা যা বলেছেন, তার অধিকাংশ সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে, আঙ্গিক সম্পর্কে নয়। এইসব বিক্ষিপ্ত মন্তব্য নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য তত্ত্ব গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। মার্ক্সের ব্যাখ্যাকাররা ওইসব মন্তব্য অবলম্বন করে যে সাহিত্যতত্ত্ব তৈরি করেছেন, তা প্রায়শই পরস্পরবিরোধী। এইসব তত্ত্বের মধ্যে অবশ্য মূল অবিসংবাদী অংশ হিসেবে কিছু সনাক্ত করা যায়।

এই মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিতে আছে মার্ক্সের ইতিহাসতত্ত্ব। যে-তত্ত্বে ইতিহাসকে দেখা হয়েছে বস্তুবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক হিসেবে। ফলে তাঁদের সাহিত্যতত্ত্ব ও মূলত বস্তুবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক। এতে নৈতিক বা রাজনৈতিক মূল্য আরোপ করা মার্ক্সবিরোধী বলেই গণ্য করা উচিত। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, সাহিত্যের ব্যবহার কীভাবে করা উচিত, প্রগতিবাদী সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য কাকে বলে, এটা মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব নয়, মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের ব্যবহার মাত্র।

মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান বিষয় হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্ক কী, বাস্তব কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় এবং সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ কীভাবে বিষয়কে রঞ্জিত করে, এই তিনটি।

শ্রেণিসম্পর্ক বাস্তবকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়, সে নিয়ে মার্ক্সের আগেও আলোচনা হয়েছে, তবে মার্ক্স অনেক স্বচ্ছভাবে এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। তাঁর সময়ে শিল্পসমৃদ্ধির ফলে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হচ্ছিল, শ্রমিকশ্রেণিতে শোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এবং ইতিহাসের গতি নির্ণয়ে শ্রমিকশ্রেণি কৃষকশ্রেণির চাইতে এগিয়ে আসছিল। ইতিহাসের এই গতিপথের পরিবর্তনে সামাজিক বিন্যাস এবং মূল্যবোধ পালটাচ্ছিল। সাহিত্য এই পরিবর্তন প্রতিফলিত করছিল। মার্ক্স তাঁর সাহিত্যালোচনা এইভাবেই শুরু করেছিলেন, কিন্তু অর্থনীতি এবং রাজনীতি ক্রমশই তাঁর আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়, তিনি নিজেই রাজনীতিতে বেশি অংশ নিতে শুরু করেন, ফলে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের মন্তব্যগুলো ইঙ্গিতমাত্র থেকে যায়, পূর্ণাঙ্গতা পায় না।

শ্রমিকশ্রেণিই ইতিহাসকে চালিত করবে, মার্ক্সের এই বিশ্বাস স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান আধার। সামাজিক মূল্যবোধ বস্তুত শ্রেণিসঞ্জাত, পুঁজিপতিদের

আশা-আকাঙ্ক্ষা আর শ্রমিক-কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হতে পারে না, সাহিত্যে যেসব মূল্যবোধ ধারিত হয়, সেইসব মূল্যবোধ শ্রেণিসত্তার প্রভাবান্বিত, মার্কসের এই ইঙ্গিতগুলো নিয়ে ফ্রাঞ্জ মেহরিঙ (১৮৪৬-১৯১৭) একটি তত্ত্ব তৈরি করেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বে তিনি সাহিত্যে অর্থনীতির প্রতিফলনে বেশি জোর দিয়েছেন, অর্থনীতি কীভাবে সাহিত্যে অনুরণিত হয় সে বিষয়ে তেমন স্পষ্ট নন, বাস্তব কীভাবে আঙ্গিকও নির্ধারণ করে তা বলতে পারেননি, একথা এঙ্গেলসই স্বীকার করেছিলেন। জি ভি প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) সাহিত্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন, শ্রেণি ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর আলোচনা দীর্ঘদিন মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি ছিল। কিন্তু, কাঠামো (উৎপাদন, উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় ইত্যাদি) এবং পরিকাঠামো (সাহিত্য)-এর মধ্যে অখণ্ড যোগাযোগ, সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে শ্রেণিসত্তা ছাড়িয়ে যেতে পারেন না, সাহিত্যিক তাঁর সমসাময়িক সমাজবিন্যাসে আচ্ছন্ন—এইসব ধারণা যান্ত্রিক মার্ক্সীয় ধারণা বলে পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যাত হয়।

বাস্তব কীভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, মার্ক্সের সেই মতামত বিশদ করেন গিয়র্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১)। সমাজের যেসব ঘটনা, চরিত্র, আবেগ প্রতিনিধিস্থানীয়, সেসবই সাহিত্যে আসে, যেসব ব্যতিক্রমী সেগুলো অবান্তর। লাসাল-এর নাটক সম্পর্কে মার্ক্স-এঙ্গেলস এমন মত প্রকাশ করেছিলেন, এবং কিছু চিঠিতে। বাস্তব শুধু অনুপুঙ্খ সত্য হলেই চলবে না, তার যথার্থ প্রতিফলন তো প্রয়োজনীয়ই, কিন্তু তার থেকে বড়োকথা, সেসব সমাজের শ্রেণিবিন্যাসকে, প্রতিনিধিমূলক পারিপার্শ্বিকে প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে কিনা, সেটাই বড়ো কথা। এই বাস্তবতাকে ভিত করে লুকাচ তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব নির্মাণ করেন, যা পরিচিত হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলে।

মার্ক্সের সাহিত্যতত্ত্বের তৃতীয়স্তম্ভ, বিচ্ছিন্নতা। ধনতন্ত্রে সৃষ্টিশীল কল্পনা শুকিয়ে আসে, কারণ শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের কোনো সম্পর্ক থাকে না, সেই শ্রম হয় পুঁজিপতির মুনাফার উপকরণ। নিজের শ্রমমূল্য থেকে, শ্রম থেকে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব থেকেই মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শোষণহীন সমাজে মানুষ আবার নিজের শ্রমের মালিক নিজেই হবে। তার নিজের অস্তিত্বের মূল্য সে ফিরে পাবে, জীবন আবার পূর্ণ হবে। গ্রীক সাহিত্যে, এলিজাবেথীয় সাহিত্যে জীবন ছিল সার্বিক, মানুষ যেখানে মানুষের থেকে, নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সাম্যবাদী সাহিত্যে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে, মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্বাস।

সাহিত্য যে শুধু বাস্তবের বা সমাজের অর্থনীতির প্রতিফলন নয়, সেকথা মার্ক্স-এঙ্গেলস বারবার বলেছেন। সাহিত্যের নিজের একটা বিশ্ব আছে, তার উপাদান ভাষার একটা নিজস্ব গতি আছে, মানুষের মন কীভাবে কাজ করে, এইসব বিষয়ে মার্ক্স যেসব ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী মার্ক্সবাদীরা বিভিন্ন তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন।

এদের মধ্যে আছে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। এ স্কুলের সবাই আবার একই তত্ত্বে, একই দর্শনে বিশ্বাস করতেন না, যদিও সবাই মনে করতেন তাঁরা মার্ক্সকে ভিত্তি করেই তাঁদের

ইতিহাস তত্ত্ব তৈরি করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন থিওডোর অ্যাডোর্নো, এরিক ফ্রম, হার্বার্ট মার্কুস, ওয়াল্টার বেনজামিন। এঁদের লেখায় শ্রেণি তত মনোযোগ পায়নি, যতটা পেয়েছে স্বয়ংশাসিত সাহিত্যবিশ্বের ধারণা। সাহিত্য কীভাবে পণ্য হয়ে ওঠে, মানুষ কীভাবে তার স্বকীয়তা হারায়, সাহিত্য কীভাবে জীবনদর্শন না হয়ে বাণিজ্য হয়ে ওঠে, এসব বিষয়ে তাঁরা জোর দেন। রাষ্ট্র এবং আমলাতন্ত্র কীভাবে মানুষের আবেগকেও নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্র করে তোলে, সেটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্যকে কীভাবে রাষ্ট্র ব্যবহার করে, এটাই তাঁদের লেখায় জরুরি হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য যখন রচিত হয় তখন সাহিত্যিকের মন কীভাবে কাজ করে সাহিত্য যখন পঠিত হয় তখন পাঠকের মন কীভাবে কাজ করে, এই দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন লুসিয়েন গোল্ডম্যানের মতো গ্রহনবাদীরা যাঁদের ইংরেজিতে বলা হয় স্ট্রাকচারালিস্ট। সমাজের বিভিন্ন কাঠামো আছে, একটি কাঠামো অপর কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে, সাহিত্য এবং সাহিত্যপাঠ সেই বিভিন্ন কাঠামোর বিভিন্ন প্রভাবের যুগ্ম ফল। অর্থাৎ শুধুই অর্থনীতি, শুধুই মনস্তত্ত্ব, শুধুই ধর্ম, শুধুই পুরাণ এসব বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, এদের সমবেত শক্তি সাহিত্য গঠন করে। এঁরা সাহিত্যিককে শুধু শ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে না দেখে নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং সাহিত্যে, শ্রেণিসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা সমান জরুরি—এই দিকে এগোতে চেয়েছেন। এঁদের উত্তরসূরিরা ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শনের ব্যবহার করে মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্বকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা মার্ক্সীয় শ্রেণিদ্বন্দ্বের মূলসূত্র থেকে সরে এসেছেন বলেই মনে করা হয়েছে। মার্ক্সীয় শ্রেণিদ্বন্দ্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও মার্ক্সীয় বিচ্ছিন্নতাবাদে মোটামুটি মেনে নিয়েছেন।

মানবাধিকার

সুজাত ভদ্র

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের মানবাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ৪৮টি দেশের মধ্যে ৪০টি দেশ সর্বসম্মতিক্রমে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। কোনো দেশই বিরোধিতা করেনি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সনদের কেবল ১৭নং ধারায় আপত্তি জানিয়েছিল। যুক্তি ছিল, যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই, সেহেতু তাদের দেশে নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার তারা প্রদান করতে পারবে না। সৌদি আরব আপত্তি জানিয়েছিল ব্যক্তির ধর্ম পরিবর্তনের ধারার জন্য। তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ শাসনের দক্ষিণ আফ্রিকা আপত্তি জানিয়েছিল বর্ণবৈষম্যবিরোধী ধারার জন্য। তবে মনে রাখতে হবে, এই আটটি দেশ ঘোষণার বিরোধিতা করেনি, অবশ্য স্বাক্ষরদানে বিরত থেকেছে।

সর্বমোট তিরিশটি ধারা সম্বলিত মানবাধিকার ঘোষণাকে আজ 'The Magna Carta of Mankind' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারসমূহকে দুভাবে ভাগ করা যায় : নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। তবে মানবাধিকার আন্দোলনে অভিঘাত, প্রাধান্য পেয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার (অত্যাচারিত না হওয়ার অধিকার, বিনা বিচারে আটক না থাকার অধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, দাসত্বে বা অন্য কোন ধরনের অবৈধ বন্ধনে না থাকার অধিকার ইত্যাদি) সমূহ। দেশে দেশে এই অধিকারসমূহ নাগরিকের আইনি অধিকারও বটে, অর্থাৎ আদালত-গ্রাহ্য অধিকার। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুচ্ছ (কর্মের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার প্রভৃতি) অতি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যেহেতু তা সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো তার বৈষম্য ও ক্ষমতার বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু দেশে দেশে সেগুলোকে সাধারণভাবে সরকারের সদিচ্ছা, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে অর্জনের চেষ্টা চলে; আদালত-গ্রাহ্য হয় না। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক নির্দেশনীতির (যেমন ভারতে) দিশা হিসাবে বিবেচিত হয় মাত্র। সুতরাং প্রথম ধরনের অধিকারসমূহ (যাকে Karel Vasak বলেছেন, First generation of rights) গুরুত্ব ও প্রাধান্য (জন রলস এর ভাষায়

lexical priority) পায় দ্বিতীয় ধরনের অধিকারসমূহ (Second generation of rights) অপেক্ষা।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার কোন আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এই ঘোষণাকে নৈতিক দায় হিসেবেই বিবেচনা করে। 'সর্বজনীনতা' এই ঘোষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপর বৈশিষ্ট্য হল, এই ঘোষণা দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছে মানুষের কিছু অবিচ্ছিন্ন (inalienable) অধিকার।

অবশ্য এই ঘোষণার নানা সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। বহু বিশেষজ্ঞের মতে, ঘোষণাটি যেহেতু সদস্যরাষ্ট্র বা সরকারগুলোর প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, সেহেতু ঘোষণার তাৎপর্য অনেকখানি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, সংখ্যালঘুদের অধিকার, আবেদন করার অধিকার প্রভৃতি এই ঘোষণায় নেই। অন্যদিকে, আশির দশক থেকেই নারীবাদীরা অভিযোগ করে আসছেন যে, পুরো ঘোষণাটি রাষ্ট্র-নাগরিকের সম্পর্কের আদিকল্পে রচিত। এই বাইরেও যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার অদৃশ্য শক্তি থাকে, অন্দরমহলে নারীদের উপর নিপীড়ন চলে, সে সম্পর্কে এই ঘোষণা হয় নীরব না হয় উপেক্ষাকারী। তাদের মতে, এই ধরনের 'gender-blindness' ঘোষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

তবুও এটা স্বীকার্য যে, সামাজিকভাবে এই ঘোষণা পরবর্তীকালে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সনদ, চুক্তি সনদকে আদর্শগতভাবে প্রভাবিত করেছে।

মানবাধিকার ঘোষণা এবং ১৯৬৬ সালের দুটি সনদকে (রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত) যৌথভাবে Bill of Rights বলা হত। বর্তমানে এই তালিকায় সংযোজিত হয়েছে আরও কয়েকটি সনদ; যেমন, বর্ণবৈষম্যবিরোধী সনদ (১৯৬৫), নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী সনদ (১৯৭৪), অত্যাচারবিরোধী সনদ (১৯৮৪), শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ এবং জাতি বর্ণ বৈষম্যবাদবিরোধী সনদ।

নাগরিক অধিকার

উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা ও নানা সনদ, চুক্তিপত্রের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক ধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, বিশ্বস্তরে আইন গড়ে উঠেছে, তা কতখানি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে, নানা আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে দেশে দেশে নাগরিকের অধিকার কতখানি আছে বা নেই। অর্থাৎ নাগরিকের অধিকার সংপৃক্ত আছে নির্দিষ্ট দেশের আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামোর চরিত্রের সঙ্গে।

এস. সুব্রামনিয়ম তাঁর *Human Rights and Police* নামক গ্রন্থে এক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন মানবাধিকারের কী কী ধারণা ও ধারা, উপধারা ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে; যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার (অনুচ্ছেদ ১৪); জাতি বর্ণ লিঙ্গ ভেদে কোনও বৈষম্য করা চলবে না

(অনুচ্ছেদ ১৫); সভাসমিতি করার অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯); জীবনের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১); সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রক্ষাকবচ (অনুচ্ছেদ ২৯); মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিকারের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩২)।

অপরদিকে ভারতের এই সংবিধানের মধ্যেই রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের বা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ন্যস্ত করা আছে। একমাত্র ভারতের সংবিধানেই (২২ [৩] অনুচ্ছেদ) রয়েছে নিবর্তনমূলক আইনে আটক রাখার ক্ষমতা (আচার্য কৃপালানি, শিশির বসু, মেঘনাদ সাহার মতো ব্যক্তিরা যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন) রয়েছে, জরুরি অবস্থা জারি করার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা রয়েছে, নির্বাচিত রাজ্য সরকার এবং রাজ্যে রাজ্যে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়ার যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা। ডেভিড ওয়াসকুব, পার্থ চ্যাটার্জি, কুলদীপ মাথুর, জাঁ-অ্যালফেস বানার্ড প্রমুখেরা দেখিয়েছেন ভারতের সংবিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নাগরিক অধিকার দমনের 'বৈধ' ক্ষমতা ও দমনপীড়নের হাতিয়ার।

পাশাপাশি, পূর্বে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সনদগুলোতেও নাগরিকের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ জারি করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বীকৃতি আছে। যেমন, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের ধারা ৪-এ জরুরি অবস্থা জারি করার ও নাগরিক অধিকার হরণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত, এই একই সনদের ধারা ২৯ (২) অনুসারে নাগরিকের অধিকারের উপর 'নির্দিষ্ট' সীমাবদ্ধতা জারি করা আছে, যাকে অধ্যাপক হিগিন্‌স্ অথবা রিচার্ড ইলিচের মত বিশেষজ্ঞরা 'Clawback' ধারা বলে চিহ্নিত করেছেন। জরুরি অবস্থা জারি করার পরেও নাগরিক অধিকারকে চিরন্তনভাবে 'Non-derogable' বলে চিহ্নিত করেছে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জীবনের অধিকার, অত্যাচারী না হওয়ার অধিকার, ক্রীতদাসত্ব প্রথার বিলুপ্তি; কালাকানুন জারি না করা; চিন্তার ও মতামতের স্বাধীনতা; পরিবারের অধিকার; শিশুদের অধিকার; নাগরিকের অধিকার; প্রতিকার পাওয়ার অধিকার। এগুলোকে অনেকে 'emergency proof' অধিকার বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

মারফতি

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশাসন প্রতিদিনের জীবনে মেনে চলা বড় কঠিন। এইসব অনুশাসনে যুক্তিহীন নির্দেশ থাকে, অদৃশ্য কোনো শক্তির কাছে অকারণে নতি-স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখালে পারলৌকিক ভীতি-প্রদর্শন করা হয়, সবচেয়ে বড়োকথা অধিকাংশ অনুশাসন অমানবিক ও নিষ্ঠুর। লোকসমাজ হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও সহজ জীবনের সন্ধান করেন, প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের রসদ সংগ্রহ করে জীবনকে অনুভব করেন, প্রশান্ত হাসিতে পারিবারিক সম্পর্ককে উজ্জীবিত করেন। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের হাসি আনন্দ ও স্বাভাবিক সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। সব শাস্ত্রীয় ধর্ম সম্পর্কেই কম বেশি এসব কথা সত্য, বেশি করে সত্য সেমিটিক ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে। সেমিটিক ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ককে ছাপিয়ে যায় ভীতি-প্রদর্শন ও নরক-ভোগের বীভৎস কল্পিত ধারণা। 'হাফিয়া দোজখ্' বড় হয়ে প্রতিভাত হয়।

মানুষ ভয়ে ও বলিষ্ঠ মানুষদের আক্রমণে কিছুকাল এসব অনুশাসন মেনে চলে, চিরকাল নতি-স্বীকার করেনা। প্রতিবাদের ক্ষীণ ধারা বয়ে চলে ও একদিন তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। নানা গৌণ সহজধর্মের প্রসার ঘটে। লৌকিক অনেক ধর্মে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়। কেমন প্রতিবাদ? কোনো শাস্ত্রীয়ধর্মে হয়ত সংগীতকে তেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, পরোক্ষে সংগীতকে বর্জন করার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। প্রতিবাদী ধর্মে জীবনাচরণে ও দর্শনে সেই সংগীতকেই জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রীয়ধর্মে যখন এই মানবজীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অন্যজগতের কথা বলা হয়, তখন এইসব লৌকিক ধর্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাসকে 'অনুমান' বলে অগ্রাহ্য করে, ইহ-দেহ-মানুষের মহিমাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মানুষে মানুষে বিভাজন এরা অস্বীকার করেন। গৌণ ধর্মের এই সুস্থ মানসিকতা ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-প্রবণতা ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মূলত ইসলামি সুফি দর্শনের উজ্জ্বল মানবিকতা।

মারফতি শুধু জীবনাচরণ নয়, একটি ধর্মীয় ও মানবিক দর্শন। 'সামা' বা অধ্যাত্ম সংগীতকে সুফি সাধকগণ তাঁদের একটি প্রধান স্তর হিসেবে গণ্য করেন। মারফতি দর্শনের উদ্ভবও সুফি সাধকদের ঐতিহ্য থেকেই। মারফতি সাধনা হল জ্ঞানের সাধনা, কেননা মারফত শব্দের অর্থ জ্ঞান। কিন্তু প্রশ্ন কীসের জ্ঞান? পরম সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজন বস্তুজগতের ও নিজের স্বরূপ সন্ধান।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে একটি অতিপ্রচলিত শব্দবন্ধ—শরিয়ত তরিকত হকিকত ও মারেফত। প্রথম তিনটি অতিক্রম করেই চতুর্থ পর্যায়ে মারেফত-এ পৌছতে হয়। শরিয়ত হল বহিরঙ্গ ও ব্যবহারিক। কিন্তু মারেফত কোনও বহিরঙ্গ নির্দেশকে গুরুত্ব দেয় না। অন্তরঙ্গ অনুশীলনই হল মারেফত। সাধারণ প্রথাগত শাস্ত্রীয় পথে মানসিক শান্তি, আত্মগত জ্ঞানলাভ, আত্ম-উৎকর্ষ ও আত্ম-উৎসর্গ সম্ভব নয়। অনুশীলনের মাধ্যমে মারেফত-এ এসব জ্ঞান ও উপলব্ধি সম্ভব। শরিয়ত, তরিকত ও হকিকত-এর মাধ্যমে মানবজীবনে যে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়, মারেফত পন্থার মাধ্যমেই সেই জ্ঞান-উৎকর্ষলাভ করা সম্ভব বলে মারফতি সাধকগণ বিশ্বাস করেন। শরিয়তের পরে কয়েকটি বিশেষ স্তর অতিক্রম করেই মারেফত-এ পৌছতে হয়। এখানেও সেই প্রতিবাদী দর্শন, শরিয়তকে অতিক্রম করতে হবে এই উচ্চারণ নিঃসন্দেহে ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী। হাদিস শরিফে মারেফত-এর সমর্থন রয়েছে,—যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকেও চিনেছে। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব না জানলে দিব্যজ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়। মারফতি দর্শনে বলা হয়েছে দিব্যজ্ঞান থেকে মহাজ্ঞান লাভ করা যায়, দিব্যজ্ঞানী ধীরে ধীরে মহাজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। এই দর্শনই মারফতি তত্ত্বের আদি ও মূলকথা। এই মানবিক আত্মদর্শন কোনোভাবেই প্রকাশের বিষয় নয়, পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধির বিষয়টি এমনই অনুভবগম্য যা মানবিক গুণাবলিকে সমৃদ্ধ করে, প্রকাশ করলে যার মর্মসত্য ব্যাহত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মারফতি দর্শনকে ধাঁধা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অর্থাৎ বস্তুবাদী বিশ্লেষণে এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে,—

শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশান মাখন।
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা জানে সবায়।

দুধে মেশানো মাখনের অংশই হল মারফত দর্শন। এই ঘোষণা থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মূল বস্তু অর্থাৎ মারেফত কখনও প্রকাশযোগ্য নয়। তাই মারফতি গানেও লক্ষ করা যায়, রূপক হেঁয়ালি আলো-আঁধারের মাধ্যমে মারফতি দর্শনকে প্রকাশ করতে হবে, মারফতি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দর্শনকে ব্যাপ্ত করার প্রবণতা সব সময়ে পরিত্যাগ করতে হবে। এইক্ষেত্রে মারফতিরাও সংকীর্ণ, স্বশিষ্যগণের পরিধির বাইরে এর প্রচার নিষিদ্ধ। এঁরা নির্মল হৃদয় ও পরিশুদ্ধ আত্মার কথা প্রচার করলেও নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ সমাজের বাইরে এসবের প্রসার অভিপ্রেত বলে স্বীকার করেন না।

গুরুর, ওঁদের ভাষায় 'মুর্শেদ' প্রভাব মারফতিতে প্রবল। গুরুর কোনো কথার প্রতিবাদ করতে নেই, তা যতই যুক্তিহীন হোক না কেন। গুরুবাদী ধর্ম ও দর্শনে এই মানসিকতা স্বাভাবিক, যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতায় এই প্রবণতা মেনে নেওয়া অসম্ভব। এখানেই সমস্ত গৌণধর্মের সীমাবদ্ধতা।

মারফতি দর্শনে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা ছিলেন একা, তিনি প্রকাশের বাসনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন। মানব ও জগৎ সংসার সৃষ্টি হল। তাই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য মধ্যবর্তী জনকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না মারফতিরা। সেই কারণে মারফতি সাধকগণ 'এশ্‌কে দেওয়ানা' অর্থাৎ ঐশী প্রেমে পাগল। আর এই প্রেমের প্রকাশ ঘটে মারফতি গানে। মারফতি গানের কাব্যিক মূল্য বহুল অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু মারফতি গানে বিশ্বজনীন মানবতার এক অনন্য ব্যতিক্রমী স্পর্ধিত মানসিকতা বিধৃত হয়ে রয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া

সুপর্ণ চৌধুরী

'মাল্টিমিডিয়া' অর্থাৎ বহু মিডিয়া বা মাধ্যমের সমাহার নতুন শব্দ নয়। মাল্টিমিডিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুদিনের থিয়েটারে বা যাত্রায় সংগীত, বাজনা, আলোর ব্যবহার থেকে শুরু করে টেলিভিশন পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া শব্দটি ব্যবহার হয় মূলত কম্প্যুটার থেকে সৃষ্ট অতি আধুনিক পঞ্চ-মাধ্যমের অভিজ্ঞতার কথা বোঝায়। পঞ্চ-মাধ্যম অর্থাৎ ধ্বনি, ছবি, ছায়াছবি, অ্যানিমেশন আর অক্ষরের বিন্যাস। ছবি হতে পারে কোনো ফটোগ্রাফ অথবা কম্প্যুটারে সৃষ্ট গ্রাফিক্স বা আঁকা ছবি। ছায়াছবি অথবা ভিডিও আর অ্যানিমেশন এই আধুনিক মাল্টিমিডিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার সঙ্গে রয়েছে রচনার বিন্যাস। তফাত হচ্ছে আধুনিক এই 'ডিজিটাল' মাল্টিমিডিয়া হয় পুরোপুরি ইন্টার-অ্যাকটিভ্ (Interactive)। অর্থাৎ শ্রোতা বা দর্শক যেরকমভাবে চান, বিভিন্ন অংশে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তাকে সরল (linear) পদ্ধতিতে দেখে যেতে হয় না। এই কারণে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়াকে বলা হয় নন্-লিনিয়ার (Non-linear)।

মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ আজ সর্বত্র। বিশেষত ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www)-এর ব্যাপক প্রসারণের ফলে। মানুষ মাল্টিমিডিয়ার অসাধারণ শক্তিকে ব্যবহার করছে শিক্ষাপ্রসারে, মনোরঞ্জন, এবং ব্যবসায়িক কাজে। বর্তমানে সারাবিশ্বের মাল্টিমিডিয়া ব্যবসা হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়াতে যেকোনো বিষয়কে অত্যন্ত প্রাণবন্ত উৎসাহব্যঞ্জক করে তোলা যায়। কম্প্যুটারের গ্রাফিক্স, অক্ষরবিন্যাস, ধ্বনি আর চলচ্চিত্রকে নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করা যায় অত্যন্ত উঁচুমানের অডিও-ভিস্যুয়াল, যা পুরোনো (traditional) পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

মাল্টিমিডিয়া তৈরি এক অর্থে চলচ্চিত্র তৈরি করার মতোই। একটি গল্প বা স্ক্রিপ্ট-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন অংশ, শিল্পীরা তৈরি করেন গ্রাফিক্স, বা ঝাড়পোঁছ করেন স্ক্যান করা ছবিকে। অ্যানিমেটররা তৈরি করেন অ্যানিমেশন। ভিডিও সম্পাদনা করতে হয় আর একজনকে। ধ্বনি অর্থাৎ সংগীত অথবা ধারাভাষ্য সম্পাদনা করতে হয় আর একজনকে। কিন্তু মজা হচ্ছে এত কিছু তৈরি করার জন্য লাগে না বিশাল স্টুডিও বা ঘর। একটি বা দুটি কম্প্যুটারে বসেই এই সব সৃষ্টি করা যায়।

লেখাকেও সুন্দর করে সাজানো যায় কম্প্যুটারে। এই সব মাধ্যম তৈরি হলে একজন মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার এই পঞ্চ-মাধ্যমকে জোড়া দেন কম্প্যুটারের ভাষায়। যে মাল্টিমিডিয়া Content তৈরি হল তা সাধারণত প্রকাশ করা হয় CD-তে অথবা ছেড়ে দেওয়া হয় ইন্টারনেটে। মাল্টিমিডিয়া তৈরিতে সত্যিই প্রয়োজন হয় শিল্প আর বিজ্ঞান। টেক্‌নোলজির সুন্দর সংমিশ্রণ।

কম্প্যুটার টেকনোলজির অভাবনীয় অগ্রসরের ফলে মাল্টিমিডিয়ার এই অসামান্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। বলা হয় কারিগরিভাবে আজ আর কোনো কিছুই অসম্ভব নয়— সৃষ্টি ক্ষমতা শুধু নির্ভর করে চিন্তাশক্তির উপর।

ভারতবর্ষ কম্প্যুটারের জগতে বিশাল অগ্রগতি করেছে গত দুই তিন দশকে। বলাই বাহুল্য মাল্টিমিডিয়াতেও পিছিয়ে নেই। কম্প্যুটারের জ্ঞান আর শিল্প সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারকে যদি ঠিকভাবে একত্র করা যায়, ভারতবর্ষ প্রথম সারির মাল্টিমিডিয়ার দেশ হতে পারে।

ম্যাজিক রিয়ালিজম

সৌগত মুখোপাধ্যায়

'ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম' আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের কোনো নির্দিষ্ট আন্দোলন বা সময়কাল সম্পর্কিত ধারণা নয়। স্প্যানিশ্‌ আমেরিকার কিছু কথাসাহিত্যিকের রচনার গায়ে সমালোচকেরা এই বিশেষ তক্‌মাটি লাগানোর বহু আগেই লাতিন আমেরিকায় এমন কিছু রকমারি সাংস্কৃতিক ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটে যা এই সাহিত্যসংজ্ঞাটির উদ্ভব ও ব্যবহারকে প্রভাবিত করেছিল। বাস্তবতার যে আধুনিক ধারণা আজ লাতিন আমেরিকার চেতনায় পাওয়া যায়, তা আসলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর (যার মধ্যে রয়েছে ইস্পানিক দখলকারী, তার 'ক্রেওল' উত্তরসূরি, স্থানীয় মানুষ আর আফ্রিকান দাস) বিশ্বাস আর সংস্কারের এক অনবদ্য মেলবন্ধনের ফলশ্রুতি। স্থানীয় ও ইউরোপীয় কালপঞ্জিকারদের লেখায় আমেরিকা 'আবিষ্কার' আর তার উপনিবেশীকরণের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা ওই গোষ্ঠীগুলির অভিজ্ঞতার রঙে রঙিন। 'নয়া দুনিয়া' সম্পর্কে বেশ কিছু ভ্রান্ত প্রাক্‌ধারণা এবং অলীক চিত্রকল্প পোষণ করা ছাড়াও ইউরোপীয় কালপঞ্জিকারদের বৃত্তান্তের ছক হামেশাই নির্ভর করেছে *লিব্রেস্‌ দে কাবায়েরিয়াস্‌* (Books of Chivalry)-এর ওপর যেখানে কাল্পনিক নায়কের অতিবাস্তব এবং অসম্ভব সমস্ত কাণ্ডকারখানার কথা বলা হত। ইউরোপীয় নবজাগরণের ইতিহাসতত্ত্ব আর বাক্‌ধারা (Rhetoric)-র পরম্পরা মেনে এক্ষেত্রেও কাহিনি আর হকিকতের মধ্যে ফারাক থাকত সামান্যই। স্থানীয় কালপঞ্জিকারেরাও তাঁদের মৌখিক গল্প বলার ঐতিহ্যকে স্বীকার করে পুরাণ আর রূপকথাকে ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বলে মনে করতেন এবং নিজেদের বৃত্তান্তে কল্পনা আর সত্যের সংমিশ্রণ ঘটাতেন। আজ তাই, অনেক সমালোচকের মতে, পুরাণের মতো, ম্যাজিক রিয়ালিজমও আসলে বাস্তবকে দেখবার এক বহুমাত্রিক এবং সামগ্রিক পদ্ধতি।

'ম্যাজিক রিয়ালিজম' শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ফ্রানৎস্‌ রো (১৮৯০-১৯৫৫) নামক এক জার্মান কলা সমালোচকের বইয়ে, যার নাম *নাখ্‌ এক্সপ্রেসিওনিজ্‌মুস্‌ : মাগিশের রেয়ালিজমুস্‌ : প্রোবলেমে ডের নয়েস্টেন্‌ অয়রোপেইশেন্‌ মালেরাই* (১৯২৫; এক্সপ্রেশনিজম-র পর ম্যাজিক রিয়ালিজম : নবীনতম ইউরোপীয় চিত্রকলার সমস্যাবলি)। পরে, ১৯২৭ সালে বইটি এস্পানিওল ভাষায় আংশিক অনুবাদাকারে *রেভিস্তা দে অক্সিদেন্তে* পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। রোর মৌলিক ধারণা অনুযায়ী অবশ্য

ম্যাজিক রিয়ালিজম উত্তর-এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা (১৯২০-২৫)-র সমার্থক আর তাকে কুহকী মনে হওয়ার কারণ এই যে সেই সমস্ত ছবির উদ্দেশ্য ছিল দৈনন্দিন জীবনের রহস্যজনক উপাদানগুলিকে মেলে ধরা। একটি সাহিত্যশৈলী হিসাবেও ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম-কে রো কখনো কল্পনা আর বাস্তবের মিশ্রণ বলে মনে করেননি। তাঁর মতে শব্দটির ব্যবহারিক ভিত্তি ছিল দৈনন্দিন বাস্তবের মধ্যেই শক্তভাবে গাঁথা আর তা ছিল রোজকার জীবনের চমকের সামনে মানুষের বিস্ময়েরই অভিব্যক্তি।

লাতিন আমেরিকার লেখকদের মধ্যে ভেনেজুলেয়ার আর্তুরো উস্‌লার পায়েত্রি তাঁর *ওব্রেস্‌ ই লেত্রাস দে ভেনেজুয়েলা* (১৯৪৮; *ভেনেজুয়েলার মানুষ ও চিঠি*) বইয়ে প্রথম ম্যাজিক রিয়ালিজমের কথা বলেন যদিও রোর কোনো উল্লেখ সেখানে ছিল না। উস্‌লার পায়েত্রির সংজ্ঞাটিকে (যা মোটামুটি রোর সংজ্ঞারই অনুরূপ) ভেনেজুয়েলার কিছু ছোটো গল্পে প্রয়োগ করা হয়। গল্পগুলি লেখা হয়েছিল আধাগদ্য-আধাকবিতা রীতিতে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নির্ভর হয়েও তাদের প্রসঙ্গ আর চরিত্র ছিল অবাস্তব। এর কিছুদিন পরেই, ১৯৯০ সালে কিউবার আলোহা কার্পেন্তিয়ের তাঁর *এল্‌ রেইনো দেল্‌ এস্তে মুন্‌দো (এই মর্ত্যের রাজত্ব)* বইয়ের সূচনায় উল্লেখ করেন লাতিন আমেরিকার লো রেয়াল মারভিয়োসো বা অলৌকিক বাস্তবতার কথা। সেই ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন বাস্তবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে সেখানে তিনি জোর দেন আমেরিকার ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার উপর। পরে অবশ্য *তিয়েন্তোস্‌ ই দিফারেন্সয়াস্‌* (১৯৬৪; *স্পর্শ ও ভিন্নতা*) বইয়ে তিনি স্বীকার করেন যে বাস্তবের এই অলৌকিক দিক শুধুমাত্র আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তার নিদর্শন রয়েছে। *এল্‌ রেইনো দেল্‌ এস্তেমুন্‌দো* প্রকাশিত হওয়ার বছরেই গুয়াতেমালার মিগেল আন্‌হেল আস্তুরিয়াসের *ওব্রেস্‌ দে মাইজ়* (জনারের মানুষ) প্রকাশিত হয় যেখানে তিনি 'কুহকী বাস্তববাদ'-এর কথা তোলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কার্পেন্তিয়ারের সঙ্গে আস্তুরিয়াসের প্রথম মোলাকাত হয় পারি শহরে এমন একটা সময়ে যখন সেখানে পরাবাস্তববাদের বিপুল রমরমা। পরবর্তীকালে কার্পেন্তিয়ার এই রীতিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন পরাবাস্তববাদ হল সেই বাস্তবের এক কৃত্রিম অনুকরণ যার ভেতরেই আসলে অনেক অলৌকিকের উপস্থিতি রয়েছে। উল্টোদিকে তিনি মনে করতেন, লাতিন আমেরিকার 'অলৌকিক বাস্তবতা' আসলে অলৌকিক সম্পর্কে আস্থাশীল এক মুহূর্তের সচেতনতা যা লেখককে পাঠকের কাছে বাস্তবের অবাস্তব দিকগুলি মেলে ধরতে সাহায্য করে। একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে কুহকী বাস্তববাদ সম্পর্কে কার্পেন্তিয়ের আর উস্‌লার পায়েত্রির ধারণা তাঁদের সাহিত্য ও সমালোচক জীবনের এক উৎক্রমণশীল পর্যায়ের সঙ্গেই যুক্ত, সমগ্র সাহিত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য নয়।

সমালোচক আন্‌হেল ফ্লোরেস্‌ তাঁর বিখ্যাত রচনা *Magical Realism in Latin American Fiction* (১৯৫৫)-এ শব্দটিকে সমালোচক মহলে জনপ্রিয় করে তোলেন। শব্দটির মূল অর্থের পরিসরকে বাড়িয়ে তিনি হোরহে লুই বোর্হেস্‌ আর মিগেল আন্‌হোল আস্তুরিয়াসের রচনাকেও এই রীতির আওতায় এনে ফেলেন। ফলে ম্যাজিক

রিয়ালিজমের সরলীকৃত অর্থ হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র 'রিয়্যাল' আর 'মার্ভেলাস'-র সংমিশ্রণ। মেক্সিকোর সমালোচক লুইস লিল অবশ্য ফ্লোরেসের ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে রোর মূল ব্যাখ্যায় ফিরে যান এবং বলেন শব্দটির মানে আসলে বাস্তবের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে রোজকার জীবনের কাব্যিক আর রহস্যজনক দিকগুলির ওপর থাকবে নজর, বাদ যাবে সমস্ত অলৌকিক উপাদান।

১৯৮২ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কার ভাষণে কোলম্বিয়ার গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস উল্লেখ করেন লাতিন আমেরিকার 'বিশাল বাস্তবতা'-র কথা যা কিনা 'এবছর সুইডেনের সাহিত্য অকাদেমির দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে' (ভাষান্তর : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁর মতে এই অতিকায় বাস্তবতাকে লাতিন আমেরিকার বাইরে থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় আর সেটিই এই বিশাল ভূখণ্ডের নিঃসঙ্গতার কারণ। তাই লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এমন এক আখ্যানরীতির যা সেই বাস্তবতাকে মেলে ধরবে ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বের কাছে। কাজেই তাঁর কালজয়ী *সিয়েন আনিওস্ দে সোলেদাদ* (১৯৬৭; একশ বছরের নিঃসঙ্গতা) বইয়ে যে কুহকী বাস্তববাদের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কল্পনা আর সত্যের সংমিশ্রণ ছাড়াও রয়েছে আঁকাবাঁকা এবং গোলকধাঁধাময় কাহিনিক্রম : দক্ষ কালপরিবর্তন; স্বপ্ন আর রূপকথার মিলিজুলি ব্যবহার; অভিব্যক্তিবাদী, কখনো বা পরাবাস্তববাদী বর্ণনা; চমক, এমনকী আকস্মিক শক, বীভৎস আর ব্যাখ্যাতীতের উপস্থিতি। সাতের দশক পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আখ্যানরীতিটির প্রভাব লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপের সাহিত্যিকদের মধ্যে আজও যথেষ্ট।

মিথ

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত

মিথ শব্দটি গ্রিক 'মুথোস' থেকে উৎপন্ন। 'মুথোস' বলতে বোঝায় সেই বাচন যাকে অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত না করে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে মিথ হল একটি বিশেষ বাচনপদ্ধতি। এই বাচন কোনো বিশেষ রীতিতে গঠিত আখ্যানের বিভিন্ন এককের সমাহার হতে পারে। সাধারণভাবে এই এককপুঞ্জ নির্দিষ্ট একটি সংস্কৃতির অন্তর্লিখিত উপাদানগুলির চিহ্ন বহন করে। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে মিথ পর্যালোচনা ক্ষেত্রে মোটামুটি দুটো দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়—অনেকে মিথের সঙ্গে আখ্যানকে যুক্ত করেন আর অন্যেরা মিথকে বিশেষ একটি পরিপ্রেক্ষিত হিসেবেই দেখেন।

যাঁরা মিথকে গল্প বা আখ্যান হিসেবে দেখছেন তাঁদের অভিমত হল মিথ-স্রষ্টা কল্পনাপ্রবণ একজন কবি। তিনি প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত জীবনের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে উত্তেজনায় ভরপুর জটিল একটি খেলার সন্ধান পান এবং সেই খেলার পরিণতি ঘটে ওই শক্তিগুলির পারস্পরিক একটা বোঝাপড়ার মধ্যে। এই পরিণতি নির্দিষ্ট এক জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। তবে মিথের আখ্যান-অংশ বিশেষ কোনো অর্থেরই বাহক এবং এই অর্থ মানুষের অন্তর্জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপসম্পৃক্ত। তাই এই আখ্যানসমূহের উৎস খোঁজা উচিত একক ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টির পরিধির বাইরেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণভাবে দেখা যায় দুই বিপরীতাত্মক রূপের সমন্বয়ে মিথের জন্ম। ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস নানা উদাহরণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে মিথ প্রকৃতি ও কৃষ্টির বৈপরীত্যে মধ্যস্থতা করে।

বলা হয় মিথই সর্বপ্রথম এবং একমাত্র তন্ত্র যার দ্বারা আদিম জনগোষ্ঠী জগতের ও মানুষের জীবনের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেছিল। বস্তুর স্বরূপকে সে এক ঘনীভূত অস্তিত্ব রূপে দেখেছিল যে-রূপ দৈনন্দিন জীবনের স্তরে না হলেও অন্য এক স্তরের সঙ্গে যুক্ত। গ্রিক ভাষায় মিথের অতি প্রাচীন এক সংজ্ঞা হল সেই সব কথাবস্তু যা আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের সময় কথিত হয়। অর্থাৎ মিথ আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিশিষ্ট দার্শনিক মির্চা এলিয়াদের মতে মানুষের জীবনের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বিশেষ কিছু মুহূর্তের কথা ভাবা হয়—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি। এই মুহূর্তগুলিকে আবার বিশেষ আচার-আচরণ দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। বিশ্বাস

করা হয় আদিতে ঈশ্বর বা কোনো আদিপুরুষ সেই একই আচার-আচরণ দ্বারা ওই মুহূর্তগুলি যাপন করেছিলেন। এলিয়াদ মনে করেন মিথ এবং তার আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের দ্বারা আদিকর্মের অনুকরণ আসলে সময়ের সরলরৈখিক গতিকে অস্বীকার করে আদিকালে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। স্থান কালের গণ্ডি ভেঙে ব্যক্তিসত্তা এভাবে বিশ্বলোকের অংশ হয়ে ওঠে। তবে মিথের সময়কালকে এখানে ইতিহাসের সময়কালের বিপ্রতীপ বিন্দুতে দাঁড় করালেও এলিয়াদ মনে করেন এই মিথগুলির মাধ্যমেই ইতিহাসের কোনো একটা স্তরকে, মননবিশ্বের ইতিহাসকে ধরা যাবে। মিথগুলি আসলে ক্রিয়াশীল সত্তারূপে সমাজে বিরাজ করে। সমাজকে বেঁধে রাখে, ঐতিহ্যগত মতাদর্শ, মানবিক ব্যবহার প্রভৃতির আদর্শ জিইয়ে রেখে সামাজিক পরম্পরাকে ধরে রাখে। মিথের মধ্যে আমরা পাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উপস্থাপনা অর্থাৎ ইতিহাসের বিশেষ গতিপথ দিয়েই আসা জীবনের দাবিদাওয়া, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা।

পঞ্চাশের দশকে ফরাসি চিন্তাবিদ রোঁলা বার্ত তাঁর *মিথোলজি* বইটিতে মিথ-তন্ত্রের আধুনিক ব্যবহারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন। ফরাসি দৈনন্দিন জীবন যাপনের পদ্ধতিতে, জনসংযোগের নানান ক্ষেত্রে ভোজন ও তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণে, একজন লেখকের ছুটি কাটানোর ভঙ্গি ইত্যাদিতে তিনি মিথের তন্ত্রের ব্যবহার দেখেছেন। এখানে মিথ হয়ে ওঠে এক ধরনের বাচন যা নিরন্তর চেষ্টা করে ইতিহাসকে সরিয়ে রাখতে এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে মুছে ফেলে স্বাভাবিকত্বের রূপ প্রদান করতে। অর্থাৎ এই বাচন কোনো দ্বান্দ্বিকতা দ্বারা গঠিত হয় না, এখানে সবকিছুই স্বচ্ছ, আদি ও অকৃত্রিম—এবং এই বাচনসমূহের উদ্দেশ্য একটাই—সামাজিক স্থিতাবস্থাকে বেঁধে রাখা। বার্ত যে মিথের কথা বলছেন তা কিছুটা যান্ত্রিক—এক বা একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতায় রাখতে কিছু মিথ সৃষ্টি করে এবং সেগুলি বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে দেয়।

প্রাচীন ও আধুনিক মিথের পার্থক্য সুগভীর। তবে বার্ত যে মিথোলজির কথা বলেছেন তা একান্তভাবে পণ্যভোগী সমাজের সঙ্গে জড়িত। অন্যত্র ইতিহাসের বিশেষ পটভূমিতে প্রাচীন মিথের ব্যবহার মানুষকে আবারও সেই ঘনীভূত অস্তিত্বের সন্ধান দেয়, বিভিন্ন গ্রন্থিতে জনজীবনকে বাঁধতে চেষ্টা করে এবং দুই বিপরীতাত্মক তন্ত্রের মধ্যস্থতা করতে প্রচেষ্ট হয়।

মিস্টিসিজম

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মসাক্ষাতের কথা বহু প্রাচীনকাল থেকে তত্ত্বজ্ঞানী সাধকরা বলে এসেছেন। আর এইসূত্রেই তাঁরা 'অভেদ-সাধনা'র কথাও বলেছেন। আমাদের দেশে যেমন, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও তেমনই। অপরোক্ষ অনুভবে পরমপ্রকৃতির সঙ্গে জীবাত্মার অভেদ-কল্পনা, বা অন্তর্বিরোধহীন অদ্বৈতবোধ, যা মিস্টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদের মূলকথা, বিশ্বাসী মানুষরা মনে করেন তা সম্ভব। সেজন্য ব্যক্তিচৈতন্যে বিভিন্ন চিন্তা, বিচিত্রগামী আকাঙ্ক্ষা, নানা রূপকথা, সামগ্রিকভাবে যা-কিছু বিশৃঙ্খলা আনে ভাবনায়, তাদের দমন করে আত্মনের সংহতি চাই, মায় অস্মিতার বোধলুপ্তিও জরুরি। ব্যক্তিচেতনার সেই দ্বন্দ্বাতীত কেবলাবস্থা বা ভাবাভাববিনির্মুক্ত কেবলস্বরূপে আধ্যাত্মিক উৎক্রমণে-র কথা আমাদের দেশে তত্ত্ববিদরা তাঁদের নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন করেছেন। বেদান্তের যুগ থেকে ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার প্রবাহ লক্ষ করলে তা আমাদের কাছে খুব একটা অপরিচিত বিষয় আর থাকে না।

বৃহত্তরভাবে অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে ধর্মের সংস্রব থাকলেও, ধর্মবিশেষের সঙ্গে এর কোনো গলাগলি নেই, একথা মনে রাখা জরুরি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীরা নিজেদের মার্গে থেকে নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা বা অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তার দরুন অতীন্দ্রিয় চেতনা ধর্মবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং যত মত তত পথে এর ঐতিহাসিক পরম্পরা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং এইসূত্রে ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বও বিবেচিত হয়েছে।

ধর্মীয় ইতিহাসের কেতাবি চর্চায় পণ্ডিতরা দু-ধরনের মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা বলে থাকেন। ব্যক্তিবিশেষের অভেদ-সাধনায় দ্বন্দ্বাতীত অদ্বৈতবোধের অভিজ্ঞতাকে 'অন্তর্মুখী প্রকৃতির' এবং সর্বজীবে পরমাত্মার উপস্থিতিতে বিশ্বাসীর অভিজ্ঞতা—দার্শনিক পরিভাষায় যা প্যান্থেইজম বা সর্বেশ্বরবাদ—'বহির্মুখী প্রকৃতির' মিস্টিসিজম। এরকম ভাগাভাগির সূত্রে ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রথমটির গুরুত্ব তাঁদের কাছে বেশি। কিন্তু প্রকৃত অনুভবী মানুষের কাছে এরকম বিভাজন, কী গুরুত্বের কমবেশি বলে কিছু নেই। বিশ্বাসী মানুষের কাছে 'মূল ঐশ্বর্যের' বোধই আসল। বিশ্বের প্রতিটি অণুতে বিরাজ করে, সমস্ত রূপের আড়ালে অরূপ হয়ে তাঁর নিভৃত প্রাণের যে পরমশক্তি, তার সঙ্গে ঐক্যসাধন বা দিব্যরকমের অভিজ্ঞতা বিশ্বাসীর পক্ষে অনির্বচনীয় হলেও বিজ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে। হয়ত কখনো কিছুটা হেঁয়ালি করে বা

আলো-আঁধারির ভাষা আশ্রয় করেও। আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকায়ত সাধকদের গান শুনলে বা গানের কথা পাঠ করলেও তা বুঝতে পারা যায়।

মৌন নিসর্গের মাঝে নিজের যাপন থেকেই মানুষের প্রশ্ন উঠেছে—কোথায় ছিলাম আমি, কে আমি, কী কাজ আমার, আমার পরিণামই বা কী? এই যে শরীর আমার, সেটি কোন কোন বস্তুতে গড়ে উঠেছে? জগৎ আর জীবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এরকম বিভিন্ন প্রশ্নের সূত্রে ব্যক্তিমানুষের অবলম্বন হয়েছে নিজস্ব অনুভব। চোখের আলোয় যে-রূপ তার কাছে ফুটে উঠেছে, চোখের বাইরে তার অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছে অন্যতরকে। স্বানুভবে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দর্শন। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেহ-মনের ঐক্যসাধনের উপায় জানতে হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরে নাড়ি ও শ্বাসের অবস্থান, ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রাণ ও আত্মাকে সেইসূত্রে বুঝে নেবার জন্য 'যোগ'।

স্বতন্ত্র এক কৃষ্টিও এই প্রবাহে গড়ে উঠেছে। ক্রমশ জটিল হয়েছে তত্ত্ব আর ক্রিয়াকর্মের বৈচিত্র্যে। মূল লক্ষ্য থেকে পর্যবসিত হয়েছে ব্যায়ামে। দেহ-মনের অভেদ-সাধনে তার বিপরীতে অপরপক্ষ তখন স্মরণ ধ্যানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চেয়েছে, আঙ্গিকের বিস্তর চর্চায় না গিয়ে বা প্রয়োজনীয়তাবোধে পরিবর্তন সাধনে। 'আত্মন'-এর উদ্বোধন ছাড়া যে 'ব্রহ্মণ'-এর উপলব্ধি সম্ভব নয়, একথা তত্ত্বজ্ঞানী সাধকরা আমাদের দেশে বহুবার নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

অতীন্দ্রিয় চেতনার বিকাশের ইতিহাসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম ধর্মের নিজস্ব মার্গে বিভিন্ন দার্শনিক পরিভাষাও ক্রমশ গড়ে উঠেছে এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আরেকটির বক্তব্যে কিছু সাযুজ্য থাকলেও সূক্ষ্ম ভেদও কম নেই। সেগুলি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় শুধু, 'অভেদ-সাধনের' উপায় নিয়েও মানুষের ভাবনার বৈচিত্র্যে সম্পর্কিত। আবার ক্ষেত্রবিশেষে, একই ধর্মের অন্তর্গত হলেও অতীন্দ্রিয় চেতনার পরম্পরায় একাধিক ধারাও লক্ষ করা যায়। যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব মূলত এই তিনটি ধারায় হিন্দু অতীন্দ্রিয় চেতনার বিকাশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও সম্প্রদায়গত অতীন্দ্রিয় ভাবনার সঙ্গে ঔপনিষদিক বা বেদান্তের অতীন্দ্রিয় চেতনাকে এক করে দেখার অবকাশ নেই। আবার বৌদ্ধরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের এবং 'নির্বাণ'-এর কথা বললেও তাঁদের মহাযান ও হীনযান বিভাজনে সাম্প্রদায়িক দর্শনে পার্থক্য আছে। খ্রিষ্টানদের অতীন্দ্রিয় ভাবনার উৎসে পেগান ধর্মের ভূমিকা থাকলেও, পরবর্তীকালে তা অন্যরূপ হয়ে উঠেছে। ইসলাম ধর্মে মর্মের সাধনে সুফিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরাও 'তওহিদ' বা অদ্বৈতভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু আল্লার শরিকহীনতায় বিশ্বাসী এই ধর্মের অঙ্গনে সুফিদের 'অভেদ সাধন' কোনো কুসুমাস্তীর্ণ পথে বিকশিত হয়নি। বরং ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্বীকৃত হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিপক্ষ হয়ে উঠেছেন ব্যক্তিবিশেষ। তার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ডও হয়েছে। কিন্তু নিজের বিশ্বাসকে ছাড়েননি, অন্তরের অনুভবকে প্রকাশ করে গেছেন দিব্যোন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে। আবার, ইহুদিদের ক্ষেত্রে অবতার-কেন্দ্রিক ধর্মসাধনা বা বিষয়মুখী প্রকৃতির হবার দরুন 'অভেদ-সাধনের' গুরুত্ব অন্যান্য ধর্মের মতো ততটা স্বীকৃতি পায়নি। যদিও তাঁদের বিভিন্ন দার্শনিক মনীষা নিজেদের অতীন্দ্রিয় অনুভবের কথা বলেছেন। কিন্তু ইহজীবনে 'আত্মসাক্ষাৎ' হলেও, পরমের সঙ্গে জীবের 'অভেদ বা 'অদ্বৈত' নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন।

মেটিরিয়ালিজম

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মেটিরিয়ালিজম একটি দার্শনিক মতবাদ, যা অনেকগুলি পৃথক পৃথক দর্শনে বিধৃত। দৈনন্দিন জীবনের বস্তুনিচয়ের সাহায্যে অথবা জাগতিক তত্ত্বের সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করা জড়বাদের লক্ষ্য; অতিজাগতিক বা আধ্যাত্মিক ধারণার সাহায্যে নয়। অন্ততপক্ষে, জড়বাদীর এই প্রতীতি আছে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। জড়বাদ প্রাচীন। পঞ্চভূতে জগৎ গঠিত (ইউরোপীয় মতে চারটি এলিমেন্টের দ্বারা), এই স্থূল ধারণার মধ্যেও একরকম শাদামাটা জড়বাদ আছে। তবে প্রাচীন ইউরোপে ডেমোক্রিটাস প্রভৃতির পূর্বে এবং প্রাচীন ভারতের চার্বাক দর্শনের পূর্বে, যাকে জড়বাদী দর্শন বলা যায় এমন কিছু ওই দুই সভ্যতায় আবির্ভূত হয়নি বলা চলে। চার্বাক আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, অন্তত ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমনে অবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবী, জল, তেজ মরুৎ—এই চারটি ভূত; এইগুলিই তত্ত্ব। এদের সংমিশ্রণে দেহ উৎপন্ন হয়। মদ্যের উপাদান থেকে যেমন মাদকশক্তি, তেমনি দেহের উপাদান থেকে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মার প্রমাণ নেই। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। পরলোক সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান কারো নেই। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মও ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। বৌদ্ধধর্মে কর্ম আছে, কিন্তু আত্মা নেই।

ইউরোপীয় জড়বাদের প্রাথমিক ধারণা ডেমোক্রিটাসের অবদান। জগৎ অণুর দ্বারা নির্মিত,—তাঁর এই ধারণাকে পরিণত রূপ দেন এপিকিউরাস, লুক্রেসিয়াস ও তাঁদের অনুসারীরা। অ্যারিস্টট্‌ল যদিও ডেমোক্রিটাসের মতবাদের বিরোধী ছিলেন, তথাপি তাঁর কোনো কোনো দার্শনিক সূত্রকে পরবর্তী জড়বাদীরা ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় অধ্যাত্মবাদের প্রাবল্যে ইউরোপে জড়বাদের প্রাধান্য খর্ব হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় জড়বাদের পুনরুত্থান ঘটে। সপ্তদশ শতকের জড়বাদের দুটি প্রধান ধারার সঙ্গে যথাক্রমে দেকার্ত (Descartes) ও বেকন (Bacon)-এর নাম জড়িত। দেকার্ত্‌-এর দর্শনকে এক ধরনের যান্ত্রিক যুক্তিবাদ বলা যায়। তাঁর মতে, ঈশ্বর, আত্মা ও দেহ—এই তিনটি দ্রব্য। দেহ ও আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, যদিও উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। বাহ্য বস্তুজগৎকে স্বীকার না করলে আত্মার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, যেহেতু আত্মায় চিন্তা ছাড়াও কতকগুলি নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা আছে। পক্ষান্তরে, বেকন ডেমোক্রিটাসের অণুবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

সপ্তদশ শতকের অপর বিখ্যাত জড়বাদী হবস্ (Hobbes) সমস্ত পরিবর্তনকে গতি আখ্যা দেন এবং বলেন, প্রকৃতি, মানবমন ও সমাজে গতির ফলাফলকে অনুধাবন করাই জ্যামিতি, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপজীব্য। এই ধারণাকে পরিপুষ্ট করেন লক (Locke)। তিনি জোর দেন অভিজ্ঞতার উপর; সব ধারণা ও জ্ঞানই অভিজ্ঞতালব্ধ। এনলাইটেন্‌মেন্টের (enlightenment) যুগে হবস ও লকের ধারণাগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে ফরাসি দর্শন দেখায়, কীভাবে বস্তুর চলাচল থেকে চেতনা বা সংবেদনেরও উৎপত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংক্রান্ত প্রশ্ন প্রাধান্য পায়। এক নতুন ধরনের জড়বাদ জন্ম নেয়। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ও ঐতিহাসিক জড়বাদের প্রধান প্রবক্তারূপে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ খ্যাত। মার্ক্স-এর মতে, অষ্টাদশ শতকের ফরাসি জড়বাদ শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা ধর্মের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেনি, সে সংগ্রাম ছিল সমস্ত অধিবিদ্যা বা মস্ত কল্পনার বিরুদ্ধে। হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে জড়বাদকে গূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব জার্মান দার্শনিক ফয়ারবাখের (Feuerbach), এবং গোড়ায় মার্ক্স ছিলেন ফয়ারবাখের অনুসারী। মার্ক্সের মতে, হেগেল ধারণা বা 'Idea'-কে করে তুলেছিলেন বস্তুবিশ্বের স্রষ্টা। এর বিরুদ্ধে, *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মার্ক্স ঘোষণা করলেন, মানবমনে বস্তুবিশ্বের প্রতিফলন এবং তার রূপান্তর চিন্তায়, এছাড়া আর কোনো 'ধারণা'-র অস্তিত্ব নেই। মার্ক্স-এর এই জড়বাদী দর্শনকে এঙ্গেল্‌স্ ব্যাখ্যা করলেন *অ্যান্টি-ডুয়েরিং* গ্রন্থে : নির্বস্তুক কোনো তত্ত্বে নয়, জড় বস্তুনিচয়েই জগতের প্রকৃত ঐক্য; দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ বিকাশের ইতিহাসেই তার প্রমাণ। চিন্তা বা চেতনার উৎস মানবমস্তিষ্ক এবং মানুষ নিজে প্রকৃতিজাত, সেই প্রকৃতি আবার বেড়ে উঠেছে পরিবেশের সঙ্গে। মানবমস্তিষ্কজাত সব কিছুই শেষ পর্যন্ত জড়প্রকৃতির অবদান।

তথাপি, ফয়ারবাখ প্রভৃতি জড়বাদীর মতামতের কিছু খুঁত মার্ক্স খুঁজে পেলেন। প্রধান খুঁত হল,আগেকার জড়বাদীরা ইতিহাসনিরপেক্ষ, দ্বান্দ্বিকতানিরপেক্ষ। হেগেলীয় ভাববাদের বিরোধী হলেও মার্ক্স হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা করতেন। দ্বান্দ্বিক দর্শনের কাছে কোনো কিছুই শেষ, পরম বা পবিত্র নয়; সব কিছুই বিকাশমান, চলমান, পরিবর্তনশীল। হয়ে ওঠা এবং চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন; চিন্তাশীল মস্তিষ্কে এই প্রক্রিয়ার প্রতিফলনই হল দ্বান্দ্বিক দর্শন। মার্কসের মতে, দ্বান্দ্বিকতা হল গতির সাধারণ সূত্রের বিজ্ঞান,—বাহ্যজগতের গতি, আবার মানুষের চিন্তার গতি। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ প্রতিপন্ন করল, মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক; বস্তুমাত্রই সর্বদা বিকাশশীল, সেই বিকাশ দ্বন্দ্বপ্রসূত; এবং বস্তুর এই দ্বান্দ্বিক বিকাশ জ্ঞানের জগতে প্রতিফলিত।

শুধু প্রকৃতিকে নয়, মানবসমাজের বিকাশকে বুঝতেও এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রয়োজন। ইতিহাসের চর্চায় দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রয়োগকে বলা হয় ঐতিহাসিক জড়বাদ (বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ)। এই পদ্ধতির সাহায্যে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন কীভাবে উৎপাদক শক্তির বিকাশের ফলে এক সমাজব্যবস্থা অন্য, উচ্চতর, সমাজব্যবস্থায় বদলায়,—কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। রূপান্ত

অবশ্য আপনা আপনি ঘটে না। যেহেতু প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে, তাই প্রত্যেকটি ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণি প্রাধান্য পাচ্ছে, অন্য শ্রেণিগুলির ওপর শোষণ চাপিয়ে দিতে পারছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই এক ব্যবস্থা থেকে আর এক ব্যবস্থায় ইতিহাসের গতি।

অতএব, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের চর্চায় দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবল দর্শনে সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। উপযুক্ত, ফয়ারবাখ্ সম্বন্ধে এগোরো নম্বর থিসিসে মার্ক্স লিখেছিলেন 'দার্শনিকরা জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রয়োজন জগৎটাকে বদলানো।' অতএব মার্ক্সীয় জড়বাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে সক্রিয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, যে কাণ্ডে দ্বন্দ্ব পুঁজির আর শ্রমিকের, যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র এবং অবশেষে, কমিউনিস্ট সম-সমাজ।

মেলোড্রামা

কুন্তল মিত্র

মেলোড্রামা শব্দটি নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রিক 'মেলোস্' (Melos) এবং ফরাসি 'ড্রেম' (Drame) শব্দদুটি মিলে মেলোড্রামার (Melodrama) সৃষ্টি। গ্রিক ভাষায় 'মেলোস্' শব্দের অর্থ হল গান। ড্রামা অর্থে নাটক। তার মানে মেলোড্রামা বলতে বোঝায় গীতিময় নাটক। সংগীত সহযোগে অলংকৃত ও আবৃত্তিযোগ্য কোনো কিছুকে বোঝাত মেলোড্রামা। ইতালিতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো গানযুক্ত নাটক রচনার এক রীতি গড়ে ওঠে। 'দাফনে' (Daphne) নাটকটি এই জাতীয় রচনার প্রথম নিদর্শন। এই রীতির নাটককে মেলোড্রামা বলা হত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালিতে এই অপেরার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। সেখানে প্রায় এক শতাব্দী ধরে অপেরার প্রতিশব্দ ছিল মেলোড্রামা।

মেলোড্রামা শব্দটি ইতালিতে যেমন অপেরা রূপে ব্যবহৃত হত তেমনি ফ্রান্স ও জার্মানিতেও মেলোড্রামা শব্দটি অপেরার প্রতিশব্দ হিসাবেই গৃহীত হয়। আঠার শতকের শেষদিকে শব্দটির অর্থ কিছু পরিবর্তিত হয়। জার্মানিতে অপেরার যে অংশটুকু বাদ্যযন্ত্র (অর্কেস্ট্রা) সহযোগে কথিত হত, তারই নাম মেলোড্রামা। গানের সাহায্যে নির্বাক চরিত্রের ভাবাবেগ প্রকাশের যে পদ্ধতি তাকেই ফ্রান্সে বলা হত মেলোড্রামা। উনিশ শতকের প্রথমে ইংলন্ডেও মেলোড্রামা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ফরাসি ও জার্মান থিয়েটারের প্রভাবে। ক্রমে মেলোড্রামা কথাটির অর্থ দাঁড়ায় গানযুক্ত আকস্মিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রধান গুরুগম্ভীর নাটক। পরবর্তীকালে অর্থ সংকোচের ফলে মেলোড্রামা বলতে নিকৃষ্ট ট্র্যাজেডি বা ব্যর্থ ট্র্যাজেডি বুঝিয়ে থাকে। একে ট্র্যাজেডির 'Plebeian relative' বলা হয়ে থাকে।

কোনো মহৎ জীবনের ইষ্টনাশ এবং মর্মন্তুদ বিনষ্টির কাহিনী অবলম্বনে ট্র্যাজেডির প্লট রচিত হয়। নিয়তিতাড়িত চরিত্র এমন কাজ করে যা তাকে শ্রেয় বা প্রেয় ফলদান করবে বলে ভাবে। কিন্তু সেই ফল সে পায় না। তখন নেমে আসে হতাশা। জীবনের সকল কিছু বিবর্ণ, বিস্বাদময় হয়ে ওঠে। তীব্র বেদনার আঘাতে বুক ভেঙে যায়। তবু চরিত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। জীবনের এই শোচনীয় পরিণামই ট্র্যাজেডির উপজীব্য। ট্র্যাজেডির এই ভাব গভীরতাকে যে নাটক ধরতে পারে না, বরং অতিরঞ্জনের ফলে নাটুকেপনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, চরিত্রের মধ্যে থাকে না সেই ব্যক্তিত্ব, তাকেই আমরা

সাধারণত মেলোড্রামা বলে থাকি। বাংলায় অতিনাটক বলা হয়। ফার্স যেমন কমেডির তুলনায় নিম্নমানের রচনা ও অভিনয়, তেমনই ট্র্যাজেডির তুলনায় মেলোড্রামা নিম্নমানের। নাটকের কাহিনীতে মিলন ও হাস্যরসের বাড়াবাড়ি থাকলে তাকে আমরা ফার্স বলি। তেমনই নাটকে অতিরিক্ত দুঃখ-কাতরতাও মেলোড্রামায় পরিণত হয়। ভাবগভীরতা বা আত্মিক ধর্মই ট্র্যাজেডিকে মেলোড্রামা থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে ও ভাবব্যঞ্জনায় গভীরতা থাকলে এবং তার দ্বারা সর্বজনীনতা ব্যক্ত হলে মেলোড্রামাসুলভ ঘটনাদি ব্যক্ত হলেও নাটককে ট্র্যাজেডির তালিকায় স্থান দিতে হবে। অবশ্য এই ভাবব্যঞ্জনা সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য। কোথায় শুধুমাত্র শারীরিক ক্রিয়াকলাপের কৌতূহল সৃষ্টি করার মধ্যে নাটক সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এবং কোথায় সে সীমা অতিক্রম করে নাটক গভীর স্তরের জীবনের রূপকে প্রকাশ করছে তা যথাযথভাবে ধরতে না পারলে ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে মেলোড্রামা ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য এইভাবে নির্দেশ করা যায়—মেলোড্রামা হল আকস্মিক দুর্বিপাকমূলক সাহিত্য (Literature of disaster)। এতে নায়কের জীবনের দুর্ভোগ নেমে আসে বাইরে থেকে, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে তা আসে ভিতর থেকে। মেলোড্রামায় মানুষই দুর্ঘটনার শিকার, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে মানুষ নিজেকে বা অপরকে দুর্ঘটনার শিকার করে। মেলোড্রামায় চরিত্রের নৈতিক গুণ গৌণ, কিন্তু ট্র্যাজেডিকে তা মুখ্য এবং নাট্য ঘটনার উৎস। মানুষ সমগ্র হলেও মেলোড্রামায় সে মহৎ নয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। দ্বন্দ্ব বড় জোর মানুষের সঙ্গে মানুষের বা মানুষের সঙ্গে বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে মানুষ সমগ্রভাবেই দ্বান্দ্বিকতায় পর্যুদস্ত। তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বেই সে বেশি করে কাতর। মেলোড্রামায় চরিত্রের শক্তি বা দুর্বলতা একটাকেই দেখানো হয় এবং তার জয় বা পরাজয় একটাকেই তুলে ধরা হয়। ট্র্যাজেডিতে কোনো একটি দিক নয়, দুর্বলতার সঙ্গে নায়কের শক্তি দুইই দেখানো হয়। ট্র্যাজিক নায়ক পরাজিত হয়েও জয়ী, পাঠকের মনের মণিকোঠায় তার স্থান। মেলোড্রামায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় এবং ঘটনার যে পরিণাম দেখান হয় তার মধ্যে ঘটনাগত কার্যকারণ যোগ থাকে না, উত্তেজনাময় ঘটনা বা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নাট্যকারের ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়। এই ঘটনায় যত গাম্ভীর্যই থাক, উত্তেজনা যতই আমাদের মাতিয়ে তুলুক, ভাবিয়ে তুলতে পারে না। তাই বলা যেতে পারে যে, সার্থক ট্র্যাজেডি লেখা ব্যর্থ হলে মেলোড্রামার সৃষ্টি হয়। তবে অবশ্য মেলোড্রামা রচনার অভিপ্রায় নিয়েই তা সৃষ্টি হতে পারে।

মেলোড্রামার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যেতে পারে—যে নাটক উত্তেজনাপূর্ণ, রোমাঞ্চকর, ঘটনাপ্রধান, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন, শ্রেণীচরিত্রমুখ্য, জয় বা পরাজয় নির্দেশক, আপাতগুরু বিষাদান্ত নাটক অপেক্ষা নিম্নমানের তাকে আমরা মেলোড্রামা বলতে পারি। এর লক্ষণগুলি হল— ক. গান, দৃশ্য ও ঘটনার গুরুত্ব এতে প্রাধান্য লাভ করে; খ. ঘটনার উপর অনুচিত জোর দেওয়া হয়; গ. গভীর ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস এতে থাকে না; ঘ. চরিত্রগুলিকে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য দান করার কোনো চেষ্টা থাকে না; ঙ. অতিরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান মজুত থাকে; চ. দর্শকদের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় এবং অভিনয় হয় পুরোপুরি নাটুকেপনাপূর্ণ।

সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মেলোড্রামা হবে বিষাদান্ত এবং এই জাতীয় নাটককে ট্র্যাজেডির গোত্রে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আঠার শতকের ফ্রান্সে প্রায় কুড়ি বছর ধরে যেসব মেলোড্রামা লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবই ছিল মিলনান্ত। আবার উনিশ শতকের মেলোড্রামার প্রায় পুরোটাই বিষাদান্ত। বর্তমানের মেলোড্রামা ঐ বিষাদান্তমূলকই।

প্রসঙ্গত বলা যায় মেলোড্রামা ও মেলোড্রামাটিক দুটি এক জিনিস নয়। মেলোড্রামা মানে একটা সমগ্র নাটক। কিন্তু মেলোড্রামাটিক নাটকের কোনো একটি চরিত্র বা ঘটনা সম্পর্কিত। যেখানে নাটকের মূল চরিত্রগুলি এবং তাদের সম্পৃক্ত ঘটনা মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়ে সেখানে নাটক মেলোড্রামায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু, পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা চরিত্র মেলোড্রামাটিক হলেও যদি তা মূল রসকে ক্ষুণ্ন না করে অর্থাৎ ট্র্যাজেডির ভাব গভীরতা বজায় থাকে তাহলে নাটকটি মেলোড্রামায় পরিণত হয় না। ঐ নির্দিষ্ট চরিত্র বা ঘটনাকে মেলোড্রামাটিক বলা যায়। অনেক সার্থক ট্র্যাজেডির কোনো দৃশ্য বা চরিত্র মেলোড্রামা লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে ট্র্যাজেডির রস ব্যাহত না হলেই হল।

মৌলবাদ

সৌরীন ভট্টাচার্য

ইংরেজি ফান্ডামেন্টালিজ্‌ম্‌ শব্দের বাংলা হিসেবে আমরা মৌলবাদ শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের রাজনীতির অনুষঙ্গে এই শব্দ সাম্প্রতিককালে খুবই বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজনীতিতে সমাজে ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশেষ কিছু ঝোঁককে নির্দেশ করার জন্য এই শব্দটি প্রচলিত।

শব্দটি তৈরি করা হয়েছে যে-ইংরেজি শব্দ থেকে তার মূলে ছিল ফান্ডামেন্টাল কথাটা। এর অর্থ মৌলিক কিংবা মৌল। দুটি শব্দই বিশেষণ, বিশেষ্য 'মূল' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। তাহলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'মৌলবাদ' এই ধারণার মধ্যে 'মূল' বলে কোনো কিছুর প্রভাব প্রত্যাশিত। সমাজ-সংস্কৃতিতে এক একটা শব্দ যখন নানাভাবে ব্যবহার হতে থাকে তখন ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক ও প্রসঙ্গের চাপে তার অর্থ পরিবর্তন ঘটে, বিস্তার লাভ করে এবং অনেক সময়েই তা ব্যুৎপত্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে দূরে সরে যায়। শব্দটি আমাদের এখানে নিঃসন্দেহে ইংরেজি থেকে বানানো, কিন্তু এর ব্যবহার পাশ্চাত্য ধরনের থেকে অনেক আলাদা। সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ফারাকের মতো শব্দ ব্যবহারেও যথেষ্ট অন্তর লক্ষ করা যেতে পারে।

এই শব্দের পাশ্চাত্য ইতিহাসে একটা সংগঠিত আন্দোলনের আদল লক্ষ করা যায়। ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের নিজস্ব সংগঠন ছিল, মুখপত্রের প্রকাশনা ছিল, একটা সমবেত উদ্দেশ্য সাধনের ব্রত ছিল। মার্কিন দেশের উনিশ শতকের এক বিশিষ্ট ধরনের খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় আন্দোলন থেকে পাশ্চাত্যে ফান্ডামেন্টালিজ্‌ম-এর উদ্ভব ধরা হয়ে থাকে। ওই দেশেও এই আন্দোলনে পর্বান্তর লক্ষ করা যায়। সব পর্বে চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য যে একই ছিল তা ঠিক না। মূল ঝোঁকে একটা মিল লক্ষ করা গেলেও এক পর্ব থেকে আর এক পর্বে জোর বদলে গেছে। শুরুতে এঁদের মূল বক্তব্য ছিল যে বাইবেলকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করতে হবে, কারণ তা নির্ভুল। যিশু খ্রিষ্টের আরেক দ্বিতীয় আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ও সন্নিকট, কুমারী মাতা, পুনরুত্থান ও পুনর্মিলনের ধারণাগুলি নিতান্ত শাদামাটা অর্থেই নিখাদ সত্য। বিশ শতকে এসে এই ধারার অনুক্রমে মৌলবাদ আধুনিকতার লক্ষণসমূহের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। বিশ শতকের শেষের দিকে এই চিন্তাধারা অনুসারী অনেক রকমের চার্চ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত নানা সংগঠনের বিকাশ লক্ষ করা যায়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ১৯০২ সালে আমেরিকান বাইবেল লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। *দ্য ফান্ডামেন্টালস্* নামে তাঁরা ১২টি পুস্তিকা প্রচার করেন। বাইবেলের সবরকম সমালোচনা ছিল এঁদের সমালোচনার লক্ষ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের ফান্ডামেন্টালিস্টদের হাতে এই আন্দোলন আরো জঙ্গি চেহারা ধারণ করে। এই পর্বে সবরকম আধুনিকতার প্রতিরোধে এঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশক থেকে বিভিন্ন বাইবেল প্রতিষ্ঠানে ও বাইবেল কলেজের মধ্য দিয়ে ফান্ডামেন্টালিজম-এর চিন্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারা প্রায় অনিবার্যভাবে কমিউনিজম বিরোধিতার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই পর্বে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিবর্তনবাদের ধ্যানধারণা ফান্ডামেন্টালিস্ট চিন্তা ও কর্মের পরম চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। মূলত এই চিন্তার প্রভাবে বিবর্তনবাদ আজও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক দেখা দেয়, সমস্যা কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত গড়ায়।

আমাদের এখানে মৌলবাদী সংগঠন হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয় তারা কিন্তু নিজেরা নিজেদের ওই নামে বর্ণনা করে না। ওই সব সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণের মধ্যে কিছু বিশেষ ধরনের দিকে লক্ষ রেখেই ইংরেজি শব্দ ফান্ডামেন্টালিজ্‌ম্-এর আদলে মৌলবাদ শব্দের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সেই সব ধরনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভিন্ন রকমের আধুনিকতার প্রতি প্রতিকূলতা। এঁদের চিন্তাভাবনা সাধারণত খুব কট্টর হয়ে থাকে। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন বিধিবিধান ও নির্দেশ থেকে কোনো বিচ্যুতি বরদাস্ত করা হয় না। শাস্ত্র কিংবা প্রাচীন কোনো সংহিতার বাণী অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত হয়। এসব প্রসঙ্গে নতুন কালের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন সমাজের জন্য নতুন কোনো ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অগ্রাহ্য। এই অর্থে মৌলবাদী চিন্তাধারার প্রয়োগপরিধি জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিভিন্ন কলাচর্চা থেকে আরম্ভ করে পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন চলনবলন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেতে পারে।

মৌলবাদের মধ্যে আধুনিকতার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়ত কাজ করে। সেই অর্থে মৌলবাদ রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে যা সংরক্ষণযোগ্য তা যেন অপরিবর্তনীয় ও সময়ের প্রভাব বর্জিত। ইতিহাসের বদলের জন্য সময় সাযুজ্য রক্ষার দায় মৌলবাদী চিন্তায় প্রায়শ কার্যত স্বীকার করা হয় না। তাই মৌলবাদী প্রত্যয়ের চেহারা সাধারণত উদারপন্থার বিরোধী এবং সেই কারণেই তা বেশ খানিকটা অসহিষ্ণু। বিরোধী মত আচরণ সেখানে বিচ্যুতি বলে গণ্য। তাই তা নিবারণ করা মৌলবাদী আদর্শের লক্ষ্য। এ রকমের অবস্থান থেকে নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়ন মৌলবাদে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। সমাজে ও সংস্কৃতিতে উঁচু নিচু ভেদাভেদ, তার অস্তিত্ব ও যৌক্তিকতা একবার মেনে নিলে সংহত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নিশ্ছিদ্র শৃঙ্খলাবোধের মানসভূমিতে এক ধরনের কঠোরতা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে পারে।

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর নানা দেশে ও সমাজে মৌলবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও এই মতাদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হতে গিয়ে অনেক সময়ে নানা রকম আপস করে চলতে হতে পারে। বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বেলায় এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। আপসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাই মৌলবাদী বলে পরিচিত সংগঠনগুলির মধ্যে অনেক অসংগতি ও দ্বন্দ্বও লক্ষ করা যায়। সার্বিক কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয়তন্ত্রে বাস্তব মোকাবিলার জন্য আপসের প্রয়োজন তুলনায় কম। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী শুদ্ধতা বজায় রাখা কিছু সহজ। মৌলবাদ তাই সাধারণত গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

রবীন্দ্রসংগীত

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের গান ঠিক কখন রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে স্বতন্ত্র সংগীত ধারায় চিহ্নিত হল তা নিয়ে সংশয় থাকলেও এই গানের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আজ আর কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু কী সেই স্বাতন্ত্র্য? রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় 'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত'। এ সেই এক ধরনের অনুভব যার 'কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে বেঁচে থাকার—মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকে। একে বলা যায় রবীন্দ্রসংগীতের স্থায়ী ভাব।' এই অনুভবের কি কোনো ব্যাখ্যা মেলে!

রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং তাঁরই দেওয়া সুরের গানগুলি রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে চিহ্নিত। ব্যতিক্রম—অল্পসংখ্যক রবীন্দ্রনাথের গান যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরে বাঁধা। প্রসঙ্গত একথা বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীত হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে না। কিন্তু তাঁর 'ভাঙা গান' সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। এইসব গান রচনায় কখনো বাণীর লাবণ্য বা শব্দের ঝঙ্কারে কখনো বা সুরের মায়ায়, আবার কখনো বা কেবলই ছন্দের লীলায় আকৃষ্ট হয়েছেন, আর সৃষ্টি করেছেন এমন সব গান যার আবেদন চিরন্তন। সেখানে নির্মাণ নয়, সৃষ্টির আনন্দেই মগ্ন যেন স্রষ্টা। এ এক আশ্চর্য রূপান্তরের খেলা যেখানে মূল আধারের সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার যোগসূত্র অনেক ক্ষেত্রে কেবলই তথ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল আধারের সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে যুক্ত হয়েছে নূতন মাত্রা।

কোন কারণে 'রবীন্দ্রসংগীত' বাংলা গানের জগতে এক স্বতন্ত্র ধারার নবসৃষ্টি বলে চিহ্নিত হল তা বুঝে নিতে হলে রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা গানের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবেই। এ বিষয়ে অনবদ্য বিবরণ রেখেছেন সংগীতবিদ্ অমিয়নাথ সান্যাল : 'বাংলা গানের নূতন যুগে তিন রকমের বিপদ এসে জুটেছিল। প্রথমত অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি ব্যক্তিদের হাতে টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালীর গান কোনও রকমে কণ্ঠাগত হয়ে থাকল মাত্র। দ্বিতীয়ত শিক্ষিত ব্যক্তিরা গান বাজনাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন বলে, এবং নাট্যসংগীতের প্রতি বিরূপ হলেন বলে সাধারণ গান তথা নাট্যসংগীত শিক্ষিত

ব্যক্তিদের সমালোচনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তৃতীয়ত এই অবসরে একদল শিক্ষিত সংগীতমোদী ব্যক্তি প্রচার আরম্ভ করলেন যে নাদ ব্রহ্ম প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপার একমাত্র হিন্দি গানে ও তম্বুরার মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে; অতএব একমাত্র পশ্চিমা গানই চতুর্বর্গের চাবিকাঠি সম্পূর্ণ করতে পারে—বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সংগীত হতে পারে না।'

এই পটভূমিতে সামগ্রিকভাবে বাংলা গানে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচনের দিশারি হলেন রবীন্দ্রনাথ। আর তা করতে গিয়ে তাঁকে যা করতে হল সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো কম্পোজারকে তা করতে হয় নি। গান রচনা করলেন যা বাংলা গানের বিষয় বিন্যাসের প্রচলিত রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল বিষয় নয় গানের গঠনেও আনলেন নতুনত্ব। কাব্যগীতির সুরসৃষ্টিতে এমন সব ঘটনা ঘটালেন যা তাঁর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি! সৃষ্টির উল্লাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি করতে হয়েছে একদল শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী যাঁরা পরম্পরাবাহী হয়ে আজও রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে বাংলার গানের জগতকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। এ পর্যন্ত করেও তিনি আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁর গানের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য একদল শ্রোতার রুচিও তাঁকেই তৈরি করতে হয়েছে। নিজের গানের বিশ্লেষণের দায়িত্বও নিতে হয়েছে তাঁকেই যার জন্য বারবার লেখনী ধরতে হয়েছে। এইভাবেই বাংলা গানের নূতন রূপসৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি—যার সুবাদে বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন শাখার সমৃদ্ধি ঘটল। তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন নিত্যনবসৃষ্টির গতিধারার উদ্ভবেই বাংলা গানের প্রাণ সঞ্চার সম্ভব—প্রাচীন সংগীতের জড় পুনরাবৃত্তিতে নয়।

বাংলা গানের সমস্ত ধারণাকে বদলে যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন তা কিন্তু কখনোই পরম্পরাহীন ছিল না। অর্থাৎ কখনোই তা ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। কেবল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এনেছিলেন নব সৃষ্টির উন্মাদনা। তাই অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন 'রসসৃষ্টিতে আসল কথা কেন হল এ প্রশ্নের জবাবে নয়, আসল কথা হয়েছে এই উপলব্ধিতে'। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মানতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গীতরচনার রূপসৃষ্টিতে গীতশিল্পী গায়ন ক্রিয়ার কৌশলে নানান ফাঁক ভরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতেন। এই ধ্যান-ধারণা একেবারে পাল্টে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিটি গান হয়ে উঠল স্বয়ং সম্পূর্ণ। সেখানে রূপকারের স্বাধীনতা কেবল অনুভবের প্রকাশে। আইনস্টাইনের সঙ্গে সংগীত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আচার আচরণে সততার নিয়ম মানলে এজাতীয় আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা পাওয়া যায়। আচার আচরণের নিয়ম জানা; তবে যে চরিত্র সেই নিয়মের স্বাতন্ত্র্য আর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলে তা হল নিজস্ব সৃষ্টিক্ষমতা। আমাদের সংগীতে এক দ্বৈত আছে—স্বাধীনতা আর নিয়মের নির্দেশ।' এই ধারণাটি বাংলা গানে ইতিপূর্বে এত স্পষ্ট করে আর কেউ বলেননি।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা গানের বিষয় ছিল একান্তই সীমিত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আনলেন আমূল পরিবর্তন। অনুপ্রাস আর শব্দের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে বাংলা গান ছিল নিতান্তই জর্জরিত। সেখানে শব্দ ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র প্রচলিত রীতি অনুসারে।

অনুপলব্ধ শব্দের ভার বা গানের শব্দগত অত্যাচার থেকে যিনি আমাদের মুক্তির আস্বাদন দিলেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। তিনি ব্যবহার করলেন এমন সব শব্দ যার ব্যঞ্জনা মানুষকে তার আত্মপরিচয় জানায়, 'তার সমস্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার শক্তি দেয়। শব্দ কীভাবে আমাদের আপন সময়ের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে' রবীন্দ্রনাথের গানে তার অসংখ্য চিহ্ন আছে ছড়ানো। গানের পরতে পরতে খুলে যায় কল্পনার অনন্ত বিস্তার। 'তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পনালোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা'। রবীন্দ্রনাথের গানে চিত্রকল্পের যে সম্ভার তাও কি বাংলাগানে অভিনব নয়? এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় হল বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্যের অখণ্ড রূপ ধরা আছে তাঁর গানে, ধরা আছে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আনন্দ বেদনা। বাংলা গানে ইতঃপূর্বে ঋতুর সঙ্গে জীবনকে নিয়ে একসূত্রে মালা গাঁথার কাজটি তিনি করলেন সর্বপ্রথম। তাই তাঁর প্রকৃতির গান ঋতুতে ঋতুতে রঙ বদলিয়ে চলে জীবনের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে।

গানের সুরেও আনলেন এক অনাস্বাদিত কল্পনার ছোঁওয়া যা নাড়িয়ে দিল সংস্কারের ভিতটিকে। তাঁর প্রথম যুগের গানে তিনি প্রধানত সুর সংগঠন করেছেন ভারতীয় রাগ সংগীতের ঐতিহ্যের পরম্পরা মেনে যা চলেছিল *গীতাঞ্জলি* পর্যন্ত। কিছু কিছু লৌকিক গানের সুরের কাঠামোও মিশেছিল এই পর্বের সুরে। *গীতিমাল্য* থেকে শুরু হয়ে গেল সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি। সেই সুরসৃষ্টি আমাদের সংগীতের ঐতিহ্য অনুসারী হয়েও আবেদনে তা অন্যতর হয়ে উঠল। এতদিন ভাবছিলেন গানে বর্ণনীয় ভাবের অনুসরণে সুরসৃষ্টির কথা। তারই পথ বেয়ে বর্ণনীয় রূপসৃষ্টিকেই আদর্শ মানলেন। সেই সুরগুলি কোনো নির্দিষ্ট রাগকৌলীন্যের পরিচয় বহন করে না কিন্তু এদের জাতির পরিচয় নিয়ে ভুল হবার অবকাশ থাকে না। স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশের সুর। এই সুর সংগঠনের নজির পেয়েছিলেন তিনি বাংলার কীর্তন গানে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মন্তব্য, 'এমনি করিয়া আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে, নানা রকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে অন্যপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে।'

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ গানের সুর সংগঠনে যে আধুনিকতার ছোঁওয়া লাগালেন সেখানেও তিনি হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের মেলডিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ব্যবহার করেছেন। এই কারণে আজও তাঁর গানকে রাগরাগিণীর ভিত্তিতে বিচার বা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। কেন জানি না আজও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাটিতে কোথাও কোথাও আমাদের মন সায় দেয় না তাই অনায়াসেই তাঁর বেশ কিছু গানকে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি নানা কাঠামোর ছাঁচে ফেলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করি। অথচ সামগ্রিকভাবে তাঁর সুররচনার ক্রমটিতে যদি আমাদের সচেতন দৃষ্টি রাখি তাহলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় কেমন ভাবে তিনি গানগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে সুর এসেছে শব্দের প্রয়োজনে, ভাবের প্রয়োজনে। সেখানে ভাব আর ভাষায় এমন অনিবার্য মেল বন্ধন ঘটে যা বাংলা গানে নজিরবিহীন। 'উভয়ের

যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেনকেই নিই বা হাইড্রোজেনকেই নিই, তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মত যৌগিক সৃষ্টি।'

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রয়োজনের খাতিরে রাগসংগীতের সুরের সঙ্গে গলাগলি করে আছে বাংলার বাউল কীর্তন। এমনভাবে মিশেছে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করা যাবে কিন্তু কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তাই রবীন্দ্রসংগীত সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ শিল্পসৃষ্টি। যে গানে দুই-তিনটি রাগেরও ছায়া মেলে তাও বাণীর প্রকাশের কারণে অনিবার্য বলে মনে হয়। হিন্দুস্থানি রাগ রাগিণীর গন্ধ, আর স্বরকেই তিনি নিজের করে নিয়েছেন, রাগ রাগিণীর স্বরের কাঠামোকে কখন প্রাধান্য দেননি। বরং এ কথা অনায়াসেই বলা যায় ভারতীয় হিন্দুস্থানি সংগীত থেকে নিয়েছেন যত ফিরিয়ে দিয়েছেন তার অনেক বেশি যা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। একালের বহু প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানি সংগীত শিল্পী (কণ্ঠ ও যন্ত্র)-কে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে দেখেছি। বলতে শুনেছি রবীন্দ্রসংগীতের সুরের যে দিগন্ত তা ভারতীয় সংগীতে অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী।

রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংগঠনের যে অনন্যতা তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল স্বরগুচ্ছের প্যাটার্ন। তিনি রাগরাগিণী চিনেছিলেন ধ্রুপদের মাধ্যমে তাই তাঁর স্বরকল্পনা এত নিখুঁত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংগীতিক অলংকরণের সংযমিত প্রয়োগ কল্পনা। তাই তাঁর গানে গমকের কোনো স্থান নেই, মিড়েরই প্রাধান্য আর স্পর্শস্বরের এমন সৌন্দর্য।

তাঁর গানে তিনিই প্রথম বললেন তাল তো অঙ্কের হিসাব। ছন্দই আসল। গানে বাণী সুর আর ছন্দ—এই আদর্শ মেনে গানে তিনি যে ছন্দের কত বিচিত্র প্রয়োগ করলেন তার নিদর্শন রয়েছে অজস্র গানে। এক এক ধরনের গানের এক-একটি স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ছন্দের এই ভাবনা আমাদের চেতনাকে এখনো সে ভাবে নাড়া দিতে পারেনি বলেই মনে হয় তাই এখন 'একটুকু ছোঁয়া লাগে'তে দাদ্‌রা বাজে 'তোমার গীতি জাগলো স্মৃতি'-তে তেওরা তাল বাজে। প্রথম গানটির মাত্রা বিন্যাস ৬ মাত্রার আর অন্যটির ৩-৪। প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন কিছু কিছু স্বরলিপিকারের সৌজন্যে বেশ কিছু গানের বিন্যাস অসাংগীতিক ছন্দের বিচারে পরিণত হয়েছে। আরো একটি কথা—রবীন্দ্রনাথ গানে ছন্দ নিয়ে যত পরীক্ষা করেছেন তা আর কেউ করেননি, কিন্তু সেই সব ছন্দের নামকরণ নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহই ছিল না। 'রবীন্দ্রসৃষ্ট নূতন তাল' বলে তাঁকে জাতে তোলার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। তিনি কখনই দাবি করেননি যে তিনি নূতন তাল সৃষ্টি করেছেন। কবিতার ছন্দে সুরারোপ করেছিলেন। বলেছিলেন প্রচলিত তালের সঙ্গে না মিললে নূতন তাল হবে।

গানের গঠন সম্পর্কেও একই কথা। গানের কাঠামো কতভাবে যে গড়েছেন আর ভেঙেছেন তার কোন সীমা নেই। এখানেও তালের মতো স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের খাঁচায় নিজেকে বেঁধে রাখেননি। স্থায়ী অন্তরা অন্তরা, স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী অন্তরা অন্তরা এমন কত যে গঠন তার সীমা নেই। বিস্তৃত তালিকা করলে তবেই তা

স্পষ্ট হবে। এখনকার আধুনিক বাংলা গানে যে সঞ্চারীহীন রূপ তাও মিলে যাবে রবীন্দ্রনাথের গানে। কবিতায় সুরারোপে প্রতি স্তবকে যে সুরের বিচিত্র সংগঠন তাও মিলে যাবে তাঁর গানে। এখানেও তিনি অনন্য।

রবীন্দ্রনাথের রচিত মোট গানের সংখ্যা নিয়ে যে কৌতূহল আমাদের তাও কি মিটেছে? কীসের ভিত্তিতে তাঁর গানের সংখ্যা নির্ণয় তা কিন্তু কেউ বলেননি। রবীন্দ্রনাথ একই গান কখনো সুরের বদল ঘটিয়ে কখনো শব্দ বদলে অন্য মাত্রা যুক্ত করেছেন। সেই সব গানগুলি কীসের ভিত্তিতে গণনা করা হবে? সেখানেও তিনি স্বতন্ত্র।

সব কিছু মিলিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের যে অনন্যতা তা স্বীকৃত হয়েছে। এ গান তাই সহজেই চেনা যায়। বাংলা গানের ক্ষেত্রে যার নজির নেই।

রস

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। অর্থাৎ যা আস্বাদন করা যায় তাই রস। পরম আস্বাদ্যতম ব্রহ্মানন্দকেই উপনিষদে রস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই রসের আস্বাদনে যে পরম আনন্দ লাভ হয় তাও ব্রহ্মানন্দী ব্যক্তির অনুভবসিদ্ধ। বস্তুত এই অপ্রাকৃত রসের ছায়াতেই প্রাকৃত রসের আস্বাদ্যমানতার কথা এসেছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভরত *নাট্যশাস্ত্র* লেখার সময় রস সম্বন্ধে প্রথম সুনিপুণ ধারণা দিলেও পরবর্তী কালের আলঙ্কারিকেরা রস ব্যাপারটা ঠিক বোঝেননি। ফলে কেউ বলেছেন রস এক রকমের অলঙ্কার, কেউ বলেছেন একটি কাব্যের গুণ। একেবারে একাদশ শতাব্দীতে এসে অভিনবগুপ্ত যখন ভরতকথিত কাব্যরস এবং নাট্যরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন *অভিনবভারতী* টীকায়, তখন রস সম্বন্ধে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হল সামগ্রিকভাবে। অথচ ভরত সেই কবেই বলেছিলেন—রস ছাড়া কোনো বিষয় চলতেই পারে না—ন হি রসাদৃত কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। হয়ত এই কথাটার ওপরে নির্ভর করেই নবম খ্রিষ্টাব্দে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন লিখেছিলেন—এমন কোনো বিষয়ই থাকতে পারে না, যা রসের স্পর্শ পেলে চমৎকার না হয়ে ওঠে—নাস্ত্যেব তদ্‌বস্তু যদভিমত রসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রথুণীভবতি।

ভরতমুনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে কাব্য-নাটকের মধ্যে রস তৈরি হওয়ার একটা নির্দিষ্ট উপায় আছে। পারিভাষিকভাবে বলা যায়—মানুষের ভিতরে নিরন্তর কতগুলি স্থায়ীভাব তাকে সুখিত করে, দুঃখিত করে, তাকে হাসায়, রাগায়, উৎসাহিত করে। ভরতের মতে মনোজগতের এই স্থায়ী ভাব আটটা—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা এবং বিস্ময়। এই স্থায়ী ভাবগুলিই যখন বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের মাধ্যমে কাব্য-নাটকে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে তখনই তাতে রসের সৃষ্টি হয়—তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। বিভাব হল স্থায়ী ভাবের কারণ। ধরুন—মনের মধ্যে যে চিরন্তন রতি বা মিলনেচ্ছা আছে তা নায়ক এবং নায়িকাকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়। এই নায়ক-নায়িকা হলেন আলম্বন বিভাব। আবার যে-সব জিনিস নায়ক-নায়িকার মিলনেচ্ছা চেতিয়ে দেয়—নির্জন নদীতীর, কোকিলের ডাক, বসন্তের হাওয়া—এগুলি হল উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হল স্থায়ীভাবের কার্য, যেমন দীর্ঘশ্বাস, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। স্থায়ীভাবের সহকারী যে ভাবগুলি তাকে বলে

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। যেমন মিলনেচ্ছা বা ভালবাসার ক্ষেত্রে চিন্তা, উদ্‌বেগ, লজ্জা, হর্ষ, দীনতা, আবেগ, স্মৃতি ইত্যাদি। ভরতের মতে—আটটি স্থায়ীভাব—রতি, হাস্য, শোক ইত্যাদি বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে আটটি রসের সৃষ্টি করে যথাক্রমে—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত রস।

কাব্য-নাটকের মধ্যে যে রস কাব্যের শ্রোতা বা নাটকের দর্শক অনুভব করে, সেখানে দর্শক-শ্রোতার মনোলোকই প্রধান। রসশাস্ত্রকারদের মতে সামাজিকের মনের মধ্যে শৃঙ্গার, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব পূর্বজন্মের সংস্কারের মতো বাসনাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। অভিনয় দেখা বা কাব্য পড়ার সময় কাব্য-নাট্যগত বিভাব-অনুভাবগুলির সঙ্গে প্রথমে সামাজিকের হৃদয় এক ধরনের একরূপতা লাভ করে। এই তন্ময়ীভবনের প্রক্রিয়ায় সামাজিকের হৃদগত স্থায়ীভাব উদ্রিক্ত হয়। এই বাসনালোক জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাব-অনুভাবের বোধগুলি অপ্রধান হতে শুরু করে এবং ভাবতন্ময় চিত্তে অলৌকিক এক রসের আস্বাদন অনুভূত হয়। এই আস্বাদন স্থায়ীভাবেরও আস্বাদন নয় আবার বিভাব-অনুভাবাদিরও আস্বাদন নয়। পোলাও তৈরি করবার সময় গোবিন্দভোগ চালটিকে যদি স্থায়িভাব হিসেবে ধরা যায়, সেখানে তার বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী হিসেবে ধরা যায় জায়ফল, শাহমরিচ, কিশোরী রং থেকে আরম্ভ করে ক্ষুধা এবং নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্য পর্যন্ত। কিন্তু পোলাও খাবার সময় যেমন আলাদা করে জায়ফল-জৈত্রির স্বাদ পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া যায় না গোবিন্দভোগ চালের নিজস্ব স্বাদও, ঠিক তেমনই রতি, শোক ইত্যাদি স্থায়ীভাব তাদের নিজস্ব বিভাবাদির সংযোগে এমন এক বিলক্ষণ আস্বাদন তৈরি করে, যাতে সামাজিকের হৃদয়ে বিলক্ষণ এক রসানুভূতির সৃষ্টি হয়, যেখানে বিভাবাদির পৃথক উপস্থিতি আর টের পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী রস আট রকমের হলেও পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা নবম রস হিসেবে যোজনা করেছেন শান্তরসকে। ব্রহ্মানন্দী ঋষিরা কামক্রোধাদিবর্জিত নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যে অলৌকিক ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ অনুভব করেন, সেটাও যে রসপদবাচ্য হওয়া দরকার, সেটা পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা অনুভব করেছেন। আরো পরবর্তীকালে ভক্তিরসকেও অন্যতম প্রধান রস হিসেবে গ্রাহ্য করার দাবি ওঠে রসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত-সজ্জনের মনে। একালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রাচীন রসশাস্ত্রের ঐতিহ্যে ভক্তিকে রস বলে গ্রাহ্য করা হয়নি বলে। তবে অতিপ্রাচীনেরা যাই করে থাকুন, চৈতন্যপরবর্তী যুগে চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী রসশাস্ত্রের রূপটাই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর মনে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটিই প্রধান রস। এই মতের অনুগামী হয়ে কবিকর্ণপুর *অলঙ্কারকৌস্তুভ* রচনা করেছেন। কৃষ্ণভক্তিই এই রসসম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য এবং ঐতিহ্যানুগত প্রাকৃত অষ্টরস এই রসের ছায়া মাত্র।

ঐতিহ্যবাহী অষ্টরসবাদীদের মতে মূল রস চারটি। যেমন শৃঙ্গার-রসের অনুকরণই হাস্য। বৃদ্ধ পুরুষ যদি যুবকের মতো সেজে তরুণীর কাছে প্রেম নিবেদন করে, তবে বলতে হয় শৃঙ্গারের অনুকরণই হাস্যরস। আরেকভাবে রৌদ্ররসের কর্মই করুণ-রস। কর্ম অর্থ ফল। রৌদ্র-রসের ফল বধ-বন্ধন প্রভৃতি। আর এমন বধ কিম্বা বন্ধন ঘটলেই

করুণ-রসের সৃষ্টি হয়। একইভাবে বীররসের ফলই হল অদ্ভুতরস। ধরুন, রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে এমনভাবেই রাবণকে মারলেন, যাতে পাঠকের মনে বিস্ময় তৈরি হয়। এই বিস্ময়ের স্থায়ীভাব থেকেই অদ্ভুতরসের সৃষ্টি। আর বীভৎস যেখানে আছে, ভয়ানক-রসও সেখানেই থাকে—এটাই রসশাস্ত্রকারদের ধারণা!

রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থে গভীর আলোচনা আছে, সেগুলি হল—ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*, তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা *অভিনবভারতী*। আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক*, তদুপরি অভিনবগুপ্তের টীকা *ধ্বন্যালোক-লোচন*। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*, মম্মটভট্টের *কাব্যপ্রকাশ*, বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ*, রূপগোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* এবং *উজ্জ্বলনীলমণি*, তথা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের *অলঙ্কারকৌস্তুভ*।

রাগ ও ঠাট

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাগ। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ রাগ অর্থে বলেছেন—'রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ' অর্থাৎ যা শুনলে মনোরঞ্জন হয়। স্বরবিন্যাস মাত্র-ই যে রাগ নয়, সুরের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হল রাগ, তা এই কথাতে স্পষ্ট। রাগ বলতে আমরা বুঝি যে নির্দিষ্ট ঠাটের অন্তর্গত বিশিষ্ট 'মূর্ছনা' বা আরোহণ-অবরোহণযুক্ত, বাদীগ্রহন্যাস ইত্যাদি লক্ষণান্বিত, বর্ণ অলঙ্কারাদি মণ্ডিত রস ও ভাষা প্রকাশক স্বরসমষ্টি। রাগ এমন একটি সুরের কাঠামো যেখানে স্বরগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পৌনপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে 'জাতি'র ভিত্তিতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে রাগ রাগিণীর ভিত্তিতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচলিত আছে।

সংস্কৃত শাস্ত্রে রাগ সম্পর্কে অনেক মত আছে। প্রধান চারটি মত হল ঈশ্বর বা ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত ও কল্লিনাথ মত।

সাধারণত তিন জাতীয় রাগ আছে—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। আরোহণ-অবরোহণ অনুসারে এগুলির মিশ্রণে নয় জাতীয় রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আর এক ধরনের রাগের জাতি বিভাগ করা হয় :

১. শুদ্ধ শ্রেণি—শুদ্ধ রাগ।

২. সালঙ্ক বা ছায়ালগ শ্রেণি—যে রাগের ভিতর অন্য কোনো একটি রাগের ছায়া থাকে, অর্থাৎ দু'টি রাগের মিশ্রণে উদ্ভূত।

৩. সংকীর্ণ শ্রেণি—যে রাগের মধ্যে শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগের অর্থাৎ দু'টি বা অনেক রাগের সংমিশ্রণ হয়েছে।

ঋতু অনুযায়ীও রাগরাগিণীর বিভাগ হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজি আরো একভাবে রাগকে ভাগ করেছেন, যথা—দিবাগেয়, সন্ধ্যা ও ঈষাগেয় এবং রাত্রিগেয়।

বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানি সংগীতে রাগের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ১০টি যথা— ১. ঠাট, ২. জাতি, ৩. বাদী-সংবাদী, ৪. গ্রহ, ৫. ন্যাস, ৬. রাগবেলা, ৭. পকড়, ৮. মূর্ছনা (আরোহণ-অবরোহণ), ৯. চলন, ১০. অঙ্গ।

বর্তমানে হিন্দুস্থানি রাগের গঠনসংক্রান্ত নিয়মাবলি বা লক্ষণগুলি হল :

১. সাধারণভাবে একটি রাগে ন্যূনতম পাঁচটি স্বরের ব্যবহার হবে।

২. প্রত্যেক রাগে বাদী বা অংশ স্বর থাকবে।

৩. রাগে আরোহণ-অবরোহণের নির্দিষ্ট নিয়ম বজায় রাখতে হবে।

৪. প্রত্যেক রাগে 'সা' স্বরটি অবশ্যই থাকবে।

৫. সাধারণত একটি রাগে 'মা' স্বর বা মধ্যম ছাড়া অন্য কোনো স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত অবস্থা পরপর ব্যবহৃত হবে না। (যদিও কর্নাটকি সংগীতে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।)

৬. কোনো একটি রাগে মধ্যম ও পঞ্চম স্বর একসঙ্গে বর্জিত হবে না।

৭. রাগের 'বর্জ্য' স্বরের সুকৌশল প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু কোনোমতেই বর্জিত স্বর ব্যবহৃত হবে না।

৮. বাদী স্বরের অবস্থিতি ভেবেই রাগ পূর্বাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গ হবে।

যখন কোনো একটি রাগে স্বরসপ্তকের ক্রমানুযায়ী আরোহণ ব্যবহৃত হয় তখন তাকে ঠাট বলা হয়। এতে পারম্পর্য বা আরোহণের কোনো স্থান নেই। একটি ঠাটের স্বর সপ্তকের মধ্যে একটি বা দু'টি স্বর বর্জন করে এবং স্বরের স্বাভাবিক ক্রম বা পারম্পর্য রক্ষা না করে অনেক ধরনের রাগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং একটি ঠাটের মধ্যে অনেক রাগ বর্তমান থাকে। ঠাটে ব্যবহৃত স্বর সপ্তকের একটি বা দু'টি বর্জন করেও রাগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার সপ্তকের স্বাভাবিক ক্রমেও যেমন একটি রাগ সৃষ্ট হয়েছে, তেমন স্বরগুলির বিচিত্র পারম্পর্যেও রাগ সৃষ্ট হয়েছে। রাগ ও ঠাটের মধ্যে এটাই পার্থক্য উদাহরণ :

টোড়ী ঠাট— স ঋ জ্ঞ ম প দ ন র্স

মুলতানি রাগ—আরোহণ— ন স জ্ঞ ম প ন র্স

অবরোহণ— র্স ণ দ প ম প

ম জ্ঞ ঋ স।

রিপ্রেজেন্টেশন

অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্প-সাহিত্য ও উপস্থাপনা বিষয়ে বহু যুগ ধরে কথা বলা হয়েছে। প্লেটো মনে করতেন, শিল্প-সাহিত্য হল উপস্থাপনার উপস্থাপনা। যেহেতু এই পৃথিবী, ভাবের এক পৃথিবীর স্বপ্নের এক পৃথিবীর উপস্থাপনারূপমাত্র এবং শিল্প-সাহিত্য এই পৃথিবীকেই উপস্থাপিত করে, তাই শিল্পসাহিত্য, সাধারণ যুক্তিতে উপস্থাপনার উপস্থাপনা। শিল্প-সাহিত্য জীবনকে উপস্থাপিত করে—এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে অনেকে উপস্থাপনা-কর্ম বিষয়ে নানান নিষেধাজ্ঞা জারির পক্ষপাতী। এই-এই জিনিস দেখানো শোনালো বলা যাবে না, ওই-ওই সব করা যাবে না। যেমন, ভরত 'নাট্যশাস্ত্রে' বলেছেন, কী কী মঞ্চে দেখানো যাবে না : রক্তপাত, যৌনকর্ম বা হিংসাত্মক কোনো দৃশ্য। বা, রাষ্ট্র দ্বারা সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি শিল্প ছাড়া সাধারণভাবে শিল্পকে প্লেটো তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেছিলেন। কবিদের তো তিনি নির্বাসিতই করলেন; ওদের উসকানিতেই তো যত ঝামেলা। মানুষ না-মানার, বেঁকে বসার সাহস পায় তো ওদের প্ররোচনাতেই। আবার অ্যারিস্টটল, ট্রাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রথমেই বললেন যে ট্র্যাজেডি হল ভাবগম্ভীর ও উচ্চস্তরের কোনো কর্মের 'নকল'...। এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় হল, এঁরা প্রত্যেকেই শিল্প-সাহিত্য ও বাস্তবের মধ্যে বাস্তবকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি, প্রথমটি যেন বা নিকৃষ্টতর কোনো কিছু; নিছক নকলনবিশি করাই শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ।

শিল্প-সাহিত্যের মৌলিকতা এবং আংশিক হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রমাণ হতে সময় লাগল বহুদিন। আর এ ব্যাপারে মূল যে বিষয়টিকে ঘিরে আলাপ-আলোচনা-তর্কাতর্কি চলল, সেটা হল 'সত্য'। বাস্তবের সত্য বনাম শিল্প-সাহিত্যের সত্য : কোনটির গুরুত্ব বেশি, কোনটির মূল্য বেশি, কে কাকে সালটে-সাপটে রাখে।

শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় স্থান-কাল অত্যন্ত জরুরি। একটি বিশেষ স্থানে, একটি বিশেষ কালে একেকটি শিল্প-সাহিত্যকর্ম নির্মিত হয়। এই নির্মাণের প্রসঙ্গটিকে ঘিরেই আমরা আলোচনাটি বাঁধতে চাই। শিল্প, সাহিত্য—দুই-ই নির্মাণসাপেক্ষ। ফলে প্রত্যেকটি উপস্থাপনাই একেকটি নির্মাণ। এবার যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হল এই নির্মাণ করে কে? শিল্পী, সাহিত্যিক—অর্থাৎ ব্যক্তি। আর এই ব্যক্তি যেহেতু সমাজে প্রোথিত, সেহেতু নির্মাণের প্রক্রিয়ার প্রতিটি খাঁজে-ভাঁজে চারিয়ে যায় সমাজের নানা চাপ।

একজন ব্যক্তি একটি শিল্প-সাহিত্যকর্ম নির্মাণ করেন ও উপস্থাপনার এই প্রক্রিয়ায় তিনি সমাজ-ইতিহাসের নানান উপকরণ ব্যবহার—আহরণ বা বর্জন—করেন। শিল্পসাহিত্য সমাজের প্রতিফলন—এই পানসে ক্লিশে অলস সমীকরণে যদি ক্ষান্ত না দিতে চাই, তাহলে যেটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, তা হল আহরণ ও বর্জনের এই প্রক্রিয়াটি সচেতন এক ক্রিয়া : উপস্থাপনা / নির্মাণ একটি সচেতন প্রক্রিয়া। উপস্থাপিত কর্মটির একটি আংশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, যা পুরোপুরি সমাজ-নিরপেক্ষ না হলেও মৌলিক। শিল্প-সাহিত্যের সত্য, বাস্তব সত্য না হলেও, অন্য জাতের সত্য; যার নিজস্ব যুক্তি আছে, প্যাঁচ-পয়জার আছে। বাস্তবে এমনটা হয় না—এই বলে কোনো উপস্থাপনা কর্মকে খারিজ করা যায় না। 'এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে', কিংবা 'মুখপানে চেয়ে দেখি, হয় মনে— / ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে'—শুনে কেউ যদি বলেন, এ আবার কী, বাস্তবে এমনটা হয় নাকি, তখন তিনি যা বুঝতে চান না, তা হল, বাস্তবকে পেইলে-পেইলে যাওন শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ না; তাঁরা বাস্তবকে তাঁদের উপস্থাপনা কর্মে 'অপরিচিত' করে তোলেন আর উপস্থাপিত বস্তুটিই 'রসে'র আধার; অ-চেনা 'ভাব'। আর উপস্থাপনা একটি সচেতন নির্মাণ বলেই ও নির্মাণকারী সামাজিক প্রাণী বলেই, এটি মতাদর্শগত, রাজনৈতিক। ইংরাজিতে 'রি'-কে উপসর্গ হিসেবে লিখলেই এই নির্মাণের বিষয়টি বোঝা যায় : রি-প্রেজেন্টেশন।

কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকরা যে বাস্তবকে অপরিচিত করে তোলেন, তার স্বরূপ কী? সে কি নিজে থেকে ধরা দেয়? নাকি তাকে বুঝতেই, অধরা সেই মাধুরীকে ছন্দ-বন্ধনে মানুষের বোধগম্য করে তুলতে মানুষকেই কোনো-না-কোনো উপায় বের করতে হয়েছে? আসলে ভাষা হল সেই জ্ঞানের একটি মাধ্যম। নিরেট বাস্তব, ভাষার মধ্যস্থতাতেই 'অর্থময়' হয়ে ওঠে। আবার বস্তু ও শব্দের সম্পর্ক অনাপেক্ষিক নয় বলেই দেখা যায় অর্থের নানান সম্ভাব্যতা। তৈরি হয় একাধিক 'বাস্তবতা', যার প্রতিটি রূপই মূল যে ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে—সেই 'বাস্তব' থেকে আলাদা। এই 'বাস্তবতা' সমূহ যেহেতু রসের আধার, ফূর্তির প্রেরণা, মানুষের অবদমিত ইচ্ছেগুলোকে সেগুলি যেহেতু সহজেই জাগিয়ে তুলতে পারে, সেহেতুই উপস্থাপনা বিষয়ে এতসব বারণাবলি। আবার এও সত্য যে, সব কিছু ভাষার মাধ্যমে বোধগম্য হয় বলেই এটা বলা যায় না যে ভাষার অতিরিক্ত কোনো বস্তুজগৎ অস্তিত্বহীন, বয়ানের বাইরে কিছু নেই। ক্ষুধা, মানবশরীর, বর্ণ; জাতি; শ্রেণিবিদ্বেষ, শোষণ—এইগুলি ভাষায় উপস্থাপিত হয়েও ফুরোয় না, বয়ানের বাইরেও, বস্তুজগতে আমাদের চারপাশে এদের উপস্থিতি প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অর্থের একাধিক সম্ভাবনার দোহাই পেড়ে কেউ যদি বলেন এইগুলি নিছক বয়ানগত উদ্ভাবনামাত্র, তাহলে ও-হেন পাঠের রাজনৈতিক মাত্রার বিশ্লেষণ দরকার। উপস্থাপনা যে কারণে এক সামাজিক-প্রতীকী কর্ম, সে কারণে পঠনও তাই। প্রতিটি পঠনও একেকটি নির্মাণ। পঠনের উদ্দেশ্যই হল উপস্থাপনা / নির্মাণ / বয়ানের যুক্তিবুনোটটিকে বোঝা ও তার বিশ্লেষণ করা। নির্মাণ বলেই তার বি-নির্মাণও সম্ভব, পৃথিবীর আর সব কিছুর মতোই : সেও তো এক রচনাই।

রিয়ালিজম

রাখী মিত্র

রিয়ালিজম শব্দটি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, বহুলব্যবহৃত দর্শনশাস্ত্রে ও চিত্রকলাতেও। প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অর্থ তাৎপর্য বিভিন্ন। এমনকী মধ্যযুগীয় ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রে রিয়ালিজম-এর শব্দার্থ আর আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই শব্দার্থ প্রায় মেরুপ্রমাণ দূরত্বে অবস্থিত। আবার ইউরোপীয় রিয়ালিজম-ই যে হুবহু বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত রিয়ালিজমের প্রস্তাবনা এমন ভাবাও হয়ত সমীচীন নয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে রিয়ালিজম ছিল নমিনালিজমের বিরোধী—প্রকল্প। নমিনালিস্টরা বস্তুসত্তার বিচারে বর্গের তুলনায় গুরুত্ব দিতেন বিশেষকে। অর্থাৎ, তাঁরা একটি বিশেষ কুকুরকে কুকুর নামক প্রজাতির চেয়ে বেশি রিয়াল মনে করতেন। পক্ষান্তরে, তৎকালীন রিয়ালিস্টরা বিশেষ একটি কুকুরের তুলনায় কুকুর নামক প্রজাতিটিকে অধিকতর রিয়াল বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রে রিয়ালিজম বলতে বোঝায় আইডিয়ালিজমের-বিরোধিতা। এখানে রিয়ালিটি শব্দটিকে প্রথমেই পৃথক করা হয় আইডিয়া বা ধারণা থেকে। মনোগত ধারণা এই প্রস্তাবমাফিক কোনো রিয়ালদ-বিষয় নয়, বরং সেই ধারণার বস্তুরূপটিকে রিয়াল হিসেবে চিহ্নিত করবেন তাঁরা। উল্টোদিকে, আইডিয়ালিস্টরা বলবেন, আমাদের মনোগত ধারণা বা আইডিয়ার মধ্যে যা নেই, তা আদৌ আছে কিনা সেইকথাই বা আমরা জানব কী করে?

রিয়ালিজম শব্দের তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থটি ঠিক জ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং সংযুক্ত কলাচর্চার ক্ষেত্রে। আরো নির্দিষ্ট করে বলা হলে, উল্লেখ করা যেতে পারে এই অর্থদুটি যুক্ত চিত্রকলা ও কথাসাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে। চিত্রকলায় রিয়ালিজম বলতে বোঝায় সমকালীন জীবনযাত্রার প্রায় হুবহু প্রতিচিত্রণ। কোনো বস্তুবিশেষের বাহ্যিক রূপকে নিবিড়ভাবে লক্ষ করে শিল্পী তার অন্তঃসৌন্দর্যকে নিজের সৃষ্টিতে ধরতে চাইলেও, রিয়ালিস্ট শিল্পীর লক্ষ্য তা নয়! বরং কত যথাযথভাবে বস্তুবিশ্বের বর্ণবৈচিত্র্য, আলোক প্রক্ষেপ আর ত্রিমাত্রিক অবস্থানগত গভীরতাকে দ্বিমাত্রিক সমতলে প্রতীতিযোগ্য করে তুলতে পারেন, সেদিকেই তিনি নজর দেবেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ফরাসি চিত্রকলায় এর ধারাবাহিক চর্চা শুরু। তার আগে উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বার্বিজোন শিল্পীগোষ্ঠী গ্রামীণ প্রকৃতি চিত্রণের ক্ষেত্রে এর সূচনা করে। ক্রমশ এরও অর্থান্তর ঘটে। সামাজিক হতাশা, ক্ষোভ প্রকাশেরও হাতিয়ার হয়ে ওঠে চিত্রকলা।

সেইমত, ফ্রান্সে অনর দ্যুমিয়ে ফরাসি সমাজের অ-নৈতিক জীবনকে যখন তাঁর টানা শক্তিশালী রেখায় ধরেন বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মোহমুক্তিকে জার্মান শিল্পীরা যখন আঁকেন তাদের ছবিতে, তাও চিত্রকলায় রিয়ালিজম চর্চারই অঙ্গ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রিয়ালিজম চর্চা আর একটু অন্যরকম বিষয়। চিত্রকলার রিয়ালিজম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বা নতুন কিছু না হলেও, সাহিত্যে এর অর্থপ্রসার ঘটেছে অনেকখানি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি কথাসাহিত্যে সচেতনভাবে এই রিয়ালিজমের চর্চারম্ভ। এর আগে অষ্টাদশ শতকে ড্যানিয়েল ডিফো, হেনরি ফিল্ডিংয়ের লেখায় ছিল এর পূর্বাভাস। ঐতিহাসিক রোম্যান্স বা অন্যান্য রোম্যান্স রচয়িতাদের মতো এখানে পারিপার্শ্বিক থেকে সুদূরবর্তী কোনো স্থান কল্পনা করে এক বৃহত্তর মাত্রায় তার কাহিনিচিত্রণ রিয়ালিস্ট কথাকারের পথ নয়; আবার সমাজ পারিপার্শ্বিকে যে ধরনের পরিণতি কাঙ্ক্ষিত সেই ধরনের পরিণতির লক্ষ্যে কাহিনির সজ্জা নির্মাণও রিয়ালিস্ট কথাকারের লক্ষ্য নয়। পারিপার্শ্বিককে যেমন দেখছেন আর যেভাবে দেখছেন তারই উপস্থাপনা করবেন তিনি। দুটি শব্দই দরকারি—'যেমন দেখছেন' ও 'যেভাবে দেখছেন'। 'যেমন দেখছেন' এর সঙ্গে যুক্ত দ্রষ্টার লক্ষ করার দক্ষতার প্রশ্ন আর 'যেভাবে দেখছেন'-এর সঙ্গে যুক্ত দ্রষ্টার পরিলক্ষিত বস্তুবিশ্বকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার প্রশ্ন।

লেখক কী লক্ষ করেন? লক্ষ করেন শুধু রাজবৃত্তে বা সামন্তবৃত্তে নয়, কাহিনির অনিঃশেষ উপাদান প্রচ্ছন্ন রয়েছে লোকবৃত্তে। সেইসূত্রেই রিয়ালিস্ট কাহিনির নায়ক শুধুই রাজসিংহ আর আকবর, শিবাজি নন, এর নায়ক কুবের মাঝি, শশী ডাক্তারও। পেশা অনুযায়ী, সামাজিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত রুচি ও অভিরুচি অনুসারে ব্যক্তিচরিত্রের বিশেষ প্রকৃতি বদলাবে। বদলাবে তার সংলাপ, চিন্তাপদ্ধতি, আবেগের প্রকাশ-পদ্ধতি, গৃহসজ্জা, পোশাক, পছন্দের বিষয়তালিকা সবই। এই বিশেষ সাধারণ মানুষকে নিয়েই রিয়ালিস্ট কথাকারের কারবার। কথাকার সেই অবস্থার সঙ্গেই লক্ষ করেন পরিস্থিতি। মানবজীবনে ঠিক যেমন—যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটিই ব্যক্তিবিশেষের জীবনে ঘটবে এমন পরিস্থিতি দুর্লভ। অথচ এই রোম্যান্সের জগতে আর আইডিয়ালিস্ট কথাসাহিত্যিকের কলমে দুর্লভ পরিস্থিতিই রীতিমত সুলভ। রিয়ালিস্ট কথাকার যে ধরনের হতাশা, অসংগতি ও অবসাদ দেখবেন চারদিকে, তার প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠ। সেইসূত্রেই এসে পড়ে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও উৎস সন্ধানের প্রশ্ন।

এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে রিয়ালিস্ট কথাকারের জিজ্ঞাসা। একদল, মানবমনের দুরবগাহ অবচেতন ও নির্জ্ঞানের মধ্য থেকে মানবসত্তার মূল খুঁজতে চেয়েছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে তাঁদের সহায়ক হয়েছে। অন্যদল মানবসমাজের শ্রেণিগত অবস্থানের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও মানসিকতার মধ্যে মানবসমাজের পরিস্থিতিগত অসংগতির উত্তর খুঁজেছেন, মার্ক্সীয় দর্শন এঁদের পথ দেখিয়েছে। সেইভাবেই রিয়ালিজমের চর্চা থেকেই উত্থিত হয়েছে একদিকে ন্যাচারলিজম অন্যদিকে সোশ্যাল রিয়ালিজম।

বাংলায় রিয়ালিজমের চর্চা আর ন্যাচারালিজমের চর্চা যেন হাত ধরাধরি করে এসেছে। ফলত প্রায়শই এখানকার রিয়ালিস্ট গল্পে ন্যাচারালিস্ট উপাদান মিলে মিশে থাকে। শুধু তাই নয় বাংলায় একদা রিয়ালিজমের প্রতিশব্দ হিসেবে 'বস্তুতন্ত্র' শব্দস্থাপনে বেশ গোলমালও নয়। কারণ ভারতীয় দর্শনের বস্তুতন্ত্র-র সঙ্গে প্রাগুক্ত আইডিয়ালিস্ট মতের কিছুটা মিল আছে, অথচ পশ্চিমে রিয়ালিজম, আইডিয়ালিজমের বিরোধিতা থেকেই জন্মেছে। আর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র কেউই এই ধরনের রূঢ় বাস্তবতার সমর্থন করতে পারেননি। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা ফোটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি?' রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন, "...লেখনীর জাদুতে, কল্পনার পরশমণিস্পর্শে, মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, ইন্দ্রের সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে, ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে 'হাঁ কবি বটে', বলবে 'একেই তো বলে রিয়ালিজম'। —আমি বলছি, বলে না। রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়।"

বাংলার রিয়ালিজম চর্চা তাই স্বতন্ত্র অনুধ্যানের বিষয়। তাতে পশ্চিমি হাওয়া যেমন আছে, তেমনই স্থানীয় মাটিও আছে।

রীতিবাদ

শম্পা চৌধুরী

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা আচার্য বামন। অষ্টম শতাব্দীর আলঙ্কারিক বামন রীতি-র সার্থক সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, কাব্যের আত্মারূপে রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে রীতিপ্রস্থানকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন সবই সত্য কিন্তু এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তার গৌরব তাঁকে দেওয়া যাবে না। তাঁর কিছু আগেই আনুমানিক সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য ভামহ তাঁর *কাব্যালঙ্কার* গ্রন্থে সর্বপ্রথম রীতির উল্লেখ করেছেন। ভামহ-র আলোচনা থেকে একথাও স্পষ্ট যে তাঁরও আগে রীতির ধারণাটি অন্তত আলঙ্কারিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বস্তুত নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরত (আনুমানিক কালসীমা খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক) রসনিষ্পত্তি আলোচনাকালে যে দশটি গুণের উল্লেখ করেছিলেন তার ভেতরেই নিহিত ছিল রীতি প্রস্থানের বীজ।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব এক অর্থে এক ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তর পর্ব। সাহিত্যালোচনায় যাঁরা নৈরাত্ম্যবাদী চার্বাকপন্থী তাঁরা কেবলমাত্র শব্দ, অর্থ ও তাদের অলঙ্কারের সমষ্টি ছাড়া কাব্যের আর কোনো পৃথক উপাদান স্বীকার করেন না। তাঁদের বক্তব্য কাব্য থেকে শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার প্রভৃতিকে পরস্পর বিশ্লিষ্ট করে নিলে আর কি উপাদান অবশিষ্ট থাকতে পারে যাকে তার আত্মা বলে নির্দেশ করা যায়? এর উত্তরে একদল আলঙ্কারিক বলেন যে সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সহৃদয়ের উপাদেয়। এই সৌন্দর্যের উপাদান অলঙ্কার—যমক, অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি শত শত ভণিতি বৈচিত্র্য যা শব্দ ও অর্থকে বিশিষ্টতা দান করে। সুতরাং কাব্যের শোভাহেতু অলঙ্কারকেই তার আত্মা বলে গ্রহণ করা উচিত। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা আচার্য ভামহ (সময়কাল আনুমানিক সপ্তম, অষ্টম শতক)। তাঁর মতে অলঙ্কারের অপর নাম 'বক্রোক্তি' আবার সমস্ত বক্রোক্তির মূলে আছে অতিশয়োক্তি। সুতরাং অতিশয়োক্তিই কাব্যের প্রাণ যাকে বাদ দিয়ে কোনো অলঙ্কার আত্মলাভ করতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে বাচ্যরীতি এবং ভাবগত নির্বাচনের বৈচক্ষণ্যকে প্রাধান্য দিলেও রীতির কাব্যমূল্যকে ভামহ আদৌ গুরুত্ব দেন নি, রীতির নামকরণও সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে রীতির নানারকম নাম কেবল মূর্খেরাই দিয়ে থাকেন এবং তা গতানুগতিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় (গতানুগতিকন্যায়াৎ নানাখ্যেয়মমেধসাম্)

ভামহ-র এই অলঙ্কার প্রস্থানের বিরুদ্ধে দণ্ডী তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাহেতু রূপে স্বীকার করে নিলেও দণ্ডী মনে করেন কাব্যে তার থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বর্তমান এবং তা হল গুণ। গুণ বলতে তিনি বোঝেন বর্ণনাভঙ্গির সৌকর্য সঞ্জাত বাগভঙ্গি বা বাক্‌পদ্ধতিকে যা এক অর্থে রীতিরই নামান্তর। অবশ্য দণ্ডী 'রীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তাঁর ব্যবহৃত শব্দটি হল 'মার্গ' এবং গুণ এই মার্গের প্রাণস্বরূপ। গুণের উপস্থিতি বা অভাবের কারণেই গড়ে ওঠে বিশিষ্ট বাক্‌পদ্ধতি। নাট্যাচার্য ভরতের মতো দণ্ডীও শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজঃ, পদসৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা ও কান্তি প্রভৃতি দশটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন এবং কাব্যের প্রাণস্বরূপ দশটি গুণ বর্তমান বলে বৈদভী মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন (এতে বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণা স্মৃতাঃ)। কালিদাসের কাব্য বৈদভী মার্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দণ্ডীর পর আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন আলঙ্কারিক বামন। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভামন্ত্রী আচার্য বামন দণ্ডী উল্লিখিত দশটি গুণ স্বীকার করলেও তাকে কাব্যের আত্মা বলে মেনে নিলেন না। *কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি* গ্রন্থে অদ্ব্যর্থভাষায় রীতিকেই তিনি কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্ট পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা'। রীতি বলতে বামন একটি বিশিষ্ট পদরচনাকে বুঝেছেন। অর্থাৎ এমনভাবে শব্দ ও অর্থ সন্নিবেশ বা রচনা করতে হবে যাতে শ্লেষ, প্রসাদ প্রভৃতি দশটি গুণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পারে। বলাবাহুল্য এইরকম রচনারীতিই কাব্যের আত্মা। বামনাচার্য কাব্যের প্রাণস্বরূপ এই রীতির তিনটি ভেদ স্বীকার করেছেন—বৈদভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। এর মধ্যে 'সমগ্রগুণোপেতা' বৈদভী ও 'ওজঃকান্তিমতী' গৌড়ী রীতির কথা দণ্ডীই বলেছেন। 'মাধুর্য সৌকুমার্যোপপন্না' পাঞ্চালী রীতি বামনের নিজস্ব সংযোজন। পাঞ্চালী রীতির বৈশিষ্ট্য শব্দ ও অর্থের তুল্য গৌরব—*'শব্দার্থয়োঃ সমগুম্ফঃ পাঞ্চালীরীতিরিষ্যতে'*। কিন্তু নতুন রীতির কথা বললেও পূর্বাচার্যদের মতো বামনও বৈদভী রীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন।

আচার্য বামনের পর আনুমানিক নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে *ধ্বন্যালোক* প্রণেতা আনন্দবর্ধনের আবির্ভাব সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বালোচনার জগতে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে আনন্দবর্ধন রীতিকে সরাসরি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন এবং 'রসধ্বনি' সৃষ্টিকেই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আনুমানিক নবম দশম শতকের অপর এক আলঙ্কারিক *কাব্যালঙ্কার* রচয়িতা রুদ্রট, বামন কথিত তিনটি রীতির পাশাপাশি 'লাটী' নামে চতুর্থ একটি রীতির আলোচনা করেছেন। নবম শতকের শেষভাগে রচিত *অগ্নিপুরাণ*-এও রীতির প্রসঙ্গ আছে এবং দেশভেদে রীতিভেদকে স্বীকার করেও সেখানে বৈদভী, গৌড়ী, লাটী ও পাঞ্চালী এই চারটি রীতির কথা আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে স্থানভেদে অলঙ্কারের আধিক্য, স্বল্পতা এবং কোমলতার মাত্রাকে আশ্রয় করে রীতির চরিত্র নিরূপণ করা হলেও রীতিবিচারের ক্ষেত্রে রুদ্রট-ই প্রথম শব্দ বা বাক্যসংগঠনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব

আরোপ করেছেন। গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও লাটী রীতির দেশজ চরিত্রকে মেনে নিলেও রুদ্রট কোথাও গুণের উল্লেখ করেননি। মূলত বাক্যসন্নিবেশের ওপরেই রুদ্রটের রীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত। নবম দশম শতকের আলঙ্কারিক রাজশেখর-এর *কাব্যমীমাংসা*-তেও রীতিবাদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

বক্রোক্তিজীবিত-র রচয়িতা কুন্তক-এর কথা উল্লেখ না করলে অবশ্য রীতিবাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর বক্রোক্তিবাদ-এ কুন্তক শব্দার্থবাদীদের বক্তব্যের যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা করলেও প্রাচীন রীতিনির্ণয় পদ্ধতিকে স্পষ্টতই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কোনো দেশবিশেষের নামে রীতির নামকরণ করা যায় না। কারণ রীতি দেশবিশেষের ধর্ম নয়, কবিরই ব্যক্তিগত স্বভাবধর্ম। দেশে দেশে নয়, কবির স্বভাবভেদেই তার ভিন্নতা। প্রসঙ্গত কুন্তক তিনটি মার্গ-এর উল্লেখ করেছেন—সুকুমার মার্গ, বিচিত্র মার্গ ও তদুভয়াত্মক মিশ্র মার্গ। তাঁর মতে এই মার্গগুলি কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থের কতকগুলি বহিরঙ্গ ধর্মের সমাবেশে গড়ে ওঠে না। কবিস্বভাবের প্রেরণাতেই ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সহকারিতায় জন্ম লাভ করে। সুতরাং উত্তম কবিদের প্রত্যেকের মার্গই সমানভাবে রমণীয়—উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার এখানে সম্ভবপর নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণস্বরূপ কুন্তক আভিজাত্য, মাধুর্য, লাবণ্য ও প্রসাদ প্রভৃতি চারটি গুণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে যেহেতু বিভিন্ন মার্গের মধ্যে উত্তম অধম ভেদ সম্ভব নয় সুতরাং উক্ত চারটি গুণ তিনটি মার্গেই বর্তমান কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন মার্গে তাদের আলাদা আলাদা তাৎপর্য।

এইভাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রীতিবিষয়ক ধারণা ক্রমশ দেশ বা অঞ্চল বিশেষের ভৌগোলিক অভিজ্ঞান পরিত্যাগ করে কবিস্বভাবের নিজস্বতা অন্বেষণে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল যে ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞরা ব্যক্তি ও স্টাইলকে যেমন অভিন্নভাবে নিতে পেরেছিলেন ভারতীয় আলঙ্কারিকরা তা পারেন নি এবং সর্বদাই রীতির সঙ্গে গুণের একটি অদ্বৈত সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাই যদিও আমরা বলি যে ভাব ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে ওঠে রূপের মধ্যস্থতায় এবং রূপ বিশিষ্টতা লাভ করে সাহিত্যিকের রচনা কৌশলে এবং এই কৌশলেরই সাহিত্যিক নাম রীতি তথাপি 'রীতি' ও 'স্টাইল' কখনোই এক নয়।

রূপকথা

পিনাকেশ সরকার

'রূপকথা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'উপকথা' থেকে এমন মনে করেন কেউ কেউ। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, বঙ্গীয় শব্দকোষ, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, বাঙ্গালা শব্দকোষ, আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান* প্রমুখ বাংলা অভিধানগুলিতে তেমনই নির্দেশ করা হয়েছে। অবশ্য অনেকে আবার 'উপকথা' বলতে ভিন্ন এক সাহিত্যপ্রকরণের কথা ভাবেন। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*-এ 'রূপকথা' বলতে বোঝানো হয়েছে 'অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী, ছেলে-ভুলানো অসম্ভব গল্প।' *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*-এ লেখা হয়েছে রূপকথা হল 'ছেলে-ভোলানো অবাস্তব গল্প [রাজপুত্র, রাজকন্যা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, জিয়নকাঠি, মরণকাঠি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি, রাক্ষস-খোক্ষস, রাজপুরী, তেপান্তরের মাঠ নিয়ে গল্প]।'

রূপকথা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা। লোককথার বিভিন্ন শাখার মধ্যে রূপকথা সবচেয়ে জনপ্রিয়। লৌকিক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবহমান। রূপকথার আঙ্গিক এমনই যে এর কথক ইচ্ছে করলে এর কাহিনি অংশকে বাড়াতে পারেন; ফলে স্বভাবতই এর মধ্যে অনেক উপকাহিনি যোগ করার সুযোগ থাকে। মূল কাহিনির অতিরিক্ত এক বা একাধিক উপকাহিনি এতে থাকতে পারে, কোনো কোনো সময় তারা মূল কাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে।

রূপকথার বিশেষ একটি ছাঁচ রয়েছে। রূপকথার পরিণতি কখনো বিয়োগান্ত হয় না। ফলে কারও কারও মতে, রূপকথায় বৈচিত্র্য কম। রূপকথায় চরিত্রের নাম থাকে না—রাজা, রাজপুত্র, রানি এসব নামেই তাদের পরিচয়। রাজার রাজ্যেরও কোনো নাম নেই, যেমন নদনদী পাহাড়পর্বত জঙ্গল প্রান্তর অতিক্রম করে রাজপুত্র অগ্রসর হয়, তাদেরও কোনো নাম নেই। কখনো কখনো কেবলমাত্র একটি মাঠ ও ঘাটের নাম শোনা যায়—তেপান্তরের মাঠ ও তিরপূর্ণির ঘাট। কিন্তু তারা যে কোথায়, তা জানার জন্য কারও কোনো কৌতূহল দেখা যায় না।

রূপকথার জগৎ অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য। তার ঘটনাও বিচিত্র সব নাটকীয় পথ ধরেই অগ্রসর হয়। তবে সেই ঘটনার মধ্যেও আমাদের প্রতিদিনকার চেনা পৃথিবীর মতোই আশা নিরাশা আনন্দ বেদনার বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়, খোঁজ মেলে একই ধরনের

স্নেহ-ভালোবাসা অথবা নিষ্ঠুরতার। পার্থক্য শুধু এই যে—মন্দ যারা তারা হয় শাস্তি পায়, নয়তো তাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়; আর ভালো যারা তারা প্রায়শই অনেক দুঃখের শেষে সুখের মুখ দেখে। কিন্তু ওই সব সুখ-দুঃখের মধ্যে অভাবনীয় কোনো গুণ থাকে। গল্প যেমন এগোতে থাকে, মনও তেমনই ক্রমে ক্রমে বিস্ময়ে ভরে ওঠে। গল্পের মধ্যে ওই রসটুকু আর এই বিস্ময়, অর্থাৎ আশ্চর্য হয়ে যাবার গুণটি থাকা চাই, নইলে রূপকথার আসল অর্থটাই বাদ পড়ে যায়। 'রূপকথা তো আর শুধু ঘটনা দিয়েই হয় না, ঘটনার প্রাণ হল গিয়ে রস, বিস্ময়; সে না থাকলে রূপকথা উৎরোয় না, কল্পনাই যথেষ্ট নয়।' (লীলা মজুমদার : ভূমিকা, *হ্যানস্ অ্যাণ্ডারসন* রচনাবলী ২)

রূপকথার পরিবেশ সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল। ইংরেজিতে একে বলে Fairy Tale বা পরি-কথা। রূপকথায় অবশ্য সবসময় পরি নাও থাকতে পারে। তবে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ এর আখ্যানভোগ। এর নায়ক সাধারণত কোনো অপরিচিত দেশের রাজপুত্র। সে কোনো নতুন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করে অসম্ভব কতকগুলি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিণামে সে দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে। তার সেই ভাগ্যান্বেষণ-যাত্রায় সঙ্গী হয় মন্ত্রিপুত্র, সদাগরপুত্র ও কোটালপুত্র। রূপকথার একটি সর্বজনীন ভিত্তি থাকে। যেমন—সিণ্ডারেলার রূপকথায় দেখি, বিমাতা কর্তৃক মাতৃহীনা সপত্নী-কন্যার উপর নির্যাতনের কাহিনি। কুটিল ঈর্ষার বিপক্ষে সরল সৌন্দর্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই গল্পের সঙ্গে তুলনীয় বাংলার রূপকথা শীত-বসন্তর সপত্নীপুত্রের লাঞ্ছনার আখ্যান।

রূপকথা মূলত শিশু-মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয় : 'বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিত প্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলাচঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনাপ্রবণ, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয়; এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরল, তরল কণ্ঠস্বর; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বইয়ের পাতায় ও সাহিত্য ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।' (রূপকথা)

শিশুমনের সারল্য ও বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলের কাছেই রূপকথার মৌলিক আবেদন। পরিণত মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ মন রূপকথার ঘটনাক্রম এবং তার কার্যকারণ-পরম্পরা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে পারে সত্য, কিন্তু যুগে যুগেই দেখা গেছে রূপকথার নান্দনিক আবেদনে সব বয়সের মানুষই সাড়া দিয়ে থাকে।

রূপকথার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য—Taboo বা সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ। ঠাকুরমার ঝুলিতে নীলকমল লালকমলকে খোক্ষসদের কাছে নীলকমলের নাম করতে বলে নিজের নাম বলতে নিষেধ করেছিল, আর সেই নিষেধ অমান্য করে লালকমল বিপদে পড়ল। *ঠাকুরদাদার ঝুলি*-র কাঞ্চনমালার কাহিনিতে ইন্দ্র মালঞ্চমালাকে একটি পাখা দিয়ে বললেন, এর উলটোদিক দিয়ে যেন বাতাস না করা হয়। এই নিষেধ না মানার ফলে গল্পের শেষদিকে বিপর্যয় ঘটল।

রূপকথার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য কিংবা সমাজের বাস্তব চিত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা বাতুলতা বলে গণ্য হবে ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসের নানা পর্যায়ে মানবজীবন, মানব-

মনস্তত্ত্ব ও মানুষের চিন্তাভাবনার সন্ধান পাওয়া যায় রূপকথাগুলির মধ্যে। রূপকথায় গোষ্ঠীজীবনের পরোক্ষ ছবি যেমন ধরা পড়ে, তেমনই ব্যক্তিমানুষের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। রূপকথার নায়কেরা নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের উপকার করে, বিপন্নকে উদ্ধার করে, পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে সমাজকে রক্ষা করে। বাস্তব জীবনে এ ধরনের মানুষ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বাস্তবে এরা দুর্লভ, তাই রূপকথার মাধ্যমে গোষ্ঠীমানুষ এমন আদর্শবান চরিত্রের কর্মমুখর জীবনকে ফুটিয়ে তোলে, যাকে সে সমাজে পেতে উৎসুক।

রূপকথার সঙ্গে উপকথার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন—পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনীই হল 'উপকথা'। ইংরেজিতে এদের বলে Animal Tale বা Fable। এ ধরনের কাহিনীর উদ্দেশ্য—কৌতুক সৃষ্টি ও নীতিপ্রচার। উপকথা যে অবিমিশ্র পশুপাখির চরিত্র নিয়েই রচিত হয় এমন নয়। অনেক কাহিনির মধ্যে দেখা যায়—পশুপাখির পাশে নরনারীর চরিত্রও স্থান পেয়ে তাদের নিতান্ত পরিচিত প্রতিবেশীর মতোই আচরণ করছে। রূপকথার নরনারীর চরিত্রের মতো এই চরিত্রগুলিও নির্বিশেষ—এদের কোনো নামধাম নেই, তেমন কোনো পরিচয়ও নেই। জোলা, তাঁতি, নাপিত, বামুন, বুড়ি—এদের আর কোনো পরিচয় জানা নেই। সাধারণত জোলা নির্বোধ, নাপিত ধূর্ত, বামুন দরিদ্র ও লোভী। কখনো কখনো এক বুড়ির কথাও শুনতে পাওয়া যায়, বয়স ও বুদ্ধির দোষে সে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়।

অন্য মতে, 'রূপকথা হল ছেলে-ভুলোনো পরীদের গল্প, ইচ্ছা হলে আজও তৈরি করা যায়। উপকথা লোকের মুখে মুখে যেন আপনা থেকে গড়ে ওঠে, তাদের মূল থাকে অতীতে। আমি বলি কি রূপকথা হল অন্যদের গল্প আর উপকথা আমাদের নিজেদের গল্প। আমাদের দেশের মাটি জল হাওয়া দিয়ে গড়া, আমাদের দুঃখে-বেদনায় বিধুর, আমাদের সুখে-আহ্লাদে ভরপুর। তার মধ্যে খানিকটা দেশের প্রাচীন ইতিহাস, খানিকটা লোকের মুখে শোনা কিংবদন্তী আর খানিকটা মন-গড়া। কেউ লিখে রাখে নি, সব মুখে মুখে বলা, যার যেমন খুশি রঙ চড়ানো, তাই সত্য আর কল্পনার মধ্যিখানের মিহি পরদা খসে পড়েছে। এখন আর কিছু আলাদা করে চিনবার জো নেই, তবু আমাদেরি গল্প, আমাদের প্রাণের ইতিহাস, ইচ্ছার কিংবদন্তী।'

[লীলা মজুমদার : রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত *ফোক টেল্‌স অব বেঙ্গল*-এর বাংলা অনুবাদ *বাংলার উপকথা*-র 'অনুবাদকের নিবেদন']

সুকুমার সেনের অনুমান 'অপরূপ কথা' শব্দটি থেকেই অপভ্রষ্ট হয়ে 'রূপকথা' শব্দের জন্ম। আর এই 'অপরূপ' শব্দের উৎস 'অপূর্ব'। অন্যদিকে 'উপকথা' বলতে তিনি বোঝেন 'ছোট সাইজের গল্প, অথবা কোন গল্পের মোড়কের মধ্যে ভরে-দেওয়া তার থেকে ছোট বা অবান্তর গল্প (অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে বলে boxed-in tale)'। তিনি আরও বলেছেন, 'উপকথার বিষয় মনোরঞ্জক বিচিত্র ঘটনা। তাহাতে ভূত প্রেত দেব দানব থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণত পুরাণ কাহিনীকে উপকথা বলে না।'

(ভূমিকা, *বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা-চর্চা*, মলয় বসু, ১৯৮০)

'উপকথা' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় দৌলত কাজির *সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী* গ্রন্থে। সেখানে সতী ময়নার হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য মালিনী তাকে উপকথা শোনাবার কথা ভেবেছে (উপকথা নানা বর্ণে ভোলাই কহিমু কর্মে / হৃদে যেন জাগে পঞ্চবাণ।।)। এছাড়া উনিশ শতকে কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় 'উপকথা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যদিকে 'রূপকথা' শব্দের প্রথম ব্যবহার সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই করেন তাঁর *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে। সেখানে ব্রহ্ম ঠাকুরাণী বলছে—'যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল, রূপকথা বল! ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?' তবে 'উপকথা'র পরিবর্তে 'রূপকথা' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-এর *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৩১৪ / ভাদ্র) প্রকাশের পর থেকে।

আধুনিক বিশ্বে উনিশ শতকের প্রথমে লোকসাহিত্যের লিখিত রূপের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় রূপকথার মাধ্যমে। জার্মান ভ্রাতৃদ্বয় জেকব লুড্‌উইগ কার্ল গ্রিম এবং উইল্-হেল্‌ম কার্ল গ্রিম—এঁদের রূপকথা-সংকলন থেকেই আধুনিক কালে লোকসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। উনিশ শতকের সূচনাপর্বে য়ুরোপের নানা জায়গা থেকে তাঁরা রূপকথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। রূপকথার ক্ষেত্রে আর একজনের নাম অবিস্মরণীয়—হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন (১৮০৫-১৮৭৫)। তাঁর রূপকথা-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৩৮ ও ১৮৪৫ খ্রিঃ। আর তাঁর শেষ রূপকথাগুলি প্রকাশ পায় ১৮৭২ খ্রিঃ। অ্যাণ্ডারসনের রূপকথাগুলি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি—পুরনো গল্পের সংগ্রহ নয়। বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রথম উল্লেখযোগ্য সংকলনটি ইংরেজি ভাষায় লেখা—রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র *ফোক টেল্‌স অব বেঙ্গল* (১৮৮৩)। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাংলা রূপকথা-সংকলন অবশ্যই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-এর *ঠাকুরমার ঝুলি* (১৯০৭) ও *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮)। মনে পড়বে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *ক্ষীরের পুতুল*-এর কথাও। অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা, নালক বা রাজকাহিনী-তেও রূপকথার সৌন্দর্যময় আবেশ চিত্ররূপায়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সোনার তরী* ও *শিশু*-র অনেকগুলি কবিতায়, *গল্পগুচ্ছ* ও লিপিকার কোনো কোনো রচনায় রূপকথার একটি ব্যক্তিগত ভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়।

রেনেশাঁস

সুকান্ত চৌধুরী

ফরাসি ও ইংরাজি Renaissance; ইতালীয় Rinascita, Rinascimento। আক্ষরিক অর্থে 'পুনর্জন্ম'। জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত এড়াতে বাংলায় 'পুনর্জাগরণ' বা 'নবজাগরণ' বলা সঙ্গত ও প্রচলিত।

বিদ্যা-শিল্প-সংস্কৃতির একাধিক স্মরণীয় বিকাশপর্বকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে 'রেনেশাঁস' বলা হয়ে থাকে : যেমন, রোম সাম্রাজ্যের পতনজনিত সাংস্কৃতিক মন্দার পর শার্লামেন (Charlemagne)-এর শাসনকালে সূচিত Carolingian Renaissance; পূর্ব ইউরোপে ১০ম শতকের Macedonian Renaissance ও ১৪শ শতকের Palaeologue Renaissance; বা ১২শ শতকে পশ্চিম ইউরোপের Twelfth Century Renaissance। এই রীতি অনুসরণ করে অন্যান্য দেশ ও সমাজে কোনো স্মরণীয় বিকাশের যুগকেও 'রেনেশাঁস' আখ্যা দেওয়া হয়—যেমন ১৯শ শতকে বাংলার নবজাগরণ বা Bengal Renaissance, কিংবা ১৯২০-র দশকে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যের Harlem Renaissance।

তবে 'রেনেশাঁস' বলতে প্রথম ও প্রধানরূপে বোঝায় পশ্চিম ইউরোপে সমাজ, চিন্তা, বিদ্যাচর্চা ও শিল্প-সাহিত্যে যে রূপান্তর ঘটেছিল ১৪শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৭শ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। এই 'আদি আধুনিক' (Early Modern) যুগের লক্ষণগুলিই রেনেশাঁসের সংজ্ঞাবাচক লক্ষণ বলে গণ্য করতে হয়।

রেনেশাঁসের মানুষ নিজেরাই নিজেদের যুগের নামকরণ করেছে; এবং নামটির ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় আগের যুগের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসকে একটা ছকে ফেলে দিয়েছে। যে-নবজন্ম বা নবজাগরণের কথা বলা হচ্ছে, তা হল পুরাকালের গ্রিক ও রোমক সভ্যতার ধারা। সেই ধারা যেন প্রায় হাজার বছর বিস্মৃতির পর পুনরুজ্জীবিত হল; অন্তবর্তী সময়টা যেন ছিল বন্ধ্যা—বৈশিষ্ট্যহীন 'মধ্যযুগ' মাত্র।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন গ্রিক ও রোমের বহুমুখী সভ্যতা আদতে একত্রিত করে একটি সংহত 'পুরাকাল' (antiquity) বা 'ধ্রুপদী যুগ' (classical age) হিসাবে দেখা যায় না, যদিও প্রাচীন রোমকরা সজ্ঞানে গ্রিকদের চিন্তা, শিল্প ও সাহিত্যের নানা উপাদান আপনার করে নিয়েছিল। আরও বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় মধ্যযুগের সভ্যতা ছিল পরম সমৃদ্ধ ও গতিশীল। মধ্যযুগ ও রেনেশাঁসের মধ্যে স্পষ্ট রেখা টানা যে বাস্তবে অসম্ভব, তা

ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন। যদিও গ্রিক চর্চায় পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগে ভাঁটা পড়েছিল, লাতিন চর্চা ছিল সর্বব্যাপী, এবং অনেক প্রাচীন লাতিন লেখক ছিলেন বহুপঠিত ও সমাদৃত।

তবু স্বীকার করতেই হয়, রেনেশাঁসে গ্রিক চর্চার পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে লাতিন চর্চাও নূতন মাত্রা লাভ করল; আর সবচেয়ে বড় কথা, গ্রিক-রোমক সভ্যতাকে বর্তমানের উপযুক্ত একটি সুসংহত আদর্শ হিসাবে দেখা হল। 'নবজন্ম' বা 'নবজাগরণ' আখ্যাটির মধ্যে অতএব নিহিত আছে একটি দ্বিত্ব : যা প্রাচীন তাই নতুন, আধুনিক, সমসাময়িক। ইতালীয় শিল্পীজীবনীকার জ্যোর্জ্যো ভাসারি (Giorgio Vasari) এই ধারাকে দেখলেন 'পুরাতন' (vecchio) ত্যাগ করে 'প্রাচীন' (antica)-এ ফিরে যাওয়া হিসাবে। নিজের দেশকালের বাইরে কোনো আদর্শকে আত্মস্থ করে, নিজের সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনকে সেই ধারার সঙ্গে একাত্ম করাই রেনেশাঁস সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক অবস্থানের ভিত্তিতে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের আরো কিছু লক্ষণ নির্দিষ্ট করা যায়। এই যুগে একটি খ্রিষ্টীয় সভ্যতা তার সাধনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে এক প্রাক্-খ্রিষ্টীয় নিদর্শনকে। এই দুই আদর্শের সমন্বয়সাধন হল খ্রিষ্টীয় মানবিকচর্চা (Christian humanism)-র প্রধান কর্মসূচি। একই সময়ে প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিপ্লব (Reformation) ঘটায় এই কর্মসূচি যা কখনো সরল পথে অগ্রসর হতে পারেনি; ধর্মবিপ্লবের সঙ্গে গ্রিক-রোমক ধারা ও তার চর্চার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র। তবু—প্রচলিত উচ্ছ্বাস ও সরলীকরণ পরিহার করেও বলা চলে—এই প্রাচীন সভ্যতার চর্চার এক অবধারিত ফল হল ধর্মীয় ও দৈবকেন্দ্রিক মানসিকতার বদলে মানবিক ও বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতার দিকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। তার ফলপ্রাপ্তি কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনেই নয়, মানবিকতা ও আত্মবোধের নতুন উন্মেষে। শেকসপিয়রের নাটকে এই বিকাশ পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এই ধারার বেগেই মানবিকচর্চা বা humanism-এর গতি নিছক ভাষা ও পাঠচর্চার গণ্ডি অতিক্রম করে একটি মানবধর্মী নৈতিক চেতনার সূত্রপাত করেছে।

এই চেতনার প্রকাশ হিসাবে শৈল্পিক বা নান্দনিক ক্রিয়ায় রেনেশাঁসে বিশেষ সম্মান আরোপ করা হয়েছে। কারুশিল্প (যা বস্তু বা পদার্থনির্ভর), সাহিত্য (যা অনির্দিষ্ট, অস্থাবর ভাষানির্ভর) এবং নাটক (যার উপজীব্য অলীক কল্পনা ও চোখের ফাঁকি) এগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে ইতিহাস-দর্শনের সমপর্যায়ে। মার্সিলিও ফিচিনো (Marsilio Ficino)-র 'প্লেটোনীয় ধর্মতত্ত্ব' (Theologia Platonica)-র একটি অনবদ্য অংশে এই সমীকরণ দেখা যায়, যেমন যায় লেওনার্দো দা ভিঞ্চির 'তুলনা' (Il Paragone)-তে চিত্রশিল্পকে দার্শনিক উপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরায়। কাব্যকে লেওনার্দো তুলনায় খাটো করে দেখেছেন, কিন্তু সচরাচর কাব্যকেই উচ্চস্থান দেওয়া হত।

রেনেশাঁসকে তাই সঙ্গতভাবেই চিহ্নিত করা যায় আশা ও আত্মপ্রত্যয়ের যুগ হিসাবে। এই প্রত্যয়ের সুর স্পষ্ট ধরা পড়ে যেমন পিকো দেল্লা মিরান্দোলা (Pico

Della Mirandola)-র *মানবমাহাত্ম্য* বিষয়ক ভাষণ-এ তেমনই বালদাস্‌সারে কাসতিলিওনা (Baldassare Castiglione)-র *সভাসদ্-বিষয়ক পুস্তক* বা ভাসারির লেখা রেনেশাঁস শিল্পীদের জীবনীর ছত্রে-ছত্রে। ইংরেজিতে এই সুরের সরল বলিষ্ঠ অনুরণন ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকের কিছু সংলাপে।

কিন্তু তারই পাশাপাশি ধরা পড়ে হতাশা ও বিভ্রান্তির রেশ—যেমন ফুটে ওঠে জার্মান শিল্পী অলব্রেখ্‌ট্ ডুয়েরর (Albrecht Durer)-এর বিখ্যাত খোদাইচিত্র 'বিষাদ ২' (Melancolia-II)-তে, বা লেওনার্দো ও মিকেলাঞ্জেলোর বহু রহস্যময়, আর্ত এমনকী অসম্পূর্ণ ছবি ও মূর্তিতে। রেনেশাঁসের শেষ অনিশ্চিত, বিভ্রান্ত প্রত্যয়হারা পর্যায়ে—যাকে Mannerism আখ্যা দেওয়া হয়—এই প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠেছে। এরও মূলে রয়েছে রেনেশাঁস-মানসে পরকে আত্মস্থ করার, বহুকে নিজের চেতনার একত্র করার দুরূহ প্রক্রিয়ালব্ধ ক্লান্তি ও দ্বিধা।

রোমান্টিসিজম

জয়িতা বাগচী

কাকে বলে রোমান্টিকতা তা নিয়ে মতবাদের সীমা নেই। তাই রোমান্টিকতাবাদের কোনো আঁটোসাটো সংজ্ঞা অসম্ভব। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি ইউরোপের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শিল্প-সাহিত্যে একধরনের প্রতিক্রিয়া হল রোমান্টিকতাবাদ। রোমান্টিকতাবাদ সব দেশে একসঙ্গে কিংবা কোনো একধরনের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি লক্ষণীয় সূত্র ছিল : ক. ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার বদলে 'বাজারের' আবির্ভাব অতএব লেখক / লেখিকা পাঠক / পাঠিকার মধ্যে নতুন সম্পর্কস্থাপন, খ. 'জনসাধারণ' নামক এক নতুন ধারণার প্রতিষ্ঠা, গ. শিল্পকে এক বিশেষরকমের উৎপাদন হিসেবে চিহ্নিত করা, ঘ. কল্পনার জগৎ হল 'উচ্চতর বাস্তব'—এ নিয়ে শিল্পের নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি, ঙ. শিল্পীকে স্বতন্ত্র ও অভিনব প্রতিভা ভাবার নিয়ম।

ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তির যুগের বিপুল কর্মকাণ্ড চলাকালীন জার্মানিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশকে শুরু হয় 'স্টুর্ম উন্ড দ্রাং' / ঝড় ও চাপ (এটি ক্লিংগারের ১৭৭৬ সালের নাটকের উপশিরোনাম) আন্দোলন, ঘোষিত হয় কঠোর নিয়ম ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে জেহাদ। গ্যেটের উপন্যাস *তরুণ ওয়ের্থরের দুঃখ* (১৭৭৪) ইউরোপে মুক্তির আধিক্যের বদলে কল্পনার ভাবালুতাকে প্রাধান্য দিয়ে এই আন্দোলনের প্রথম পর্ব প্রতিষ্ঠা করে। তৈরি হল রোমান্টিক 'শিল্পী'র ধারণা, যেখানে 'শিল্পী' হল নির্বাচিত প্রাকৃতিক দৈবিক শক্তি এবং শিল্পকর্ম স্বতন্ত্র ও অভিনব। প্রাপ্তবয়স্কদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি-র বিপরীতে প্রকৃতি, শিশু, 'অসভ্যতা' আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হল না। না পাওয়ার বেদনায় সার্থক হল রোমান্টিক প্রেম।

এরপরে 'ক্লাসিক' পর্বে গ্যেটে ছাড়াও লিখছেন হোল্ডারলিন, শিলার প্রমুখ। নোভালিস, টিক্, শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, একেরনাম-রা ১৮০০ নাগাদ শুরু করেন শেষ 'রোমান্টিক' পর্ব। জার্মানিতে রোমান্টিক আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কয়েক দশক আগে থেকেই ক্লপস্টক, উইলান্ড, হার্ডার বা ফ্রান্সের রুশো, দিদেরো প্রমুখ। তাঁরাই প্রথম এন্‌লাইটেনমেন্টের একরৈখিক প্রগতি সম্পর্কে সন্দেহ ও প্রশ্ন করা শুরু করেন। জার্মানিতে দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য—শিল্পকলার সমস্তক্ষেত্রেই এ-আন্দোলনের বিশাল প্রভাব পড়েছিল।

ইংলন্ডে কিন্তু রোমান্টিক আন্দোলন প্রধানত সাহিত্য এবং বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৯৮-তে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের *লিরিকাল ব্যালাড্‌স* রোমান্টিক আন্দোলনের উর্বরপর্বের উদ্বোধন করে। প্রতিভাবান ইংরেজ কবি ব্লেক অবশ্য অনেক আগে থেকেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে 'শিল্পী-পরিত্রাতা'-কে নতুন যুগের আহ্বায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলন খানিকটা স্থানীয় রীতি অনুসারে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া শিল্প-বিপ্লবের ফলে শহরের দূষিত পরিবেশের সৃষ্টি হলে তার বিরুদ্ধে প্রকৃতি প্রেমকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠা করা রোমান্টিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে উঠেছিল। ধর্মের প্রতাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খ্রিষ্টপূর্বযুগে অথবা 'অজানা' আফ্রিকা / প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে মাহাত্ম্য আরোপ করাও ছিল রোমান্টিক তত্ত্বের অংশ বিশেষ। তার উপর ইংল্যান্ডে পড়েছিল ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবও। রোমান্টিক আন্দোলনের প্রথমপর্বে (১৭৯৮-১৮০৬) ওয়ার্ডসওয়ার্থের নেতৃত্বে কোলরিজ, ক্র্যাব, ক্লেয়ার প্রমুখ লেখা শুরু করেন। ১৮০৫-১৮১০কে বলা যায় স্কট ও ক্যাম্বেল, মুর, সাদে প্রমুখের সময় এবং শেষপর্ব (১৮১৮-১৮২২) হল শেলি, কিটস্, বায়রন প্রমুখের যুগ। (এ যুগ-গোষ্ঠী বিভাগ নিয়ে মতান্তরের সীমা নেই)। মোট কথা বিখ্যাত ইংরেজ কবিরা যখন প্রায় সকলেই মৃত, তখনই প্রতিবেশী রাজ্য ফ্রান্সে রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পড়ল।

১৮২০-তে লামারতিন-এর *মেদিতাসয় প্রোএতিক* প্রকাশিত হয়। বলা যায় এ বই-ই রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা করে। ফ্রান্সে সাহিত্যকে নব্য ধ্রুপদী নিয়মের কবল থেকে মুক্ত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। জার্মান কবিদের সঙ্গে মিশে মাদাম দ্য স্তাইল লেখেন *দ্য ল আলেমন্* (১৮১০)। শুধু তাই-ই নয়, ওঁর সালোঁয় আড্ডার নির্দিষ্ট কার্যাবলিতেই ছিল তরুণ কবিদের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা। ফ্রান্সে সাধারণ পাঠক / পাঠিকারাও নব্য ধ্রুপদীরুচিতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে লামারতিন ভিনি, শাতোব্রিয়া দ্য মুসে প্রমুখের পক্ষে প্রতিভার জোরে জায়গা করে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। ১৮৩০-এ ভিক্টর হুগো-র *হেননানি* নাটককে ঘিরে যে যুদ্ধ হল তাতে অবশেষে রোমান্টিকযুগ স্বীকৃতি পেল। প্রখ্যাত ফরাসি রোমান্টিক কবি বোদ্‌লেয়ারের *লে ফ্লর দু মাল* (১৮৫৭) রোমান্টিক ধারাকে অবলম্বন করেও সম্পূর্ণ নতুন এক পথের দিশা দিলে জন্ম হয় প্রতীকীবাদের। একঅর্থে রোমান্টিকতার মধ্যেই ছিল আধুনিকতার বীজ। স্তঁদাল লিখেছেন সব আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক, অর্থাৎ সব সাহিত্যিকই তাঁর নিজের যুগে রোমান্টিক (এ অবশ্য নেহাতই অত্যুক্তি)। ফ্রান্সেও রোমান্টিক আন্দোলন কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

রোমান্টিকতাবাদ প্রধানত ত্রিদেশীয় হলেও ইতালিতে লিওপার্দি (১৭৯৮-১৮৩৭), মানজোনি (১৭৮৫-১৮৭৩) ও ফোসকোলো (১৭৭৮-১৮২৭); পোল্যান্ডে মিকিউইক্স (১৭৯৮-১৮৮৫) ও স্লোওয়াকি (১৮০৯-৪৯); স্পেনে এস্ প্রোনসেডা (১৮০৮-৪২); রুশদেশের পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭) ও লেরমেনতভ (১৮১৪-৪১); যুক্তরাষ্ট্রে মেল্‌ভিল (১৮১৯-৯১) প্রমুখও এর অংশীদার ছিলেন।

রোমান্টিকতাবাদের যে অজস্র ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব তার একটা কারণ হল নতুন চিন্তাকে অধিষ্ঠিত করবার জন্য শিল্প, শিল্পী ও শিল্পের আধুনিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একাধিক ঘোষণাপত্র লেখার প্রচলন। ১৯৪৮ সালে লুকাচ ১১, ৩৯৬টি রোমান্টিকতাবাদের সংজ্ঞা পেয়েছিলেন। অনেক সংজ্ঞাই সেখানে বাদ পড়েছিল নিশ্চয়। অসংখ্য অর্থ হলেও রোমান্টিকতাবাদ মূলত ইউরো-কেন্দ্রিক। ইউরোপের খুব স্পর্শগ্রাহ্য পরিবেশ থেকে একটি বিশেষযুগে তার জন্ম এবং বিবর্তন।

রোম্যান্স

অর্জুনদেব সেনশর্মা

রোম্যান্স যেহেতু ইচ্ছাপূরণের সাহিত্য সেইজন্যই সে খুব উঁচুদরের নয়—এমন একটা ধারণা সাহিত্যের ইতিহাসে বদ্ধমূল। দিবাস্বপ্নের কল্পনাপূরণ রোম্যান্সের আবহাওয়ায় এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে রিচার্ড হগার্ট তাঁর একটি বইতে এমনই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের গোড়ায় রোম্যান্সের প্রয়োজন শুধু সদ্যসাক্ষর শ্রমিকশ্রেণীর মদ্যপানের সঙ্গী হিসেবে। *দি বুক অফ দি ডাচেস্* গ্রন্থের কথামুখে চসার রোম্যান্সকে আহ্বান করেছিলেন রাত্রিকে সরিয়ে দিতে। সত্যিই সেই রাত্রি ছিল শ্রম ও দৈনিক দৈন্যের রাত্রি। মানুষ ও সপ্রাণ প্রকৃতির পেগ্যান সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ইংরেজের রোম্যান্স থেকে উনিশ শতক এমনকি বিংশ শতক পর্যন্ত লিখিত সেক্যুলার রোমান্সেরও এই রাত্রিকে দিন করার কাজে ভাঁটা পড়েনি। যদিও সব যুগেই তার চরিত্র কিছু কিছু বদলেছে। প্রথমযুগের রোম্যান্সের চরিত্র মূলত অভিজাত রাজপুরুষ-কাহিনীবৃত্ত অতীত আশ্রয়ী বা বাস্তব থেকে বহুদূরের কোনো সামাজিক জীবনকেন্দ্রিক—কখনো সেই জীবন বহু দূরবর্তী আদিম স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতায় ভরপুর। রোম্যান্সের নায়ক চিরলাবণ্যময়—বয়স সাধারণত বাড়ে না তার—এক একটি অভিযানের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে—এ্যাগন্ এ্যাগন্ আর অ্যাগন্ পার হয়ে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব—প্যাথোস্ বা মৃত্যুযন্ত্রণা অতিক্রম করে এ্যানাগ্নরিসিস বা উদ্বোধন এই-ই প্রায় সব নায়কের ভবিতব্য। এমনকি সৌরমিথের প্রত্নপ্রতিমা দিয়ে এর ব্যাখ্যাও করেছেন কোনো প্রাজ্ঞবোদ্ধা। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চিরচেনা চক্রে তাই যেন অধিবাসিত সেন্ট জর্জ বা পার্সিয়ুস বা শার্লামেন কিংবা রাজা আর্থার বা খ্রিষ্ট। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপে রোম্যান্সকে বিন্যস্ত করলে বাংলা মঙ্গল কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে রোম্যান্সের একটি বীজ—কেবল বিদ্যাসুন্দর, লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মৃগাবতীকথা, চন্দ্রমুখী ছাড়াও। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপের লক্ষণ মিলিয়ে কেবল অতিপ্রাকৃত প্রণয় ও বীর গাথাই শুধু রোম্যান্স নয়—পশ্চিমে অনেক সন্তজীবনীও রোম্যান্স—বাংলাতেও অনেক নবীবংশ ও জঙ্গনামা রোম্যান্সের বৃহত্তর বর্গ পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। রোম্যান্স ও তার নায়কের ইতিহাস তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধির দিকে এক যাত্রীর যাত্রার ইতিহাস। তার স্মৃতিতে আছে মিথের জগতের অমরা বা স্বর্গ—তার অবস্থান রয়েছে অভিজ্ঞতায়—সেখান থেকে সে পালাতে চায় স্বপ্নকল্পনার প্রোজেকশানে। অভিজ্ঞতা ও কামনার এই নিরুচ্চার প্রতিতুলনাই

রোম্যান্স—পুবে-পশ্চিমে। কামনার এই মায়া ছড়ানো তাতে আছে বলেই দিয়েগোর 'But. does anyone doubt such histories are false' এই প্রশ্নের উত্তরে কোহোতে 'I doubt it' বলেও শেষত বলে—'Let the matter rest there'—তার পরে হোক উপন্যাসের সূত্রপাত। রোম্যান্সের নায়ক তার যাত্রা বা অভিযানের শেষে লাভ করে—হয় কোনো গুপ্ত ঐশ্বর্য—কখনো বা অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা। সেইজন্য প্রেম ও অভিযানই রোম্যান্সের কেন্দ্রিক থিম—কখনো একত্রে কখনো একত্বে। তাই রোম্যান্সের রাজা রানি সাধারণ পাঠকের আধিপত্য বাসনার আশ্রয়; সাধারণ মানুষের যে জীবন দৈনন্দিনের অপ্রেমে বিক্ষুব্ধ, রোম্যান্সের রাজসভাশ্রিত প্রেম—সেই জীবনকেই প্রদীপ্ত দেহ উৎসবে ভরিয়ে তোলে; যে জীবনযুদ্ধে হেরে ক্লান্ত—সেই জীবনকেই দুর্গম অভিযানের বিজয় এনে দেয়।

রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে পাঠকের এই আত্মবিসর্জন অবাধ করার লক্ষ্যেই রোম্যান্সের জগতে দৈনন্দিনের খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকে নিখুঁত। ইচ্ছাপূরণের স্বার্থেই রোম্যান্সের ভাষা কাব্যস্পন্দে ভুলিয়ে দেয় বাস্তব জগৎকে—ইংল্যাণ্ডে স্পেন্সার পর্যন্ত তো রোম্যান্স পদ্যেই সুপ্রতুল ছিল—ক্রমশ সদ্যোত্থিত উপন্যাসের গদ্যভাষা তাকে প্রভাবিত করলেও—দুর্গেশনন্দিনীর গদ্যে কবিতার আস্বাদন কে না পায়? রোম্যান্সের মধ্যে কবিতার পদসঞ্চার তাই আবশ্যিক। এই কবিতার জগতে পাঠক রোম্যান্স স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে তার অসম্ভবের নিয়মের রাজত্বে আত্মসমর্পণ করে। তখন ক্রমশ খুলে যেতে থাকে গূঢ় স্বপ্নের জগৎ—ব্যক্তিগত ও যূথগত। আর সেই স্বপ্নপূরণের মায়াবসরে লেখক চাপিয়ে দিতে থাকেন পাঠকের অজ্ঞাতেই তার নিজের শ্রেণিগত মূল্যবোধ—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়—জাদুর দোহাইয়ে। এইখানেই উভয়েই স্বভাবে অতিপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও মিথের দেবনায়ক আর রোম্যান্সের রাজনায়ক মূলে পৃথক। দেবতার ইচ্ছাই উপায়—আর রোম্যান্সের নায়কের আছে জাদুদণ্ড, চিচিং ফাঁকের মন্ত্র আর বেঙ্গমা বেঙ্গমী পরিহরির আশীর্বাদ। আর এই জাদুর আকাঙ্ক্ষাতেই রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে সাধারণ মানুষ পায় আত্মপ্রক্ষেপের সুযোগ। এই জাদুকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই রোম্যান্স সাধারণত মধ্যযুগে সাংগীতিক মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গকে গেয়েই শোনানো হত। এই গানেই ব্যক্তিগত ইতিহাসও হয়ে উঠত সর্বসাধারণের আর সাধারণ মানুষ দেখত—যুদ্ধ অভিযানের অবসরে সমাজ, সংস্কার, দেবতা মিথ্যে করে—দুটি হৃদয় মুখোমুখি হয়ে বসেছে, এমনটি যে ইচ্ছে ছিল তারও।

তবে রোম্যান্সে সাধারণ মানুষের এইভাবে ইচ্ছাপূরণ হলেও রোম্যান্স কিন্তু সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির কণ্ঠস্বরকেই প্রকাশ করে, তারই ইচ্ছা রূপ নেয় নায়ক নায়িকার কার্যক্রমে। ঐ প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির বিরোধী স্বার্থ রূপ নেয় প্রতিনায়কের প্রতিফলিত জীবনচিত্রে সেইজন্যই রোম্যান্স যদিও দৈহিক প্রেমের সার্থকতাকে দেখাতে চায়, তবুও অতিক্রম করে না সতিত্বের সংজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার মানদণ্ড। রোম্যান্সের এই শ্রেণিস্বার্থ-সংরক্ষণ যেমন সত্য মধ্যযুগের রোম্যান্সের ক্ষেত্রে—তেমনই সত্য রেনেসাঁসের সমকালীন অভিজাত রোম্যান্সের ক্ষেত্রে অথবা অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া

রোম্যান্স

অর্জুনদেব সেনশর্মা

রোম্যান্স যেহেতু ইচ্ছাপূরণের সাহিত্য সেইজন্যই সে খুব উঁচুদরের নয়—এমন একটা ধারণা সাহিত্যের ইতিহাসে বদ্ধমূল। দিবাস্বপ্নের কল্পনাপূরণ রোম্যান্সের আবহাওয়ায় এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে রিচার্ড হগার্ট তাঁর একটি বইতে এমনই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের গোড়ায় রোম্যান্সের প্রয়োজন শুধু সদ্যসাক্ষর শ্রমিকশ্রেণীর মদ্যপানের সঙ্গী হিসেবে। *দি বুক অফ দি ডাচেস্* গ্রন্থের কথামুখে চসার রোম্যান্সকে আহ্বান করেছিলেন রাত্রিকে সরিয়ে দিতে। সত্যিই সেই রাত্রি ছিল শ্রম ও দৈনিক দৈন্যের রাত্রি। মানুষ ও সপ্রাণ প্রকৃতির পেগ্যান সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ইংরেজের রোম্যান্স থেকে উনিশ শতক এমনকি বিংশ শতক পর্যন্ত লিখিত সেক্যুলার রোমান্সেরও এই রাত্রিকে দিন করার কাজে ভাঁটা পড়েনি। যদিও সব যুগেই তার চরিত্র কিছু কিছু বদলেছে। প্রথমযুগের রোম্যান্সের চরিত্র মূলত অভিজাত রাজপুরুষ-কাহিনীবৃত্ত অতীত আশ্রয়ী বা বাস্তব থেকে বহুদূরের কোনো সামাজিক জীবনকেন্দ্রিক—কখনো সেই জীবন বহু দূরবর্তী আদিম স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতায় ভরপুর। রোম্যান্সের নায়ক চিরলাবণ্যময়—বয়স সাধারণত বাড়ে না তার—এক একটি অভিযানের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে—এ্যাগন্ এ্যাগন্ আর অ্যাগন্ পার হয়ে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব—প্যাথোস্ বা মৃত্যুযন্ত্রণা অতিক্রম করে এ্যানাগ্নরিসিস বা উদ্বোধন এই-ই প্রায় সব নায়কের ভবিতব্য। এমনকি সৌরমিথের প্রত্নপ্রতিমা দিয়ে এর ব্যাখ্যাও করেছেন কোনো প্রাজ্ঞবোদ্ধা। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চিরচেনা চক্রে তাই যেন অধিবাসিত সেন্ট জর্জ বা পার্সিয়ুস বা শার্লামেন কিংবা রাজা আর্থার বা খ্রিষ্ট। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপে রোম্যান্সকে বিন্যস্ত করলে বাংলা মঙ্গল কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে রোম্যান্সের একটি বীজ—কেবল বিদ্যাসুন্দর, নোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মৃগাবতীকথা, চন্দ্রমুখী ছাড়াও। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপের লক্ষণ মিলিয়ে কেবল অতিপ্রাকৃত প্রণয় ও বীর গাথাই শুধু রোম্যান্স নয়—পশ্চিমে অনেক সন্তজীবনীও রোম্যান্স—বাংলাতেও অনেক নবীবংশ ও জঙ্গনামা রোম্যান্সের বৃহত্তর বর্গ পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। রোম্যান্স ও তার নায়কের ইতিহাস তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধির দিকে এক যাত্রীর যাত্রার ইতিহাস। তার স্মৃতিতে আছে মিথের জগতের অমরা বা স্বর্গ—তার অবস্থান রয়েছে অভিজ্ঞতায়—সেখান থেকে সে পালাতে চায় স্বপ্নকল্পনার প্রোজেকশানে। অভিজ্ঞতা ও কামনার এই নিরুচ্চার প্রতিতুলনাই

রোম্যান্স—পুবে-পশ্চিমে। কামনার এই মায়া ছড়ানো তাতে আছে বলেই দিয়েগোর 'But, does anyone doubt such histories are false' এই প্রশ্নের উত্তরে কোহোতে 'I doubt it' বলেও শেষত বলে—'Let the matter rest there'—তার পরে হোক উপন্যাসের সূত্রপাত। রোম্যান্সের নায়ক তার যাত্রা বা অভিযানের শেষে লাভ করে—হয় কোনো গুপ্ত ঐশ্বর্য—কখনো বা অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা। সেইজন্য প্রেম ও অভিযানই রোম্যান্সের কেন্দ্রিক থিম—কখনো একত্রে কখনো একত্বে। তাই রোম্যান্সের রাজা রানি সাধারণ পাঠকের আধিপত্য বাসনার আশ্রয়; সাধারণ মানুষের যে জীবন দৈনন্দিনের অপ্রেমে বিক্ষুব্ধ, রোম্যান্সের রাজসভাশ্রিত প্রেম—সেই জীবনকেই প্রদীপ্ত দেহ উৎসবে ভরিয়ে তোলে; যে জীবনযুদ্ধে হেরে ক্লান্ত—সেই জীবনকেই দুর্গম অভিযানের বিজয় এনে দেয়।

রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে পাঠকের এই আত্মবিসর্জন অবাধ করার লক্ষ্যেই রোম্যান্সের জগতে দৈনন্দিনের খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকে নিখুঁত। ইচ্ছাপূরণের স্বার্থেই রোম্যান্সের ভাষা কাব্যস্পন্দে ভুলিয়ে দেয় বাস্তব জগৎকে—ইংল্যাণ্ডে স্পেন্সার পর্যন্ত তো রোম্যান্স পদ্যেই সুপ্রতুল ছিল—ক্রমশ সদ্যোত্থিত উপন্যাসের গদ্যভাষা তাকে প্রভাবিত করলেও—দুর্গেশনন্দিনীর গদ্যে কবিতার আস্বাদন কে না পায়? রোম্যান্সের মধ্যে কবিতার পদসঞ্চার তাই আবশ্যিক। এই কবিতার জগতে পাঠক রোম্যান্স স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে তার অসম্ভবের নিয়মের রাজত্বে আত্মসমর্পণ করে। তখন ক্রমশ খুলে যেতে থাকে গূঢ় স্বপ্নের জগৎ—ব্যক্তিগত ও যূথগত। আর সেই স্বপ্নপূরণের মায়াবসরে লেখক চাপিয়ে দিতে থাকেন পাঠকের অজ্ঞাতেই তার নিজের শ্রেণিগত মূল্যবোধ—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়—জাদুর দোহাইয়ে। এইখানেই উভয়েই স্বভাবে অতিপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও মিথের দেবনায়ক আর রোম্যান্সের রাজনায়ক মূলে পৃথক। দেবতার ইচ্ছাই উপায়—আর রোম্যান্সের নায়কের আছে জাদুদণ্ড, চিচিং ফাঁকের মন্ত্র আর বেঙ্গমা বেঙ্গমী পরিহরির আশীর্বাদ। আর এই জাদুর আকাঙ্ক্ষাতেই রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে সাধারণ মানুষ পায় আত্মপ্রক্ষেপের সুযোগ। এই জাদুকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই রোম্যান্স সাধারণত মধ্যযুগে সাংগীতিক মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গকে গেয়েই শোনানো হত। এই গানেই ব্যক্তিগত ইতিহাসও হয়ে উঠত সর্বসাধারণের আর সাধারণ মানুষ দেখত—যুদ্ধ অভিযানের অবসরে সমাজ, সংস্কার, দেবতা মিথ্যে করে—দুটি হৃদয় মুখোমুখি হয়ে বসেছে, এমনটি যে ইচ্ছে ছিল তারও।

তবে রোম্যান্সে সাধারণ মানুষের এইভাবে ইচ্ছাপূরণ হলেও রোম্যান্স কিন্তু সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির কণ্ঠস্বরকেই প্রকাশ করে, তারই ইচ্ছা রূপ নেয় নায়ক নায়িকার কার্যক্রমে। ঐ প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির বিরোধী স্বার্থ রূপ নেয় প্রতিনায়কের প্রতিফলিত জীবনচিত্রে সেইজন্যই রোম্যান্স যদিও দৈহিক প্রেমের সার্থকতাকে দেখাতে চায়, তবুও অতিক্রম করে না সতিত্বের সংজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার মানদণ্ড। রোম্যান্সের এই শ্রেণিস্বার্থ-সংরক্ষণ যেমন সত্য মধ্যযুগের রোম্যান্সের ক্ষেত্রে—তেমনই সত্য রেনেসাঁসের সমকালীন অভিজাত রোম্যান্সের ক্ষেত্রে অথবা অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া

রোম্যান্স

অর্জুনদেব সেনশর্মা

রোম্যান্স যেহেতু ইচ্ছাপূরণের সাহিত্য সেইজন্যই সে খুব উঁচুদরের নয়—এমন একটা ধারণা সাহিত্যের ইতিহাসে বদ্ধমূল। দিবাস্বপ্নের কল্পনাপূরণ রোম্যান্সের আবহাওয়ায় এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে রিচার্ড হগার্ট তাঁর একটি বইতে এমনই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের গোড়ায় রোম্যান্সের প্রয়োজন শুধু সদ্যসাক্ষর শ্রমিকশ্রেণীর মদ্যপানের সঙ্গী হিসেবে। *দি বুক অফ দি ডাচেস্* গ্রন্থের কথামুখে চসার রোম্যান্সকে আহ্বান করেছিলেন রাত্রিকে সরিয়ে দিতে। সত্যিই সেই রাত্রি ছিল শ্রম ও দৈনিক দৈন্যের রাত্রি। মানুষ ও সপ্রাণ প্রকৃতির পেগ্যান সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ইংরেজের রোম্যান্স থেকে উনিশ শতক এমনকি বিংশ শতক পর্যন্ত লিখিত সেক্যুলার রোমান্সেরও এই রাত্রিকে দিন করার কাজে ভাঁটা পড়েনি। যদিও সব যুগেই তার চরিত্র কিছু কিছু বদলেছে। প্রথমযুগের রোম্যান্সের চরিত্র মূলত অভিজাত রাজপুরুষ-কাহিনীবৃত্ত অতীত আশ্রয়ী বা বাস্তব থেকে বহুদূরের কোনো সামাজিক জীবনকেন্দ্রিক—কখনো সেই জীবন বহু দূরবর্তী আদিম স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতায় ভরপুর। রোম্যান্সের নায়ক চিরলাবণ্যময়—বয়স সাধারণত বাড়ে না তার—এক একটি অভিযানের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে—এ্যাগন্ এ্যাগন্ আর অ্যাগন্ পার হয়ে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব—প্যাথোস্ বা মৃত্যুযন্ত্রণা অতিক্রম করে এ্যানাগ্নরিসিস বা উদ্বোধন এই-ই প্রায় সব নায়কের ভবিতব্য। এমনকি সৌরমিথের প্রত্নপ্রতিমা দিয়ে এর ব্যাখ্যাও করেছেন কোনো প্রাজ্ঞবোদ্ধা। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চিরচেনা চক্রে তাই যেন অধিবাসিত সেন্ট জর্জ বা পার্সিয়ুস বা শার্লামেন কিংবা রাজা আর্থার বা খ্রিষ্ট। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপে রোম্যান্সকে বিন্যস্ত করলে বাংলা মঙ্গল কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে রোম্যান্সের একটি বীজ—কেবল বিদ্যাসুন্দর, লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মৃগাবতীকথা, চন্দ্রমুখী ছাড়াও। এই পুনর্জন্মের আর্কিটাইপের লক্ষণ মিলিয়ে কেবল অতিপ্রাকৃত প্রণয় ও বীর গাথাই শুধু রোম্যান্স নয়—পশ্চিমে অনেক সন্তজীবনীও রোম্যান্স—বাংলাতেও অনেক নবীবংশ ও জঙ্গনামা রোম্যান্সের বৃহত্তর বর্গ পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। রোম্যান্স ও তার নায়কের ইতিহাস তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধির দিকে এক যাত্রীর যাত্রার ইতিহাস। তার স্মৃতিতে আছে মিথের জগতের অমরা বা স্বর্গ—তার অবস্থান রয়েছে অভিজ্ঞতায়—সেখান থেকে সে পালাতে চায় স্বপ্নকল্পনার প্রোজেকশানে। অভিজ্ঞতা ও কামনার এই নিরুচ্চার প্রতিতুলনাই

রোম্যান্স—পুবে-পশ্চিমে। কামনার এই মায়া ছড়ানো তাতে আছে বলেই দিয়েগোর 'But. does anyone doubt such histories are false' এই প্রশ্নের উত্তরে কোহোতে 'I doubt it' বলেও শেষত বলে—'Let the matter rest there'—তার পরে হোক উপন্যাসের সূত্রপাত। রোম্যান্সের নায়ক তার যাত্রা বা অভিযানের শেষে লাভ করে—হয় কোনো গুপ্ত ঐশ্বর্য—কখনো বা অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা। সেইজন্য প্রেম ও অভিযানই রোম্যান্সের কেন্দ্রিক থিম—কখনো একত্রে কখনো একত্বে। তাই রোম্যান্সের রাজা রানি সাধারণ পাঠকের আধিপত্য বাসনার আশ্রয়; সাধারণ মানুষের যে জীবন দৈনন্দিনের অপ্রেমে বিক্ষুব্ধ, রোম্যান্সের রাজসভাশ্রিত প্রেম—সেই জীবনকেই প্রদীপ্ত দেহ উৎসবে ভরিয়ে তোলে; যে জীবনযুদ্ধে হেরে ক্লান্ত—সেই জীবনকেই দুর্গম অভিযানের বিজয় এনে দেয়।

রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে পাঠকের এই আত্মবিসর্জন অবাধ করার লক্ষ্যেই রোম্যান্সের জগতে দৈনন্দিনের খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকে নিখুঁত। ইচ্ছাপূরণের স্বার্থেই রোম্যান্সের ভাষা কাব্যস্পন্দে ভুলিয়ে দেয় বাস্তব জগৎকে—ইংল্যাণ্ডে স্পেন্সার পর্যন্ত তো রোম্যান্স পদ্যেই সুপ্রতুল ছিল—ক্রমশ সদ্যোত্থিত উপন্যাসের গদ্যভাষা তাকে প্রভাবিত করলেও—দুর্গেশনন্দিনীর গদ্যে কবিতার আস্বাদন কে না পায়? রোম্যান্সের মধ্যে কবিতার পদসঞ্চার তাই আবশ্যিক। এই কবিতার জগতে পাঠক রোম্যান্স স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে তার অসম্ভবের নিয়মের রাজত্বে আত্মসমর্পণ করে। তখন ক্রমশ খুলে যেতে থাকে গূঢ় স্বপ্নের জগৎ—ব্যক্তিগত ও যূথগত। আর সেই স্বপ্নপূরণের মায়াবসরে লেখক চাপিয়ে দিতে থাকেন পাঠকের অজ্ঞাতেই তার নিজের শ্রেণিগত মূল্যবোধ—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়—জাদুর দোহাইয়ে। এইখানেই উভয়েই স্বভাবে অতিপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও মিথের দেবনায়ক আর রোম্যান্সের রাজনায়ক মূলে পৃথক। দেবতার ইচ্ছাই উপায়—আর রোম্যান্সের নায়কের আছে জাদুদণ্ড, চিচিং ফাঁকের মন্ত্র আর বেঙ্গমা বেঙ্গমী পরিহরির আশীর্বাদ। আর এই জাদুর আকাঙ্ক্ষাতেই রোম্যান্সের নায়কের মধ্যে সাধারণ মানুষ পায় আত্মপ্রক্ষেপের সুযোগ। এই জাদুকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই রোম্যান্স সাধারণত মধ্যযুগে সাংগীতিক মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গকে গেয়েই শোনানো হত। এই গানেই ব্যক্তিগত ইতিহাসও হয়ে উঠত সর্বসাধারণের আর সাধারণ মানুষ দেখত—যুদ্ধ অভিযানের অবসরে সমাজ, সংস্কার, দেবতা মিথ্যে করে—দুটি হৃদয় মুখোমুখি হয়ে বসেছে, এমনটি যে ইচ্ছে ছিল তারও।

তবে রোম্যান্সে সাধারণ মানুষের এইভাবে ইচ্ছাপূরণ হলেও রোম্যান্স কিন্তু সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির কণ্ঠস্বরকেই প্রকাশ করে, তারই ইচ্ছা রূপ নেয় নায়ক নায়িকার কার্যক্রমে। ঐ প্রতিষ্ঠিত শ্রেণির বিরোধী স্বার্থ রূপ নেয় প্রতিনায়কের প্রতিফলিত জীবনচিত্রে সেইজন্যই রোম্যান্স যদিও দৈহিক প্রেমের সার্থকতাকে দেখাতে চায়, তবুও অতিক্রম করে না সতিত্বের সংজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার মানদণ্ড। রোম্যান্সের এই শ্রেণিস্বার্থ-সংরক্ষণ যেমন সত্য মধ্যযুগের রোম্যান্সের ক্ষেত্রে—তেমনই সত্য রেনেসাঁসের সমকালীন অভিজাত রোম্যান্সের ক্ষেত্রে অথবা অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া

রোম্যান্সের বৃত্তে এমনকী বিপ্লবী রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত রোম্যান্সের কাহিনিতে। এই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সব যুগে রোম্যান্স লেখা চললেও রোম্যান্স বলতেই মূলত মনে ভেসে ওঠে মধ্যযুগের একটি সাহিত্য সংরূপের কথা। ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দীরও পূর্বে এর সূত্র পাওয়া যায়। এমনকি গ্রিক রোম্যান্স পাঠের চর্চা ছিল এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে আবার এ কিন্তু ভুললে চলবে না আজকের কমিকস্ট্রিপও একধরনের রোম্যান্স বৈকি। রোম্যান্সের ইচ্ছাপূরণ, নানাধরনের নৈতিক অ্যাজেন্ডা অব্যভিচারী প্রেম—রোম্যান্সের নায়কের প্রকৃতিজ সারল্য নিয়ে কমিক্সেও আত্মপ্রকাশ করে। রোম্যান্সের ইতিহাস তাই নিয়তরূপ বদলের মধ্য দিয়ে একটি সংরূপের বেঁচে থাকার ইতিহাস। মধ্যযুগে রোম্যান্স বা Exromancier বা Romancer বা Romear ছিল ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করা ভার্নাকুলার সাহিত্য। ইউরোপে আক্ষরিক অর্থেই অনেক মহাকাব্যিক ও প্রচলিত কাহিনির অনুবাদ করে রোম্যান্স রচিত হয়েছে। বাংলাতেও অনুবাদ হয়েছে আরবি, পার্সি, পশ্চিমি কাহিনির বা মহাকাব্যের। ক্রমশ সে পরিচয় লাভ করেছে তার কাহিনিবৃত্তের সার্বিক পরিচয়ে। ফলে প্রাচীন ফরাসিতে দেখি রোঁম্যা শব্দের অর্থই দাঁড়াল পদ্যে রচিত রাজসভাশ্রিত প্রেমকাব্য এবং জনপ্রিয় সাহিত্য। বিষয় রাজসভার কিন্তু মালিকানা সাধারণের। এই-ই রোম্যান্সের প্যারাডক্স। এই প্যারাডক্স *ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা, দি ফেয়ারী ক্যুইন, দি মিস্ট্রি অফ উডল্‌ফো এ্যাণ্ড লউজিম* হয়ে *এনডিমিয়ন এ পোয়েটিক রোম্যান্স* হয়ে টারজান পর্যন্ত বিস্তারিত—বলিউডের হিন্দি সিনেমাও তার বাইরে নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে রোম্যান্স এর আধুনিক রূপ আমরা ইউরোপের হাত থেকে ইংরেজি পথে পেয়েছি। তবে ইউরোপীয় রোম্যান্স ক্রুসেডের পর থেকে যে আরব্যরজনীর গল্পমালার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তারই তো আর একটি উত্তরপ্রজন্ম মুসলিম প্রণয়গাথা ও বীরকাহিনির মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল এবং অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির যুগ পর্যন্ত বহমান ছিল—তা বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা আছে। তবে এদেশ ওদেশ যে দেশই হোক্ না কেন—মধ্যযুগের রোম্যান্সের কাহিনিগত ও উপস্থাপনাগত একটি ধারা সরাসরি ইতিহাসমিশ্রিত মহাকাব্যের উত্তরাধিকার আর একটি ধারা ইতিহাসমিশ্রিত লৌকিক কাহিনির সমবায়ে গঠিত। একদিকে মালোরি, আরিওস্তো, দৌলত বা আলাওল অন্যদিকে হ্যাভেলক দি ভেন্ বা মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রণয়গাথা বা যুদ্ধ বিবরণ।

বহুদিনের স্মৃতিসঞ্চিত এই ঐতিহাসিক কাহিনিই কথকের মুখে মুখে রক্ষিত বা কখনো লিপিবদ্ধ আকারে পরবর্তী রোম্যান্সের বিষয়বস্তু সরবরাহ করেছে। এইভাবেই অতীতের পুনর্ব্যাখ্যাও করেছে রোম্যান্স—অতীতকে, দূরকে অনেকটাই বর্তমান জীবনের নিকটও করে তুলেছে। রোম্যান্সের এই প্রক্রিয়াকে বুঝলে ইতিহাসচর্চা ও সংস্কৃতিবিদ্যার একটা ধারাবাহিকতাও তাই সহজে আবিষ্কার করা সম্ভব। তখন এও বোঝা যাবে কীভাবে পূর্বযুগের একটি সামাজিক উপন্যাস পরযুগে রোম্যান্স হিসেবে পঠিত হচ্ছে সাধারণ্যে।

লিটল ম্যাগাজিন

সন্দীপ দত্ত

'ম্যাগাজিন' শব্দটির অভিধানিক অর্থ বারুদশালা। বারুদশালায় যেমন বারুদ মজুত রাখা হয় তেমনি অক্ষর-শব্দের যেন সংগ্রহশালা পত্রপত্রিকাগুলি। সমস্ত কিছু যাতে পোরা হয় তাই 'ম্যাগাজিন'। এইভাবেই হয়ত Magazine শব্দটি প্রবেশ করেছে পত্রিকার বিকল্পে। ইতিহাস সূত্রে দেখি সাময়িক পত্রকে 'ম্যাগাজিন' হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি চিহ্নিত করেন তাঁর নাম ওডওয়ার্ড কেভ। তাঁর সম্পাদনায় লন্ডন থেকে ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায় Gentleman's Magazine। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের আদিযুগে Magazine শব্দটি শুধুমাত্র বাঁধানো পত্র-পত্রিকা প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক, দৈনিক পত্রিকার সঙ্গেও শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে যায়।

ম্যাগাজিনের পাশে একটি বিশেষণ বসল লিটল। 'লিটল ম্যাগাজিন' এই দুটি শব্দের একযোগে ব্যবহার শুরু হয়েছিল ইউরোপে আঠারো শতকের শেষ দশকে। সাহিত্য যেন পণ্য হয়ে উঠেছিল, বলা যায় পণ্যসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, তখন সেই পণ্যমুখিন সাহিত্য থেকে দূরে থাকার জন্যে, সরে দাঁড়ানোর জন্যে, অন্য সাহিত্য পত্রিকার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এই সাহিত্য প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠা। সাহিত্যের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হল। ব্যক্তিদের মর্যাদা ও প্রেরণাই এই সাহিত্যের বড় শর্ত। এই নব্য সাহিত্য চেতনাই লিটন ম্যাগাজিনের ভূমি তৈরি করল। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত এক বিশেষ রীতির পত্রিকাকে 'লিটল ম্যাগাজিন' অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে 'লিটল ম্যাগাজিন' ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে। *দেশ* পত্রিকার মে ১৯৫৩ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্য-পত্র' প্রবন্ধে প্রথম 'লিটল ম্যাগাজিন' অভিধাটি প্রয়োগ করলেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে। এখন এই অভিধাটির বহুল ও যত্রতত্র ব্যবহারে লিটল ম্যাগাজিনের স্বরূপ বা চরিত্র নির্ণয়ে অস্পষ্টতা লক্ষ করি।

'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি সম্ভবত এসেছে ১৯১৩ সালে শিকাগো থেকে প্রকাশিত মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত *Little Renieve* থেকে। কেউ কেউ মনে করেন ইউরোপে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চের পাশাপাশি যে ছোটো নাট্যদল গড়ে উঠেছিল সেই

লিটল থিয়েটার অনুকরণে বা অনুসরণে Little Magazine শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন পৃষ্ঠা, সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকেও সাধারণভাবে লিটল হয়ে থাকে। কিন্তু 'লিটল' শব্দটি আকার, প্রচার বা সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়নি। এখানে লিটল শব্দটি পুঁজিগত অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঢালাও পুঁজি এইসব কাগজের থাকে না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে কাজ করে না। পুঁজিগত অর্থে 'Little'. মধ্যপদলোপী সমাসে ব্যাসবাক্য এরকম হতে পারে Little Capital Magazine। আবার অন্যদিক থেকে বলা যেতে পারে 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'বিগ ম্যাগাজিন' শব্দটি মনে আসে। যা কিছু ব্যবসায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক তাই 'বিগ'। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরা সাহিত্য সংস্কৃতির পোষণ করে। লিটল ম্যাগাজিন এই বড়ো একটা কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন সেই অর্থে প্রতিবাদী ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী। লিটল ম্যাগাজিন নামে লিটল হয়েও এই পত্রিকাগুলিই 'গ্রেট'। আজ আর শুধু পুঁজিগত অর্থে লিটল ম্যাগাজিনকে ভাবলে পুরো ভাবনাটাই একপেশে হয়ে যাবে।

লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তবু এর প্রকৃত শুরু বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমারসন ও মার্গারেট ফুলার সম্পাদিত *The Dial* (১৮৪০-১৮৪৪) পত্রিকাটি লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলা যেতে পারে। লিটল ম্যাগাজিন ব্যাপকতা পেতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আমেরিকা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে—ইমেজিস্ট, সিম্বলিস্ট প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলা যেতে পারে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত *সবুজপত্র*-কে।

যেকোনো দেশের যেকোনো জাতির সাহিত্যের মূল ভাণ্ডার এইসব ম্যাগাজিনই। লিটল ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়েই সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, তরুণ সাহিত্যের পরিচিতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লিটল ম্যাগাজিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে উল্লেখ করা যায়।

১ যেকোনো দেশ ও জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক সেই দেশের লিটল ম্যাগাজিনগুলি।

২ লিটল ম্যাগাজিনের অবস্থান 'বিগ ম্যাগাজিনের' ঠিক বিপরীতে।

৩ লিটল অর্থাৎ কম পুঁজিতে বৃহৎ চিন্তার প্রকাশ।

৪ লিটল ম্যাগাজিনের নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী থাকে ও লেখক তৈরি করে।

৫ লিটল ম্যাগাজিন যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে।

৬ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বক্তব্য তুলে ধরে সমাজ ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করে।

৭ লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে চালিত ও সংগঠিত করে।

৮ লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য সৃজনশীল সাহিত্যের প্রসার।

৯ লিটল ম্যাগাজিনকে বলা যায় তরুণের সাহিত্য বা সাহিত্যের তারুণ্য।

১০ লিটল ম্যাগাজিনেই সাহিত্যের বহু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

১১ লিটল ম্যাগাজিন যথার্থ অর্থে সাহসী পত্রিকা। যেকোনো বক্তব্য (সাহিত্য-সংস্কৃতি-সামাজিক মূল্যবোধ) প্রকাশে নির্দ্বিধ। লেখার ব্যাপারে কোনো রফা বা আপস করে না।

১২ প্রতিষ্ঠিত, বাজারি ও ব্যবসায়ী লেখক কিংবা লেখা ব্যবসায়ীর স্থান লিটল ম্যাগাজিনে নয়।

১৩ কাগজের বিশেষ চরিত্রকে গড়ে তোলা লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম আদর্শ।

১৪ লিটল ম্যাগাজিন সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

১৫ লিটল ম্যাগাজিন বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী।

১৬ লিটল ম্যাগাজিন যেকোনো বিষয়ের হতে পারে। যথা—কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র, সংগীত, ধ্রুপদী সাহিত্য, শিল্পকলা, অনুবাদ, লোকসংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, সমালোচনা ইত্যাদি।

১৭ লিটল ম্যাগাজিন সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন।

১৮ লিটল ম্যাগাজিন যেকোনো আয়তনের হতে পারে। নির্দিষ্ট কোন মাপ নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০ হতে পারে, ১ পৃষ্ঠাও হতে পারে। তবে সাধারণভাবে ২ থেকে ৫-৬ ফর্মা হয়ে থাকে।

১৯ ঝকঝকে-ঝকমকে গ্ল্যামার না থাকলেও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ রীতি ও রুচিতে মর্যাদাপূর্ণ।

২০ লিটল ম্যাগাজিনের অন্য প্রচেষ্টা—'নিজস্ব প্রকাশনা'।

২১ লিটল ম্যাগাজিনের দুটি দিক ১. সৃজনশীলতা ২. প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষ ও নির্ভীক প্রকাশ।

২২ নির্দিষ্ট পাঠক গড়ে তোলে। পাঠককে সাহিত্যের পাঠে দীক্ষিত করে নতুনভাবে।

২৩ সমসাময়িক ঘটনার স্রোতে লিটল ম্যাগাজিন উজ্জীবিত।

২৪ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের প্রবণতা।

২৫ জাতীয় জীবনে কোনো সাম্প্রতিক সমস্যা বা জ্বলন্ত বিষয় (Burning topics) নিয়ে জনমত গড়ে তোলা।

২৬ আন্তর্জাতিক সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়কে পত্রিকা মারফত প্রকাশ করা।

২৭ সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে স্পর্শ করা।

২৮ সাহিত্য সম্মেলনের নিয়মিত আয়োজন।

উপরিউক্ত সূত্রানুসারে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে প্রধানত যে ধারণায় আমরা স্থিতধর্মী হতে পারি, তা হল লিটল ম্যাগাজিন বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী, সৎ সাহিত্য ভাবনায় পরিচালিত এস্টাবলিসমেন্ট বিরোধী, সমাজ সচেতন, স্বল্পবিত্ত, রুচিশীল তরুণদের সৃজন-সাহিত্যপত্র।

লোকশিল্প

দীপঙ্কর ঘোষ

মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত, ব্যষ্টিচেতনার ঐতিহ্যবাহী ও পরম্পরাগত শিল্পকলা নিদর্শনই লোকশিল্প। সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও আঞ্চলিকতার নিরিখে স্বতঃস্ফূর্ত কৃৎকৌশলে লোকশিল্প একটি স্বতন্ত্র বিষয়। ভারতীয় সংস্কৃতির আবহমান ধারায় বিষয় হিসাবে লোকশিল্প বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। 'Folk-Art' এই ইংরেজি শব্দেও 'লোকশিল্প' বহুল পরিচিত ও প্রচলিত।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ জীবন সংগ্রামের অনুষঙ্গ হিসাবে যে আদিম শিল্পকাজের প্রমাণ রেখেছে, তা শিল্পকলা চর্চার পটভূমি আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য। হাজার হাজার বছর আগের গুহাচিত্র, পাথর ও হাড়ের তৈরি আয়ুধে আদিম জীবনচর্যার বিষয় ফুটে ওঠে। পরবর্তীকালের জটিলতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, বস্তুগত শিল্পধারার বিকাশ ও বিস্তারে ইন্ধন জোগায়। আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত শিল্পবস্তু হিসাবে লোকশিল্প পরিচিত হয়েছে। প্রাচীন সময়কাল থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিবর্তনের পরিক্রমায় সমাজ-সাংস্কৃতিক চৌহদ্দিতে লোকশিল্পও সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। কালানুক্রমিক বিবর্তন ও ভৌগোলিক অবস্থানের রকমফেরে লোকশিল্প একটি সজীব বস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদান। হারানো অতীতের ইতিহাস উদ্ধারেও উপাদান হিসাবে লোকশিল্প প্রয়োজনীয় উৎস।

মৃৎশিল্প, কাঠ খোদাই শিল্প, শোলার কাজ, শিকা, ডোকরা শিল্প, মিষ্টান্ন তৈরির ছাঁচ, মুখোশ শিল্প, বাস্তুশিল্প, নকশি কাঁথা, আলপনা, পটচিত্র, চালচিত্র প্রভৃতি লোকশিল্পের সম্পদ। প্রতিটির শিল্পগত আঙ্গিকে অঞ্চলভেদে পার্থক্য দেখা যায়। দেশব্যাপী এই তারতম্যের লক্ষণ দেখা যায়। আবার তৈরির উপাদানে পুতুল পোড়ামাটি, কাঠ, শোলা, গালা ইত্যাদি নানাবিধ মাধ্যমে হয়; মুখোশ যেমন তৈরি হয় মাটি-কাগজ-কাঠ ইত্যাদিতে। দশাবতার তাস, সরাচিত্র, পাটাচিত্র আঞ্চলিকতার নিরিখে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। ব্যবহারিক, ধর্মীয় ও অলঙ্করণমূলক এসব নিদর্শন বঙ্গসংস্কৃতি তথা ভারত-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। নির্মাণশৈলী ও শিল্পসুষমার নিজস্বতায় লোকশিল্প মর্যাদালাভ করেছে। সাধারণভাবে গ্রামীণ শিল্পকলার রূপই লোকশিল্পে প্রতিফলিত হয়। তৈরির সহজলভ্য উপকরণ, স্বকীয় প্রযুক্তি আর সহজাত কৃৎকৌশলে লোকশিল্প গুরুত্বলাভ করেছে। বিশেষ বিশেষ শিল্পীর মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক সমাজ-চাহিদায় লোকশিল্প সর্বজনীন রূপ পায়।

প্রাগৈতিহাসিক শিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা গেলেও লোকবিশ্বাস, জাদুক্রিয়ার নানা প্রাসঙ্গিক মিল দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে, আদিম মানুষের শিল্পরূপের সঙ্গে লোকশিল্পের পার্থক্য সবক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায় না। তবে লোকশিল্পের স্বকীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। চলমান জীবন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায়। প্রত্নবস্তুর সঙ্গে লোকশিল্পের পার্থক্য এই নিরিখেই বহুলাংশে বিবেচিত হয়। তেমনি আদিবাসী সংস্কৃতির স্ব-শৃঙ্খলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তৈরি হওয়া শিল্পের সঙ্গে লোকায়ত শিল্পকলার ভেদরেখাও গড়ে ওঠে। কারুশিল্প, চারুশিল্প, হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্প থেকে যে লোকশিল্প স্বতন্ত্র তাও আঞ্চলিক জনজীবন ও আঙ্গিকগত অবস্থা থেকে প্রকাশ পায়। নকশা, মোটিফ, প্রতীক, রূপকল্প প্রভৃতি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেও প্রকৃত রূপ বোঝা যায়। জীবজগৎ, সৌরজগৎ, ব্যবহারিক জীবন-সহ জ্যামিতিক নক্সার অবয়বে গড়ে ওঠে লোকশিল্পের আঙ্গিক। তৈরির পদ্ধতি, উপাদান ও সমাজ-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা বহুলাংশে জানা যায়। আচার, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় পটভূমির সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে লোকশিল্পের সম্পর্কসূত্র মূল্যায়ন করা হয়, যা অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য নয়। কারণ, অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে লোক ঐতিহ্যের ধারা সুস্পষ্ট নয়। তবুও, লোকশিল্পের বিভাজনরেখা নির্দিষ্টকরণ নিতান্তই জটিল প্রক্রিয়া। কোনো জনগোষ্ঠীর শিল্পকাজমাত্রই যেমন লোকশিল্প নয়, তেমনি সূক্ষ্ম কারুকাজই সবসময় লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। আদিবাসী শিল্পকলায় একান্তভাবে ব্যবহারিক ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক রূপ দেখা যায়। এই শিল্পকলা অনাদিকালের উত্তরাধিকারী ও নিয়মরীতির অনুসারী। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম, পূর্ব-ধারণাপ্রসূত ঐতিহ্য ও সুশৃঙ্খল সূত্রপাত পাওয়া যায়। চিত্রকলা সংশ্লিষ্ট বিষয়ই যেমন চারুশিল্পের চৌহদ্দি। অন্যদিকে, হস্তশিল্প যান্ত্রিক উৎপাদনের বিপরীত অর্থবোধক বিষয়। মামুলি সূচিকাজ, মডেল প্রভৃতি হস্তশিল্পরূপে চিহ্নিত করা হয়। লোকঐতিহ্যের ধারা এতে পাওয়া যায় না। আবার ক্ষুদ্রায়তনের কারখানায় যে উৎপাদিত সামগ্রী তা কুটিরশিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

আদি প্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগ এবং পরে কৃষিকাজের বিস্তার—গ্রাম ও শহরের প্রসার ঘটার সঙ্গে মানুষের শিল্পকাজেরও রূপান্তর এবং বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন দেখা যায়। শিল্পকাজ তাই মানুষের ক্রমবিবর্তনে উৎপাদনগত অবস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। মুর্শিদাবাদের যে হাতির দাঁতের শিল্প বিশেষ পরিচিত ছিল তা ঐতিহ্যশালী শিল্পকাজ, তবে, লোক-উপাদানের সামগ্রিক বিশিষ্টতা নেই। পোড়ামাটির শিল্প, পটচিত্র, মোমগলানো পদ্ধতিতে তৈরি ডোকরা ধাতুশিল্প প্রভৃতিতে যেমন লোক-উপাদানের প্রাচুর্য। সাধারণভাবে যেমন আসবাবের জন্য কাঠের কাজ বা পোড়ামাটির মন্দিরফলক লোকশিল্প নয়।

লোকশিল্পের ক্ষেত্রে গঠনশৈলীতে বা স্টাইলে এবং গ্রামীণ লৌকিক পরিবেশের সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা শিল্পের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকশিল্পে শিল্পীর সৃজনশীল মনের আবেগের অভিব্যক্তি যেমন থাকে, তেমনই থাকে সৃষ্টির আনন্দ। মনোরঞ্জন,

লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, খেলনা এবং ব্যবহার্য বস্তু হিসাবেও তা ব্যবহৃত হয়। লোকশিল্প সবসময় ঐতিহ্যবাহী হলেও সমস্তপ্রকার ঐতিহ্যবাহী শিল্প লোকশিল্প নয়। মাটি, পাথর, কাঠ, কাগজ, কাপড়, ধাতু, বেত, বাঁশ ইত্যাদি নানা উপকরণ মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে লোকশিল্পের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে, 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ'—হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে—যে শিল্পবস্তু শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিলেও মন হরণ করে।

সময়ের স্রোতে লোকশিল্পের বহু বিষয়বস্তু যেমন হারিয়ে যাচ্ছে; আবার, সময়ের পথ ধরে ঐতিহ্যাশ্রিত হয়ে সমাজ-চাহিদায় নতুন সাংস্কৃতিক উপকরণ অঙ্গীভূত হচ্ছে। বহমান সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ও উপলব্ধিতে লোকশিল্প অনন্য।

লোকসংস্কৃতি

বিকাশ চক্রবর্তী

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততম আলোচনাও শুরু করা প্রয়োজন পৃথকভাবে লোক ও সংস্কৃতি শব্দদুটির অর্থ বিচার করে।

লোক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Folk। ঐতিহাসিকভাবেই লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ ও চর্চার সূত্রপাত ঘটে ইউরোপ মহাদেশে। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপে লোক বলতে মনে করা হত মূলত গ্রামীণ নিরক্ষর কৃষকদের, যাদের সমাজব্যবস্থার নিয়মকানুন, রীতিনীতি, প্রথা, শিল্পকলা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে মৌখিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে, অর্থাৎ যাঁদের জীবনধারায় ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাপকাঠিতে এই লোক-এর সামাজিক অবস্থান ছিল একদিকে আদিম সমাজব্যবস্থার 'অ-সভ্য' মানুষের ওপরে। ধনতন্ত্র ও শিল্পায়নের প্রভাবসঞ্জাত 'সভ্য' সমাজে এরা ছিল 'অ-সভ্য' ও 'অ-সংস্কৃত'। নিজস্ব এলিট্ সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধানী ইউরোপীয় গবেষকরা তাঁদের আগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন লোক-এর ওপর, যদিও তাঁদের যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল লোক-এর স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ক্ষীয়মাণ হতে হতে বিলুপ্ত হবে গ্রামিক লোকসমাজ। অতএব এর যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ Alan Dundes-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে লোক-এর বিলুপ্তি ঘটেনি, বরং সজীব রয়েছে লোকসংস্কৃতি। তাঁর ধারণায় লোক বলতে যেকোনো গোষ্ঠীর মানুষকে বোঝায়, যাঁদের মধ্যে অন্তত একটা বিষয়ে ঐক্যচেতনা রয়েছে, যা পেশা, ভাষা কিংবা ধর্মের মতো যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল যে গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত সদস্য পরস্পর পরিচিত না হলেও তাঁরা সকলেই এক পরম্পরার (Tradition) অধীন এবং এই পরম্পরাই নির্ধারণ করে তাঁদের আত্মিক অবস্থান। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই মেলে লোক-এর সন্ধান—কৃষক, নাপিত, কুমোর, জেলে, শ্রমিক, মালিক, বুদ্ধিজীবী কেরানি ইত্যাদি সকলেরই পরিচয় লোক। তাই কেবলমাত্র অতীতের সামন্ততন্ত্রী কৃষি সমাজের মানুষই নয়, বর্তমানের শিল্পোন্নত সমাজের মানুষও লোক পদবাচ্য।

সংস্কৃতি-র সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা রয়েছে। তবে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে E. B. Tylor প্রদত্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করা যায়—'that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'। আবার অন্যভাবেও বলা হয়েছে যে সংস্কৃতি হল পরিবেশের মানব-নির্মিত অংশ। মার্ক্সীয় অভিধায় তা হল সমাজে অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে নির্মিত উপরিকাঠামো। এই উপরিকাঠামোর প্রেরণাতেই মানুষ তরবারির শুধুমাত্র তীক্ষ্ণতাতেই সন্তুষ্ট থাকে না, তাকে করে তোলে মণিরত্নখচিত। সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর এতই অন্তর্ভেদী যে এদের কাউকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, যা আবার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের জীবনধারাকে।

লোক ও সংস্কৃতি শব্দ দুটিকে যুক্ত করলে পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতি শব্দসমষ্টি, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Folklore এবং শব্দটি ১৮৪৬ সালে ইংরেজিতে প্রথম ব্যবহার করেন William John Toms। ইউরোপে লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত আগ্রহের সূচনাকাল ষোড়শ শতক হলেও আধুনিক চর্চা শুরু হয় জার্মানিতে Grimm ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক লোককথা সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮১২ সালে। একদিকে লোকসংস্কৃতি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচায়ক এবং অন্যদিকে তা অধ্যয়নযোগ্য শাস্ত্র।

প্রথম অর্থে, Dan Ben-Amos-এর অভিব্যক্তি অনুযায়ী 'Folklore is artistic communication in groups' অর্থাৎ লোকসমাজের অভিজ্ঞতা, সৃজনশীল কল্পনা, রীতিনীতি, অতীত ও বর্তমানের পরম্পরার এক সুষমামণ্ডিত নান্দনিক বার্তা-বিনিময় ঘটে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। কুমোরের চাক যেমন কারিগরি জ্ঞানের নিদর্শন, তেমন এতেই কুশলী হাতের স্পর্শে তৈরি হয় শিল্পগুণসম্পন্ন মৃৎপাত্র। লোকউৎসব, ব্রত, পাঁচালি, কথকতা, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির সমস্ত উপাদানই সমাজ-সম্পৃক্ত এবং এদের সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণসমূহ কোন নির্দিষ্ট লোকসমাজের পরম্পরা অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয় বহন করে। জাতিগত ও আঞ্চলিক পার্থক্য প্রতিটি লোকসমাজের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, এককথায়, সমগ্র জীবনধারাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তোলে। লক্ষণীয় যে একই দেশের একাধিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটা সামগ্রিক ঐক্যচেতনার স্থান থাকলেও লৌকিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের অনন্যতার পরিচায়ক। তাই লোকসংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে স্থান-কালের প্রেক্ষিতেই তা করতে হয়। মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের মতে, লোকসংস্কৃতি শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টি ও তাঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার।

লোকসংস্কৃতি কখনই স্থবির নয়। সমাজজীবনের জঙ্গমত্বই তার পরিবর্তনের সূচক। ফেলে-আসা সামন্ততন্ত্রী সমাজের প্রতি আবেগজনিত স্মৃতিমেদুরতার জন্যই গবেষক ও অনুরাগী মানুষ অতীত লোকসংস্কৃতিকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখতে চান। সমাজ-পরিবর্তনের অমোঘ গতির মুখে লোকসংস্কৃতিকে লক্ষ্মণরেখার গণ্ডিতে ধরে রাখা কোনো

দেশেই সম্ভব হয়নি। লোক যেহেতু একটা প্রবহমান ধারা, লোকসংস্কৃতিও তাই বিলুপ্ত হতে পারে না, তার রূপান্তর ঘটে।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রয়োগ শিল্প (Performing art) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত। লোকসংস্কৃতির অবস্তুনির্ভর উপাদানসমূহ, যেমন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, কথকতা, পাঁচালি প্রভৃতি সমস্তই রূপ লাভ করে অভিকরণ প্রক্রিয়ায় বা প্রয়োগশিল্পের মাধ্যমে জারিত হয়ে। এমনকি লোকশিল্প ও কারুকলার মতো বস্তুনির্ভর উপাদানও মূর্ত হয়ে ওঠে পরম্পরালব্ধ কৃৎকৌশলের মাধ্যমে, কিংবা নির্দিষ্ট আচার-আচরণের ছন্দোবদ্ধ পুনরাবৃত্তি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে প্রথা-ব্রত-উৎসব উদ্‌যাপনকে। লোকসংস্কৃতির গোষ্ঠীগত পরিচয়ের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে অভিকরণের শিল্পকর্ম।

অধ্যয়নের বিষয়বস্তুরূপে লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে, যেমন, তুলনামূলক, জাতীয়তাবাদী, নৃতাত্ত্বিক, মনঃসমীক্ষণিক, রূপতাত্ত্বিক, টাইপ মোটিফ ইনডেক্স। এছাড়াও যা কাজে লাগে তা হল সমাজতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান, শব্দার্থবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা। কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা বিশেষ সহায়ক শাস্ত্র এক্ষেত্রে একক ভূমিকা পালন করতে পারে না, কারণ তাতে অসম্পূর্ণতার আশঙ্কা থেকে যায়। বহুমাত্রিক লোকজীবনের প্রতিফলন ঘটে লোকসংস্কৃতিতে। তাই লোকসংস্কৃতি চর্চাকে আন্তর্বিদ্যাগত (Interdisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বিজ্ঞানরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

লোকসাহিত্য

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এক গোষ্ঠী থেকে আরেক গোষ্ঠীতে যে অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা হস্তান্তরিত হতে থাকে, তার মাধ্যমে মানুষ নানান কিছু সৃষ্টি করে একই সঙ্গে ব্যবহারিক এবং নান্দনিকভাবে। এই ব্যবহারিক এবং নান্দনিক দুটি দিককে প্রথা, রীতি, আচার, সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে সংহত করে তৈরি হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে তিনটি স্তরের আয়তনে বিন্যস্ত করলে দেখা যায় যে :

ক. প্রথম স্তর : ভাবসম্পদের স্তর যার অন্তর্ভুক্ত ললিতকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।

খ. দ্বিতীয় স্তর : ভাবসংযোগ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রথা, রীতি, বিশ্বাস, আচার-সংস্কার ইত্যাদি।

গ. তৃতীয় স্তর : ব্যবহারিক সম্পদের স্তর, যাতে রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্ত করার উদ্‌ভাবনী প্রজ্ঞাসমূহ এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ নান্দনিক অনুভূতি ও ব্যবহারিক প্রয়োজন এ দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান হল লোকসাহিত্য, যা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল একান্তভাবেই মৌখিক তথা oral-literature। এইটিই বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত থেকেছে নানান প্রকরণের মধ্যে দিয়ে। আধুনিককালে এসে যখন গবেষণা ও বিজ্ঞানসম্মত লোকসংস্কৃতি চর্চার উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে লোকসাহিত্যের নানা প্রকরণ, লিখিত-রূপও তখন থেকেই তৈরি হতে শুরু করেছে মূলত নানান গ্রন্থে সংকলনের আকারে। লোকসাহিত্য শুধু গ্রামীণ মানুষেরই সাহিত্য নয়, ঘেটে খাওয়া নাগরিক জীবনের অংশীদারও এই সাহিত্যের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। আসলে লোক তথা সাধারণ মানুষের জীবনকথার অভিপ্রকাশকেই লোকসাহিত্য বলা যেতে পারে হয়ত, তবে সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে সেই সাহিত্যকেই যথা অর্থে লোকসাহিত্য বা Folk literature বলা যেতে পারে যা ঐতিহ্যের দীর্ঘ পরম্পরার অবিভাজ্য অংশ হিসেবেই প্রজন্মানুসারে মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়ে থেকেছে অতীত থেকে বর্তমান অবধি। ফলত লোকসাহিত্যের সীমানার বিস্তৃতি অনেকদূর অবধি—সৃষ্টি রহস্যের কথা, সমাজবিবর্তনের সূত্র, প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কৃতি-রীতিনীতি, মিথ, টেল, লিজেণ্ড সবই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত উপবর্গগুলি :

ক. লোককথা

খ. ছড়া

গ. ধাঁধা

ঘ. প্রবাদ

ঙ. প্রবচন

চ. গীতিকা

লোককথার অন্তর্গত আবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ সেগুলি হল, মিথ, টেল (কাহিনী) ও লিজেন্ড (কিংবদন্তী)। এদের মধ্যে মিথই হল প্রাচীনতম। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের নানান অভিজ্ঞতার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল না সেযুগে। সেই অব্যাখ্যাত অভিজ্ঞতাগুলির বর্ণনামূলক যে মৌখিক কাহিনিগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলিই হল আদিম মিথ। প্রাক্‌বিজ্ঞান যুগের মানসিকতায় রচিত এই কাহিনিগুলির ভিত্তিভূমি অলৌকিকের ওপর বিশ্বাস এবং একক নয় গোষ্ঠীগত প্রয়াসে এগুলি গড়ে উঠত। এই কাহিনীগুলির সঙ্গে প্রাচীনকালের ধর্মবিশ্বাসের সংযোগও ছিল গভীরভাবে।

'লোকপুরাণ' বা 'মিথ' থেকেই সময়ের বিবর্তনে তৈরি হয়েছে 'টেল' (বা 'কথা') যাতে 'মিথ'-সম্পৃক্ত ধর্ম ও অলৌকিকতার ভাগ কমে এসে মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রচলিত লোকজীবনের পরিচিত ছবিগুলি। তাই 'মিথের' মূল ভিত্তি ধর্ম ও দেবতা হলেও, তার বিবর্তিত রূপ 'টেল'-এ মানুষ ও তার সামাজিক সংস্কারই প্রধান। তবে মানুষের সহজাত অলৌকিকতায় প্রতীতি তার মধ্যেও বিম্বিত হয়ে থেকেছে।

তাই যেহেতু মানুষের মনের অবচেতনে পরবর্তীকালীন ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান মনস্কতার যুগেও অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও আস্থা থেকেই গেছে তাই ধর্ম-দেবতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত 'টেল'-এর সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে থাকে অলৌকিক ক্ষমতা, অসাধারণত্বের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ একটি নতুনমাত্রার ঐশীভাব। কিন্তু এই ঐশীভাব 'মিথ'-এর মতো দেবতা বা ধর্মসম্পৃক্ত নয়—বরং কোনো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের বা আপাতভাবে অব্যাখ্যেয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে টেল-এর বিবর্তিত রূপ 'লিজেণ্ড' তথা কিংবদন্তী। অর্থাৎ এতে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষের ওপর আরোপিত হয় অলৌকিকত্ব। স্থান বা ঘটনাও সেই 'অসাধারণত্ব' অর্জন করে বহু সময়ে। তাহলে মিথ > টেল > লিজেণ্ড ~ এই বিবর্তনটিকে সূত্রাকারে এইভাবে দেখানো যায় :

· ম—$দ_১$ = ট

ট + $দ_২$ = ল ~

অর্থাৎ 'ম' = 'মিথ' তার থেকে দৈব নির্ভরতা (= $দ_১$) বিযুক্ত হলে তৈরি হয় 'ট' = 'টেল'। আবার টেলের সঙ্গে নতুন মাত্রার দৈবভাব (= $দ_২$) সংযুক্ত হলে তৈরি হয় 'ল' = 'লিজেন্ড'।

পশুকথা, রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা, প্রভৃতি নানা বর্গে লোককথাগুলিকে বিভক্ত করা হয়।

লোকসাহিত্যের আরেকটি অতি প্রাচীন প্রকরণ হল ছড়া। সভ্যতার আদিলগ্নে দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করা হত ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে—সেই সব আদি-মন্ত্রই পরে প্রাথমিকভাবে ছড়ায় বিবর্তিত রূপ ধারণা করেছে। তবে ছড়ায় মন্ত্রের মতো ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গটি প্রায় বিলুপ্তই বলা যায়—পরিবর্তে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবনা এতে প্রতিফলিত হয়।

ছড়া মূলত দুধরনের : ১. সর্বজনীন ও ২. ছেলেভুলানো। সর্বজনীন ছড়ার যে গঠনকাঠামো রয়েছে সেটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ব্রত, খেলাধূলা এমনকী বিয়ের নাপিতের ছড়াও। এছাড়া বাঘ-তাড়ানো বা ভূত-তাড়ানোর মন্ত্রও ছড়ার আকারেই তৈরি হয়।

ছেলেভুলানো ছড়ায় সামাজিক ও পরিচিত পারিবারিক জীবনের অভিভব সর্বাধিক তাই শিশুরাও ভালো করে কথা বলতে শেখার আগে ছড়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তবে এর আরেকটা বড় কারণ হল ছড়ার অন্তর্লীন ছন্দোস্পন্দন। এই নিবেদন বৈশিষ্ট্যই সম্ভবত ছড়াকে সবচেয়ে জনপ্রিয় মৌখিকশিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

ধাঁধা : ধাঁধা হল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার, যার মূল উপকরণ দৈনন্দিন জীবনের ও সমাজের নানান উপাদান। ধাঁধার মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়। এই বিশেষ প্রকাশভঙ্গিটি হেঁয়ালির মধ্যেও দেখা যায়। ধাঁধার মধ্যে একটা সাদাসিধে ভঙ্গি থাকে এবং অপ্রত্যাশিত বা অভাবিত কোনো কিছুর তুলনা বা উপমা এর মধ্যে রূপকাশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সাদৃশ্য ও আপাত-বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক পরিণতিতে সুপ্রাচীন কাল থেকে ধাঁধা অনগ্রসর এবং অগ্রসর—সমস্ত সমাজেই গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ লোকসমাজেও এর প্রচলন থাকলেও নাগরিক সমাজে এর ব্যবহার ক্রমক্ষীয়মাণ। গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, কল্পিত অলৌকিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস, বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. নির্ণয়ের প্রচেষ্টা, সামাজিক আনন্দ ও ধর্মাচার, লোকাচার ইত্যাদি নানান কারণে ধাঁধার ব্যবহার হয়।

প্রবাদ : প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয় 'wit of one, wisdom of many'।' যে-কোনো প্রবাদই বহুকালের বহুজনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিস্মৃত পরিচয় কোনো একজন মানুষের বাচনে স্বরূপধারণ করে। প্রায় সব প্রবাদের নেপথ্যেই কোনো একটি ঘটনা বা কাহিনি থাকে, যাকে উপলক্ষ করে বহুজনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়। যেহেতু মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তন সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক উদ্বর্তনের ছক সারা বিশ্বেই একইভাবে গড়ে উঠেছে—তাই অনুরূপ অভিজ্ঞতা কিংবা একই অন্তর্কাঠামো (deep-structure)-সম্পন্ন অভিজ্ঞতার নিরিখে, সারা পৃথিবীতে একই রকমের উপলব্ধির অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রবাদের মধ্যে। এই জন্যে প্রবাদ একান্তভাবেই একটি বিশ্বজনীন বাক্‌শিল্প।

প্রবচন : প্রবাদ ও প্রবচনকে অনেক সময়েই আমরা সমার্থক বলে মনে করে নিলেও, দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে প্রবাদ দীর্ঘদিনের

আর্থসামাজিক অভিজ্ঞতায় বহুজনতার আয়োজনে গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রবচন প্রায়শই কোনো একক লেখকের একক সৃষ্টি। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকের মুখে মুখে তার ব্যাপক প্রচার ঘটে, ঠিক প্রবাদের মতোই। ফলে এইটিই এক অর্থে সর্বজনীনতা লাভ করে নিঃসন্দেহে।

গীতিকা : লোকসাহিত্যের সর্বশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপবর্গটি হল গীতিকা। প্রাচীনকালে 'গাথা-নারাশংসী' নামক এক ধরনের বীরগাথা-বিজয়গাথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। মূলত চারণকবিরা এই কাহিনিগুলি সুরে বেঁধে দেশ থেকে দেশান্তরে গেয়ে বেড়াতেন। পরবর্তীকালে সেগুলিই 'গীতিকা' হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি-রেণু কি লোককথার নানান ঘটনাগুচ্ছ ধীরে ধীরে যেভাবে সমষ্টিবদ্ধ রূপ লাভ করত—সেই কাহিনিগুলিতে ভ্রাম্যমাণ ওই গায়কেরা গানের সুর সংযোজিত করে তাকে পরিণত করতেন বীরগাথা তথা 'গাথা-নারাশংসী'-তে—এই ছিল মধ্যযুগের গীতিকা-র প্রাক্-রূপ। রামায়ণ, মহাভারতও এইভাবেই একদা গড়ে উঠেছিল। গীতিকার পরিপূর্ণ রূপের বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগেই—নাথ গীতিকার উদ্ভবের যথার্থ সময় জানা না গেলেও—সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই ঐ ধর্মীয় কাহিনিগুলি প্রচলিত ছিল যে, তা বলাই যায়। ধর্ম ভাবনা-বর্জিত পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলিও আনুমানিক তিনশো বছরের পুরোনো। তবে পশ্চিমবঙ্গের গীতিকাগুলির বয়স কম।

গীতিকা-র মূল দুটি উপাদান হল কাহিনি এবং সংগীতময়তা। একটি নির্দিষ্ট গল্পকে অবলম্বন করে গীতিকা-র সৃষ্টি এবং এরপর গল্পটি গানের সুর সহযোগে পরিবেশিত হয়। তবে এই সুরের ধরাবাঁধা কোনো রীতি নেই। সুর মূলত শাদামাটা হয়—কারণ সুরের কারিকুরির পরিবর্তে কথার ভাবকে ব্যক্ত করাটাই তার মূল লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলির কাহিনী সাধারণত বিষাদান্তক প্রেম নির্ভর হয় আর এক্ষেত্রে ভাটিয়ালি সুরের গায়নভঙ্গী প্রধানত ব্যবহৃত হয়। অন্যপক্ষে পশ্চিমবঙ্গীয় সামান্য যে কয়েকটি গীতিকা পাওয়া গেছে—সেখানে ঝুমুরের গায়নভঙ্গিটিই মুখ্য। তবে উত্তরবঙ্গের নাথ গীতিকার সুরারোপের কোনো নির্দেশ সেভাবে প্রাপ্য নয়। সম্ভাব্য একটি সূত্র হল, হয়ত উত্তরবঙ্গীয় লৌকিক সুর ভাওয়াইয়ার আদিরূপে সেগুলি গাওয়া হত। এছাড়াও সব ধরনের গীতিকাতেই বাক্‌রীতির একটি বিশেষ ভঙ্গি হিসেবে শব্দগুচ্ছ বা পংক্তির পুনরাবৃত্তি থাকে, যাকে ধুয়া বা Refrain বলা হয়। গীতিকা-র মধ্যেই বহুলভাবে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ।

শরিয়ত

আবদুর রশীদ চৌধুরী

শরিয়তের অর্থ হল ধ্রুবপথ, যা নিশ্চিতভাবে সঠিক জলাশয়ের কাছে জলপানের জন্য বা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিয়ে যায়। পাক কোরানের বিধিবদ্ধতা এবং হাদিসের সাথে গভীর আত্ম সম্পর্কে যুক্ত 'সুন্না' বা সুন্নত অর্থাৎ রসুল মহম্মদের (দঃ) কর্ম ও আচরণ বিধি; 'ইজমা' অর্থাৎ বিবেকপ্রসূত ঐক্যমত এবং 'কিয়াস' অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত—এই ত্রি-স্তম্ভ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে শরিয়ত-ইমারত। শরিয়ত হচ্ছে সারা মুসলিম জাহানের ধর্মীয় বিধি। শরিয়তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিধি ও সমস্ত কর্মাচরণ। আধুনিক আইনের সংজ্ঞায় শরিয়তকে ঠিক আইন বলা উচিত হবে না। শরিয়ত হল অব্যর্থ, অভ্রান্ত, ধর্মীয় ও নৈতিক পথ নির্দেশিকা।

শরিয়তের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি ধর্মীয় হুকুম ক্রিয়াশীল :

১. 'ফারজ'—অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রত্যহ পাঁচবার 'সালাত' বা ইবাদত বা নামাজ (প্রার্থনা) কায়েম করা আবশ্যিক—যথা 'ফজর' (প্রত্যুষে), 'জুহর' (দুপুরে), 'আছর' (বিকালে), 'মগ্‌রেব্' (সন্ধায়) এবং 'এশা' (রাতের প্রথমভাগে)। উল্লিখিত পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা ফারজ্ রূপে গণ্য।

২. 'হারাম'—নিষিদ্ধ নির্দেশ। এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যেক মুসলমানের কাছে চিরকালই হারাম বা নিষিদ্ধ যেমন মদ খাওয়া, সুদ খাওয়া, শুকরের মাংস খাওয়া, সহোদর বা সহোদরাকে বিয়ে করা ইত্যাদি।

৩. 'মুনদাব্'—অতিরিক্ত নামাজ কায়েম। ফারজ পালনের মতই ঈদ্-উল্-ফিতর্—একমাস রোজা বা উপবাসের পর এবং ঈদ্-উল্-আজ্-হা-করবানীর—নামাজ—ওয়াজিব (ফারজ-এর সমতুল্য) নামাজ হিসাবে কায়েম করা শরিয়তী বিধান।

৪. 'মুকরূহ্'—ঐচিত্যগত নিষেধাজ্ঞা। সহি হাদিসে বলা হয়েছে যে মুসলমানদের কিছু কিছু ভোগ্যদ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। যেমন—কাঁকড়া, কাদা মাছ বা সাপ জাতীয় মাছ ইত্যাদি।

৫. 'জায়েজ'—নিরপেক্ষতা, গতানুগতিকতা। কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে কোরান এবং হাদিস নীরব বা উদাসীন থেকেছে অর্থাৎ কোন নির্দেশ দান করে নি;—যেমন আকাশ পথে বা সমুদ্রপথে ভ্রমণ ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয়গুলির সবই শরিয়তভুক্ত।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় যুক্ত হয়েছে আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যেগুলি শরিয়তকে বিশেষ ভাবে ঋদ্ধ করেছে :

৬. 'ফিকাহ্'—বোধশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা বা বিবেক প্রয়োগ ক্ষমতা। ফিকাহ্ তত্ত্ব শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ফিকাহ্কে বাদ দিলে শরিয়ত অর্ধসত্য হয়ে পড়ে। কোরান ও হাদিসে যে যে বিষয়ের ভালত্ব-মন্দত্ব সম্বন্ধে কোনো কিছুই যেখানে বলা নেই, সে সে বিষয়ের ভালত্ব-মন্দত্ব নিরূপিত হয় বোধশক্তি বা বুদ্ধিমত্তা বা বিবেক প্রয়োগের মাধ্যমে। মুসলিম সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধ মুফ্তী বা আলেমগণ তাঁদের বোধশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো বিষয়ের ভালত্ব-মন্দত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন কেবলমাত্র যেখানে কোরান-হাদিসে কোনও কিছুই বলা নেই। ফিকাহ্ বা ইলম্-উল্-ফিকাহ্ তত্ত্বকে আরও সহজভাবে প্রয়োগের জন্য—ক. ইলম্-উল-ফাতোয়া—অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেবার বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতা এবং খ. ইলম্-উল্-ফারাইজ—অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান, বোধ এবং বিবেক প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। অতীতে কোনো অনুরূপ বিষয়ে কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাও দেখা হয় এবং অতীত রায় নিষ্পত্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। তাই ইলম্-উল-ফিকাহ হয়ে উঠেছে শরিয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে ইলম্-উল-ফিকাহ-এর সঙ্গে শরিয়তের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আমরা দেখি তা হল এদের প্রয়োগ ক্ষেত্রের পরিধি। শরিয়তের বৃত্তের পরিধি সমগ্র মুসলিম সমাজের সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় আর ফিকাহ্-এর প্রয়োগ ক্ষেত্র কেবল আইনগত বিষয়। কোরান ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শরিয়ত আর ফিকাহ্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সব বিষয়ে যা কোরান ও হাদিসে উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে ফিকাহ্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ইলম্-উল্-ফাতোয়া এবং ইলম্-উল-ফারাইজ এর মাধ্যমে, যা মুসলিম সমাজের বিধিসম্মত শরিয়তি ব্যবস্থা কায়েম করার জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগী ব্যবস্থামাত্র। মুসলিম সমাজের শরিয়তি আইনের উৎস হল শরিয়ত এবং ফিকাহ্ তত্ত্বের মিশ্রণ। তাই ফিকাহ্ শরিয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে স্বীকৃত।

ফিকাহ্-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আরও তিনটি বিষয় শরিয়তকে পুষ্ট করেছে :

১. ইজ্মা—বিবেকপ্রসূত ঐক্যমত। হজরত মহম্মদের জীবনকালে তাঁর সাহাবী বা অনুচরেরা বিবেকপ্রসূত ঐক্যমত দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় যেভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন সাধারণ মানুষের অধিকাংশের ঐক্যমতের উপর নির্ভর করে—তাই হল ইজ্মা। শরিয়তে সেই বিষয় স্থান পায় যা ইজ্মা।

২. কিয়াস্—সাদৃশ্য-অনুমান। পূর্ব ঘটনার সঙ্গে উদ্ভূত ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শরিয়ত মোতাবেক বলে দাবি করা হয়।

৩. সুন্না বা সুন্নত্ (হজরত মহম্মদের [দঃ] জীবন চরিত)। সুন্নাত্ মোতাবেক জীবন পরিচালনা শরিয়ত অনুপস্থী বলে দাবি করা হয়—মহম্মদের (দঃ) পোশাক পরিচ্ছদ ও খানাপিনা; ব্যবহার ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলিকে একত্রিত করলে যে অবয়ব পাওয়া যায় সেটাই হল আমাদের জানা-চেনা শরিয়ত।

শিক্ষাব্যবস্থা : পশ্চিমবঙ্গ

সুনন্দ সান্যাল

ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা স্তরগুলির প্রত্যেকটিই দুটি ভাগে বিভক্ত—প্রাথমিক (প্রথম—চতুর্থ শ্রেণি), উচ্চপ্রাথমিক (পঞ্চম—অষ্টম শ্রেণি); মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণি); উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি); উচ্চশিক্ষা বা টারসিয়ারি স্তর (প্রাক-স্নাতক) এবং আপার টারসিয়ারি বা (স্নাতকোত্তর) স্তর। উল্লেখ্য, অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক স্তর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাথমিক স্তরের পরে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা সব রাজ্যেই বেশি, কারণ উচ্চপ্রাথমিক স্তরে আসন-সংখ্যা তুলনায় কম। আমাদের রাজ্যে বাৎসরিক পরীক্ষায় পাশ-ফেল নেই, পঞ্চম শ্রেণির আগে পর্যন্ত প্রোমোশন অনায়াস, তবু অন্যান্য রাজ্যের মতো পঞ্চম শ্রেণির পরে নয় বরং চতুর্থ শ্রেণির পরেই মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৯ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলের বাইরে থেকে যায়। এ রাজ্যে সরকারি হিসেব অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৫৩,০০০ এবং মাদ্রাসা সহ সব ধরনের মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১০,০০০ এর কিছু বেশি। তবে অনেক স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণিতে একাধিক সেকশন আছে।

স্কুলশিক্ষার মান উন্নয়ন হলে 'স্বাভাবিকভাবে উচ্চশিক্ষার মান উন্নীত হতে থাকে'—এই সহজবোধ্য বক্তব্যটি রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভাগ ইউনেস্কোর। বাস্তবিকই স্কুলশিক্ষার মানই একটি দেশের কেবল উচ্চশিক্ষা নয়, সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থারই মান নির্ধারণ করে। তাই প্রধানত স্কুলশিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচয় নিলে রাজ্যের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

বাঙালির সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস যথেষ্ট পুরাতন। ইংরেজরা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ অধিকার করার আগে আমাদের একটা সুগঠিত পাঠশালা-ব্যবস্থা ছিল। সেখানে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছেলেদের পড়ারও কিছু প্রমাণ আছে। তারপর রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদের জের ধরে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে যে ইংলিশ এডুকেশন প্রবর্তিত হয় তা বস্তুত গড়ে ওঠে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। তিনি ইংলিশ এডুকেশন প্রসারেই তৎপর হন—তবে তা বাংলা-মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ইংলিশ এডুকেশন বলতে রামমোহন কেবল ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা বোঝাননি, বুঝিয়েছিলেন বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা ইত্যাদিও। দুই, বাংলা-মাধ্যম শিক্ষা বলতে আমরা আজ যা বুঝি তার

প্রচলন রামমোহনের হাতে একেবারেই হয়নি তা নয়, এবং বিদ্যাসাগরের হাতেই তা সম্পূর্ণ হয়েছিল এমনও নয়। তবু বিদ্যাসাগরই বাংলা-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন বলার কারণ সে-জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজে হাত লাগান তিনিই।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, বাংলা-মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চাই পাঠ্যপুস্তক-উপযোগী বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য। দুটি কাজেই তিনি হাত লাগান। বাংলা ভাষা 'নির্মাণে'র জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত এবং ইংরেজি বিভাগ দুটি সমধিক গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বিষয় দুটিতে দক্ষতা ব্যতীত পাঠ্যপুস্তক-উপযোগী বাংলা ভাষা নির্মাণ করা যাবে না। তিনি অতঃপর বোপদেবের সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ্য না করে নিজেই শিক্ষণোপযোগী ব্যাকরণ রচনা করেন, বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন, এমনকী স্কুল-পরিদর্শন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন।

রামমোহন প্রবর্তিত এবং বিদ্যাসাগর নির্মিত শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে আমরা 'আধুনিক বাঙালি' হয়ে উঠেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবেচনায় আধুনিক বাঙালি চার আনা ইউরোপীয়, আট আনা ভারতীয় এবং বাকি চার আনা বাঙালি—এই শেষ চার আনার অধিকাংশই ভারতীয়ত্বের বিকার এবং অবশিষ্ট অংশ খাঁটি গ্রাম্য বাঙালি। অনেকের বিশ্বাস, বাঙালির আধুনিকতা ভালো হোক মন্দ হোক, তার ভিত্তি বাংলা-মাধ্যম স্কুলশিক্ষা-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার আজ ভগ্নদশা : রাজ্যের বৃহত্তম শাসক দল সহ গোষ্ঠী বিশেষের মতে তার জন্য দায়ী প্রধানত 'কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা'। আবার কারও কারও মতে বাংলা-মাধ্যম স্কুলব্যবস্থার ধ্বংসের সূত্রপাত বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি পাঠ এবং পাশ-ফেল প্রথার বিলোপ সাধন দিয়ে। কারণ এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পরেই মন্ত্রী আমলা ভাষানীতি-নির্ণায়করা অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের হয় ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে না-হয় এমন বেসরকারি স্কুলে সরিয়ে নেন যেখানে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি পড়ানো হয় এবং নিয়মিত পরীক্ষাও নেওয়া হয়। অভিযোগ, বাংলা-মাধ্যম স্কুল সম্বন্ধে শিক্ষা-নিয়ামকদের আগ্রহ তারপরেই কমে যায়।

এই অভিযোগ সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, ঘটনা হল গত ২৫ বছরে এ রাজ্যে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে শহরাঞ্চলে (বিশেষত কলকাতায়) বাংলা-মাধ্যম স্কুল উঠে যাচ্ছে। অবশ্য তার একটা কারণ, কলকাতা থেকে বাঙালি পরিবারগুলি ক্রমশ মফস্‌সল-অভিমুখী হয়ে পড়ছে। এও সত্য শহরতলীতে তো বটেই গ্রামাঞ্চলেও ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের চাহিদা বাড়ছে। আর একদিকে, মফস্‌সলে বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলি ছাত্রভারে ভেঙে পড়ছে। তার কারণ স্কুল-উপযোগী বয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা গত ২৮ বছরে যে-হারে বেড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে শিক্ষক : ছাত্রের হার ঈপ্সিত ১ : ৪০ রাখা সম্ভব হয়নি। তার ওপর সরকারি নির্দেশ হল কোনো শ্রেণিতে ৮০-র বেশি ছাত্র-সংখ্যা না-হলে নতুন সেকশন খোলা যাবে না। অস্যার্থ ১৫৯ জন ছাত্রছাত্রীকে একটি সেকশনেই বসাতে হবে।

বাস্তবে অনেক মফস্সল স্কুলেই ছাত্র-সংখ্যা এক-একটি সেকশনে ২০০-র বেশি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি—দাঁড়িয়েছে। কিছু স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসে মাইক্রোফোন ব্যবহার করছেন। কোনো কোনো স্কুলে ৪০ মিনিটের পিরিয়ড ছাঁটাই করে ২৫ মিনিট করা হয়েছে, আবার কোথাও পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুল রোজ না এনে একদিন অন্তর-অন্তর আনা হচ্ছে। এমন অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্লাস কামাই করে কোচিং বিপণিতে ভিড় করার প্রবণতা বাড়ছে।

এই অবস্থার আশু উন্নতির সম্ভাবনা কম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়োজনে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, ইউনিসেফ-এর বদান্যতায়, একটি রাজ্য জুড়ে সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে এই মুহূর্তে আমাদের ১০,০০০ প্রাথমিক স্কুলের ঘাটতি আছে। আর একদিকে, নির্ভরযোগ্য বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে ঘাটতি ২০০০ স্কুলের। অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর মিলে এখনই মোট ৮০,০০০ শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা দরকার। এত বিদ্যালয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের কই? দ্বিতীয়ত, অর্থ থাকলেও কাজটা এক-দুই-তিন বছর দূরের কথা, আগামি ১০ বছরেও করা সম্ভব নয়। এমন পরিকাঠামো ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়, রাতারাতি সেরে ফেলা যায় না। খেয়াল করে দেখুন, ১০ বছরে ১২০০০ স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়—৮০,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়া তো পরের কথা।

আবার অর্থাভাব এত তীব্র যে গত বছরের রাজ্য বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৪৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৩ শতাংশ করা হয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' চালু হয়েছে। এই সুযোগে সব স্কুল-উপযোগী ছেলেমেয়েকে স্কুলে ধরে রাখতে 'বদ্ধপরিকর' বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যে কয়েকবছর আগেও স্কুল বহির্ভূত ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। এখন সেটা ১০ লক্ষে নামিয়ে আনা হয়েছে—এদেরও অবিলম্বে স্কুলে আনা হবে। সে-জন্য ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা বেতনে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক (প্যারা টিচার) নিয়োগের কাজ চলছে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক স্কুলেও শূন্যপদ পূরণ করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাজার চারেক টাকা বেতনে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগও হচ্ছে।

এত কম বেতনে নিষ্ঠাবান সুশিক্ষক তৈরি করা যায় কি না সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল : এত দ্রুত গড়ে তোলা শিক্ষাব্যবস্থা কি কার্যকর হয়—হতে পারে? আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দ্রুত-গড়া শিক্ষাব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়—তা শিক্ষার মানও নামিয়ে দেয়।

সতর্ক দৃষ্টির অভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মান অবনত হয়েছে সে-কথা সবাই স্বীকার করেন। এই ক্ষেত্রে মাত্র পাঁচ বছরে অনেকগুলি এনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট তৈরি হয়েছে—ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে। এই সব ইন্সটিটিউটের কয়েকটিতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হননি, প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে

যন্ত্রপাতিও অপ্রতুল—এমন অভিযোগ ব্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাভাবের দরুন লক্ষ লক্ষ টাকার 'ক্যাপিটেশন ফি' নিয়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ৬৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাদের আসন বাতিল হয়ে গেছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আবারও বোঝা যাচ্ছে তিন দশক ধরে জমে ওঠা সমস্যার কোনো আশু সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের ধৈর্য ধরে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু কাজের অভিমুখিনতা সেদিকে বলে মনে হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়ানো এবং প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্সি সহ আরও কিছু কলেজকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়ার আয়োজনও চলছে বলে শোনা যাচ্ছে। এই সংকেত শুভ। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিক্ষক নিয়োগ সম্পূর্ণত মেধা ভিত্তিক না করলে পুনর্গঠনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

শিখজাতি ও ধর্ম

অর্জুনদেব সেনশর্মা

'নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না।... । কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।" [বীরগুরু, *বালক* : শ্রাবণ—১২৯২ রবীন্দ্রনাথ।]

'শিখদের যাহারা নায়ক ছিল তাহারা [এই] কৃতকার্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। "...যতো ধর্মস্ততোজয়ঃ" এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল। ...আজ শিখের মধ্যে আর-কোনো অগ্রসর-গতি নাই। ...মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে তাহারা কেবল বারিকে বসিয়া কুচ-কাওয়াজ করিবে এজন্য নানক জীবন উৎসর্গ করেন নাই।'

[শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ : *প্রবাসী* : চৈত্র—১৩১৬ রবীন্দ্রনাথ]

এই দুটি উদ্ধৃতির বৈপরীত্যময় পারম্পর্যর মধ্যেই শিখ ইতিহাস নিহিত রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে—শিখ ধর্মের ইতিহাস এবং শিখ জাতির ইতিহাস মূলত সমান্তরাল। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত ইতিহাস একটি ধর্মনির্ভর গোষ্ঠীগত জাতির ইতিহাস হতে পারে না।

বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ এবং জৈনধর্মের প্রায় সম্পূর্ণ অবসানের পর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ শুরু হয় ভারতবর্ষে। কিন্তু নবাগত ইসলামের প্রতিস্পর্ধী অবস্থান হিন্দুধর্মের বহুদেববাদকে মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে থাকে অষ্টম শতাব্দী থেকেই। পাশাপাশি বেদান্তের চর্চার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। এরই ফলে একেশ্বরবাদী ধর্মের একটা রূপ হিন্দুধর্মের ভিতর থেকেই তৈরি হয়ে উঠতে চাইছিল। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের এই রূপ পরিবর্তনের তাগিদ—সামাজিক রূপ পরিবর্তনের তাগিদ থেকেই উঠে এসেছিল।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, রামানন্দের জাতিভেদ বিরোধিতা, কবীরের মূর্তিপূজা বিরোধিতা ও আচাররিক্ততা এই সবেরই প্রেক্ষিতে লুথারের সমকালীন নানকের অবস্থান (জন্ম ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)। নানক ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রি) পরিবারের সন্তান ছিলেন,—ধর্মের ইতিহাসে এই তথ্যটুকুই গুরুত্বপূর্ণ—এই কারণেই যে ক্ষত্রিয়রা চিরকালই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে প্রবল প্রতিস্পর্ধী ও বিনম্র পৃষ্ঠপোষকের দ্বৈত ভূমিকায় দোলায়িত থেকে গেছেন। নানক ও তাঁর অনুগামীরা বিরুদ্ধতারই উত্তরাধিকার স্বীকার করেছিলেন। সেইজন্যই

বিদেহ রাজ জনককে নিজেদের আদিপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন—এই নতুন ধর্মসম্প্রদায়—কারণ ঐ জনকেরও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষণা ও প্রতিরোধের দ্বান্দ্বিকতায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের ব্যবহারগত উদারতা, স্পষ্টজীবিতাকে শিখ ধর্মনেতাগণ প্রথম দিকে গুরুত্ব দিলেও শেষ অবধি ক্ষত্রিয়দের প্রয়োজনমুখী যোদ্ধৃত্বই শিখধর্মের পরিণতি হয়ে দাঁড়াল।

নানক, নানকের দুইপুত্র, নানকের গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা, অঙ্গদের প্রতিষ্ঠা, অঙ্গদের গুরুমুখী লিপির প্রবর্তনা, নানকের বাণীর স্মৃতিবাহিত সংরক্ষণের প্রয়াস, নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের উদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, বহুজাতিক পঙ্‌ক্তি ভোজনের প্রবর্তন, গুরু উমারদাস, গুরু রামদাস, ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের আকবরের স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান, রামদাসের পর গুরু বংশক্রমে রক্তঘটিত বংশধারার অনুপ্রবেশ, গুরু অর্জনদেব, তাঁর দ্বারা গ্রন্থসাহিবের প্রাথমিক রূপের বিন্যাস সাধন ও সম্পূর্ণতা দান, গ্রন্থসাহিবকে আকবরের অনুমোদনক্রমে ঈশ্বরত্ব ও 'গুরুত্ব' দান, অর্জনদেবের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের সম্পর্কের অবনমন, নিপীড়ন ও অর্জনের মৃত্যু, গুরু হরগোবিন্দর সময় থেকে তরবারির গুরুত্ব, শিখজাতির যোদ্ধৃজাতিতে রূপান্তর, মাংস ভক্ষণের সূত্রপাত, হরগোবিন্দর কারাবাস, হরগোবিন্দর শাহ্‌জাহান-বিজয়, গুরু হরবাই, গুরু হরকিষেণ, গুরু তেগবাহাদুর এবং অবশেষে গুরু গোবিন্দ সিংহ। গোবিন্দর বাই উপাধি পরিত্যাগ, সিংহ উপাধি ধারণ, বিশুদ্ধার্থক 'খালসা'—এই নামপ্রতীকে শিখগোষ্ঠীর নবপরিচয়, যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পহাল দীক্ষার প্রবর্তন, পঞ্চ-র তাৎপর্যপূর্ণ বাহ্যপ্রতীক যোজনা, শিখদের মধ্যে জাতিগত সাম্যের সম্পূর্ণ প্রচলন, গুরু গোবিন্দের মৃত্যু, গুরুবাদের অবসান, বান্দার নেতৃত্ব, শিখদের মুঘল এবং পাহাড়ী হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য, বান্দার মৃত্যু, ফারুখ শিয়ারের অনুদান, শিখ যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ের পঞ্চক্রম ও অষ্টক্রমিক বিন্যাস, অকালি বা গ্রন্থীদের প্রাধান্য, অকালতখ্‌তের প্রাধান্য লাভ, রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব—শিখজাতির নামে মুদ্রা প্রচার, শিখধর্মকে রাজ্যের জাতীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান—১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের আগে পরে পর্যন্ত শিখধর্ম ও জাতির ইতিহাস এই রকমই। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই সব ধর্মমতের মতোই শিখধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও কারা গুরু নানকের মতাদর্শের সব থেকে বেশি অনুগামী সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। ফলে অকালিদের প্রভাব কমা, সেবাপন্থিদের উত্থান, নিরঞ্জনী নিমিরহংকারী প্রমুখ নানা গোষ্ঠীর উত্থান, গোষ্ঠীগুলিরই ক্রমশ শিখজাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ—এই সবই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেছে। এরপরে রয়েছে শিখ যুদ্ধের পর্ব—নানা পতন অভ্যুদয়ের পরে ইংরেজের সঙ্গে পাঞ্জা কষা—১৮৪৫ এবং ১৮৪৮।

এই ইতিহাসের পথেই জাঠ জাতির শিখ ধর্মাবলম্বীরা শিখ যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত হল। কিন্তু একদিন 'ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁর সুখের উপায় কী?' নানকের এই প্রাথমিক প্রশ্ন থেকে এই ধর্মগোষ্ঠীর সূত্রপাত হয়েছিল। নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর তাঁর উপাস্য ছিলেন। কোরান বা পুরাণ তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি—এ কথা বলা হলেও চৈতন্যস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের ধারণা তাঁর ঈশ্বর চিন্তার মূলে থাকা স্বাভাবিক। নানক

নিজেকে কখনো অবতার বলেন নি—বলেছেন 'আজ্ঞাবাহী ভৃত্য' মাত্র। আরবের পয়গম্বর ও পবিত্র পুরুষদের ও হিন্দু অবতারদের তিনি সমান শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এমনকি শিখ যোদ্ধৃজাতির জনক নানক একথাও বলেছেন—'এক ঈশ্বরবাক্য ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র সাহায্যে যুদ্ধ কোরো না।' কিন্তু লক্ষণীয় এই জাতিই পরে শস্ত্রনির্ভর যোদ্ধায় পরিণত হল। একই সঙ্গে বেদবাদী ব্রাহ্মণ্যধর্মর বিরোধিতা করেও শেষত আরেকটি ধর্মগ্রন্থনির্ভর হয়ে পড়ল।

নানকের হাতেই জাতিভেদপ্রথার মূলে আঘাত শুরু হয়—গোবিন্দ সেই ভিতের উপরেই খালসা-শিখ ধর্মের সাম্যপ্রথা গড়ে তোলেন। তার দৃঢ় সাম্য প্রথা ও চার জাতির পঙ্‌ক্তি ভোজন রীতি প্রবর্তিত করার প্রয়াসে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিষ্য সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে। গোবিন্দসিংহ শিখদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার পর বান্দার সময়ে শিখ সমাজে কিছু আলোড়ন উপস্থিত হয়। বান্দা হিন্দুধর্মের কিছু রীতি শিখ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করতে চেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন। বান্দার মৃত্যুর পর বিধর্মীদের অত্যাচারে অনেক শিখের মৃত্যু হয়, অনেকে হিন্দু হয়ে যান, অনেকে আত্মগোপন করেন। আর দুশ বছর পর শিখধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। নানকের একটি ক্ষুদ্র শিষ্য সম্প্রদায় এইভাবেই একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। তার চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই এখনো বিবর্তিত হয়ে চলেছে। তবে নানকের শিষ্য সম্প্রদায় যে আরেকটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মাত্র না হয়ে একটি বৃহৎ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে—তার জন্য গুরু উমার দাসের গৃহীত পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়।

স্বাধীনতার পর শিখজাতির ইতিহাস—ভারতের রাজনীতির নানা অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অপারেশান ব্লুস্টার, ইন্দিরা গাঁধী হত্যা ও শিখবিরোধী দাঙ্গার প্রসঙ্গ মনে পড়ে। তবে তারই সঙ্গে পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী শিখদের আশাতীত ব্যবসায়িক সাফল্য, ভারতের অর্থনীতিতে তাঁদের সাফল্যময় যোগদান, দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের পরিশ্রমী আত্মনিয়োগ—ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁদের যোগদানের পাশেও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

শৈলী

বিপ্লব চক্রবর্তী

শৈলী শব্দটি রীতি বা স্টাইল অর্থে প্রযুক্ত হয়। কোনো লেখক বা শিল্পীর নিজস্ব রচনা-বৈশিষ্ট্যকে শৈলী রূপে চিহ্নিত করা যায়। সমষ্টিগতভাবেও কোনো একটি শৈলী সাহিত্য বা শিল্প রচনায় অনুসৃত হতে পারে। আবার যুগগতভাবেও কোনো শৈলী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শৈলী বা স্টাইল শব্দের নানা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নানাভাবে ব্যাখ্যাত হলেও প্রধানত কোনো রচনার স্বভাব-লক্ষণকেই শৈলী বলা হয়েছে। ভাষা ও উপাদান ব্যবহারের ওপর শৈলী নির্মাণ অনেকটাই নির্ভরশীল। এইজন্য শৈলী বিশ্লেষণ করার অর্থ হল কোনো রচনার নির্মাণরীতি বিশ্লেষণ।

সাহিত্যিক শৈলী-নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা হল—১. শব্দ প্রয়োগ, ২. বাক্য নির্মাণ, ৩. অর্থ প্রয়োগ, ৪. ধ্বনি ও ভাব সংযোগ। এইগুলিই যে কোনো রচনা নির্মাণের স্তম্ভ স্বরূপ। কারণ এগুলির ওপর নির্ভর করেই কোনো রচনার সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এই সৌন্দর্য আসলে উপাদান ব্যবহারের শৃঙ্খলা ও ফলপ্রদ ঐক্যবোধের ফল। তার সঙ্গে জড়িত থাকে লেখক বা শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান ও ভারসাম্যবোধ। তখন এক নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি শিল্পের আকার নেয়। এইভাবে যে কোনো কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

প্রকাশভঙ্গি ও ভাষাপ্রয়োগের সঙ্গে শৈলী নির্মাণের সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর। লেখক কী ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই শব্দপ্রয়োগ ও বাক্য ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন করা দরকার। এই প্রয়োগগত পার্থক্যের ফলে কোনো রচনা সহজ ও অনাড়ম্বর মনে হতে পারে আবার কখনো তা নাও হতে পারে। অর্থ প্রকাশের তারতম্য, অলংকার প্রয়োগ, ব্যঞ্জনা সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলোও শৈলী অনুধাবনের সহায়ক। সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, অবন্তী, মাগধী প্রভৃতি বিভিন্ন রীতিতে রচিত রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। মূলত অঞ্চলভেদে এই রীতিগত পার্থক্য নির্ণীত হত। তবে শব্দ প্রয়োগ, অলংকার বৈচিত্র্যও রীতিগত পার্থক্যের মূলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যেমন, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের বহুলতার সঙ্গে অতিশয়োক্তি ও অন্যান্য অলঙ্কারের প্রয়োগ ছিল গৌড়ী রীতির বৈশিষ্ট্য।

শৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক কোন শৈলী বেছে নেবেন বা প্রয়োগ করবেন তার সঙ্গে লেখকের নিজস্ব পছন্দ বা তার মানসিক প্রবণতার সম্বন্ধ সুগভীর। লেখকের নিজস্ব

পছন্দ তাই শৈলী বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের সব রচনার ক্ষেত্রে একই ধরনের পছন্দ বা বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের অভিন্ন রীতি একই রকম নাও হতে পারে। তবে একজন লেখকের বিভিন্ন রচনায় লেখকের ভাষা ব্যবহারের যে সব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা সংশ্লিষ্ট লেখকের ভাষা শৈলী বোঝার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকে সাহিত্য নির্মাণের নানা উপাদান। কাহিনি বা চরিত্র নির্মাণে লোকজীবন বা ইতিহাসের নানা উপাদান সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কবিতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কবির ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতা কবিতার উপাদান হয়ে উঠতে পারে। উপাদান যেমনই হোক না কেন তার প্রয়োগ-কৌশল বা দক্ষতার ওপরই শৈলী নির্মিত হয়। কোন উপাদান কীভাবে ব্যবহৃত হয়ে ভাষায় রূপ লাভ করেছে তা লেখকের বাচনক্রিয়া বা প্রয়োগ-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে ভাষা ব্যবহারকারীর বাচনক্রিয়া সাহিত্যে শৈলী নির্ণয়ের সহায়ক।

আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট শৈলী হল লোকাভরণ। আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকাভরণ শৈলীর বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং পরবর্তী অনেক কবির রচনায় লোকাভরণ শৈলীর উদাহরণ রয়েছে। এই শৈলীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কবিতা বা কাব্যের নির্মাণে লোকোপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। একই লোকোপাদানকে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাব্যশরীরী করে তুলেছেন। তাই লোকাভরণের প্রকারগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'—এই বহুশ্রুত লোকোপাদানটির উল্লেখ করা চলে। বিভিন্ন কবি এই একই উপাদানে কখনো বাক্যান্বয়ী কখনো ভাবান্বয়ী আবার কখনো অন্য ধরনের লোকাভরণ সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নতুনকাল' (*সেঁজুতি*) কবিতায় এই উপাদানটি পাদপূরক লোকাভরণ রূপে ব্যবহৃত। আবার বিষ্ণু দে (টপ্পা-ঠুংরি), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (মধ্যিখানে চর), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (সাঁকো) প্রমুখ কবিরা ঐ একই লোকোপাদানকে কখনও বাক্যান্বয়ী লোকাভরণ শৈলীতে কখনও বা ভাবান্বয়ী লোকাভরণ শৈলীতে ব্যবহার করেছেন। সর্বত্র লোকোপাদানই শৈলী নির্মাণের নিহিত উপাদান।

শৈলী আলোচনায় শৈলীবিজ্ঞানের উল্লেখ অনিবার্য। সাহিত্যের শৈলী বিশ্লেষণে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেছে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বস্তুত এই শতকের তৃতীয় দশকের পর থেকে 'লিঙ্গুইসটিক স্টাইলিস্টিকস' ক্রমেই জনপ্রিয় হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী সোস্যুর মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ভাষার এলোমেলো রূপ এবং সুবিন্যস্ত ভাষারূপের পার্থক্য নির্দেশ করেন। পরবর্তীকালে নোয়াম চমস্কি নির্দেশিত ভাষার আদর্শ ও বাস্তবরূপের বিভাজনে তা নতুন মাত্রা পায়। চমস্কি ভাষাশৈলীকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় দিক থেকেই দেখাতে চেয়েছেন। ফলিত ভাষা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে শৈলীচর্চা ও বিশ্লেষণও আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চমস্কি উদ্ভাবিত বাক্যের অন্বয় ও তার রহস্য উন্মোচনের পদ্ধতি শৈলীচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জেলিং হারিংস, রোমান ইয়াকসন প্রভৃতি অন্যান্য ভাষা বিজ্ঞানীদের অবদানও বিষয়টির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

যে কোনো সাহিত্যকর্মের রসোপলব্ধিতে শৈলীগত অনুধাবন বিশ্লেষণ অনিবার্য। আধুনিককালে সাহিত্য বিশ্লেষণ তথা সাহিত্যের শৈলী বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সাহিত্য ও ভাষার আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তাই শৈলী আলোচনায় তুলনামূলক ও আন্তঃক্ষেত্রীয় বিবেচনার প্রয়োজন ও সুযোগ রয়েছে। একালের বাংলা শৈলী আলোচকদের অনেকেই তুলনামূলক শৈলী আলোচনায় উৎসাহী। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে শৈলী বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। এদেশে, ওদেশে, সর্বত্র।

শ্রেণি

অনীক চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসে এমন কোনো সমাজব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে সামাজিক বিভাজন বা সামাজিক স্তরবিন্যাসে পুরোপুরি অনুপস্থিত। সম্ভবত সে কারণেই সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোচনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে class বা শ্রেণি তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রেণি সামাজিক বিভাজনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। সেই অর্থে শ্রেণি একটি সামাজিক-সমাজতাত্ত্বিক ধারণা। খুব সহজ ভাষায় 'শ্রেণি'কে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে : সামাজিক বিভাজনের স্তরে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যার সদস্যরা একই ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানে বিরাজ করে। শ্রেণির অন্তর্গত সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কমবেশি একই পর্যায়ের। তত্ত্বগতভাবে শ্রেণি Caste বা জাতির মত আবদ্ধ জনগোষ্ঠী নয়। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শ্রেণি একটি যুক্ত জনগোষ্ঠী যেখানে সদস্যদের ঊর্ধ্বমুখী (Vertical) পার্শ্বমুখী (Horizental) সচলতার সুযোগ রয়েছে। তবে তত্ত্বগতভাবে একথা সত্যি হলেও, প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তির শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য নয়। যদিও মনে করা হয়, অত্যাধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে শিক্ষা, অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদি একজন ব্যক্তির শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তনে সাহায্য করে।

Class বা শ্রেণি ধারণাটির উৎসস্থল প্রাচীন রোম। যতদূর জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সারভিয়াস তুলিয়াস (Servius Tullius) (৫৭৮-৫৩৪ খৃঃ পূঃ) নামে জনৈক রোমান রাজা অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সেনাগোষ্ঠী (Classis) গঠন করেন এবং সেই সেনাদের তাদের নিজস্ব ধনসম্পত্তি (অর্থাৎ নিজস্ব অশ্ব, অস্ত্র ইত্যাদি) জোগান দেবার ক্ষমতা অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তবে ইতিহাস অনুসারে সমাজজীবনে শ্রেণির প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রিস ও মেসোপটেমিয়াতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। প্রাচ্যে, ভারতবর্ষ ও চীনে, শ্রেণির জন্ম হয় সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে। (তথ্যসূত্র : *মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, শোভনলাল দত্তগুপ্ত)।

যে সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী শ্রেণির অবস্থান ও গুরুত্ব নিয়ে অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে আসে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর নাম। যদিও একথা মনে করলে ভুল হবে যে শ্রেণিসংক্রান্ত তত্ত্বের জনক হলেন মার্ক্স ও

এঙ্গেলস্। মার্ক্স নিজেই জানিয়েছেন যে তাঁর পূর্বসূরিরা অনেকেই সমাজে শ্রেণির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং শ্রেণির ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ৫ মার্চ ১৮৫২ সালে জোসেফ ভাইডেমাইয়ারকে একটি পত্রে মার্ক্স লিখেছিলেন যে সমাজে শ্রেণির অবস্থানকে চিহ্নিত করার কৃতিত্ব তাঁর ছিল না। তাঁর পূর্বে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো সমাজে শ্রেণির অবস্থান চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও 'Restoration' যুগের একাধিক ফরাসি ঐতিহাসিক, Thierry, Guizot, Mignet—প্রমুখ, সমাজে শ্রেণির অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। (তথ্যসূত্র : *মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, শোভনলাল দত্তগুপ্ত)। তবে এঁদের কারোর আলোচনাই মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর মতো পূর্ণাঙ্গ, গভীর ও ব্যাপক ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই আধুনিক শ্রেণিতত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর শ্রেণি বিশ্লেষণ সামাজিক উৎপাদন নির্ভর। তাঁদের মতে, সামাজিক উৎপাদন যতদিন সমাজের সমস্ত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাত এবং উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করত না, ততদিন সমাজে শ্রেণি বিভাজন ছিল না। তাঁদের মতে কেবলমাত্র 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ'ই শ্রেণি-নিরপেক্ষ ছিল। যেদিন থেকে সামাজিক উৎপাদন উদ্বৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিল, সেদিন থেকেই সমাজে শ্রেণিবিভাজনের সূত্রপাত। তাই 'দাস সমাজ ব্যবস্থা'য় যে শ্রেণি পার্থক্যের সূত্রপাত, পরবর্তী সমাজগুলিতে সেই পার্থক্যই তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজ'-এ শ্রেণি বৈষম্য ছিল প্রকট, তবে সেই বৈষম্য চূড়ান্ত শ্রেণি দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে 'পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা'য়। মার্ক্সীয় মতে, সমাজে শ্রেণির অবস্থান নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে। বৈরসম্পর্ককেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় (দাস, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ) উৎপাদনের উপকরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু একটি ব্যক্তিগোষ্ঠী সংখ্যাগুরু মানুষের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদকে করায়ত্ত করে। এই পদ্ধতিতে জন্ম নেয় শোষণ। সংখ্যালঘুর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমকে আত্মসাৎ করার পদ্ধতি, এবং সেই পদ্ধতিকে কায়েম রাখবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আইনকানুনের সৃষ্টির অপর নাম শোষণ। সুতরাং প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সমাজে সৃষ্টি হয় শ্রেণি বিভাজন, জন্ম নেয় শোষক এবং শোষিত শ্রেণি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, দাসব্যবস্থায় দাসদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে জোর করে আত্মসাৎ করত দাসমালিকেরা। সামন্ততন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাসদের Corvee প্রথার মাধ্যমে শোষণ করত সংখ্যালঘু ভূস্বামীরা। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা মুনাফা সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমকে আত্মসাৎ করে এবং তাদের শোষণ বজায় রাখে। সব কটি সমাজেই শোষক ও শোষিত শ্রেণির পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উপর ব্যক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে। সুতরাং, মার্ক্সীয়মতে বৈর উৎপাদন সম্পর্ক সমাজে সৃষ্টি করে শ্রেণি বৈষম্যের। বৈর উৎপাদন সম্পর্ক যে সমাজে যত তীব্র, সেই সমাজে শ্রেণি পার্থক্য এবং শোষণের মাত্রা ততই প্রকট। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শোষণ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এই তীব্র শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে

শ্রেণি সংগ্রাম,—যার মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। শ্রেণি সম্পর্কে মার্ক্সবাদী ধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় লেনিনের *A great Beginning* পুস্তিকাটিতে। লেনিনের মতে, 'শ্রেণি বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী অর্থনীতিতে নিজ অবস্থানের জোরে অপর কোনো গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম।'

সমাজবিভাজনের প্রশ্নে মার্ক্সীয় তত্ত্বকে অর্থনৈতিক নিয়ন্তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অ-মার্ক্সীয় আলোচকেরা। সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণে শ্রেণির ধারণার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ এবং শ্রেণিকে কেবলমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন অ-মার্ক্সীয় বিশেষজ্ঞরা। সামাজিক বিভাজন এবং শ্রেণি সম্পর্কে অ-মার্ক্সীয় মতবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber-এর মতবাদ। ওয়েবার সমাজবিভাজনের বিশ্লেষণে তিনটি নির্ধারকের কথা বলেছেন শ্রেণি (Class), মর্যাদা (Status) এবং ক্ষমতা (Power)। ওয়েবারের মতে, সমাজবিভাজনের প্রশ্নে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ অতি-সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। সামাজিক স্তরবিন্যাসকে কেবলমাত্র অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা, ওয়েবারের দৃষ্টিতে, অতিসরলীকরণ এবং সে কারণেই অসম্পূর্ণ। ওয়েবার এই অভিমত পোষণ করেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস শ্রেণি-নিরপেক্ষভাবেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তির 'মর্যাদা' ও 'ক্ষমতা' গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে একইস্তরে অবস্থান করেও একজন ব্যক্তি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক পরিচয়, মূল্যবোধ, জাত-পরিচয় প্রভৃতির ফলে সেই স্তরের অন্যান্য ব্যক্তি থেকে সামাজিক পদমর্যাদায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করতে পারেন। সুতরাং সামাজিক মর্যাদা, ওয়েবারের মতে, একধরনের আত্মিক সচেতনতা, যার দ্বারা স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। 'ক্ষমতা' বলতে ওয়েবার বোঝেন, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির দ্বারা অন্যান্যদের আচরণকে প্রভাবিত করবার কৌশল। শ্রেণির ভিত্তি যদি অর্থনৈতিক হয়, তবে 'ক্ষমতা'র ভিত্তি হল রাজনৈতিক। (রাজনৈতিক) ক্ষমতা কোনো জনগোষ্ঠীকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে তুলতে পারে। একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত হয়েও কোনো কোনো ব্যক্তি (রাজনৈতিক) ক্ষমতার দ্বারা সমাজে অধিক প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন। তাই ওয়েবারের মতে, ক্ষমতার দ্বারাও সামাজিক স্তরায়ণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মার্ক্সীয় শ্রেণিতত্ত্বকেও পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি ওয়েবার। শ্রেণিসচেতনতা প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। সমাজে বৈর উৎপাদনসম্পর্কই যে শুধুমাত্র শ্রেণিসচেতনতা গড়ে তোলে, ওয়েবার তা মনে করতেন না। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, পেশা, আয়ের উৎস প্রভৃতি উপাদান ব্যক্তির শ্রেণিসচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে বলে ম্যাক্স ওয়েবার বিশ্বাস করতেন।

পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার ওপর ওয়েবেরীয় বিশ্লেষণের প্রভাব আজও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত সামাজিক

স্তরবিন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রেণির বিকল্প নির্ধারক উপস্থিত করে চলেছেন পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা। পাশাপাশি শ্রেণির আলোচনাকেও উৎপাদন নিরপেক্ষ করে তোলার প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত। যেমন নিকোস পৌলানজ্রাস (Nicos Poulanztas) -এর মতে, শ্রেণি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ধারণা নয়, শ্রেণি সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং শ্রেণির ধারণাটি পুরো সামাজিক কাঠামোর জটিলতার মাপকাঠিতে বিচার্য হওয়া প্রয়োজন। র‍্যালফ্ ডাহ্‌রেনডর্ফ (Ralf Dahrendrof). আন্দ্রে ফিলিপ (Andre Phillip) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, মার্ক্সীয় শ্রেণিতত্ত্ব পশ্চিমি দুনিয়ার বর্তমান জনকল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের শোষণের যে চিত্র মার্ক্স-এঙ্গেলস্ এঁকেছেন, তা যথার্থ নয়। বর্তমানে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে শ্রমিকরাও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যবসায় অংশীদার হচ্ছে। তার ফলে শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব নয়, গড়ে উঠছে শ্রেণিসমন্বয়।

ওয়েবেরীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণি নিরপেক্ষ অন্যান্য নির্ধারকের সাহায্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণ করে চলেছেন পশ্চিমি সমাজবিজ্ঞানীরা। কোল, ওয়ার্নার, হেনার, নিউগার্টেন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী পেশা, জীবনধারার মান, আয়ের উৎস, বাসস্থান প্রভৃতি নির্ধারকের সাহায্যে সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্প্রতিককালেও শ্রেণির আলোচনাতে এসেছে অভিনবত্ব। পুঁজিবাদী সমাজে কেবল দুটি মুখ্য পরস্পরবিরোধী শ্রেণি নয়, চিহ্নিত হচ্ছে মূল তিনটি, পাঁচটি, এমনকী সাতটি শ্রেণিও। শুধুমাত্র উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই নয়, পেশা, আয়, জীবনযাপনের ধরন, বাসস্থান, ক্ষমতা প্রভৃতি উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। তাই কিছুদিন পূর্বেও আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে যেখানে চিহ্নিত হত তিনটি মূল শ্রেণি (উচ্চ, মধ্য, নিম্ন), অতি সাম্প্রতিককালে সেই সংখ্যা পাঁচ (উচ্চ, উচ্চ-মধ্য, মধ্য, মধ্য-নিম্ন, নিম্ন) ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে সাতটি শ্রেণিতে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিজ্ঞানীরা শিল্প-সমৃদ্ধ আধুনিক সমাজে যে সাতটি শ্রেণির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল : উচ্চ-উচ্চ, উচ্চ, উচ্চ-মধ্য, মধ্য, মধ্য-নিম্ন, নিম্ন, এবং নিম্ন-নিম্ন। শ্রেণির এইরূপ চিহ্নিতকরণ হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত উপাদান বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্ক্সীয় ধারা থেকে পৃথক হলেও শ্রেণির এইরূপ অতিসাম্প্রতিক আলোচনা যে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত এবং চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সংগীত—বাংলার লোকসংগীত

তপন রায়

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক সংগীতের সৃষ্টিকাল বলতে বৈদিক যুগকেই মনে করে থাকেন। চার বেদের মধ্যে 'সামবেদ'-কেই ভারতীয় সংগীতের উৎসরূপে ধরা হয়। কিন্তু বৈদিক যুগের শুরু 'ঋকবেদ' থেকে। 'সাম' শব্দের অর্থ সুর বা সুমিষ্ট স্বর। ঋকছন্দের ওপর সুর সংযোজন করে সামগানের বিকাশ। তাই স্বরযুক্ত ঋক বা সামের সমষ্টিই হল 'সামবেদ'। সামবেদ বা সাম-সংহিতা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ও ছোটো ভাগটির নাম 'আর্চিক'। দ্বিতীয় ভাগটির নাম 'স্তোভিক'। স্তোভ অর্থে প্রশংসা করা, অর্থাৎ দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশে প্রশংসাসূচক গানই স্তোভ। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য এবং উহ (রহস্যগান) এই চারটি গানভাগকে নিয়ে সামগানের গাথা গান বা সংগীতাংশ রচিত। গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয় গানই আদি বা মূল গান। মনে করা হয় এই গ্রামগেয় গান থেকেই বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব গান বা মার্গ ও মার্গ থেকে ক্রমশ ক্ল্যাসিকাল—অভিজাত দেশীগানের সৃষ্টি হয়েছে। উহ্য বা উহ গান এই গ্রামগেহ গান থেকেই সৃষ্টি হত। অরণ্যগেয় গান অরণ্যবাসী ঋতিক ও সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয় গান নির্দিষ্ট ছিল। গৃহবাসী গোষ্ঠী বা সাধারণ শ্রেয়কামীদের জন্য।

বিভিন্ন বেদের অনেকগুলি করে শাখা। পৃথক পৃথক শাখার সামগরা পৃথক পৃথক স্বরে সামগান করত। তাঁদের গানের প্রকৃতি ও শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ হত স্বরসংখ্যার প্রয়োগে। কেননা কেউ পাঁচ স্বরে, কেউ বা ছয় আবার কেউবা সাত স্বরে সামগান গাইত। আদিম ও অনুর্বর যুগে এক, দুই বা তিন স্বরযুক্ত গানের প্রচলন ছিল। সামিকযুগের গান ছিল মাত্র তিনটি স্বর যোগে। আর্চিকযুগে ছিল একটি মাত্র স্বরের ব্যবহার। এইভাবে ক্রমশ বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক, দুই বা তিন স্বর থেকে বৈদিক যুগে সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাতটি স্বর হল—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট, ও অতিস্বার। তবে এই সাত স্বরের বিকাশের সময় সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। সামগানে প্রকৃতি ও বিকৃতি স্বরের ব্যবহার ছিল। প্রকৃতি বলতে প্রধান ও বিকৃতি বলতে অনুষঙ্গী। বিকৃতি স্বর ছিল অনেকটা খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতিস্বরের মতো। কিন্তু কোমল নয়। সামিকযুগে ব্যবহৃত তিনটি স্বরকে—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই নামে চিহ্নিত করা হত। উদাত্ত ছিল সর্বোচ্চস্বর এবং অনুদাত্ত নিচু। কিন্তু

স্বরিত স্বরটির স্থান নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। সংগীতজ্ঞানীরা বলেন এই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যেই সাতটি স্বরের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন—উদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল গান্ধার ও নিষাদ ('গা' ও 'নি'), অনুদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল ঋষভ ও ধৈবত ('রে' ও 'ধা') এবং স্বরিত স্বরের অন্তর্গত ছিল ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম ('সা', 'মা' ও 'পা')।

এই সাতস্বরের সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার ক্রমবিকাশ আমরা লক্ষ করতে পারি। গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয়; সামগানের এই রূপটি থেকেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে উক্ত রূপটির ক্রমঃপরিবর্তিত ধারাটি গ্রাম্যগীতি বা গ্রামীণগীতি। যা একসময় পল্লীগীতি হিসেবেও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একাধিক গ্রামীণ গান পরবর্তীকালে রেকর্ডের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনমানসের কাছ থেকে উঠে আসে আধা শহুরে বা শহুরে জনমানসে। শুধু রেকর্ডের মাধ্যমেই বা কেন বলি, আকাশবাণীর মাধ্যমেও এই গান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এইভাবে এক অঞ্চলের গানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে অন্য অঞ্চলের মানুষ খুব সহজেই। যা আগে কখনোই এভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই পথেই গ্রামীণ গীতি নিয়ে ভাবনাচিন্তার বিকাশ ঘটতে শুরু হয়ে যায় এবং তাতে গ্রাম্যগীতি বা পল্লীগীতির বিস্তারলাভ ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। আর এই গানের সীমানা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্পীর কণ্ঠ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাঁদের মধ্যে—আব্বাসউদ্দীন, নায়েব আলী, গিরীন চক্রবর্তী, গৌরী কেদার চক্রবর্তী, অনন্তবালা, সুরেন চক্রবর্তী, মিস্ হরিমতিসহ আরো অনেক অনেক শিল্পীর অবদান আমরা কখনোই ভুলতে পারি না। পল্লীবাংলার বিভিন্নধারার প্রচলিত গান উঠে আসে জনসমক্ষে যা আজও আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিশেষ করে তার কথার সরলতা এবং সুরের সাবলীলতা গ্রাম থেকে শহুরে মানুষের মন ছুঁয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। যার ফলস্বরূপ আমরা বড়ো জায়গায় বা উচ্চশিক্ষিত সমাজে গ্রামীণগীতি বা পল্লীগীতিকে প্রতিষ্ঠা পেতে দেখি। এর ফলে শিক্ষিত সমাজ পল্লীগানের অনুরাগী হয়ে ওঠেন বিশেষভাবে। এমন কি সেই ভূমিকায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতেও ভুল করি না। পল্লীসংগীতের অনুরাগী হয়ে তিনি বলেই ফেললেন—'নিঃসংশয়ে জানি বাউলগানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক।' রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার প্রকাশ আমরা অবশ্যই পরবর্তীকালে দেখতে পাই গ্রাম্যগীতি বা পল্লীগীতিতে। এই সময় থেকেই আস্তে আস্তে গ্রাম্যগীতি বা পল্লীগীতি কথাটাই বা এর আবেগটাই হারিয়ে যেতে বসে। আমরা নতুন এক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ফেলি এই গানগুলোর ক্ষেত্রে। এই সময় থেকেই শুরু হয় এই গ্রামীণ ঐতিহ্যের ক্রমন্বয় আধুনিকরণ।

গ্রাম্যগীতি বা পল্লীগীতি থেকে এবার এই সংগীতধারার নামকরণ হল লোকসংগীত। আর দ্রুত এই নাম শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল খুব অল্প সময়ের মধ্যে। যতটা কঠিন পথ ধরে গ্রামীণ এই ঐতিহ্য শহরের বা আধাশহরের জনমানসে উঠে এল ততটাই সহজ পথ বেয়ে লোকসংগীত শব্দটা বিস্তার লাভ করল। তাতে সমগ্র বাংলার ঐতিহ্যলালিত এই গানের কোনো মূল পরিবর্তন না ঘটলেও

মানগত বা গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলি—১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বহু মত বিনিময়ের পর আন্তর্জাতিক লোকসংগীত পরিষদ বা International Folk Music Council-Folk Song (যার বাংলারূপ লোকসংগীত) শব্দটির আমদানি ঘটায়। তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তারা এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। সেগুলো হল—ঐতিহ্য, উদ্ভাবন ও নির্বাচন। ইংরাজিতে Continuity. Variation ও Selection। এই তিনটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে—Continuity অর্থাৎ ধারাবাহিকতার সঙ্গে ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়টি জরুরি, Variation অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মূল বিষয় হচ্ছে উদ্ভাবন এবং Selection শব্দের সঙ্গে গ্রামীণ জনমানসের গ্রহণ করার প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়ে যায়। Folk Song বা লোকসংগীতের এই সংজ্ঞা নির্ধারিত হবার পর তা দ্রুতগতিতে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষে তখনকার সময় সব থেকে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম আকাশবাণীর একান্ত চেষ্টায় এই Folk Song বা লোকসংগীত ক্যাপশানটি শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। খুবই অবাক হতে হয়, যে গ্রামীণ মানুষের মুখে এতদিন পল্লীগীতি, গ্রাম্যগীতি শব্দটি ছিল এক নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ—তা অতি সহজেই তাঁরা ত্যাগ করে মুখে তুলে নিলেন Folk Song, বা লোকসংগীত শব্দটি। আকাশবাণীসহ কিছু কিছু রেকর্ড কোম্পানি গ্রামের এই ধারাকে Folk Song বা লোকসংগীত লেভেল দিয়ে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে কোনোরকম আর রাখঢাক রাখল না। গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার গান যেমন লোকসংগীত ক্যাপ্‌শানে বের হতে শুরু করল তেমনি পাশাপাশি শুরু হয়ে গেল শহুরে বা আধাশহুরে জনজীবনে বেড়ে ওঠা মানুষদের লেখা কিছু গান—যা লোকসংগীত নামেই প্রচার করানোর চেষ্টা। অবশ্যই গ্রামীণ সুরকে আশ্রয় করে, কখনো সখনো গ্রামীণ ভাবধারার প্রকাশ কথাতেও। সংজ্ঞা নিরূপণ যাই-ই হোক; আমাদের একান্ত গ্রামীণ অনুভূতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আস্তে আস্তে ঘরমুখী হতে শুরু করল এর ফলে।

আমাদের দেশীয় লোকসংগীতের মধ্যে বাংলা লোকসংগীতের যতগুলো ধারা আছে সেগুলোকে মূলত চারটি অঞ্চলভেদে ভাগ করা যায়। যেমন—পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ, উত্তরাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল বা পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণ বঙ্গ। পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববঙ্গের ধারাগুলোর মধ্যে মূল ধারাটি হল ভাটিয়ালি। তাছাড়াও সারি, জারি, ধামাইল, বিয়ের গান, মাইজভাণ্ডারী, মুর্শিদি, মারফতি, মালসী খাটু, গোষ্ঠের গান, কুব্জভঙ্গ, প্রভাতী, গীতিকা, পালাগান, আগমনী, বিজয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে পূর্ববঙ্গের সব গানের মধ্যে যে সুর মূলত আমরা পাই তা হল ভাটিয়ালি সুর। উত্তরাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গের ধারাগুলোর প্রধান ধারাটি ভাওয়াইয়া। এছাড়াও এই অঞ্চলে আমরা পাই—চটকা, ক্ষিরোল, দীঘলনাশা, পালাগান, জাগগান, মনসার গান, রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু আচার অনুষ্ঠানমূলক গান ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের গানের মধ্যে সুরগত তেমন তফাৎ আমরা পাই না। উত্তরবঙ্গেও ভাটিয়ালি সুরের প্রচলন অনস্বীকার্য। এই অঞ্চলের গান সুরের আকুতি ফুটিয়ে তোলার জন্য

ভাটিয়ালির মত উচ্চগ্রামে গাওয়া হয় না। ভাটিয়ালিতে ব্যবহৃত খাম্বাজ রাগের ব্যবহার এই অঞ্চলের গানে আমরা দেখতে পাই কিন্তু তা কোমল নিষাদ স্বরটি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এই অঞ্চলের অধিকাংশ গান মধ্যমকে জান করে বা মধ্যমকে 'সা' করে পরিবেশন করা হয়ে থাকে—কথা ও সুরের আকুতিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাই উত্তরাঞ্চলের গানে মাঝ খাম্বাজের ব্যবহার লক্ষণীয়। পশ্চিমাঞ্চল বা পশ্চিমবঙ্গের ধারাগুলোর মধ্যে মূল ধারাটি হল ঝুমুর। তাছাড়াও ভাদু, টুসু, রাঢ়ের বাউল, কুর্মি গান, হাপু গান, খন গান, ছড়া গান, এই অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিয়ের গান, মুসলিম বিয়ের গান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অঞ্চলের সব ধারার গানের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই ঝুমুর সুরের একটা নিজস্বতা। দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গের ধারাগুলোর মধ্যে মূলধারাটি—বনবিবির গান। এছাড়াও দক্ষিণ রায়ের গান, দাশু রায়ের গান, অষ্টক গান, দুখে কাহিনী, দক্ষিণবঙ্গের ভাটিয়ালি গান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অঞ্চলের গানের কথার মধ্যে অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য থাকলেও সুরের কোনো নিজস্বতা আমরা পাই না। এই অঞ্চলের সব গানের সুরের মধ্যে আমরা পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি সুরের সরাসরি প্রভাব বেশি লক্ষ করতে পারি। মাঝে মাঝে পশ্চিমাঞ্চলের সুরও আশ্রয় নিয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীর লোকসংগীতের দিকে তাকালে আমরা সুরগত একটা মিল কোথায় যেন খুঁজে পাই। যেমন আমার শোনা কিছু পাশ্চাত্যের বা মধ্যপ্রাচ্যের লোকসংগীতের মধ্যে আমাদের ভাটিয়ালি সুরের এবং ঝুমুর শৈলীর সুরের একটা মিল খুঁজে পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসংগীত নিয়ে যে সমস্ত মানুষ দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন তাঁরা অনেকেই যা মত প্রকাশ করেন তা থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে লোকসংগীতের সুরের ক্ষেত্রে হয়ত আমরা একসূত্রে কোথায় যেন বাঁধা। ভাষাগত মিল কতটা বা ভাবগত মিল কতটা পাওয়া যায় তা নিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে বলতে না পারলেও, ভাষা বিজ্ঞানীরা সেটা বলতে পারবেন এবং সেটা এই সময়ে ভীষণ জরুরিও বটে। তবে সুরগত বা স্বরগত মিলের একটা বড় কারণ কারোর কারোর মনে হয় সেই সাতস্বর। এই সাতস্বরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বা বাঁধা আছে প্রতিটি গানের সুরের প্রাণ ভ্রমরাটি। তা সে যে দেশেরই হোক না কেন। কারণ যে কোনো সুরকে ব্যাকরণগতভাবে গানে রূপ দিতে গেলেই আশ্রয় করতে হবে এই স্বরমণ্ডলীকে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই এই সৃষ্টির একটা সুরগত মেলবন্ধন ঘটবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ

উদয়কুমার চক্রবর্তী

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নানা সময়ে নানা ব্যাকরণের কথা বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানীগণ। সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ আধুনিক একটি ব্যাকরণের মডেল। বাংলাদেশে ইংরেজি 'Transformational Generative'-এর পরিভাষা হিসাবে 'রূপান্তরমূলক সৃজনধর্মী' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার সংবর্তনী-সঞ্জননী পরিভাষা ব্যবহার করতে চান। পাশ্চাত্যে সংবর্তনী ব্যাকরণ এবং অধোগঠন (Deep Structure) নিয়ে অনেকেই ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু, সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব নোয়াম আব্রাহাম চমস্কি (১৯২৮)-র গবেষণাতেই যথাযথ রূপ নেয়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই তিনি এ বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। নানা সময়ে লেখা কিছু কিছু বইয়ের নাম প্রথমে দেওয়া যাক।

১৯৫৫, *Logical Syntax and Semantics* (Language, Vol-31, pp. 36-45)

১৯৫৫, *The Logical Structure of Linguistic Theory* (mimeographed, MIT library, Cambridge Mass. / ১৯৭৫-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। Plenum, New York)

১৯৫৭, *Syntactic Structures* (সংক্ষেপে SS) The Ilague, Mouton.

১৯৬৫, *Aspects of the Theory of Syntax* (সংক্ষেপে *Aspects*), MIT Press, Cambridge, Mass.

১৯৬৮, *Language and Mind, Harcourt Brace Jovanovich, New York.*

১৯৮১, *Lectures on Government and Binding*, Foris, Dordrecht.

এই প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলিতে চমস্কি বাক্যের অন্বয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ভাষা ও মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ধ্বনিতত্ত্ব নিয়েও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন M. Halle-এর সঙ্গে।

১৯৬৮, *The Sound Pattern of English*, Harper and Row, New York.

১৯৫৭-তে প্রকাশিত *Syntactic Structures (SS)* গ্রন্থটি সারা বিশ্বে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে দেয়। ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান তিনটি মডেল এখানে

দেখালেন। বললেন, আমরা যখন কথা বলি তখন পছন্দ ও বাছাই-এর (Slot and Choice) মাধ্যমে শব্দগুলি নির্বাচন করি। তারপর একটি মগ্নবাক্য (Underlying Sentence) তৈরি করি। তারপর সেই মগ্ন বাক্যের অন্বয়গত কিছু পরিবর্তন ঘটে। একে সংবর্তন (Transformation) বলে। এইখানেই 'রূপস্বনিমগত সূত্র' (Morpho-phonemic Rule) প্রয়োগ করা হয়। তারপর তৈরি হয় চূড়ান্ত বাক্য—অধিগঠন (Surface Structure)। আর এভাবেই তিনি বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাক্য তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখালেন। SS গ্রন্থে তিনি যে তিনটি ব্যাকরণের মডেল দিয়েছেন সেগুলি হল—১. Finite State Grammar ২. Phrase Structure Grammar এবং ৩. Transformational Grammar। তিনি শেষ ব্যাকরণের মডেলটিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এখানে তিনি বললেন যে, পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মাধ্যমে বিশাল (কিন্তু নির্দিষ্ট) সংখ্যক মগ্নবাক্য। কিন্তু এই মগ্নবাক্যই বাক্য নয়। এরপর সংবর্তনসূত্র প্রয়োগ করা হবে। তখন আমরা পাবো বীজবাক্য (Kernel Sentence)। সংবর্তন দু' ধরনের ক. বাধ্যতামূলক খ. ইচ্ছামূলক। বাধ্যতামূলক সংবর্তনের মাধ্যমে পাবো বীজবাক্যটি। আর ইচ্ছামূলক সংবর্তনের ফলে পাব বীজবাক্য নয় এমন বাক্য। যেমন কর্তৃবাচ্য পাবো বীজবাক্য হিসাবে। যদি কর্তৃবাচ্যই মুখে বলি তবে বীজবাক্যই অধিগঠনে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু অধিগঠনে যদি কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্য ব্যবহার করি তাহলে বীজবাক্যকে ইচ্ছামূলক সংবর্তনের মাধ্যমে বীজবাক্য নয় এমন বাক্যে পরিণত করতে হবে। ফলে, অধিগঠনে যে বাক্য পাবো সেটি হুবহু বীজবাক্য নয়।

Aspects গ্রন্থে অর্থাৎ ১৯৬৫-র তত্ত্বে চমস্কি সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্বের একটি যথাযথ রূপ দিলেন। একটি রেখাচিত্র-র মাধ্যমে ব্যাকরণের মডেলটি দেখা যাক—

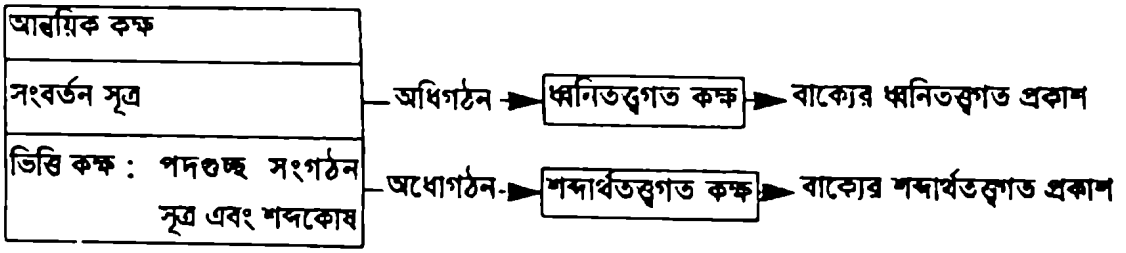

চমস্কি সঞ্জননী ব্যাকরণকে কয়েকটি নিয়মের পদ্ধতি বললেন। এই নিয়মগুলি প্রয়োগ করে আমরা অনির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্য পাই। তিনি তিনটি প্রধান কক্ষ (Component)-র কথা বললেন। এগুলি হল—আন্বয়িক কক্ষ, ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ এবং শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ।

বাক্যের বেশ কিছু বিমূর্ত গঠন বা নিয়ম আন্বয়িক কক্ষে থাকে। শিশু শুনে শুনে যে ভাষা শেখে সে সেই ভাষার আন্বয়িক নিয়মগুলি শিখে নেয়। আর সেই নিয়ম আসলে আন্বয়িক বিন্যাস। আন্বয়িক সূত্র দিয়ে তৈরি বাক্যের যে গঠন তা আসলে ধ্বনিশৃঙ্খল। ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষে থাকবে ধ্বনিতত্ত্বগত নিয়ম আর তার মাধ্যমেই উচ্চারিত হবে বাক্য। সে বাক্য আসলে ধ্বনিস্রোত বা ধ্বনিশৃঙ্খল। শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষে বাক্যের অর্থগত দিকটি দেখা হবে। আন্বয়িক কক্ষ প্রত্যেক বাক্যের আন্বয়িক নিয়ম দ্বারা তৈরি করা অধোগঠন-এর শব্দার্থতত্ত্বগত ব্যাখ্যা তৈরি করবে। আর সংবর্তনের মাধ্যমে সেই

অধোগঠনটি অধিগঠন হিসাবে প্রকাশিত হবে। অধিগঠন ধ্বনিতত্ত্বগত ব্যাখ্যা দেবে ও ধ্বনিশৃঙ্খল তৈরি করবে।

১৯৫৭ আর ১৯৬৫-র তত্ত্ব মিলিতভাবে সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণের একটি যথাযথ মডেল তৈরি করল। অধোগঠন থেকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিগঠন তৈরি হওয়াকে বলা হল—সঞ্জনন। আর সঞ্জনিত হবার আগে যে নানা ধরনের অদল বদল করা হয় তাকে বলা হল—সংবর্তন। এভাবেই এই ব্যাকরণকে সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ বলা হতে থাকল। ১৯৬৫-র তত্ত্বকে 'Standard Theory' বলা হতে থাকে। এখানে তিনি বেশ কিছু দ্বিবিভাজিত তত্ত্বর কথা বললেন। যেমন, বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিশেষ ব্যাকরণ, পারঙ্গমতাবোধ-ভাষা ব্যবহার, অধোগঠন-অধিগঠন, ব্যাকরণসম্মতবাক্য-গ্রহণযোগ্যবাক্য।

বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar বা UG)। *Language and Mind* (১৯৬৮) গ্রন্থে চমস্কি জানালেন, শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে আছে ভাষা এলাকা। সেখানে আছে ভাষা শেখার কৌশল (Language Acquisition Device বা LAD)। আর স্বাভাবিক ভাষায় সম্ভব অসম্ভব সমস্ত নিয়মই সেখানে আছে। এই নিয়মগুলির গঠন বিমূর্তগঠন। অর্থাৎ শব্দ বা ধ্বনি দিয়ে তৈরি উচ্চারিত বাক্য নয়। বংশধারার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে শিশু সম্ভাব্য নিয়মগুলি বারবার ব্যবহার করে ভাষা তৈরি করে। পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাকরণগত নিয়মগুলি প্রযোজ্য। তাই একে বৈশ্বিক ব্যাকরণ বলা হয়।

বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar বা PG)। বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ। যেমন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, হিব্রু ভাষার ব্যাকরণ, ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ ইত্যাদি।

পারঙ্গমতাবোধ (Competence)। ভাষা ব্যবহারকারীর মনের মধ্যে বা জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত মাতৃভাষা সম্পর্কিত পদ্ধতিগত ধারণা।

ভাষা ব্যবহার (Performance)। প্রকৃত বা বাস্তব ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার বা কথা বলা, শোনা, বুঝতে পারা ইত্যাদি।

অধোগঠন (Deep Structure)। একটি বাক্যের আন্বয়িক নিয়ম, শব্দার্থতত্ত্বগত নিয়ম এবং শব্দকোষ নিয়ে তৈরি গঠন হল অধোগঠন। অর্থাৎ বাক্যের কাঠামো বা আদর্শ গঠনকে অধোগঠন বলে। প্রত্যেক বাক্যের একটি করে অধোগঠন আছে।

অধিগঠন (Surface Structure)। অধোগঠনের বাক্যটি সংবর্তনের মাধ্যমে যে ধ্বনিশৃঙ্খল রূপে প্রকাশ পায়। সেই উচ্চারিত চূড়ান্ত রূপটিকেই অধিগঠন বলা হয়।

ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence)। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে যে বাক্য তৈরি হয়। পারঙ্গমতাবোধ বোঝার মাপকাঠি হল ব্যাকরণসম্মত বাক্য। ব্যাকরণসম্মত বাক্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

গ্রহণযোগ্য বাক্য (Acceptable Sentence)। যে বাক্য সহজে বোঝা যায় বা তৈরি করা যায়। উচ্চারণগত ত্রুটি বা আন্বয়িক ত্রুটি সত্ত্বেও যে বাক্য বুঝতে পারা যায়। যেমন 'আপনি কিছু বলবে না' ব্যাকরণসম্মত বাক্য নয় কিন্তু এটি গ্রহণযোগ্য বাক্য।

বাক্যের অধোগঠন থেকে অধিগঠনে সঞ্জনিত হবার ক্ষেত্রে বৃক্ষরেখাচিত্র ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় একই অধোগঠনগত বৃক্ষরেখাচিত্র তৈরি হবে না। এখানে বৃক্ষরেখাচিত্রগুলির প্রাথমিক চিত্র দেখানো হল।

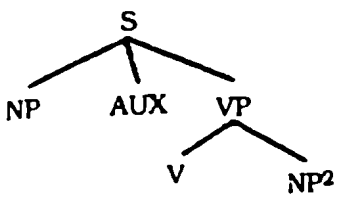

চমস্কি প্রদত্ত ইংরেজি বাক্যের গঠন।

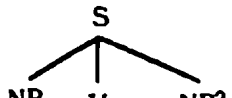

রস্, ল্যাকফ্ প্রমুখ প্রদত্ত ইংরেজি বাক্যের গঠন।

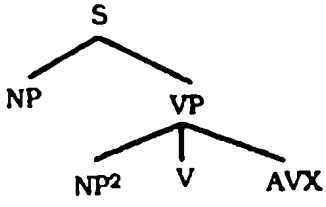

উদয়কুমার চক্রবর্তী প্রদত্ত বাংলা বাক্যের গঠন।

অধোগঠন থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে বাক্য সঞ্জনিত হচ্ছে তা একটি রেখাচিত্রর মাধ্যমে দেখানো হল।

অধোগঠন—➤

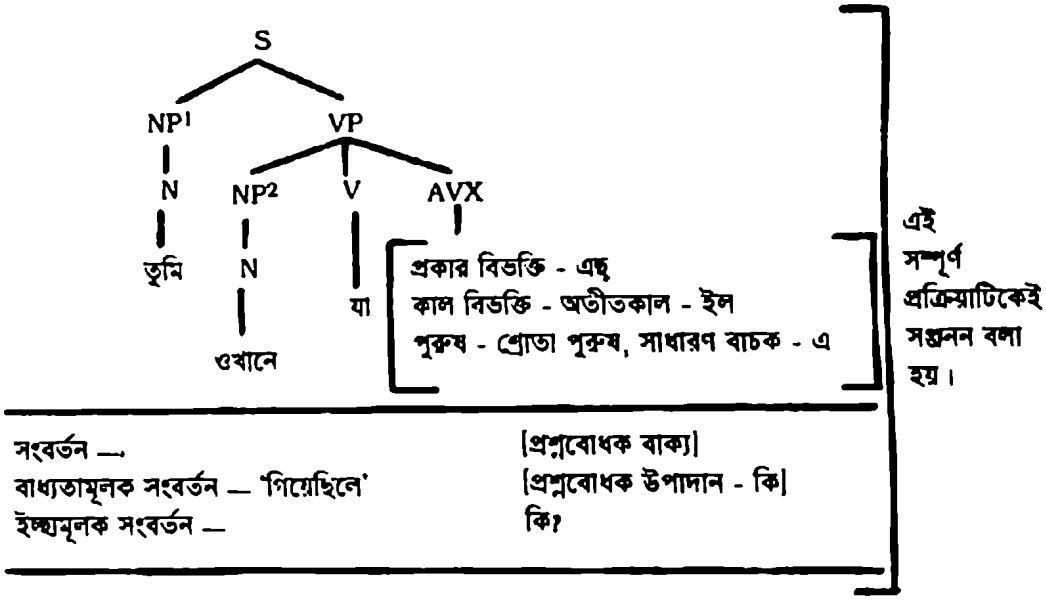

অধিগঠন—➤ তুমি ওখানে গিয়েছিলে কি?

পরিণাম অনুসারে সংবর্তন চার ধরনের। সংযোজন (Addition), বিলোপন (Deletion), রূপান্তরণ (Substitution) এবং বিপর্যাস (Extraposition)।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এ সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় Extended Standard Theory (EST)। এবং ১৯৮১-তে Government and Binding তত্ত্বকে বলা হতে থাকে Revised Extended Standard Theory (REST)

বাংলা ভাষার সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব নিয়ে বাংলা ভাষায় বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র সরকার, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র কয়েকটি।

সংবাদপত্র

দেবাশিস গুপ্ত

দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য সংবাদ সরবরাহ এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবেশিত সংবাদের বিশ্লেষণ। পাঁচ শতাব্দীর প্রাচীন মাধ্যম সংবাদপত্রকে তুলনামূলকভাবে অনেক অল্পবয়সী বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত চলচ্চিত্র, দ্বিতীয় দশকের বেতার এবং চারের দশকের দূরদর্শন জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্বের দিক থেকে এখনও অতিক্রম করতে পারে নি। আজ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মোট সতেরশ'র বেশি সংবাদপত্র প্রতিদিন ছাপা হয় কম করে সাড়ে ছ' কোটি।

ধাতু নির্মিত টাইপ আবিষ্কৃত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। খবর তার আগে প্রচারিত হত মুখে মুখে, চিঠির মাধ্যমে বা সাধারণ বিজ্ঞপ্তিতে। আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহের নিযুক্ত চর প্রতি প্রদেশে বা বড় শহরে খবর জোগাড় করে লিখিতভাবে হুজুরে হাজির করত। তেমন গোপনীয় রাজকীয় তথ্য না থাকলে এই সব সংবাদবাহী পত্র প্রকাশ্য রাজদরবারে পাঠ করা হত। ১৬০৯ সালের আগে সংবাদপত্রের অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায় নি। উত্তর জার্মানিতে মুদ্রিত প্রথম দিকের সংবাদপত্রগুলিকে বলা হত 'Cornatos'। News শব্দের উদ্ভব হতে লেগে যায় আরও অন্তত এক শতাব্দী। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে জার্মানিতেই কলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন এবং হামবুর্গ ছাড়া অস্ট্রিয়ায় ভিয়েনা, নেদারল্যাণ্ডে আমস্টারডাম এবং বেলজিয়ামের আন্টওয়েরপ শহরে সংবাদপত্র ছাপা হতে থাকে। আমস্টারডামের সংবাদপত্র ছিল দ্বিভাষিক। ইংরেজি এবং ফরাসিতে প্রকাশিত এই কাগজ হাত ঘুরে লণ্ডন শহরে ১৬২১ সালে এবং প্যারিসে ১৬৩১ সালে সেসব দেশের ভাষায় মুদ্রিত হতে শুরু করে। ১৬৪৫-এ প্রথম প্রকাশিত স্টকহম শহরে আদালত-সংক্রান্ত পত্র এখনও ছাপা হয়ে যাচ্ছে।

ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি খবরের কাগজ *The Weekly News*-এ (১৬২২-৪১) প্রথমে প্রধানত বিদেশী খবরাখবরই ছাপা হত। দেশী খবর যা প্রথম ছাপা হয় তা হল ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় বিবরণ। এগুলিকে বলা হত 'diurnals'। সপ্তদশ শতকের অনেকখানি জুড়ে সরকারি সেন্সর-শৃঙ্খলে আটকে পড়ে কুখ্যাত হতে হয় ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রকে। ১৬৪০-এ গৃহযুদ্ধ এবং অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালেও সংবাদপত্রের ওপর প্রশাসনের ছিল কড়া নজর যা অনেকটা শিথিল হয়

১৬৬০-এ দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের পর। সরাসরি সরকারের সমালোচনা না করলে সংবাদপত্রকে ঘাঁটানো হত না। এই চাপ, আমরা জানি, সংবাদপত্রকে আজও, বিভিন্ন দেশে, নানাভাবে, আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

১৭০২ সালে প্রকাশিত হয় ইংল্যাণ্ডের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র *The Daily Courant*।

এরপরে অনেকখানি এগিয়ে চলে আসা যাক ১৮৫৫-তে। সরকারি কর প্রত্যাখ্যানের পর খবরের কাগজের দাম কমে যায় অনেকখানি। স্বভাবতই ঘাটতি পড়ে এবং সেই সঙ্গে বাড়ে বিজ্ঞাপনের আমদানি এবং প্রভাব। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ সালে মার্কিন দেশে ঘটে গেছে খবরের কাগজের জগতের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। নিউইয়র্কের দু'টি সংবাদপত্র ওয়াশিংটন এবং বস্টন থেকে টেলিগ্রামে খবর আমদানির বিপুল খরচ সামলাতে একটি কার্যকর জোট বেঁধেছে। অবিলম্বে এই জোট পরিণত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদ সংস্থা Associated Press-এ। A.P. দ্রুত বেড়ে ওঠে ১৮৬১'র ঘরোয়া যুদ্ধের পর।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, খবরের কাগজের বাণিজ্যেও প্রতিযোগিতার ধাক্কায় এবং বিক্রি বাড়ানোর লড়াইয়ে জেতার জন্য এক বিশেষ ধরনের খাস্তা এবং মুচমুচে সংবাদ নির্মিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে Newyork World কাগজে জোসেফ পুলিৎজার আর *Sanfransisco Examiner* এবং *Newyork Morning Journal*-এ রানডল্‌ফ্ হার্স্ট-কে এই বিশেষ ধারাটির প্রবর্তকের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। খবরের কাগজে ভূরি ভূরি ছাপা হতে থাকে কেচ্ছা। ধারাবাহিক ছবিতে গল্প প্রকাশিত হতে শুরু করে। বেড়ে যায় ড্রইং-এর পরিমাণ। এই পত্রিকাগুলিতে বর্ণময় যেসব চিত্রকাহিনী ছাপা হতে থাকে তাদের মধ্যে একটি ছিল *The Yellow Kid*। কালক্রমে এই রগরগে সংবাদ পরিবেশনের ধারাটিকেই Yellow Journalism আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আমাদের নিজস্ব ধরনের অনুবাদে আমরা তাকে বলছি পীত সাংবাদিকতা।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের মাঝামাঝি লাইনো টাইপ বাজারে এসে যায়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপ সাজানোর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা, রোটারি প্রেসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ সংখ্যা বেড়ে গেছে হু-হু করে। এরপর বিংশ শতাব্দীর গোটাটাই প্রযুক্তিগত উন্নতির যুগ, অতি সাম্প্রতিক সেসব পরিবর্তন আমাদের পরিচিত।

বিংশ শতাব্দীতে সংবাদপত্রের আরেকটি বিশেষ ঘরানা ট্যাবলয়েড। মাপে সাধারণ খবরের কাগজের অর্ধেক এই ধরনের পত্রে সংবাদ পরিবেশনের গভীরতা ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে রাখা হয় এবং ছবির পরিমাণ অনেকটাই থাকে বেশি।

সংস্কৃতায়ন

কাঞ্চন সরকার

সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির স্বার্থে যখন নিম্নবর্ণ, উপজাতি ও অন্যান্য গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য প্রথার আচার-আচরণ, বিশ্বাস, আদর্শ ও জীবনযাত্রার রীতি গ্রহণ করে, তখন হিন্দু সমাজের এই সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে বলে 'সংস্কৃতায়ন'।

নানা কারণে এটি ঘটে থাকে। কোনো গোষ্ঠীর আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন, আশ্রম অথবা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংসর্গ হিন্দু সমাজের 'মহান ঐতিহ্যের' (Great Tradition) সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। তার ফল সংস্কৃতায়ন। এম. এন. শ্রীনিবাস (১৯৫২) এই ধারণাই তাঁর গ্রন্থে (*Religion and Society Among the Coorgs of South India*) ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত বর্ণাশ্রম প্রথার সমকালীন ও পুরাতন এই ধারা। উনবিংশ শতকে A. Lyall (১৮৮২) এবং H. H. Risely (১৮৯১) 'আর্যীকরণ' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে এর অনুরূপ। Milton Singer-এর মতে ভারতীয় সভ্যতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এটি সব থেকে সম্যক ও ব্যাপকভাবে গ্রাহ্য।

সংস্কৃতায়ন সামাজিক গঠনের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, বরং সামাজিক অবস্থানগত পরিবর্তন আনে। অর্থাৎ হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির কোনো পরিবর্তন এর ফলে হয় না। কিন্তু কোনো একটি জাতি বা বর্ণের ঊর্ধ্বমুখী সঞ্চালন (সামাজিক অবস্থানের) ঘটে। এই সামাজিক গতি অবশ্য অন্যভাবেও দেখা দিতে পারে, যেমন, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম, খ্রিষ্ট এমনকি নব্যবৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে। এছাড়াও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তার প্রতীক আদর্শকে পরিত্যাগের এবং প্রতিবাদের উদাহরণ আমরা পাই তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় কাঝাগাম, দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে।

পরবর্তীকালে (১৯৫৯) এম. এন. শ্রীনিবাস নিজেই তাঁর তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তন করেন। প্রতিপত্তিশালী বর্গ (Dominant Caste) এই ধারণা তাঁর পূর্ববর্তী ধারণার থেকে পৃথক। এই ধারণা অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতীয় সমাজ ও তার পরিবর্তনকে বুঝতে হলে, স্থানীয় প্রতিপত্তিশালীবর্গ এবং তারা কী ধরনের প্রতিপত্তিজনিত সুবিধা ভোগ করে, তা জানা আবশ্যক (*The Dominant Caste in Rampura*)।

প্রতিপত্তির পেছনে সেই জাতি বা বর্ণের সংখ্যাধিক্য, আর্থ-রাজনৈতিক শক্তি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সম্মানজনক অবস্থান, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং জীবিকার ধরন প্রভৃতি

উপাদানগুলি সক্রিয়। সাধারণত এই বিভিন্ন উপাদানগত সুবিধা গ্রামে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো বিশেষ একটি গোষ্ঠীর বা বর্ণের মধ্যে এই উপাদানগুলির সবকটা অথবা অধিকাংশ বিদ্যমান থাকে তখন সেই গোষ্ঠী সেই গ্রামীণ সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। সামাজিক স্তরবিন্যাসে যে জাতির স্থান খুব নিচুতে সেই জাতির ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য সমস্ত সর্ত বিদ্যমান থাকলেও, প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়; প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠতে গেলে সেই জাতির স্থান অন্ততপক্ষে মধ্যবর্গের হওয়া উচিত। এই কারণে ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে মধ্যবর্গের প্রতিপত্তি লক্ষ করা যায়। এমনকী অভ্যন্তরীণ বা পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে কেবল নিম্নবর্গের ক্ষেত্রেই নয়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও তারা সম্মানিত স্থান গ্রহণ করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পুরোহিত সম্প্রদায় উচ্চাসনে থাকলেও প্রতিপত্তিশালীবর্গের অসম্প্রদায়িক নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত হয়ো উঠতে পারে না। প্রতিপত্তিশালী বর্গের নেতৃবর্গ তাই বিভিন্ন বর্গের সদস্যদের বিবাদই শুধু মেটায় না, অভ্যন্তরীণ পারিবারিক বিবাদ মেটাতেও তারা প্রায়ই আহূত হয়।

এসব 'সংস্কৃতায়ন' ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন পদ্ধতি বলে আজও পরিগণিত হয়।

[এই লেখায় জাতি, বর্গ ও বর্ণ শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত]

সন্ত্রাসবাদ

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

সন্ত্রাসবাদের মূল কথা বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা। এটা যেমন দুষ্কৃতীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে, তেমনই সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে, হয়ে থাকে, এবং যুগ যুগ ধরে হয়ে চলেছে।

সন্ত্রাসবাদী মতবাদ সাধারণভাবে মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর এক ইতিবাচক ভূমিকাও ইতিহাসে লক্ষ করা যায়।

পরাধীন দেশে মানুষ নানা পথে স্বাধীনতা অর্জনে আন্দোলন করে। 'সন্ত্রাসবাদী' তথা সশস্ত্র সংগ্রাম তেমনই একটি পথ। প্রাচীন আমলে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রিকদের সংগ্রাম থেকে, আধুনিক যুগে আমেরিকা, আয়ার্ল্যান্ড বা ভারতবর্ষের মতো নানা দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে এই পন্থার প্রয়োগ ঘটতে দেখা গেছে। এদেশে ভি. পি., যুগান্তর, অনুশীলন বা গদর পার্টি বিদেশী শাসকদের হত্যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এই সংগ্রামীদের বিশ্বাস ছিল, এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভীত হয়ে উঠবে এবং বিপ্লবীদের ত্যাগ ও শৌর্যের দৃষ্টান্তে দেশের যুবশক্তি জাগ্রত হবে।

সমকালীন শাসকগোষ্ঠী এঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা না দিয়ে আখ্যাত করেছে সন্ত্রাসবাদী বলে। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এঁরা বিপ্লবী ও শহিদের মর্যাদা পেয়েছেন। ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং-সুখদেব-রাজগুরু তেমনই মহৎ, দেশপ্রেমিক 'সন্ত্রাসবাদী'।

আবার স্বাধীন দেশে শোষণ-পীড়ন-অবিচার-অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা এই পন্থা গ্রহণ করেন, শাসকগোষ্ঠী তাঁদের সন্ত্রাসবাদী বললেও ইতিহাস তাঁদের বিপ্লবীর মর্যাদা দেয়। এদেশে স্বাধীনতার ঠিক পরেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যে বিপ্লব শুরু করে তাতে নিহত কাকদ্বীপের অহল্যা, বাতাসী বা কাইয়ুর বন্দীদের মতো দেশের বহু শহিদ তার দৃষ্টান্ত (বিনয় রায়ের বিখ্যাত গান 'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কাইয়ুর বন্দীরে' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়)।

বিশ শতকে ষাট-সত্তরের দশকে 'নকশালবাড়ি'-র পর কৃষি বিপ্লবের যে প্রয়াস শুরু হয়, শাসকগোষ্ঠী তাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে দমন পীড়ন চালালেও

চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত প্রমুখের মতো এই সংগ্রামের নিহত নেতা ও কর্মীবৃন্দ ইতিহাসের পাতায় বিপ্লবী শহিদের মর্যাদাই পেয়েছেন।

সমাজ পরিবর্তন ছাড়াও নানাবিধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সন্ত্রাসবাদী পন্থা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোনো জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির স্বার্থে। পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে একসময় গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বা আসামে বোড়োল্যাণ্ডের দাবিতে এই উদ্দেশ্যেই আন্দোলন হয়। তাতে সন্ত্রাসবাদের একটা ভূমিকা ছিল। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হলে এইসব আলোড়ন অংশত প্রশমিত হয়।

কখনো আবার মূল রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম শুরু করা হয়। ভারতবর্ষে এমন প্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে দেখা গেছে নাগাল্যান্ডে। অর্ধ শতাব্দী আগে সে আন্দোলন শুরু করেছিলেন নাগা নেতা ফিজো। এখনও দেখা যাচ্ছে মণিপুর (মণিপুর পিপ্‌ল্‌স্‌ লিবারেশন আর্মি), আসাম (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম) কাশ্মীর, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে চলছে সেই আন্দোলন। কাশ্মীরে যে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকল্প চলছে তার পেছনে যেমন পাকিস্তানি মদত আছে, সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যেমন কাশ্মীরি ও অ-কাশ্মীরি নানা দেশের 'জেহাদি'রা আছে, তেমনই কাশ্মীরের সন্তানদের একটি অংশও আছে। কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদীদের সকলেই যে পৃথক রাষ্ট্র চায় বা সমগ্র কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়, তা নয়। অনেকেই নানা ধরনের বঞ্চনা, উপেক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বিশেষত দীর্ঘকাল ধরে সেখানে ঘটে চলা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অন্য পথ না পেয়ে সন্ত্রাসবাদের পথে চলে গেছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তেই রাষ্ট্রই সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় উৎস ও সংঘটক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হয় ও চলতে থাকে সন্ত্রাস দমনের নামে। 'নকশাল সন্ত্রাস' দমনের নামে পশ্চিম বাংলায়, খালিস্তানি সন্ত্রাস দমনের নামে পাঞ্জাবে, সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের নামে কাশ্মীরে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে মণিপুরে বা নাগাল্যান্ডে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নির্মম রূপ দেখা গেছে।

সব সন্ত্রাসের আদি উৎস ও রপ্তানিকারক এবং বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদী যে সাম্রাজ্যবাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদের নানা চেহারা আছে। তার নব্য চেহারাটিতে কোনো বন্দুক বা রক্তবিন্দুর চিহ্নমাত্র নেই। অর্থনৈতিক সন্ত্রাসই সেখানে বোমা বা কামানের চেয়ে বড় ভূমিকা নেয়। এই ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কারিগর বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি সংগঠন। এদের কলাকৌশলে এক একটি জাতি তথা রাষ্ট্রের অস্তিত্বই রাতারাতি বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। লাতিন আমেরিকার 'বানানা রিপাবলিকগুলি'র ইতিহাস থেকে একথার যাথার্থ্য বোঝা যায়। এর অতিসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত আর্জেন্টিনা। আই এম এফ-নির্ধারিত পথে চলতে গিয়ে সেখানকার অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে যায়। সেদেশের টাকার মূল্য প্রায়

শূন্যে পৌঁছে যায়। ফলে গণবিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, কয়েক মাসে কয়েকটি সরকারের পতন ঘটে। এক ডজন লর্ড ক্লাইভ যা করতে পারত না, ডলারের মার তা করে দেয় অনায়াসে।

'স্যাংশন' আর একটি অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদী অস্ত্র। কিউবা বা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের যে-অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বছরের পর বছর জারি রয়েছে, তাতে সেসব দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভয়ংকর ব্যাহত হলেও আপন শক্তিতেই তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক যুগের 'স্যাংশন' ইরাককে যে ভেতরে ভেতরে কী ভয়ংকর ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল তা স্পষ্ট হল ঈঙ্গমার্কিন জোটের ইরাক আক্রমণের পর। যুদ্ধের আগেই তার ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল আর্থিক সন্ত্রাসবাদের কল্যাণে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে, ভারতসহ, কখনো না কখনো সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হতে হয়েছে এবং হতে হয়।

এছাড়া সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ তো আছেই। কখনো তা প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষে কাজ করে। উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রসারে সরাসরি বলপ্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকি ছিল এক আমোঘ অস্ত্র। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে অসংখ্য নরনারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করার পেছনেও কাজ করেছে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদ।

আবার নিজে সামনে না এসে অন্যদের দিয়েও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ পারদর্শী। অর্থ, অস্ত্র ও কূটনৈতিক-রাজনৈতিক সাহায্য দিয়ে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় এভাবেই সে বিশ্বের নানা প্রান্তে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে ও তাকে লালন ও উৎসাহিত করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এবং একবিংশ শতাব্দীতেও ইজরায়েলে, কসোভোয় বা আফগানিস্তানে তাই ঘটেছে। প্যালেস্তাইনসহ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের আগ্রাসন, সার্বিয়ার একটি অংশ কসোভোর আলবানীয় মুসলমান গেরিলাদের সার্বিয়া তথা সার্বদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ফৌজকে হটিয়ে দেওয়ার জন্যে তালিবানি সন্ত্রাসবাদের উত্থান ও বিজয় সবই সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক শিকার যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক ইত্যাদি দেশ। এই সন্ত্রাসবাদের আর এক শিকার দক্ষিণ গোলার্ধের নিকারাগুয়া। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস যে দেশকে ধরে তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। নিকারাগুয়া, ভিয়েতনাম, সার্বিয়া, আফগানিস্তান বা ইরাক তারই দৃষ্টান্ত।

সন্ত্রাসবাদের চরিত্রেই আছে 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' হয়ে ওঠার ঝোঁক। ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে যায়। নিউ ইয়র্কের পৃথিবীখ্যাত বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের 'টুইন টাওয়ার' এবং খোদ পেন্টাগণের একটি অংশ এই আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। শত শত নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে। সমগ্র বিশ্ব এই ঘটনায় স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়। মার্কিন মানসে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। নিশ্ছিদ্র, নিশ্চিত নিরাপত্তায় আশ্বস্ত মার্কিন নাগরিকরা এক বিপন্নতাবোধে

আক্রান্ত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেন। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সন্ত্রাসবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়।

আমেরিকা এই আক্রমণের পেছনে আল কায়দা, জৈশ-এ-মহম্মদ ইত্যাদি ইসলামি মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাত আছে বলে অভিযোগ করে। আমেরিকার অভিযোগ, আফগানিস্তানে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে বিশ্বময় আল কায়দার কার্যকলাপ পরিচালনা করেন ওসামা বিন লাদেন। ওমরের প্রধানমন্ত্রিত্বে পরিচালিত আফগান সরকারের কাছে লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় ওয়াশিংটন। এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনক্রমে আমেরিকা তার সহযোগী রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। তাদেরই হাতে গড়া তালিবান সরকারের পতন হয়। আফগানিস্তান প্রায় এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস কী কাণ্ড ঘটাতে পারে আফগানিস্তান তারই দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণ করতে মনস্থ করে। রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদন দেয় না। ফ্রান্স ও জার্মানির মতো ব্রিটেন-আমেরিকার পুরাতন মিত্ররাষ্ট্র এবং রাশিয়া ও চীনের মতো নূতন সহযোগীসহ প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইরাক আক্রমণের বিরোধিতা করে। তথাপি স্পেন, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইতালির মতো চৌত্রিশটি দেশের সমর্থন ও সহায়তা নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন জোট ইরাক আক্রমণ ও জয় করে। সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে সাদ্দাম আমেরিকার হাতে বন্দী হন। তাঁর দুই পুত্র ও প্রধান সহায়ক উদয় ও কুশেইকে হত্যা করা হয়।

কিন্তু আমেরিকা ও তার মিত্রদের আফগানিস্তান ও ইরাক জয়ের খুব প্রভাব সন্ত্রাসবাদের ওপর পড়েছে বলে মনে হয় না। ওসামা বিন লাদেন বা ওমরকে এখনো ধরা যায়নি। অন্যদিকে বিশ্বের নানা দেশে সন্ত্রাসবাদী আঘাত অব্যাহত। ইরাকে এই আঘাতে বহু সংখ্যক মার্কিন ও জোটসেনার এবং তাদের সহযোগী ইরাকির মৃত্যু ঘটছে। আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদী আঘাতের আশঙ্কায় সদা সন্ত্রস্ত। নিরাপত্তা ও নিষেধাজ্ঞার কঠিন বেড়াজাল তাদের নিজেদের নাগরিকদেরই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিদিন সংকুচিত করে চলেছে, যেন তারা সন্ত্রাসবাদের হাতে বন্দী।

অনেকে মনে করেন ইসলামি সন্ত্রাসবাদ সম্প্রতিকালে এক বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। মৌলবাদী, গোঁড়া ধর্মীয় ভাবভাবনা এর মনস্তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত ভিত্তি। সেই কারণেই ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই 'ফিদায়ে' হয়ে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী কাজে অনায়াসে প্রাণ দিয়ে দিতে পারে এবং দিয়ে চলেছে। ভারত থেকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, প্যালেস্তাইন, ইরাক, সৌদি আরব, মিশর, আলজিরিয়া, তুরস্ক, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি নানা দেশে এই সক্রিয়তা দেখা গেছে। অনেকে আবার মনে করেন এই সন্ত্রাসবাদ স্বয়ম্ভূ নয়। এর জন্ম ও বৃদ্ধিও একদিকে সাম্রাজ্যবাদের উৎসাহে ও সহায়তায়, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়ায়।

সম্প্রতি ইসলাম ধর্মের সঙ্গেই সন্ত্রাসবাদকে এক করে দেখার একটি ঝোঁক পশ্চিমি শক্তির এক বড় অংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেন মুসলমান রাষ্ট্রমাত্রই সন্ত্রাসবাদী, প্রতিটি মুসলমানই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং ইসলাম ধর্মই সন্ত্রাসবাদের উৎস। রাষ্ট্রপতি বুশ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনার পরেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদের' ডাক দেন। তাঁর সহযোগী, ইতালির প্রধানমন্ত্রী বেরলুসকোনি ঘোষণা করেন, ইসলামি সভ্যতার চেয়ে পশ্চিমি সভ্যতা অনেক বেশি উন্নত। এই মনোভাব শক্তিশালী হতে হতে একটা মতবাদে পরিণত হলে দুই সভ্যতার মধ্যে যে-সন্ত্রাস ও সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা সমগ্র বিশ্বকে বিপন্ন করবে। এই আশঙ্কা থেকেই খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান পোপ দ্বিতীয় জন পল ইরাক আক্রমণ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হন। সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেলে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের এক শত কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়ে পৃথিবী বাঁচতে পারে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

অভ্র ঘোষ

বিশ্বইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিসংবাদ নতুন কথা নয়। আদিকাল থেকেই আছে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে বারবার। ফলে আধুনিক মানুষ বিশ্বশান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চাইবে, সেটা স্বাভাবিক। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ-ব্যাপারে অনেকেই চিন্তা-ভাবনা করেছেন, কিন্তু উনিশ শতক পর্যন্ত তেমন বড় মাপের কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) একটি অংশ হিসেবে লিগ অব্ নেশনস-এর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯২০-এর ১০ জানুয়ারি তৈরি হল লিগ। উদ্দেশ্য ছিল বিধ্বংসী যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করা। বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আওতাভুক্ত করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা, যূথবদ্ধ নিরাপত্তার মাধ্যমে বিশ্বের আক্রান্ত রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, লিগ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুকিছু বিবাদের মীমাংসা করতে পারলেও ১৯৩১-এ জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও ১৯৩৫ সালে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রে লিগ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিগের অস্তিত্বই টের পাওয়া গেল না। বস্তুত, এই সংগঠনের গোড়াতেই ছিল কিছু মৌলিক গলদ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুই প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র লিগের সদস্য ছিল না, আর লিগের কোনো নিজস্ব সামরিকবাহিনীও ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) বিশ্বশান্তির স্বপ্ন বিলীন করে দিল। মিত্রশক্তির নায়কেরা অর্থাৎ রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিন যুদ্ধ চলাকালীনই পারস্পরিক বৈঠকে মিলিত হয়ে নতুনভাবে আরেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা শুরু করলেন। ১৯৪১ সালে প্রথমে লন্ডন ঘোষণা ও পরে আটলান্টিক সনদ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনার কথা বলে। ১৯৪২-এ ১ জানুয়ারি মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনেতারা মিলিত হন এবং চব্বিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন প্রকাশ করেন। আটলান্টিক সনদের নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানানো হয় বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে। ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াশিংটন ডাম্বারটন ওকসের সম্মেলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনের

প্রতিনিধিরা ওই সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন এবং এঁরা আন্তর্জাতিক সংগঠনের একটি খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। এটাই জাতিপুঞ্জের প্রথম খসড়া এবং এতেই 'ইউনাইটেড নেশনস' নামটি গৃহীত হয়। কিন্তু সংগঠনটির গঠনগত কতগুলি জরুরি প্রশ্ন তখনো অমীমাংসিত। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ইয়াল্টা সম্মেলনে সেগুলির মীমাংসা হয় এবং সাব্যস্ত করা হয় জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদী চীনকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। আর আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে এই স্থায়ী সদস্যদের ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। একটি অছি ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এরপর ১৯৪৫-এর ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সংবিধান গ্রহণ করে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এবং ২৪ অক্টোবর একান্নটি রাষ্ট্রের সমবায়ে জাতিপুঞ্জের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটে।

জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা এখন ১৯০টি রাষ্ট্র। সদস্যপদ পেতে হলে জাতিপুঞ্জের সনদে বর্ণিত নীতি ও নিয়মগুলির প্রতি সেই রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি নিতে হবে। ১৯৭১ পর্যন্ত এই অনুমোদন না পাওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে পারেনি। তবে সদস্যপদপ্রাপ্তির পর এই চীন নিরাপত্তা পরিষদেও স্থায়ী সদস্যপদ পেয়েছে জাতীয়তাবাদী চীনের পরিবর্তে। পঞ্চাশের দশকে মঙ্গোলিয়া ও আলবেনিয়ার সদস্যপদের আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, অবশ্য কিছু পরেই এরা সদস্য হয়েছে যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৬১ সালে। ১৯৫৬-তে জাপান সদস্যপদ পেয়েছে।

জাতিপুঞ্জের ৬টি প্রধান সংস্থা—সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং কর্মদপ্তর। জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য সাধারণ সভার সদস্য। প্রতিটি রাষ্ট্র থেকে অনধিক পাঁচজন প্রতিনিধি এই সভায় আসতে পারেন। তবে প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রের ভোট একটি। সাধারণ সভার কাজ বা ক্ষমতাগুলিকে সাতটি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়—শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ, আলোচনা ও সুপারিশ করার ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, সনদ সংশোধনের ক্ষমতা। বিশ্ব নাগরিকসভা হিসেবে বিশ্বজনমত গড়ে তোলাই এই সভার বিশেষ উদ্দেশ্য। সেটুকু ছাড়া, নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্য ও সুপারিশ ছাড়া সাধারণ সভা অর্থবহভাবে তেমন ক্ষমতা ভোগ করে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবর্তে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে যখন নিরাপত্তা পরিষদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র মুহুর্মুহু ভিটো প্রদান করতে থাকে (১৯৪৬-৪৭ সালে ২৩ বার ভিটো প্রয়োগ হয়েছিল এবং ২১ বারই তা দিয়েছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র), তখন ১৯৫০-এ সাধারণ সভার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'শান্তির জন্য মিলনের প্রস্তাব' আসে এবং সাধারণ সভায় মার্কিন পক্ষের গরিষ্ঠতা থাকায় সে-প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে সমস্যা সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে সাধারণ সভা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে। ১৯৬০ পর্যন্ত

বহু নজির আছে যেখানে সাধারণ সভা এই ভূমিকা নিতে পেরেছে। সাময়িকভাবে মার্কিন উদ্দেশ্য সফল হলেও ষাট-সত্তরের দশকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির উত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সাধারণ সভায় খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য, নামিবিয়া, জিম্বাবোয়ের সমস্যা থেকে শুরু করে অ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিক-পর্তুগিজ গায়না ইত্যাদি দেশগুলির সমস্যা সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ক্রমে রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও সাধারণ সভার আলোচনায় ঠাঁই পায়। ১৯৮৯ সালে শিশুদের অধিকারের প্রস্তাব, ১৯৯০ সালে মানবাধিকার বিষয়ে সম্মেলনের প্রস্তাব পাশ করে সাধারণ সভা। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার সমস্যায় আতঙ্কিত হয়ে পরিবেশ কর্মসূচির কথাও গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বর্ণবৈষম্য, জীয়নবাদ, পরিবেশ-সমস্যা ছাড়াও গুরুত্ব পেয়েছে দীর্ঘকাল ধরে নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বিষয়ে নিষিদ্ধকরণের বিভিন্ন প্রস্তাব ও চুক্তি। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কখনো মার্কিন আধিপত্য, কখনো সোভিয়েত আধিপত্য, কখনো বা জোট-নিরপেক্ষ শক্তিগুলির বা চীনের বক্তব্য এসব আলোচনা-সুপারিশে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সমগ্র জাতিপুঞ্জে মার্কিন আধিপত্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

গঠনগতভাবে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা পাঁচ হলেও, আরো দশ জন অস্থায়ী সদস্য আছেন। অস্থায়ী সদস্যরা দু-বছরের জন্য সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন। নব্বইয়ের দশক থেকেই দাবি উঠতে শুরু করেছে যে স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হোক। ১৯৯২-তে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব স্বয়ং পরিষদকে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্য প্রস্তাব দেন যে ভারত, জার্মানি, জাপান, নাইজিরিয়া ও ব্রাজিলকে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া উচিত। গত একদশক ধরে বারংবার এই ধরণের দাবি উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি ও জাপানকে স্থায়ী সদস্য করতে রাজি, কিন্তু ভারতকে নয়।

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী নিরাপত্তা পরিষদ। শান্তি ও নিরাপত্তাবিধানের ক্ষমতা, নিরস্ত্রীকরণের ক্ষমতা, অছি সংক্রান্ত ক্ষমতা, নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা, সদস্যপদ দেওয়া ও বাতিলের ক্ষমতা ও সনদ সংশোধনের ক্ষমতা ভোগ করে এই পরিষদ। এর সুপারিশ না পেলে কোনোকিছুই কার্যকর হয় না। প্রবল প্রতাপান্বিত নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে এইচ. জি. নিকোলাসের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব কাজকর্মের ভিতর যে-প্রবল ফারাক দেখা যায় নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার ক্ষেত্রে, তা জাতিপুঞ্জের আর কোনো সংস্থার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত, তাত্ত্বিক দিক থেকে পরিষদ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তার ভূমিকা নিতান্তই শাদামাটা। এর কারণ, নিরাপত্তা পরিষদের গঠনে দুর্বলতা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের ভিটো ক্ষমতার দরুন সদস্যদের সমানাধিকারের প্রভাব, বিশ্বরাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের সংকীর্ণ স্বার্থ, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতি, নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর অভাব ইত্যাদি পরিষদের দুর্বলতার কারণ। ১৯৪৬ থেকে ১৯৯১ সাল

পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনাসভায় কোন্ দেশ কতোবার ভিটো প্রদান করেছে, তার হিসেব দেখলেই বোঝা যাবে অবস্থাটা কীরকম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১১৪-বার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৯ বার, গ্রেট ব্রিটেন ৩০-বার, ফ্রান্স ১৮-বার ভিটো প্রয়োগ করেছে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক কোনো প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করলে তবেই বিবাদের মীমাংসা সম্ভব, না হলে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা অসম্ভব।

কেবল যুদ্ধবিগ্রহ রোধ করে বা বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেই বিশ্বশান্তি স্থায়ী করা সম্ভব নয়, স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তির জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। এই পরিবেশ রচনার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।

এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি মানবিক বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে নীতি সুপারিশ করে জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিশেষ সংস্থাগুলির কাছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য, সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা ইত্যাদি বিশেষ সংস্থাগুলির কাজ হল ওইসব নীতি রূপায়ণ করা। বিশেষ সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্ম বিষয়ে নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাছে প্রতিবেদনও পেশ করে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত হলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

সমস্যাকণ্টকিত জাতিপুঞ্জ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি গত প্রায় ষাট সত্তর বছরের ইতিহাসে। জন্ম লগ্ন থেকে ষাটের যুগের সূচনা পর্যন্ত পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষার কাজে জাতিপুঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে। ষাটের যুগের মধ্যভাগ থেকে আশির যুগের গোড়া পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শক্তিবৃদ্ধি ও তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় যুদ্ধের ভীতি ও আতঙ্ক খানিকটা প্রশমিত করা গিয়েছিল। নয়া ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রবল জনমতও তৈরি হয়েছিল, তবে তাকে পুরোপুরি ঠেকানো যায়নি। সেকথাও সত্য।

তবে কঠিন সমস্যা তৈরি হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে সংকট তৈরি হওয়ার পর, বিশেষত সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর। জাতিপুঞ্জে যে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি কাজ করছিল তার চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটল। প্রতিস্পর্ধী শক্তির অবসানের পর তৈরি হল মার্কিন একাধিপত্যের চূড়ান্ত রূপ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীনেও পুরনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদল ঘটতে শুরু করল, পুঁজিপতি দেশগুলির সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া ও সমঝোতার আবহাওয়া তৈরি হল। এসবেরই অব্যবহিত ফল মূর্ত হয়ে উঠল নব্বইয়ের যুগের সূচনায় মার্কিন-ইরাক যুদ্ধে। কুয়েত সমস্যাকে কেন্দ্র করে

ইরাকের অবিবেচনাপ্রসূত নীতির সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরাকের ওপর। জাতিপুঞ্জের সহায়তায় এক বহুজাতিক সামরিক বাহিনী নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণটিকে বৈধ আক্রমণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০০১-এর সেপ্টেম্বরে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর ওসামা বিন লাদেন, আল কায়দা এবং তালিবানদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্থান যুদ্ধও জাতিপুঞ্জের কাছ থেকে বৈধতা পেয়েছিল। কিন্তু অতি সম্প্রতি নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখার অজুহাতে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসন জাতিপুঞ্জ বৈধ বলে মনে করেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে। জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেটি আদৌ ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে না—এরকমই মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা।

সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম

রমাকান্ত চক্রবর্তী

বঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম আনুমানিক অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ক্রমশ, ইসলামের আবির্ভাবে ও প্রচারে, এবং হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে, সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রান্তিক হয়ে যায়। কিন্তু, যৌনতাভিত্তিক গুরুবাদমূলক সহজিয়া ভাবধারা যে অবলুপ্ত হয়নি, তা শ্রীচৈতন্যের দ্বারা এবং তাঁর সমর্থকদের দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ণব-ভক্তির প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সহজিয়া-সাধকদের চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস 'ব্রহ্মদৈত্য'-রূপে চিহ্নিত করেছেন; তার অর্থ, সহজিয়া গুরুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ শতক থেকে রচিত সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যও বিশিষ্ট স্থান পেলেন। এই ধর্মবিশ্বাস যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের লক্ষণীয় পুষ্টি। দু'শ পঞ্চাশটি সহজিয়া পুথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-পাঠাগারে আছে; বহু সহজিয়া পুথি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারে। চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত সহজিয়া বৈষ্ণব গীতি-সমূহের কাব্যিক মূল্য স্বীকৃত; সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসই লিখেছিলেন : শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই। এই 'মানুষ সত্য' 'সহজ' মানুষ, রামা-শ্যামা নয়। অনেক সহজিয়া পুথি জড়তাগ্রস্ত বাংলা গদ্যে রচিত। কয়েকটি সহজিয়া পুথি বটতলার বেসাতিতে স্থান পেয়েছে, যেমন 'রাধারসকারিকা', 'মীরাবাইয়ের কড়চা' এবং 'বিবর্ত্তবিলাস'। আবার কয়েকটি পুথি রীতিমত সম্পাদিত, যেমন, যুগলের দাস-রচিত 'আগমসার', প্রেমদাস-রচিত 'আনন্দভৈরব', মুকুন্দ দাস-রচিত 'অমৃত রত্নাবলী', এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের 'অমৃতরসাবলী'। [দ্র. পরিতোষ দাস, *চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি*, ১৯৭২]

সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বে যোগ, তান্ত্রিক দেহতত্ত্ব, এবং বৈষ্ণব-ভক্তি সংমিশ্রিত হয়েছে। সেখানে গুরুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা হয়েছে। সাধক-সাধিকার যৌন-মিলন ধর্মাভ্যাসরূপে কীর্তিত হয়েছে। 'বিবর্ত্তবিলাস'-এ যথেষ্ট জোর দিয়ে ঘোষিত হয়েছে যে, চৈতন্য এবং বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, এমনকী কৃষ্ণদাস কবিরাজও, পরকীয়া রতি-সাধনা করতেন। এখানে এই তথ্যও আছে যে, মীরাবাই রূপ গোস্বামীকে পরকীয়া রতির তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। সহজিয়া সাহিত্যে বিচিত্র পরিভাষা দিয়ে যৌনতাকে আবৃত করে রাখা হয়েছে। তবে সহজিয়া সাধনা বিষয়ক তত্ত্বে ঠিক বামাচারী তান্ত্রিক পঞ্চ-'ম'-

কার বিবৃত হয়নি, কারণ সহজিয়া বৈষ্ণবরা নিরামিষাশী ছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণব প্রেম-সাধনার তত্ত্ব এসেছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* এবং স্বরূপ দামোদরের অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত 'কড়চা' থেকে। সহজিয়া মতানুসারে দেহ ছাড়া প্রেমের চিন্তা ছিল অবাস্তব। রাধাকৃষ্ণের 'স্বরূপ' দীক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে আছে। এই ছিল প্রধান 'সহজ-তত্ত্ব'। বলা হয়েছে, 'রূপেতে স্বরূপে। দুই এক করি। মিশাল করিয়া থুবে।' কিন্তু এমন প্রেম-সাধনাতেও শর্ত ছিল। প্রধান শর্ত ছিল সাধকের ও সাধিকার স্বভাবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির রূপান্তর। চণ্ডীদাস লিখেছিলেন : কলঙ্ক-সাগরে। সিনান করিবি। এলাইয়া মাথার কেশ। নীরে না ভিজিবি। জল না ছুইবি। সম দুখ সুখ ক্লেশ। দেহে স্থিত 'কামসরোবর'-এ স্নান করার প্রধান শর্ত বীর্যবিন্দুর অটলত্ব। এই ক্ষমতা বলেই নায়িকার সহযোগে নিরুদ্ধ সংগমে বীর্যবিন্দুকে পিঙ্গলা নাড়িতে এনে ঈড়া-নাড়ির পথে উপরের দিকে পরিচালিত করার সময় সাধক নারীভাবভাবিত হয়ে কৃষ্ণের ভজনা করবেন। একেই বলা হয়েছে বিবর্ত্তবিলাস। বিবর্ত্তবিলাসে কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে, সহস্রারে জ্ঞান সূর্যের উদয় হয়, এবং মূলাধারে পদ্ম জ্ঞান-সূর্যের প্রভাবে বিকশিত হয়। সাধক আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। সিদ্ধ গুরুর উপদেশ ছাড়া এসব ভাবাও যায় না, জানাও যায় না। এই সাধনার প্রক্রিয়া 'নায়িকাসাধনাটীকা' নামক পুথিতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, Edward C. Dimock, Jr. *The place of the Hidden Moon*, 1966, pp. 235-245)।

এমন কথা আছে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'পিঙ্গলা নাপিতানী'-র সঙ্গে প্রেম-সাধনা করতেন; তাঁরই কনিষ্ঠতম শিষ্য মুকুন্দদেব সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। এই ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা, নবদ্বীপ, এবং বর্ধমান জেলার কালনা ও বাঘনাপাড়া। উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলাতেও সহজিয়া বৈষ্ণবদের অস্তিত্ব ছিল। 'দক্ষিণাচারী' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সর্বদা কৃষ্ণলীলাকে প্রাধান্য দিলেও কৃষ্ণলীলার অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের গুরুপরম্পরা দুর্জ্ঞেয়, কারণ তাঁদের ধর্মীয় মত ও ধর্মাভ্যাস ছিল গোপনীয়। অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্ত্তবিলাস' পড়ে মনে হয়ে যে, বাঘনাপাড়ার কাছে কোনো গ্রামে তাঁর গুরুদেব থাকতেন। বাঘনাপাড়ার গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগণ যে সহজিয়া মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা প্রেমদাস-রচিত 'বংশী শিক্ষা' পড়লে বোঝা যায়।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের মূল ধারা থেকে সরে আসেন। তাঁরা পার্থিব জীবনকে মূল্যহীন ভাবেন নি, এবং সন্ন্যাসের জীবনবিরোধী আদর্শকে গ্রহণ করেননি। কোনো কোনো সহজিয়া পুথিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। তথাকথিত 'বৈষ্ণব-বাউল'-তত্ত্বে সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রভাব আছে। কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার ব্যবহারের নিদর্শন ছাড়া সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা বাংলার কৃষ্টিকে আর কোনো ভাবে সম্প্রসারিত করেনি। শেষ পর্যন্ত এই হয় যে, পেশাদার সহজিয়া-সাধিকা ক্ষুধার তাড়নায় দেহ বিক্রয় করতে চান। (দ্রষ্টব্য, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, *সাক্ষাৎকারে ভৈরবী সাধিকা* ১৯৮০)

সাবঅলটার্ন

সেমন্তী ঘোষ

উনিশশো আশির দশক থেকে 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি (ইংরেজিতে যার প্রতিশব্দ হতে পারে 'সাব-অর্ডিনেট') ভারতীয় ইতিহাস-চিন্তায় একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে। বাংলায় এর প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ'। স্পষ্টতই 'সাব-অলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গের' এই ধারণাটি স্বয়ংপূর্ণ নয়, বরং সরাসরি যুক্ত কোনো 'এলিট' বা 'উচ্চবর্গে'র ধারণার সঙ্গে। কোন্ নিরিখে এই ধারণাদুটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত? 'আধিপত্যে'র নিরিখে। 'আধিপত্য'কে কিন্তু আবার নানা রকমভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক, এক ধরনের ভাবাদর্শগত আধিপত্য, যাকে আমরা বলি হেগেমনি / হেজেমনি (hegemony); এক্ষেত্রে অধীন যে সে নিজের অলক্ষ্যেই এই আধিপত্যে নিজের সমর্থন দিয়ে চলে। দুই, আধিপত্য হতে পারে কেবল এক সরাসরি প্রভুত্বের সম্পর্ক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—যাকে বলা যায় 'ডমিন্যান্স'।

'আধিপত্যে'র ধরন নানা রকম; তাই 'সাব-অলটার্ন' শব্দটির ব্যবহারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন। মার্কস-পন্থী গ্রামসি যখন তাঁর *কারাগারের নোটবই (Prison Notebooks)* লেখেন উনিশশো তিরিশের দশকে তখনই তিনি প্রথম এই 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি ব্যবহার করেন, এবং, সেই তখন থেকেই শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুমুখী। প্রথমে গ্রামসি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা করতে গিয়ে। ক্ষমতাবিন্যাসের যে ধরন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরিত্র তৈরি করে—তার সূত্রেই গড়ে ওঠে ক্ষমতার অধিকারী 'উচ্চবর্গ' আর ক্ষমতাহীন 'সাব-অলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ'। এই প্রসঙ্গে—আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব এ শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করেন গ্রামসি যে বোঝা মুশকিল হয় এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না,—অর্থাৎ আধিপত্যেরও নানা রকমফের থাকতে পারে কিনা। পরে, তার আলোচনা যত এগিয়ে চলে, আমরা দেখি গ্রামসি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করছেন 'সাব-অলটার্ন' শব্দটিকে, তা হয়ে উঠেছে তখন সরাসরি 'প্রোলেতারিয়েত'-এরই প্রতিশব্দ। এই প্রোলেতারিয়েত গোষ্ঠীর সঙ্গে তার উচ্চবর্গ 'বুর্জোয়াজি'র যে সম্পর্ক—তা কিন্তু কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যেরই নয়, তার চেয়ে আরো বেশি কিছু। এই আধিপত্যই হল 'হেগেমনি' বা 'হেজেমনি'—এক ধরনের সার্বিক সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব—সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে যা নিরঙ্কুশ, স্বয়ং-চালিত (Self-sustaining) করে তোলে।

গ্রামসির জটিল আলোচনার মধ্যে অবশ্য কেবলমাত্র নিম্নবর্গের ভাবনা বা ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথাই বলা হয়নি। তিনি দেখিয়েছেন অন্য ধরনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রও—যেখানে নিম্নবর্গের ভাবনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারে, বা প্রতিরোধের রূপ দিতে পারে। এই জটিল সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনার উপর ভিত্তি করে উনিশশো আশির দশকের গোড়ায় তৈরি হয়ে উঠল ভারতীয় ইতিহাসের 'সাব-অলটার্ন' তত্ত্ব। রণজিৎ গুহ তাঁর *Elementary Aspects of Peasant Insergency in Colonial India* (১৯৮৩) বইতে গ্রামসির তত্ত্বের সাহায্যে পূর্বসূরি ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার এক যুগান্তকারী সমালোচনা করলেন। এর আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বা মার্ক্সীয় ইতিহাস—কোনোটিতেই জনগণের রাজনীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং জনগণের রাজনৈতিক ভাবনা বা কার্যকলাপকে বোঝা হয়েছে নেতৃ-রাজনীতি বা উচ্চবর্গ (elite) রাজনীতির লেজুর হিসেবে। এমনকী, যেসব কৃষক-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এই নেতৃ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতই ক্ষীণ ছিল, পুরোনো ধরনের ইতিহাসে সেগুলিকেও বলা হয়েছে নেহাতই স্বতোৎসারিত, 'উপ-রাজনৈতিক' (Pre-political) আন্দোলন হিসেবে। সেখানে সত্যিকারের আধুনিক রাজনীতির কোনো বোধ বা লক্ষ্য দেখেননি ঐতিহাসিকরা। রণজিৎ গুহ বললেন—এইসব বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের মধ্যে অবশ্যই এক নিজস্ব রাজনীতিকতা ছিল, যেমন ছিল উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে আহরণ করা নানা বিক্ষিপ্ত মূল্যবোধও (inherited and uncritically absorbed material of the ruling culture)। রণজিৎ গুহ আর তাঁর অনুসারী ঐতিহাসিকেরা দেখালেন—এ দুয়ের সংমিশ্রণে নিম্নবর্গের ভাবনায় আর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক সম্পূর্ণ অধরা সামাজিক ইতিহাস। তৈরি হয়ে উঠল সাব-অলটার্ন স্টাডিজ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শহিদ আমিন বা জ্ঞান পাণ্ডের নানা নতুন রচনায় দেখা গেল এক স্বতন্ত্র ধরনের ইতিহাস-চর্চা। নতুন তত্ত্ব, নতুন উপাদান (source) আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ সেই চর্চা।

গত দুই তিন দশক ধরে অবশ্য 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজে'র চরিত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল ঘটে গেছে। সংক্ষেপে, প্রথমদিকের রচনাগুলিতে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি প্রধানত প্রয়োগ করা হয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতা (domination) আর শোষণের (exploitation) প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য। এই প্রাথমিক ধারাটির সঙ্গে ১৯৬০ বা '৭০ এর ইউরোপের মুক্তমনা ইতিহাস—'Histories from Below' আন্দোলনের যোগ বেশ স্পষ্ট। আশির দশকের শেষে এসে আমরা দেখলাম সাব-অলটার্ন স্টাডিজের এই প্রাথমিক ধারাটির আপাত-অবলুপ্তি। আর দেখলাম, নতুন এক ব্যাখ্যায় 'আধিপত্য' বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। 'সাব-অলটার্ন' বা নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরনের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভুবন। আগেকার সমাজ-অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা, কেননা ওই

অর্থনৈতিক আলোচনার ভিত্তি স্পষ্টতই মার্ক্সীয় দর্শন যা কিনা ওই ধরনের পাশ্চাত্য 'সর্বজনীনতা'র (universalism) বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

'নিম্নবর্গের' ধারণাটির মধ্যে বিভিন্নরকম তাৎপর্য লুকিয়েছিল প্রথম থেকেই, তাই সাব-অলটার্ন স্টাডিজের এই চেহারাবদল খুব অপ্রত্যাশিত নয়। নতুন ধারাটিতে অবশ্য নানা রকম দুর্বলতা রয়েই গেছে। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আলোচনায় কেবলই ঢাকা পড়ে যায় অর্থনৈতিক-সামাজিক ভেদাভেদের বাস্তব। 'পাশ্চাত্যে'র 'অপর' (other) হিসেবে প্রাচ্য সংস্কৃতি মণ্ডলকে দেখাতে গিয়ে 'প্রাচ্যের' মধ্যেকার অন্তহীন টানাপোড়েন এই ইতিহাসের বাইরেই থেকে যায়। 'সাব-অলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' শব্দের বহুল ব্যঞ্জনার চক্রে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক ইতিহাস।

সাবকালচার

ঈপ্সিতা চন্দ

মূল শব্দের পূর্বে যে উপসর্গ ব্যবহার হয়, তার অন্যতম উপযোগিতা, তা সামাজিক ক্ষেত্রে পরিভাষা নির্ণয় পদ্ধতির আড়ালে ক্ষমতার বিন্যাস বুঝতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দ কালচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি—ব্যাপক অর্থে, কোনো বিশেষ বৃহৎ এবং সীমিত প্রেক্ষিতে নির্বাহ বা যাপন। তার সঙ্গে ব্যবহার হয়েছে একটি অব্যয়, বাংলায় যার প্রতিশব্দ খুঁজলে পাওয়া যাচ্ছে অধীন, নিম্নবর্তী, অপর। এই অব্যয় ব্যবহার বিশেষভাবে আলোচনা করা যায়। কারণ এই ব্যবহারকে 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' হিসেবে ধরে নেওয়ার উপরই সামাজিক পরিকাঠামোর মূলগত ভেদাভেদগুলি নির্ভরশীল। যা আপাত প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষার্থে 'স্বাভাবিক', তা যে আসলে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের উতোরচাপান দ্বারা গঠিত, এই ধারণা স্পষ্ট হয় এই উপসর্গের তাৎপর্য এবং তার সৃষ্টি ও ব্যবহার পদ্ধতির প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে।

প্রসঙ্গত 'সাব' কালচারের বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই বুঝতে হবে 'কালচার'। প্রশ্ন হল—কোন, অথবা কার কালচার, যার নিরিখে অপর বা অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান বা ব্যবহারকে সাব বা অধীন, নিম্নবর্তী, অপর, অন্ততপক্ষে ভিন্ন বলা হচ্ছে? কালচার তাহলে সকলের জন্য এক নয়—তা কোনো এককও নয়। সুতরাং কার কালচার বা কোন কালচার এই প্রশ্নের উত্তর হল ক্ষমতাশালী পক্ষ যে সব সাংস্কৃতিক উপাদান বা ব্যবহার বা প্রকাশকে 'কালচার' বলে চিহ্নিত করছেন সেগুলি মিলেমিশে কালচারের একমাত্র ব্যবহারিক অর্থ হিসেবে বহাল হচ্ছে। এই অর্থকে কালচারের একমাত্র অর্থ বলে চাউর করে দিলেই এটাকে আমরা বলে থাকি মূল্যস্রোতের সংস্কৃতি, মেইনস্ট্রিম কালচার—মূলস্রোতের বহুসংখ্যক মানুষ এই ধরনের কালচারের আওতায় না পড়লেও এটা যেহেতু চলতি অর্থে কালচার বলে চিহ্নিত, তাই এই চিহ্নন-প্রক্রিয়ার দাসত্ব করা সমাজ-জীবনের অংশ।

কালচার থেকেই যদি 'সাব' কালচারের পরিভাষা খুঁজতে হয়, তাহলে মানে দাঁড়ায় এই—যে সব ব্যবহার, যাপন বা প্রকাশকে মূলস্রোতের আওতায় স্থান দেওয়া যাচ্ছে না, সেগুলিকে তাহলে ওই 'সব'-এর খোপে পোরা যায়। আধুনিক মানুষ অনেক উদারমনস্ক—উনিশ শতকে উপনিবেশকারীরা উপনিবেশিতদের যে সব কার্যকলাপকে নিজের সাংস্কৃতিক মূলস্রোতের মধ্যে আনতে পারেননি, সেগুলিকে সরাসরি 'অসংস্কৃত'

'অসভ্য' বলেই খারিজ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আজকাল, কালচারের একটি সিঁড়ি তৈরি করাই রেওয়াজ—সেখানে উপরওয়ালা, নিচেওয়ালা সকলেই থাকবেন, শুধু উপসর্গের সূক্ষ্ম প্যাঁচে ক্ষমতার তারতম্য বোঝা যাবে।

কালচার নামক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তিতে। যেকোনো শব্দ এবং তার সমাজস্বীকৃত অর্থ ও ব্যবহার নির্ধারণ করে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ কোনো বস্তু বা ধারণা, বিশেষ্য বা বিশেষণের সামাজিক তাৎপর্য ও ব্যবহার এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমের সমাজগুলিতে বিয়ের কনে শাদা না পরলে ধরে নেওয়া হয় সে কুমারী নয়, আবার আমাদের দেশে শাদার যোগ বৈধব্যের সঙ্গে। সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু কথিত বা লিখিত ভাষার আওতায় সীমিত নয়—তা সমাজজীবনের সর্বাঙ্গে জড়িত—তাছাড়া আমরা একে অপরের সঙ্গে বাস করতে পারব না, অর্থাৎ সমাজ সৃষ্টিই হবে না, কারণ একজন কী বলছে, তা অপরজনের বোঝার উপায় থাকবে না। মূলস্রোতের কালচার এই সামাজিক ভাষার পরিকাঠামোকে একটি বিশেষ ছকে বন্দি করতে চেষ্টা করে। স্থান-কাল অনুযায়ী যেকোনো সমাজের কালচার পাল্টাতে পারে, কারণ তার ভিত অর্থাৎ সামাজিক ভাষা বা চিহ্ন প্রণালী বা সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় রদবদল ঘটে। কিন্তু 'সাব' কালচারের বৈশিষ্ট্য হল, এই সামাজিক ভাষার বিভিন্ন উপাদান, সামাজিক চিহ্নন প্রণালীর বিভিন্ন ব্যবহার বা প্রকাশকে মূল ছক থেকে মুক্ত করে এমন ভাবে উপস্থাপিত বা রূপায়িত করা, যাতে মূল ছকে সেগুলির যা অর্থ বা তাৎপর্য তা সম্পূর্ণ ওলোটপালোট হয়ে যায়। এই নতুন ব্যবহারগুলি যদি মূলস্রোতের সংস্কৃতির আওতার বাইরে, একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে প্রতি-সংস্কৃতি বা কাউন্টার কালচার বলা চলে। কিন্তু যদি মূলস্রোতের সাংস্কৃতিক উপাদান, ব্যবহার বা প্রকাশগুলির অর্থ বা তাৎপর্য মূল নির্ধারিত সামাজিক ভাষা বা চিহ্নণ প্রণালীকে উপেক্ষা করে অন্য ধরনের অর্থ বা তৎপর্য ব্যক্ত করে, তাহলে সেই সব উপাদান ব্যবহার বা প্রকাশ 'সাব' কালচারের আওতায় চলে আসে। অর্থাৎ সাব কালচারের অন্তর্গত যাঁরা, তাঁরা মূলস্রোতের সংস্কৃতি থেকে উপাদান প্রায় চুরি করে সেগুলিকে কেটে ছিঁড়ে জুড়েজারে নিজেদের জীবন যাপনে ব্যবহার করেন। মূলস্রোতের প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, বা সমাজ-যাপনের জমি থেকে ইচ্ছেমতো উপাদান বেছে সেগুলিকে এমনভাবে সাজান, যাতে মূলস্রোতের সংস্কৃতিতে সেগুলির ছকে বাঁধা অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ সৃষ্টি হয়। এই যথেচ্ছাচারের মধ্যে কোনো বাস্তববাদী যুক্তির কার্যকারণ পাওয়া মুশকিল—তাই এই ধরনের ব্যবহার পদ্ধতিকে 'ব্রিকোলাজ' বলা হয়—স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর এই ব্যবহারের কোনো পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না, অবস্থা অনুযায়ী এই ব্যবহার পাল্টাতে পারে। সুতরাং কোনো চিহ্নের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ বা তাৎপর্যকে অবজ্ঞা করে নতুন অর্থ বা তাৎপর্য আরোপে যে চমক সৃষ্টি হয়, সেটাই হল একটি সাব কালচারের বৈশিষ্ট্য, তত্ত্বের ভাষায় সেই নতুনত্বকে বলা হয় স্টাইল। এই 'স্টাইল' দ্বারাই সাব কালচার মূলস্রোতের সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও তার নিজস্ব সত্তা প্রতিভাত করে।

অবশ্য মূলস্রোতের সংস্কৃতির আওতায় থাকার জন্য সাব কালচারকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি শুষে নিতেও পারে। গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বিপণন পরিকাঠামোর দৌলতে ব্রিটেনের অন্যতম সাব কালচার পাঙ্কদের অদ্ভুত চুলের ছাঁট ও রঙ, তাদের বিদ্‌ঘুটে পোশাক ও যাপনভঙ্গি আমাদের দেশে চালু হয়েছে, কিন্তু তফাত লক্ষণীয়। ব্রিটেনে পাঙ্ক সাব কালচার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রান্তিক হয়ে যাওয়া শ্রমিক শ্রেণির বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতিবাদ। আমাদের দেশে যাঁরা পাঙ্কদের মতো চুল ছাঁটেন বা তাদের জীবনযাপন অনুকরণ করেন, তাঁরা শ্রমিক শ্রেণির নন, উচ্চবিত্ত সমাজের অন্তর্গত—বেকার তো ননই, এমনকী তাঁদের কাজের দরকারও অনুভব হয় না। পাঙ্ক কালচারের স্টাইলকে তার বিশেষ সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক করে ভারতীয় তরুণ-তরুণীরা তাকে করেছেন 'ফ্যাশন'। এভাবেই প্রতিবাদের প্রকাশকে ভোগ্যপণ্যে বদলে ফেলে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সাব কালচারকেও মূল সংস্কৃতির আওতায় নিয়ে আসতে পারে। তাতে মূলস্রোতের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়—কিন্তু সাব কালচারের নিজস্বতা, তার ভিন্নতা হয়ে যায় বাজার-চলতি প্রযুক্তি উৎপাদিত ফ্যাশন মাত্র।

এছাড়া একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের সমাজ-ইতিহাসে কাকে বলব সাব কালচার? ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের কি কোনোভাবে হিন্দু সংস্কৃতির নিরিখে অপর বা নিম্নবর্তী বলা চলে? বাউলরা কি মূলস্রোতের সংস্কৃতির থেকে পৃথক? সাব কালচারের যে আলোচনা এতক্ষণ করলাম সেই তত্ত্বের সাহায্যে ভারতীয় প্রেক্ষিতে এই ধারণা বোঝা যায় কি? নাকি অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে হবে?

সাময়িকপত্র

দেবাশিস গুপ্ত

সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় নিয়মিত ব্যবধানে। জার্নাল বা বিশেষ ধরনের বিনোদনমূলক রচনার ক্ষেত্রে ম্যাগাজিন নামে পরিচিত। সংবাদপত্র যেখানে মূলত দৈনিক মুদ্রিত হয় সস্তা পাতলা কাগজে, মাপে বড় এবং বাঁধাইহীন আকারে, সাময়িকপত্র তুলনামূলকভাবে মূল্যবান কাগজে ছাপা হয়। মাপে ছোটো এবং বাঁধাই করা। এর প্রকাশক্রম সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা এমনকী বার্ষিকও। তাৎক্ষণিক সংবাদের দিকে এর ঝোঁক কম এবং কদাচ সংবাদভিত্তিক হলেও জোর দেওয়া হয় প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত মতামতের উপর।

আদিযুগের সাময়িকপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মান ভাষায় প্রকাশিত Erbauliche *Monaths-Unterredungen* (১৬৬৩-১৬৬৮)। ফরাসি *Journal des Scavans* (১৬৬৫), (পরবর্তীকালে *Journal des Savants*) এবং ইংরেজি রয়্যাল সোসাইটি প্রকাশিত *Philosophical Transaction* (১৬৬৫)। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি প্রবন্ধপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক স্যার রিচার্ড স্টীল-এর *The Tatler* (১৭০৯-১৭১১), জোসেফ অ্যাডিসন সম্পাদিত *The Spectator* (১৭১১-১৭১২, ১৭১৪) বা প্রথিতযশা সাম্যুয়েল জন্‌সন্‌ প্রতিষ্ঠিত *The Rambler* (১৭৫০-১৭৫২) এবং *The Idler* (১৭৫৮-১৭৬০)। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জার্মান পত্রিকা *Allgemeine Literatur-Zeitung* (১৭৮৫-১৮৪৯) দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অধুনা বহুব্যবহৃত ম্যাগাজিন শব্দটির উদ্ভব হতে সাময়িকপত্রের সেই আদিযুগে লেগে গিয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। বিনোদনপত্র ইংরেজি *The Gentlemans Magazine* (১৭৩১-১৯০৭)-এ সাময়িকপত্রের বহুমুখী আমোদের চেহারাটা প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সচিত্র সাময়িকপত্র মুদ্রিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংল্যাণ্ডের *Illustrated London News* (১৮৪২), ফরাসি দেশের *L' Illustration* (১৮৪৩-১৯৪৪) এবং জার্মানির *Die Woche* (১৮৯৯-১৯৪০)। ব্যঙ্গচিত্র এবং রসালো রচনায় সমসাময়িকতাকে তুলে ধরে বিশ্ববিখ্যাত *Punch* (১৮৪১-২০০২)। ঐ একই ধারার পত্রিকা জার্মানির *Simplicissimus* (১৮৯৬-১৯৪৪, ১৯৫৬-১৯৬৭)।

ইতোমধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছোটো পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন আবির্ভূত হয়। ছোটো আকারে, অল্প পাঠক সংখ্যার নিরিখে পরীক্ষামূলক লেখালেখির ধারা মার্কিন লিটন ম্যাগাজিন *Poetry* (১৯১২), *Dial* (১৮৮০-১৯২৯) ইত্যাদিতে বিস্তর নতুন এবং উল্লেখযোগ্য লেখকের আগমন হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫৫ সালে প্রথমবার ক্রমবর্ধমান নির্মাণমূল্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে *Readers Digest* পত্রিকা বিজ্ঞাপন ছাপতে শুরু করে।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের জগতের আন্তর্জাতিক পথপ্রদর্শকদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাভাষায় প্রকাশিত একেবারে আদিযুগের কিছু পত্রপত্রিকার কথা স্মরণ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটু দেরীতে এলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না কত বিচিত্র ধরনের ভাবনাচিন্তা করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা একেবারে নতুন একটি মাধ্যমকে ঘিরে।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিকপত্র দিগদর্শন প্রকাশিত হল জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্ল্যার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় এপ্রিল ১৮১৮ সালে। পরের মাসেই শ্রীরামপুর মিশন ছাপল বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ। বাঙালি মালিকানার প্রথম সংবাদপত্র *বাঙ্গাল গেজেটি* জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হলেও *সমাচার দর্পণ*-এর সঙ্গে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হবার গৌরব কার প্রাপ্য সে নিয়ে তখন বিভিন্ন বাদানুবাদও হয়েছিল। ১৮২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা *পশ্বাবলী*। এর প্রথম পর্যায়ের সংকলক ছিলেন পাদরি লসন এবং সঙ্গে লেখাগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করতেন ডবলিউ এইচ পীয়র্স। এর প্রতি সংখ্যায় একটি করে জানোয়ারের বিবরণ এবং সেই সঙ্গে তার কাঠ খোদাই ছবি থাকত যেগুলি লসনকৃত। ১৮৩১-এ প্রথম মানের দিক থেকে সাবালকে বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়—*সংবাদ প্রভাকর*। রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন এর নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং এখানে গোড়ার দিকের রচনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং রঙ্গরাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'র নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা এই পত্রিকা ১৮৩১-১৮৩২ প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিকরূপে, ১৮৩৬-১৮৩৯-এ সপ্তাহে তিনবার থেকে অবিলম্বে ১৮৩৯-এর জুনে পরিণত হয় দৈনিক সংবাদপত্রে, অর্থাৎ বিলেতের একেবারে বিপরীতে এখানে সাময়িকপত্র পরিণত হয়েছে খবরের কাগজে। ১৮৩২-এ উল্লেখযোগ্য মাসিক বিজ্ঞানপত্রিকা *বিজ্ঞানসেবধি* প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে ঐ একই বছরে প্রকাশিত হয় একটি অদ্ভুত সাময়িকপত্র *দলবৃত্তান্ত*। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল সামাজিক দলাদলি। ১৮৩৯-এ প্রকাশিত হয়েছে *সংবাদ অরুণোদয়*—যেটি একটি দৈনিক সংবাদপত্র। জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র কয়েকমাস। মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজাররাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী* মফস্বল থেকে ছাপা প্রথম সংবাদপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। এই

পত্রিকার আয়ুষ্কাল মাত্র এক বছর। মাসিক *বেঙ্গল স্পেকটেটর* বেরিয়েছিল এপ্রিল ১৮৪২-এ। রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিক ইংরেজি-বাংলা এই দ্বিভাষিক পত্রের প্রকাশে সাহায্য করতেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নকুমার ঘোষ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা বিদ্যাদর্শন প্রথম ছাপা হয় ঐ ১৮৪২ এর জুন মাসে। পরের বছর ১৮৪৩-এ প্রকাশিত হয়েছে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* নামক মাসিক পত্রিকা যার সম্পাদক পরম্পরা অক্ষয়কুমার দত্ত-সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতীব কৌতূহলোদ্দীপক পক্ষীতত্ত্ববিষয়ক *পক্ষির বিবরণ* একটিমাত্র সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ১৯৪৪-এ। বাংলাদেশের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়েই সম্ভবত ১৮৪৯ সালের মে মাসে কাশীতে প্রকাশিত হয় *বারাণসী চন্দ্রোদয়* সাপ্তাহিক—প্রবাসী বাঙালিদের ছাপা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র মুখপত্র *বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন নিজেই। মাসে মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮৫৫ সালে। একালের নারীবাদী পত্রিকার পূর্বপুরুষ প্রথম মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩) সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রকাশনার এই ছোটো ঢেউ কীভাবে ইদানীং বিপুল উচ্ছ্বাসে আকড়ে পড়ে একেবারে পাল্টে দিচ্ছে বাংলা পত্রিকা এবং সাময়িকপত্রের জগৎকে তা আমাদের, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের, বিলক্ষণ জানা আছে।

সাহিত্যেতিহাস

স্বপন মজুমদার

সাহিত্যের বিকাশধারার পারম্পরিকতা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে সূচনা হয়েছিল সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রথন। তার পেছনে অবশ্য সক্রিয় ছিল স্বভাষার সাহিত্য বিষয়ে এক গৌরববোধ : বর্তমান—নিঃস্ব হোক বা গরীয়ান্—সময় থেকে তার ঐতিহ্য-উৎস জানার বাসনা। ইতিহাসের সময়-ধারণাকে মান্য করেই তৈরি হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের ইতিহাসের আদি সব নিদর্শন। একটি জনগোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠীর সত্তা-পরিচয় আবিষ্কারের আবেগ যুক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে। নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনবাদের চেতনা গভীরতা দিয়েছিল এই ইতিহাসবোধকে। যুগ-সময়ের ব্যাপ্তি হয়ে উঠেছিল তার মাত্রা।

সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ হবে কোন্ সূত্রে, সে-বিষয়ে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ আছে তার লেখকদের মধ্যে। সাহিত্যের ইতিহাসের আদিপর্বে যুগবিভাগে ছিল ইতিহাসের, এবং প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাসের, অনুসরণ। আকবর, প্রথম এলিজাবেথ, চতুর্দশ লুই, দ্বাদশ আল্‌ফান্‌সো প্রমুখ রাজপ্রধানদের নামে চিহ্নিত হয়েছিল সাহিত্যের যুগ। কখনো জন-এবং / বা ভাষা-গোষ্ঠীর নামে তাদের প্রাধান্যকাল পরিচিত হয়েছিল। যেমন, অ্যাংলো-নর্মান বা অ্যাংলো-স্যাক্সন, পাঠান বা মোগল যুগ। কখনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার নামে পরিচয় হয়েছিল তাঁর কালের। কালিদাস, শেক্সপিয়র, গ্যেটে, ভোল্‌তেয়ার বা রবীন্দ্র-যুগ তার উদাহরণ। শুধু সাহিত্যপ্রতিভাই-বা কেন, লুথার, ক্যাল্‌ভিন্, চৈতন্য, শঙ্করদেব বা নামকদেবের মতো ধর্মজনের যুগও অধ্যায় হিশেবে গৃহীত হতে দেখা যায় সাহিত্যের ইতিহাসে। আবার কোনো-কোনো সাহিত্য-ঐতিহাসিক সন-কালের চিহ্নে, কখনো শতাব্দীর পরিসরে বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা-ক্রান্তিকারী বিপ্লব বা প্রধান লেখকের জন্মমৃত্যুর নিরিখে যুগবিভাজন করতে উৎসাহী হয়েছেন। ধর্ম বা ধর্ম-সংঘাত, কখনো ধ্রুপদী যুগ, পুনর্জাগরণ, আলোকপ্রাপ্তি বা আধুনিকতার মতো ভাবচেতনা-নির্ভর সংজ্ঞাশব্দেও সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগ করেছেন ইতিহাসকার। এই জাতীয় প্রয়াসে কোথাও সন-কালের চিহ্ন যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনি কখনো উহ্যও রাখা হয় তার উল্লেখ। শতাব্দীর মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই বিবেচিত হয় না আর। কখনো এমনকী সৃষ্টিকেন্দ্রের বিচারেও সাহিত্যের ইতিহাস বিন্যস্ত করেছেন কোনো-কোনো সাহিত্য-ঐতিহাসিক। যেমন, *বেঙ্গলি লিটারেচর* বইতে জে. সি. ঘোষ। আবার কখনো দেখা যায়, এইসব বিবেচনা মিশ্রভাবে ব্যবহার করা হয়

একই সাহিত্যের ইতিহাসে। যদিও এমন উদাহরণকে আপসের চিহ্ন হিশেবেই গণ্য করেন তাত্ত্বিকেরা।

আমাদের পরিচিত সাহিত্যের ইতিহাসের অধিকাংশই রচিত হয়ে উঠেছে একটি ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রকে অবলম্বন করে। যদিও আমরা জানি, কোনো ভাষা-সাহিত্যই অন্য ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ-বর্জিত হয়ে বিকাশ পেতে পারে না; একক সাহিত্যের ইতিহাসে আদানপ্রদানের বিবরণ নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বহুভাষা-সাহিত্যের সমন্বিত ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বোধ করেছেন দেশবিদেশের একাধিক গবেষক ও প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসংঘ ও ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমি এ-বিষয়ে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছে। এমন সমন্বিত ইতিহাস সাধারণত বহু গবেষকের রচনার সংকলন হয়ে ওঠে ; আবার জে. এম্. কোহেনের *এ শর্ট হিস্ট্রি অফ্ ওয়েস্টার্ন লিটারেচর* বা শিশিরকুমার দাশের *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের* মতো একক লেখকের প্রযত্নে রচিত সমন্বিত সাহিত্য-ইতিহাসের বিরল উদাহরণও আছে আমাদের সামনে।

প্রথমদিকে সাহিত্যের মূল প্রবণতা ছিল লেখকমুখিন্। কীর্তিমান লেখকদের পরম্পরাসূত্রে গ্রথিত হত সাহিত্যের ইতিহাস। তাঁদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপ্রকাশের সময়টিই হয়ে উঠত এই সাহিত্যের ইতিহাসের দাঁড়া। ক্রমে প্রধান একটি সাহিত্যধারাকেই চিহ্নিত করা হল মূল স্রোত বলে। অন্যান্য সহগামী বা প্রতিগামী স্রোতগুলিকে মনে করা হল অনাবশ্যক বা গুরুত্বহীন। অচিরেই, এই নির্বাচনের সংকীর্ণতা ও পক্ষপাত বুঝতে পেরে, একটি দীর্ঘতর কালপর্বকে সাহিত্যের ইতিহাসকার দেখতে চাইলেন ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্যধারার সমবায় হিশেবে। ব্যক্তিপ্রতিভা বা গ্রন্থপ্রকাশকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে উপেক্ষিত হত যুগধর্ম ; আবার বিচিত্র সাহিত্যধারার উদ্ভব ও বিকাশের যান্ত্রিক ক্রমিকতা লক্ষ করতে গিয়ে হারিয়ে যেত সামগ্রিকতা। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের সংজ্ঞাও তাঁদের কাছে ছিল সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন সাহিত্যধারাকে অনপেক্ষ ও সর্বৈব স্বতন্ত্র মনে করতেন তাঁরা।

সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক-প্রাধান্যের পরিবর্তে সাহিত্য-ইতিহাসকারের লক্ষ্য হল সাহিত্যসৃষ্টিকে একটি ঘটনা হিশেবে গ্রহণ করে, বিচিত্র ধারা-উপধারায় বিন্যস্ত গ্রন্থ-রচনা বা প্রকাশের একটি সময়সূচি প্রস্তুত করা। স্রষ্টার তুলনায় সৃষ্টির প্রতিই তাঁদের অভিনিবেশ ছিল বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তেইন্-এর স্থান-কাল-জন সূত্র সাহিত্যের ইতিহাসচিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মার্ক্সের সমাজমুখিন চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগ।

সাহিত্যের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বের মুখ্য প্রবণতা সমাজ-পরিবেশের ভিন্নতায় সাহিত্যসৃষ্টির তারতম্য পর্যবেক্ষণ করা । একদিক থেকে এইসময়েই দেখা গেল সাহিত্যের প্রাণ ও তার প্রকরণের মধ্যে অন্তঃসাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা ; প্রগতির মাত্রায় মানবিক মূল্যবোধ আবিষ্কারের প্রয়াস। কিন্তু সবই এক সামাজিক তাৎপর্যে সাহিত্যবিচারের অধীনতা। এই পর্বে সমাজবোধ ও সাহিত্যের এক কৃত্রিম সর্বসমতার বিশ্বাস থেকে লেখা হতে থাকে সাহিত্যের ইতিহাস।

নব্য সমালোচনা, পাঠক-সংবেদী আলোচনা এবং সবশেষে রলা বার্তের লেখকের মৃত্যুঘোষণাকে বলা যায় ঠিক আগের যুগের প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র পর্যায়। এঁদের সার্বভৌম পাঠতত্ত্বের অভিঘাতে শুরু হয় সাহিত্য-ইতিহাস রচনার চতুর্থ পর্ব। এতাবৎ গৌণ বলে উপেক্ষিত সবধরনের ভাষানির্ভর রচনাকর্ম যেমন হয়ে উঠল সাহিত্য পদবাচ্য, তেমনি মানুষের অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখার একটি পদ্ধতিও গড়ে উঠল দ্রুত। সাহিত্যের ইতিহাস হয়ে উঠল সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্যের ইতিহাসে এতদিন যদি সন-তারিখের ছকে সাজানো হয়ে থাকে সাহিত্যের নিদর্শনগুলি, নবপর্যায়ের সাহিত্যেতিহাসে সাহিত্যকেই গ্রহণ করা হয় ধ্রুবক হিশেবে ; সাহিত্যের বাঁক ফেরাকে—তার সঙ্গে অন্য-অন্য ইতিহাসের সঙ্গতি না-থাকলেও—গ্রহণ করা হয় সময়চিহ্ন নির্ধারণের জন্য। সন-তারিখ অবশ্য অনিবার্যত বর্জন করা হয় না সেখানে, কিন্তু তার গুরুত্ব গৌণ হয়ে যায়। সাহিত্যকে একটি ক্রমপরিণতিশীল শিল্প হিশেবে এখন বিবেচনা করা হয় বলেই একইসঙ্গে একাধিক সাহিত্য ধারার সন্নিপাত, তাদের উত্থান-পতন-পুনরুত্থান বা বলিয়, তাদের বহুস্তরীয় সম্পর্ক—সহযোগ ও প্রতিযোগ, এমনকী মিশ্রণও সময় দিয়ে শনাক্ত করা যায় না অনেকসময়েই। লক্ষ্যগোচর হওয়ার আগে বা লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার পরেও যে তার স্তিমিত ইতিহাস ছিল বা থেকে যায়, এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতিপত্তির ধারণা। নবপর্যায়ের সাহিত্যেতিহাসে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতাপের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের কে-কি-কেন-কবে-কোথায়-এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন সাহিত্যের ইতিহাসকার। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান ছিল বিবরণ, সাহিত্যেতিহাসে সন্ধান। সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য ছিল উপকরণ, ইতিহাস তার প্রতিমা। সাহিত্যেতিহাসে ইতিহাস হল উপাদান, সাহিত্য তার প্রতিমা।

না-মেনে উপায় থাকে না, সাহিত্যকে এই সমগ্রতায় অনুধাবনের প্রয়াসে সাহিত্যেতিহাসও যেন হয়ে উঠতে চাইছে সংস্কৃতির ইতিহাস। তার সম্ভাব্য পূর্ণরূপ এখনই হয়ত ধরা দেয় নি আমাদের কাছে। কিন্তু সংশয় হয়, ক্রমে উপাদান-উপকরণে-উপচারে অবসিত হবে না তো সাহিত্য? সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অঙ্গ হিশেবে হয়ত দেখা হবে সাহিত্যের ইতিহাসকে, কিন্তু খর্ব হবে তার স্বরাটত্ব। সাধারণভাবে সে বড়ো সুখের সময় হবে না সাহিত্যের।

সিজোফ্রেনিয়া

কৌশিক দে

মানুষের মনোবিকলনের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিধিতে ক্রমবর্ধমান এবং বহুলদৃষ্ট অসুখটির নাম—সিজোফ্রেনিয়া। চিন্তা, অনুভব এবং আচরণের সম্পর্কের মধ্যে পারম্পর্যহীনতা এবং সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে আমরা সিজোফ্রেনিয়া বলে থাকি। বিচিত্র লক্ষণ এবং বিস্তৃত পরিধির কারণে এককথায় এই অসুখটির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মনোবিজ্ঞানী জেমস্ সি. কোলম্যানকে উদ্ধৃত করে মোটামুটিভাবে আমরা একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারি—'Schizophrenia is the descriptive term for a group of psychotic disorders characterized by gross distoritions of reality ; withdrawal from social interaction, and the disorganization and fragmentation of perception, thought and emotion.' (*ABNORMAL PSYCHOLOGY AND MODERN LIFE* / Page -292)

'সিজোফ্রেনিয়া' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দুটি গ্রিক শব্দের কাছে ঋণী (skhizo-split, phren mind)। এই জাতীয় অসুখের কেস হিস্ট্রি প্রথম বর্ণনা করেন বেলজিয়ামনিবাসী মনোবিজ্ঞানী মোরেল, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এর নাম দেন—'dementia precox' (Mental deterioration at an early age)। ক্রমশ বহুল প্রচলনের কারণে জার্মান মনোবিজ্ঞানী ক্রেপেলিন শব্দটির ল্যাটিন ফর্ম 'dementia praecox' নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 'Schizophrenia' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সুইস মনোবিজ্ঞানী ব্লিউলার, যার অর্থ—Splitting of the Personality।

সিজোফ্রেনিয়া কোনো বিশেষ দেশ-কাল-পরিস্থিতির ফসল নয়। আধুনিক জীবনে সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষই এই অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও, আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে দেখা গেছে শতকরা একজন মানুষ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। পরিসংখ্যানগত ব্যাপ্তির মতো সিজোফ্রেনিয়ার রোগলক্ষণকেও সীমাবদ্ধ পরিসরে বাঁধা অসম্ভব। সাধারণত শৈশবেই প্রকাশিত এই রোগটির রোগীর ক্ষেত্রে একাকিত্ব, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে আগ্রহের ক্রমাবনতি, দিবাস্বপ্নে আচ্ছন্নতা, আচরণে অসংলগ্নতা এবং নির্দিষ্ট উদ্দীপকের

বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। চিন্তন প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্য এবং সমস্যা-সমাধান ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অপারগতার ফলে মনোজাগতিক ক্রমাবনতি (Mantal Deterioration) ঘটে চলে। সিজোফ্রেনিয়ার অপর অন্যতম লক্ষণ, এক্ষেত্রে বহির্বাস্তব (External reality) ও অন্তর্বাস্তব(Inner reality)-এর যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রোগী সর্বদাই তার অন্তর্বাস্তবের দুনিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। আর অন্তর্বাস্তবে তীব্র আলোড়ন ও উদ্বেগের কারণেই জন্ম নেয় নানা ভ্রমাত্মক ভাবনা (Deluison & Hallusination)। আমার সম্পর্কে আশেপাশের সবাই আলোচনা করছে বা টিভিতে আমাকে নিয়েই কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে (Delusion of reference), চারপাশের বিভিন্ন শত্রু আমাকে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে (Delusion of influence) অথবা ভয়ঙ্কর (যা বাস্তবিক অসম্ভব) বিভিন্ন রোগ দ্বারা আমি আক্রান্ত প্রভৃতি ডিলিউসনে রোগী আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এমনকি বহু বছর আগেই আমার মৃত্যু হয়েছে এবং বর্তমানে আমার আত্মাটুকু অবস্থান করছে (Nihilstic delusion) জাতীয় অলীক বিশ্বাসের রাজ্যে সর্বদা বসবাস করাও অসম্ভব নয়। এর সঙ্গে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে নানাপ্রকার হ্যালুসিনেশন। বলা কর্তব্য অবচেতনে উদ্বেগের কারণে স্বাভাবিক মানুষের মনেও এই জাতীয় কোনো একটি ভাবনার ক্ষণিক উদয় অসম্ভব নয়। কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে এর প্রায় সবকটি স্থায়ীভাবে রোগীর অজান্তেই তাঁর আচরণকে প্রভাবিত করে চলে।

রোগলক্ষণ তো রোগীর আচরণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত ; কিন্তু তার উৎস মানুষের মনের গহনতম অন্ধকারে নিহিত। ফ্রয়েড সাহেব মনে করেছিলেন, সিজোফ্রেনিয়া আসলে যৌন-প্রক্ষোভ বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ফিরে যাওয়ার লক্ষণ। তাঁর মতে সিজোফ্রেনিয়ার উৎসে আছে কোনো নির্দিষ্ট ভাবনার মধ্যে সংবদ্ধতা এবং তার ফলে বস্তুবিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতা। প্রকৃতপক্ষে এ-এক 'নার্সিসিস্টিক ডিসঅর্ডার', যা ইগোর সংহতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বাধা দেয়। সি. জে. ইউঙ্-এর মতে, কালেকটিভ আনকনসাসনেসের গভীরতম স্তরে পারিপার্শ্বিকের প্রতি সম্পৃক্তিহীনতা ও বিচ্ছিন্নতাই সিজোফ্রেনিয়ার মূলে। এহ বাহ্য, আমরা আলোচনা কেন্দ্রিত করতে চাই ক্রমবর্ধমান এই অসুখটির মূলে সমাজ-অর্থনীতি ও পরিবেশগত কারণগুলির প্রতি। যেহেতু শৈশবেই সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলি সাধারণত প্রকাশ পায় সেহেতু পিতামাতার, বিশেষত মায়ের একটি ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। এল. ইজেনবার্গ, জে. এল. ডেসপার্ট, বি. র‍্যাঙ্ক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী মনে করেছেন : সমস্যাপীড়িত, নার্সিসিস্টিক ও মাতৃস্নেহে শীতল 'সিজোজেনিক' মায়ের সন্তানের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হবার আশংকা অনেক বেশি। ফ্রেক ও লিড গত শতাব্দীর ছয়েক দশকে একটি সমীক্ষায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন শীতল দাম্পত্যজীবন, কর্মোদ্যোগহীন পিতা এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মায়ের সন্তান সিজোফ্রেনিক হতে পারে। ১৯৬০ সালে একটি সমীক্ষায় বোয়েন দেখান 'ইমোশনাল ডিভোর্স' ঘটে যাওয়া দাম্পত্যসম্পর্কে জন্ম নেওয়া সন্তান সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে 'হাই রিস্ক জোন'-এ বসবাস করছে।

পারিবারিক কাঠামোর বাইরে বৃহত্তর সামাজিক প্রতিবেশটিও উল্লেখনীয়। সামাজিক সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন, উচ্চবিত্ত পরিকাঠামোয় মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ শিশু আধুনিক যুগে প্রায়শই সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। একইসঙ্গে অনুন্নত আর্থসামাজিক পরিকাঠামো, শহরবাসী নিম্নবিত্ত মানুষের নিরাপত্তাহীনতা এবং অতিদ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সিজোফ্রেনিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। ক্যারোথারস্ আফ্রিকার অনুন্নত উপজাতিদের মধ্যে 'হেবেফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া'-র প্রাচুর্য লক্ষ করে তার কারণ হিসাবে 'ইগো ডিফেন্স মেকানিজম'-এর অনুপযুক্ত বিকাশকেই চিহ্নিত করেছিলেন। ফিল্ড ১৯৬০ সালে প্রমাণ করেন ঘানার গ্রাম্য আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও তদ্‌জনিত ভীতি অসংখ্য সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর জন্ম দিয়েছে।

বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে দৃষ্ট এই অসুখটি প্রায়শই আমাদের সাহিত্য বা চিত্রকলারও কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। কাফকার *দি ট্রায়াল* উপন্যাসের নায়ক জোসেফ কে. স্পষ্টতই সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। অথবা হানা গ্রিনের আত্মজৈবনিক উপন্যাস *আই নেভার প্রমিসড্ ইউ এ রোজ গার্ডেন* (১৯৬৪)-এ কেন্দ্রীয় চরিত্র সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত কিশোরীটি, যে নিজেকে বারবার সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এই প্রমাণ করতে যে, সে জৈবিক উপাদানে গঠিত নয়।

বহির্বাস্তব থেকে এই সম্পূর্ণ বিযুক্তির নিরাময়ের প্রশ্নটিও অনস্বীকার্য। বলাই বাহুল্য মনের ক্যান্সাররূপী সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা সময়সাপেক্ষ এবং তা আক্রান্তের পরিবার, স্বজন ও চিকিৎসক উভয়পক্ষেরই ধৈর্য্য, মনোযোগ ও সহানুভূতি দাবি করে। বর্তমানে রোগীর উত্তেজনা, চিন্তাশক্তির পারম্পর্যহীনতা ইত্যাদি কমাতে এবং তার আগ্রহ ও মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে উচ্চমাত্রায় ঘুমের ওষুধ, ক্লান্তিনাশক ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হচ্ছে। গ্রুপ থেরাপিও এদের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। সব থেকে বড় কথা মনোরাজ্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও দ্বন্দ্বমথিত এই মানুষগুলির প্রতি আমাদের ধৈর্য্যশীল সহানুভূতি ও ভালোবাসাই তাদের রোগযন্ত্রণার উপশম ঘটাতে সক্ষম।

সিনট্যাক্স

তিস্তা বাগচি

গ্রিক উপসর্গ Ouv-syn 'সহ-, সং-' Tawis Ta'xis 'সারি, পরম্পরা' বিশেষ্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে ইংরেজি syntax (সিনট্যাক্স) শব্দটি। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'অন্বয়'-এর ধারণার মধ্যে সিনট্যাক্সের অনেক নিয়ম-নীতি বিধৃত হয়েছে। অন্বয় যেমন, সিনট্যাক্সও তেমনি মূলত ব্যাকরণের এমন একটি শাখা, যা বাক্যে পদের বিন্যাস ও পারম্পর্য বিশ্লেষণ করে ভাষার গঠনকে বোঝার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সিনট্যাক্স ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের শাখাবিশেষ।

এই হিসেবে বলা যায়, অন্বয়ের প্রথম সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ নিয়মনির্দেশ প্রাচীন (আনুমানিক ৬ষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের) সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে বিধৃত। শব্দ বা পদকে 'নাম', 'আখ্যাত' (সাধারণভাবে বলতে গেলে ক্রিয়াপদ), 'উপসর্গ' ও 'নিপাত' এই চারটি শ্রেণির কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে বাক্যের অন্বয়গঠনে সেই শব্দ বা পদের ভূমিকা নির্ধারণ। এছাড়া বিশেষ্য বা সর্বনামের কারক ও বিভক্তি নির্ধারণে তো বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে সেই বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্পর্কের (বা সম্পর্কের অভাবের, যেমন ষষ্ঠী-বিভক্তির ক্ষেত্রে) বিশেষ অন্বয়গত চরিত্র নির্ণয় করা একান্ত অপরিহার্য।

প্রাচীন গ্রিস ও রোমের বৈয়াকরণ ও ভাষাচিন্তকেরা ছাড়াও সিনট্যাক্সের পূর্বসূরি হিসেবে মধ্যযুগীয় আরব ভাষাতাত্ত্বিকেরা অন্যতম। বোগদাদ, অল-বস্‌রা এবং অল-কুফায় আরব বৈয়াকরণদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণচর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে—তাঁদের মধ্যে ইব্‌ন্ জিন্নি, তাঁর শিষ্য সিবাওয়ায়হি প্রমুখ বিচক্ষণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ আজও স্মরণীয়। এই বৈয়াকরণেরা আরবি ভাষায় বাক্যের গঠন সম্পর্কে বহু তথ্য ও নিরীক্ষা উপস্থাপন করেছেন যা অন্যান্য ভাষায় বাক্যের গঠন সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং যাকে আজ আমরা পুনরাবিষ্কার করছি।

তবে গত চল্লিশ বছরে সিনট্যাক্স এক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, ভাষা ও চিন্তার জ্ঞানগত মনস্তত্ত্বের (cognitive psychology-র) অনন্য এক নিশানা হিসেবে। সিনট্যাক্সের এই গুরুত্বের আধুনিক বীজ কিন্তু পাওয়া যায় তার অন্তত ত্রিশ বছর আগেই, দিনেমার ভাষাবিদ অটো ইয়েসপারসেন (Otto Jespersen)-এর পৃথুল ইংরেজি ব্যাকরণে। ইয়েসপারসেন দেখান যে সিনট্যাক্স কেবল বাক্যে শব্দাবলির

পারম্পর্যের যান্ত্রিক নির্দেশমাত্র নয়, তাতে চিন্তার গঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ হদিশও পাওয়া যায়। এই ধারণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান—স্বতন্ত্রভাবে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিদ এডওয়ার্ড সাপির (Edward Sapir) এবং তারপরে তাঁর ছাত্র বেনজামিন লি হোয়র্ফ (Benjamin Lee Whorf)। সাপিরই প্রথম ১৯২১ সাল নাগাদ তাঁর Language বইটিতে বাক্যে Immediate Constituent Analysis প্রয়োগ করে তার অন্বয়গঠন বোঝাবার কথা বলেন। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—

পাখি ফল খায় (বাক্য)
[পাখি] [ফল খায়]। (উদ্দেশ্য : বিশেষ্য) (বিধেয় : ক্রিয়াজোট)
[পাখি] [ফল] [খায়]। (উদ্দেশ্য : বিশেষ্য) (বিধেয় : (কর্ম) (ক্রিয়া))

অর্থাৎ বাক্যকে ধাপে ধাপে তার সংগঠক শব্দজোট (Phrase) এবং শব্দাবলিতে (words-এ) ভেঙে তার ন্যূনতম সংগঠনগুলোতে (ultimate constituents-এ) পৌছানো হয় এই Immediate Constituent Analysis পদ্ধতিতে। এ-পদ্ধতি মার্কিন এবং ইউরোপীয় গঠনবাদী-বর্ণনবাদী (Descriptivist-Structuralist) ভাষাবিজ্ঞানীদের বেশ মনে ধরল, এবং লেনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leonerd Bloomfield), এমিল বাঁভেনিস্ত (Emile Benveniste) প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ইউরোপীয় মার্কিন এবং অন্য দেশের নানা ভাষায় এর প্রয়োগ করতে লেগে গেলেন বিশ ও ত্রিশের দশক থেকে। তার পরের দু-তিন দশকে ব্লুমফিল্ডের শিষ্যস্থানীয় আরো নানা ভাষাবিজ্ঞানীর বই প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হল এই পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে।

সিন্‌ট্যাক্সের রমরমার দিন কিন্তু শুরু হল তার পরে। চল্লিশের দশকে জেলিগ হ্যারিস নামে তৎকালীন গঠনবাদী-বর্ণনবাদী (Structualist-Descriptist) ভাষাবিজ্ঞানের এক মার্কিন অধ্যাপক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, Immediate Constituent Analysis-এর মাধ্যমে বাক্যকে ভাঙার পরেও বাক্যের অন্বয় সম্পর্কে, ভাষাবিজ্ঞানীর আরও কিছু বলা বাকি থেকে যায়। কর্তৃবাচ্যের বাক্য 'আমি এ বইটা পড়েছি' কর্মবাচ্যের বাক্য 'এ বইটা আমার পড়া'—এই দুয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, ওই পদ্ধতিতে তো তা পুরোপুরি বিধৃত হয় না। তবে?

হ্যারিস তাঁর তরুণ ছাত্র নোয়াম চমস্কির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে স্থির করলেন, দুই বাক্য—যেমন কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য এবং কর্মবাচ্যে মোটামুটি এই অর্থবোধক বাক্য—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'সংবর্তন-নিয়ম' বা transformational rule-এর মাধ্যমে। এই সময়ে পাশাপাশি মনস্তত্ত্বের চর্চার জগতে আরেকটি ব্যাপার ঘটছিল—ভাষাকে নিছকই শেখা বুলির অবস্থোপযোগী পুনরাবৃত্তি বলে ব্লুমফিল্ড এবং তার পরবর্তীকালের মনস্তত্ত্ববিদ স্কিনার (B. F. Skinner) যে সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন তার সত্যতা নিয়ে সংশয় উদ্রেক করার মতো অন্বয়ভিত্তিক অনেক তথ্য জমে উঠছিল—যার শুরু ধরা যায় এ হিসেবে সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তিবাদী (rationalist) ধারায় ফ্রান্সে প্রকাশিত *Port Royal* ব্যাকরণে। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত নোয়াম চমস্কির প্রথম বই Syntactic Structures অনেকখানি এই ধারায় আধুনিক অন্বয়-বিষয়ক

বই। ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Language পত্রিকায় ভাষার মনস্তত্ত্ব বিষয়ে স্কিনারের *Verbal Behaviour* বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়—চমস্কি এতে ব্লুমফিল্ড-এবং স্কিনারের behaviourist বা আচরণবাদী ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক ও মানসিক ভিত্তি সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন। চমস্কির *Syntatic Structures* বইটি এবং এই সমালোচনাটি বাক্যের গঠন সম্পর্কে প্রচলিত আচরণবাদী ও গঠনবাদী-বর্ণনবাদী ধ্যান-ধারণাকে আমূল পালটে দেবার প্রক্রিয়া উদঘাটন করে দেয়। ভাষা যে কেবল আচার-আচরণের এক বিশেষ নিদর্শনমাত্র নয়, তার সঙ্গে মানুষের বহুমুখী চিন্তনক্ষমতা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই বোধ বাক্যের অন্তর্গত অন্বয় বা 'সিনট্যাক্স'-এর চর্চায় বিরাট এক দিগন্ত খুলে দেয় যা আজও এগিয়ে চলেছে।

আধুনিক সিনট্যাক্সের নানা তত্ত্ব আজ প্রচলিত, যেমন চমস্কির 'সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ' (Transformational Generative Grammar) এবং তার উত্তরসূরি 'অনুশাসন-বন্ধন-তত্ত্ব' (Government & Binding Theory) ও তারও পরবর্তী বর্তমানে প্রচলিত Minimalist Programme ছাড়াও জোন ব্রেজনান কর্তৃক প্রবর্তিত Lexical Functional Grammar সংবর্তনহীন সঞ্জননী ব্যাকরণ Generalised Phrase Structure Grammar ও জেরল্ড সেডকের Autolexical Grammar বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নানান তত্ত্বের মধ্যে সিনট্যাক্সের কয়েকটি সাধারণ বিষয় লক্ষ করা যায়। এগুলি হল :

১. শব্দসম্ভার বা Lexicon-এর গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি। ব্যাকরণগত অনেক তথ্য এতে নিহিত—যেমন অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

২. বাক্য বা বাক্যাংশের গঠন-নির্দেশক নিয়মাবলি বা Phrase structure rules। উদাহরণস্বরূপ :

i. বাক্য → বিশেষ্যজোট ক্রিয়াজোট [ঝাউ-ডাল / দেয় তাল]

ii. ক্রিয়াজোট → ক্রিয়া বিশেষ্যজোট [দেয় / তাল]—ইত্যাদি।

৩. ব্যাকরণকে মূলত বাক্ ও অর্থের মধ্যে সংযোগস্থাপন পদ্ধতি হিসেবে দেখা, সুইস গঠনবাদী ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের (Ferdinand de Saussure) ভাষাগত 'বাচ্য' (Signified) ও 'বাচক' (Signifier)-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে।

৪. ব্যাকরণকে খানিকটা গণিতের ধাঁচে 'সঞ্জননী' (generative) নিয়মাবলির সমষ্টি হিসেবে দেখা, নিছক অন্বয়ের মামুলি বর্ণনা হিসেবে নয়।

৫. কর্তা কর্ম গৌণকর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারকের স্বীকৃতি।

৬. প্রত্যেক সুসংবদ্ধ বাক্যের বাক্যার্থব্যঞ্জক Semantic representation বা logical from-এর স্বীকৃতি।

৭. ভাষার সৃজনশীলতার অন্বয়গত স্বীকৃতি (যার উপরে চমস্কিই প্রথম জোর দেন)।

সিনট্যাক্সের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর যেকোনো ভাষার মধ্যেই অন্বয়ের যে সাধারণ সর্বজনীন সূত্রাবলি নিহিত সেগুলিকে উদ্‌ঘাটন করা—অর্থাৎ Diversal Grammar-এর চরিত্রটি সম্যকভাবে জানা। যেমন দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের কারক পৃথিবীর সব ভাষাতেই বিদ্যমান (কর্তা বা agent, কর্ম বা theme / patient, গৌণকর্ম বা goal / recipient ইত্যাদি)। আরো দেখা যায়, প্রশ্নবোধক শব্দ হয় বাক্যের আদিতে এসে বসে (যেমন ইংরেজিতে) নয়তো তার নিজস্ব জায়গাতেই থাকে কিন্তু অর্থগতভাবে গোটা প্রশ্নবাক্যের উপরেই প্রভাব ফেলে (যেমন বাংলায় : 'রাম কী পড়ছে?' উত্তর : '(রাম) খবরের কাগজ (পড়ছে)।' এবং সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদি শব্দের প্রকার মোটামুটি যে-কোনো ভাষাতেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

সিনট্যাক্স আজ কাজে লাগছে নানান ক্ষেত্রে, যেমন মনস্তত্ত্বে, ভাষাশিক্ষণে, কম্‌পিউটার-প্রযুক্তির কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, দর্শনচর্চায় এবং সাহিত্যিক বিশ্লেষণে।

সিনট্যাগমা ও প্যারাডাইম

কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সিনট্যাগমা বা ক্রমান্বয় এবং প্যারাডাইম বা পরিকল্প হল চিহ্নতত্ত্বের দুটি পরিভাষা। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) *কোর্স ইন জেনারেল লিঙ্গুইস্টিকস* (প্রথম সংস্করণ, মরণোত্তর : ১৯১৫) সিনট্যাগম্যাটিক রিলেশান বা ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক এবং এসোসিয়েটিভ রিলেশান বা আনুষঙ্গিক সম্পর্ক নামে ভাষা প্রবাহের দু'ধরনের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এই বিশেষ পরিভাষা দুটির জনক যেহেতু সোস্যুর, তাই প্রথমত সোস্যুরের ভাষাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতেই পরিভাষার পরিচিতিকরণ সঙ্গত। তাঁর মতে, ভাষার গঠন বা তার নিয়মজালের বাইরে আর যা-কিছু ভাষার সঙ্গে জড়িত, তা ভাষাতত্ত্বের বাইরের ব্যাপার। এই বাহ্যভাষাতত্ত্ব ভাষাতাত্ত্বিকদের বিচরণস্থল নয়। ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনার পরিসীমা যে-অংশে নিবদ্ধ, তার নাম অন্তর্ভাষাতত্ত্ব—যেখানে মানুষের দৈনন্দিন বচন-বাচনের বদলে ভাষা হয়ে ওঠে একটি তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

এরকমই এক ভাষাবিশ্বের, ভাষাকাল মাঝে, সোস্যুর মনে করেন আমাদের ভাষাপ্রবাহের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেই এক ধরনের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি উপাদানই হয় অন্য একটি উপাদানের মতো, নয়তো তার থেকে আলাদা। হয় প্রকরণের দিক থেকে নয় বিষয়ের বিচারে, হয় রূপের মাপকাঠিতে নয় অর্থের দাঁড়িপাল্লায় এরা প্রত্যেক উপাদানই প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত। যেমন বাংলা ক্রিয়াপদ খাচ্ছে, যাচ্ছে, করছে, বলছে—প্রত্যেকের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, রূপের সম্পর্ক। প্রত্যেকের গঠনেই 'ছে' একটা সামান্য উপাদান। আবার 'শিক্ষক' ও 'শিক্ষকতা', 'গুরু' ও 'গুরুত্ব' এই শব্দগুচ্ছে যথাক্রমে 'শিক্ষক ও গুরু' সামান্য উপাদান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক হতে পারে অর্থগত। যেমন 'গুরু', 'শিক্ষক', 'অধ্যাপক' তিনটি শব্দই অর্থগত দিক থেকে সম্পর্কিত। ভাষা-চিহ্নের মধ্যেকার এইসব মিল এবং অমিলকে দুটো আলাদা শ্রেণিতে ভাগ করার কথা বলেন সোস্যুর, যাদের প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট মূল্য ও সত্তা আছে। এই দুই শ্রেণি আমাদের দু'ধরনের মনন ক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। ভাষার জীবনচক্রে এরা একান্তই জরুরি।

সোস্যুরের মতে, বাচনক্রিয়ায় শব্দের সঙ্গে শব্দের যে সম্পর্ক তা ভাষার একমুখী ধারাবাহিক প্রকৃতিকে ভিত্তি করেই নির্মিত। এর ফলে একই সঙ্গে দু'টো উপাদানের উচ্চারণ অসম্ভব। বলা-কওয়ার ধারাবাহিকতায় এই উপাদানগুলো যথাক্রমে সজ্জিত। ভাষাপ্রবাহের মধ্যে এ ধরনের সমরৈখিক সংযুক্তি সোস্যুর বলেন সিনট্যাগম্যাটিক

রিলেশান বা ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক। ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক হল কোনো একটি পরম্পরাগত উপাদানের সম্পর্ক। তা' হতে পারে ধ্বনিমূলের সঙ্গে ধ্বনিমূলের, দলের সঙ্গে দলের, বাকরণের ক্ষুদ্রতম অর্থময় একটি এককের সঙ্গে আরেকটি এককের, পদগুচ্ছের সঙ্গে পদগুচ্ছের। অন্যদিকে, শব্দের সঙ্গে শব্দের আরেক আলাদা রকমের সম্পর্কও সম্ভব। এমন ভাষা-চিহ্ন যা আমাদের মননে একই সঙ্গে একই রকম আরো অনেক উপাদানের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, বানায় বিচিত্র সম্পর্কের একটি চিহ্নদল যা কিনা মোটেই সমরৈখিক নয়, বরং বাড়ির ভাঁড়ারের মতো তারা মগজে বসে থাকে আর সেখান থেকে ভাষার জোগান হয় বক্তার মুখে—একেই সোস্যুর বলেন অ্যাসোসিয়েটিভ রিলেশান বা আনুষঙ্গিক সম্পর্ক। পরে এর নামকরণ হয় প্যারিডিগম্যাটিক রিলেশান বা পারিকল্পিক সম্পর্ক। একে 'অনুপস্থিতির সম্পর্ক'-ও বলা যায় কারণ এখানে উপাদানগুলো তাদেরই মতো, কিন্তু অনুপস্থিত, উপাদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সোস্যুরের ভাষাতত্ত্বে এই পরিভাষা দু'টির উল্লেখ থাকলেও তা' ক্রমশই ভাষাতত্ত্বের চৌহদ্দি পেরিয়ে চিহ্নতত্ত্বের আলোচনায়ও হয়ে ওঠে আবশ্যিক। সোস্যুরই একটি বাড়ির উপমা দিয়ে বোঝাতে চান বিষয়টি। বাড়ির মধ্যে যে থামগুলো থাকে, তাদের মধ্যে একটা যোগ আছে, আবার থামগুলির সঙ্গে আছে বাড়ির একটা যোগাযোগ। এই যোগ বা সম্পর্ক হল ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক। আর বাড়ির মধ্যে যদি নানা রকম থাম থাকে, তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হল পারিকল্পিক সম্পর্ক।

ধরা যাক দুটি অক্ষ—ক্রমান্বয়িক এবং পারিকল্পিক। মনে করা যাক দুটি অক্ষেই চিহ্ন হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে কিছু কাপড়চোপড়ের নাম। ক্রমান্বয়িক অক্ষটি আনুভূমিক। তার মধ্যে ক্রমানুযায়ী চলে আসতে পারে... প্যান্টি... ব্রা... সালোয়ার... কামিজ... সুয়েটার... স্কার্ফ... টুপি। অর্থাৎ একটি মেয়ে যে-ক্রম অনুসারে পোশাক আশাক পরে তারই একটি নমুনা। পারিকল্পিক অক্ষ উল্লম্ব। তাই এতে কোনো ক্রম না মেনে একটি বিশেষ কোনো কাপড়ের নাম-চিহ্নই মনে করিয়ে দিতে পারে অন্যগুলো—শাড়ি, ফ্রক, পাঞ্জাবি, সালোয়ার, ব্লাউজ, নাইটি, জামা, চাদর, মেখলা...। অর্থাৎ যে কোনো একটি নাম-চিহ্নের সঙ্গ ধরেই চলে আসছে বাকিগুলো। ঠিক একইভাবে যদি আরেকটি ক্রমান্বয়িক অক্ষে থাকে মানুষের খাদ্যতালিকা, তার রূপ হতে পারে—...ভাত...উচ্ছে... ডাল...বেগুনভাজা...আলুর দম...ইলিশ মাছের কালিয়া...দই...পায়েস। আবার সুকুমার রায় যখন লেখেন—'ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য, / আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব চোষ্য, / রুটি লুচি, ভাজাভাজি টক ঝাল, মিষ্টি / ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি'—তখন এক নিমেষে ভেসে ওঠে বাঙালি খাওয়ার একটি পরিকল্প। এতে কোনো খাদ্যাভ্যাসের ক্রম নেই, আছে শুধু 'যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে'।

ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক বর্ণনা করে কার পেছনে কে বা কীসের পেছনে কী। অন্যদিকে পারিকল্পিক সম্পর্ক বলে দেয় কার সঙ্গে কে বা কীসের সঙ্গে কী। ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক হল কালগত ক্রমের যথাযথ রূপ আর পারিকল্পিক সম্পর্ক এই যথাযথ রূপটিকেই অপ্রকৃত করে তোলে। ক্রমান্বয়িক আনুভূমিক, পারিকল্পিক উল্লম্ব। তাই বোধ হয় সোস্যুর বলেছিলেন, এই সম্পর্ক দু'টিকে বুঝতে গেলে, আসলে, তাদের বৈপরীত্যকেই বুঝতে হবে।

সিম্বলিজম

শোভন তরফদার

মানুষের ভাষার শরীরে অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পড়লে যে নিছক 'এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' বেরিয়ে আসে, সেকথা জীবনানন্দই জানিয়েছেন। আর অনুভূতি দেশের এই আলোর সঙ্গে, *কবিতার কথা*-র শরণার্থী হয়ে বলি, জীবনের গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ এক সম্বন্ধ রয়েছে। এই গোপন অন্বয়ই সিম্বলিজমের প্রাণ ভোমরা। অথবা প্রতীকবাদের।

'Symbol' শব্দটির উৎস ক্রিয়াপদ 'symballein' যার অর্থ একত্রিত করা (to put together) এবং সম্পর্কিত বিশেষ্য 'symbolon'—অর্থাৎ চিহ্ন (mark)। এই বিশেষ্যটির অর্থনির্মিতির গড়নটি বেশ মজার। কোনো চুক্তি সম্পাদনের পরে সম্মতির স্মারক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ দুটি পক্ষ একটি করে অর্ধমুদ্রা নিয়ে যেত, যেগুলির নাম হত symbolon; খেয়াল করতে হবে, এই অর্ধগুলির সার্থকতা একান্তভাবেই পরস্পর সাপেক্ষ এবং এইভাবে প্রতীক ও তার অনুষঙ্গী বিষয় (subject)-এর সম্বন্ধও অঙ্গাঙ্গি এই অর্থে যে একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অনিকেত হয়ে পড়বে। 'যে ঋতু আমার মাঝে দেখো তুমি, তার নাম শীত'—বলেছিলেন শেক্সপিয়র মূর্ত আর বিমূর্তের আশ্চর্য যোগাযোগে—এবং ইংলিশ চ্যানেলের পরপারে আরেক কবি, যিনি বেশ কয়েক শতকের কনিষ্ঠ, লিখলেন—'হেমন্তের অমল আকাশ তুমি, অরুণবরণ!' এখানেও প্রতিমার মধ্যে দেখা দিল ভাবরূপ ও ভাবনার রসায়ন। বিচিত্র নয়, কারণ অনুভবী এই কবি বাহ্য জগৎকে গ্রহণ করতে চাইলেন প্রতীক হিসাবে। 'বস্তুপুঞ্জ এক গোপন সত্যের ব্যঞ্জনামাত্র, বর্ণ গন্ধ ধ্বনির মধ্যে মূলত কোনও ভেদ নেই, তারা এক আইডিয়ারই সংকেত এবং কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে অন্তরালবর্তী সত্যিকার জগৎকে উন্মোচিত করবে, এই তাঁর বক্তব্য।' (*ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে*, অরুণ মিত্র পৃ. ৫৪) বলা বাহুল্য, ইনি শার্ল বোদলেয়র, ফরাসি সিম্বলিজমের পুরোধা।

ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যাবে ফরাসি কবিতায় স্তর হিসাবে 'parnassianism'-এর প্রখর বিষয়মুখিতার পরেই উনিশ শতকি ফরাসি রোমান্টিকতার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করে এনেছিল সিম্বলিজম। সংবেদন, কল্পনা এবং সংগীতময়তার মিশ্রণে ফরাসি কবিতার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ব্যঞ্জনার দিকে—যে ব্যঞ্জনা স্পষ্টত অনুভূতি-নির্ভর এবং যে অনুভূতি-নির্ভরতা থেকে উঠে এল লিরিকের এক নতুন চেহারা। ১৮২৪-এ গ্যয়টে

লিখছেন যে সিম্বলিজম কোনও phenomenon-কে রূপান্তরিত করে Idea-তে এবং Idea-কে বদলে নেয় Image-এ, কিন্তু এই শেষোক্ত রূপান্তরে Ideaটি ভাবকল্পের মধ্যে কখনোই পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায় না। ১৯৩৫ সালে গোতিয়ে-র *মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যা* উপন্যাসের ভূমিকায় প্রথম প্রস্তাবিত হল 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর সূত্র। আমেরিকার এডগার অ্যালান পো ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন কবিতার স্বাশ্রয়ী তাৎপর্যের কথা। ১৮৫৭-তে প্রকাশিত হল বোদলেয়রের *লে ফ্লুর দ্যু মাল*।

আমরা জানি, এর প্রায় তিরিশ বছর পরে ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ তারিখে *ফিগারো* পত্রিকায় Jean Moreas প্রকাশ করবেন সিম্বলিস্ট ইশতেহার এবং ১৮৯১-তে Jules Huret-এর বিখ্যাত *Enquete sur l'evolution litteraire* সূচিত করবে সিম্বলিস্টদের জয়যাত্রা। এসব বোদলেয়র দেখে যেতে পারেননি। ১৮৬৭-তে অকালমৃত্যুর আগে ১৮৮৫-তে তরুণ ভের্লেন যখন *লে ফ্লুর*-এর প্রশংসায় মুখর, তখন ভের্লেনের দুটি প্রবন্ধ মা-কে পাঠিয়ে সঙ্গে চিঠিতে কিছুটা খেদ নিয়েই লিখলেন তিনি—'মনে হয় বোদলেয়র-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে।' তিনি জানতেও পারবেন না যে ১৮৭১-এই র‍্যাবোঁ তাঁকে প্রণতি জানাবেন 'প্রথম দ্রষ্টা' হিসাবে।

রুশো এবং শাতোব্রিয়ঁ-র ভাবনার উত্তরাধিকার এই সিম্বলিস্ট আন্দোলন নিজের শরীরে সমন্বিত করে নিল এমার্সন, হুইটম্যান, শিলার, ফিখটে, হ্যোল্ডার্লিন, নোভালিস, শিলিং হফমান, হ্বাগনার, বার্কলে, কোলরিজ, শেলি, কিটস, কার্লাইল, মরিস, রসেটি, সুইনবার্ন, রাস্কিন প্রমুখের ভাবনাসূত্র এবং সৃজনপ্রতিভা।

অন্যদিকে এই কাব্যরীতির দীর্ঘছায়া এসে পড়ল আর্থার সিমন্স, আর্নস্ট ডসন, ওয়াল্টার ডি লা মেয়র, লায়োনেল জনসন, অস্কার ওয়াইল্ড, জর্জ রাসেল, ইয়েটস, পাউন্ড, ডিলান টমাস, হার্ট ক্রেন, ই. ই. কামিংস, ওয়ালেস স্টিভেন্স; জার্মানিতে স্তেফান গেয়র্গ এবং রিলকে; অস্ট্রিয়াতে হুগো ভন হফমানস্থাল; রাশিয়ায় ভ্যালেরি ব্রুসভ, আলোকজান্দার ব্লখ, ইভানভ; স্পেনে আন্তনিও মাচাদো, হিমনেথ; নিকারাগুয়াতে রুবেন দারিও; পর্তুগালে জি কাস্ত্রো প্রমুখ ব্যক্তিত্বের রচনাকর্মে।

বোদলেয়র আইডিয়াকে মুখ্য ভূমিকা দিয়েছিলেন—মালার্মে হয়ে উঠলেন আইডিয়াসর্বস্ব। এখানে উল্লেখ্য এই যে সিম্বলিস্টদের লেখাপত্রে একটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রতীক (private symbol)। আইডিয়া এবং এই ব্যক্তিগত প্রতীকের মধ্যে সম্বন্ধটি নিবিড়। এদের যৌথ ক্রিয়াকলাপে একদিকে যেমন ছিল সিম্বলিস্ট আন্দোলনের সিদ্ধি, অন্যদিকে বিলয়কেও ডেকে আনল তারা। গিয়ম আপলিনেরকে ধরা যাক উদাহরণ হিসাবে। বোদলেয়র স্বপ্নপ্রয়াণ চেয়েছিলেন, আপলিনের প্রবর্তনা করলেন অবচেতনাময় কাব্য—surréalisme শব্দটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। আবার এই আপলিনেরই একসময় রোমান্টিসিজম্ এবং সিম্বলিজমের শিকল থেকে মুক্তি চাইলেন।

'বাক্যের অ্যালেকেমির কাছে আর তিনি মিরাক্‌ল্ প্রত্যাশা করেন না, শব্দের সংগীত তার কাছে অবজ্ঞেয়। বস্তু থেকেই ঘটনা থেকেই অতঃপর উৎসারিত হবে

আশ্চর্য।' (*ফরাসি* সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃ. ১৪)। বিশ শতকে আপলিনের যখন আগুনে গোলার মধ্যে চন্দ্রসুষমা আবিষ্কার করেন, তখনই যেন তথাকথিত সিম্বলিজম-এর বিদায় ঘন্টা বেজে যায়। কবির যে ব্যক্তিগত প্রতীক-কে একদা তাঁর স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান ভাবা হয়েছিল, কালান্তরে সেই বৈশিষ্ট্যই যেন হয়ে উঠল বাস্তবতার সামনে এক অনভিপ্রেত আড়াল। তবু অতীত গোপনে গোপনে কাজ করে চলে বলেই যেন পোড়ো জমি-তে দাঁড়িয়ে থাকা এলিয়টও এড়াতে পারেন না সিম্বলিজমের প্রভাব। ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। বোদলেয়রের বিড়াল নতুন লাবণ্যে ফিরে আসে জীবনানন্দ দাশের উঠোনে।

সুনামি

সায়ম ঘোষ

কাকে বলে প্রলয়পয়োধি জল? ঠিক কেমন তার চেহারা-চরিত্র? প্রশ্নটি সহজ, এবং উত্তরও তো জানা। ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এর পরে সেই উত্তরের নাম 'সুনামি'। প্রলয়পয়োধিজল, একুশ শতকে।

সুনামি (Tsunami) শব্দটি জাপানি। বাংলায় সঠিক বানান হওয়া উচিত 'ৎসুনামি'। এর অর্থ বন্দরের ঢেউ। শব্দটি misnomer. কারণ সাধারণত হাওয়ার সমুদ্রতীরে যে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় আর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সুনামির উৎস সমুদ্রের নীচে ভূগর্ভে কম্পন অথবা কখনো জলের তলায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

ভূগর্ভে আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয় সামুদ্রিক তরঙ্গ। পুকুরের জলে ঢিল ফেললে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় অনেকটা সেইরকম। কিন্তু ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও সময়সীমা সাধারণ তরঙ্গের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়। গভীর জলে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ২০০ কি. মি. এবং সময়সীমা কয়েক মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা অবধি হতে পারে, যেখানে সাধারণ ঢেউ-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার আর সময়সীমা কয়েক সেকেন্ড হয়। লক্ষণীয় বিষয় যে গভীর সমুদ্রের তরঙ্গের উচ্চতা মাত্র ০.৩ থেকে ০.৬ মিটার খাড়াই (এক থেকে দুই ফুট) হয়। ফলে ঢেউ-এর Steepness অতিঅল্প হয়। তাই (বায়ু হাওয়ায় দ্বারা) সৃষ্ট ঢেউ সমুদ্রবক্ষে এই সব তরঙ্গকে সহজেই ঢেকে দেয়। কিন্তু সমুদ্রের উপরিতলের নিচেই এই তরঙ্গ বয়ে যায় ভয়ঙ্কর গতিতে—ভূমিকম্পের epicentre-এর কেন্দ্রের / উৎসের বিপরীত দিকে। Epicentre থেকে এই সব তরঙ্গ বৃত্তের আকারে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

তরঙ্গগুলি যখন সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী হয় তখন এদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। উপকূলে সমুদ্র অগভীর হবার ফলে তরঙ্গের সম্মুখভাগের গতি হ্রাস পায়। কিন্তু শতাধিক কি. মি. দূরে তরঙ্গের পিছনের অংশ তরঙ্গের সাধারণ (original) গতিতে এগিয়ে আসে। ফলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমে যায়। (amplitude) বেড়ে যায়। তরঙ্গের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তা ১০-১২ মিটার অবধি উচ্চতায় উঠতে পারে। এই সব দীর্ঘকায় ঢেউ ডাঙায় আছড়ে পরে। ঢেউ-এর গতি এবং উচ্চতা স্থলভূমির গঠনের উপর নির্ভর করে।

২৬ ডিসেম্বর যে-সুনামি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল তার উৎপত্তিস্থল (Epicentre) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও সুমাত্রা জাভার মধ্যস্থলে, ভারত মহাসাগরে।

উপর অবস্থান করে ১৮ Tectonic plate। এই প্লেটগুলি জিগ'স-পাজল-এর মতো করে সাজানো। প্লেটগুলির উপরিভাগ স্থলভূমি কিম্বা ocean floor সমুদ্রপৃষ্ঠে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অস্থিরতার ফলে tectonic plateগুলি নড়াচড়া করলে ভূমিকম্পের আশংকা দেখা দেয়।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার কাছে ভারত মহাসাগরের নিচে দুটি প্লেট হল যথাক্রমে ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট বা ইণ্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেট বা বার্মা প্লেট। কয়েক হাজার বছর ধরে ইন্ডিয়ান প্লেটটি একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছে বার্মা প্লেটের নিচে। বহুকালের এই ঘটনায় মারাত্মক কিছু ওলটপালট ঘটে ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। ধীরে সরতে থাকা ইন্ডিয়ান প্লেট সে দিন কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর তিনবার বার্মা প্লেটের নিচে পিছলে গিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটে সুমাত্রার উত্তর পশ্চিমে, ফলে বার্মা প্লেটটি স্প্রিং-এর মতো কিছুটা উপরের দিকে উঠে যায় এবং যে বিপুল পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হয় তা প্রায় ২০ কোটি ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন বিস্ফোরণের সমান।

প্লেটের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে সুমাত্রায় দেখা যায় ভূকম্প। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মান ছিল ৮.৯।

২৬ ডিসেম্বর ৬.৩০ নাগাদ এই ভূমিকম্পের আধ ঘণ্টার মধ্যে ভারত মহাসাগরে তৈরি হয় সুনামি। ভারতের পূর্ব উপকূলে ও শ্রীলঙ্কায় তা পৌছয় দেড় ঘণ্টায়, মালদ্বীপে তিন ঘণ্টায় এবং সুদূর আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী দেশ সোমালিয়া, তানজানিয়া এবং কেনিয়ায় আছড়ে পরে সাত ঘণ্টায়। এই মেগা সুনামি ডাঙায় আছড়ে পরার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ফিরে যায় সমুদ্রে। লক্ষণীয়, এই সুনামির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোটা পৃথিবী। ইন্দোনেশিয়াতেই ক্ষয়ক্ষতির হার সবচেয়ে বেশি। ভারতে সুনামির প্রথম এবং সবচেয়ে মারাত্মক ধাক্কা আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জের বিশেষত কার নিকোবরে। ফলত ভারতের মানচিত্রও খানিকটা পালটে গেছে। আদিম অধিবাসীদের / জনজাতির (aborigInal) উপর এর মারাত্মক ফল এখনও অনুমানের বিষয়। সুনামিতে মৃত পর্যটকের সংখ্যা কয়েক হাজার। কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এত অধিক সংখ্যক পর্যটকের প্রাণহানিও সম্ভবত এই প্রথম। মৃত এবং নিখোঁজ পর্যটকদের বেশিরভাগই ইউরোপ এবং আমেরিকার মানুষ।

এই মেগা সুনামির প্রভাবে সুমাত্রার অবস্থান ২০ থেকে ২৫ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গেছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনও সুনামির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে সুমাত্রার ভূমিকম্প পৃথিবীর কেন্দ্রকে প্রভাবিত করায় পৃথিবী নিজের অক্ষের দিকে এক ইঞ্চি ঝুঁকে গেছে। এতে ঘোরার গতিবেগ তিন মাইক্রো সেকেন্ড (এক সেকেন্ডের ২১০ লক্ষ ভাগ) বেড়ে গেছে।

সুনামির পূর্বাভাস দেওয়া কিন্তু সম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরে বিশেষত আমেরিকা ও জাপানের উপকূলে এই ধরনের পূর্বাভাস দেওয়ার যন্ত্র আছে। কিন্তু ভারতে মহাসাগর সুনামির থেকে সুরক্ষিত ভাবার ফলে এখানে এই ব্যবস্থা নেই। যদিও সুনামি থামানো

সম্ভব নয় তবুও আগে থেকে এর খবর পেলে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়। দেখা গেছে যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুনামির জলোচ্ছ্বাস কিছুটা আটকাতে সক্ষম। আবার প্রবাল প্রাচীরও সুনামির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেই কবে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণী রক্তে লাল...।' একুশ শতকের গোড়ায় জলের গায়ে রক্তদাগ এঁকে দিল এই সুনামি। ফুকেতের সমুদ্রতট, বা তামিলনাড়ুর ধীবরপল্লী; কোথাওই আর জলের নিষ্পাপ মুখ জেগে থাকবে না। কীটসের অনুষঙ্গ টেনে বলা চলে, সুনামির তাণ্ডবে বিশ্ব জুড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যারা, জলের দাগে লেখা আছে তাদের নাম।

ভুল হল। জলের দাগ, নাকি রক্তদাগ?

সুফি ও সুফিবাদ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

'সুফি' শব্দের অর্থ নানা জনে নানাভাবে দিয়েছেন। কেউ বলেছেন 'সুফ' শব্দের পশম বা উল, সুফি সম্প্রদায়ও সাধারণত পশমের একপ্রকার পোশাক পরিধান করতেন। এঁরা মুসলমান ধর্মভুক্ত এক বিশেষ শ্রেণির সাধু। কেউবা বলেছেন 'শাদা বা পবিত্রতা' অর্থেই সুফি শব্দটি প্রযুক্ত। আবার কারো মতে বা আল্লার কাছে যাওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান (সাফ) মানুষগুলির অগ্রগণ্যরাই 'সুফি'। তবে আমরা সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মভুক্ত এক বিশেষ শ্রেণির প্রেমিক সাধকদেরই সুফি বলতে পারি। মরমিয়াবাদী এইসব সাধকেরা মূলত ইসলাম ধর্মের কঠোর নিয়মবিধির বিরুদ্ধে প্রেম ও ভক্তির সাহায্যেই তাঁদের ঈশ্বরকে পেতে চান। তবে তার মানে এই নয় যে সুফিবাদ ইসলামের বিরোধী বা একেবারেই স্বতন্ত্র এক মতবাদ। কারণ পবিত্র কোরানের অনেক নির্দেশই সুফিবাদে মেনে চলা হয়, পাঠ করা হয় নামাজ। আবার ঠিক খাঁটি অর্থে একে ইসলাম ধর্মের আওতায় বিচার করা যায় না। কারণ এ এক মিশ্রদর্শন। অনেকেই এর মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধদর্শন এবং আরো কিছুর ছায়া প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। আবার কেউবা মনে করেছেন কোনো প্রভাব নয়, সুফিবাদের বীজ ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল বা কোরানের ভাবগত ব্যাখ্যাই 'সুফিবাদ'। ইউসুফ হোসেন যেমন বলেছেন 'ইসলামের বক্ষদেশ থেকেই সুফিবাদের জন্ম' অথবা জালালউদ্দিন রুমির মতে 'সুফিবাদ ইসলামের মগজ'। তবে এটা ঠিকই যে গোঁড়া ইসলামি মতবাদ থেকে সুফিবাদের দর্শন এক উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং তা-ই ইতিহাসে 'সুফি আন্দোলন' নামে খ্যাত। এ ধর্মমতের জন্ম আরবে হলেও তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইরানে। সুফিবাদে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর অস্তিত্ব বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতেই তাঁর অবস্থান। সকলই ঈশ্বরময় (হামা ওসৎ) অথবা সবই ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি (হাসা আজ্ব ওসৎ)। আচার সর্বস্বতাকে সুফিবাদে বর্জন করা হলেও আচার অনুষ্ঠানকে যে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে তা নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে সুফিবাদে নামাজ পাঠ করা হয়। এটি 'শরিয়ত' এর মধ্যে পড়ে। শরিয়ত, হকিকত, তরিকত ও মারেফত-এ চারটি স্তর সুফিবাদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই মানবদেহও। কারণ সুফিবাদীদের বিশ্বাস, পরমচেতনা আমাদের দেহের মধ্যেই অবস্থান করছে। উপযুক্ত সাধনার মাধ্যমেই সেই চেতনা বা

জ্ঞান আমাদের লাভ করা সম্ভব। আত্মার অস্তিত্বেও তাঁরা বিশ্বাসী এবং তারও অবস্থান দেহের মধ্যেই। দেহকে কেন্দ্র করেই সুফিরা দেহাতীতকে লাভ করতে প্রয়াসী। তাঁদের ধর্ম অসাম্প্রদায়িক। অবতারত্বে বিশ্বাস না করলেও বিশেষ ব্যক্তিতে আল্লার শক্তি থাকে বলে সুফিবাদীরা বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস রাখেন গুরু বা পিরের প্রতি। 'জিকির'কে তাঁরা খুবই গুরুত্ব দেন। 'জিকির' হল ঈশ্বরের পবিত্র নাম জপ। দক্ষিণ আসামে প্রচলিত একটি জিকির গানের কিছু নমুনা—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ডাক
একবার হাদিস খুলে দেখ—
এ জেকেরের দরজা ভারি
ফকির নজির কয় ফুকারি
হরদমে পড় এল্লেলা।

সেবা, ত্যাগ, সাম্যনীতি ও বিশেষভাবে বলতে গেলে আল্লার উদ্দেশে আত্মনিবেদন (ফনা) সুফিবাদে খুবই গুরুত্ব পায়। সুফিবাদীরা বলেন, আল্লার প্রতি বিশ্বাস থাকলে এবং সুফিবাদের দর্শন মেনে চললে ঠিকই একদিন ঈপ্সিতের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। ফরিদুদ্দিন আত্তার উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমিই ঈশ্বর, আমাকে ছাড়া কোনও দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই।' *ভারতকোষ*-এর পঞ্চম খণ্ডে বলা হয়েছে সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য্য, ঈশ্বরবিশ্বাস ও সন্তোষ—এ ছয়টি হল প্রকৃত সুফির লক্ষণ। অনুমতি হয় যে খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই আরব থেকে সুফিবাদ ভারতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে তা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। তবে সেগুলির মধ্যে দুটিই প্রধান—চিস্তি ও সুরহাবর্দি। প্রসঙ্গত কয়েকজন সুফির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন জালালুদ্দিন রুমী, খাজা মইনুদ্দিন চিশতি, আহমদ মাসরুক, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ। সুফিবাদের প্রভাব যে কত গভীর তার প্রমাণ আমাদের সমাজ ও সাহিত্য। ভারতীয় সমাজে সুফিবাদের সহজ সরল দর্শন, মানবতাবাদ অনেককেই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ সুফিবাদের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়। সুরাপান, জুয়াখেলা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও সুফিবাদীরা বলেন। কাওয়ালি সংগীতের বিকাশ হয়। সুফিবাদে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে কল্পিত হয়—'আশেক ও মাশুক'। এই প্রেমদর্শন অনেক কবিকেই মুগ্ধ করেছিল, মুগ্ধ করেছিল সুফিবাদের দর্শন। আমাদের সাহিত্যে তার নানা প্রভাব লক্ষিত হয়। মালিক মুহম্মদ জায়সির *পদ্মাবৎ* কাব্যে সুফি প্রভাবের কথা আমাদের জানা। সুফিবাদের গুরুবাদী চেতনা, যোগসাধনা, নাম জপ প্রক্রিয়া, প্রেমদর্শন প্রভৃতি নানা দিকই এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুরবিহার

অরীন্দ্রজিৎ সাহা

আমাদের জগৎ শব্দময়। সে শব্দ কোথাও বিক্ষিপ্ত, কোথাও সুসংবদ্ধ। ব্যাপৃতির মধ্যে ধ্বনির সম্ভাবনা সম্বন্ধই সংগীত যা আবেগ, অনুভূতি ও অনুভাবের এক অত্যন্ত উন্নত ভাষা।

কথাগত ও বস্তুগত মানসিক প্রতিবিম্বের অতিরিক্ত এক প্রকার অ-ব্যবহারিক, অস্পষ্ট ও অ-বিশেষ অনুভূতিই সংগীতের উপকরণ। তার উপযুক্ত ভাষারূপ হল সুর, তার অক্ষর স্বর, বিন্যাস লয়, তাল, ছন্দ।

অবিমিশ্র স্বরের কোনো অন্তর্নিষ্ঠ ক্ষমতা নেই কোনো আবেগ বা অনুভূতিকে উদ্রেক করার। সে শক্তি কেবল স্বরবিন্যাসেরই আছে—যেমন অক্ষরের সাহায্যে সৃষ্ট শব্দবিন্যাসের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তেমন স্বরবিন্যাসের সাহায্যে সুরের ভাষা ছন্দ-তাল-লয়ের মাধুর্যে জেগে ওঠে।

সম্বন্ধ স্থাপন যদি ভাষার প্রয়োজন মেটায় তবে সম্বন্ধের উৎকর্ষ সে-ভাষার উৎকর্ষে। বিহরণের মধ্যে অজানাকে জানার অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়। ভাষা ও ভাবনা সমৃদ্ধ হয়। সুরবিহার সংগীতের ভাষার মধ্যে এনে দেয় বৈচিত্র্যের আহ্বান, বিস্ময় ও এক অপূর্ব সম্ভাবনীয়তা।

যে-কোনো প্রচলিত প্রথাগত পরিকল্পনার মধ্যে ঐক্য ও বৈষম্য দুই-ই থাকে। বৈষম্য যেমন সংগীতের মধ্যে প্রসারণ ও জটিলতার সৃষ্টি করে সংগীতকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমন বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলির একীকরণের মধ্যেই সংগীতের বিভিন্ন অভিপ্রায়গুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুরবিহারের মধ্যেই ঐক্য ও বৈষম্যের সাধন ও সম্পাদন সম্ভব।

প্রাচ্যের মার্গসংগীতের 'ইম্প্রোভাইজেশন' এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে তার প্রয়োগ সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। রসবাহুল্যবর্জিত শান্ত-গম্ভীর ধ্রুপদ সুনির্দিষ্ট সংযমিত সংগীত যার ঐশ্বর্য অন্তরের। তুলনায় খেয়ালে উদ্ভাবনার স্থান অধিক। তবে রাগ-রাগিণীর চরিত্রচিত্রায়ণে অযথা তাল দেওয়া যেমন অক্ষমণীয় তেমন আরোহণ, অবরোহণ এবং 'পকড়' যথাযথ হওয়া চাই। নইলে উপযুক্ত রসোপলব্ধি অসংযত হবে। প্রতিটি স্বর তার বর্ণবৈচিত্র্য এবং অপসারণ দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন করে। তাই সুরবিহার বিশেষ যত্ন সহকারে করতে হয় যা সংগীতকে পরিশেষে এক উন্নত অন্তর্গামী মানসিক অবস্থায় উত্তীর্ণ করতে পারে যা চিরন্তন উপলব্ধির বিষয়।

পাশ্চাত্য সংগীতে সুরবিহার পৃথক। এ সংগীত তালের সঙ্গে স্বরসঙ্গতির যোগস্থাপনে সংগঠিত। স্বরসঙ্গতিকে আনে স্বরবিস্তার। পাশ্চাত্য মার্গসংগীত যেহেতু কঠোর নীতি দ্বারা সংকলিত সেহেতু সচরাচর স্বরবিস্তারের মাধ্যমে সুরবিহার গায়ক বা বাজনদারদের দ্বারা সংঘটিত হয় না। সে-কাজটার ভার নেন রচয়িতা।

'থীম এ্যাণ্ড ভেরিয়েশন' পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও তার ক্রমান্বিত বিস্তার সুরের হেরফেরে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তির কাঠামোর রদবদলে ও স্বরসঙ্গতির পরিবর্তনে সাধিত হয়। এছাড়া 'সিনকোপেশন' বা তালের আড়ে চলার দ্বারাও সুরবিহার হয়। আবার 'কন্‌চের্তো'র মধ্যে একক বাদ্যযন্ত্রের সুরবিহারের দ্বারাও সংগীত বিস্তার লাভ করে।

বারো মাত্রা দীর্ঘ সুরের নকশার উপর স্বরসঙ্গতি অক্ষুণ্ন রেখে কর্ডের ক্রমান্বয়িক অগ্রগতি জ্যাজের মূল অঙ্গ। কর্ডের অগ্রগতির সঙ্গতি বজায় রেখে ব্যাপক সুরবিহারের মধ্যে জ্যাজের উৎকর্ষ সাধন। ব্যক্তিগত স্থানটি সুরবিহারের দ্বারাই জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয় জ্যাজে।

আধুনিক সপ্তস্বরের স্বরগ্রাম পাল্টে গিয়ে সৃষ্ট হয় দ্বাদশ স্বরের অভিনব স্বরগ্রাম, যে স্বরগ্রামের বিভিন্ন স্বর স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরভঙ্গিমার মধ্যে থাকে শুধু অভিব্যক্তি, সুর নয়। সুর হয়ে ওঠে গৌণ। মুখ্য হয় সমগ্র রচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরান্তরের সঙ্গতি। বিন্যাস হয়ে ওঠে সুরের এবং স্বরসঙ্গতির মধ্যে স্বরান্তরের অনুক্রমিক জটিল নকশা। সুরমুক্ত সংগীত হয়ে ওঠে স্বরবিস্তারের মাধ্যমে এক বিশেষ মৌলিক অভিব্যক্তি।

এই অনুক্রমিক স্বরান্তরিক সংগীতের সাংগীতিক গুণ স্বরান্তরের সমাবেশের দ্বারা ব্যক্ত। এই স্বরান্তরের সমাবেশই স্বরবিস্তারের ভিত্তি। এই সংগীত স্বরবিস্তারভিত্তিক।

'আকস্মিক' বা 'অনির্ণীত' সংগীতের (aleatory music) ক্ষেত্রে স্বরবিহার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। রচয়িতার মানসিক বা ইচ্ছাশক্তিই যে কেবল সংগীতের কেন্দ্র তা নয়, আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক নানান শব্দও সংগীতে একইসঙ্গে সম্পৃক্ত সংযুক্ত। আকস্মিক সংগীতের সংযুক্ত সরল প্রবাহের মতো ও তার বয়নের বিন্যাস পরিবর্তনশীল। বিন্যাস ও প্রণালী সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত না থাকায় রচয়িতা ও সংগীত পরিবেশকে আপন অভিরুচি অনুসারে, আকস্মিকতার সাহায্যে সামঞ্জস্য আনার দায়িত্ব নেয়। জ্যাজের ছন্দগত স্বাধীনতা, সুরবিহারের কাঠামো, স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস, সুরগত উদ্ভাবনা অনির্ণীত সংগীতের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আজ সমাজের নানান বৈচিত্র্য, বৈপরীত্যকে ও আকস্মিকতাকে অনির্ণীত সংগীত অত্যন্ত সফলরূপে রূপায়িত করে সুরবিহারের মধ্যে দিয়ে নয়, স্বরবিহারের মধ্যে দিয়েই, কারণ সুর না থাকলেও সংগীত সম্ভব, স্বর না থাকলে নয়।

স্বতঃস্ফূর্ত সংগীতের মধ্যে একটা তাৎক্ষণিকতা আছে, যে তাৎক্ষণিকতা অনির্ণীত সংগীতের প্রধান বিষয়বস্তু। যে-কোনো শব্দময় মুহূর্তের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিপুল সম্ভাবনা। সেই মুহূর্তটিকে শব্দের মাধ্যমে, আত্মঅভিরুচি অনুসারে, তাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা বাদ দিয়ে, অনুপম সংগীতরূপে অনুভব ও প্রকাশ করাই সংগীতের মর্ম। স্বরবিস্তার ও সুরবিহার সংগীতের সেই মর্মবাণী।

সুর্‌রিয়ালিজম্

অশ্রুকুমার সিকদার

বিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশকে সুররিয়ালিজম্ বা পরাবাস্তববাদ বা অধিবাস্তববাদের সূত্রপাত। প্যারিস-কেন্দ্রিক এই আন্দোলন শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিসিজমের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। সম্ভবত এই আন্দোলনের প্রভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোমান্টিসিজমের চেয়েও ব্যাপকতা পেয়েছিল। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, চলচ্চিত্রে এই আন্দোলন ও তত্ত্ব এখনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও তারপরের অর্থনৈতিক মন্দায় সমস্ত সভ্যতা যেন ধ্বস্ত হয়ে গেল, পরিচিত অস্তিত্বের উপর যেন সকলের আস্থা টলে গেল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকটে জীবন যতই নিরর্থক হয়ে গেল, ততই চেনা-বাস্তব বিষয়ে তরুণ সংবেদনশীল মন ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, তাঁরা বাস্তবের অতি-ব্যবহৃত বহিরঙ্গকে চূর্ণ করে নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে চাইলেন বাস্তবের পুনর্গঠন করতে এবং সংগতিবোধের এক নতুন সূত্র সন্ধান করতে। 'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী'। সেই সন্ধানেরই পরিণাম সুররিয়ালিজম। এই শিল্পতত্ত্ব ও আন্দোলনের নামকরণ করেছিলেন কবি গিয়োম আপোলোনেয়ার।

রাবেলের লেখায়, রোমান্টিকদের রচনায়, গথিক উপন্যাসে, মার্কুইজ দ্য সাদের লেখায়, লিউস ক্যারলের হামটিডামটির ভাষাতত্ত্বে, নেরভাল, হোলডারলিন, 'প্রথম দ্রষ্টা, খাঁটি কবি', বোদলেয়ারের কবিতায়, অন্বয় যারা ভেঙেছিলেন সেই মালার্মে ও র‍্যাবোঁর কবিতায় সুরিয়ালিস্টরা নিজেদের পূর্বসূরি খুঁজে পেয়েছিলেন। আবার কখনো বলেছেন পূর্বসূরি মানেন না, তাঁরা স্বয়ম্ভু।

যাবতীয় শাসনকে ভাঙা যেহেতু ছিল এই শিল্পতত্ত্বের মূল কথা, সেই কারণে পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটা যোগ গড়ে উঠেছিল। একদল শিল্পের বাস্তবতাবোধকে বদলাতে চাইছিল, অন্যদল সমাজবাস্তবতাকে, দুই পক্ষই চায় বিপ্লব, তাই এই সংযোগ। ১৯২৩ সালের ২৭ জানুয়ারির ইস্তাহারে সুররিয়ালিস্টরা বলেছিলেন, তথাকথিত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই, বিপ্লব ঘটাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। শ্রমিকের যেমন মাতৃভূমি নেই, তেমনি শিল্পীরও নেই। কবিতা লেখা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বর্জনের অজুহাত হতে পারে না, তাই আরাগঁ, এলুয়ারের মতো পরাবাস্তববাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। শিল্পী দালি অবশ্য এই সংস্রবের বিরোধী

ছিলেন। আরাগঁ পরে বহিষ্কৃত হন ব্রেতোঁর দ্বারা, এলুয়ার সম্পর্ক ত্যাগ করেন ১৯৪২-এ। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রভাব তাঁদের রচনায় থেকেই যায়।

১৯২২ সালে ব্রেতোঁ ও তাঁর বন্ধুরা ডাডাবাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে যে পরাবাস্তববাদী আন্দোলন শুরু করেন তার মূলকথা—পূর্ণ মানসিক মুক্তি, ন্যায়পরম্পরা থেকে, সামাজিক ঔচিত্যবোধ, প্রচলিত নৈতিকতা থেকে, বাক্যের অন্বয় থেকে, যাবতীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি। আন্দ্রে ব্রেতোঁর ১৯২৪ ও ১২২৯-এর ইস্তাহার দুটিতে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি মেলে। লক্ষ্য হল মুক্ত সৃজনশীলতার পথের সব প্রতিবন্ধককে ভাঙা। এই শিল্পতত্ত্ব অনুসারে সৃজনের ক্ষেত্রে পূর্বপরিকল্পনার কোনও ভূমিকা নেই। ফ্রয়েডের দ্বারা আবিষ্ট এই অধিবাস্তববাদীরা মনে করতেন অবচেতন হল যাবতীয় চিত্রকল্পের আদি উৎস, তার থেকে উঠে আসে শৃঙ্খলাহীন দুঃস্বপ্নের মতো উদ্ভট কল্পনার জগৎ। স্বপ্নই সব, প্রেরণাই একটিমাত্র চালিকাশক্তি। ভেঙে পড়ে মনন ও যুক্তির বন্ধন, বাস্তববাদ-প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় ভেঙে পড়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বহিরাবয়ব—'বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে।' শিল্পী ফিরে যান প্রত্নস্মৃতির কাছে, শিশুর পৃথিবীতে, আদিম জগতে, উন্মাদের ভুবনে। এই তত্ত্বের শিল্প সজ্ঞা-সঞ্জাত, তাতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিপর্যয় হয়। তার লক্ষ্য বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বাস্তবতার সামঞ্জস্যবিধান। এই তত্ত্বানুপ্রাণিত শিল্পীরা প্রাচ্যের আফ্রিকার মালেনেশিয়ার উদ্ভট আদিম শিল্পের কাছে দীক্ষা নেওয়া জরুরি মনে করেছিলেন। তবে অন্ধকার আর উন্মাদনার সন্ততি সুররিয়ালিস্টদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা সবাই প্রায় কবি। তাই এই ভাষাশিল্পীদের প্রধান আক্রমণ ছিল ভাষার বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে। প্রচলিত ভাষা উন্নততর সত্যকে ধারণে অক্ষম, তাই ভাষাকে ভেঙে ধরতে হবে নিহিত সত্যকে। ভাষা আদৌ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার যথেচ্ছ ব্যবহারে কবির নিরঙ্কুশ অধিকার। স্বপ্নজগৎকে, ঘুম আর জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থানকে শিল্পগতভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে অবচেতনের দ্বারা প্রণোদিত অধিবাস্তববাদীরা 'automatic writing'-এর আশ্রয় নেন। তাঁরা সাহিত্যে তুলে ধরতে চান চিন্তার অকৃত্রিম স্রোতোধারা। তাই চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসের পদ্ধতির সঙ্গে এই কবিতার মিল পাই। সুররিয়ালিস্টদের কবিতা প্রায়ই গদ্যে লেখা কিন্তু সেই গদ্য স্পন্দিত। মনের উপর থেকে যুক্তির স্বৈরাচারী শাসনকে সরিয়ে ফেলে অন্তর্লীন গোপন সত্তাকে উদ্ধারের জন্য, 'Pure psychic Automatism' অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাঁরা মাদকের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেননি। সুররিয়ালিস্ট পদ্ধতির অনুকরণে উত্যক্ত আরাগঁ বলেছিলেন অনুকারীরা মনে করে কৌশল রপ্ত করে নেওয়া মাত্র কবিতা বেরিয়ে আসবে অনর্গল উদরাময়ের মতো। কিন্তু সুররিয়ালিজমে 'everything is rigour. inevitable rigour'। মজা হল, সব 'rigour'-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রাতিষ্ঠানিক জগৎ এই তত্ত্বাশ্রয়ী শিল্পকে উদ্ভট বলে উপেক্ষা করেছে, আর সাধারণ মানুষ মনে করেছে এ এক শিল্পগত ধোঁকা।

এইসব অবজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে দুনিয়াজোড়া এই সাহিত্য আন্দোলনের তত্ত্ব চিত্র, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। এক্সপ্রেশনিজম্, কিউবিজম্, কনস্ট্রাকটিভিজম্,

ভোর্টিসিজম্ ইত্যাদি আন্দোলন ও তত্ত্বের সঙ্গে তার নিকট সাদৃশ্য। পিকাসো, দালি, এরনস্ট, ক্লি, কান্‌দিস্কি মিরো প্রভৃতির ছবিতে ভাস্কর্যে, লুই বুনুয়েলের চলচ্চিত্রে অধিবাস্তব তত্ত্বের স্বতঃপ্রকাশ। এই শিল্পতত্ত্বের প্রভাব যেমন মায়াকোভস্কির, নেরুদার, লোরকার, রনে শরের কবিতায়, এজরা পাউন্ডের Cantos-এ, আর্তোর নাটকে, এক্সপ্রেশনিস্ট ও অ্যাবসার্ড নাটকে, তেমনি আধুনিককালে গিনসবার্গ-প্রমুখ বিটবংশীয়দের রচনায়, এমনকি জাদুবাস্তবতাধর্মী উপন্যাসে। কল্পনার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবনীন্দ্রনাথকে বা সুকুমার রায়কে যদি হিসেবে গণ্য নাও করি, তাহলে বাংলায় আদি সুররিয়ালিস্ট জীবনানন্দ, যিনি পুরনো বীজগণিতের পরিবর্তে গভীর এক নতুন বীজগণিত দিয়ে বস্তুবিশ্বকে বুঝতে চেয়েছিলেন। ফরাসি কাব্য-প্রভাবিত অরুণ মিত্র সুররিয়ালিস্ট মগ্নচৈতন্যের স্রোতে আকণ্ঠ মগ্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও আছে ভৌতিক স্বপ্নময় অধিবাস্তব, আছে বিনির্মাণের বাস্তবতা, স্বয়ংক্রিয় রচনারীতি। হাংরি জেনারেশন, যাঁরা শিল্পকে বলেছেন 'ভূষিমাল' তাঁদের ফর্মের তোয়াক্কাহীন আঁকাড়া অভিজ্ঞতার যদ্দৃষ্টং বিবৃতিতে সুররিয়ালিস্ট শিল্পতত্ত্বের ছাপ স্পষ্ট।

সৃজনশীল নৃত্য

সুশীল সাহা

ধ্রুপদী ও লোকধারার নৃত্যের বাইরেও একধরনের নৃত্যের কথা বিশেষত আজকাল শোনা যায়। এ নৃত্য যোগ্য স্রষ্টার বিনির্মাণে নতুনতর মাত্রায় সংযোজিত। এই নৃত্যধারার নাম 'সৃজনশীল নৃত্য'। বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্যরীতিকে ভেঙ্গে তৈরি করা এই নৃত্যের প্রথম রূপকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, পরে বহু বর্ণবিভঙ্গে উদয়শঙ্কর। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংগীত, নৃত্য ও চারু ও কারুশিল্পের যে একটি বিশেষ স্থান থাকা দরকার রবীন্দ্রনাথ শুধু তা অনুভবই করেননি, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার একটা সম্মানজনক স্থান দিয়ে সমাজে তার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়েছেন। একে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি যথেষ্ট কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমও করেছেন। নিজে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নেচেছেন, নাচে উৎসাহ দিয়েছেন, নৃত্যনাট্য রচনা করে তার মহড়া ও পরিচালনা করেছেন। তিনি লিখেছেন 'আমি বিচিত্রের দূত। নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমরা তারই দূত।' তাঁর কাছে নৃত্যকলা মর্যাদা পেয়েছিল দেহের চলমান একটি শিল্পরূপে। এই ছন্দের আনন্দেই তিনি নিঃসঙ্কোচে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি প্রাণবান আন্দোলন। পূর্বদেশের বিভিন্ন জায়গার পরিভ্রমণে তিনি নানা রীতির নৃত্যকলা, দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। জাভা, বালি, শ্যাম, চীন ও জাপান ছাড়াও ভারতের কোচিন, মালাবার ও মণিপুরে তিনি যেমন নাচ দেখেছেন তেমনি ইউরোপের লোকনৃত্য ও অন্যান্য রীতির নাচ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় '...এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করব না যে আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিলেছে, তার পিছনে যে সাধনা, যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্যবিকাশ আছে তা যে কোনোখানেই দুর্লভ।' এ থেকে বোঝা যায় তিনি নৃত্যকলাকে একটি সম্মানজনক বিদ্যারূপে অনুভব করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এর প্রবল অভাব দেখা দিয়েছিল নগরবাসী শিক্ষিতসমাজে। তখন নৃত্যকলা ছিল বিলাস বা প্রমোদ উপকরণসামগ্রী। ক্রমে এর চর্চা নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল পেশাদার বাইজি, খেমটাওয়ালি বা যাত্রা-থিয়েটারের নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তারই পরিণতি আমরা লক্ষ করি তাঁরই রচিত অসামান্য নৃত্যনাট্যগুলিতে।

বিভিন্ন ধ্রুপদী ও লোকনৃত্যের এক অসাধারণ মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি যার জন্ম দিলেন, তাকেই বলা যায় সৃজনশীল নৃত্য। তিরিশ দশকের গোড়ায় শ্রীমতী ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতাটির আবৃত্তির সঙ্গে একটি নৃত্য পরিবেশন করেন। এর আগে তিনি মেরি ওয়িগম্যান, কাটয়ুস, ও রুডলফ্ লাবান যাঁরা ইউরোপের নৃত্যজগতে বৈপ্লবিক আলোড়ন এনেছিলেন, এঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর নাচ দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে বলেছিলেন 'এই তার নিজস্ব নাচ'।

এই নিজস্ব নাচের বহুমাত্রিকতা দেখা দেয় পরবর্তীকালে উদয়শঙ্করে মধ্যে বিপুলভাবে। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্টসে চিত্রকলা শিক্ষা সম্পন্ন করে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ রোটেনস্টাইনের মাধ্যমে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর অনুরোধে ভারতীয় বিষয়ে দুটি নৃত্য 'হিন্দুবিবাহ' ও 'রাধাকৃষ্ণ' রচনা করেন এবং সহ নৃত্যশিল্প হিসেবে তিনি আনা পাভলোভার সঙ্গে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। নৃত্যে কোনো প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর মধ্যেও ছিল নৃত্যসৃজনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা। লন্ডনের অপেরা হাউসে, কভেন্ট গার্ডেন ও বিভিন্ন অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে তিনি নিয়মিত নৃত্যপ্রদর্শন করতে থাকেন। আনা পাভলোভাই তাঁকে পশ্চিমি নৃত্য অনুসরণ না করে প্রাচ্যের শিল্পকলা তথা নৃত্যধারা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়া সুইডিস শিল্পী এলিস বোনারও তাঁকে ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেন। তাঁর সঙ্গেই উদয়শঙ্কর ভারতের কাশ্মীর থেকে মালাবার হিল্‌স পর্যন্ত ভ্রমণ করে নিজ দেশের মানুষের জীবনধারা ও নৃত্যকলার সঙ্গে পরিচিত হন। ত্রিশের দশকে মিস এলিস বোনারই তাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। এর আগে ১৯২২ সালে লন্ডনের জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত একটি সাহায্য রজনীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ উদয়শঙ্করের অসি নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান।

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যরীতিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ভেঙে চুরে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন উদয়শঙ্কর। গুরু শঙ্করন নাম্বুদ্রি তাঁর অনুরোধে কথাকলি আঙ্গিকে 'কার্তিকেয় নৃত্য' রচনা করে দেন যা উদয়শঙ্করের উপস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়। ১৯৩১-৩৩ সালে তিনি তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় তাঁর সৃজিত নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন ফরাসি নৃত্যশিল্প সিমকি, ছোটোভাই রবিশঙ্কর, বোন কনকলতা, কাকা ভবানীশঙ্কর ও আত্মীয় রাজেন্দ্রশঙ্কর। এছাড়া নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তিমিরবরণ, শচীন দেববর্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ প্রমুখ। এ সময়কার বিখ্যাত নাচগুলির মধ্যে অসিনৃত্য, কার্তিকেয় নৃত্য, নটরাজ, হরপার্বতী উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ইন্দ্রনৃত্য ইত্যাদি প্রদর্শন করে তিনি কবির আশীর্বাদধন্য হন। ১৯৩৯ সালে তিনি আলমোড়াতে 'উদয়শঙ্কর কালচার সেন্টার' স্থাপন করেন। সেখানে নিয়মিত সৃজনশীল নৃত্যের অনুশীলন হত। এখানেই তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'রিদম অফ লাইফ', 'লেবার অ্যান্ড মেশিনারি' সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় রামায়ণ অবলম্বনে ছায়ানাট্য

'রামলীলা'। ১৯৪৭ সালে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর অসাধারণ চলচ্চিত্র 'কল্পনা' যার প্রধান উপজীব্য ভারতীয় নৃত্যকলা। ব্রাসেলস-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি শ্রেষ্ঠ কাহিনি চিত্রের স্বীকৃতি ও সম্মান পায়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি প্রযোজনা করেন 'সামান্য ক্ষতি' এবং ১৯৬৬ সালে চণ্ডালিকা অবলম্বনে 'প্রকৃতি ও আনন্দ'। ১৯৬৮ সালে তিনি শেষবার দু'মাসের জন্য কানাডা ও আমেরিকা সফর করেন তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে। ১৯৬১-৭০ তিনি তাঁর নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখেন চলচ্চিত্র, মঞ্চাভিনয় ও নৃত্য মিলিয়ে 'শঙ্করস্কোপ'-এ।

উদয়শঙ্করের স্ত্রী অমলাশঙ্কর 'উদয়শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টার' নামে একটি সৃজনশীল নৃত্যের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন যা আজও টিকে আছে। তাঁদের সুযোগ্য কন্যা মমতাশঙ্কর ও পুত্রবধূ তনুশ্রীশঙ্করও নৃত্য নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়া শম্ভু ভট্টাচার্য, বুলবুল চৌধুরী, অচ্যুতনারায়ণ, শচীনশঙ্কর, অনাদিপ্রসাদ, শান্তি বসু, বটু পাল, অসিত চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চাকীসরকার, রেখা মৈত্র, অলকানন্দা রায়, সাধন গুহ, পলি গুহ, রঞ্জাবতী সরকার প্রমুখ নৃত্যশিল্পীরা নিজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্র নৃত্যধারায় মৌলিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শান্তিদেব ঘোষের নাম অবিস্মরণীয়।

সেক্স অ্যান্ড জেন্ডার

ঈপ্সিতা চন্দ

এই দুটি ধারণাকে আলাদা করে ভাবার মূলে রয়েছে নারীবাদী চিন্তা। বাংলা অভিধানে এই দুটি ধারণাকে পৃথক শব্দ হিসেবে পাওয়া যায় না—তথাপি, দুটিকে পৃথক করাই নারীবাদী তত্ত্বের প্রধান সূত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে জন্মমুহূর্ত থেকে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ হয় শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, কিন্তু লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শারীরিক পার্থক্যই একমাত্র ভিত্তি নয়। আসলে, লিঙ্গনির্ধারণ একটি সামাজিক পদ্ধতি। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লিঙ্গ পরিচয় স্থির হলে নারীবাদী তত্ত্বে তাকে বলা হয় সেক্স এবং সমাজসৃষ্ট লিঙ্গ পরিচয়কে জেন্ডর। এই ধারণা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য, কিন্তু নারীবাদী তাত্ত্বিকরা প্রথম এই দুটি পরিচয়-নির্ধারণ পদ্ধতি পৃথকভাবে চিহ্নিত করেন এবং এই পার্থক্য ব্যবহার করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য বোঝার চেষ্টা করেন, তাই এই ধারণা নারীবাদী তত্ত্বের অন্তর্গত।

সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়, অথবা জেন্ডর, স্থায়ী পরিচয় নয়—পৌরুষ বা নারীত্বের সামাজিক সংজ্ঞা অথবা নারী ও পুরুষের সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় প্রেক্ষিত-নির্ভর এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ভরও বটে। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, পৌরুষের সামাজিক পরিভাষাই ঠিক করে দেয় নারীত্বের সামাজিক পরিভাষা। কিন্তু শারীরিক বা যৌনাঙ্গভিত্তিক পরিচয় সমাজের কাঠামো বা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন অনুযায়ী পাল্টায় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতাশালী পক্ষ, অর্থাৎ পুরুষরা, নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই সামাজিক নারীত্ব এবং শারীরিক নারীত্বের মধ্যে একটি সরলরৈখিক যোগ সৃষ্টি করেন। এই গঠিত সমীকরণকে 'প্রাকৃতিক' অথবা 'স্বাভাবিক' বলে চালানো হয়। এই কারণেই পৌরুষ বা নারীত্বের একটি বিমূর্ত আদর্শ খাড়া করা হয়—নারী শরীরের অধিকারীকে এই আদর্শ অনুযায়ী তার মন, জীবন, ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে নিতে হবে; এই নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে তার 'নারী' পরিচয় সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না। এই আদর্শকে লিঙ্গ মতাদর্শ বা জেন্ডর আইডিওলজি বলা যায়—এর বিধিনিষেধ মেনেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নারী-পরিচয়ের অধিকারী হতে পারেন, অন্যথা নয়। যে সব সামাজিক ব্যবহার, চিন্তা বা যাপনের মাধ্যমে এই মতাদর্শ বলবৎ হয়, এবং কোনো ব্যক্তি-নারীকে তার নিজস্ব সামাজিক কার্যকলাপ, ব্যবহার, বা অবস্থানের তাৎপর্য বুঝতে

বা বোঝাতে সাহায্য করে, সেই সকল ব্যবহার চিন্তা বা যাপন একত্র হয়ে সৃষ্টি হয় একটি সমাজের লিঙ্গ বয়ান, যাকে বলা যায় জেন্ডর ডিসকোর্স। উদাহরণস্বরূপ, যদি বলি, 'মেয়ে হিসেবে আমার কাছে পেশার চাইতে মাতৃত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ' তাহলে বোঝা যাবে যে আমি যে-সমাজে বাস করি, সেই সমাজের লিঙ্গ মতাদর্শ অনুযায়ী নারীত্বের অন্যতম আদর্শ মাতৃত্ব। এবার সন্তান পালনের জন্য আমি যদি চাকরি ছেড়ে দিই, তাহলে, এই মতাদর্শকে আমি নিজের জীবনযাপনে কার্যকর করছি—আমার এই সিদ্ধান্তকে আমি 'স্বাভাবিক' বলতে পারি, কারণ আমার সমাজে লিঙ্গ বয়ান অনুযায়ী, নারীত্বের সাফল্য মাতৃত্ব, এই তথ্যটি আমি আত্মস্থ করে নিয়েছি। ব্যক্তি হিসেবে নিজের কাজের কার্যকারণ বোঝাতে ও বুঝতে আমি একটি বিশেষ লিঙ্গ মতাদর্শ থেকে প্রবাহিত একটি বিশেষ লিঙ্গ বয়ান প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্যবহার করছি। এই কারণেই তাত্ত্বিকরা জেন্ডরকে সম্পাদিত, নির্বাহিত, অভিনীত বা পারফর্মড্ বলেছেন। অর্থাৎ নারীর বা পুরুষের সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় মানে সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে নারীত্ব বা পৌরুষের আদর্শ অনুযায়ী নারী বা পুরুষের ভূমিকা পালন করা। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে মানুষ শারীরিক যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় ঠিকই কিন্তু শুধুই তার জন্য সে নারী বা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয় না—সমাজে বাস করতে করতে এবং সমাজে বাস করার জন্যও, সে ক্রমশ সামাজিক অর্থে নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠে।

সমাজে মহিলা বা পুরুষদের সম্পর্কে যে সব বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত আছে—যেমন মেয়েরা অঙ্কে কাঁচা হয়, বা ছেলেরা কাঁদে না—সেগুলি সবই বিশেষ লিঙ্গ বয়ানের অন্তর্গত। পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে নারীর যে যুক্তিরহিত আবেগসর্বস্ব প্রতিমা পাওয়া যায়, তাকে মূর্তরূপ দেওয়ার জন্যই এই লিঙ্গ বয়ান প্রবাহিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই প্রতিমার বিপরীতে পুরুষকে যুক্তিসর্বস্ব, আবেগবর্জিত শক্তিধারী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও সহজ হয়ে যায়। এবার বোঝা সম্ভব যে নারীত্ব বা পৌরুষের কিছু কাল্পনিক সারাৎসার ব্যবহার করে বিমূর্ত আদর্শ তৈরি হয়েছে এবং সমাজ-শাসনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক নারী বা পুরুষকে সেই বদ্ধখোপের মধ্যে নিজেকে কেটে ছেঁটে আঁটাতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই একই পদ্ধতির অন্য দিক হল নারীত্ব এবং পৌরুষকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক এবং সামাজিক অবস্থান হিসেবে কায়েম করা। এই দুই অবস্থানের মধ্যে সেতু হিসেবে আছে যৌন সম্পর্ক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যার বৈধ-রূপ বিবাহ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো কায়েম রাখতে নারীর পুরুষনির্ভর কোমল, আবেগপ্রবণ প্রতিমা ব্যবহার করে তাকে অন্দরমহলে আটকে রাখা সম্ভব—বহির্জগতে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যও বলবৎ থাকে এভাবেই। সুতরাং সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তাগিদে সৃষ্ট আবার সেই ব্যবস্থাকে বহাল রাখার সাধনও বটে।

দুটি প্রশ্ন ওঠে—এক, নারীত্ব বা পৌরুষ কি সত্যিই কিছু নিহিত মূল সত্তা বা উপাদানের মিশ্রণ? এবং দুই, নারীত্ব এবং পৌরুষ কি সত্যিই বিপরীত যুগ্মপদ? নারীবাদী তত্ত্ব ও তজ্জনিত সমালোচনা সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বদ্ধমূল ধারণার মূল সন্ধান করে এবং বিশ্লেষণ করে এই ধারণাগুলিকে নির্মূল করার চেষ্টা চালায়।

এভাবেই বোঝা সম্ভব যে 'নারী' বা 'পুরুষ' পরস্পরবিরোধী দুটি একক নয়—তাছাড়া, নারীত্বের খোপের বাইরে নিজের সত্তাসন্ধানী নারী সামাজিক নিয়মে 'পুরুষ' হয়ে যেতে বাধ্য নয়। নারীবাদী তত্ত্বকে ঠিক করে বুঝতে হলে জেন্ডরের সৃষ্টি রহস্য বোঝা, বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে এই জেন্ডর নির্ধারণ পদ্ধতি আমূল পাল্টে ফেলাই হয়ে দাঁড়ায় সর্বপ্রথম এবং সব থেকে কঠিন কাজ।

সেন্সরশিপ

সোমেশ্বর ভৌমিক

সেন্সরশিপ-এর উদ্দেশ্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাভাবনা, মতপ্রকাশ, মতের আদানপ্রদান, সংযোগের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। বলা হয়, এই নিয়ন্ত্রণ না-থাকলে নানা অবাঞ্ছিত, অপকারী মতামতের পথ ধরে সমাজ দূষিত হবে। সমাজপতি, ধর্মীয় নেতা আর প্রশাসনিক কর্তাদের এই স্পর্শকাতরতার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।

যুগে যুগে মানুষ নিজের কথা অন্যকে বোঝাতে চেয়েছে। তার ভাবপ্রকাশের সীমানা আত্মীয়, বন্ধু আর পরিচিতের ছোট্ট গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে অপরিচিতের মহলেও। আদানপ্রদান আর সংযোগের এই ব্যাপক ক্ষেত্রটিকে ঘিরে তৈরি হয় তাৎপর্যের নানা ছক, বিভিন্ন বৃত্ত। কারণ, সমাজ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত; আর শ্রেণিতে শ্রেণিতে আছে চাহিদা আর স্বার্থের তারতম্য, এমনকী সংঘাত। ইতিহাসের নানা যুগে মতপ্রকাশের মতো বিষয়ও এসে পড়েছে এই সংঘাতের বলয়ে। মতে-মতান্তরে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়েছে। তৈরি হয়েছে জটিলতা। এইসব জটিলতার পথে তৈরি হয়েছে সেন্সরশিপের বিচিত্র ইতিহাস।

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে অভিজাত ধনবান সম্প্রদায় প্যাট্রিশিয়ানদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার নিষ্কণ্টক রাখার জন্যে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রত্যেক শহরে একজন রাজকর্মচারী অধিবাসীদের ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তিগত যাবতীয় বিবরণ নথিবদ্ধ করতেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। নগর-সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের তদারকিও ছিল এই রাজকর্মচারীদের এক্তিয়ার। ওপরে ওপরে এটা আদমশুমারি হলেও, বকলমে এটি একধরনের গোয়েন্দাগিরি। এর খপ্পর থেকে বাঁচতেই যিশুর বাবা-মা-কে (জোসেফ আর মারি) যিশুর জন্মের ঠিক আগে গালিলি প্রদেশের নাজারেথ শহর থেকে পালিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁদের জন্মভূমি জুদাইয়া প্রদেশের বেথলেহেম-এ। পেশায় কাঠের মিস্ত্রি জোসেফ-এর পক্ষে অন্য প্রদেশে বাস করা ছিল বেআইনি। লাতিন এই প্রথার নাম ছিল 'সেন্সাস'। বিশেষ্যটি ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াত 'সেন্সের'-এ, যার অর্থ গণনা করা।

খ্রিষ্টোত্তর যুগের প্রথম দেড় হাজার বছর ইউরোপের সমাজ আর রাজনীতিতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন। এর মধ্যে মিশে ছিল গ্রিক, রোমান আর ইহুদি সভ্যতার নানা উপাদান। সেই সুবাদে সেন্সরশিপও ঢুকে পড় খ্রিষ্টীয়

পরিমণ্ডলে। এর প্রত্যক্ষ অভিঘাতে অধার্মিক, অবিশ্বাসীদের ওপর নেমে এল নিয়ন্ত্রণের, এমনকী চরম নির্যাতনেরও, খড়্গ। কেড়ে নেওয়া হল তাদের মতপ্রকাশের অধিকার। বাজেয়াপ্ত হল, নিষিদ্ধ হল, পোড়ানো হল তাদের লেখাপত্র আর বই। ডাইন বা ডাইনি নাম দিয়ে তাদের বন্দি করা হল, শূলে চড়ানো হল অথবা পুড়িয়ে মারা হল। ধর্মের নামে তৈরি করা হল বর্বরতার নতুন মাত্রা! স্পেন-এ ইনকুইজিশন-এর তাণ্ডব আর জোন অব আর্ক-এর হত্যাকাণ্ড এরই ফল। আদমশুমারির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে 'সেন্সর' শব্দটি এখন নির্যাতনের হাতিয়ার।

ষোলোর শতকে সেন্সরশিপ পেল নতুন তাৎপর্য। রাজনৈতিক প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় এই পদ্ধতি স্বীকৃতি পেল। সারা ইউরোপ জুড়েই তখন চলছে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের মতাদর্শগত লড়াই। শাসক অভিজাত শ্রেণির মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে উঠতি বুর্জোয়ারা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সেন্সরশিপই হল অভিজাতদের অবলম্বন। ইংল্যান্ডে টমাস মোর-এর কুখ্যাত বিচার-এর উদাহরণ। অবশ্য সেন্সরশিপ-এর ধর্মীয় অনুষঙ্গ তখনো সমান কার্যকর। এই শতকেরই উল্লেখযোগ্য ঘটনা, গালিলেও-র নির্যাতন আর জিওর্দানো ব্রুনো-কে আগুনে পুড়িয়ে মারা।

সেন্সরশিপকে আরো সংগঠিত করা হল সতেরো শতকে। পালাবদলের ঢেউয়ে, প্রশাসনিক সঙ্কট ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ-এর দেশে-বিদেশে। সবচেয়ে ক্ষতি হল ইংল্যান্ডের। স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাদের অপদার্থতায় বিক্ষোভে উত্তাল হল সমাজ। এরই মোকাবিলা করতে সে দেশের কোনো-কোনো কাউন্টিতে 'সেন্সর' নামে একটি পদ তৈরি করা হল। বলা হল, 'এই সরকারি কর্মচারীর কাজ হবে প্রকাশের আগেই বই, পত্রিকা নাটক ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা আর এটা সুনিশ্চিত করা যে, সেগুলিতে নীতিবিগর্হিত বা প্রতিষ্ঠিত রীতিপদ্ধতির পক্ষে অমর্যাদাসূচক অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু নেই।' এটা ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।

প্রশাসনের এই তৎপরতা থেকেই বোঝা যায়, সমাজে তখন প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার হাওয়া প্রবল হয়ে উঠেছে। রেনেশাঁস আর এনলাইটেনমেন্ট-এর প্রভাবে বহু মানুষ মুক্ত চিন্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সমাজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান আর রাষ্ট্র অনুমোদিত, বলা ভালো আরোপিত, চিন্তার গণ্ডিকে তাঁরা মানতে অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্র আর প্রশাসনের পক্ষে সে বড়ো সুখের সময় নয়। ঘটনাচক্রে ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দেই কবি জন মিল্টন তাঁর অ্যারিওপ্যাগিটিকা (*Areopagitica*) বইতে দাবি জানালেন 'সর্বোত্তম সেই স্বাধীনতা'-র যা মানুষকে দেবে 'সব কিছু জানার অধিকার, অবাধ মতপ্রকাশের অধিকার এবং বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ করার অধিকার'।

প্রতিষ্ঠানবিরোধীদের এইসব দাবির প্রত্যুত্তরে ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাস হল 'অনুমোদন আইন' (Licensing Act)। মুদ্রিত পত্র-পত্রিকায় কুরুচিপূর্ণ, সরকারি বা ধর্মমতে আপত্তিকর এবং রাষ্ট্রস্বার্থের পরিপন্থী কোনোকিছু যাতে জনসাধারণের সামনে প্রকাশিত হতে না পারে, সেজন্যে প্রকাশের আগেই সরকারি

অনুমোদনের বিধান দেওয়া হল এই আইনে। এই আইনের আওতায় এল নাটক এবং নাট্যাভিনয়ও।

'অনুমোদন আইন' অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ আধুনিক এই প্রথার ঝোঁকটা প্রাক্-নিয়ন্ত্রণের ওপর, যার পোষাকি নাম Pre-censorship। কণ্ঠরোধের নতুন আয়োজন প্রতিষ্ঠানবিরোধীদের হাত শক্ত করল। এতদিন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আটকে ছিল দার্শনিক তত্ত্বের গণ্ডিতে। নতুন প্রেক্ষিতে তা রূপান্তরিত হল মতাদর্শগত হাতিয়ারে। সমাজকর্মীদের তীব্র আন্দোলনের চাপে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি হল 'বিল অব রাইট্স্' বা 'অধিকারের সনদ'। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেল। শেষ পর্যন্ত ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বাতিল করল কুখ্যাত 'অনুমোদন আইন'।

কিন্তু আধুনিক সেন্সরশিপের ইতিহাস এখানে শেষ নয়। বরং এখানেই তার শুরু। আঠেরো শতকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূত্রে পুঁজিবাদীরা সামন্তবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল প্রাধান্যের পতাকা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল ইউরোপ-এর অন্যান্য দেশেও। এই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় ঘোষিত মানবাধিকার সনদ এবং ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় রচিত 'বিল অব রাইট্স'। এইভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়ারা প্রমাণ করতে চাইল তারা প্রগতির ধ্বজাধারী। কেননা প্রশাসনিক পরিকাঠামোর নানা ক্ষেত্রেই তখনো সেন্সরশিপ-এর চিহ্ন ছড়ানো। বিশেষত প্রকাশিত রচনা, বই, নাটক, খবর বা পত্রপত্রিকা এবং এমনকী পাঠানো চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্যে নানারকম আইন তখনো ছিল। মূলত সামন্তবাদী, অভিজাত শ্রেণীর সুবিধার্থে। সুবিধা পেয়েছিল ধর্মগুরুরাও।

উনিশ শতকেই অবস্থা আমূল বদলে গেল। পৃথিবী জুড়ে পুঁজিবাদের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিবাদীরা তাদের ভূমিকা পরিবর্তন করল। তাদেরই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের ওপর নতুন করে খবরদারি শুরু হয়ে গেল। এ ব্যাপারে তারা পাশে পেল সমাজের রক্ষণশীল অংশ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে। এদের সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি হল সেন্সরশিপ-এর চারটি উপাদান—

১. অভিভাবকত্ব বা প্রাধান্য বজায় রাখার তাগিদ

২. সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদ

৩. ধর্মীয় অনুশাসনের চাপ

৪. রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার তাগিদ

তবে সেন্সরের পুঁজিবাদী কায়দা একটু সূক্ষ্ম। পুঁজিবাদীরা খাতায় কলমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে। এটা উদারতার মুখোশ। পাশাপাশি তারা এটাও বলে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হতে পারে না; স্বাধীনতা চালিত করবে কিছু 'যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ' (Reasonable Restraint)। পুঁজিবাদী সমাজে সেন্সরশিপ হল এই 'যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ'-এরই অংশ। তবে এখানে প্রকাশমাধ্যম অনুযায়ী সেন্সরশিপ-এর তীব্রতায় তারতম্য হয়। খবরের কাগজ, বই বা পত্রপত্রিকা সাধারণভাবে এর আওতায় পড়ে না। ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়

নাটক এবং সিনেমায়। তাছাড়া সেন্সরশিপকে পুঁজিবাদীরা বলে নিছকই এক আপৎকালীন ব্যবস্থা। জরুরি প্রয়োজনের উপাদান। কাকে বলা হবে আপৎকালীন অবস্থা বা জরুরি প্রয়োজন তার খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোনো দেশের আইনেই নেই। তা নির্ভর করে সমাজপতি, ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা শাসকশ্রেণির স্বার্থের ওপর। তাদের বিচারের ওপর। আর যদি উপস্থিত হয় সেই জরুরি প্রয়োজন (Emergency). তখন ছাপাখানা, নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন এমনকী চিঠিপত্রের ওপরেও আরোপিত হয় নিয়ন্ত্রণ। সবই আইন মেনে।

কিন্তু দেশে যখন কোনো জরুরি অবস্থা থাকে না, সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কী হয়? আমেরিকান সাংবাদিক রিশার্ড কাপুসিন্স্কি লিখেছিলেন, জনমতকে প্রভাবিত করার জন্যে একনায়কতন্ত্র প্রয়োগ করে সেন্সরশিপ আর গণতন্ত্রে ব্যবহার করা হয় আরো সূক্ষ্ম কৌশল বা ছল। ইংরেজিতে ম্যানিপুলেশন বললে ব্যাপারটাকে এককথায় চেনা যায়। আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজতান্ত্রিক নোয়াম্ চম্স্কি অবশ্য একে ম্যানিপুলেশনের বদলে বলছেন প্রোপাগান্ডা—উদ্দেশ্যমূলক প্রচার। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রে এই প্রচারের ভূমিকাটা একনায়কতন্ত্রে ব্যবহৃত মুগুরেরই (bludgeon) মতো। এডওয়ার্ড এস. হেরম্যান-এর সঙ্গে লেখা *ম্যানুফ্যাক্চারিং কনসেন্ট : দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব মাস মিডিয়া* বইতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ম্যানিপুলেশনের চেহারাটা বিশদ বর্ণনা করেছেন চম্স্কি। তাঁদের বক্তব্য, পুঁজিবাদের বর্তমান পীঠস্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিপুঁজি-নির্ভর গণমাধ্যমগুলো প্রশাসনের নানা কৌশলে প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির সমর্থক বা সরাসরি প্রবক্তা হিসেবেই কাজ করে। ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও এভাবেই রাষ্ট্রলালিত মিথ্যা বা ছলনা বৈধতা পায়। পুঁজিবাদ-প্রভাবিত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর চরিত্র অবশ্য গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্রের মাঝামাঝি। শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন বা নৈতিকতার অজুহাতে সেখানেও নানাভাবেই চাপিয়ে দেওয়া হয় সেন্সরশিপ। আর কখনো-কখনো ব্যবহারিক কৌশলে রাষ্ট্র আদায় করে নেয় নাগরিক সম্মতিও—যেমন হয়েছে স্বাধীন ভারতে ফিল্ম সেন্সরশিপ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

বিশ শতকে সেন্সরশিপের চরম রূপ দেখা গেছে একনায়কশাসিত, সামরিক বাহিনী বা কমিউনিজ্ম্-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাহ্য করেই সেখানে রাষ্ট্রশক্তি তার ক্ষমতা জাহির করেছে। সেন্সরশিপ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত।

সেমিওটিক্স সেমিওলজি

মিহির ভট্টাচার্য

'সেমিয়টিকস্' কথাটির উদ্ভাবক মার্কিন দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়র্স (Charles Sanders Peierce. ১৮৩৯-১৯১৪), 'সেমিয়লজি' প্রথম ব্যবহার করেন সুইস ভাষাবিদ ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure. ১৮৫৭-১৯১৩)। আজকাল প্রধানত সেমিয়টিকস্ কথাটাই ব্যবহার করা হয়, তার একটা কারণ বোধহয় এই যে সংকেত-বিষয়ক আলাদা কোনো বিদ্যা বা disipline গড়ে ওঠেনি, বিবিধ বিদ্যানুশাসনের মধ্যে কখনো আলাদা কখনো মিশ্রিত একটি মত বা পদ্ধতি হিসাবেই এটির প্রসিদ্ধি। কথাদুটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ semeion (সংকেত) থেকে।

পিয়র্স সমগ্র বিশ্বকে সংকেতময় বলে ধরেছিলেন, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য সব কিছুই, মানুষ পর্যন্ত এক একটি সংকেত। সংকেতের এই বিশ্বজোড়া জালকে কীভাবে জানা যাবে, তাদের অর্থ এবং বিন্যাস কীরকম? পিয়র্স বহু আয়াসে একটি জটিল সিস্টেম তৈরি করলেন যার দ্বারা সংকেতগুলিকে তাদের চরিত্র অনুযায়ী সাজানো যাবে। দশটি ত্রিধান্বিত বর্গের অন্তর্গত ৫৯,০৪৯টি শ্রেণিতে সব সংকেতগুলি বিভক্ত, যদিও শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে ছেবট্টিটি শ্রেণিই মোটামুটি কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই বিপুল পরিমাণ তাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাজন সম্ভবত পরবর্তী কোনও চিন্তাবিদ সামলাতে পারবেন বলে ভরসা করেননি। কাজেই অনেকদিন পর্যন্ত পিয়র্সের চিন্তা নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া হয়নি, অনেককিছু প্রকাশিত হতেও সময় লাগে। তবে একটি ত্রিধাবর্গ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে এখন নিয়মিত ব্যবহৃত হয় : সেটি হল icon-index-symbol (প্রতিমা-সূচক-প্রতীক)। প্রতিমা এমন একটি সংকেত যার চরিত্র নির্ধারিত হয় উদ্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যের দ্বারা, যেটি সংকেতের বাইরে অবস্থিত। যেমন আলোকচিত্র প্রতিমা হিসাবে সংকেতের বাইরেকার কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনাকে সাদৃশ্যের দ্বারা চিহ্নিত করে, বা 'হাম্বা' কথাটি সাদৃশ্যের দ্বারা বাইরের একটি শব্দকে চিহ্নিত করে। সূচক এমন একটি সংকেত যার চরিত্র উদ্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে বা অবয়বসূত্রে যুক্ত, যেমন ধোঁয়া হল আগুনের সূচক বা ভ্রূকুটি বিরক্তির বা সিঁদুর বিবাহিত রমণীত্বের। প্রতীক উদ্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সংকেত হিসেবে তার অর্থ প্রথাগতভাবে নিয়ন্ত্রিত। কোনো স্বাভাবিক ভাষার বেশিরভাগ শব্দই প্রতীক, যে কারণে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে চিহ্নিত। যেমন, শিশু, বাচ্চা child. infant—সব কটি শব্দই উদ্দেশ্যরহিত

বা arbitrary-ভাবে একশ্রেণির বস্তুকে চিহ্নিত করছে। যান নিয়ন্ত্রণে লাল আলো একটি প্রতীক, সবাই মিলে সেটিকে নীল বা বেগুনি করে দিলে দ্যোতনার ইতরবিশেষ হবে না।

সোস্যুর অবশ্য বিশ্বময় সংকেতের সন্ধান করেননি, মূলত ভাষিক সংকেতের চরিত্রায়ণই ছিল তাঁর অভীষ্ট, যদিও ভাষা-নামক সংকেত-সিস্টেমকে তিনি আরো ব্যাপক এবং সাধারণ এক সংকেতনের অংশ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি দেখালেন যেকোনো ভাষিক সংকেতের দুটি অংশ আছে : 'সংকেতক' (signifiant / signifier) এবং 'সংকেতিত' (signifie / signified)—যেখানে সংকেতক হল একটি উচ্চারিত বাক্‌প্রতিমা এবং সংকেতিত হল একটি ধারণা। 'গোরু' শব্দটি উচ্চারিত বা লিখিত হলে সংকেতক হিসাবে কাজ করে এবং তার সংকেতিত হল চতুষ্পদ একটি জন্তুর ধারণা, বাস্তব জন্তু নয়। এবং এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল উদ্দেশ্যহীন বা arbitrary, পিয়র্স প্রতীক সম্পর্কে সাধারণভাবে যা বলেছিলেন। অনুরূপভাবে, সোস্যুর দেখালেন যে ভাষাও দুভাবে দেখা যায় langue এবং parole। সেখানে langue হল ভাষিক নিয়মের নির্দিষ্ট বিন্যাস, যার দ্বারা অর্থপূর্ণ পদ এবং বাক্যসৃজন করা যায়, আর parole হল বাস্তবে উচ্চারিতপদ এবং বাক্যের সমষ্টি, যার কোনো পরিমাপ বা সীমানা নেই। সোস্যুর-প্রবর্তিত ভাষিক সংকেতের আলোচনায় আর দুটি 'দ্বৈত বিপরীত' (binary opposition) খ্যাতিলাভ করেছে : synchronic / diachronic এবং syntagmatic / paradigmatic। ভাষার Synchronic বিশ্লেষণ ধরে নেয় যে নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তে ভাষার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাকে নিয়মে বিন্যস্ত সমষ্টি হিসাবে দেখা যেতে পারে। Diachronic বিশ্লেষণে ভাষিক উপাদানের কালগত পরিবর্তন লক্ষ করা হয়। Paradigm হল পছন্দ বা বাছাই-এর ক্ষেত্র, সেখান থেকে উপাদান আহরণ করে Syntagm নির্মিত হল কালিক বা স্থানিক মাত্রায়। 'সালমা বড় ভাল মেয়ে' বাক্যটিতে চারটি উপাদান কালিক অনুক্রমে (Syntagmatic) বিন্যাসে সাজানো হয়েছে, ব্যাকরণের অনুশাসন অনুযায়ী এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ। Paradigmatic-ক্ষেত্রে সালমার বদলে রাম, রহিম, খালেদা, শ্যাম ইত্যাদি পদ, মেয়ের বদলে, ছেলে, বুড়ো বাছুর, বাঘ ইত্যাদি বাছাই করা যেত।

সোস্যুরের বই বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু সংকেততত্ত্ব প্রকৃত চেহারা পেল দুয়ের দশক থেকে, মূলত রঁলা বার্তের (Roland Barthes) প্রচেষ্টায়। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল সংকেত-সিস্টেমের মধ্যেকার নিয়ামবলি থেকে অর্থ কীভাবে নির্মিত হয় তার অনুসন্ধান। অর্থ নিহিত হয় সংকেতন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে নয়। 'গোরু' পদ থেকে একটি চতুষ্পদ জন্তুর ধারণা করা হয় অন্যান্য অর্থপূর্ণ পদ থেকে তার পার্থক্য থেকে : 'গোরু বাঘ / সিংহ / হাতি / কুকুর / শিয়াল ইত্যাদি নয়। সংকেত সিস্টেমের মধ্যবর্তী পার্থক্যের জালে জড়িত আছে বলেই ভাষা-ব্যবহারী ব্যক্তি 'গোরু' কথাটার অর্থ করতে পারেন। এই অর্থনির্মাণের ক্ষেত্র থেকে reference বা প্রসঙ্গ দূরে চলে যাওয়ার সংকেতনে

অনেকসময় অতিমাত্রায় রূপকেন্দ্রিক বা formalist চেহারা নেয়। অনেকে সেজন্য সংকেততত্ত্বে ভাববাদী বিচ্যুতি লক্ষ করেছেন। 'গোরু' বহির্জগতে বিরাজমান এই ধারণা ভাষা-ব্যবহারের অন্যতম ভিত্তি, অ-বাস্তবিক প্রতিস্থাপন (non-realist representation) অনেকক্ষেত্রে ঘটে বলেই প্রসঙ্গকে উড়িয়ে দেওয়া সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে।

সংকেততত্ত্বের এই চেহারাটি বিন্যাসবাদ বা structuralism-এর সঙ্গে জড়িত। সেইসঙ্গে আবার সংস্কৃতিপাঠ (cultural studies) যখন গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসাবে দেখা দিল তখন সংকেতনের সামাজিক দিকটি প্রাধান্য পেল। দেখান হল যে অর্থনির্মাণ কেবল ভাষিক বা প্রতিমাভিত্তিক নিয়মে আবদ্ধ নয়, তার পিছনে আছে সাংস্কৃতিক বিধি বা code-এর জাল, অর্থাৎ শেষপর্যন্ত সামাজিক সংহিতার জঙ্গম নিয়মাবলি। 'গোরু' পদের অর্থ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জটিল এবং বিস্তৃত হয়ে ওঠে, বিবিধ সমাজের বিবিধ অংশে এই চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থান ও তার ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার সম্বন্ধে বিবিধ বর্গের মানুষের ধারণা—ইত্যাদি অনেক কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বিধি 'গোরু' শব্দের অর্থ তৈরি করে নেয়। গোমাতার তকমা যেমন এই ধারণার অংশ, তেমনই নির্মিত হয়েছে কুরুচিপূর্ণ ইংরেজি বাক্যবন্ধ stupid cow। বিধি বা code সংকেততত্ত্বের আলোচনায় চলে আসার পর জনপ্রিয় সংস্কৃতি (popular culture) বিশ্লেষণ একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। সবকিছুতেই পাঠ্য বা Text হিসেবে ধরলে উচ্চসংস্কৃতির প্রাধান্য আর বজায় থাকে না, কারণ পাঠবিশ্লেষণের সংকেতভিত্তিক পদ্ধতি শেক্সপিয়র আর ম্যাডোনার মধ্যে তফাত করে না। 'চারুলতা' আর 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'-দুটি পাঠ্যই সংস্কৃতির নির্মাণ, এবং একই নিয়মে বিশ্লেষণযোগ্য। মূল্যের পুনঃনির্দেশন অবশ্য সংকেততত্ত্বের অনায়ত্ব নয়, যাঁরা মার্ক্সবাদ, নারীবাদ বা সাইকো অ্যানালিসিস ভিত্তি করে সংকেতনের চর্চা করেছেন তাঁদের কছে মূল্যের প্রবর্তন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সেমান্টিক্স

পবিত্র সরকার

সেমান্টিক্স্ বা বাগর্থতত্ত্ব সাধারণভাবে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। সম্ভবত ১৮৯৩ সালেই ফরাসি পণ্ডিত ব্রেয়াল, গ্রিক উৎস থেকে ফরাসি sementiquc (সেমাঁতিক্) শব্দটি নির্মাণ করেন। কিন্তু তখনকার প্রচলিত ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে সেমান্টিক্স্ বলে বোঝাত ঐতিহাসিক বাগর্থতত্ত্ব। অর্থাৎ একটি শব্দের অর্থ নানা সময়ে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তারই বিবরণ। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের পাঠ্যগ্রন্থে কলম শব্দের অর্থ আগে যা ছিল ('শর' বা 'খাগ'), তা থেকে হল শর বা খাগের মাথা সরু করে কেটে তৈরি লেখার ব্যবস্থা, আবার পরে পরে শর বা খাগের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিবের লেখনীও কলম, 'ঝর্ণা'-কলমও কলম—এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে 'কলম' ইত্যাদি শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারা দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাতে অর্থ সংকোচ, অর্থপ্রসার, অর্থ-সংশ্লেষ, অর্থের উন্নতি, অর্থাবনতি ইত্যাদি ধারণাও ব্যবহার করা হয়। এগুলি সবই অর্থের নানারকম পরিবর্তনের নমুনা। অর্থসংকোচে একটি শব্দে আগে যত বেশি বস্তু বোঝাত, পরে তার চেয়ে কম বস্তু বোঝানো হতে থাকে। মন্দির আগে ঘর বোঝাত, এখন বোঝায় দেবমূর্তির ঘর।

এখনকার বাগর্থতত্ত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। বর্তমান ভাষাবিজ্ঞান ধরেই নিয়েছে যে, নানা সময়ে একই শব্দের অর্থ যেভাবে বদলায় তার সম্ভাবনা খুব ব্যাপক নয়, ফলে বিজ্ঞানের কাছে তা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকও নয়, যদিও সাধারণ মানুষের কাছে তা চিত্তাকর্ষক মনে হতেই পারে।

আধুনিক বাগর্থবিজ্ঞান ভাষায় শব্দের বর্তমান অর্থ এবং তার নানা সম্ভাবনাকেই লক্ষ করে। এই অর্থের দুটি ক্ষেত্র আছে। এক, ভাষার অভিধানে শব্দগুলির যে এক বা একাধিক অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা; দুই, ব্যবহারের মধ্যে শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে কোন্‌টি পরিস্ফুট হয়, কোন্‌গুলি হয় না—তার হদিশ নেওয়া এবং কারণ সন্ধান করা। এই দুরকম সন্ধানের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে একক শব্দের অর্থ, আর দ্বিতীয়ত বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে, সমগ্র বাক্যের অর্থের মধ্যে স্থাপিত শব্দটির অর্থ—এই দুরকম সন্ধান। অন্যভাবে বলতে পারি, অভিধানগত শব্দ আর বাক্যগত ব্যবহৃত পদের অর্থের দ্বিমুখী সন্ধান। একদল পণ্ডিত, যেমন নৃবিজ্ঞানী ব্রোনিস্লাভ ম্যালিনোস্কির 'context of situation' কথাটির দ্বারা উদ্দীপিত

লন্ডনের ভাষাবিজ্ঞানীর দল অবশ্য বলেন যে, অভিধানের অর্থ কোনো অর্থই নয়—ব্যবহারে শব্দটির যে অর্থ ফুটে উঠল সেটাই তার অর্থ। রুশ সমালোচনাতত্ত্বজ্ঞ বাখতিনও নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে একমত হবেন। অবশ্যই তাঁদের এই কথাটা বলা যেতে পারে যে, অভিধানের অর্থ যদি অর্থ না হবে, তবে আদৌ সে শব্দটা ব্যবহারে আসে কী করে? একটা কোনো অর্থ আছে বলেই না, কিংবা অভিধান একটা অর্থ না দিক, অর্থের কিছু সম্ভাবনা তৈরি করে রাখে বলেই না শব্দটা ব্যবহার করি আমরা! অভিধান যদি একটা অন্ধকার ঘর হত, তা থেকে অর্থপ্রকাশ করবার জন্য শব্দ বাছাই করতাম কী করে? কাজেই অভিধান কিছু নয়, ব্যবহারই সব—এই চূড়ান্ত মত যথেষ্ট যুক্তিবহ নয়। নিশ্চয়ই ব্যবহারে শব্দের অর্থ বা ব্যঞ্জনা বদলায়। কিন্তু অভিধানেই সেই ইঙ্গিত নিহিত থাকে।

এই অর্থের বিষয়ে একটা প্রাথমিক কথা আগে জেনে নেওয়া দরকার। তা হল, শব্দশরীর (ধ্বনিশরীর) আর তার অর্থের সম্পর্ক ফার্দিনান্দ সোস্যুরের কথায় arbitrary বা আপতিক। অর্থাৎ অর্থটা শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র, শব্দের ওই ধ্বনিবিন্যাসের সঙ্গে তার অর্থের কোনো আবশ্যিক নিত্য ও অপরিহার্য যোগ নেই। অর্থাৎ 'কুকুর' (ক্ + উ + ক্ + উ + র্)—এই ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে 'কুকুরত্ব' স্বতোসিদ্ধভাবে ফুটে ওঠে। যদি উঠত তাহলে পৃথিবীর সব ভাষাতেই 'কুকুর' শব্দটাই কুকুর নামক প্রাণী বোঝাতে ব্যবহৃত হত। তা হয় না, তাই এই প্রাণীর নাম লাতিনে canis (কানিস্), সংস্কৃতে শ্বন্, জর্মনে hund (হুন্ট্), ইংরেজিতে dog, ফরাসিতে chien (শিয়ঁ)। ভাষার ধ্বন্যাত্মক কিছু শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দ সম্বন্ধে সোস্যুরের কথা খাটে।

অর্থ সম্বন্ধে আর-একটা গোড়ার কথা আছে। তা হল, শব্দের অর্থ যখন পৃথিবীর কোনো বস্তুর সূচক, যেমন 'বই' বা 'জুতো' বা 'টেবিল'—তখন সে-অর্থ সেই বস্তুগুলিকে বোঝায় না, ওসব বস্তুর 'ধারণা'কে বোঝায়। অর্থ কোনো বস্তু প্রাণী ভাব অবস্থা ইত্যাদির সূচক নয়, তা এসবের 'বোধ' বা 'ধারণা'র সূচক। বাস্তবক্ষেত্রে 'ওই গোরুটা' বলতে অবশ্যই একটা বাস্তব গোরু বোঝাতে পারে, কারণ 'ওই' নির্দেশটি সেই যোগ দেখাচ্ছে। কিন্তু শুধু 'গোরু' বললে গোরুর ধারণাটি মাত্র জেগে ওঠে। মনের ভাবের ক্ষেত্রে তো একথা আরো সত্য।

অভিধানের একক শব্দের অর্থকে সাধারণভাবে কয়েকটি দিক থেকে বিচার করা হয়। ১. অন্তর্ভুক্তি (hyponymy)—অর্থাৎ শব্দের অর্থটি অন্য কোনো শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত কিনা—যেমন 'গাছ'—এই ব্যাপক ধারণার অন্তর্গত হল 'নিমগাছ'। ২. প্রতিশাব্দিকতা (synonymy) অর্থাৎ কোন্ শব্দগুলিকে এর প্রতিশব্দ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যেমন গাছের বেলায় বৃক্ষ, বিটপী, তরু ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানীরা সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন যে, প্রতিশব্দ বলে আদৌ কিছু নেই। কারণ অর্থের দিক থেকে মোটামুটি একই ভাব (ধারণা) বোঝাতেও যেখানে আমরা 'গাছ' কথাটা প্রয়োগ করব সেখানে 'তরু' বা বিটপী' ব্যবহার করা যাবে না। একাধিক শব্দের

অর্থ একরকম হলেও তাদের মধ্যে আছে শৈলীর বা স্টাইলগত চরিত্রের তফাত—ভাষার এক-এক শৈলীতে এক-একটি শব্দ মানিয়ে যায়, সব শব্দ এক শৈলীতে চলে না। আছে সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক অর্থের তফাত। 'চর্মকার' আর 'চামার', বা 'ভিক্ষুক' আর 'ভিখিরি' কথা দুটোর মধ্যে যেমন আছে সামাজিক অর্থের (আবার শৈলীগত অর্থেরও) তফাত, তেমনই মনস্তাত্ত্বিক তফাত আছে একই লোকের দুটি নাম 'রতন' আর 'রতনা'-র মধ্যে। প্রথমটা নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়টায় একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। ৩. বিপরীতার্থকতা (Antonymy) কোন্ শব্দের অর্থের বিপরীত কোন্ শব্দের অর্থ—'সুখী' আর 'দুঃখী', 'বেঁটে' আর 'লম্বা' ইত্যাদি যেমন। ৪. বহুর্থকতা বা বহু-অর্থকতা (polysemy). যেখানে একটি শব্দের একাধিক অর্থ দাঁড়িয়ে যায়—যেমন 'নাম' কথাটির আরো অর্থ—'খ্যাতি' ('খুব নাম হয়েছে'), 'হরির নাম' ('রাত্রে এখানে নামগান হবে'), 'চিহ্ন' ('খাবারদাবারের কোন নামই নেই সেখানে') ইত্যাদি। ৫. রূপৈক্য (homonymy)—যেখানে ভিন্ন উৎসের দুটি শব্দের অর্থের তফাত থাকে, কিন্তু ধ্বনিগত চেহারা এক দাঁড়িয়ে যায়, যেমন 'চাল' = 'ব্যবহার', 'চাল' = 'তণ্ডুল' এবং 'চাল' = ঘরের ছাউনি।

একক শব্দের এই বহু অর্থের মধ্যে কোন্‌টি বক্তার উদ্দিষ্ট তা স্পষ্ট হয় তার ব্যবহারের মধ্যে। এই ব্যবহারই শব্দটিকে দেয় সেই প্রতিবেশ যার সাহায্যে বোঝা যায় তার কোন্ অর্থটি বক্তার মনে আছে। এই প্রতিবেশ প্রধানত দুরকম হতে পারে—১. বাস্তব, আর ২. শব্দগত। 'আমার এরকম চাল চাই' বলে বক্তা যদি ঘরের ছাউনি দেখান—সেটা হবে বাস্তব প্রতিবেশের সাহায্যে বহু-অর্থকতা নিরসন; আর তিনি যদি দোকানির বহু চালের বস্তার মধ্যে রাখা চালের ('চাউল') দিকে দেখান—সেটা হবে আর-একটা অর্থে। আর শব্দগত প্রতিবেশ হল ভাষার অংশ। যদি বলি 'হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত'—সেখানে দুপাশের দুটি শব্দ—'হাঁড়িতে' আর 'বাড়ন্ত' বলে দেবে ওখানে 'চাল' কথাটির অর্থ ঠিক কী।

একক শব্দের যে অর্থই অভিধানে থাকুক না কেন, তাকে অর্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানের যোগফল হিসেবে দেখার একটা চেষ্টা ১৯৬০-এর বছরগুলির শেষদিকে দেখা যায়। এর নাম অর্থখণ্ড বিশ্লেষণ (componential analysis)। যেমন 'শিক্ষক' কথাটার অর্থখণ্ড বিশ্লেষণ এভাবে করা যায়— + মানব, + পুরুষ, + শিক্ষকতা-বৃত্তিধারী। ধ্বনির স্ব-লক্ষণ (distinctive features) তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই অর্থখণ্ড-তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, জার্মান, ভাষাবিজ্ঞানী মাক্স বিয়েরভিশ্ ছিলেন এর প্রধান প্রবক্তা। চম্‌স্কি-শিষ্য কাট্‌স ও পোস্টাল, এবং চম্‌স্কিও তাঁদের ব্যাকরণতত্ত্বে এই অর্থখণ্ড-তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন—এবং বহু অর্থের মধ্য থেকে যে-নিয়মের সাহায্যে ইপ্সিত অর্থটিকে নির্দেশ করা হয় কাট্‌স ও পোস্টাল তার নাম দিয়েছিলেন নির্দেশ-নিয়ম (projection rules)।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বাক্যে শব্দসজ্জায় আভিধানিকভাবে বাক্যের অর্থ যা হতে পারে তা না হয়ে তাতে একটি ব্যঞ্জনা তৈরি হল—বাক্যের শব্দগুলির সঙ্গে যার

সম্পর্ক জটিল, কিন্তু প্রতিবেশের সঙ্গে যে ব্যঞ্জনার্থের সম্পর্ক আছে। কেউ ঘরে ঢুকে 'বড্ড গরম' বললে আক্ষরিকতার বাইরে গিয়ে এমনও বোঝানো হতে পারে যে, 'ফ্যান্‌টা চালিয়ে দাও' বা 'জানলাটা খুলে পর্দা তুলে দাও'। বাক্যের এই প্রতিবেশগত ব্যবহারিক ব্যঞ্জনাকে চম্‌স্কি বাগর্থতত্ত্বের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রয়োগার্থতত্ত্ব বা (pragmatics)-এর এলাকায় ফেলেন। ফলে ভাষায় বাক্যের দুরকম অর্থ তৈরি হয়ে যায়—ব্যাকরণগত অর্থ আর প্রয়োগার্থ। ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী জন লায়ন্‌স-এর বাক্যার্থ আর উক্তি-অর্থের (sentence meaning আর utterance meaning) মধ্যে কিছুটা এই তফাত আছে, পুরোটা নয়। প্রয়োগার্থ বিষয়ে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ধ্বনিবাদে আনন্দবর্ধন প্রভৃতি অতিশয় সূক্ষ্ম বিচার করে গেছেন।

বাগর্থতত্ত্বের নানা দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটিকে দিয়ে অর্থের সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করা যাবে বলে মনে হয় না। হয়তো শেষ পর্যন্ত নানা মত থেকে বিশ্লেষণ গ্রহণ করে একটি অখণ্ড তত্ত্ব গড়ে তোলা যাবে। আমরা তার অপেক্ষায় আছি।

সোশ্যালিজম

অভ্র ঘোষ

সোশ্যালিজম (Socialism) বা সমাজতন্ত্রবাদ ধারণাটির ব্যবহার দুদিক থেকে হয়ে থাকে। বিশেষ একধরনের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা বোঝাতে যেমন সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়, তেমনি বিশেষ একটি মতাদর্শ বোঝাতে আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করি। ১৮২৮ সালে প্রথম ফরাসি ভাষায় Socialisme বা সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার দেখা দিয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীবাদী'দের (Utopian Socialist) তত্ত্বালোচনায় এই মতাদর্শটি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল। সাঁ সিমো (Saint Simon, ১৭৬০-১৮২৫) শার্ল ফুরিয়ে (Charls Fouirer, ১৭৭২-১৮৩৭) রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, ১৭৭১-১৮৫৮) প্রমুখ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্র' শব্দদ্বয় এঁদের সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্যবহার করেছিলেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস] সমাজতন্ত্র বিষয়ে আগ্রহের আগেও অবশ্য অনুরূপ ধারণার কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিল। প্লেটোর *রিপাবলিক* বা টমাস মোরের (Thomas More, ১৪৭৮-১৫৩৫) *ইউটোপিয়া* গ্রন্থে সমাজবাদী চিন্তার প্রকাশ ছিল। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে ১৬৪২-৫২-এর যুগে গৃহযুদ্ধের সময় ডিগারস (Diggers) ও লেভেলারস (Levellers) গোষ্ঠীর কার্যকলাপে এবং বিশেষত ডিগারদের মুখপাত্র *গেরার্ড উইনস্ট্যানলি* (G. Winstanley) যেসব তাত্ত্বিক ধারণাগুলি প্রচার করেছিলেন তাকে সমাজতন্ত্রের আদিরূপ বলা যেতে পারে। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে এবং তারপরে ব্যাবুফ (Francois Babeuf, ১৭৬০-১৭৭৯) ও লুই ব্লাকির (Louis Blanqui, ১৮০৫-১৮৮১) চিন্তা ও গুপ্ত কর্মকাণ্ডেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। তবে আগেই বলা হয়েছে যে সচেতনভাবে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি চয়ন করে এই ধারণার ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকে 'কাল্পনিক সমাজবাদী' চিন্তাধারায়। 'কাল্পনিক সমাজবাদীরা' যৌথ উৎপাদনের ভিত্তিতে ছোটো ছোটো সমাজতান্ত্রিক কলোনি গঠন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সমগ্র সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক কোনো কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক কর্মসূচি তাঁদের ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজের নতুন শ্রেণিশক্তি প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী ভূমিকা বিষয়েও এই সমাজবাদীদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্ক্স (Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের (F. Engels, ১৮২০-১৮৯৫) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হলে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মধ্য উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের বর্তমান কাল পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থাগত ও মতাদর্শগত বিপ্লবী ধারণা হিসেবে এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের নানা রূপ ও ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। একালের এক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক জোড (Joad) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, সমাজতন্ত্র একটা টুপির মতো যা তার নিজস্ব আকৃতি হারিয়েছে, কারণ সকলেই তা পরার চেষ্টা করেছে। বাস্তবিকপক্ষে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাল্পনিক সমাজবাদ, মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা মার্ক্সবাদ, শেষার্ধে ইংল্যান্ডের ফেবিয়ান সমাজবাদ এবং তারই পাশাপাশি ইউরোপের নানা অঞ্চলে গিল্ড সমাজবাদ (সঙ্ঘ সমাজবাদ), সিন্ডিকালিজম (শ্রমিক সঙ্ঘবাদ) ইত্যাদি আন্দোলন, বিশ শতকের শুরু থেকে বিবর্তনমূলক সমাজবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্বসমূহ—সবকিছুই সমাজতন্ত্র বলে পরিচিত। ফলত সমাজতন্ত্র, কী,—কী কী তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য তা শনাক্ত করা খুবই কষ্টকর। তবে সব ধরনের সমাজতন্ত্রের মধ্যে সাধারণ কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যার সময়ে খেয়ালে রাখতে হবে যে সমাজতন্ত্র একটি বিশেষ উৎপাদনব্যবস্থা ও মতাদর্শের নাম।

এক, ইউরোপের শিল্প বিপ্লব (প্রথম ও দ্বিতীয়) এবং ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে অর্থনৈতিক, উৎপাদনব্যবস্থা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমপ্রসরমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার পর সমাজে দুই নতুন শ্রেণি গড়ে উঠেছিল—নিম্নবিত্ত ও শোষিত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি (মার্ক্স তাঁর বিশ্লেষণে এর নামকরণ করেছিলেন প্রলেতারিয়েত।) এবং অন্যদিকে পুঁজির মালিক ও সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা পুঁজিপতি শ্রেণি। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী শ্রেণির উত্থানও ধনতন্ত্রে এক ঐতিহাসিক সামাজিক ঘটনা। যাই হোক, ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের তীক্ষ্ণতা ও মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকার দরুণ নিম্নবর্গের প্রলেতারিয়েত শ্রেণির অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল স্বতঃই। শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির দর্শন ও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে সমাজতন্ত্রের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা। সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক নৈরাজ্য-অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজগঠনের স্বপ্নে ব্রতী হয়েছিল সমাজতন্ত্র।

দুই, সব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরাই কৃষি, কলকারখানা, খনি বা অন্যান্য শিল্পব্যবস্থাগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাতে চায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থিক ও জীবনযাপনগত বৈষম্য কমাতে চায়। এর জন্য সম্পদের সামাজিক মালিকানার কথা বলা হয়। সম্পদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিব্যবস্থার অবলোপ। সেইকারণেই 'কাল্পনিক

সমাজবাদী'রা সমবায় ও সহযোগমূলক উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সম্পদের জাতীয়করণের কথাও এসেছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও জোর দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হল শোষণের মূল উৎস। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ অবলুপ্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি। ভারী শিল্পের ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাদির রাষ্ট্রীয়করণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের দেশে নেহরু প্রবর্তিত সমাজবাদী ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মিশ্র অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনীতি, উৎপাদনে ও বাণিজ্যব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বসমূহ ও তৃতীয় দশকে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির দর্শনেও অনুরূপ গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।

তিন, সমাজতন্ত্রবাদীরা সকলেই সমাজকে শোষণমুক্ত করে তোলার জন্য প্রতিযোগিতামূলক সমাজের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়মূলক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চান। মার্ক্সবাদীরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে ভাবধারা অনুযায়ী বৈপ্লবিক শ্রেণিযুদ্ধের মাধ্যমে সমাজকে শ্রেণিশোষণ মুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন, শ্রমজীবী শ্রেণির একধিপত্যের কথা বলেছেন। 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্র' বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদে সহিংস শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ ঠাঁই পায়নি, বিদ্যমান শ্রেণিগুলির মধ্যে আইনগতভাবে ও নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমবায়িক ও সহযোগমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার চিন্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের বাস্তব স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে মার্ক্সবাদে, আর অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা প্রত্যক্ষ শ্রেণিযুদ্ধ পরিহার করে রাষ্ট্রে সর্বপ্রকার জনগণের শাসন ও মৌলিক অধিকারের সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘগুলির অধিকার ও শিল্পগ্রহণের অধিকার সম্প্রসারণ করতে চেয়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করে আইন প্রণয়ন, সমবায় আন্দোলন ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে।

চার, সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বৈষম্যহীন-শ্রেণিহীন উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা যেমন গড়ে তুলতে চায় তেমনই সামাজিক রাজনৈতিক দিক থেকে এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞাতেও আস্থা রাখে। জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে, এক পরস্পর-বিরোধহীন সমতাবাদী সমাজ নির্মাণ করতে চায় সমাজতন্ত্র। মার্ক্সবাদীরা এই সুঠাম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পৌঁছবেই এমন বিশ্বাসে আস্থা রাখেন বলেই তাঁদের সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট বলা হয়। তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের এক মধ্যবর্তী স্তর। এই মধ্যবর্তী সামাজিকস্তরে সমাজতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হয় বিপ্লবী সচেতন শ্রমজীবী শ্রেণির বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধারাবাহিক শ্রেণিসংগ্রাম চালু রাখতে হয়। ক্রমে সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজ শ্রেণিহীন হলে এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর সমাজের পূর্ণ যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং প্রতিক্রিয়াশীল

শ্রেণিগুলির প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হলে সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন আর থাকবে না। এঙ্গেলসের ভাষায় রাষ্ট্র ক্রমশ অবলুপ্ত হবে। 'কাল্পনিক সমাজবাদ' বা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদে' অবশ্য এই রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন স্বীকৃতি পায়নি। বরং একে এক অলীক দিবাস্বপ্ন বলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা অভিহিত করেছেন। তাঁরা মনুষ্যসভ্যতার সমস্ত পর্বে রাষ্ট্রকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রশাসনিক যন্ত্র হিসাবে স্বীকার করেছেন। এঁদের মতে বুর্জোয়া সমাজের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক শক্তিশালী ও সংগঠিত মানবকল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই সমাজবাদীদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার রাষ্ট্রকর্তৃত্ব নয়, পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের নায়কত্বে সহযোগমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের একান্ত লক্ষ্য। বাস্তবিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মার্ক্সবাদীরাও তাঁদের মধ্যবর্তী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এক অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসনিক যন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছে, কেননা পারিপার্শ্বিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এবং সমাজকে প্রলেতারিয় একনায়কত্বের ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেণিহীন করে তোলার জন্য রাষ্ট্রকে এক সামগ্রিকতাবাদী শক্তিতে পরিণত করতে না পারলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হবে না।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও সংকট—এই দুয়েরই সাক্ষ্য বিংশ শতাব্দী। ঐ শতকের সূচনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (USSR) প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মাওয়ের অধিনায়কত্বে চীনেও গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশে যেমন পোল্যান্ড, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি ইত্যাদিতেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে কিউবাতেও তৈরি হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এরই পাশাপাশি বুর্জোয়া উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধারণাও বিস্তৃতি পেতে শুরু করে বিশ শতকের সূচনাতেই। জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের আধিপত্য, ইংল্যান্ডে লেবার পার্টির জনপ্রিয়তা যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শের বিস্তার ঘটেছে। ভারতে পণ্ডিত নেহরু এই আদর্শের ভিত্তিতেই সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। সত্তরের দশক পর্যন্ত এই উভয় প্রকার সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল বলা চলে। কিন্তু মধ্য আশির দশক থেকেই মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংকট প্রকট হয়ে পড়ল। সংকটের সূচনাকাল হিসেবে এই দশককে চিহ্নিত করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। সংকট তৈরি হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে বহু আগে থেকেই, এই সময়কে প্রকাশকাল হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে। অতিকায় রাষ্ট্রক্ষমতার দাপট, স্বার্থদুষ্ট আমলাতন্ত্রের নির্যাতন, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুপস্থিতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব, সামরিক বাজেটের ভয়াবহ স্ফীতি ইত্যাদি আরো বহু কারণে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এবং শেষে

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নামক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটেছে গত শতকের নব্বইয়ের যুগের সূচনাতে। চীনের সমাজতান্ত্রিক সরকারও নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য উদারনীতিকরণের পথ প্রশস্ত করে তুলেছে।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের চিন্তাধারাও পূর্বাপেক্ষা তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বিধি ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ধ্যানধারণাগুলি ক্রমাগত বর্জিত হচ্ছে। ভারতেও এই একই প্রবাহ। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিবর্তে অবাধ বাজার অর্থনীতি, বেসরকারি শিল্প সংস্থান ও বিনিয়োগ মাত্রার ক্রমপ্রসারণ আমাদের উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের চিন্তাভাবনা থেকে বহুদূরে আমাদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। অতএব বলা যেতে পারে, বিশ শতক যুগপৎ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও সংকটের শতাব্দী। শুরুতে ছিল তার বিকাশের প্রতিজ্ঞা শেষে দেখা গেল সংকটের গভীর ছায়া।

স্ফোটবাদ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

স্ফুট্ ধাতুর অর্থ ফুটে ওঠা, প্রকাশিত হওয়া, অভিব্যক্ত হওয়া, (স্ফুট + ঘঞ্ অপাদান অর্থে)। অতএব আক্ষরিকভাবে স্ফোট মানে দাঁড়ায়—যা থেকে অর্থ ফুটে ওঠে, যা থেকে অর্থ অভিব্যক্ত হয়—স্ফুটতি প্রকাশতে অর্থো অস্মাদিতি স্ফোটঃ। কণ্ঠ, তালু, নাসিকা ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণের উচ্চারণ স্থানে যে বায়ু সংযোগ ঘটে, সেই বায়ু-সংযোগের দ্বারাই স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। স্ফোটের অভিব্যঞ্জনাকে অর্থাৎ যা থেকে স্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটে, তাকে ধ্বনি বা বর্ণ বলা হয়। বস্তুত স্ফোটই বর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। শব্দগত বর্ণের উচ্চারণের সময়ে পূর্ব-পূর্ব বর্ণের একটা সংস্কার কাজ করতে থাকে। এই সংস্কারজনিত স্মৃতির ফলে অন্ত্যবর্ণটির উচ্চারণের সময় তারসঙ্গে পূর্ববর্তী বর্ণসমূহের একটি স্মৃতিজ্ঞানবিশিষ্ট সমূহাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সমূহাত্মক জ্ঞানই অর্থবোধের হেতু। 'অশ্ব' শব্দটি উচ্চারণের সময় ক্রমে 'অ শ্ ব্ অ' উচ্চারণ করি বটে কিন্তু 'শ্' উচ্চারণ করার সময় অ-এর উচ্চারণ থাকে না। অথবা 'ব্' উচ্চারণের সময় 'শ্'-এরও উচ্চারণ থাকে না। কিন্তু একেবারে শেষ 'অ' বর্ণ উচ্চারণের সময় পূর্বোচ্চারিত অ শ্ এবং ব্ স্মৃতি বা সংস্কার থেকে যাওয়ার সমগ্র পদটির উচ্চারণ শেষে একটি বিশেষ অর্থের অভিব্যক্তি ঘটে। একেই স্ফোট বলে।

বৈয়াকরণদের মতে শব্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণের পর সম্পূর্ণ শব্দটির একটি অখণ্ড জ্ঞান তৈরি হয়। প্রথম বর্ণের উচ্চারণের পর একেবারে শেষ অন্ত্যবর্ণটি উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত শব্দের এই অখণ্ড জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হয় না। বর্ণসমূহের সামগ্রিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হলে শব্দের উচ্চারণকালীন পূর্ববর্ণের স্মৃতি এবং পরবর্ণের অপেক্ষা তথা অনুভূতি আর পৃথকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। ঠিক এইজন্যই বর্ণসমূহের অখণ্ড উচ্চারণ এবং তজ্জনিত অখণ্ড জ্ঞানকেই স্ফোট শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়।

স্ফোট বলতে যাই বোঝাক, সেটি বর্ণ, পদ এবং বাক্য তথা সেগুলির অর্থসম্বন্ধীয় এক বিশেষ মতবাদ। আর বর্ণ, পদ এবং বাক্য এমনই এক বস্তু যা শুধুই বৈয়াকরণদের সম্পত্তি হলেও প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রবক্তারা স্ফোটবাদের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে বিভিন্ন মতও ব্যক্ত করেছেন এবং প্রয়োজনে আপন সিদ্ধান্তসিদ্ধির জন্য গ্রহণও করেছেন স্ফোটবাদ। স্ফোটবাদের প্রধান প্রবক্তা আচার্য ভর্তৃহরি স্ফোটের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন বৈদিক সূত্র ধরে। সেই মতে শব্দ তার অস্ফুট সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রাণীর

মূলাধার পদ্মে অবস্থিত থাকে, ঠিক যেমন ঘি দুধের মধ্যেই থাকে অব্যক্ত অবস্থায়। শব্দোচ্চারণের ইচ্ছা হলে দেহের অভ্যন্তরে থাকা কৌষ্ঠ বায়ু সেই ইচ্ছাকে ঠেলে দেয় ওপর দিকে। তখনই সে 'বাক্'-সংজ্ঞা লাভ করে। পরা বাক্ যখন আরো ওপরে ঠেলে উঠে নাভিদেশে আসে তখন সেই অব্যক্তের অভিব্যক্তি হয় খানিকটা। এই অবস্থার নাম 'পশ্যন্তী', বা 'পরা' বাক্। পশ্যন্তী বাক্ আরো ওপরে ঠেলে উঠে হৃদয়দেশ প্রাপ্ত হলে মধ্যমা বাকে রূপান্তরিত হয়। ইচ্ছাপ্রেরিত সেই কৌষ্ঠ বায়ু আরো ওপরে ঠেলে উঠে যখন কণ্ঠ-দেশ প্রাপ্ত হয় তখন তার নাম হয় 'বৈখরী'। শব্দের এই চতুর্থ অভিব্যক্ত অবস্থাতেই মানুষ কথা বলে—তুরীয়াং বাচং মনুষ্যা বদন্তি।

ভর্তৃহরি বলেছেন—তৃতীয় অবস্থায় মধ্যমাশক্তি দ্বারা শব্দ যখন কেবলই প্রকাশমান হয় সেই সূক্ষ্ম অবস্থাটাই স্ফোটের ব্যঞ্জক—মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে। ভর্তৃহরির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লোকব্যবহারের অতীত পারমার্থিক অবস্থায় স্ফোট পশ্যন্তী শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং সেই পশ্যন্তী বাক্ই অনাদি অনন্ত সমস্ত বিকারবর্জিত পরম ব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মই বৈয়াকরণমতে আত্মা—অস্মাকং জ্ঞানশক্তির্যা যা সদাশিবরূপতা। বৈয়াকরণ সাধূনাং পশ্যন্তী সা পরা স্থিতিঃ। ইত্যাহুস্তে পরং ব্রহ্ম যদনাদি তথাক্ষরম্। তদক্ষরং শব্দরূপং সা পশ্যন্তী পরা হি বাক্। 'পশ্যন্তী'র শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ যে অভিব্যক্তি অর্থাৎ কানে শোনা যায় এই অবস্থাটা তাকে 'বৈখরী' বলা যায় এবং ওই 'পশ্যন্তী'রই অন্তঃকরণগ্রাহ্য যে অভিব্যক্তি তাকে বলা যায় 'মধ্যমা' এবং এই মধ্যমাকেই স্ফোটের ব্যঞ্জক বলেছেন ভর্তৃহরি।

বৈয়াকরণকেরা আটরকমের স্ফোট স্বীকার করছেন—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট, অখণ্ডপদস্ফোট, অখণ্ডবাক্যস্ফোট, বর্ণজাতিস্ফোট, পদজাতিস্ফোট, বাক্যজাতিস্ফোট। দার্শনিকদের মধ্যে এই বিভিন্ন স্ফোট নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ শতাব্দে জন্মেছিলেন—তিনি পদ্ধতিগত শব্দসাধনে বেশি আগ্রহশীল ছিলেন বলেই হয়ত শব্দের দার্শনিক প্রস্থানে তেমন মাথা ঘামাননি। কিন্তু শব্দতত্ত্বের দার্শনিক বীজগুলি তিনি তাঁর শব্দসাধনের অন্তরে অন্তরে মাঝেমাঝেই প্রকাশ করেছেন এবং সেই বীজগুলি শাখা-পল্লবে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে ভর্তৃহরির *বাক্যপদীয়* গ্রন্থে। যেমন পতঞ্জলির একটি মৌলিক তত্ত্ব হল—স্ফোট আর ধ্বনি কিন্তু এক নয়। ধ্বনিকে তিনি অর্থবোধক বলে মনে করেন না। ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত স্ফোটকেই তিনি অর্থবোধক বলে স্বীকার করেছেন। পতঞ্জলি বলেছেন—স্ফোটই শব্দ। ধ্বনি হল শব্দের গুণ। ধ্বনি ব্যঞ্জকত্বসাধন করে শব্দ বা স্ফোটের উপকার করে—এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ (শব্দগুণ ইতি শব্দস্য উপকারকো ব্যঞ্জকত্বেনেত্যর্থ)।

স্ফোটবাদের ধারণা খ্রিষ্টীয় ১৫০ শতাব্দীর আগে অর্থাৎ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির আগেও ছিল। বর্ণ, পদ এবং বাক্যকে কেমন এক অধরা-ধরা অব্যক্ত অসীম ব্রহ্মস্বরূপতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, ব্যাকরণে সেটাই স্ফোটবাদের একটা তাৎপর্য। পতঞ্জলি এবং ভর্তৃহরি তাঁদের পূর্বে লেখা যে বিলুপ্ত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন, তার

নাম 'সংগ্রহ'। এই গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাড়ি অদ্ভুত একটি কথা বলেছেন সেই কোনকালে। বলেছেন—বর্ণের রূপে বাঁধা পদ বলে কিছু নেই। পদের সঙ্গে তার অর্থেরও সম্বন্ধ নেই কোনো। বাক্যের অর্থ থেকেই পদের অর্থ কল্পিত হয় মাত্র। বস্তুত শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের কেউ কর্তা নেই এবং সেই সম্বন্ধটাও অনাদি। কেউ যদি শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ করে, তবে অন্য কোনো শব্দকে অবলম্বন করেই যে সম্বন্ধ করতে হয়। আবার যে শব্দকে অবলম্বন করে অন্য শব্দের অর্থ করতে হল, তার অর্থ করতে গেলেও অন্য একটি শব্দ লাগে। তাহলে কী দাঁড়াল? শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ অনাদি। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের মূল এবং পারমার্থিক স্বরূপ একই, শুধু লোকব্যবহারের সময় আমরা বলি অমুক শব্দের অর্থ অমুক ইত্যাদি—শব্দার্থয়োরসম্ভেদে ব্যবহারে পৃথক্‌ক্রিয়া। যতঃ শব্দার্থয়োস্তত্ত্বমেকং তৎ সমবস্থিতম্।

ব্যাড়ি, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি—এই তিন প্রবক্তার হাতে স্ফোটবাদের সূচনা ও স্থাপনা হয়েছিল, তার আরো বিস্তার হয়েছে কৌণ্ডভট্ট নাগেশভট্ট প্রমুখ নব্যবৈয়াকরণদের রচনায়। বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন মীমাংসক কুমারিলভট্ট, নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট প্রমুখ দিকপাল দার্শনিকরা।

বর্ণ, পদ এবং বাক্য নিয়ে এই যে কূট-বিচার এবং দার্শনিকতার সৃষ্টি হয়েছিল স্ফোটবাদের মাধ্যমে, তা এতই বিশাল, গভীর এবং সূক্ষ্ম যে, আধুনিককালে যে কোনো নোয়াম চমস্কিকেও তা উন্মাদ করে দিতে পারে, কিন্তু সে-সব তত্ত্বের চর্চা করার মতো বুদ্ধি এবং ভাবনা করার পথই এখন লুপ্ত হতে বসেছে।

হকিং-এর কাল-দর্শন

তরুণকান্তি সেন

পৃথিবী বিপুলা, কাল নিরবধি। হায়—পৃথিবী এখন আর বিপুলা নয়। প্রায় মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে, মুঠোফোনের মধ্যে তো বটেই; এমনকি যে ছায়াপথের (Galaxy) একটি মাঝারি আয়তনের তারকাকে ঘিরে আমাদের এরকম নাচানাচি তার চারপাশে লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের অস্তিত্ব এখন সর্ববাদীসম্মত। তারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, বিস্তৃত হচ্ছে। এর বিস্তার কি একদিন থেমে যাবে আর তারপর নিউটন সাহেবের কথামত মহাকর্ষের টানে তারা আবার কাছাকাছি চলে আসবে? এলে কী হবে? মহাকর্ষের সূত্র অনুযায়ী দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক আর দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ যত কাছে আসবে টান তত প্রবল হবে। এর শেষ কোথায়? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কি ঘন থেকে ঘনতর হয়ে নিশ্চিন্ত বিলয়ের পথে যাবে? এতে অবশ্য নতুন করে ভয় পাবার কিছু নেই; কারণ ব্যাপারটা ঘটতে যত কোটি বছর লাগবে তার অনেক আগেই আমাদের সূর্যের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। আমাদের কী হবে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনেকের কাছে এত কথা, ধান ভাঙতে শিবের গীতের মত শোনাতে পারে। কাহিনীটা সময়ের, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের কথা টেনে আনার কি আছে? অবশ্যই আছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আমরা যাকে সময় অথবা কাল বলি, তার সম্পর্ক ঠিক ভাশুর-ভাদ্দর বউ-এর নয় বরং যমজ সন্তানের মত। অর্থাৎ তাদের জন্মলগ্ন এক। বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই একমত যে এক প্রচণ্ড বিস্ফার (Big Bang) থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। সময়ের যাত্রাও একই লগ্নে। সময় শুরু হল কথাটা কেমন শোনায়, কারণ আমরা সময়ের একটা সার্বভৌম অবিচল অস্তিত্বই মানতে অভ্যস্ত। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এরকম যাবতীয় জিনিষই একটা সময়ে শুরু হয়ে পূর্বনির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট কোন সময়ে শেষ হতে পারে। কিন্তু সময় শুরু হল, এর অর্থটা কী? ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র প্রকাশিত হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে, আকাশ (Space) ও সময় (Time) ছিল দুটি স্থির, সার্বভৌম এবং অন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে অবিচল অস্তিত্ব। যে কোনো ঘটনাপ্রবাহকে এই দুটির স্বাধীন নিরিখে নির্দিষ্ট করা হত। স্পেনে কোথায় কী ঘটে গেছে, কবে ঘটেছে তা চিহ্নিত করতে কোনো দ্বিধা ছিল না। কাল ছিল নিরবধি, আকাশ অনন্ত বা সান্ত যাই হোক না কেন তার অস্তিত্ব ছিল

স্থির। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পর এটা বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত যে, মহাজগতে যা ঘটছে, ঘটেছে বা ঘটবে তাতে আকাশ এবং সময় দুটিই প্রভাবিত হবে: দুটির কোনটারই কোনো সৃষ্টিছাড়া অবিচল অস্তিত্ব নেই। তাই যদি হয় তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আগে সময়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিগ ব্যাং থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি যদি সত্য হয় তাহলে কালের যাত্রাপথও তখন থেকেই শুরু।

এবারে খানিকটা পিছু হটা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল জানতেন যে পৃথিবী একটি স্থির গোলক যাকে প্রদক্ষিণ করছে চন্দ্র, সূর্য এবং তৎকালীন পরিচিত গ্রহ নক্ষত্রেরা। অ্যারিস্টটলের আদলে টলেমি (২য় খ্রিষ্টাব্দ) যে মডেল করেন তাতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গোলকপথে চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং স্থির তারকারা ঘুরছে এটিই ধরে নেওয়া হয়।

বহু শতাব্দী ধরে এই মডেলই ধ্রুব বলে গৃহীত ছিল কারণ তার সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী মোটামুটি মিলত। ধর্মযাজক নিকোলাস কোপার্নিকাস ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে উল্টো সুর গাইলেন, অবশ্য ভয়ে ভয়ে। কারণ চার্চ টলেমির মডেলে আস্থাশীল ছিল। তিনি বললেন যে, সূর্যই আমাদের মধ্যমণি এবং গ্রহ নক্ষত্রেরা বৃত্তাকার পথে তাকে প্রদক্ষিণ করছে। শ-খানেক বছর বাদে জার্মান বিজ্ঞানী কেপলার গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তের বদলে উপবৃত্ত বলে স্থির করেন, কারণ এই সিদ্ধান্তেই গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে হিসাবগুলি নির্ভুল হচ্ছিল। কেপলার অবশ্য কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হবার পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি দর্শাতে পারেননি। সে কাজ করলেন নিউটন সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তাঁর আবিষ্কৃত মহাকর্ষের তত্ত্বের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষপথের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু গণ্ডগোল বাধল অন্যত্র। মহাকর্ষের জন্য নক্ষত্রগুলি সকলেই পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। তাই যদি হয় তাহলে এতদিনকার লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী মহাকাশে বহুদূরস্থিত নক্ষত্রগুলির স্থির থাকার কথা নয়। কোনো এক কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের মিশে যাবার কথা। নিউটন এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি যুক্তি দিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ যদি অসীম হয় এবং নক্ষত্রগুলি যদি মোটামুটি সমভাবে তাতে ছড়িয়ে থাকে তাহলে মহাকর্ষের টানে তারা কোনো কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিশে যাবে না, ছড়িয়েই থাকবে। এই অনন্ত অথচ স্থির নক্ষত্রখচিত মহাকাশের মডেলে যে ভ্রান্তি আছে তা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সত্য যে কি তা বোঝা যায়নি। আসলে জন্মমৃত্যুর অধীন মানবজীবনে এক স্থির মহাজগতের চিন্তা কিছুটা দার্শনিক নিশ্চিন্ততার আস্বাদ দিত। আইনস্টাইনও এই স্থির মহাজগতেই বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী এডউইন হাব্‌ল প্রথম বললেন যে আমাদের ছায়াপথের চারধারে যত ছায়াপথ আছে সবাই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, অর্থাৎ মহাজগত স্থির নয়, প্রসারমান। বিগ ব্যাং-এ যে মহাজগত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল তা আজও অব্যাহত।

এই বিগ ব্যাং-এর অব্যবহিত আগে বর্তমান মহাজগতের সমস্ত ভর একবিন্দুতে সংহত হয়ে এক অসীম ঘনত্বের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় জড়বিজ্ঞানের সমস্ত

নিয়মকানুনই লুপ্ত হয়ে যায়। তাই সময়ের প্রবাহ আশ্রয় করে আমরা যে বর্তমানের কোনো অভিঘাতে ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি অথবা অতীতের কোনো ঘটনা থেকে বর্তমানের কোনো অবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারি তারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বিগ ব্যাং-এর আগে যদি সময়ের কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে তা আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন। কারণ সেই অভিজ্ঞতার কোনো রেশ বিগ ব্যাং-এর পরে বাহিত হয়ে আসবে না। অর্থাৎ আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, সময়ের জন্মের উষালগ্ন বিগ ব্যাং-এর সময়। একটা বিন্দু থেকে মহাবিশ্বের প্রসারমানতাকেই সময়ের জন্মলগ্নের একটা স্বাভাবিক ভৌতিক কারণ হিসাবে উপলব্ধি করা যায়। কাল যদি নিরবধি হত তাহলেও একটা জন্মলগ্ন থাকতে পারত, কিন্তু তা হত ঈশ্বরনির্দিষ্ট। তার কোনো ভৌতিক প্রয়োজনীয়তা নেই।

মহাজগতের স্থিতিশীলতার ওপর আঘাত আসে অভিকর্ষের তত্ত্বে। সময়ের অবিচল, নিরবধি অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে—যেখানে স্বীকৃত হল যে স্পেস এবং টাইম, অর্থাৎ আকাশ এবং সময়ের যুগ্ম নিরিখে কোনো ঘটনার বর্ণনা সম্ভব। আলাদা আলাদাভাবে তাদের সাপেক্ষে কোনকিছুই সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না, কারণ কোনো ঘটনা আকাশ এবং সময় উভয়কেই প্রভাবিত করে তাদের পরিবর্তন ঘটায়। ক্রমশ প্রসারমান ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ করল যে সময়ের একটা শুরু আছে। এবারে দেখা যাক এই সময়ের চরিত্রকে আমরা কী কী ভাবে বুঝতে পারি।

সময়ের প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা। অতীতের কথা আমরা অনেক কিছুই জানি। বহু ব্যাপারে সবকিছুই জানাও সম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যতের সবটাই অনুমানসাপেক্ষ। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে আমাদের যাত্রা, কিন্তু সময়ের কলকে উল্টোদিকে চালিয়ে মৃত্যু থেকে জন্মের দিকে যাত্রা এখনও অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। সময়ের গতি সবসময়েই ভবিষ্যতের দিকে, অতীতের দিকে নয় কেন? বিজ্ঞানীদের মতে জগতের সবকিছুই গোছানো অবস্থা থেকে অগোছালো অবস্থায় যেতে চায়। মহাজগতের সবকিছুরই নিয়তি এই যে অগোছালো অবস্থা বেড়েই যাবে। টেবিল থেকে একটা কাপ মাটিতে পড়ে গিয়ে ছত্রখান হয়ে ভেঙে গেল। যদি এই মুভি তুলে রাখা হত এবং সেটিকে চালানোর সময় উল্টোদিকে চালানো হত তাহলে আমরা দেখতাম যে কাপের ভাঙা অংশগুলি কীভাবে মেঝে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে টেবিলে গিয়ে জোড়া লেগে সুন্দর একটা কাপ হয়ে গেল। বাস্তবে তা হবার নয়। টেবিলের ওপর গোছানো কাপ মাটিতে ভাঙা টুকরোর অগোছালো অস্তিত্বের দিকেই এগিয়ে যাবে। যদি এর উল্টোটা হত অর্থাৎ সময়ের জন্মলগ্নে সবকিছু প্রচণ্ডভাবে অগোছালো থাকত তাহলে হয় মহাজগত ক্রমশ গোছানো অবস্থার দিকে যেত নতুবা উপায়ান্তর না পেয়ে অগোছালো অবস্থায় স্থিরভাবে থেকে যেত। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা নিয়তই দেখতে পেতাম যে ভাঙা কাপের টুকরো লাফিয়ে লাফিয়ে গোটা কাপ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের স্মৃতিতে বাঁধা থাকত ভবিষ্যত, অতীত নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোনও প্রশ্ন

থাকত না। দার্শনিক বলতে পারবেন যে এক স্থির বর্তমান জগতের চেহারাটা কিরকম দাঁড়াত!

আমাদের বোধে অতীত বলতে যা ধারণা তা এই গোছানো অবস্থা থেকে অগোছালো অবস্থায় যাবার সঙ্গেই সমার্থক। আমাদের ধারণায় যে ক্রমবিবর্তনকে আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতে সঞ্চার বলে মনে করি, বিজ্ঞানের পরিভাষায় গোছানো (Order) অবস্থা থেকে অগোছালো (Disorder) অবস্থায় যাওয়া বলতেও তাই বোঝায়।

স্মৃতির প্রসঙ্গ তুললে কম্প্যুটারে কীভাবে স্মৃতি ধরে রাখা হয় সেটার আলোচনাই ভাল। কারণ বিজ্ঞানীরা এটার সবটা বোঝেন, কিন্তু মস্তিষ্কের কোষে কোষে কীভাবে স্মৃতি ছড়িয়ে থাকে অথবা কালিদাসের 'জননান্তর সৌহৃদানি'-র ব্যাপারটা বা কী তা বিজ্ঞানীরা সবটা জানেন না। কম্পিউটারের স্মৃতিতে আমরা যদি কিছু সঞ্চয় করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা আসলে দাঁড়ায় যে অনেক অগোছালো তথ্য থেকে বেছেবুছে আমরা এক গোছানো তথ্যে যাচ্ছি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়—এটা গোছানো অবস্থা থেকে অগোছালো অবস্থায় যাবার বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। আসলে কিন্তু তা নয়। কম্পিউটার চালু করা থেকে স্মৃতিতে তথ্য রক্ষা করা পর্যন্ত যা শক্তি ব্যয়িত হয় অর্থাৎ আমাদের পেশীর শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি এবং তার জন্য যে তাপশক্তি জগতে ছড়িয়ে পড়ে তাতে সামগ্রিকভাবে কম্পিউটারের স্মৃতির গোছানো অবস্থাকে ছাপিয়ে মহাজগতের অগোছালো অবস্থা বেড়েই যায়। বিজ্ঞানীরা এটা সহজেই প্রমাণ করতে পারেন।

বাকি থাকে সময়ের তৃতীয় গতি অর্থাৎ সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে মহাবিশ্ব তত ছড়িয়ে পড়ছে। এর কি শেষ আছে? অন্যভাবে বলা যায় সময়ের কি একটা সমাপ্তি আছে? যদি ধরে নেওয়া যায় যে মহাবিশ্বের প্রসারমানতা একদিন থেমে গেল এবং মহাকর্ষের জন্য সমস্ত ছায়াপথগুলি সঙ্কুচিত হতে শুরু করল তাহলে কি বিশ্বজগত অগোছালো অবস্থা থেকে গোছানো অবস্থায় ফিরে আসবে? ব্যাপারটা অবশ্যই অনেকটা অস্বভাবী। কারণ অনুরূপ সঙ্কোচন ঘটতে সময় লাগবে অন্তত এক হাজার কোটি বছর। যাই হোক যদি সঙ্কোচন ঘটতে থাকে এবং মহাজগৎ গোছানো অবস্থায় ফিরতে থাকে তাহলে হতেই পারে যে সময়ের তীর উল্টোদিকে ছুটবে। আমরা যাকে ভবিষ্যত বলে জানি তাই ঘটবে আগে, মানুষ মরবে আগে জন্মাবে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেন—তা নয়। সব গোল মিটে যায় আমরা যদি ধরে নিই যে মহাজগত সান্ত, অন্তত নয়, কিন্তু তার কোনো সীমানা নেই, ধার নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠে একই দিকে চলতে শুরু করলে যেমন শুরু করার বিন্দুতে পৌঁছে যাব তেমনি সীমানাবিহীন অথচ অনন্ত নয় এমনই আমাদের মহাজগত।

মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করলেও ছায়াপথগুলি ভৌত অবস্থা ঠিক প্রসারণের উল্টো পিঠ হবে না। অগোছালো অবস্থা বাড়তেই থাকবে, তবে খুব ধীরে; এবং সময়ের তীর ঠিক আগের মতোই, আমরা যাকে অতীত বলি তা থেকে ভবিষ্যতের পথে

অনিবার্যভাবেই চলবে। শুধু মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের তখন অস্তিত্ব থাকবে না। কেন থাকবে না তার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের জীবনধারণের জন্য, গোছানো অবস্থা থেকে অগোছালো অবস্থায় যেতে একটা দ্রুততা লাগে। আমরা শাকসব্জী খাই—সেগুলি সংহত গোছানো শক্তি। খাবার পরে আমাদের শরীরে সেগুলি তাপ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেটা কিনা অগোছালো শক্তি। এই পরিবর্তনের জন্য ন্যূনতম দ্রুতি লাগে, যেটা কিনা, মহাজাগতিক সঙ্কোচনের সময় না-থাকাই সম্ভব। কিন্তু এত ভাবারই বা কী দরকার? বিজ্ঞানে কোনো তত্ত্বই যে শেষ কথা তা কেউ বলে না। কোনো কারণে আমাদের সূর্য যদি হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম গ্যাস তৈরি বন্ধ করে দেয় তাহলে সেই গুরুদশা থেকে আমাদের কি কোনো নিস্তার থাকবে?

হিউম্যানিজম

অম্লান দাশগুপ্ত

'হিউম্যানিজম' নিয়ে আলোচনা করার প্রধান সমস্যা কথাটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য করা। ইউরোপীয় নবজাগরণের সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে 'হিউম্যানিজম' যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, তারই কিছু সূত্র ধরে এখানে আমরা আলোচনা করব। আরো নানাভাবে কথাটি প্রয়োগ করা হয়, কখনো সাধারণ এবং বিস্তৃতভাবে, কখনো খুব সীমিত বা পারিভাষিক অর্থে। 'মানবতাবাদ' বা 'মনুষ্যধর্ম' শব্দের সমগোত্রীয় অর্থে 'হিউম্যানিজম'-এর ব্যবহার বহুপ্রচলিত। মানবজাতির সামাজিক কল্যাণ, তার সমষ্টিগত উন্নতিসাধন এবং সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা এই ধারণার আওতাভুক্ত। এই ধরনের প্রয়োগ সাধারণভাবে স্বীকৃত, তাই ব্যাখ্যা করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। অন্যদিকে খ্রিষ্টীয় ধর্মচিন্তার পরিভাষায় 'হিউম্যানিজম'-এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যিশু খ্রিষ্টকে শুধুমাত্র মানুষরূপে কল্পনা করার রীতিকে এইভাবে নির্ধারণ করা হয়।

ইউরোপীয় নবজাগরণের যে কোনো আলোচনায় 'হিউম্যানিজম' স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। কিন্তু এর মানে নিয়ে এখানেও নানারকম সমস্যা, বিশেষ করে সংজ্ঞা নির্ধারণের। রেনেসাঁস-এর স্বরূপ নিয়ে যেমন অনেক মতবিরোধ, হিউম্যানিজম-এর প্রকৃত অর্থ নিয়েও বিভিন্ন মতবাদ। আলোচনার শুরু পল অস্কার ক্রিস্টেলর (Paul Oskar Kristeller) সমর্থিত একটি মত দিয়ে করা যায়। প্রাথমিকভাবে অন্তত 'হিউম্যানিজম'কে 'মানবতাবাদ' ইত্যাদির প্রতিশব্দ না মনে করে এটিকে একটি বিশেষ শিক্ষার ধারার শীর্ষক বলে মনে করা যেতে পারে। জার্মান পণ্ডিত নিয়েট্‌হামের (Niethammer) ১৮০৮ সালে 'হুম্যানিজ্‌মুস' (Humanissmus) কথাটি প্রয়োগ করেন বিদ্যালয়ে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের পঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে। প্রচলিত কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম থেকে এই শিক্ষা ভিন্ন। ক্রিস্টেলর মন্তব্য করেন যে যদিও 'হুমানিজ্‌মুস'-এর এই অর্থটি উনিশ শতকের গোড়ার থেকে পাওয়া যায়, ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সময় থেকেই ধ্রুপদি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রদের 'হুমানিস্তা' (Humanista) অথবা এইরকম অন্য কোনো নামে, অভিহিত করা হত।

একটি বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'হিউম্যানিজম'-এর উৎপত্তি রোমানযুগে। সিসেরো (Cicero) এবং অন্যান্য লেখকদের মধ্যে 'স্তুদিয়া হুমানিতাতিস্'

(Studia Humanitatis)-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। এর আওতায় সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ত। এই অর্থের একটি ছায়া এখনও আমাদের 'হিউম্যানিটিজ' (Humanities) পাঠ্যক্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই অর্থটি প্রাধান্য পায়। ইউরোপীয় মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ঈশ্বরতত্ত্বের অনস্বীকার্য প্রাধান্য ছিল। তার থেকে ভিন্ন একটি শিক্ষার ধারা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা এই কথাটির ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত। তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর আলোচনায় 'হিউম্যানিজম' একটি বিশিষ্ট পাঠ্যক্রম বা শিক্ষার ধারা, যার অন্তর্গত প্রধান বিষয়গুলি ব্যাকরণ, ইতিহাস, অলঙ্কার, কাব্য, নীতিশাস্ত্র। এইগুলি অধ্যয়ন করা হত প্রচলিত লাতিন (এবং কিছুক্ষেত্রে গ্রিক) লেখকদের প্রতি মনোনিবেশ করে। তাই 'হিউম্যানিজম'-এর এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি কোনো বিশেষ দার্শনিক ভাবধারা নয় : বরং এটিকে বলা যেতে পারে একটি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা এবং শিক্ষার কর্মসূচি। ইউরোপীয় রেনেশাঁস-এর মতাদর্শের খোঁজ করতে গেলে 'হিউম্যানিজম'-এর কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়। নবজাগরণের বিশিষ্ট চিন্তাধারাগুলি, যেমন—প্লেটো-বাদ, আরিস্ততল-বাদ ইত্যাদি—বুঝতে গেলে 'হিউম্যানিজম'-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন লেখকদের পুঁথি উদ্ধার, সেগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করা, তার সঠিক পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা এবং সেগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা সাধারণভাবে হিউম্যানিস্ট পদ্ধতির কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত।

ব্রিস্টেলর এবং তাঁর অনুগামীদের প্রবর্তিত এই ব্যাখ্যাকে বলা যেতে পারে হিউম্যানিজম-এর একটি আবশ্যিক ন্যূনতম রূপ। যদিও আমরা 'হিউম্যানিস্ট' বলতে বুঝি ফ্রাঞ্চেস্কো পের্ত্রাকের মতো কবিদের, অথবা ফ্লোরেন্স শহরে আচার্য কলুচ্চিও সালুতাতির মতো পণ্ডিত এবং সুলেখকদের। সেকালে যাদের হিউম্যানিস্ট আখ্যা দেওয়া হত তাঁরা বেশির ভাগ স্কুল কলেজে পড়াতেন, বা সরকারি দপ্তরে চাকরি করতেন, বা রাজা-রাজড়ার পরামর্শদাতা ছিলেন। এ সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে আরেকটু বিস্তৃতভাবে দেখলে 'হিউম্যানিজম'-এর আরো কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। দুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি রাজনৈতিক। যে প্রাচীন লেখকদের হিউম্যানিস্টরা বিশেষভাবে সমাদর করতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রোমান দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ সিসেরো। অনেকে মনে করেন যে নবজাগরণের 'হিউম্যানিজম'-কে 'সিসেরো-পন্থী হিউম্যানিজম' বললে ভুল হয় না। হিউম্যানিস্টদের চোখে সিসেরোর দার্শনিক সত্তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর প্রখর বাগ্মিতা এবং তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ। তাই সিসেরো-র লেখা অধ্যায়ন করা তাঁর বাগ্মিতার উৎস খোঁজা এবং যথাসম্ভব সেটিকে আত্মস্থ করা। আগেই বলা হয়েছে যে অলঙ্কারশাস্ত্রের (rhetoric) স্থান হিউম্যানিস্ট পাঠ্যক্রমের শীর্ষে ছিল। মনে রাখতে হবে যে এই শাস্ত্র অধ্যয়নের এবং প্রয়োগের প্রধান ক্ষেত্র মনে করা হয়েছে রাজনীতি : বক্তৃতা করার সময় বক্তা কীভাবে ভাষার মাধ্যমে অন্যদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে তারই বিচার এই শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। প্রাচীনকাল থেকেই বাগ্মিতার সঙ্গে নৈতিক সদ্‌গুণের নিবিড় সম্পর্ক কল্পনা করা

হত। রেনেশাঁস 'হিউম্যানিজম'-এর চিন্তার ভাষার সঠিক ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে নিজের এবং অপরের সামাজিক আদান-প্রদানের নিয়ন্ত্রণ-এর বিষয় গভীর মনোযোগ আমরা দেখতে পাই, এবং এখানে হিউম্যানিস্ট শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ সম্ভব। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্লোরেন্স শহরে 'পৌর' 'হিউম্যানিজম'-এর বিকাশের রূপটি দেখলে এই বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হয়।

রেনেশাঁস 'হিউম্যানিজম'-এর আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে যেমন 'মানবতাবাদ'-এর সাধারণ অর্থের সঙ্গে এর পার্থক্য স্থাপন করার দরকার হয়েছিল, শেষে আবার তেমনই একটি নতুন সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। যে-শিক্ষার কথা হিউম্যানিস্টরা বলেছেন, তাঁদের চোখে এটি প্রকৃতপক্ষে মানুষ হবার শিক্ষা। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম্যানিস্ট চিন্তায় মনুষ্যত্বের দুটি সূত্র দেখা দেয়। একটি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যবর্গের নিম্নে যা তার পার্থক্য; অন্যটি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যবর্গের উর্ধ্বে যা তার পার্থক্য। মানুষ হওয়া তাই যেমন একটি সদ্‌গুণ আবার এক ধরনের সীমাবদ্ধতাও বটে। এই দুটি সূত্র আমাদের 'হিউম্যানিজম'-এর 'মানবতাবাদ'—যা তার বিবিধ শিল্পকর্মে এবং সাহিত্যকর্মের প্রকাশিত—বুঝতে সাহায্য করে।

হিন্দুধর্ম

অজিতকুমার চক্রবর্তী

জরথ্রুষ্ট বা গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মকে যেমন বলা হয় জরথ্রুষ্ট্রীয় বা বৌদ্ধধর্ম, অথবা যিশুখ্রিষ্ট প্রচলিত ধর্ম খ্রিষ্টান বা হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম ইসলাম ধর্ম—হিন্দুধর্মের এমন কোনো বিশেষ একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ, অবতার বা ধর্মগুরুর সর্বগ্রাহিতা নেই। এটাই হিন্দুধর্মের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

হিন্দুধর্ম প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। তবে সেই প্রাচীনকালে এই ধর্ম নিশ্চিতভাবেই 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত ছিল না। সমগ্র বৈদিক-সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি কোথাও 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ নেই। বস্তুত শব্দটির উদ্ভব সম্ভবত ভারতের বাইরে। সিন্ধুনদের নামানুসারে বহু প্রাচীনকালে সৃষ্টি হয়েছিল 'হিন্দু' শব্দটি।

প্রাচীন পারসিকরা দন্ত্য'স-এর স্থানে 'হ'-উচ্চারণে ছিল অভ্যস্ত। ফলে সিন্ধু তাঁদের উচ্চারণে হয়ে যায়—'হিন্দু'। আর সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চল হয় 'হিন্দুস্থান'। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরাই 'হিন্দু'। পারসিকদের উচ্চারণে 'স' যেমন হয়ে যায় 'হ', তেমনি গ্রিকরা আবার শব্দের আদ্য হ-ধ্বনিকে উচ্চারণ করে না। তাই পারসিকদের উচ্চারিত 'হিন্দু' গ্রিকদের উচ্চারণে হয়ে গেল ইন্দু বা ইন্দো (Indo)। এর থেকেই ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান (India, Indian)। এভাবে শুধু সিন্ধুতীরবর্তী অধিবাসীমাত্রই নয়, অর্থব্যাপ্তি ঘটে সমগ্র ভারতবাসীই পরিচিত হল হিন্দু নামে এবং তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি বলে পরিচিত হতে থাকল সারা বিশ্বে।

বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় অর্থে 'হিন্দু' শব্দটি এদেশে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় ভারতে আগত আক্রমণকারী মুসলমানগণ দ্বারা—এদেশের অধিবাসীদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি (Identity) সূচিত করতে।

বিশ্বের প্রাচীনতম সুগঠিত এই ধর্মটির লক্ষণ নির্ণয়ে *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*-তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল—ক. আত্মন্ ও ব্রাহ্মণের তত্ত্বে বিশ্বাস খ. বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস গ. ইষ্টদেবতা ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাস এবং ঘ. পুনর্জন্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস। মোটামুটিভাবে হিন্দুধর্মের একটা পরিচয় এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ধর্ম কালক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বহুমত ও মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নানান দার্শনিক মত। নিজের কোনো রুচিমতো যে কোনো মত গ্রহণ বা অনুসরণে কোনো বাধা নেই হিন্দুধর্মে। বিশেষ কোন ক্রিড

(Creed) বা অনুশাসন দ্বারা এখানে খর্ব করা হয় না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে—এটাও হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বলা চলে হিন্দুধর্মের উৎসমূলে আছে বেদ গ্রন্থ। বেদনির্ভর এই ধর্মকে তাই বৈদিক ধর্মও বলা হয়। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ, জ্ঞান—পরম জ্ঞান (knowledge per excellence)। ম্যাকডোনেল (A. A. Macdonell), ভিন্টারনিৎস (M. Winternitz) প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে বেদ-এর রচনাকাল অন্তত তিন থেকে চারহাজার বছর পূর্বে। ম্যাক্সমূলারের মতে বেদ-মন্ত্রাদি খ্রি. পূ. ১০০০, ১৫০০, ২০০০ বা ৩০০০ বৎসর পূর্বে কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল, তা পার্থিব কোনো শক্তির পক্ষেই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বেদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

—'প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ হতেই পাওয়া যায়,—সে কারণেই একে বেদ বলা হয়।'

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারটি বেদ। প্রতিটি বেদ আবার চারভাগে বিভক্ত—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ।

বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি ও উপাসনা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব। সুধীবৃন্দ অনুমান করেন যে, খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ সনাতন ভারতীয় ধর্ম তথা প্রাচীন হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত।

বৈদিক ধর্মাচরণে যজ্ঞের একটি বিশেষ স্থান ছিল। যজ্ঞে পশুবলি ছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় সকল ধর্মেই নানা উপলক্ষে পশুবলি বা উৎসর্গ প্রথা ছিল। কোনো কোনো ধর্মে এখনো বর্তমান। পরবর্তীকালে ভাবগত সম্প্রদায় যজ্ঞে পশুহত্যার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই পশুহত্যার যৌক্তিকতা অস্বীকার করেছেন। যজ্ঞে পশুবলির এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রচার করলেন বৌদ্ধধর্ম, যার মূলকথা—'অহিংসা পরমোধর্ম'। অবশ্য কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেই প্রতিবাদী বৌদ্ধধর্ম মিশে গেল হিন্দুধর্মের মধ্যে এবং বুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়েও বিষ্ণুর অবতাররূপে গৃহীত হলেন হিন্দুধর্মে।

বেদে একেশ্বরবাদ স্বীকৃত হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সকল প্রাচীন সমাজই ছিল বহুদেবতার উপাসক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাচীন সমাজের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষ বহুদেবতায় আপাত বিশ্বাস সত্ত্বেও মূলত ছিল একেশ্বরবাদী। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদেই বলা হয়েছে—'পক্ষী একই আছেন পণ্ডিতগণ তাঁকে বহুপ্রকার কল্পনা করেন।' এই পক্ষী অবশ্যই—'ব্রহ্ম'। আরেকটি শ্লোকে বলা হয়েছে 'এক ঈশ্বরকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করে থাকেন বিপ্রজন।' ঋগ্বেদে দেবউপাসনার বৈশিষ্ট্য বহুর মধ্যে একত্বের অনুভূতি। অপর বেদগ্রন্থগুলিতেও বহুদেবতার উল্লেখ থাকলেও তাঁরা যে সেই 'পরম এক'-এরই নানা রূপ, সে কথাটিই বলা হয়েছে সর্বত্র। তাই হিন্দুধর্ম তার উন্মেষলগ্ন থেকেই একেশ্বরবাদী। বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ—সর্বত্র প্রকাশিত এই একেশ্বর-বিশ্বাস।

বেদের যুগের উত্তরকালে একেশ্বরবাদ ভাবনাধারার আরো বিকাশ ঘটে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র—এ ভাবনা পরবর্তীযুগে সন্তোষজনক মনে হয়নি। আরো গভীর অনুসন্ধান এল নতুন এক উপলব্ধি—'পুরুষং এবেদং সর্বম্'। সৃষ্টি হল 'সর্বেশ্বরবাদ'।

একেশ্বরবাদে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র। এখানে যেহেতু ঈশ্বরের পৃথক সত্তা আছে, তাঁর উপর আরোপ করা সম্ভব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ফলে ভক্তের সঙ্গে ভক্তির সূত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ সৃষ্টির সঙ্গে পরম সত্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। এখানেই একেশ্বরবাদের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের পার্থক্য। ব্যক্তিত্বগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে এখানে স্বীকার করা হয় না। সর্বেশ্বরবাদে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি উভয়ে ওতপ্রোত সম্পৃক্ত। ঋগ্বেদের শেষে সূচিত হলেও উপনিষদেই সর্বেশ্বরবাদ স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

বুদ্ধপূর্ব যুগে অর্থাৎ তিন হাজার বছর পূর্বে হিন্দুধর্মে যে সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, অষ্টাদশ শতকে জার্মান দার্শনিক শেলিঙ্ নতুন করে আবিষ্কার করলেন সেই তত্ত্বটিকে। তিনি বললেন,—জড় এবং চেতন এই উভয়প্রকার বস্তুর মধ্যেই এক এবং একই বিশ্বশক্তি নিহিত রয়েছে। একই বহু হয়, এবং বহু এক হয়।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মের প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই তাদের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলয়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি'। এই সকল চিন্তাধারা অনুধাবন করলে সন্দেহ থাকে না যে একই বিরাট শক্তি সমগ্র বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ তথা সর্বব্রহ্মবাদ হিন্দুধর্মের এক পূর্ণতার দার্শনিক মতবাদ। বেদ-উপনিষদের এই সকল চিন্তা নিয়েই প্রাচীন হিন্দুধর্ম। ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম হয় না। অন্তত সাধারণ লোক সে কথাই ভাবতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে 'ধর্ম' কখনই নিরীশ্বর নয়।

বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় ধর্মেই ঈশ্বরে অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে, সুতরাং উভয়ধর্মই নিরীশ্বর। এখানে লক্ষ্য নির্বাণ, বুদ্ধের বা মহাবীরের উপদেশ, যা কতকগুলি নীতি, পালন করলেই এই নির্বাণ লাভ করা যায়। ঈশ্বর এখানে নিরর্থক। তবুও বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ ধর্ম বলেই স্বীকৃত। হিন্দুধর্মের বহুশাখা ও দর্শনে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকাশ্যে খণ্ডন করা হলেও বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হলেও এগুলিকে ধর্মমত বলে স্বীকারে কোন বাধা আসেনি। এরা হিন্দুধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই স্বীকৃত।

হিন্দুধর্ম বহুজনসেবিত একটি বটবৃক্ষের ছায়া, যে যার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। পরমতত্ত্ব নিয়ে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশ্বসংসারের অর্থ নিয়ে, এখানে তর্কবিতর্ক আছে। এখানেই বলা সম্ভব 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ'। সকল ধর্মেই মত-মতান্তর আছে। একমাত্র হিন্দুধর্মে বলা হয় 'যত মত, তত পথ'। ঋগ্বেদের প্রার্থনা মন্ত্রের সর্বত্র সকলের জন্য কল্যাণ কামনা দেখা যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্ম ভারতের নানা সাধনার সমন্বয় সাধনা করেছে। হিন্দু স্বভাবতই এ সকল ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতে যখন খ্রিষ্টানগণ

এলেন, তখন দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজারা সেই সব খ্রিষ্টান সাধকের ব্রহ্মোত্তরের মতো ভূমি বৃত্তি দিয়ে তাঁদের ধর্ম সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। পারসিরা যখন আপন ধর্ম রক্ষার জন্য আপনদেশ পারস্য ছেড়ে গুজরাতে এলেন তখন যদুরাণা তাঁদের ভূমি ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেন। মুসলমান ভক্তদের জন্যও দেবী অনুপমা যে চুরাশিটি মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন সে-কথা আমরা জৈনদের পুরাতন-প্রবন্ধ গ্রন্থে দেখতে পাই। আক্রমণকারী মুসলমান জয়ের বহু পূর্বে মুসলমান সাধকদের জন্য হিন্দুরাজাদের ভূমিদানের বহু প্রমাণ আছে।

একাদশ শতকে আরব দেশীয় বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত অলবেরুনি ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ভাষা অধিগত করে সংস্কৃত শাস্ত্রে অনুসন্ধান করে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলেছেন :

আমাদের ধর্ম [আরবদেশি ধর্মবিশ্বাস] থেকে হিন্দুদের ধর্ম একেবারে আলাদা। কারণ আমরা যা বিশ্বাস করি তারা তা বিশ্বাস করে না। আর তারা যা বিশ্বাস করে আমরা তা বিশ্বাস করি না। মূল কথা এই—ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিশেষ কলহ হয় না, বড়োজোর বাগ্‌যুদ্ধ অর্থাৎ তর্ক-বিতর্ক চলে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই নিজের দেহ, আত্মা বিসর্জন দিয়ে অর্থাৎ 'খুনোখুনির' পথে ধর্মীয় কলহের নিষ্পত্তি করতে চায় না।

অলবেরুনি হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্য সেদিন লক্ষ করেছিলেন, সকল ধর্মসম্প্রদায় সেই মনোভাবের অধিকারী হলে বিশ্বের মঙ্গল হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুধর্ম সেই উদার সহনশীলতার রূপটি আজ হারাতে বসেছে।

হিন্দুধর্মের বিশ্বাসগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখ্য তার মধ্যে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ অন্যতম। এই বিশ্বাস শুধুমাত্র হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ নয়। একমাত্র যুক্তিবাদী লোকায়ত চার্বাকপন্থী ছাড়া আর প্রায় সকলেই—বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক—পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী। দেহাতিরিক্ত আত্মা না মেনেও বৌদ্ধধর্ম পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। উপনিষদের মতবাদগুলির মধ্যে কর্মফলবাদ এবং জন্মান্তরবাদ অন্যতম। এই পুনর্জন্ম লাভ হবে কর্মফলের উপর। এখানেই নীতিশিক্ষার প্রয়োগ। সুকর্মের জন্য সুফলের প্রত্যাশা। কুকর্মের জন্য দুঃখভোগের আশঙ্কা।

সকল ধর্মেই স্বর্গ-নরকের ধারণা রয়েছে। আপন আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বর্গ নরকের কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মে স্বর্গ এমন একটি 'অবস্থা' যা দুঃখের দ্বারা মিশ্রিত নয়। সে সুখ অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকে—ইত্যাদি। এখানে কিন্তু স্বর্গ বলতে একটি 'অবস্থা' বোঝানো হয়েছে, স্বর্গ কোনো দুর্গম স্থান নয়। 'নরক' কল্পনাটা বৈদিক চিন্তায় বিশেষ স্থান পায়নি। 'নরক' শব্দটিও অবৈদিক। পরবর্তী পুরাণাদিতে এই ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। বেদ বা বেদাশ্রিত মীমাংসা'য় স্বর্গ একটা বিশেষ স্থান নয়। একটা অবস্থা মাত্র। অনাবিল আনন্দ—দুঃখের একান্ত অভাবই স্বর্গ। হিন্দু ধর্ম-দর্শনে স্বর্গ আছে অন্তর্জগতে। আর স্বর্গ যদি হয় এক প্রকার নিরবচ্ছিন্ন মানস সুখধারা নরকও তাহলে স্থানবিশেষ না হয়ে এক মরণাধিক যন্ত্রণাময় মানস অবস্থাকেই বোঝাতে চায়।

হিন্দুধর্মের আরেক লক্ষণ মূর্তি পূজা। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। মূর্তিপূজার ধারণা বহু পরবর্তী কালের। বেদ-উপনিষদের ঋষিগণ নিরাকার আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধিতে সক্ষম হলেও সাধারণ লোকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না বলেই পরবর্তীকালে অধিকারভেদে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ-অনুসারে প্রতীকরূপে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল। পুরাণের যুগেই এ সকল দেব-কল্পনা ও মূর্তিপূজার চলন হয়েছিল বলেই মনে হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ইতিহাসখ্যাত মেগাস্থিনিস তাঁর বিখ্যাত ভারত-বিবরণে বলেছেন—ভারতীয়গণ মন্দিরে দেবতাদিগের আরাধনা করিত না। খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতকেও ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়নি। পরিবর্তে বুদ্ধের প্রতীকরূপে পদচিহ্ন, ধর্মচক্র, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি প্রতীকগুলিই পাথরে খোদাই করে উপাসনা করা হত।

হিন্দু সমাজে প্রতিমা পূজার প্রচলন থাকলে বৌদ্ধধর্মে ও শাস্ত্রে তার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়তই। যেমন পরবর্তীকালে পড়েছে। তবে একথা বোধহয় ঠিক যে গ্রিক ভাস্কর্যের প্রেরণা ও প্রভাবেই প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। হিন্দু দেবমূর্তি কল্পনার মূলেও গ্রিক ভাস্কর্যের প্রভাব থাকা সম্ভব।

নিরুক্তকার যাস্ক-এর মতে বেদের দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবীর অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, দ্যুলোক সূর্য। অগ্নির অগ্নিত্ব বা তেজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে। এই তেজোরূপ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ সূর্য ইত্যাদি। এর থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা প্রতীকী-উপাসনা মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের প্রতীক-প্রীতি থেকেই মূর্তিপূজার উদ্ভব। সম্ভবত পুরাণের যুগেই নানা দেবতার কল্পনা এবং মূর্তিপূজা সুপ্রতিষ্ঠ হয়।

গুপ্তযুগে অর্থাৎ তৃতীয়-চতুর্থ শতকে পৌরাণিক ধর্ম ও মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল একথা বলা যায়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই যুগের মুদ্রা ও ভাস্কর্যে। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় যেমন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদানের চিত্র অঙ্কিত আছে, তেমনই অঙ্কিত আছে লক্ষ্মী, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবমূর্তিও। যাগযজ্ঞ এবং দেববিগ্রহ পূজা, ধর্মচর্যার এই উভয়রীতিই সম্ভবত প্রচলিত ছিল গুপ্তযুগে। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক ও বাসিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি মূর্তির সঙ্গে গ্রিক, পারস্য প্রভৃতি দেশের নানা দেবতার মূর্তি একই সঙ্গে অঙ্কিত আছে। এর থেকে মনে করা যায় যে বিদেশি প্রভাবে এদেশে মূর্তি প্রচলন ঘটেছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মেও হিন্দু দেবতাগণ স্থান করে নিয়েছিলেন। আরো পরবর্তীকালে নানা লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের দেবতা-মণ্ডলে স্থান পেয়ে পূজিত হতে থাকেন।

হিন্দুধর্মের সুবিস্তৃত ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা সর্বজনস্বীকৃত। হিমালয়ের সু-উচ্চ গোমুখ থেকে ভাগীরথী গঙ্গা যেমন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে সাগরে মিশেছে—পথে কত জলধারা এসে যেমন তার পুষ্টিসাধন করেছে, তেমনি বহুতর আবিলতাও ঘটিয়েছে। তবুও ভাগীরথীর স্রোত রুদ্ধ হয়নি।